বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ

শ্রীনিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী

যাঁর রসবোধ ও বৈদগ্ধ্যের সামান্য উত্তরাধিকার পেলে

আমার জীবন ধন্য হয়ে যেতো,

সেই স্নেহময় বাবা স্বর্গীয় শ্রীপতি চরণ সাহুর

প্রেরণা ও রম্য স্মৃতির উদ্দেশে।

সূচীপত্র

ভূমিকা পূর্বভাস

প্রথম অধ্যায়

কৃষ্ণকথার প্রাচীন প্রসঙ্গ

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালী—সে ভক্ত-ভাবুক, রসিক-সজ্জন কিংবা ধনী-নির্ধন, যিনিই হোন না কেন, প্রাণের তৃষ্ণা যে নির্ঝরিণীর ধারাস্রোতে নিবৃত্ত করতেন তার সংক্ষিপ্ত নাম 'কৃষ্ণকথা'। একটি প্রবাদে এই সত্য মূর্ত হয়ে আছে—'কানু বিনা গীত নাই'। নদীমাতৃক বাংলাদেশের তরুপল্লবের সজীব শ্যামলিমা, তার বর্ষা ঋতুর মেঘমেদুর পরিবেশ, এই কানুগীতির 'সাহিত্য'কে বাঙালীর জীবনে যেন আরো নিবিড় নৈকট্যে নিয়ে এসেছে। আধুনিক সাহিত্যও হয়তো সেই অতীত স্মৃতির নিবিড় প্রেরণায় কানুগীতির সুধা বাঁশিতে আজও মাঝে মাঝে সুরের জলসা বসায়। বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিষয়টি এমন গভীর ভাবে আশ্লিষ্ট হয়ে গেছে যে, এটি যে কোন-দিন বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ ছিল না তা বোধই হয় না। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিষয়টি একদিন বঙ্গেতর ভারতীয় ঐতিহ্য থেকেই বাঙালী গ্রহণ করেছিল। গ্রহণের পর সংযোজন ও বিয়োজনের স্বাভাবিক প্রাণধর্ম আরোপে একটি সুসংবন্ধ পথও সে অতিক্রম করেছে। আমাদের জিজ্ঞাসা—জীবনের কোন প্রেরণায় নির্বিশেষ বাঙালী একদা বিষয়টিকে আপন করে নিয়েছিল এবং বিকাশের কোন্ ধারাপথে সে আপন অধিকার করেছিল বিস্তার? মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথা প্রধানতঃ 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যগুলো এবং 'বৈষ্ণব পদাবলী'কে আশ্রয় করলেও অল্পবিস্তর সমস্ত কবিকর্মের সঙ্গেই তার যোগাযোগ। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমরা সর্বভারতীয় ঐতিহ্যে কৃষ্ণকথার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের রেখাচিত্রটি উপস্থিত করতে চাই। এ ক্ষেত্রেও আমরা দেখব বিষয়টি নিত্য নবায়িত হয়ে কালস্রোতে পরিবর্তমান রুচি ও কল্পনার অনুগ একটি শাশ্বত কথাবস্তুতে পরিণত হয়ে উঠেছে।

॥ ১ ॥

বৈদিক সাহিত্যে কৃষ্ণকথা

ভারতীয় সাহিত্যের পৌরাণিক যুগেই কৃষ্ণকথার বিকাশ পরিণতির একটা উচ্চ সীমা স্পর্শ করেছিল, এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। পুরাণ লক্ষণাক্রান্ত মহাভারতের পরিশিষ্ট 'খিল হরিবংশ' থেকে আরম্ভ করে নানা পুরাণ ও উপপুরাণ সমূহ এই কৃষ্ণকথার আশ্রয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই পুরাণ সমূহের আগেও কৃষ্ণকথার নানা উপাদান ছিল বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। বিশ্বের প্রাচীনতম লিখিত সাহিত্য হিসেবে অভিনন্দিত ঋগ্বেদের মধ্যেও আমরা কৃষ্ণ প্রসঙ্গের প্রাথমিক আভাসটি পেয়ে থাকি। আজ আমরা যে কৃষ্ণকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সর্বব্যাপ্ত দেখি, তার মধ্যে মিলিত হয়েছেন 'বিষ্ণু', 'নারায়ণ', 'হরি' প্রভৃতি বিচিত্র দেবসত্তা। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থাতে এঁরা ছিলেন পরস্পর পৃথক। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা 'বিষ্ণু' এবং 'কৃষ্ণ' আজ অভিন্ন হলেও এঁদের মধ্যে রয়েছেন বৈদিক 'আদিত্য-বিষ্ণু', উপনিষদের 'বাসুদেব-কৃষ্ণ' এবং ব্রাহ্মণ ও মহাভারতের 'নারায়ণ'।

'আদিত্যবিষ্ণু' বৈদিক দেবতা, ঋগ্বেদে আমরা এঁর উল্লেখ পেয়েছি। ঋগ্বেদে 'বিষ্ণু' সম্বন্ধে যে মন্ত্রগুলি পাওয়া যায় তার একটি হলো—

ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূলহমস্য পাংসুরে।
ত্রীনি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্ ॥[১]

বিষ্ণু সপ্তকিরণের সাথে যে ভূপ্রদেশ হতে পরিক্রমা করেছিলেন সে প্রদেশ হতে দেবগণ আমাদের রক্ষা করুন। বিষ্ণু এ জগৎ পরিক্রমা করেছিলেন, তিন পদবিক্ষেপ করেছিলেন, তাঁর ধূলিযুক্ত পদে এ জগৎ আবৃত হয়েছিল।

সায়নাচার্যের মতে 'বিষ্ণু'র এই তিন প্রকার পদক্ষেপের প্রসঙ্গ পরবর্তী কালের পুরাণে-উল্লিখিত বামনাবতারের পূর্বাভাস। ঋগ্বেদের এই 'বিষ্ণু' সূর্যের সাথে অভিন্ন বলেও কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন।[২] গোপবালক কৃষ্ণের একটি ক্ষীণ আভাসও ঋগ্বেদের কোন কোন শ্লোকে পাওয়া যায়। যেমন উদ্ধৃত মন্ত্রটিতেই বিষ্ণুকে 'গোপা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর পুরাণে কৃষ্ণ তো গোপবেশী বিষ্ণু। অন্য একটি শ্লোকে বিষ্ণুকে বলা হয়েছে 'যুবা কুমারঃ'। পুরাণে বৃন্দাবনলীলার কৃষ্ণও গোপশিশু ও কিশোর। ঋগ্বেদেও দেখি দ্যুলোকের বহু ঊর্ধ্ব স্থানে বিষ্ণুর বহু শৃঙ্গ বিশিষ্ট গরু ছিল (যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ[৩])। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের মর্যাদা বিষ্ণুর তুলনায় বেশী হলেও পুরাণে 'উপেন্দ্র' (উপ-ইন্দ্র) নামটি বাদ দিলে বিষ্ণুই প্রধান দেবতা। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, বেদের বিভিন্ন কাহিনী নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নব নব সূত্রের অঙ্গীকারে নবতর পৌরাণিক কাহিনী সৃষ্টি করেছে। বেদে ইন্দ্রের শত্রুদের মধ্যে বৃত্র অহির উল্লেখ আমরা পাই, যাকে ইন্দ্র হত্যা করেছিলেন। এই অহিবৃত্র কল্পনাই সহজে কালীয়নাগের কল্পনায় রূপান্তরিত হয়েছে।[৪]

পুরাণে ইন্দ্র ও কৃষ্ণের বিরোধসংক্রান্ত দুটি গল্প আছে। একটি পারিজাতহরণ আর দ্বিতয়টি গোবর্ধন ধারণ। পারিজাতহরণ উপাখ্যান অর্বাচীন, এর কোনও আভাস বৈদিক সাহিত্যে নেই। তবে গোবর্ধন-ধারণের আভাস ক্ষীণভাবে আছে। কৃষ্ণ ইন্দ্রের প্রতিকূলতা থেকে বৃন্দাবনকে রক্ষা করার জন্য গোবর্ধন ধারণ করেন, আর বেদে আছে বিষ্ণু পৃথিবীর ঊর্ধ্ব আকাশকে থামের মতো ধরে আছেন ("যো অস্কভায়দ্ উত্তরং অধস্থম্"), যার তলায় মর্ত্য-অমর্ত্যের বাস। এই গোবর্ধনলীলা, সাহিত্যে যেমন মূর্তি-শিল্পেও তেমনি অত্যন্ত সুপরিচিত প্রসঙ্গ। পরবর্তী ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদে 'বিষ্ণু' প্রসঙ্গ আরও ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণের একটি উপাখ্যান থেকে জানা যায়, দেবতাদের কৌশলে নিহত বিষ্ণুর ছিন্নমুণ্ডই আকাশে সূর্যরূপে শোভমান।[৫] শতপথ ছাড়া 'তৈত্তিরীয় আরণ্যক' ও 'পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে'ও বৈদিক বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিষ্ণুকে একজন বিশিষ্ট দেবতা হিসেবে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয়েছে।[৬] এই বিষ্ণু ইন্দ্রের সহায়ক এবং ইন্দ্রের দ্বারপাল।

আবার ঋগ্বেদের কাল থেকেই নারায়ণ নামে এক ঋষি-দেবতার উল্লেখ আমরা পেয়েছি। তিনি "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।"[৭] শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত নারায়ণ যে ঋগ্বেদেরই নারায়ণ তাও সহজেই বোঝা যায়। ঋগ্বেদে যাঁর বর্ণনা

"স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্,'[৮] শতপথ ব্রাহ্মণে তাঁরই ইচ্ছা—"অতিতিষ্ঠেয়ং সর্বাণি ভূতান্যহমেবেদং সর্বং স্যামিতি"[৯] এবং শতপথেও বিষ্ণু নারায়ণ দুই পৃথক দেবতা।

কৃষ্ণ নামে একাধিক ব্যক্তির পরিচয়ও আমরা ঋগ্বেদ থেকে পাই। যেমন ৮।৬, ৮।৮৫, ১০।৪২, ১০।৪৩, ১০।৪৪ সূক্তের দ্রষ্টা ঋষি কৃষ্ণ। ৮।৮৬ সূক্তের দ্রষ্টা কার্ষ্ণি বা বিশ্বকায় যিনি কৃষ্ণ-পুত্র। অংশুমতী নদীতীর নিবাসীও এক কৃষ্ণ ঋষি।[১০] কিন্তু এঁদের আমরা বাসুদেব কৃষ্ণের পূর্বরূপ বলে গ্রহণ করতে পারি না। মহাভারত পুরাণাদিতে যে কৃষ্ণকে আমরা দেখি তাঁর আদিরূপ সম্ভবতঃ ছান্দোগ্য উপনিষদেই আমরা পাব।[১১] ছান্দোগ্য উপনিষদ প্রাচীনতম উপনিষদগুলোর একটি। এখানে কৃষ্ণের যে পরিচয় তা মহাভারতের কৃষ্ণের সঙ্গে অনেকাংশে তুলনীয়। উভয়েই ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য এবং উভয়েই দেবকীপুত্র। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদের ষোড়শ প্রপাঠকে মানবকুলজাত ইতরার পুত্র মহীদাসের প্রসঙ্গের পরেই রয়েছে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের প্রসঙ্গ। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, এই কৃষ্ণ মনুষ্য সন্তান। বিষ্ণু যেখানে দেবতা, ছান্দোগ্য উপনিষদের কৃষ্ণ সেখানে পৃথিবীরই মানুষ।

ঋগ্বেদ কিংবা তার পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যসমূহে আমরা বাসুদেব নামের উল্লেখ পাই নি। বহু পরবর্তীকালের পরিশিষ্টমূলক কিছু কিছু সাহিত্যে অবশ্য এর উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২] অতএব দেখা যাচ্ছে, আদিতে 'বিষ্ণু', 'নারায়ণ', 'কৃষ্ণ', 'বাসুদেব' প্রভৃতি সত্তাগুলি পরস্পর পৃথক ছিল। কিন্তু কালক্রমে এঁদের সমীভবন ঘটেছে। সমাজশক্তির কোন্ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে এই একীভবন সম্ভব হয়েছিল তা আজ নিশ্চিত করে বলা না গেলেও কালে কালে যে এদের মিশ্রণ ঘটেছে তার চিহ্নসমূহ বিরল নয়।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ১০ম অধ্যায়ে ও মহানারায়ণ উপনিষদের বিষ্ণুগায়ত্রী-মন্ত্রে 'নারায়ণ', 'বাসুদেব' ও 'বিষ্ণু'—এই তিনটি নাম একসঙ্গে পাওয়া যায়। এবং এখানে তিনটি নামই একজন দেবতার। মন্ত্রটি হলো—"ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে, বাসুদেবায় ধীমহি, তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ"। মহাভারতের শান্তিপর্বের নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়েও এই 'নারায়ণ' নামটি পাওয়া যায়। এই পর্বাধ্যায়ের একটি আখ্যান থেকে জানা যায় যে, 'নারায়ণ', 'বাসুদেব' কৃষ্ণেরই ভিন্ন রূপ। সেখানে বৃষ্ণিবীর বাসুদেবকে নারায়ণের 'আদি-প্রকৃতি' ও 'পরম পুরুষ' রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এই অংশে আরও বলা হয়েছে, বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিষ্ণু ও নারায়ণ, বাসুদেব-কৃষ্ণেরই বিভিন্ন রূপ।

বনপর্বে[১৩] ঋষি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে, মহাপ্রলয়ের সময় তিনি এক দেব-শিশুর উদরে সারা ব্রহ্মাণ্ডকে অবস্থিত দেখেন এবং প্রশ্ন করে জানতে পারেন যে, ইনি নারায়ণ (অপাং নারা ইতিপুরা সংজ্ঞাকর্ম কৃতং ময়া। তেন নারায়ণোহস্ম্যুক্তো মম তত্ত্বয়নং সদা॥) এরপর মার্কণ্ডেয় বলেন, যুধিষ্ঠিরের বন্ধু ও আত্মীয় জনার্দনের এটি অন্য রূপ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এখানে বাসুদেব কৃষ্ণ এবং নারায়ণ অভিন্নত্ব লাভ করেছেন। জ্যাকোবি মনে করেন, বৈদিক যুগের শেষে বাসুদেব, নারায়ণ এবং বিষ্ণুর সমকক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু দেবকীপুত্র কৃষ্ণ তখনও সত্য-

অনুসন্ধিৎসু একজন মানুষ। আরও পরবর্তীকালে এই মানুষই বিষ্ণুর সাথে সাম্যলাভ করেছেন।[১৪] আমাদেরও মনে হয় বাসুদেব ও কৃষ্ণ মূলতঃ পরস্পর পৃথক ছিলেন। পরবর্তীকালে ভাবনাগত ঐক্যে তাঁরা এক দেবতায় এবং এইভাবে এক অবতারে রূপান্তরিত হন। এই তিনের সম্মেলনকে কোনও নির্দিষ্ট সাল-তারিখে চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব। বিশাল কাল-পরিধিতে বিবর্তনশীল সংস্কৃতির প্রতিটি স্তর-পরিবর্তনকে ধারণ করে এই একীকরণ সম্ভব হয়েছে। আমাদের অনুমান খ্রীস্টপূর্ব সময়ের বেশ কিছু আগে আরম্ভ হয়ে এটি খ্রীস্টীয় কালের আগেই সমাপ্ত হয়েছিল।

॥ ২ ॥

বেদোত্তর কালের কৃষ্ণকথা ও প্রাসঙ্গিক নানা কথা

এই যুগের কিছু সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনকে অবলম্বন করে আমরা আমাদের বাসুদেব-নারায়ণ-বিষ্ণু-কৃষ্ণের সমীকরণ সংক্রান্ত পূর্ব-অনুমানকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। খ্রীস্টজন্মের অন্ততঃ ৩৭০ বৎসর পূর্বে সংকলিত ঘটজাতকে আমরা কৃষ্ণলীলার বর্ণনা পাই।[১৫] শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার কাল খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী বলে মনে করা হয়। গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুন বাসুদেব-কৃষ্ণকে কল্পনা করার সময় 'বিষ্ণু' সম্বোধন করেছেন।[১৬] গীতার দশম অধ্যায়ে আদিত্যগণের মধ্যে কৃষ্ণ নিজেকেও 'বিষ্ণু' বলে বর্ণনা করেছেন।[১৭] খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের বেসনগর শিলালিপিও বাসুদেব কৃষ্ণের ও বিষ্ণুর অভিন্নতার ইঙ্গিত দেয়। এতে গ্রীকদূত হেলিওডোরাস তাঁর উপাস্য দেবতা বাসুদেবের উদ্দেশ্যে একটি গরুড়ধ্বজ উৎসর্গ করেছেন। এই গরুড় পরবর্তী সাহিত্যে বিষ্ণুর বাহন। সুতরাং বাসুদেব-কৃষ্ণ এবং বিষ্ণুর সংযোগ যে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেই সম্ভব হয়েছিল তা এই প্রমাণ থেকেই বোঝা যায়। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার নানাঘাট স্তম্ভে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লিপি পাওয়া গেছে। এটির কাল খ্রীস্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ কিংবা খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর প্রথমে। এতে সঙ্কর্ষণ ও কৃষ্ণের সঙ্গে ধর্ম, ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের ও বাসবের দোহাই দেওয়া হয়েছে। এই লিপিটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো বৈদিক দেবতাদের সঙ্গে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের উল্লেখ। চিতোরগড়ের নিকটবর্তী নাগরী গ্রামে পাওয়া খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের আর একটি শিলালিপির উদ্ধৃত অংশ দেখে মনে হয় ঐ দেবস্থানে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব পূজার জন্য মন্দির ছিল। এ ছাড়া, ঐ মন্দিরের 'নারায়ণবাট' নামটিও লক্ষণীয়। এটিও বাসুদেবের কৃষ্ণ এবং নারায়ণে সমীকরণের অন্যতম প্রমাণ।

খ্রীস্টপূর্ব কালের মধ্যে বিচিত্র দেবসত্তার সমীকরণে যে কৃষ্ণস্বরূপ ধীরে ধীরে মূর্ত হয়ে উঠছিল পরবর্তীকালের সাহিত্যে তা দ্বিবিধ ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। আগেই উল্লিখিত হয়েছে, মহাভারতের মধ্যে কৃষ্ণের সঙ্গে নারায়ণ, বিষ্ণু প্রভৃতির সমীকরণ সাধিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে বর্ণিত কৃষ্ণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হল—কৃষ্ণ রণপণ্ডিত,

কূটনীতিজ্ঞ, আশ্রিতবৎসল ও পরমতত্ত্বজ্ঞ। কিন্তু অপর রূপটির প্রতি আমরা কিঞ্চিৎ অধিক উৎসাহী। পরবর্তীকালীন সাহিত্যে স্থাপত্যেও কৃষ্ণের এই রূপটির একাধিপত্য। বাংলা সাহিত্যেও কৃষ্ণকথার এই দিকটি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। এটি হল হরিবংশ পুরাণাদিতে বর্ণিত গোপালকৃষ্ণের রূপ। যে রূপে তিনি প্রেমিক, ভক্তসখা ও গোপীজনবল্লভ। পুরাণগুলিতে বিশেষত: বৈষ্ণবপুরাণগুলিতে যেমন ব্রহ্ম, ভাগবত ব্রহ্মবৈবর্ত প্রভৃতি পুরাণে গোপালকৃষ্ণের যে শৈশব ও কৈশোর লীলা বর্ণিত হয়েছে —তার সঙ্গে মহাভারতের কর্মবীর কৃষ্ণের বেশ কিছু অসামঞ্জস্য দেখা যায়। হরিবংশ ইত্যাদিতে গোকুল ও ব্রজধামে অনুষ্ঠিত কৃষ্ণের যেসব বাল্যলীলার বর্ণনা পাওয়া যায় অনেকের মতে তার কোনটাই খ্রীস্টপূর্বকালের গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় না। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রন্থ পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কৃষ্ণের কংসবধ প্রসঙ্গ রয়েছে (অসাধুর্মাতুলে কৃষ্ণঃ, জঘান কংসং কিল বাসুদেবঃ)। কিন্তু এর কোন অংশেই তাঁর গোকুলে নানা পশুরূপধারী অসুর বিনাশের উল্লেখ নেই। অথচ পরবর্তীকালের পুরাণ সমূহে কৃষ্ণ ও তাঁর অগ্রজ বলরামের বৃষরূপী অরিষ্টাসুর, অশ্বরূপী কেশী দৈত্য, পক্ষিরূপধারী বকাসুর ও বৃক্ষরূপী যমলার্জুন প্রভৃতিকে নিধন ও মুক্তিদানের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কিশোর কৃষ্ণের গোপিকারমণ মূর্তির উল্লেখও পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে নেই। তাই জার্মান পণ্ডিত Weber, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে কংসের কারাগারে কৃষ্ণের জন্ম, তাঁর পালক পিতামাতা যশোদা নন্দের প্রসঙ্গ, কংস কর্তৃক দেবকীগর্ভজাত কৃষ্ণের অগ্রজ শিশুদের হত্যা ইত্যাদি ঘটনার সঙ্গে বাইবেলের যীশুখ্রীস্টের বাল্যজীবনের অনেক ঘটনার সাদৃশ্য আছে। এই সমস্ত ঘটনার ওপর নির্ভর করে Weber এক শতাব্দী আগে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে বাসুদেব-কৃষ্ণর বাল্যজীবন খ্রীস্টের জীবনকথার প্রভাবেই গড়ে উঠেছে।[১৮] ভাণ্ডারকর প্রমুখ কোনও কোনও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতও এই মতকে সমর্থন করেছেন।[১৯] ভাণ্ডারকর বলেন বাসুদেব কৃষ্ণের এই গোপাল রূপটি খ্রীস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে ভারতে প্রবেশকারী বৈদেশিক জাতির আনুকূল্যেই গড়ে উঠেছে। খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী প্রাচীন আভীররা ভারতে এসে বাসুদেব-কৃষ্ণপূজকদের সংস্পর্শে আসে। আর খ্রীস্ট এবং কৃষ্ণের নামের মধ্যে মিল থাকার জন্য এবং অন্যান্য নানা কারণে শিশু খ্রীস্টের কাহিনী বালক কৃষ্ণ সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই মত যে নিতান্তই অসার তা হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিত এবং কিছু কিছু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতও প্রমাণ করেছেন। হয়তো এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, খ্রীস্টের এবং কৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যকালীন ঘটনার সাদৃশ্য আছে। দেবগড়ের দশাবতার বিষ্ণু মন্দিরের প্রাচীরে প্রস্তরফলকের ওপর শিশু কৃষ্ণ ও বলরামকে কোলে নিয়ে নন্দ-যশোদার যে মূর্তি আছে— তাদের পোশাক এবং অলঙ্কারে বিদেশী প্রভাবও স্বীকার্য সত্য। কিন্তু এই সাজসজ্জায় বৈদেশিক প্রভাবই কৃষ্ণকথার মূলকে বৈদেশিক প্রমাণিত করে না, যেমন শার্টপ্যান্ট পরা বাঙালীর জনকত্ব বিলিতি হয়ে যায় না। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে এটা কোন নতুন ঘটনাও নয়। কারণ অজন্তায় কিছু কিছু গুহাচিত্রে চীন এবং পারস্যদেশীয় প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়।[২০]

অন্য আর একটি মতে চতুর্থ শতকের পল্লববংশীয় রাজা বিষ্ণুগোপের নামে জন্মপ্রাপ্ত

কাহিনীই কৃষ্ণে আরোপিত হয়েছে। এই শতাব্দীর সাহিত্যও এই সংযোজন কর্মে সহায়তা করেছে। কালিদাসের পূর্ববর্তী খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের কবি ভাসের 'বালচরিত' নাটকে দামোদর-সঙ্কর্ষণ বৃষ্ণিকুমার। এ ছাড়াও এখানে কংস ও বাসুদেবের নাম আছে। এমন কি, বালচরিতে রাসের প্রসঙ্গও রয়েছে।[২১] গুপ্তযুগের কবি কালিদাসের কাব্যেও গোপবেশী বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায়।[২২] অনেকের ধারণা হরিবংশাদি পুরাণে এই গোপবেশধারী বিষ্ণুরই পল্লবিত লীলা সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের সংযোজন-বাদে আস্থা স্থাপন ভ্রান্তিকরই হবে বলে মনে করি। কারণ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে আদিত্য বিষ্ণুর 'গোপা', 'যুবা', 'অকুমার' প্রভৃতি বিশেষণের মধ্যেই এর বীজ নিহিত।

শুধু গোপালকৃষ্ণই নয়—পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি দেখিয়েছেন খ্রীস্টজন্মের বহু শতাব্দী আগেই কতকগুলি জ্যোতিষতত্ত্ব কবিকল্পনার আশ্রয়ে রূপকধর্মী হয়ে পরবর্তীকালের সত্যরূপ ধারণ করেছে। তাঁর মতে কৃষ্ণ হলেন সূর্য, আর গোপী তারকা।[২৩] তাঁর মতে কৃষ্ণের বাল্যলীলাও জ্যোতিষতত্ত্বের রূপক রূপ। যেমন, যমলার্জুন ভঙ্গ, শকটভঙ্গ, কালিয়দমন প্রভৃতি। তাঁর মতে কালিয়দমনের মূলও ঋগ্বেদে আছে। "সেখানে ইন্দ্র বৃত্র নামক অহিকে বধ করেন।"[২৪] তাঁর সিদ্ধান্ত হলো—"কৃষ্ণের এইরূপ লীলা আকাশের সূর্য-লীলার প্রতিবিম্ব বলার এমন তাৎপর্য নয় যে, মহাভারতের দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ ছিলেন না, তিনি মনঃকল্পিত। তাঁর বাল্য ও কৈশোরকাল জানা ছিল না, তাঁহার সময়ে বর্তমান মহাভারত বা পুরাণ রচিত হয় নাই। বহুকাল পরে যখন প্রণীত হইল, তখন তিনি বিষ্ণুর অংশাবতার। ভানুচরিত্র তাঁহাতে আরোপ করিয়া ভক্তেরা নভোমণ্ডলে তাহারই লীলা দেখিতে লাগিলেন"[২৪] তা হলে যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে, গোপালকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা পরবর্তীকালীন বা বহিরাগত না হলেও জ্যোতিষতত্ত্বেরই রূপকমাত্র। কিন্তু এ ব্যাপারে বলা যায় যে, বৃষ্ণি-বংশীয় বাসুদেব কৃষ্ণের জীবনেই বৃন্দাবনলীলার কিছু ঘটনা ঘটেছিল। তারই সাথে পরবর্তীকালে ঋগ্বেদের গোপ-গোলোকের ধারণা এবং জ্যোতিষতত্ত্ব মিশ্রিত হলো। অনেকের ধারণা খ্রীস্টপূর্বকালে বৃন্দাবনলীলার কোনো উল্লেখ কোথাও নেই। তাঁদের মতে মহাভারতে শিশুপাল কর্তৃক কৃষ্ণ-দূষণ প্রক্ষিপ্ত অংশ মাত্র। কিন্তু এ ব্যাপারে ড. বিমানবিহারী মজুমদার জানিয়েছেন, পুণা-প্রাচ্য-গবেষণা-কেন্দ্রের প্রামাণ্য মহাভারত সংস্করণে এই অংশটি বাদ দেওয়া হয় নি এবং নির্ভরযোগ্য কোন পুঁথিতেই এ অংশ বাদ পড়ে নি।[২৫] সুতরাং শিশুপালের উল্লিখিত পুতনা বধ, যমলার্জুন ভঙ্গ, গোবর্ধন ধারণ প্রভৃতি বাসুদেব কৃষ্ণেরই বাল্যলীলার অংশ বলে ধরে নিতে হয়। মহাভারতের গোপীপ্রসঙ্গও[২৬] ভাণ্ডারকরের মতে প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু পুণা সংস্করণেই আছে সুভদ্রা যখন বিয়ের পরে প্রথম স্বামিগৃহে যাচ্ছেন তখন তাঁকে গোপালিকা বেশে সাজানো হয়েছে। গোপীদের বেশভূষা কৃষ্ণের ভালো লেগেছিল বলেই এরূপ বেশ সুভদ্রাকেও পরানো হয়েছে।[২৭] অতএব ব্রজলীলার প্রসঙ্গকেও নিতান্ত অর্বাচীন কিংবা প্রক্ষেপ বা প্রভাবজাত বলে আমরা মানতে পারছি না। বরং বৈদিক কালেই এর উদ্ভব ও খ্রীস্টপূর্বকালেই এর বিকাশ ঘটেছে—এ কথা বিশ্বাস করার মতো তথ্য আমরা পাচ্ছি।

এছাড়া, খ্রীস্টজন্মের বহু আগে থেকেই কৃষ্ণ যে জনমনকে অধিকার করতে আরম্ভ করেছিলেন তার প্রমাণও আমরা পেয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী থেকে 'বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্'[২৮] সূত্রটি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, পাণিনির কালেই বাসুদেবের উপাসক ও অর্জুনের উপাসক দুটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। একালেই কৃষ্ণার্জুনের দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। পতঞ্জলিও তাঁর ভাষ্যে পাণিনির এই পৃথক্ সূত্র ব্যবহার সম্পর্কে বলেছেন—কৃষ্ণার্জুন মহাভারতের ক্ষত্রিয়বীর শুধু নন, দুজন দেবতা (অথবা নৈষা ক্ষত্রিয়াখ্যা। সংজ্ঞৈষা তত্রভবতঃ)। গ্রীয়ারসন, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি পণ্ডিতেরাও এই পাতঞ্জল ভাষ্য থেকেই মনে করেন যে, পাণিনির এই সূত্রের মধ্যেই মহাভারতের কৃষ্ণ ও অর্জুনের দেবত্বপ্রাপ্তির ইতিহাস নিহিত আছে। এই সূত্রে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে স্বল্পসংখ্যক স্বরবিশিষ্ট 'অর্জুনে'র পরিবর্তে অধিকতর সম্মানার্হ 'বাসুদেব' শব্দটি আগে বসেছে। এতেই বোঝা যায় বাসুদেবই অধিকতর সম্মানার্হ এবং তাঁর ভক্তরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অধিকতর সম্ভ্রান্ত ছিলেন। পতঞ্জলি পাণিনির আর একটি সূত্রের[২৯] ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কংসভক্ত ও বাসুদেবভক্তের কথা বলেছেন। পাণিনির অন্য একটি সূত্রের[৩০] ব্যাখ্যার সময়ও পতঞ্জলি 'বাসুদেব বর্গ্যঃ' ও 'বাসুদেববর্গীণঃ' এই দুটি পদের উল্লেখ করেছেন। এই পদগুলি বাসুদেব-কৃষ্ণ ভক্তের নামান্তর। পতঞ্জলির দু'শতাব্দী আগে যে সমস্ত গ্রীকরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন তাঁদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে বাসুদেবপূজারী গোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কুইন্টাস কার্টিয়াস খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক হলেও তাঁর গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্যাদি আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক গ্রন্থ থেকে নেওয়া—সুতরাং প্রামাণ্য। তিনি লিখেছেন যে, আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে পুরুর যুদ্ধের সময় পুরুর সৈন্যেরা সামনে হেরাক্লিসের মূর্তি নিয়ে বিতস্তা তীরের যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিল।[৩১] জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, এই হেরাক্লিসই বাসুদেব কৃষ্ণ। কারণ "পৌরব সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগে ইঁহার অবস্থান, এবং ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা যে অত্যন্ত অন্যায় এই বিশ্বাস আমাদিগকে শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বর্ণিত প্রথমতঃ যুদ্ধে অনিচ্ছুক অর্জুনকে উৎসাহপ্রদানকারী পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে পুরু নিজে এবং তাঁহার সৈন্যদলের এক বিশিষ্ট অংশ বাসুদেব কৃষ্ণোপাসক ছিলেন।"[৩২] মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা গ্রন্থের কিছু অংশ অ্যারিয়ান নামক এক গ্রীক লেখকের রচনায় উদ্ধৃত আছে। সেখানেও মেগাস্থিনিস বলেছেন 'সৌরসেনয়' জাতির লোকেরা 'হেরাক্লিস' দেবতাকে বিশেষ সম্মান করত। এরা 'মেথোরা' ও 'ক্লিসোবারা' নামক দুটি নগরে বাস করত আর এদের দেশের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হত 'জোবারিস' নদী। ভাণ্ডারকর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মনে করেন যে 'সৌরসেনয়' এবং 'হেরাক্লিস' বলতে 'সাত্বত' এবং বাসুদেব কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছে। এই দুটি নগরী ও নদীর নামও যথাক্রমে মথুরা, কৃষ্ণপুর ও যমুনা। কৃষ্ণপুর নগরটি কারও কারও মতে গোকুল, যা কৃষ্ণের ব্রজলীলারই আশ্রয়স্থলী।

॥ ৩ ॥

প্রাচীন লিপিলেখনে ও ভাস্কর্যে কৃষ্ণকথা

কৃষ্ণকথা বিষয়ে কতগুলি মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের কথাও উল্লিখিত হতে পারে। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেই কৃষ্ণ-বলরামের মন্দির নির্মিত হতো—তা পতঞ্জলির মহাভাষ্য থেকেই জানা যায়। পাণিনির একটি সূত্র[৩৩] ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ধনপতি, রাম (বলরাম) এবং কেশবের (কৃষ্ণের) প্রাসাদে ভক্ত সংসদে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, তূণবাদি বাদ্য ব্যবহারের কথা লিখেছেন।[৩৪] মথুরা ও তার নিকটবর্তী স্থানে পাওয়া খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের কয়েকটি নিদর্শনে সেই সময়ের বাসুদেবকৃষ্ণ সম্পর্কিত বহু তথ্য পাওয়া যায়। এদের মধ্যে একটিতে আছে শকক্ষত্রপ রজুবুলের পুত্র মহাক্ষত্রপ ষোডাশের রাজত্বকালে মথুরায় ভগবান বাসুদেবের মন্দিরে একটি প্রস্তর নির্মিত তোরণ ও বেদিকা নির্মিত হয়। ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ লেখা থেকে এই পাঠোদ্ধার করেছেন রমাপ্রসাদ চন্দ এবং লুডারস্।[৩৫] মথুরার নিকটবর্তী মোরা গ্রামে পাওয়া একটি অর্ধভগ্ন শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মহাক্ষত্রপ ষোডাশের শাসনকালে তোষা নাম্নী একটি প্রস্তর নির্মিত মন্দিরে বৃষ্ণিবংশের ভগবান্ পঞ্চবীরের পাঁচটি মূর্তি স্থাপন করেন। এই পঞ্চদেবতার যথার্থ পরিচয় জানা যায় সুপ্রাচীন ও প্রামাণ্য বায়ুপুরাণ থেকে। এর একটি শ্লোকে সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব ও অনিরুদ্ধকে 'বংশবীর' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৩৬] বায়ুপুরাণের এই শ্লোকটি থেকেই আমাদের ধারণা জন্মায় যে, মোরা শিলালেখর এই বৃষ্ণিবংশীয় ভগবান পঞ্চবীর পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ নন। অবশ্য বায়ুপুরাণে এঁদের মধ্যে সম্পর্কের কোনও উল্লেখ নেই। মৎস্য পুরাণেই রয়েছে কৃষ্ণের পত্নী রুক্মিণী ছিলেন প্রদ্যুম্নের মাতা। প্রদ্যুম্নের পুত্র আবার অনিরুদ্ধ এবং অনিরুদ্ধের পুত্র হলো সাম্ব।[৩৭] লক্ষণীয় এই যে, বায়ুপুরাণে এঁরা শুধু দেবতা নন "মনুষ্যপ্রকৃতি দেবান্"।

বায়ুপুরাণ থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, বাসুদেব-কৃষ্ণপুজা প্রথমে ছিল বীরপুজা। সুতরাং এইখানেই আমরা কৃষ্ণবাসুদেবের তার একটি ধাপ উত্তরণ লক্ষ্য করলাম। হরিবংশ পুরাণ, নায়ধম্মকহাও, উবসগদশাও, ত্রিষষ্ঠিশলাকা, পুরুষচরিত্র প্রভৃতি জৈনগ্রন্থ গুলিতেও 'বলদেব পমোখখা পঞ্চমহাবীরাঃ' পদটি পাওয়া যায়। স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকলেও এঁরা যে পূর্বোক্ত পঞ্চমহাবীর তা সুনিশ্চিত।

এ পর্যন্ত আলোচনায় খ্রীস্টপূর্ব কালে এবং খ্রীস্টীয় কাল আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময়েও যে বাসুদেবকৃষ্ণ দেবতারূপে পরিগণিত হতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তার পরবর্তীকালীন নানা নিদর্শনেও বিষ্ণু-কৃষ্ণের নানা লীলাকথার আভাস পাওয়া যায়।

চতুর্থ শতাব্দীর বলে অনুমিত তুষাম শিলালিপিতে সর্বপ্রথম কৃষ্ণের পত্নীপ্রসঙ্গ আমরা পাচ্ছি। আশ্চর্যের কথা এই, পুরাণসমূহে যে রুক্মিণী ও সত্যভামাকে কৃষ্ণের প্রিয়তমা পত্নী বলা হয়েছে—তাদের উল্লেখ এখানে নেই। আছে জাম্ববতীর উল্লেখ। বিষ্ণুকে বর্ণনা করা হয়েছে জাম্ববতীর মুখপদ্মে অবস্থিত শক্তিশালী মধুকররূপে।[৩৮]

এই প্রসঙ্গে আমাদের যেটি স্মর্তব্য বিষয় তা হলো জাম্ববতী অনার্যদুহিতা। কৃষ্ণকথার বিকাশে এটিও এক তাৎপর্যময় ইঙ্গিত।

গুপ্তযুগে বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন কৃষ্ণবাসুদেবের উপাসনা ব্যাপকভাবেই প্রচলিত হয়েছিল। কারণ নানা শিলালেখ ও মুদ্রা থেকে দেখা যায় গুপ্ত সম্রাটরা ভাগবত বা পরমভাগবত বলে অভিহিত হয়েছেন। অনেক পণ্ডিতের মতে গুপ্তযুগ ও তার পরবর্তীযুগে পাঞ্চরাত্র-ব্যূহবাদের পঞ্চদেবতা পূজার পরিবর্তে অবতারবাদ ও অবতার পূজা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয় এবং এঁরা আরও বলেন, এই অবতার পূজার প্রসারই ভাগবতধর্মের বৈষ্ণবধর্মে রূপান্তরিত হওয়ার অন্যতম একটি বিশিষ্ট কারণ।[৩৯] কিন্তু এই মত সর্ববাদিসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য হয় নি। এবং আমাদের বর্তমান আলোচ্য কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে সে তর্ক অবান্তর বিবেচনায় প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক।

গুপ্তযুগেই স্কন্দগুপ্তের 'ভিতারী' প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপিতে কংসবধের পর কৃষ্ণ এবং কংসের কারাগারে বন্দী মাতা দেবকীর মর্মস্পর্শী মিলনদৃশ্যের প্রসঙ্গ রয়েছে।[৪০] আসামের রাজার তিনটি শিলালিপিতে কৃষ্ণের অসাধারণ কর্মসমূহের উল্লেখ রয়েছে। ভাস্করবর্মণের নিধনপুর লিপিতে কৃষ্ণের সমসাময়িক নরকাসুর ও ভগদত্তের উল্লেখ আছে। ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্তের বংশধরেরা তিন হাজার বছর ধরে কামরূপে রাজত্ব করেন। তারপর ওই বংশেরই পুণ্য বর্মণ নামে একজন রাজা হন এবং হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ভাস্করবর্মণ ছিলেন তাঁরই দ্বাদশ পুরুষ পরবর্তী বংশধর। ভাস্করবর্মণের 'দুবী' লিপিতে (ক্ষোদিত ধাতুফলক) সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মণ ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাস্করবর্মণের বীরত্বকে বলরাম এবং অচ্যুতের বীরত্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এবং এই প্রসঙ্গে দৈত্যরাজ বাণের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁদের জয়লাভের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।[৪১] এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখার মতো। আসামের রাজধানী তেজপুরকে বাণের রাজধানী শোণিতপুরের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। বিষ্ণুপুরাণে এই বাণের কন্যা ঊষা ও কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের প্রেমকাহিনী রয়েছে।[৪২] এটিও মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের বিষয়ীভূত হয়েছে।

নবম শতাব্দীর বনমালবর্মদেবের পর্বতীয় লিপিতে বর্ণিত হয়েছে কৃষ্ণের দ্বারা নরকাসুর নিহত হয়েছিল। নরকাসুরের পত্নীর ক্রন্দনে কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত বিচলিত হয়ে তার দুই পুত্র ভগদত্ত ও বজ্রদত্তকে বিনা শাস্তিতেই মুক্তি দিয়েছিলেন। এই লিপিতে পৌরাণিক বিবরণের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করার মতো বিষয়। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, হরিবংশে আছে কৃষ্ণ নরকের পুত্রকে মুক্তি দিয়েছিলেন নরকাসুরের জননীর অনুরোধে। রাজপুতনার যে অংশ মথুরার সীমান্তে সেখানে কৃষ্ণের অনেক মূর্তি ও কৃষ্ণপ্রসঙ্গের বহু শিলালিপি প্যাওয়া গেছে। আগেকার উদয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী মান্দোরে প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার প্রাচীনতম শিলালেখ-প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এটি অষ্টম কিংবা নবম শতাব্দীর, রাধাকৃষ্ণের প্রেমপ্রসঙ্গে পরবর্তী শিলালেখ তিনটি বাক্‌পতি মুঞ্জের। এই তিনটির কাল হলো ৯৭৪, ৯৮২ এবং ৯৮৬ খ্রীস্টাব্দ। একটি শ্লোকে রাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যঞ্জনাও রয়েছে।[৪৩]

দ্বাদশ শতাব্দীর আজমীর শিলালিপিতে কৃষ্ণ অষ্টম অবতার রূপে বর্ণিত। কিন্তু গীতগোবিন্দকার জয়দেব ঐ একই সময়ের লোক হয়েও হলধর বা বলদেবকে অষ্টম

অবতার রূপে বর্ণনা করেছেন। জয়দেবের কাব্যে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। দেখা যাচ্ছে, বাংলা দেশের কৃষ্ণকথা দ্বাদশ শতাব্দীতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দিকে একধাপ অগ্রসর হয়েছিল।

ভোজবর্মণের 'বেলাভ' লিপিতে কৃষ্ণকে অংশকৃতাবতার বলা হয়েছে। এই তাম্রলিপিতে একই সঙ্গে তাঁকে 'মহাভারতসূত্রধার' এবং 'গোপীশত কেলিকার' বলা হয়েছে। এই লিপিতে কৃষ্ণকে বলা হয়েছে চন্দ্রবংশোদ্ভূত। ডক্টর ডি. সি. সরকার একটি চিত্তাকর্ষক তথ্য আবিষ্কার করেছেন। ১১৯৯ খ্রীস্টাব্দে ক্ষোদিত ও অন্ধ্রপ্রদেশে প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে মন্দ্রকূটের ভগবান গোপীজন বল্লভের উল্লেখ আছে।[৪৪]

বাসুদেব-বিষ্ণুর অবতারমূর্তির নিদর্শনও প্রাচীনকাল থেকেই পাওয়া যায়। উদয়গিরি-গুহাগাত্রে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতক সময়ের বরাহ-অবতার মূর্তি দেখা যায়। খ্রীস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে মধ্যভারতের দেবগড়ে দশাবতার মন্দির নির্মিত হয়। গুপ্তরাজাদের কালে নির্মিত এলাহবাদের কিছু দূরে পাওয়া গাড়ওয়া গ্রামে বিষ্ণুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি অবতারের মূর্তি পাওয়া গেছে। নরসিংহ, ত্রিবিক্রম-বামন, কুঠারহস্ত পরশুরাম, ধনুর্ধারী রামচন্দ্র ও হলধর বলরাম এই অবতার-মূর্তির মধ্যে রয়েছেন। কখনও কখনও বলরামের পরিবর্তে কৃষ্ণকেই অবতার হিসেবে দেখানো হয়েছে। মথুরার চিত্রশালায় সংরক্ষিত খ্রীস্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতকের একটি অর্ধভগ্ন প্রস্তরফলকে কৃষ্ণের জন্মঘটনা ক্ষোদিত রয়েছে। এ ছাড়াও কৃষ্ণ বলরামের বহু বাল্যলীলার ঘটনা গুপ্তযুগ এবং তার পরবর্তী যুগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু বিষ্ণু মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ হয়েছে।

॥ ৪ ॥

কৃষ্ণকথায় দাক্ষিণাত্য

কেবলমাত্র উত্তর ভারতেই নয়, দক্ষিণ ভারতেও নিতান্ত প্রাচীনকাল থেকেই কৃষ্ণ-বিষ্ণু কেন্দ্রিক ভাগবতধর্ম বিস্তৃত হয়েছিল। অবশ্য খ্রীস্টপূর্ব যুগে দক্ষিণ ভারতে এই ধর্মের প্রসার ছিল কিনা জানা যায় না। সাতবাহন রাজা গৌতমীপুত্র শ্রীযজ্ঞ সাতকর্ণির একটি শিলালেখ থেকে আমরা অন্ধ্রদেশে ভাগবতধর্মের অস্তিত্বের কথা জানতে পারি। এটি পাওয়া গিয়েছিল কৃষ্ণা জেলার চিন গ্রামে। খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে এবং তার আরও পরবর্তীকালের তামিল সাহিত্য, শিলালেখ, মন্দির প্রভৃতি থেকে দক্ষিণ ভারতে ধর্মকথারূপে কৃষ্ণকথা-বিস্তৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। শিলপ্পদিকারম্ ও অন্যান্য তামিল কবিতা থেকে আমরা জানতে পারি মদুরা, কাবিরিপদ্দিনম্ ও অন্যান্য দক্ষিণ ভারতীয় নগরে কৃষ্ণবলরামের প্রাচীন মন্দির ছিল। কাবিরিপদ্দিনমের কবি কবিকন্নম্ তাঁদের দেশের দুজন রাজাকে ভগবান কৃষ্ণ-বলরামের অবতার বলে বর্ণনা করেছেন। দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের কিছু কিছু প্রমাণ থেকে অনুমান করা যায় দক্ষিণ-ভারতে খ্রীস্টপূর্ব যুগেই বাসুদেব কৃষ্ণের পূজা প্রচলিত ছিল। দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্য জাতি সম্পর্কে মেগাস্থিনিস বলেছেন, এরা ভারতীয় হেরাক্লিস অর্থাৎ বাসুদেবের দুহিতৃবংশজাত ছিল। আর পাণ্ড্যদের প্রধান নগরী

মদুরার নাম মথুরা থেকে নেওয়া এবং এই মথুরাই ছিল সাত্বতদের বাসভূমি। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে দেখি কাঞ্চীদেশের পল্লববংশীয় রাজা হলেন বিষ্ণুগোপ। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চালুক্যরাজ মঙ্গলেশ তাঁর শিলালিপিতে পরম-ভাগবত বলে বর্ণিত হয়েছেন। সমসাময়িক কালের বাদামি ইত্যাদি চালুক্যদেশীয় মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত বৈকুণ্ঠ বা বিষ্ণু চতুমূর্তি, কৃষ্ণলীলাবিষয়ক নানা প্রস্তরচিত্র আর সপ্তম শতকের মহাবলীপুরে অবস্থিত মন্দিরগুলির নানা বিষ্ণুমূর্তির দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায় সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণকথার ব্যাপক প্রসার হয়েছিল এবং বাসুদেব-কৃষ্ণ-বিষ্ণু উপাস্য দেবতা হিসাবেও যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

এই সমস্ত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিদর্শন ছাড়াও দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবধর্মের প্রাচীনত্বের প্রমাণ আমরা সাহিত্য থেকেও পাই। শ্রেডার প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে 'ঈশ্বর', 'উপেন্দ্র', 'বৃহদ্‌ব্রহ্ম' প্রভৃতি কিছু কিছু পাঞ্চরাত্র গ্রন্থ দ্রাবিড় দেশেই রচিত হয়েছিল। অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত 'শ্রীমদ্ভাগবতম্' গ্রন্থটি শুধুমাত্র ভারত-ইতিহাসের আদিমধ্য-যুগেই নয়—তার পরবর্তীকালেও বৈষ্ণব ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এর রচনাকাল অনেক পণ্ডিতের মতে খ্রীস্টীয় দশম শতক কিংবা তার আরও কিছু আগে। খ্রীস্টপূর্বকালে রচিত বলে অনুমিত শ্রীমদ্ভগবদগীতার ধীর ও প্রশান্ত কৃষ্ণভক্তি অবশ্য এখানে অনুপস্থিত। ভাগবতের কৃষ্ণভক্তি ভাবোন্মাদনার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ভগবদগীতা থেকে ভাগবতের এই কয়েক শতাব্দী মধ্যবর্তী সময়ে কৃষ্ণভক্তির এই রূপান্তর সম্ভব হয়েছিল প্রাকৃত জীবনের সংস্পর্শে এসে। প্রত্যক্ষভাবে ভাগবতের এই ভক্তিধর্মের পূর্বরূপ আমরা দেখতে পাই দক্ষিণ ভারতেই। প্রমাণ হিসাবে ভাণ্ডারকর প্রমুখ পণ্ডিতেরা ভাগবতের কয়েকটি শ্লোক সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ পরায়ণাঃ ॥
ক্বচিৎক্বচিম্মহারাজ দ্রবীড়েষু চ ভূরিশঃ
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী ॥

কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বরঃ
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেহমলাশয়াঃ ॥[৪৫]

এই শ্লোকগুলির মাধ্যমে পুরাণকার দক্ষিণ ভারতীয় এক বিশিষ্ট ভক্তগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করেছেন বলে পূর্বোক্ত পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। এবং এই ভক্তগোষ্ঠীর নাম আড়বার বা আলবার বা আলোয়ার। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকেই এই ভক্তদের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৬] তামিল ভাষায় এঁদের চার হাজার পদের সংকলন রয়েছে—যার নাম 'নালায়ির দিব্যপ্রবন্ধম্'। বারোজন সাধক কবির পদ এখানে সংকলিত। এই কবিরা হলেন পোয়গৈ, ভূত্তার, পেয় আলোয়ার, তিরুমলিসৈ, নর্ম, মথুর কবি, কুলশেখর, পিরিয়, অণ্ডাল, তোণ্ডর দিপ্পোদি, তিরুপ্পান ও তিরুমঙ্গৈ। পণ্ডিতদের মতে ব্রজলীলা কেন্দ্রিক কৃষ্ণগোপী-কথার প্রথম ভক্ত এঁরাই।[৪৭] এই কবিদের মধ্যে মহিলা-কবি অণ্ডাল কৃষ্ণকে ভজনা করেছেন প্রেমিকরূপে। এঁর রচিত কাব্য 'তিরুপ্পাবৈ (শ্রীব্রত)' নামক গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সাথে ভাগবতের কাত্যায়নী ব্রতের[৪৮] অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।

সুতরাং ভক্তিধর্মের বৈশিষ্ট্যে এঁরা ভাগবতের পূর্বসূরী। এঁদের প্রগাঢ় ঈশ্বরানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে নানা নৃত্যে ও গানে। বিষ্ণু, নারায়ণ, কৃষ্ণরূপী ঈশ্বরের সঙ্গে পুত্র, পিতা, স্বামী প্রভৃতি বিভিন্ন মধুর সম্পর্ক কল্পনা করে তাঁদের আন্তরিক ঈশ্বর-ভক্তিকে তাঁরা প্রকাশ করতেন। ভগবান শ্রীচৈতন্য-প্রভাবিত গৌড়ীয় কৃষ্ণকথার বৈশিষ্ট্য বহু শতাব্দী পূর্ববর্তী এই আড়বারদের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

॥ ৫ ॥

পৌরাণিক কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গ

এখন মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত প্রভৃতি প্রধান প্রধান কৃষ্ণকথার আকর গ্রন্থগুলির তুলনামূলক সমীক্ষা প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে কৃষ্ণের ভগবৎসত্তা, বিকাশের কোন্ ধারাপথ অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে উপস্থিত হয়েছে। মহাভারত এবং ভাগবতে দুটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষ্ণের জীবনকে দেখা হয়েছে। মহাভারতে তিনি মূলতঃ পাণ্ডবদের হিতৈষী রাজনীতিবিদ। তাই তাঁর জীবনের যে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুরু-পাণ্ডবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়—তা মহাভারতে নেই। কেবলমাত্র প্রসঙ্গক্রমে কখনও তাঁর বাল্যলীলা ও দ্বারকালীলার-উল্লেখ কিছু কিছু লোকের মন্তব্য থেকে জানা যায়।

মহাভারতে রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণ বলেছিলেন, তিনি যখন নরকাসুরের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রাগজ্যোতিষপুরে চলে গিয়েছিলেন—তখন শিশুপাল দ্বারকায় আগুন লাগিয়ে দেয়।[৪৯] কিন্তু শিশুপাল বধের ভূমিকা হিসেবে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কোনও বিবরণ হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ অথবা ভাগবতে পাওয়া যায় না। কারণ এটি পাণ্ডব হিতৈষী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই সমস্ত বৈষ্ণব পুরাণ গুলিতে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় নি। আবার অন্যদিকে স্যমন্তক মণির জন্য কৃতবর্মা ও অক্রূর কর্তৃক সত্রাজিতের হত্যা ঘটনাটির উল্লেখমাত্র মহাভারতে আছে। অথচ হরিবংশ,[৫০] বিষ্ণুপুরাণ,[৫১] ব্রহ্মপুরাণ এবং ভাগবতে[৫২] এর বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৯০টি অধ্যায়ের মধ্যে ৪০টি অধ্যায়ে বৃন্দাবন এবং গোকুলে কৃষ্ণের বাল্যজীবনের বর্ণনা রয়েছে। ৩৯৪৬টি শ্লোকের মধ্যে উপরোক্ত বিষয়ক শ্লোকের সংখ্যা হলো—১৬০৪টি। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনাবলীকে এখানে উপেক্ষা করা হয়েছে। মাত্র তিনটি ঘটনার উল্লেখ আছে। ভীষ্মের মৃত্যু, ভীম ও দুর্যোধনের দ্বন্দ্বযুদ্ধে বলরামের ভূমিকা এবং অশ্বত্থামার শাস্তি।

ভীষ্মের মৃত্যুপ্রসঙ্গ ভাগবতে বেশ নাটকীয়ভাবেই বর্ণিত হয়েছে। অনুশাসন পর্বে আমরা ভীষ্মকে দেখি বহু বীরের মৃত্যুতে তিনি অনুতাপ করেছেন। একদা দুর্যোধন তাঁর উপদেশ অমান্য করেছিল, এজন্য তিনি দুর্যোধনকে দোষ দিচ্ছেন। কৃষ্ণকে তিনি বলছেন 'দেবদেব' এবং নিজের নরদেহ ত্যাগ করার জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। আর ভাগবতে দেখানো হয়েছে, সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে ভীষ্ম উদাসীন। যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে তিনি বলেন—কৃষ্ণের উদ্দেশ্য বোঝার সাধ্য কারও নেই, সুতরাং সমস্ত ঘটনাবলী ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন মনে করাই ভালো।[৫৩] ভীষ্ম তাঁর উক্তিতে

কৃষ্ণকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মা ও সমদর্শী বলে অভিহিত করেছেন। গোপীরা একদিন কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভ করেছিল—এ কথাও তিনি বলেন।[৫৪] কিন্তু মহাভারতে ভীষ্মের মুখে গোপী প্রসঙ্গ নেই। অন্তত এই একটি ঘটনাই পৌরাণিক কৃষ্ণকথার বিভিন্ন স্তরে একটি আপেক্ষিক পরিবর্তনের চমৎকার দৃষ্টান্ত বহন করে। মহাভারতের কৃষ্ণ, নারায়ণ ও বিষ্ণুর সাথে অভিন্ন হলেও তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নিয়ন্তা ঐশ্বর্যময় পুরুষ। আর অন্যদিকে ভাগবতের কৃষ্ণ ভক্তবৎসল ভগবান, প্রেমের দেবতা।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বলরামের ভূমিকা সম্পর্কে এই দুটি গ্রন্থের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যও লক্ষণীয়। মহাভারতে আছে যখন কৌরব ও পাণ্ডবেরা সৈন্যসংগ্রহ করছিল—তখন বলরাম কৃষ্ণকে কৌরবপক্ষে যোগ দিতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর অনুরোধ রক্ষা না করায় বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে কয়েকজন যাদবকে সঙ্গী করে সরস্বতী তীর্থে বেরিয়েছিলেন। ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের সময় তীর্থ প্রত্যাগত বলরাম দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ভীম নাভির নীচে আঘাত করে দুর্যোধনকে পরাজিত করেন। কিন্তু নাভির নীচে আঘাত করা অন্যায় বলে বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে লাঙ্গল নিয়ে ভীমকে তাড়া করলে কৃষ্ণ তাঁকে নিবৃত্ত করে বোঝান যে, নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য ভীম যা করেছেন তা অন্যায় নয়। উপরন্তু পাণ্ডবেরা তাঁদের পিতৃস্বসার পুত্র, সুতরাং তাঁদের সমৃদ্ধি মানেই যাদবদের সমৃদ্ধি। কিন্তু বলরাম এই সমস্ত কূট যুক্তিতে আদৌ ভুললেন না। তিনি শান্তভাবে ঘোষণা করলেন, অন্যায় পন্থা অবলম্বন করার জন্য ভীম চিরকাল নিন্দিত হবে আর সৎ দুর্যোধন ন্যায় যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শাশ্বত-লোক প্রাপ্ত হবেন।[৫৫]

কিন্তু পাণ্ডব ও কৌরবকে নিয়ে কৃষ্ণ-বলরামের মতবিরোধ সম্পর্কে ভাগবত সম্পূর্ণ নীরব। ভাগবতে শুধু বলা হয়েছে, যুদ্ধে বলদেব নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছিলেন।[৫৬] ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের সময় উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁদের যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের শত্রুতার কথাই মনে রেখে বলরামের পরামর্শে কর্ণপাত করলেন না। বলরাম হতাশ হয়ে বলেছিলেন, প্রাক্তনের ফল রোধ করার ক্ষমতা কারও নেই এবং তারপর তিনি দ্বারকায় ফিরে যান। এখানে কৃষ্ণের অন্যায় যুদ্ধ সমর্থনের ব্যাপারে ভাগবত সম্পূর্ণ নীরব।

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে গোপনে হত্যার জন্য অশ্বত্থামার শাস্তির ঘটনাও মহাভারত এবং ভাগবতে ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

মহাভারতে বলা হয়েছে অশ্বত্থামার হাতে পঞ্চপুত্রের নিধনসংবাদ পেয়ে দ্রৌপদীর অনুরোধে ভীম অশ্বত্থামাকে অনুসন্ধান করে তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হন। কৃষ্ণ এবং অর্জুন ভীমকে অনুসরণ করে তাঁকে নিবৃত্ত করেন। অশ্বত্থামা তখন সমগ্র পাণ্ডবদের ধ্বংসের জন্য ব্রহ্মশিরা অস্ত্র নিক্ষেপ করলে কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুনও সেই একই ব্রহ্মশিরা অস্ত্র অশ্বত্থামার প্রতি নিক্ষেপ করেন। এই অস্ত্র যেখানে পড়বে সেখানে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হবে। তাই ব্যাসদেব ও নারদ—এঁদের দুজনকেই অস্ত্র সংবরণ করতে অনুরোধ করলে অর্জুন অস্ত্র সংবরণ করে নেন। কিন্তু অশ্বত্থামার সে কৌশল জানা না থাকার জন্য ব্যাসদেব অশ্বত্থামাকে উত্তরার গর্ভস্থ পুত্রের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করার

নির্দেশ দেন। পরিবর্তে তাঁর মস্তকের স্যমন্তক মণিটি নিয়ে নেওয়া হয়। কৃষ্ণ উত্তরার গর্ভস্থ পুত্রকে আবার বাঁচিয়ে তোলেন।[৫৭]

কিন্তু ভাগবতে এই দ্রৌপদীই ক্ষমাশীলা। এখানে দেখি অর্জুন অশ্বত্থামার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে পিঞ্জরাবদ্ধ জন্তুর মতো ধরে নিয়ে এলে পুত্রহত্যাকারীর এই দুরবস্থায় ব্যথিতা দ্রৌপদী তাঁকে মুক্ত করে দিতে বলেন। ভীম অবশ্য ঘৃণার সঙ্গে বলেন দুষ্টব্যক্তির মৃত্যু অবশ্য প্রাপ্য। এর উত্তরে কৃষ্ণ বলেন, একজন ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণকেও হত্যা করা উচিত নয়। অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণ। আবার অন্যদিকে একজন হত্যাকারীর শাস্তি হল মৃত্যু, ধর্মশাস্ত্রসমূহে তিনি সেই উপদেশই দিয়েছেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাঁর উভয় নির্দেশই পালন করতে হবে।[৫৮] তাঁর কথার অন্তর্নিহিত নির্দেশ হল তরবারির দ্বারা অশ্বত্থামার মস্তকস্থ মণি ছেদন করা। কৃষ্ণের এই উক্তিটিই মহাভারতের কৃষ্ণ ও ভাগবতের কৃষ্ণকে পৃথক্ করে দিয়েছে।

মহাভারতে আছে কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতাদের কাছে বলেছেন জরাসন্ধ নিজেকে সর্বতোভাবে চক্রবর্তী রাজারূপে ঘোষণা করতে চেয়েছে। তিনি যুধিষ্ঠিরকে আরও বলেন, "সমস্ত রাজাকে ধরে এনে জরাসন্ধ বন্দী করে রেখেছে। এমন কি, আমরাও জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা ত্যাগ করে দ্বারাবতীতে পলায়ন করেছি"।[৫৯] মহাভারতে জরাসন্ধের মথুরা অবরোধের এবং যাদবদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষের কোনও উল্লেখ নেই। অন্যদিকে হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবতে রয়েছে জরাসন্ধ তাঁর বিধবা কন্যাদের অনুরোধে এক বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে মথুরা অবরোধ করেন এবং সতেরবার কৃষ্ণ ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। বিষ্ণুপুরাণে[৬০] এবং ভাগবতে[৬১] আছে যে, জরাসন্ধ তেইশ অক্ষৌহিনী সৈন্য নিয়ে মথুরা আক্রমণ করেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে কৃষ্ণ এবং বলরাম অল্প কয়েকজন শক্তিশালী সেন্য নিয়ে মগধরাজ ও তার সৈন্যদের পরাজিত করেন।[৬২] আর ভাগবতে আছে সিংহ যেমন করে থাবায় শিকার ধরে, ঠিক তেমনি করে বলরাম জরাসন্ধকে ধরেছিলেন এবং তাকে তার রথ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বরুণ পাশে বন্ধ করেছিলেন। গোবিন্দ জরাসন্ধকে মুক্ত করেন এবং পরাজিত লজ্জিত জরাসন্ধ অবশিষ্ট জীবন তপশ্চর্যায় কাটানোর সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর অনুচরেরা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন "হে বীর, নিজের কর্মফলে আপনি যদুদের নিকট পরাজিত হয়েছেন। এতে আপনার বলবিক্রম কিছু কম বলে প্রতিপন্ন হয় না।" ভাগবতের পাঁচটি শ্লোকে বিজয়ী কৃষ্ণবলরামকে মথুরাবাসীরা কিভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তার বর্ণনা আছে।[৬৩] এই ঘটনাটিতেও মহাভারতের তুলনায় কৃষ্ণ-বলরামের অবিসংবাদী মহিমাকে উচ্চে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

হরিবংশকে সাধারণভাবে মহাভারতের পরিপূরক গ্রন্থ বলেই মনে করা হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত W. Ruben-এর মতে পুরাণগুলির মধ্যে এটি প্রাচীনতম পুরাণ এবং ব্রহ্মপুরাণ হরিবংশের নকলমাত্র। আর বিষ্ণুপুরাণ সেই ব্রহ্মাপুরাণেরই পরবর্তী-কালীন রূপ।[৬৪] বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবত পুরাণে যেখানেই কৃষ্ণের অপমানের প্রসঙ্গ রয়েছে সেই অংশকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

এই দুই পুরাণে মহাশক্তিমান কালযবন মথুরা আক্রমণ করতে আসছে

জানতে পেরে কৃষ্ণ তাঁর আত্মীয় পরিজনদের দ্বারকা পাঠিয়ে দেওয়াই দূরদর্শিতার কাজ বলে মনে করেন। না হলে কালযবন ও জরাসন্ধ উভয়ের হাতেই নিগৃহীত হতে হবে। পরিণামে কৃষ্ণ মুচুকুন্দর গুহায় কৌশলে কালযবনকে নিয়ে গিয়ে তাকে ভস্মে পরিণত করেন।[৬৫]

হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণে ভীমের হাতে জরাসন্ধের পরাজয় ও মৃত্যুর বর্ণনা দেওয়া হয় নি। তার কারণ মহাভারতে এর বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া আছে। কিন্তু ভাগবতে এই ঘটনা কিছুটা বর্দ্ধিত এবং পরিবর্তিতভাবে পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

মহাভারত কেবলমাত্র মহাকাব্যই নয়, একাধারে ইতিহাস ও রাজনীতি। ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় কালক্রমের যথাযথ উপস্থাপনা অনিবার্য। অন্যথায় পাঠকের মনে ঐতিহাসিক চেতনার সঞ্চার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মহাভারতকারও যে কৃষ্ণকে উপস্থাপিত করেছেন, তিনি যথাযথ কালক্রমের অনুষঙ্গে গ্রথিত হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। ফলে মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্র হয়ে উঠেছে ঐতিহাসিক কালের এক কূটনীতিজ্ঞ বীরের চরিত্র। এখানে কৃষ্ণ সাধারণভাবে দেবতা হলেও, তাঁর চরিত্রে মানবিক দিকটির ইঙ্গিত দুর্লভ নয়। যেমন—কৃষ্ণের উক্তি, "অহং হি তৎ করিষ্যামি পরং পুরুষকারতঃ" ॥ কিংবা "দৈবং তু ন ময়া শক্যং কর্ম কর্তুং কথঞ্চন"।[৬৬] অতএব মহাভারতকারকে ঐতিহাসিক চরিত্র বর্ণনা করতে হয়েছে সময়ের ক্রম ঠিক রেখে—কিন্তু ভাগবতকার পরিপূর্ণভাবে আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগবত সঙ্কলন করেছেন। তাই ভাগবতের ঘটনাগুলি বিষয়ানুসারে সাজানো হয়েছে, সময়ানুসারে নয়। যেমন বিবাহের প্রসঙ্গ যখন এসেছে তখন ভাগবতকার তিন পুরুষের অর্থাৎ পর পর কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের বিবাহ বর্ণনা করেছেন। আবার মহাভারতে সুভদ্রা এবং অর্জুনের বিবাহ হওয়ার অনেক পরে খাণ্ডবদহন হয়েছে। কিন্তু ভাগবতে খাণ্ডবদহন বর্ণিত হয়েছে দশম স্কন্দের ৫৮শ অধ্যায়ে এবং সুভদ্রাহরণ বর্ণিত হয়েছে এই স্কন্দের শেষের দিকে।[৬৭] অতএব কৃষ্ণকথার বিবর্তনের ধারায় মহাভারতের ঐতিহাসিকতা থেকে ভাগবতের আধ্যাত্মিকতায় উত্তরণ সুস্পষ্টভাবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভক্তের দৃষ্টিপ্রদীপে শ্রীকৃষ্ণজীবনের যে সমস্ত লীলা পরবর্তীকালে আলোকিত হয়ে উঠেছে তা সব সময় ইতিহাসের মুখ রক্ষা করে নি। অতএব এখন থেকে তা হয়ে উঠেছে ভক্ত-কল্পনায় নিত্যনবায়মান বিস্ময়কর দেবমাহাত্ম্যকাহিনী।

দ্বিপার্বিক কৃষ্ণলীলাকথার আর এক পর্ব হলো ব্রজলীলাকথা অর্থাৎ কৃষ্ণের বাল্যজীবনকাহিনী। দ্বারকা পর্বে এবং মহাভারতের কুরুক্ষেত্রলীলায় শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নিয়ন্তা। তাই অনেকে মহাভারত ও গীতার এই শ্রীকৃষ্ণকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। কিন্তু এই রূপ তাঁর কেবলমাত্র ঐশ্বর্যরূপ। অন্যদিকে বাল্যলীলায় একাধারে মিশ্রিত রয়েছে ঐশ্বর্য ও মধুর রস। পুরাণ সমূহের মধ্যে এই ব্রজলীলাকথার পূর্ণ লিপিচিত্র পাওয়া যায়। এই পুরাণগুলির মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ নিতান্তই অর্বাচীন। কিন্তু হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ প্রাচীন ও প্রামাণ্য। এই তিন পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার যে বর্ণনা আছে, তা যথোপযুক্তভাবে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো অদ্ভুতকর্মা মানব শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে আরাধ্য দেবতায় পরিণত হয়েছেন। এবং তারই পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা গেছে

পরবর্তীকালীন ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও পদ্মপুরাণে। হরিবংশের শ্রীকৃষ্ণ অমিত শক্তিশালী অদ্ভুতকর্মা বালক। তাঁর অলৌকিক কার্য মাতা-পিতা ও আত্মীয়স্বজনের বিস্ময় উদ্রেক করে।

বিষ্ণুপুরাণে এই বিস্ময়ের সাথে যুক্ত হয়েছে ভক্তি। এখানে তিনি আর কেবল অমিত শক্তিধর গোপবালক নন, দেবতাও বটে। আর ভাগবত পুরাণে তিনি দেবতারও দেবতা। এই দেবশ্রেষ্ঠকেই পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তিরসমণ্ডিত করে উপস্থাপিত করেছে ব্রহ্মবৈবর্ত ও পদ্মপুরাণ। উপরন্তু এই দুই পুরাণে আমরা পাচ্ছি বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তপ্রধানা কৃষ্ণপ্রেমধন্যা রাধাকে।

এখন হরিবংশ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত ও পদ্মপুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা আলোচনা করে দেখা যেতে পারে। হরিবংশে আছে কংস চরমুখে নন্দভবনে দেবকীর পুত্র কৃষ্ণের অবস্থিতি সংবাদ পেয়ে পুতনাকে পাঠিয়েছে হত্যা করার জন্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্তন্যপানছলে তাকে হত্যা করেছেন। বালকের এই অলৌকিক পরাক্রমে নন্দ এবং অন্যান্য গোপেরা অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হয়েছেন।[৬৮] অন্যদিকে বিষ্ণুপুরাণে পুতনাবধ প্রসঙ্গে শিশু কৃষ্ণের ক্রন্দধ হওয়ার উল্লেখ আছে।[৬৯] এবং এখানে ব্রজবাসীরা কৃষ্ণকে দেবতা বলে ধরে নিয়ে এই কার্যে বিস্ময়প্রকাশ করে নি। আর ভাগবতে পুতনাবধ প্রসঙ্গে কৃষ্ণের দেবত্ব আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভাগবতে এই পুতনাবধ উপলক্ষ্যে, শ্রীকৃষ্ণকে 'ভগবান' ও 'কৈবল্যাদ্যখিলপ্রদ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।[৭০] এই দুটি বিশেষণই কৃষ্ণের ঐশ্বরিক সত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে বলে মনে করি। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকার কৃষ্ণের শুধু ভগবতী সত্তাই প্রতিষ্ঠা করে সন্তুষ্ট থাকেন নি। ভগবানকে শত্রুরূপে ভজনা করলেও যে মুক্তি পাওয়া যায় তা বর্ণিত হয়েছে নিহত পুতনার গোলোক গমনে।

বিভূতিপ্রকাশক শ্রীকৃষ্ণের আর একটি লীলা কালীয়দমন। এই কালীয়দমন-প্রসঙ্গে হরিবংশে আছে, শ্রীকৃষ্ণ কালীয়নাগের অত্যাচার নিবারণের জন্য হ্রদের জলে ঝাঁপ দিয়ে তাকে পরাজিত করেন এবং কালীয়কে অন্যত্র চলে যেতে নির্দেশ দেন। শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখে ব্রজবাসীরা বিস্মিত হয়ে তাঁর বন্দনা করেন। বিষ্ণুপুরাণের সঙ্গে এই কাহিনীর পার্থক্য খুব অল্পই। বিষ্ণুপুরাণে কালীয়নাগের সঙ্গে সংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণকে নিশ্চেষ্ট দেখে বলরাম তাঁকে ঐশ্বরিক সত্তা সম্পর্কে সচেতন করে দেন।[৭১] শুধু তাই নয়, বিষ্ণুপুরাণের অতিরিক্ত সংযোজন হলো—কালীয়নাগের পত্নীরাও স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেছেন।[৭২] তাঁদের অনুরোধে কৃষ্ণ কালীয়কে প্রাণে বাঁচিয়ে সাগরে চলে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। পরে ব্রজবাসীরা কৃষ্ণকে স্তবের দ্বারা প্রসন্ন করেছেন। পূর্বোক্তলীলায় যে পার্থক্য দেখা যায়, এখানেও ঠিক একই ধরনের পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। হরিবংশে যিনি কেবল বিপদশরণ, বিষ্ণুপুরাণে তিনি জগন্নাথ এবং ব্রহ্মাদি দেবগণও তাঁর অর্চনা করেন। কিন্তু ভাগবতে এই স্তুতির পরিমাণ আরও কিছু অতিরিক্ত। ব্রজবাসী কিংবা কালীয় পত্নীরাই শুধু নয়, শ্রীকৃষ্ণকে স্তবের জন্য এখানে সমবেত হয়েছেন গন্ধর্বগণ, সিদ্ধগণ, এবং মুনিগণ। ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণ আরও একধাপ এগিয়ে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ঈশ্বররূপ প্রকটিত। কালীয়নাগ তাঁকে কণ্ঠস্থ করা মাত্র তার উদর ও কণ্ঠ দগ্ধ হয়ে যায়। এখানে কালীয়ের

পত্নী কালীয়ের জীবনভিক্ষা না করে শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা করতে চায়। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের বরে পত্নীসহ কালীয় গোলোকে গমন করে। বলরামের উক্তিতে এই কৃষ্ণ জগতের বিধাতা, পরমেশ্বর, তাঁর লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করছে, এবং তিনি মহাবিষ্ণুর নিয়ন্তা।[৭৩]

গোবর্ধনধারণ লীলায়ও আমরা দেখবো হরিবংশে গোপ-গোপীরা প্রথানুযায়ী ইন্দ্রপূজার আয়োজন করলে শ্রীকৃষ্ণ তাদের গোবর্ধন পূজায় প্রবর্তিত করেন। ক্রুদ্ধ ইন্দ্র সাতদিন অবিরল বারিবর্ষণ ঘটিয়ে গোপদের পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করলে কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতকে ছত্রের মতো ধারণ করে এর থেকে ব্রজবাসীদের রক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত শক্তিতে ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ তাঁর স্তব করেন[৭৪] এবং ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে 'গোবিন্দ' আখ্যা দেন।[৭৫] ব্রজবাসীরা কৃষ্ণের এই অলৌকিক কার্য দেখে বিস্মিত হয়ে তাঁর স্তুতি করেন—

দেবো বা দানবো বা ত্বং যক্ষো গন্ধর্ব এব বা।
অস্মাকং বান্ধবো জাতো যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তুতে?[৭৬]

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে ব্রজবাসীরা বিস্মিত হন নি। অথবা কৃষ্ণের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁদের কোনও সংশয় নেই। তাঁরা বলেন, শ্রীকৃষ্ণ যা করেছেন তা দেবতাদেরও অসাধ্য।[৭৭] হরিবংশে ব্রজবাসীদের বিস্ময়ের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি তাদের স্বজাতীয় বান্ধব।[৭৮] কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণ নিজেকে কেবলমাত্র তাদের বান্ধব বলেই পরিচয় দিয়েছেন। আর ভাগবতের কাহিনী মোটামুটি একই রকম হলেও কৃষ্ণের এই অলৌকিক কর্মে ব্রজবাসীরা আদৌ বিস্মিত হন নি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গোবর্ধনলীলায় সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যমূর্তি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গোপদের ইন্দ্রপূজাস্থলে শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হলে সর্বস্তরের মানুষ তাঁকে বন্দনা করে রত্নসিংহাসন প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণ করলে ক্রুদ্ধ ইন্দ্র বজ্র দিয়ে কৃষ্ণকে হত্যা করতে উদ্যত হন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় অস্ত্র হয়ে যায় শক্তিহীন। এমন কি, মেঘ ও বায়ুও হয়ে যায় স্তব্ধ। ইন্দ্র যেদিকে তাকান সর্বত্রই দেখেন কৃষ্ণকে। এই বর্ণনার লক্ষণীয় বিষয় হোলো, পূর্ববর্তী পুরাণসমূহে কৃষ্ণের অলৌকিক কার্য দর্শন করার পর তাঁকে দেবতা জ্ঞান করা হয়েছে। কিন্তু এই পুরাণে যজ্ঞস্থলে উপস্থিতমাত্রই তিনি দেবতার মর্যাদা পেয়েছেন। আর পদ্মপুরাণে দেখি কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজবাসীরাও গোবর্ধনলীলায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছেন। কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজবাসীরাও ইন্দ্রের বন্দনীয় হয়েছেন।

কেবলমাত্র ঐশ্বর্যভাবাশ্রিত লীলাগুলিই নয়, কৃষ্ণের মধুর রসযুক্ত লীলাও বৃন্দাবনপর্বের উল্লেখ্য অংশ। এই মধুর রসাত্মক লীলাগুলি সুগভীর অধ্যাত্মরসরঞ্জিত হয়ে ভক্ত বৈষ্ণবের চিত্তকে প্রেমরসে আপ্লুত করেছে। যেমন, মধুর রসাত্মক লীলার মধ্যে রাসলীলাই বৈষ্ণবভক্তের মতে শ্রেষ্ঠ। এর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা অতি সুগভীর। হরিবংশে একে বলা হয়েছে 'হল্লীসক ক্রীড়া'। হরিবংশে বর্ণিত রাসলীলা শুক্লপক্ষে শারদরাস। এখানে গোপবালক ও গোপীরা কৃষ্ণকে ঘিরে মণ্ডলাকারে নৃত্য করে। ব্রজযুবতীরা পিতামাতা ও পরিজনের নিষেধ অমান্য করে কৃষ্ণের সাথে মিলিত হন।[৭৯] বিষ্ণুপুরাণে আছে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় সঙ্গীতে আকৃষ্ট গোপীদের নিয়ে তিনি রাস-মণ্ডল রচনা করলে গোপীরা অনুলোম ও প্রতিলোম গতিতে তাঁর নাম জপ

করে নৃত্য করে। গৃহের আকর্ষণ তুচ্ছ করে গোপীরা রাত্রিকালে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলে পরব্রহ্মরূপী কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে রমণ-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। এমন কি, গৃহে আবদ্ধ গোপীরাও কৃষ্ণের কথাই মনে মনে চিন্তা করে মোক্ষপ্রাপ্ত হন। হরিবংশের রাসলীলা যেন কিছু পরিমাণে প্রাকৃতজন সুলভ। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের রাসলীলা পরিপূর্ণভাবে আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত। এখানে রাসলীলার কৃষ্ণ 'ঈশ্বর ও সর্বভূতের আত্মস্বরূপ'।[৮০] এই আধ্যাত্মিকতার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটেছে ভাগবতে। ভাগবতের রাসলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী, গোপীগণের সঙ্গে তাঁর রাসলীলা ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, এবং গোপাঙ্গনারাও একান্তভাবে কৃষ্ণভক্ত। তাঁরা কামনাশূন্য-ভাবেই কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করেন।[৮১] আবার পদ্মপুরাণে দেখি কৃষ্ণের রাসলীলার সহচরী গোপিনীরা রামরূপী কৃষ্ণের বরে গোপীজন্ম প্রাপ্ত দণ্ডকারণ্যের মুনিঋষি।[৮২] পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে আছে ঝুলন ও দোললীলা।[৮৩] কিন্তু হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে এর কোনও উল্লেখই নেই।

শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণলীলাও হরিবংশ বা বিষ্ণুপুরাণে নেই। এই লীলাও লৌকিক ঘটনার আধারে সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য মণ্ডিত। ভাগবতের যুগে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান। তাই রাসলীলার মতো আধ্যাত্মিক তাৎপর্যযুক্ত লীলা বর্ণনার আগে এই লীলা বর্ণিত হয়েছে। ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে তাঁকে সর্বস্ব সমর্পণ করতে হয়; এমন কি, নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ লজ্জাও—এটাই বস্ত্রহরণ লীলার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আবার এই বস্ত্রহরণ লীলায় রাধারও উল্লেখ আছে। এখানে রাধার অনুরোধেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্র ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের রাসলীলাতেও রাধাই প্রধান।

বিভিন্ন বৈষ্ণব পুরাণের ব্রজলীলার প্রধান আখ্যায়িকাগুলো বিচার করে দেখা গেল যে, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব একদিকে যেমন মধুর রসকে ব্যাহত করেছে, তেমনি অন্যদিকে ব্রজবাসিগণের ভয় ও বিস্ময়ে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভগবৎসত্তার প্রতি তাদের অজ্ঞানতা অথবা সংশয় ফুটে উঠেছে। কিন্তু ভাগবতে ঐশ্বর্যের পাশাপাশি ব্রজলীলার স্নিগ্ধ মাধুর্য, পিতামাতা ও বন্ধু পরিজনের পারস্পরিক সম্পর্কের অকৃত্রিমতা ভক্তিরসার্দ্র হয়ে মধুরভাবে ফুটে উঠেছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও পদ্মপুরাণ এই একই পথে যাত্রা করেছে এবং বিশ্বাস করেছে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা ও গোপীলীলার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটেছে এই পুরাণগুলির মধ্যে। আর তারই ধারাপথ বেয়ে বাংলা সাহিত্যে এসেছে বৈষ্ণবধর্মাভিষিক্ত কৃষ্ণকথার রসপ্লাবন।

উল্লেখ পঞ্জী

১. ঋগ্বেদ (হরফ সংস্করণ) ; ১।২০।১৭-১৮।

২. পঞ্চোপাসনা—জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ-১৯৬০ ; পৃ. ৩৩-৩৪ Materials for the study of the Early History of the Vaisnava Sect—Hemchandra Roychowdhuri (2nd Edition) ; p. II.

৩. ঋগ্বেদ ; ১।১৫৬।৬।

৪. ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—ড. সুকুমার সেন, পৃ. ১৯।

৫. শতপথ ব্রাহ্মণ ; ১৪শ কাণ্ড।

৬. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ; ১।১।

৭. ঋগ্বেদ ; ১০।৯০।১।

৮. ঐ—ঐ।

৯. শতপথ ব্রাহ্মণ—১৩।৬।১।

১০. ঋগ্বেদ—৮।৯৬।

১১. ছান্দোগ্য উপনিষদ ; ৩।১৭ ৬।

১২. তৈত্তিরীয় আরণ্যক ; ১০ম অধ্যায়।

১৩. মহাভারত ; বন। ১৫৯ ও ১৬০ সংখ্যক অধ্যায়।

১৪. Encyclopaedia of Religion and Ethics ; VII ; p. 195.

১৫. ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত জাতক, ১ম খণ্ড, উপক্রমনিকা, পৃ. ১১।

১৬. গীতা ; ১১।২৪ : ১১।৩০।

১৭. ঐ—১০।২১।

১৮. Indian Atiquary, Vol. XXX (190) p. 286.
সাম্প্রতিক কালেও এ চেষ্টার বিরাম নেই। দ্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, তাং ১৮।২।৭৯।

১৯. Indian Antiquary ; পৃ. ৪৩১ [Hopkins/Journal of the Royal Asiatic Society, London 1907, Art. by J. Kennedy, pp. 977-78, 989-990]

২০. ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস—অশোক মিত্র।

২১. বালচরিত ; ৩য় অঙ্ক।

২২. মেঘদূত ; (পূর্বমেঘ) "বর্হেণের স্ফুরিত রুচিণা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ"।

২৩. পূজাপার্বণ ; শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (রাসযাত্রা প্রবন্ধ)।

২৪. ঐ—পৃ. ২৯, পৃ. ৩১।

২৫. 'কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিক পুনর্বিচার'—ড. বিমানবিহারী মজুমদার, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ; বর্ষ—৭১ সংখ্যা ১—৪।

২৬. মহাভারত ; সভা ৬৫।৪১।

২৭. 'কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিক পুনর্বিচার' ; সা. প. প.—৭২।১—৪।

২৮. অষ্টাধ্যায়ী ৪।৩।৯৮।

২৯. ঐ—'হেতুমতি চ'—৩.১.২৬।

৩০. ঐ—'অব্যয়াত্তপ্'—৪.২.১০৪।

৩১. Krsna in History and Legend—Biman Bihari Majumdar, p. 16.

৩২. পঞ্চোপাসনা—জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬০) পৃ. ৫৫।

৩৩. 'অল্লাচ্ত্রবস' (২.২.৩৪)।

৩৪. 'মৃদঙ্গশঙ্খতূণবাঃ পৃথঙ্নদন্তি সংসদি প্রাসাদে ধনপতিরামকেশবানাম'।

৩৫. Epigraphia Idica, Vol. XXIV, pp. 208-9.

৩৬. বায়ুপুরাণ ; ৭৯ অধ্যায়, ১ম শ্লোক—
মনুষ্য প্রকৃতীন্ দেবান্ কীর্তমানিবোধত।
সঙ্কর্ষণ বাসুদেব প্রদ্যুম্ন সাম্ব এবচ।
অনিরুদ্ধশ্চ পঞ্চৈতে বংশবীরাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

৩৭. মৎস্য পুরাণ ; ৪৭, ২৩।

৩৮. Early History of the Vaisnava Sect—H.C. Roychowdhuri ; p. 165.

৩৯. ঐ ; পৃ. ১৭৬।

৪০. হত রিপুর-ইব কৃষ্ণ দেবকীম্ অভ্যুপেত Fleet. c.I.I. III, Text, p.-54.

৪১. E.I. XXX (1954) p.-203.

৪২. বিষ্ণুপুরাণ : শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কার নাথ সম্পাদিত ; ৫।৩৩। পৃ. ৪৪৫।

৪৩. যল্লক্ষ্মীবদনে ন্দুনান সুখিতং যন্নাহদিতস্বাবিধে ধারা যন্ন নিজেন নাভিসরসী পদ্মেন শান্তিঙ্গতম্।
যাচ্ছষাহিফণা সহস্রমধুবশ্বাসৈর্ন চাশ্বাসিতং
তদ্রাধাবিরহাতুরং মুররিপোর্বেল্লদ্বপুঃ পাতু বঃ ॥
(শশীভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, পৃ. ১২৯ হ'তে পুনরুদ্ধৃত।)

৪৪. E.I. XXXIV, p. II (1961), p. 68.

৪৫. ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায়।

৪৬. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড) পৃ. ২৬৭।

৪৭. ঐ

৪৮. ভাগবত-১০।২২।

৪৯. প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং প্রাপ্তানস্মান্ জ্ঞাত্বা নৃশংসবৎ
অদহদ্দ্বারকামেব বসুস্রায়ঃসন্ নরাধিপাঃ ॥
সভা—৪৪।৭
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ।

৫০. হরিবংশ ; শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সম্পাদিত ; ১৩৯।

৫১. বিষ্ণুপুরাণ—শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ পৃ. ১৬।

৫২. ভাগবত ১০.৫৬-৫৭ অধ্যায়।

৫৩. তদেব ১।৯।১৬—১৭।

৫৪. তদেব ১।৯।৪০।

৫৫. মহাভারত—৯।৫৯। ২৩—২৩।

৫৬. ভাগবত—১০।৭৮।

৫৭. মহাভারত—১০।১৬। ৮—১০।

৫৮. ভাগবত ১।৭।৫২।

৫৯. মহাভারত—সভা ১৪। ৬৪—৬৫।

৬০. বিষ্ণুপুরাণ—৫।২২।৩।

৬১. ভাগবত—১০।৫০।৪।

৬২. বিষ্ণুপুরাণ—৫।২২।৮।

৬৩. ভাগবত—১০।৫০। ৩০—৪০।

৬৪. Journal of the Royal Asiatic Society ; 1941, pp. 247 ff

৬৫. বিষ্ণুপুরাণ ৫।২৩ ; ভাগবত১০।৫০—৫১।

৬৬. শ্রীমদ্ভাগবতম্ ; ৫।৭৯। ৫—৬।
Edited by Padit Ramchandra Sastri Kijawadeker. First Edition, 1931, Pooa.
এই শ্লোকগুলি কিন্তু সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণে কিংবা B.O.R.I সংস্করণে পাওয়া যায় না। অথচ শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্তও মনে করতে পারছি না। কারণ শ্রীকৃষ্ণের দৈবী সত্তার পরিবর্তে মানবিক সত্তার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কোন শ্লোক পরবর্তীকালীন সংযোজন এ কথা মেনে নেওয়া কষ্টকর।

৬৭. ভাগবত ১০।৫৮।২৫ এবং ১০।৮৬। ২—১১

৬৮. হরিবংশ—বিষ্ণুপর্ব। ৬।৩২।

৬৯. বিষ্ণুপুরাণ ৫।৭।৯।

৭০. ভাগবত—১০।৬।৩৯।

৭১. বিষ্ণুপুরাণ—৫।৭।৩৬, ৩৮।

৭২. ঐ—৫।৭।৪৮।

৭৩. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ; শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। ১৩। ১৪৬—৪৭।

৭৪. হরিবংশ—২।১৯।২১।

৭৫. ঐ—২।১৯।৪২।

৭৬. ঐ—২।২০।৮।

৭৭. বিষ্ণুপুরাণ ৫।১৩। ৫—৮।

৭৮. হরিবংশ—২।২০।১১।

৭৯. ঐ—২।২০।২৪।

৮০. বিষ্ণুপুরাণ—৫।১৩। ৬০—৬১।

৮১. ভাগবতপুরাণ—১০।৩২।১৩, ২২ ; ১০।৩৩।২৮, ৩৫—৩৬।

৮২. পদ্মপুরাণ—পাতাল খণ্ড। ৫২।৪।

৮৩. ঐ—উত্তর খণ্ড। ৫২।৪৮, ৫০—৫২।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা কৃষ্ণকথার প্রাক্‌রূপ

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কৃষ্ণকথার উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের রেখাচিত্রটি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এখন বাংলাসাহিত্যে কৃষ্ণকথার উদ্ভব ও বিকাশপূর্বে যে রূপটি আমরা লিপিলেখনে, স্থাপত্য-ভাস্কর্যে, প্রাকৃত সাহিত্যে এবং অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাই, তার পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

॥ ১ ॥

লিপিলেখন, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

বাংলা দেশে বিষ্ণু উপাসনার ঐতিহ্য নিতান্ত অর্বাচীন নয়। খ্রীস্টপূর্বকাল থেকেই যে এই ঐতিহ্য বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে, তার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয়েছে।

বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে প্রাকৃত ভাষায় রচিত মহাস্থান চক্র লিপি বাংলাদেশে প্রাপ্ত বিষ্ণু উপাসনার প্রাচীনতম প্রত্ননিদর্শন।[১] প্রত্নতত্ত্ববিশারদদের মতে এটি সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের সমসাময়িক। এই সময় ধরা হলে এর লিপিকাল খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী।[২]

এরপর সুদীর্ঘ ব্যবধানে আমরা বাংলাদেশে প্রাপ্ত নানা প্রত্ননিদর্শন থেকে নানারূপে ও নানাভাবে বিষ্ণুপূজার একটি ধারাবাহিক বিবরণ পাচ্ছি। কিন্তু কৃষ্ণকে পেয়েছি আরও পরবর্তীকালে।

বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময়ে খোদিত একটি লিপি পাওয়া গেছে।[৩] শুশুনিয়া পাহাড়ের একটি ভগ্ন গুহার গাত্রে খোদিত বিষ্ণুচক্রের নীচে ও পাশে সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটি কথা উৎকীর্ণ আছে—

> পুষ্করণাধিপতের্মহারাজ শ্রীসিংঘবর্মণঃ পুত্রস্য
> মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণঃ কৃতিঃ
> চক্রস্বামিণঃ দোসগ্রেণাতিসৃষ্টঃ।

চন্দ্রবর্মার কাল চতুর্থ শতাব্দী। এবং এই লেখনে তিনি যে নিজেকে বিষ্ণুর পূজক বলে অভিহিত করেছেন তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

পঞ্চম শতাব্দীর একটি তাম্রশাসনপট্ট থেকে জানা যায় এই শতাব্দীর প্রথম দিকে শিবনন্দী গোবিন্দস্বামীর দেউল প্রতিষ্ঠিত করেন।[৪] এই গোবিন্দস্বামী নামটিও বিষ্ণুর তথা কৃষ্ণের অপর নাম। হরিবংশেই আমরা ইন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত কৃষ্ণের গোবিন্দ নাম পেয়েছি।[৫] বৈগ্রাম লিপি থেকে জানা যায় এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তরবঙ্গে হিমালয় পর্বতে কোকামুখস্বামী ও শ্বেতবরাহস্বামীর দুটি ছোটো মন্দির (কোষ্ঠিকাদ্বয়ং) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৬] শ্বেতবরাহস্বামী বরাহ অবতার বিষ্ণুরই অন্যতম রূপ। কোকামুখস্বামীও বিষ্ণুরই অপর নাম। বরাহপুরাণে কোকামুখ হিমালয়ে অবস্থিত ত্রিস্রোতা ও কৌশিকীর নিকটবর্তী একটি স্থান। এই স্থান বিষ্ণুর

প্রিয়স্থান বলে সেখানে বর্ণিত। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নয় যে, হিমালয়ের এই কোকামুখ-স্বামীর মন্দির বরাহ পুরাণোক্ত বিষ্ণুরই মন্দির। ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে ত্রিপুরা জেলার গুণাইঘর পট্টোলীতে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৭] সপ্তম শতকের লোকনাথ পট্টোলীতে ত্রিপুরা জেলায় ভগবান অনন্তনারায়ণের মন্দির ও পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতেই কৈলান পট্টোলীতে শ্রী ধারণরাতকে পরমবৈষ্ণব বলে অভিহিত করা হয়েছে ও পুরুষোত্তমের ভক্ত বলা হয়েছে। এই সমস্ত নিদর্শন থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে পৌরাণিক বিষ্ণুপূজার প্রসার ধীরে ধীরে হচ্ছে। প্রদ্যুম্ন পৌরাণিক কৃষ্ণের বংশধর এবং বলরাম অনন্তেরই অবতার। সুতরাং প্রদ্যুম্নেশ্বর ও অনন্তনারায়ণের মন্দির বাংলাদেশে পৌরাণিক বিষ্ণু কৃষ্ণপূজো-প্রসারেরই সাক্ষ্যবাহী।

কিন্তু এ পর্যন্ত বাংলাদেশে বিষ্ণুপ্রসঙ্গ নানাভাবে পাওয়া গেলেও কৃষ্ণকথার প্রথম নিদর্শন পাই ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে পাহাড়পুরের প্রত্ননিদর্শন থেকে। বাংলা দেশে কৃষ্ণকথা যে ধীরে ধীরে শিল্পে-সাহিত্যে স্থানলাভ করছিল পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মূর্তিগুলি থেকেই তা বেশ বোঝা যায়। ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণরে বাল্যলীলার বেশ কিছু অংশ পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ রয়েছে।

শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে বাসুদেবের নন্দালয় যাত্রা, গোপ-গোপীদের সঙ্গে তাঁর ক্রীড়া, গোবর্ধন ধারণ, যমলার্জুনভঙ্গ, কেশী দৈত্য নিধন, কংসের সভায় চানুর মুষ্টিকের সঙ্গে যুদ্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণের বাল্যলীলা পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে অলঙ্করণ রূপে উৎকীর্ণ। বলরাম ও যমুনা মূর্তিও এখানে পাওয়া যায় এবং বলরাম-যমুনা প্রসঙ্গও পৌরাণিক বৃন্দাবনলীলার অন্তর্ভুক্ত। পাহাড়পুরের মন্দিরে ২২ নং স্থাপত্যে যে মিথুন মূর্তি অঙ্কিত রয়েছে তাতে কৃষ্ণের পাশে দণ্ডায়মান নারীমূর্তিটি রাধার কিনা এ নিয়ে কোনও কোনও পণ্ডিত সংশয় প্রকাশ করে থাকেন। তাঁদের মতে, পুরাণে কোথাও রাধার উল্লেখ নেই (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বহু অর্বাচীন) এবং এই সময়ের পরিধিতে কেবলমাত্র গাথা-সপ্তশতীর একটি শ্লোকে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও গাথা-সপ্তশতীর এই একক শ্লোকটি সম্পর্কেও তাঁরা সংশয় প্রকাশ করে থাকেন।[৮]

কিন্তু এই মিথুনমূর্তি যে রাধাকৃষ্ণের এ সিদ্ধান্ত করার পেছনেও কয়েকটি যুক্তি আছে। কে. এন. দীক্ষিত বলেন—এই দেবমিথুনের নিকট-সান্নিধ্যে বলরাম-যমুনা প্রসঙ্গ বৃন্দাবনলীলার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই মিথুনও বৃন্দাবনলীলার অন্তর্ভুক্ত। এবং তা হলে কৃষ্ণের বামে অবস্থিত এই নারী নিশ্চয়ই কোনো গোপিনী। কিন্তু তিনি যে সাধারণ গোপিনী নন—তা তাঁর মস্তকের পশ্চাদ্দিকের জ্যোতির্মণ্ডল থেকে বোঝা যায়। এবং এই অসাধারণত্ব গোপিনীদের মধ্যে রাধারই ছিল। অতএব এটি রাধারই মূর্তি।[৯] সুতরাং, শুধু পৌরাণিক কৃষ্ণকথাই নয়—রাধাকৃষ্ণ প্রেম-কথাও যে এই সময় থেকেই প্রসারলাভ করছিল—এই প্রত্ননিদর্শনই তার প্রমাণ।

অষ্টম শতাব্দী থেকে প্রত্নলিপিগুলিতে বিষ্ণু ও কৃষ্ণলীলার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। পালবংশীয় রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও বিষ্ণু-নারায়ণের প্রতিও তাঁরা শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে[১০] আছে, তাঁর মহাসামন্তাধি-

পতি নারায়ণবর্মা নন্ন নারায়ণের দেউল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই নন্ন নারায়ণ সম্ভবতঃ বামন বিষ্ণুরই আর এক নাম। কিংবা নন্ন নারায়ণ শব্দটি যদি নন্দনারায়ণের অপভ্রংশ হয়, তবে এই মন্দিরে যে দেবতার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল—তিনি নন্দদুলাল, কৃষ্ণরূপী নারায়ণ। নারায়ণ পাল একটি গরুড়স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন।[১১] এই গরুড়স্তম্ভ স্থাপিত হয়েছিল বর্তমান দিনাজপুর জেলার একটি গ্রামে। সে যুগে বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখে গরুড়স্তম্ভ নির্মাণ করা হত। স্তম্ভের ওপরে থাকতো অঞ্জলিবদ্ধ গরুড়ের মূর্তি। এই সময়ের লিপিতে দামোদর নামের উল্লেখও কৃষ্ণকথার ব্যাপক প্রসারের প্রমাণ দেয়।

আসাম-বাংলার বর্মরাজদের রাজত্বকালের রাজশাসনে বিষ্ণু-কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। নবম শতাব্দীতে কামরূপের বনমালবর্মদেবের শাসনে কৃষ্ণলীলার উল্লেখ আছে।[১২] একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বঙ্গসমতটের বৌদ্ধরাজা লডহচন্দ্র পট্টিকেরে 'লডহ মাধব' নামে কৃষ্ণ-বিষ্ণু মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু ভূমি দান করেছিলেন। ময়নামতীতে পাওয়া দুটি তাম্রশাসনে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা আছে।[১৩] 'লডহ' শব্দের অর্থ কমনীয়কায়। এবং এই অর্থটি গ্রহণ করলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মূর্তিটিকে বালগোপালের মূর্তি বলেই মনে হয়।[১৪] এবং এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে ঐ অঞ্চলে কৃষ্ণকথা সুপ্রচলিত ছিল।

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে হরিবর্মের মহামন্ত্রী রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রাম নিবাসী ভবদেব ভট্ট ভুবনেশ্বরে অনন্ত-বাসুদেবের মন্দির নির্মাণ করান।[১৫] মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ প্রশস্তির প্রথমেই বিষ্ণুবন্দনা রয়েছে—

গাঢ়োপ গূঢ় কমলাকুচকুম্ভ পত্রমুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরিপ্সমানঃ।
মালুপ্যতামভিনবা বনমালিকেতি বাগ্‌দেবতোপহসিতোঽস্তু হরিঃ শ্রিয়ে বঃ ॥

অর্থাৎ—কমলাকে গাঢ় আলিঙ্গন করায় তাঁর কুচকুম্ভের চন্দনের ছাপ যাতে লেগেছে, সেই বপুতে সরস্বতীকে আলিঙ্গন করতে ইচ্ছুক হলে, "অভিনব বনমালা যাতে নষ্ট না হয়"—এই কথা বলে সরস্বতী যাঁকে উপহাস করেছিলেন—এই হরি তোমাদের সম্পদের হেতু হোন ॥

আদিরসাশ্রিত বিষ্ণুপ্রেমের যে চিত্র আমরা সেনরাজসভার কবিদের কাব্যে দেখতে পাই এ যেন তারই একটি রূপ।

সেন বংশের প্রথম রাজা বিজয়সেন রাজসাহী শহরের অদূরে দেওপাড়া বা দেবপাড়া নামক গ্রামে প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির স্থাপন করেছিলেন। ঐ স্থান থেকেই পাওয়া দেওপাড়া প্রশস্তিলিপিতে এর উল্লেখ আছে।[১৬] প্রদ্যুম্নেশ্বর বিষ্ণুরই অপর নাম। এবং এই নামটি কৃষ্ণ-বিষ্ণুর অভিন্নতার প্রত্যক্ষ পরিচয়বাহী।

পাল এবং সেনযুগে বাঙলা দেশের নানা স্থানে বহু বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেলেও সেনযুগে রাধাকৃষ্ণ ও গোপীকৃষ্ণ প্রেমলীলাই ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল, এ যুগের সাহিত্যই তার প্রমাণ।

ঢাকা জেলার বেলাবো গ্রামে পাওয়া সমতটের ভোজবর্মার বেলাভ লিপিতে[১৭] কৃষ্ণকথার দুটি ধারারই রূপায়ণ দেখা যায়। এই লিপিটিকে জয়দেব ও বড়ুচণ্ডীদাসের অগ্রপথিক বলা যায়।

সোহপীহ গোপীশতকেলিকারঃ।
কৃষ্ণো মহাভারতসূত্রধারঃ।
অর্ঘঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ।
প্রাদুর্বভূবোদ্ধৃতভূমিভারঃ ॥

এই কৃষ্ণবন্দনায় কৃষ্ণকথার চারটি দিকের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে—(১) কৃষ্ণ-গোপী-প্রেমলীলার উল্লেখ, (২) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নিয়ন্তা কৃষ্ণ, (৩) ভগবান স্বয়ং নয়—অংশাবতার কৃষ্ণ, এবং (৪) ভূভারহরণের জন্য তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর এই লিপিতেও গীতগোবিন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ কৃষ্ণের মাধুর্য ও ঐশ্বর্যভাবের মিশ্রণ ঘটেছে। চৈতন্য প্রভাবিত ঐশ্বর্যবিমুক্ত মাধুর্যমূর্তি এখনও জনমানসে অনাগত বিষয়।

এ পর্যন্ত আলোচিত লিপিলেখন ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে এটুকু অনুধাবন করা যায় বাঙলা দেশে খ্রীস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কৃষ্ণলীলা কথা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এবং প্রথম দিকে বিষ্ণু উপাসনা বিস্তারলাভ করলেও পরবর্তীকালে বিষ্ণু উপাসনার পরিবর্তে কৃষ্ণলীলাকথাই প্রাধান্য লাভ করেছে। সমকালীন প্রাকৃত অপভ্রংশ ও অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্য আমাদের এই সিদ্ধান্তের অনুবর্তী হবে।

॥ ২ ॥

প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্য

প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ তার প্রমাণ পাওয়া যায় কয়েকটি প্রাকৃত-অপভ্রংশ গ্রন্থ আলোচনা করলে। অবশ্য নিশ্চিত ভাবে বাংলাদেশে রচিত হয়েছে এমন প্রাকৃত অপভ্রংশ গ্রন্থ হয়তো পাওয়া যাবে না। বিশেষতঃ গাথা-সপ্তশতী ও প্রাকৃত পৈঙ্গল বাংলা দেশের সংকলনই নয়। কিন্তু বাঙালী জীবনের অনুরূপ চিত্রে, উত্তরকালীন বাংলা সাহিত্যের, বিশেষতঃ বাংলা সাহিত্যে বাহিত কৃষ্ণ-কথার সাধর্ম্যে সংকলন দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গাথাসপ্তশতী :

মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত গাথাসপ্তশতীর শ্লোকগুলিতে সাধারণ মানুষের জীবন চিত্রণের সাথে সাথে দেবদেবীদের লীলাও বর্ণিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ভাবে কৃষ্ণলীলাবর্ণনামূলক কিছু কিছু শ্লোকও আমরা এই কাব্যে পাচ্ছি। কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে এই সঙ্কলনটির গুরুত্ব অসাধারণ। কারণ এই সঙ্কলনেই কৃষ্ণকথার বৃত্তে সেই উজ্জ্বলতম সংযোজন রাধা প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটেছে। অবশ্য পঞ্চতন্ত্রেও আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া ও গোকুলজাতা রাধা নামটি পেয়েছি।[১৮]

বাণের হর্ষচরিতে গ্রন্থটিকে সাতবাহনের সঙ্কলিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসে সাতবাহন রাজাদের যে কাল বর্ণিত হয়েছে তা খ্রীস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দী। অথচ সঙ্কলিত গাথাগুলির ভাষা এত প্রাচীন বলে মনে হয় না। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যবর্তী সময়ে এটি সঙ্কলিত হয়েছিল বলে কীথ মনে করেন।[১৯] কিন্তু ড. সুকুমার সেনের মতে এই সঙ্কলন

৪০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৮০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে পূর্ণাঙ্গ হয়েছিল।[২০] জার্মান পণ্ডিত উইন্টারনিজ বলেন খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে সপ্তম শতকের মধ্যে এটি সঙ্কলিত হয়েছিল।[২১] এর কাল সম্পর্কে ড. সেন আরও বলেছেন, এই গ্রন্থের যে সমস্ত পুঁথি পাওয়া গেছে—তার সবগুলিতেই সাতশত শ্লোক পাওয়া যায় নি। বাণও একে সপ্তশতী বলে উল্লেখ করেন নি। তাই অনুমান করা যেতে পারে, সাতবাহন নরপতি হাল খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে এর সঙ্কলন কার্য আরম্ভ করলেও পরবর্তীকালে আরও নানা জনের দ্বারা খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত এর সঙ্কলনকার্য চলছিল।

লৌকিক জীবনে প্রচলিত কৃষ্ণকথার যে পশ্চাৎপট আমরা এই গাথাসপ্তশতীর সাহিত্য দর্পণে প্রতিফলিত দেখি—সমকালীন শিল্পকলাতেও তার প্রভাব পড়েছিল। পাহাড়পুরের স্থাপত্য শিল্পই তার নিদর্শন। তা ছাড়া, গাথাসপ্তশতীর রাধা পাহাড়-পুরের সেই বিতর্কিত ২২নং চিত্রের নারীমূর্ত্তি ব্যাখ্যার (রাধা অথবা সত্যভামা) একটি নতুন সঙ্কেতও নিয়ে আসতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে হয় রাধা-কৃষ্ণ আশ্রয়ী যে কৃষ্ণকথা এতদিন লোকজীবন এবং লোককথাকে আশ্রয় করে বহমান ছিল —এই সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতেই তা ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার তাগিদে শিল্পে-সাহিত্যে স্ফুটতর বিকাশমানতা লাভ করেছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, রাধাকৃষ্ণের একত্র উল্লেখও এই গাথাসপ্তশতীরই একটি শ্লোকে পাওয়া গেছে—

মুহমারুএণ তং কণ্‌হ গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এত্তাণং বল্লবীণং অণ্ণাণ বি গোরঅং হরসি॥[২২]

এই প্রসঙ্গে আমাদের যেটা লক্ষণীয় বিষয় তা হলো, রাধার নামটুকুই শুধু নয়—অন্যান্য গোপিনীদের তুলনায় কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার উৎকর্ষও এখানে ঘোষিত হয়েছে। অর্থাৎ কৃষ্ণকথার অনুষঙ্গে রাধার নামটিই আমরা কেবল পাচ্ছি না—প্রাচীন ও মধ্য-যুগীয় বাংলা সাহিত্যধারার কৃষ্ণকথায় রাধার যে আসন তা সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর সাহিত্যেই সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গাথাসপ্তশতীর এই রাধানামাঙ্কিত শ্লোককে অনেকে পরবর্তীকালের সংযোজন বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণলীলা বিষয়ক এই একটি মাত্র পদ যদি আমরা এখানে পেতাম—তা হলে স্বাভাবিক ভাবেই এই সংশয় জাগতে পারতো। তার পরিবর্তে একাধিক পদ এখানে পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের অঙ্গীকারের পরেও এই প্রক্ষেপ—এমন সংশয় অমূলক।

গাথাসপ্তশতীর অন্যান্য কয়েকটি শ্লোকেও গোপীকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ রয়েছে। একটি শ্লোকে কৃষ্ণকে এখনও বালক ভেবে জননী যশোদার সস্নেহ উক্তি গোপিনীদের কিরূপ মনোভাব উদ্রিক্ত করছে—তার একটি চমৎকার চিত্র রয়েছে।[২৩] এখানে যুগপৎ বাৎসল্য ও মধুর রসের মিশ্রণ ঘটেছে। এই ধরনের বিমিশ্র রসব্যঞ্জক পদের উদাহরণ পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীতেও পেয়েছি। অপর একটি শ্লোকে[২৪] দেখি গোপিপ্রেমের চাতুর্যময় গভীরতার উৎসার—

ণচ্চণ-সলাহণ ণিহেণ পাস-পরিসংঠিআ নিউণ গোবী।
সরিস গোবিআণং চুম্বই কবোল পডিমা-গঅং কণ্‌হ॥

কৃষ্ণকে চারপাশে ঘিরে গোপিনীদের এই নৃত্য রাসনৃত্যের অনুরূপ। অপরা গোপীর গণ্ডে প্রতিবিম্বিত কৃষ্ণমুখ চুম্বন করার মধ্যে গোপিনীদের গভীর প্রেমের পরিচয়ই ফুটে উঠেছে।

গাথা সপ্তশতীর অপর একটি পদে রাধা এবং কৃষ্ণের নাম না থাকলেও গোপীপ্রেমের উল্লেখ রয়েছে। শালিক নামক এক গাথাকারের গাথায় আছে—

মহু-মাস-মারুআহঅ-মহুঅর-ঝংকার-নিবভরে রণ্ণে
গাঅই-বিরহক্খরাবিদ্ধ-পহিঅ-মণ-মোহণং গোবী ॥[২৫]

অর্থাৎ বসন্তকালে মলয়পবনে ভ্রমরঝংকারে অরণ্যভূমি পরিপূর্ণ হয়েছে। গোপীরা বিরহের গানে পথিকদের মন মোহিত করছে। ঠিক এই ভাবেরই একটি শ্লোক জয়দেবের গীতগোবিন্দেও আছে।[২৬]

কৃষ্ণ-গোপীসংক্রান্ত পদ ছাড়াও গাথাসপ্তশতীতে প্রাকৃত নায়িকার প্রেমের যে বিচিত্র স্তর লক্ষ্য করা যায়—তার মধ্যে পরবর্তীকালীন রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার আভাস পাওয়া যায়। দীর্ঘ বিরহিণী নায়িকার বিরহযন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ[২৭], প্রোষিতভর্তৃকার দীর্ঘকাল প্রবাসী প্রিয়ের অভ্যর্থনা পরিকল্পনা[২৮], চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদের কথা মনে করিয়ে দেয়। গাথাসপ্তশতীর কিছু কিছু প্রাকৃত প্রেমের কবিতা পরম্পরা-ক্রমে ব্যবহৃত হতে হতে বৈষ্ণব সাহিত্যে এসেছে। যেমন অভিসারের একটি পদের[২৯] অনুরূপ প্রাকৃত প্রেমিকার অভিসারপদ কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়েও পাওয়া যাচ্ছে।[৩০] পরবর্তীকালে গোবিন্দদাসের বিখ্যাত অভিসারের পদেও আমরা অনুরূপ ভাবের পরিচয় পাচ্ছি।[৩১]

এই ধরনের আরও বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। সুতরাং তালিকা আর বেশী না বাড়িয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, গাথাসপ্তশতীতে প্রত্যক্ষভাবে ব্রজলীলার যে কতিপয় পদ রয়েছে—তা যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি এতে বর্ণিত প্রাকৃত নরনারীর প্রেমলীলার বিচিত্র পর্যায়ও পরবর্তীকালের কৃষ্ণকথাকে প্রভাবিত করেছে।

প্রাকৃত পৈঙ্গল ঃ

গাথাসপ্তশতীর মতোই আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গের আর এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' নামক শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত ছন্দোগ্রন্থ। গাথাসপ্তশতী যেমন উত্তরকালীন কৃষ্ণলীলাকথার নানা বিশিষ্ট উপাদানের উদ্ভবসূত্র আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে—প্রাকৃত পৈঙ্গলও তেমনি বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগীয় কৃষ্ণলীলাকথার কিছু বিশিষ্ট উপাদানের উৎস নির্দেশে সক্ষম। কিন্তু এই প্রসঙ্গের পূর্বেই গ্রন্থটির ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে আসা যাক।

কাশীধামের Prakrit Text Society-র সংস্করণে সম্পাদক ড. ভোলাশংকর ব্যাস সংকলনটিকে চতুর্দশ শতকের বলে অনুমান করেছেন। অন্যান্য পণ্ডিতগণও সংকলনটির কাল সম্পর্কে অনুরূপ অনুমান করেছেন।[৩২] 'এর সংকলনস্থান কাশী অর্থাৎ পূর্বভারত বলে এতে বাঙালীর কিছু কিছু রচনা সংকলিত হয়েছে—এমন অনুমান অমূলক নয়। সংকলনকর্তা 'পিঙ্গল ছন্দসূত্রে'র পিঙ্গল কিনা—এ প্রশ্ন

উত্থাপিত হলেও তা অগ্রাহ্য হয়েছে। এর বেশি কিছু তথ্য আমরা সংকলনটি সম্পর্কে পাই নি।

কিন্তু মূল গ্রন্থটি অনুসরণ করলে দেখি 'ইহাতে এমন অনেক শ্লোক আছে, যাহার ভাব, বিষয়বস্তু ও ভাষা কৌশল প্রায়ই বাংলার অনুরূপ।'[৩৩] সাধারণ জীবনের বিচিত্র রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ ও গোপীলীলা প্রসঙ্গও এতে আছে। কিন্তু সব থেকে বড় কথা, মধ্যযুগীয় বাংলা কৃষ্ণকথায় এমন কিছু উপাদান সংযোজিত হয়েছিল যার উৎস নিরূপণে গবেষকগণ বহু চেষ্টা করলেও খুব বেশী প্রাচীন উপাদান হাজির করতে পারেন নি। তেমনি একটি বিষয় হলো রাধাকৃষ্ণের নৌকালীলা। আর এই নৌকালীলার প্রথম প্রসঙ্গ আমরা পেলাম এই প্রাকৃত পৈঙ্গলেরই নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে—

অরে রে বাহহি কাহ্ন ণাব,
ছোড়ি ডগমগ কুগতিণ দেহি।
তই ইথি ণদিহি সংতার দেই,
জো চাহহি সো লেহি॥[৩৪]

ওরে ও কৃষ্ণ, নৌকা বাও, টলমল করিয়ে দুর্গতি দিও না। আগে তুমি নদীটা পার করে দিয়ে যা চাও তাই নিও।

আর একদিক থেকেও সংকলনটির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। গাথাসপ্তশতীর রাধা আমাদের কাছে তার দৈবী সত্তার পরিচয় নিয়ে আসে নি। কিন্তু প্রাকৃত পৈংগলের একটি শ্লোকে রাধাকে অভিজাত পৌরাণিক দেবীদের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্মী, গৌরী, মহামায়া ইত্যাদি দেবীদের সঙ্গে 'রাঈ' বা শ্রীমতী রাধার নাম একাধিক পংথিতে পাওয়া যায়।[৩৫]

লচ্ছী রিদ্ধী বুদ্ধী লজ্জা বিজ্জা খমা আ দেহীআ।
গৌরী রাঈ চুণ্ণা ছাআ কান্তী মহামাঈ॥[৩৬]

কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশে গুরুত্বপূর্ণ আর একটি বৈশিষ্ট্য আমরা এই সংকলনটিতে লক্ষ্য করি। তা হলো জয়দেবের কাব্যরীতির অঙ্গীকার। পরবর্তীকালের কৃষ্ণকথায় জয়দেব কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন প্রাকৃত পৈঙ্গলের নিম্নোদ্ধৃত পদ থেকে তা সহজেই বোঝা যায়—

জিণি কংস বিণাসিঅ কিত্তি পআসিঅ
মুট্ঠি অরিট্ঠি বিণাস করে গিরি হত্থ ধরে,
জমলজ্জুণ ভংজিঅ পঅভর গংজিঅ
কালিঅ কুল সংহার করে জস ভুঅণ ভরে।
চাণূর বিহংডিঅ পিঅকুল মংডিঅ
রাহামুহমহু পাণ করে জিনি ভমর বরে।
সো তুম্ম ণরাঅণ বিপ্পপরাঅণ
চিত্তঅ চিংতিঅ দেউ বরা ভব ভীই হরা।[৩৭]

যিনি কংস বধ করে কীর্তি প্রকাশ করেছিলেন, মুষ্টিক অরিষ্টকে বিনাশ করেছিলেন, হাতে গিরি ধরেছিলেন, যমলার্জুন ভেঙ্গেছিলেন, পদভরে নির্যাতন করে কালিয়কুল

সংহার করেছিলেন, যশে ভুবন ভরে ছিলেন, চাণূরকে বিখণ্ডিত ও আপন কুলকে মণ্ডিত করে ভ্রমরের মতো রাধার মুখ-মধু পান করেছিলেন, সেই বিপ্রপরায়ণ নারায়ণকে চিত্তে চিন্তা কর। তিনি (তোমাকে) ভবভীতিহর বর দান করুন।

কৃষ্ণলীলাবিষয়ে আর যে শ্লোকটি এই সংকলনটিতে পাই তার বিষয়বস্তু কংস-সংহারাদি সাধারণ বিষয়।

কংসসংহারণা পক্ষিসণ্ডারণা।
দেবইডিংভ আ দেউ মে ণিব্ভআ ॥[৩৮]

যিনি কংসকে সংহার করেছেন, তিনি গরুড়ের পৃষ্ঠে সঞ্চরণ করেন, এবং যিনি দেবকীপুত্র, তিনি আমাকে অভয় প্রদান করুন।

॥ ৩ ॥

সংস্কৃত শ্লোক সংগ্রহ

বাংলা সাহিত্য-পূর্ব কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ শ্লোক সংকলনের আলোচনার পরই আমরা অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কৃষ্ণকথার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করবো। এই প্রসঙ্গে দুটি মূল্যবান শ্লোকসংকলন—সুভাষিত রত্নকোষ ও সদুক্তিকর্ণামৃত—আমাদের হস্তগত হয়েছে। দুটি গ্রন্থই বংলাদেশের সংকলন। শ্লোকরচয়িতাদের মধ্যেও রয়েছেন বহু বাঙালী কবি। অতএব এই গ্রন্থ দুটিতে ধৃত কৃষ্ণকথামূলক শ্লোকাবলী যে উত্তরকালীন বাংলা কৃষ্ণকথার মানসপ্রস্তুতির সাক্ষ্যবাহী তা বলাই বাহুল্য।

সুভাষিতরত্নকোষ (কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়) ঃ সেন আমলের শ্রীধরদাস সংকলিত সদুক্তিকর্ণামৃত অপেক্ষা সুভাষিতরত্নকোষ প্রায় শতাব্দীকাল আগে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে বা একাদশ শতাব্দীর শেষে সঙ্কলিত। কবিতার কবিগণ আরও পূর্ব-বর্তী, কারণ এতে ভাস-কালিদাসের [৩৯] কাল থেকে আরম্ভ করে সমকাল পর্যন্ত যে সমস্ত কবিদের কবিতা জনমানসে বহুল আদৃত হয়েছে সেগুলিই সঙ্কলিত। এর খণ্ডিত পুঁথিটি পাওয়া গেছিল নেপালে। কিন্তু বইটির নাম তাতে পাওয়া যায় নি। এফ. ডবলু. টমাস এই বইটির সম্পাদনা করেন। প্রথম শ্লোকে 'নানা কবীন্দ্রবচনানি' দেখে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এর নাম দেন 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়'। পরবর্তীকালে এর সম্পূর্ণ ও নূতন পুঁথিতে গ্রন্থের 'সুভাষিতরত্নকোষ' নামটি পাওয়া গেছে।[৪০] প্রাচীন পুঁথিটি বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত দ্বাদশ শতাব্দীর নেওয়ারী অক্ষরে রচিত। এর সঙ্কলয়িতার নাম বিদ্যাকর। তিনি সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, কারণ তাঁর গ্রন্থারম্ভে বুদ্ধ-বন্দনা রয়েছে।

কিন্তু গ্রন্থারম্ভের সুগতব্রজ্যা বাদ দিলে সারা গ্রন্থে হিন্দু দেবদেবী বিষয়ক এবং তার মধ্যে আবার হরিবিষয়ক কবিতার সংখ্যাই বেশী। এ ছাড়াও রয়েছে আদিরসসম্বন্ধ প্রাকৃত প্রেমকবিতা ও ঋতুবিষয়ক কবিতা।

আমাদের আলোচ্য হরিব্রজ্যায় রয়েছে ৪৪টি শ্লোক। তার মধ্যে বারোটি শ্লোকই কৃষ্ণলীলাবিষয়ক। এবং এই কৃষ্ণলীলাসমন্বিত শ্লোকগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায়—এদের মধ্যে রাসলীলা ছাড়া কৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রধান প্রধান ঘটনাই কাব্যরূপ লাভ করেছে। পরবর্তীকালের সদুক্তিকর্ণামৃতেও এর ৭টি পদ গৃহীত হয়েছে।

হরিব্রজ্যার প্রথমেই রয়েছে অবতার বন্দনা। পরবর্তীকালে একই রীতি অবলম্বন করে জয়দেবের গীতগোবিন্দেও দেখেছি, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনার আগে দশাবতার বন্দনা করা হয়েছে।

তবে এখানকার প্রকীর্ণ পদগুলি ক্রমানুসারে সাজানো নয়। ইতস্ততঃ মিশ্রিত। কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবেই এখানে কৃষ্ণকথার নানা প্রসঙ্গ বর্ণিত যা, ভাবেভঙ্গীতে পরবর্তীকালীন বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বরূপ। আমরা আলোচনায় পৃথক্ পৃথক্ এগুলির আলোচনা করছি।

ব্রজ্যার প্রথমেই বাক্‌পতিরাজের দুটি শ্লোকে যথাক্রমে বরাহ অবতার ও কূর্মাবতার বন্দনা করা হয়েছে। এই ধরনের অবতারবিষয়ক পদ কখনও কখনও কাব্যসৌন্দর্যে রমণীয় হয়ে উঠেছে। যেমন—'শকুলাকৃতি' মৎস্যাবতারের 'পুচ্ছচ্ছটাচ্ছোটনে' সিন্ধুর জলবিন্দুতে অম্বরতলে শতচন্দ্রমাচ্ছটা,[৪১] নিদ্রামগ্ন কূর্মাবতার[৪২] এবং একাধিকবার নরসিংহবন্দনাও[৪৩] রয়েছে। একটি শ্লোকে পানমত্ত স্খলিতবাক্ হলধরের চিত্র অঙ্কিত।

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার অনুরূপ বিষ্ণুলক্ষ্মীর প্রেমলীলাও সে যুগের কবিরা কল্পনা করেছিলেন। এবং কৃষ্ণকথার বিচিত্র ভাবযুক্ত প্রেমবিলাস বিষ্ণুলক্ষ্মীর প্রেমের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে।

মুরারির একটি পদে বিষ্ণুবন্দনা রয়েছে। এই গ্রন্থের অন্য দুটি পদে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর সুরতক্রীড়া বর্ণিত।[৪৪] সম্ভোগান্তে 'বিগলিতকবরী ভার' লক্ষ্মী ও 'তৎকালকান্তিদ্বিগুণিতসুরতপ্রীত' শৌরির বর্ণনা পরবর্তীকালের গীতগোবিন্দে সুরত-প্রীত কৃষ্ণ ও রাধার কথা মনে করিয়ে দেয়। ভাসের শ্লোকে দেখি হরির বক্ষঃস্থল-শায়িনী লক্ষ্মী অনন্ত নাগের সহস্র ফণার মণিতে প্রতিবিম্বিত নিজের শরীর দর্শনে সেই প্রতিবিম্ব গুলিকেই সপত্নী ভেবে অভিমান করেছেন।[৪৫] তাঁর অভিমান দেখে হরির মুখে ফুটে উঠেছে স্মিতহাস্য। অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীর এই প্রণয়জাত অভিমান আমাদের অভিমানিনী রাধার কথাই মনে করিয়ে দেয়। শ্রীভগীরথের একটি পদে 'নিধুবনক্লান্তিনিদ্রান্তে ক্ষুণ্ণ-কেয়ূর-পত্র' হরির বন্দনা করা হয়েছে। বাক্‌পতি রচিত হরিব্রজ্যার পঞ্চম শ্লোকে হরির সঙ্গে লক্ষ্মীর বুদ্ধিদীপ্ত কথোপকথন লিপিবদ্ধ হয়েছে। অভিমানিনী লক্ষ্মীকে হরি নানাভাবে শান্ত করতে চাইলে লক্ষ্মী তাঁকে বক্রোক্তিবাণে নিবৃত্ত করেছেন। বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর আবরণে এই প্রেম আসলে তৎকাল প্রচলিত জনপ্রিয় রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথারই আর এক রূপ। পৌরাণিক বিষ্ণু-লক্ষ্মীর সঙ্গে অভেদীকৃত রাধাকৃষ্ণেরই এই প্রণয়বিহ্বলতা।

এখন যে পদগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হয়েছে তার আলোচনা করা যেতে পারে। পরবর্তীকালীন বৈষ্ণব পদাবলীর পঞ্চরসোপাসনার পূর্বাভাস এই পদগুলিতে ব্যঞ্জিত।

এই সংকলনে বিধৃত কৃষ্ণের শৈশব কালের বর্ণনাযুক্ত একটি শ্লোক[৪৬] পরবর্তীকালীন পদাবলীতে গৃহীত হয়েছে। জননী যশোদার ঐশ্বর্যভাব বিমুক্ত যে নিবিড় বাৎসল্য পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রকাশ পেয়েছে, এই শ্লোকটি যেন তারই পূর্ববর্তী কাব্যরূপ। বিনিদ্র দুরন্ত শিশু কৃষ্ণের নিদ্রাকর্ষণের জন্য জননী তাকে

শোনাচ্ছেন রামচন্দ্রের কথা। এবং তাতে শিশুকৃষ্ণের মুখে দেখা দিয়েছে স্মিতহাস্য। নিজের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে কৃষ্ণ এখানে সচেতন হলেও জননী যশোদা মানবী মাতার মোহেই আবদ্ধ। তাঁর বাৎসল্যের স্ফুরণ অকৃত্রিম।

এই ধরনের আর একটি পদে দেখি, জননী যশোদা পুত্র কৃষ্ণকে বলেছেন হিংস্র জন্তুর সামনে পড়লে পুরাণপুরুষ নারায়ণকে স্মরণ করতে। মায়ের কথা শুনে কৃষ্ণ অধর দংশন করে মৃদু হাস্য করলেন।[৪৭] এটিও অনুরূপ ভাব প্রকাশক। এই শ্লোকটি নবম শতাব্দীতে অভিনন্দ কর্তৃক রচিত। অভিনবগুপ্ত তাঁর লোচনে এটিকে উদ্ধৃত করেছেন। পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীতে অনুরূপ ভাবের পদেও দেখি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ঐশ্বর্যভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।[৪৮]

একটি পদে গোচারণ থেকে প্রত্যাবৃত্ত কৃষ্ণের একটি মধুর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।[৪৯] তিনি 'শ্রান্তোঽপি রম্যাকৃতিঃ' এবং সেই কারণে 'গোপস্ত্রীনয়নোৎসবঃ'। এই ক্লান্ত অথচ কমনীয় কৃষ্ণের অনুরূপ মনোরম বর্ণনাও সদুক্তিকর্ণামৃতে 'বেণুনাদঃ' অংশে উমাপতিধরের পদে পাচ্ছি। এবং পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীতে বৃন্দাবনলীলা অংশে গোধূলিকালে গোচারণভূমি থেকে ফেরা বেণু বাদনরত, ধূলিধূসর, ম্লান বনমালাধারী কৃষ্ণ দুর্লক্ষ্য নন। অন্য একটি পদেও দেখি ক্রীড়া-গোপালের জীবন্ত চিত্র।[৫০] একটি জঙ্ঘার দ্বারা তাঁর লগুড় বেষ্টিত, গোবর্ধনরজ্জু হয়েছে তাঁর শিরোমাল্য, সমররস গাইতে গাইতে তাঁর নেত্রে স্ফূর্জিত হচ্ছে দর্প।

কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণ তাঁর বৃন্দাবনলীলায় ঐশ্বর্যভাবপ্রকাশক একটি ঘটনা। এই বিষয়ক পদও বর্তমান সংকলনে এবং পরবর্তীকালের সদুক্তিকর্ণামৃতে গৃহীত হয়েছে।[৫১] জননী যশোদার বাৎসল্যজাত ত্রাস, প্রিয়গুণপ্রীতা রাধিকার প্রেমদৃষ্টি, সখাদের সরভস বিলোকন এবং আশঙ্কায়, পুত্রগৌরবে ও সম্ভ্রমজাত বিস্ময়ে মিশ্রিত নন্দের দৃষ্টি—সমস্ত কিছু একসাথে মিশে এই পদ একাধারে বাৎসল্য, সখ্য ও মধুররসের সমন্বয়ে অপূর্ব শিল্পসূক্ষ্মতা লাভ করেছে—যা নিঃসন্দেহে কাব্যসৌকর্যে এবং কৃষ্ণকথার মানবিক আবেদন সমৃদ্ধিতে পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতিশ্রুতি।

সুভাষিতরত্নকোষের একটি শ্লোক পরবর্তীকালে সদুক্তিকর্ণামৃতে 'কৃষ্ণ স্বপ্নায়িতম্' অংশে গৃহীত হয়েছে। রাধার সঙ্গে শায়িত হরি স্বপ্নে রামাবতারে তাঁর জানকি-বিরহের স্মৃতিতে ব্যথিত হয়েছেন এবং কৃষ্ণের স্বপ্নোক্তি শুনে তাঁকে শঙ্কাভরে নিরীক্ষণ করেছেন শ্রীরাধা।[৫২] রামাবতারের স্মৃতি ও রাধার অনুষঙ্গ এই উভয়ের সহযোগে এই শ্লোকটি পৌরাণিক কৃষ্ণের মহিমা ও রাধাপ্রেমের গভীরতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। বিপরীতভাবে পুষ্পাকরচিত অপর একটি শ্লোকেও দেখি রাধাস্মৃতিতে বেদনার্ত হরি 'প্রতপ্তসরল' দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করলে কমলা তাঁকে ঈর্ষাভরে নিরীক্ষণ করেছেন।[৫৩]

অপর একটি পদে দেখি বক্রবচনপটিয়সী শ্রীরাধা দ্বারে দণ্ডায়মান প্রণয় প্রার্থী হরিকে বাক্যবাণে নির্বচনীকৃত করেছেন।[৫৪]

অন্যত্র একটি পদে রয়েছে, রাধাকর্তৃক প্রেরিতা দূতী কৃষ্ণকে সারারাত্রি ধরে পরিচিত লীলাস্থলীসমূহে অন্বেষণ করে এসেছে। কিন্তু ভাণ্ডীরবন, গোবর্ধনগিরি অথবা কালিন্দী কূলের নিভৃত নিকুঞ্জ, কোথাও কৃষ্ণের দর্শন না পেয়ে সে রাধাকে জানিয়েছে, নিশ্চয়ই সেই ধূর্ত অন্য নায়িকার কাছে গেছে।[৫৫]

অন্য একটি শ্লোকে দেখি, রাধাকে নির্জনে পেতে ইচ্ছুক কৃষ্ণ অন্যান্য গোপীদের দুগ্ধ কলস নিয়ে আগে চলে যেতে বলেছেন, রাধা 'শনৈর্যাস্যতি'।[৫৫] এইভাবে বিবিক্তব্রজে রাধার সাথে নিজের নির্বিঘ্ন ক্রীড়ার সুযোগ করে নিয়েছেন। এই ধরনের পদ পরবর্তীকালের সদুক্তিকর্ণামৃতেও রয়েছে।

বিষ্ণুব্রজ্যার সর্বশেষ শ্লোকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমচিত্র অভিনবভাবে অঙ্কিত হয়েছে। রাধার সুবর্ণদ্যুতি-পয়োধরমণ্ডলে নবজলধরশ্যাম শ্রীহরি নিজের প্রতিবিম্ব দেখে কৃষ্ণবস্ত্রের প্রান্ত ভেবে বার বার তা তুলে দিতে চাইলে লজ্জিতা রাধার মুখে হাসি-ফুটে উঠেছে।[৫৭]

বিষ্ণুব্রজ্যা বা হরিব্রজ্যা ছাড়াও এই সংকলনের অসতীব্রজ্যায় আমরা রাধাকৃষ্ণ তথা গোপীকৃষ্ণ লীলাসংক্রান্ত দুটি পদ পাচ্ছি। এর একটি পদে গোপবধূর 'বিলাস-সুহৃদ' ও 'রাধারহঃসাক্ষী' কালিন্দী তীরবর্তী লতাগৃহের কথা বলা হয়েছে।[৫৮] অপর শ্লোকটিতে রাধা অথবা গোপীপ্রসঙ্গ না থাকলেও পদটির উদ্দিষ্ট নায়িকা যে রাধা তা বুঝতে কষ্ট হয় না। বিপর্যস্ত প্রসাধনা রাধাকে দেখে কোন সখী তার কারণ জানতে চাইলে উত্তরে নায়িকা বলে 'অশেষ জনস্রোতের কল্মষনাশী নীলাম্বুজ-ভাসের দ্বারা'। সখী পুনরায় প্রশ্ন করে 'তাহলে কৃষ্ণের দ্বারা।' নায়িকা পুনরায় বলে, 'না, যমুনার দ্বারা'। সখী এর উত্তর যমক অলংকারে দেয় 'বুঝেছি কৃষ্ণেই (যমুনাপক্ষে কালোজল, কৃষ্ণ পক্ষে কালো রঙ) তোমার অনুরাগ'।[৫৯] দুটি পদেই রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার জনপ্রিয় দিককে কাব্যায়িত করা হয়েছে। অসতীব্রজ্যায় এদের স্থান হলো কেন? সাধারণতঃ হরিব্রজ্যায় এই রাধা এবং এই গোপীদের প্রসঙ্গ সংকলিত হয়েছে। কিন্তু হরিব্রজ্যায় সংকলিত হয়েছে বলেই এগুলো যে অপ্রাকৃত দৈবী বিষয় হয়ে যায় নি তার প্রমাণ অসতীব্রজ্যায় ধৃত এই শ্লোকগুলি। ধর্মবিনি-মুক্ত যে সমাজনিষিদ্ধ প্রেমের উত্তপ্ত কামনাময় উল্লাস লোকপ্রচলিত রাধাকৃষ্ণপ্রেমে বহমান ছিল—সংকলয়িতা তাঁর সংকলনে তা মুছে ফেলতে পারেন নি; যদিও ধীরে ধীরে রাধা তখন স্থান করে নিচ্ছিলেন ধর্মীয় পরিমণ্ডলে। পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণ লীলা যখন চরমভাবে ধর্মসাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে, তখন তাতে পরকীয়া ভাবনার যে বিকাশ, গোস্বামিগণ তাকে যতই শাস্ত্রীয় বলে ব্যাখ্যা করুন না কেন—এই উৎস থেকেও তা প্রাণরস সঞ্চয় করেছে। অসতীব্রজ্যায় ধৃত একটি পরকীয়া প্রেমের শ্লোক মহাপ্রভুর প্রিয় ছিল। শ্লোকটি হলো—

> যঃ কৌমারহরঃ স এব চ বরস্তাশ্চন্দ্রগর্ভা নিশাঃ
> প্রোন্মীলন্নবমালতীসুরভয়স্তে তে চ বিন্ধ্যানিলাঃ।
> সা চৈবাস্মি তথাপি ধৈর্যসুরতব্যাপারলীলাভৃতাং
> কিংমে রোধসি বেতসীবনভুবাং চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥[৬০]

যে আমার কৌমার্য হরণ করেছিল সেই-ই আমার বর, সেই চন্দ্রগর্ভ নিশা, সেই প্রস্ফুটিত নবমালতীর সুরভি, সেই মলয় বাতাস এবং সেই আমিও আছি। তবুও (বিবাহ পূর্বকালের পরকীয়া প্রীতিতে) নদীতীরবর্তী বেতসকুঞ্জে যে নিভৃত সুরত-লীলা, তারই জন্য আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হচ্ছে।

রচয়িত্রী শীলভট্টারিকা এতে লৌকিক পরকীয়া প্রেমের তৃষ্ণাকেই রূপায়িত করেছেন। অথচ বিবাহপরবর্তী বৈধ প্রেমের তুলনায় বিবাহপূর্ব পরকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়েছে বলে ভাবোন্মাদ মহাপ্রভু পুরীতে জগন্নাথদেবের রথের সামনে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করে নৃত্য করতেন। এই তথ্যও আমাদের পরকীয়া ভাবনার উৎস-সংক্রান্ত বক্তব্যের পরিপূরক।

সদুক্তিকর্ণামৃত :

'সুভাষিতরত্নকোষ' যে কালে সংকলিত হয়েছে—বাংলা দেশে তার অব্যবহিত পরবর্তীকাল হলো সেন রাজবংশের রাজত্বকাল। এই কালকে বাংলা দেশের সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার সুবর্ণযুগও বলা হয়। এ কালের সাহিত্যসম্পদে কৃষ্ণকথার প্রভাব আলোচনার প্রাক্‌কালে ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ইঙ্গিত সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আগেই আমরা দেখেছি, খ্রীস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে শিল্পে (পাহাড়পুর) ও সাহিত্যে (গাথাসপ্তশতী) কৃষ্ণের ব্রজলীলা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হতে আরম্ভ করেছে। অনুমান করতে পারি, তারও বহুকাল আগে থেকেই লোককথায় ও লোক-সংস্কৃতিতে এর বিচিত্র উপাদান ধীরে ধীরে সঞ্চিত হচ্ছিল। সেন আমলের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সংকলন সুভাষিতরত্নকোষেও তার উজ্জ্বল বিকাশ আমরা লক্ষ্য করলাম। লোককথার ভেতর রাধাকেন্দ্রিক ব্রজলীলা এই অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যে যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল—তেমন কিছু কিছু তথ্যও আমাদের হাতে আছে। যেমন হেমচন্দ্র তাঁর ব্যাকরণের শেষ অংশে বিবিধ সূত্রের উদাহরণ হিসেবে কিছু অবহট্‌ঠ কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। কৃষ্ণের ব্রজপ্রেমলীলাঘটিত তেমনি একটি পুরোনো অবহট্‌ঠ কবিতা হলো—

রাহী দোহাঁড় পঢ়ণ সুণি
হসিউ কণ্হ গোআল।
বৃন্দাবন ঘণ কুঞ্জঘর
চলিউ কমণ রসাল ॥[৩১]

—রাধিকার দোহাটি পড়া শুনে কৃষ্ণ গোপাল হাসলো (আর) বৃন্দাবনের নিবিড় কুঞ্জগৃহে কেমন রসাল (গতিতে) চলে গেল।

অতএব সঙ্গতভাবেই সিদ্ধান্ত করতে পারি, কৃষ্ণকথা বিশেষতঃ রাধা এবং ব্রজকেন্দ্রিক কৃষ্ণকথা, বাংলা দেশের লোকসমাজে সহজভাবেই বিকাশ লাভ করছিল।

সেন আমলের পরবর্তী পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। শুধু তাই নয়, দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলাদেশের বুকে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির মহাপ্লাবনও ইতিহাস-স্বীকৃত তথ্য। ফলে বৌদ্ধ আমলে বাংলা দেশে সনাতন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির ক্রমসংকোচন ঘটেছে স্বাভাবিক কারণেই এবং এ কারণেই হয়তো কৃষ্ণকথাকে সমাজের উচ্চকোটির বিষয় হিসেবে বিকাশলাভ করতে আমরা দেখি নি।

কিন্তু শিব ও বিষ্ণুর উপাসক সেন রাজাদের উত্থান সমাজে বিগতমহিম্ন সনাতন হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী করবে—এটাই স্বাভাবিক। বল্লালসেনের

গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট রচিত 'হারলতা'ও 'পিতৃদয়িতা'; বল্লালসেনের নিজেরই 'ব্রতসাগর', 'আচারসাগর', 'প্রতিষ্ঠাসাগর', 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর'; হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব', 'মীমাংসাসর্বস্ব', 'বৈষ্ণবসর্বস্ব', পণ্ডিতসর্বস্ব এবং হলায়ুধের দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশান ও পশুপতির শ্রাদ্ধ ও প্রাত্যহিক পালনীয় আচার সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সেই একই উদ্দেশ্যে রচিত। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হলো পূর্ববর্তী সেন রাজারা শৈব হলেও লক্ষ্মণ সেন হলেন বৈষ্ণব। কৌলিক উপাস্য দেবতা শিবের পরিবর্তে কৃষ্ণকে গ্রহণ করার পেছনে একটি কারণ নিশ্চয়ই ছিল। আমরা অনুমান করি সেই কারণটি হল, আগে থেকেই কৃষ্ণকথা সাধারণ লোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এই কৃষ্ণকে আশ্রয় করেই সেকালের বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষকে সনাতন ধর্মে উদ্বুদ্ধ করা সহজতম উপায় ছিল। লক্ষ্মণ সেনের বৈষ্ণব হওয়ার পেছনে হয়তো এই সামাজিক শক্তিটি ক্রিয়াশীল হয়েছে। এবং রাজার বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণে সমাজের নিম্নতম কোটি থেকে উচ্চতম কোটি পর্যন্ত কৃষ্ণকথার ব্যাপ্তি প্রসারিত হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলার মাটিতে দীর্ঘদিনের বদ্ধমূল বৌদ্ধধর্মকেও এই কৃষ্ণ আত্মসাৎ করেছে। এযুগের কৃষ্ণকথাকোবিদ্‌ জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রে কৃষ্ণের বৌদ্ধধর্ম আত্মসাতের একটি তাৎপর্যময় ইংগিত আছে—'কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর, জয় জগদীশ হরে'। মোটকথা, সমাজের সাধারণ স্তর থেকে আরম্ভ করে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত এবং হিন্দু-বৌদ্ধ নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালীর ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক চেতনা সেন আমলে কৃষ্ণকথাকেই আশ্রয় করেছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাজসভার কবিরাও কৃষ্ণকথা নিয়ে কাব্য কবিতা রচনা শুরু করলেন। স্বয়ং রাজা লক্ষ্মণসেন এবং রাজপুত্র কেশব সেনও কৃষ্ণলীলা অবলম্বন করে কবিতা লিখলেন। কৃষ্ণকথার এই সর্বব্যাপ্ত বিকাশের আসরেই ভবিষ্যৎ সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল।

পরবর্তীকালে তুর্কী আক্রমণের আঘাতে আহত বাঙালী প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে উচ্চনীচভেদরহিত যে সাংস্কৃতিক-সংশ্লেষ গাঢ়তর করতে বাধ্য হয়েছিল, মধ্যযুগীয় সাহিত্য যার নিদর্শন, তার পীঠভূমি কিন্তু রচিত হয়েছিল সেন আমলেই এবং এই কারণেই হয়তো তুর্কী আক্রমণোত্তর কালের প্রথম যে বাংলা কাব্যটি আমাদের হাতে এসেছে তার নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে সেন আমলের এবং তৎপরবর্তীকালীন অন্য কিছু সাহিত্যে কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে।

লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্তচূড়ামণি বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস এই সময়ে সংকলন করেন সদুক্তিকর্ণামৃত। এটি একটি আশ্চর্য সংকলনগ্রন্থ। তৎকালীন সংস্কৃতির কবিত্বময় বহু বিচিত্র প্রকাশ এখানে বিধৃত।

এই সংকলনগ্রন্থের শ্লোকগুলি পাঁচটি প্রবাহে বিভক্ত—

(১) অমরপ্রবাহ (২) শৃঙ্গারপ্রবাহ (৩) চাটুপ্রবাহ (৪) অপদেশপ্রবাহ ও (৫) উচ্চাবচপ্রবাহ।

অমরপ্রবাহে দেবদেবীসম্বন্ধীয় পদগুলি রয়েছে। আমাদের আলোচ্য কৃষ্ণকথা এরই একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে।

শৃঙ্গারপ্রবাহে প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমের বিভিন্ন স্তর সংক্রান্ত পদ সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

চাটুপ্রবাহে রয়েছে রাজপ্রশস্তি বিষয়ক পদ। অপদেশপ্রবাহেও উচ্চাবচপ্রবাহে বিভিন্ন বিষয়ক পদ সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

অমরপ্রবাহে শিব, কৃষ্ণ এবং অন্যান্য দেবতার লীলাসংক্রান্ত পদ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কৃষ্ণের বিভিন্ন অবতাররূপ এবং তার বাল্য ও যৌবনলীলার বিভিন্ন কবিরচিত পদ এখানে ক্রম অনুসারে সাজানো রয়েছে। শ্রীধরদাস "অমরপ্রবাহবীচয়ঃ"-এর প্রারম্ভেই তার বিষয়বস্তু বলে দিয়েছেন।[৬২]

অমরপ্রবাহে কৃষ্ণকথার এই বিচিত্র বিষয়বস্তুর দিকে তাকিয়ে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি। যেমন—গীতগোবিন্দের অন্তর্গত সর্বভারতীয়, দশাবতার স্তোত্র রচনার পেছনে লক্ষ্মণসেনের সভার অন্যান্য কবিদেরও অবদান আছে। এবং কৃষ্ণলীলা কথাকে আমরা এখানে ধারাবাহিক ভাবে পাচ্ছি।

সদুক্তিকর্ণামৃতে কেবলমাত্র সেনরাজসভার কবিদের অথবা সমকালীন কবিদের কবিতাই সংকলিত হয় নি। সেন রাজসভার বাইরের বহু কবির এবং পূর্ববর্তী যুগের কবিদের পদও সংকলিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সংকলন সুভাষিতরত্নকোষের কিছু কিছু পদও এখানে পাওয়া যায়—সেকথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু সবাই সমকালীন না হলেও, সংকলয়িতা যেখানে বসে যাঁদের কবিতা সংকলন করেছেন—তাঁদের অধিকাংশই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে Contemporary air-কেই প্রতিফলিত করেছেন। অর্থাৎ রাজসভার শৃঙ্গারানুকূল পরিবেশে এটি হয়ে উঠেছে প্রধানতঃ শৃঙ্গার-রসাত্মক কাব্য সংকলন। যখন বাস্তবকে আশ্রয় করে শৃঙ্গার প্রকাশ পেয়েছে—তখন তা লৌকিক। আর সনাতন ধর্মকথার দুই কথাবস্তু—শিবকথা এবং কৃষ্ণকথাকেও শৃঙ্গার আশ্রয় করেছে। এই প্রসঙ্গে আমরা প্রথমে সদুক্তিকর্ণামৃতের অন্যান্য কবি-কৃতি আলোচনা করে পরে সেন-রাজসভার কবিদের কথা আলোচনা করছি।

অবতার বন্দনাবিষয়ক পদের মধ্যে আছে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, নরসিংহ-নখাঃ, শৃঙ্গারিনরসিংহ, বামন, ত্রিবিক্রম, পরশুরাম, শ্রীরাম, বিরহী শ্রীরাম, হলধর, বুদ্ধ ও কল্কী।

এই অবতার বন্দনা বিষয়ক পদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি, সরাসরি শৃঙ্গার-রসাত্মক কিছু কিছু পদসংযোজন এবং প্রিয়াবিরহী শ্রীরামের বর্ণনায় কবিরা শৃঙ্গার-রসপ্রবণতারই পরিচয় দিয়েছেন।

সংকলয়িতা শ্রীধরদাস বিভিন্ন কবি-রচিত কৃষ্ণশৈশবের পদও সমাহরণ করেছেন। এই পদগুলিতে ভাগবতের অনুরূপ বালক কৃষ্ণের মৃত্তিকাভক্ষণ, এবং শিশু-কৃষ্ণের মুখে জননী যশোদার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডদর্শন অর্থাৎ বাৎসল্য রসাত্মক পদে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব প্রকাশিত হয়েছে। দিবাকর দত্তের একটি পদে দেখি রোরুদ্যমান শিশু-কৃষ্ণকে কোনও এক গোপিনী বক্ষে ধারণ করলে কৃষ্ণ নিভৃত পুলক অনুভব করেছেন।[৬৩] এখানে কৃষ্ণের শৈশবলীলায়ও ঘটেছে আদিরসের স্ফুরণ। বনমালীর পদে 'অমৃতলেহন'-চ্ছলে 'ন্যস্তাঙ্গুলিস্বাননে'-বালক কৃষ্ণের বর্ণনা বড় মনোরম।[৬৪] কৃষ্ণ-শৈশবের পদগুলিতে কৃষ্ণের মাধুর্য ও ঐশ্বর্যভাব তুল্যভাবেই প্রকাশিত।

অজ্ঞাতনামা কোনও এক কবির পদে শিশু-কৃষ্ণকে দেখি জননী যশোদার করতালির সঙ্গে নৃত্য করতে। কিন্তু এখানেও যশোদা পুত্রকে 'দেব' সম্বোধন করেছেন। কৃষ্ণ-শৈশবের পদগুলিতে তাই কৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য ভাবের সঙ্গে জননীর বাৎসল্য ও বিস্ময় প্রায় সমপরিমাণেই মিশ্রিত—যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীতে জননী যশোদার সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যবিস্মৃতিকে, সচেতন করিয়ে দেয় এই কবিদের পৌরাণিক ঐতিহ্য সচেতনতাকে।

'কৃষ্ণকৌমারম্' অংশে অভিনন্দ ও শতানন্দের পদ[৬৫] দুটি পূর্বেই সুভাষিত রত্ন-কোষে সংকলিত হয়েছে এবং ওই প্রসঙ্গেই তা আলোচিতও হয়েছে। একজন অজ্ঞাতনামা কবির রচিত শতানন্দ ও অভিনন্দের অনুরূপ একটি পদ পাওয়া যায়।[৬৬] আর এক অজ্ঞাতনামার পদে দেখি যশোদার দধিমন্থন দেখে কৃষ্ণের 'ক্ষীরাব্ধিমন্থনজাতহাসো।[৬৭]

পরবর্তী কৃষ্ণলীলান্তর 'কৃষ্ণস্বপ্নায়িতম্' অংশেও ঐশ্বর্যময় বিরাট পুরুষ ভগবানের স্বরূপ-বিস্মৃত জননী যশোদার স্নেহশঙ্কাতুর মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য উৎসারিত।[৬৮] সুভাষিতরত্নকোষ থেকে সংকলিত সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি পদে কৃষ্ণ স্বপ্নে সীতাবিরহ-স্মৃতিতে আক্রান্ত। অনুরূপভাবে বিরিঞ্চির পদেও স্বপ্নে কৃষ্ণের মনে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে। অপর এক অজ্ঞাতনামার পদে কমলা কর্তৃক আলিঙ্গিত কৃষ্ণ স্বপ্নে মানিনী রাধার মান ভঞ্জন করেছেন। রাধাপ্রেমের উৎকর্ষই এখানে সূচিত হয়েছে।[৬৯] এখানেও দেখছি সুদূর দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কালেই অন্যান্য নায়িকাদের তুলনায় রাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত।

পরবর্তী পর্যায় 'কৃষ্ণযৌবনম্'-এর পদগুলিতে সদ্যযৌবন প্রাপ্ত কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা এবং অন্যান্য গোপিনীদের লীলাপ্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। তারই সঙ্গে মিশে আছে জননী যশোদার স্নিগ্ধবাৎসল্য। কৃষ্ণ এখানে 'যশোদাভয়াদভ্যর্নেম্বর্তিনির্জনেষু যমুনারোধো লতাবেশ্মষু' রাধার সঙ্গে মিলিত হন। হরিক্রীড়ায় লক্ষ্মণসেন ও উমাপতিধরের দুটি পদ ছাড়া আচার্য গোপীকেরও একটি কৌতুকরসোজ্জ্বল পদ রয়েছে। কোকিলের শব্দে কৃষ্ণ সংকেত করলেন। অর্গলমুক্ত করার সময় রাধার বলয় শিঞ্জনে জেগে জরতী 'কে কে' বলে উঠলে রাধাকৃষ্ণের মিলন আর সম্ভব হলো না। প্রাঙ্গণ পার্শ্বের বৃক্ষতলে লুক্কায়িত অবস্থায় কৃষ্ণকে রাত্রিযাপন করতে হলো।[৭০] গোপীকের এই শ্লোকটিই প্রমাণ করে দেয় রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জরতী (বড়ায়ি) চরিত্রটি বড়ু চণ্ডীদাসের মৌলিক সৃষ্টি নয়। অন্ততঃ দ্বাদশ শতাব্দীতেই এটি কৃষ্ণকথার একটি বিশিষ্ট চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লক্ষ্মণ সেনের পদে উল্লিখিত বৃন্দার চরিত্রটিও অনুরূপভাবেই প্রাচীন।[৭১] রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার সহকারী এই পার্শ্বচরিত্রগুলির উল্লেখ প্রাচীন পুরাণসমূহে নেই। সম্পূর্ণভাবে লৌকিক উপাদান থেকেই এগুলি আহৃত। পৌরাণিক কৃষ্ণকথার পাশাপাশি আর একটি সুপ্রাচীন লৌকিক কৃষ্ণকথার প্রবহমানতার পরিচয় এখানে সুস্পষ্ট। দ্বাদশ শতাব্দীর সংকলন সদুক্তিকর্ণামৃতের এই শ্লোকগুলিতে সেই দুই ধারার মিশ্রণের পরিচয়ও মুদ্রিত।

'বেণুনাদ' অংশে সেন রাজসভার বাইরের তিনজন কবির পদ রয়েছে। নাথোকের শ্লোকে কৃষ্ণকে 'রাধাধব' অর্থাৎ রাধার স্বামী বলা হয়েছে।[৭২] প্রাচীন তামিল কাব্য

'শিলপ্পদিকারম্'-এও কৃষ্ণকে 'নাপ্পিন্নাই' বা রাধার স্বামী বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু নাথোকের পদের এই দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও আমরা লক্ষ্মণ সেন ও কেশব সেনের পদে রাধাকে কৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকা রূপেই দেখি। পরবর্তীকালের বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যেও রাধা পরকীয়া নায়িকা হিসেবেই গৃহীত। অবশ্য জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাধা স্বকীয়া অথবা পরকীয়া, তার কোন স্পষ্ট মীমাংসা নেই।

গীত অংশের পাঁচটি শ্লোকের মধ্যে তিনটি শ্লোক অজ্ঞাতনামার। অন্য দুটি যথাক্রমে উদ্ভট ও যোগেশ্বরের। কৃষ্ণ বিরহে সন্তাপিতা গোপীদের ও রাধার যে নিবিড় গভীর বিরহ বেদনা পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যের একটি বিরাট রসোত্তীর্ণ অংশ, অধিকার করে আছে—এখানে তারই পূর্বাভাষ। এদের মধ্যে একটি শ্লোকে দেখি, কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলে 'গদ্‌গদ্‌গলত্তার স্বরে' রাধার করুণ গান শুনে কালিন্দীর জলচরেরাও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে।[৭৩] এই শ্লোকটি যে বহু প্রাচীন তার প্রমাণ আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোকে, কুন্তকের বক্রোক্তিজীবিতে এবং হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসনের উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায়।[৭৪]

কৃষ্ণভুজ বর্ণনায় সেনরাজসভার কবিদের মধ্যে জয়দেবের একটি পদ রয়েছে। বাকী চারটি পদ অন্য কবিদের রচনা। এই পদগুলিতে কৃষ্ণের বাহুবলের সঙ্গে তাঁর বাহুর ললিত শোভাও বর্ণিত হয়েছে। শুভাঙ্গের পদে একই সঙ্গে গোবর্ধনধারী ও 'ব্রজবধূলীলোপাধান' কৃষ্ণবাহুকে বন্দনা করা হয়েছে।[৭৫] ব্যাসপাদ চতুর্ভুজ বিষ্ণুর 'শার্ঙ্গর্জ্যাঘাত কর্কশাঃ' বাহুর বন্দনা করেছেন।[৭৬] এই পর্যায়ে ভগীরথের শ্লোকটি সুভাষিতরত্নকোষ থেকে উদ্ধৃত।

গোবর্দ্ধনোদ্ধারের পদগুলি যথাক্রমে সোল্লোক, শতানন্দ, শঙ্কর ও দুই অজ্ঞাত-নামার রচিত। এই পদগুলিতে কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণের সঙ্গে বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রস মিশ্রিত। পূর্ববর্তী সঙ্কলন 'সুভাষিতরত্নকোষ' সম্পর্কে আলোচনায় এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

উৎকণ্ঠার পদগুলিতে কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার তথা রাধা ও গোপিপ্রেমের উৎকর্ষ বর্ণিত হয়েছে। সেনরাজসভার কবিদের প্রসঙ্গেই এই পদগুলি আলোচিত হবে। কারণ এতে উমাপতিধর ও শরণেরও দুটি পদ রয়েছে।

'গোপীসন্দেশঃ' অংশে নীল, নমোঽস্মিতাঃ, পুংসোক, পঞ্চতন্ত্র, বীরসরস্বতী ও একজন অজ্ঞাতনামার পদ আছে। কৃষ্ণের মথুরা গমনের পর ব্রজবল্লবীদের বেদনায় এই পদগুলি বিধুর। পরবর্তীকালের মাথুর বিষয়ক পদাবলীর সূত্রপাত এখানেই। দ্বারাবতী-যাত্রী পান্থকে ডেকে 'স্মরমোহমন্ত্রবিবশা' গোপিনীরা কৃষ্ণের কাছে সংবাদ পাঠাতে চেয়েছেন নানাভাবে। পুংসোকের পদে দেখি বিরহিণী রাধা কৃষ্ণকে পত্র লিখতে গিয়ে পত্রের বয়ান নিয়েই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। বীরসরস্বতীর পদ সংক্ষিপ্ত হয়েও বেদনা বিদ্যুৎদীপ্ত। বিরহিনী গোপিনীরা মথুরাপথিকের হাতে কৃষ্ণের কাছে সংবাদ পাঠাচ্ছে; পুনরায় যমুনা নদীতে বিষজ্বালা দেখা দিয়েছে।

পরবর্তী দুটি পর্যায় 'সামান্যহরিঃ' ও 'হরিভক্তিঃ'। এগুলি নিতান্তই হরিবন্দনা। কৃষ্ণকথার সঙ্গে এর বিশেষ যোগ নেই। শৃঙ্গার-প্রবাহের দিবাভিসারিকা অংশে

গোপীকের একটি শ্লোকে অভিসারিকা রাধার তাপক্লিষ্ট চরণ ও সেই চরণের ক্লেশ দূরীকরণে প্রেমিক কৃষ্ণের প্রয়াস বর্ণিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি অনুমানের কথাও উল্লেখ করি। শৃঙ্গারপ্রবাহের অন্যান্য অভিসারবিষয়ক পদে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ না থাকলেও পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীর অভিসারবিষয়ক পদে এই পদগুলির গভীর প্রভাব পড়েছে।

এছাড়াও 'অপদেশ' প্রবাহের 'বাসুদেবঃ' অংশের পাঁচটি শ্লোকে দশাবতারের কয়েকটি অবতারের বর্ণনা রয়েছে। এই পদগুলির মধ্যে শরণের পদ শিল্পসৌন্দর্যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সদুক্তিকর্ণামৃত আলোচনায় এবার সেন রাজসভার কবিদের কথা। প্রাসঙ্গিকভাবে কবিদের অন্য রচনার কথাও আমরা এখানেই উত্থাপন করছি।

উমাপতিধর ঃ লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় পঞ্চরত্নের অন্যতম রত্ন উমাপতিধরের কাব্য দিয়েই আমাদের এই প্রসঙ্গ শুরু করি। তাঁর কোনও পূর্ণাঙ্গ কাব্য আমরা পাই নি। প্রশস্তি ও প্রকীর্ণ কবিতাতেই তাঁর কাব্য-প্রতিভার দীপ্তি বিকীর্ণ। সমকালীন সংকলন 'সদুক্তি কর্ণামৃত' ছাড়া কল্‌হণের 'সূক্তিমুক্তাবলী' এবং রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলীতে'ও তাঁর শ্লোক গৃহীত হয়েছে। উমাপতিধরের কাব্যপ্রতিভা জয়দেবের কথায় পল্লবিত বাক্যবয়ন পটুতায় সিদ্ধ।[৭৭] কিন্তু আত্মবিচারে তিনি 'পদ পদার্থ বিচার শুদ্ধবুদ্ধি'।[৭৮] সমকালীন রাজসভার রুচিরঞ্জক উমাপতি শিবকথা ও কৃষ্ণকথাকেই তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় বসে যিনি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ রচনা করেছেন, পুরাণ বর্ণিত কৃষ্ণকথার সঙ্গে তাঁর অপরিচয় থাকার কথা নয়, এটি সহজেই অনুমেয়। এই পুরাণসমূহের বৃন্দাবনলীলা ও দ্বারকাপ্রসঙ্গকেই উমাপতিধর এবং অন্যান্য কবিরাও কাব্যবিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হলো, 'রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিত' দ্বারকার মন্দির অপেক্ষা কালিন্দী যমুনা বিধৌত বৃন্দাবনের 'বানীরকুঞ্জ'কে এঁরা অনেক বেশী প্রেক্ষণীয় কাব্যবিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। চৈতন্যব্যক্তিত্বের অসাধারণ মাধুর্যনিষেকেই যে রাতারাতি মাধুর্য গুণসম্পন্ন কৃষ্ণকথার উদ্ভব ঘটে নি—একথার ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমি এখানেই। বাঙালী জীবনচেতনার গভীর গভীরতর উৎস থেকেই এটি সঞ্জাত।

ঐশ্বর্যদ্যুতিউদ্ভাসিত দ্বারকায় প্রবলপ্রেমপরায়ণ রুক্মিণীর গাঢ় আলিঙ্গন কৃষ্ণের স্মরণে এনে দিয়েছে যমুনাতীরের বেতসকুঞ্জে আভীরবধূর সঙ্গে তাঁর কেলি মুহূর্তকে।[৭৯] তাঁর আর এক শ্লোকে, দ্বারকাপ্রাসাদে রুক্মিণীর পাশে নিদ্রিত কৃষ্ণ স্বপ্নে রাধাপ্রেমের স্মৃতিতে ব্যাকুল।বহুবল্লভ কৃষ্ণ সানুনয়ে রাধার কাছে নিজের দোষস্খালনের পূর্বঘটনাকে স্বপ্নে রোমন্থন করেছেন। শুধু রুক্মিণী নয়,অন্যান্য নারীর তুলনায়ও রাধার প্রেম কৃষ্ণের বহু কাঙ্ক্ষিত। যে কৃষ্ণ অপর নারীদের 'ভ্রূবল্লীবলন', 'নয়নোন্মেষ' এবং 'স্মিতজ্যোৎস্নাবিচ্ছুরণ'কে অবহেলায় উপেক্ষা করেন, 'গর্বোদ্ভেদকৃতাবহেলললিত' রাধার আননে তাঁরই সাতঙ্ক ও সানুনয় দৃষ্টি পতিত হয়।[৮০] এখানেও সেই মানময়ী রাধার শ্রেষ্ঠত্ব। কমলা, রুক্মিণী, সত্যভামা ও সাধারণ গোপিনীদের তুলনায় রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা—

শ্রীরূপ গোস্বামীর বহুকাল আগেই বাংলাদেশের কৃষ্ণকথায় এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার অন্যান্য নানা প্রসঙ্গও উমাপতিধরের কতগুলি শ্লোকে অনায়াস কবিত্বে উদ্ভাসিত। চতুর ছলনাময় কৃষ্ণ এবং গোপজাতির বৃত্তি গোচারণে পটু গোপবালকসহচর নয়নাভিরাম কৃষ্ণের নানা রূপে এই বৃন্দাবনী প্রেমলীলা মৃত্তিকালগ্ন মানবের একান্ত কাছাকাছি। উমাপতির একটি শ্লোকে সেই কেলিগোপালের মনোরম মূর্ত্তি অঙ্কিত। সন্ধ্যাবেলায় গাভীরা ফিরে আসে তাঁরই ডাকা সংকেত নামে। তাঁর মোহন বেণুধ্বনি মুগ্ধ করে গোপনারীদের মন—আর চারপাশে ভীড় করে দাঁড়ায় বৃন্দাবনের হরিণীরা।[৮১] অন্য এক শ্লোকে পিতা নন্দের সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিয়ে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের যে গোপন প্রণয়, তারই একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন কবি। চতুর কৃষ্ণের গোপন প্রণয় ও নন্দের পিতৃহৃদয়ের উৎকণ্ঠায় এখানে বাৎসল্য ও শৃঙ্গার-রসের মিশ্রণ ঘটেছে।[৮২] আবার কখনও বা নাগর কৃষ্ণ ছলনাবাক্যে প্রতারিত করেছেন গোপসখাদের। আভীরবধূর সঙ্গে নিরুপদ্রবে ক্রীড়া করার জন্য যমুনার জলে কুমীর আর বৃন্দাবনের পাহাড়ে বাঘের ভয় দেখিয়ে তাদের বৃন্দাবন ত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন।[৮৩] রাধা ও গোপীপ্রসঙ্গ ছাড়াও সখ্যরসের ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায় এখানে।

শরণ ঃ লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় কৃষ্ণকথার আর এক রূপকার কবি শরণ। কোনও কাব্যগ্রন্থ পাওয়া না গেলেও 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ও 'পদ্যাবলী'তে উদ্ধৃত শ্লোকেই এঁর কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। 'দুর্ঘটবৃত্তি'র রচনাকার শরণ জয়দেবের ভাষায় 'শ্লাঘ্য দুরূহদ্রুতে'।[৮৪] বাস্তব বিষয় ও রাজপ্রশস্তি নিয়ে রচিত শ্লোক ছাড়াও শরণের রচনায় কৃষ্ণকথার প্রেক্ষণীয় ও উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

শরণের কৃষ্ণকথা বিষয়ক শ্লোকসমূহে রুক্মিনী অনুপস্থিত কিন্তু দ্বারকা নয়। তাঁর দ্বারকাধিপতি প্রতপ্ত চিত্তে স্মরণ করেছে অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা বৃন্দাবনের পটভূমিকায় প্রথমাভিসারিকা শ্রীমতী রাধাকে। এখানেও সেই বৃন্দাবনের কৃষ্ণই কবির প্রিয়তম। তাই 'দ্বারবতীপতি' হয়েও তিনি 'দামোদর'।[৮৫] 'কুবলয়দল-স্নিগ্ধমধুরা' কালিন্দীর কুলে এসে তাঁর মনে পড়েছে 'সরভসসতৃষ্ণ' মুরারির কথা। এই নদীরই কূলে একদা তাঁর দিন কাটতো 'গোপীনিধুবনবিনোদন' করে। কবিমানসের নিত্য বৃন্দাবনে যে লীলামাধুরীর নিত্য নব উদ্ভাসন, তারই আলোকে এই স্মৃতি-চারণা মধুময়।[৮৬] কবির একটি পদে দুগ্ধদোহনরত দামোদর ও তাঁর পার্শ্বস্থিত এক গোপনারীর চমৎকার জীবন্ত বর্ণনা রয়েছে। সেই গোপনারী সকৌতুকে দেখেছে 'সদ্যঃ পয়োবিন্দু'তে আর্দ্র কৃষ্ণের অমল অঞ্চল, শুনেছে তাঁর 'জানুদ্বয়মধ্যমন্দ্রিত' 'ঘটিবক্ত্রা-ন্তরালস্খলদ্ধারা'র মনোহর ধ্বনি। আর এক অন্তরালবর্তিনীকে সম্বোধন করে সে এই দৃশ্যের বর্ণনা দিচ্ছে।[৮৭] দুগ্ধদোহনরত দামোদরের এমন জীবন্ত ভাষাচিত্র পরবর্তী-কালের পদাবলীসাহিত্যেও দুর্লভ। কৃষ্ণলীলাকথায় বৃন্দাবনলীলার আপেক্ষিক উৎকর্ষ এই কবিদের কাব্যে বারংবার প্রকাশিত। শরণেরই আর একটি পদে কৃষ্ণ মনে মনে ব্রজবালাদেরই স্মরণ করেছেন। জ্যোৎস্নালোক তাঁর কাছে অসহ্য, লীলাকমলে তিনি অনিচ্ছুক, মৃগনয়না নারীদের মধুরালাপে তিনি অপরিতৃপ্ত।[৮৮] দ্বারকার অনুল্লেখে বুঝতে পারি—এই ক্লিষ্ট কৃষ্ণ দ্বারকারই অধিপতি।

কৃষ্ণের বাল্যকালীন নানা পরাক্রম-কাহিনী সাহিত্যেই শুধু নয়, শিল্পে, স্থাপত্যেও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ আলোচনা আমরা আগেই করেছি। শরণেরও একটি শ্লোকে কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণের পরিচিত ঘটনাকে রূপ দেওয়া হয়েছে। ইন্দ্রের প্রতিকূলতা থেকে বৃন্দাবনকে রক্ষা করতে গিয়ে কৃষ্ণ সাতদিন গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। সমবেত গোপগণ তাঁর ক্লেশ কিঞ্চিৎ অপনোদনের জন্য কিছুক্ষণ এই ভার বহন করতে চেয়ে কর প্রসারিত করলো। কিন্তু কৃষ্ণ সামান্য ভার শ্লথ করাতেই তারা কাতর হয়ে পড়লে কৃষ্ণের মুখে দেখা দিল স্মিত হাস্য।[৮৯]

রাধাপ্রেমের নিবিড় গভীরতা ও তার বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ কৃষ্ণকথার উজ্জ্বলতম অংশ। সেই রাধাপ্রেমের বিভিন্ন পর্যায় ও তার নিবিড় গভীরতা জয়দেবের গীতগোবিন্দে তো বটেই, অন্যান্য কবিদের শ্লোকেও যে বিকাশলাভ করেছিল তার উদাহরণ আমরা পেয়েছি। শরণের একটি শ্লোকে সেই অনবদ্য রাধাপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।[৯০] এই শ্লোকেরই ভাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভাগবতের ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তারে করে দ্বিনয়ন,
বিধি হইয়া হেন অবিচার।[৯১]

গোবর্ধন ঃ শরণের পর সেন রাজসভার অন্যতম কবি-রত্ন গোবর্ধনের কৃষ্ণকথা বিষয়ক পদ আমাদের আলোচ্য। একটি প্রচলিত শ্লোকে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার যে পঞ্চকবিরত্নের নামোল্লেখ করা হয়েছে তার প্রথমেই রয়েছে গোবর্ধনের নাম।[৯২] এছাড়া জয়দেবের ভাষায়ও কবি 'শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়' রচনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হালের গাথাসপ্তশতীর অনুকরণে গোবর্ধনের নিজস্ব প্রকীর্ণ কবিতা-সঙ্কলন আর্যা-সপ্তশতীর সর্বত্রও এই উক্তির দৃঢ় সমর্থন পাওয়া যায়।

আমাদের আলোচ্য কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে এইটুকুই বলা যায়, সমকালীনদের মত তিনিও অবতারপ্রসঙ্গ এনেছেন তাঁর গ্রন্থারম্ভব্রজ্যায়। জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রের বাইরে কবি হয়গ্রীবরূপী ও শেষনাগরূপী হরির বন্দনা করেছেন। আর্যাসপ্তশতীর গ্রন্থারম্ভ-ব্রজ্যায় বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর বন্দনামূলক শ্লোকগুলি এই দেবদম্পতির উগ্র কামগন্ধী প্রেমলীলার রক্তরাগে অনুরঞ্জিত। কিন্তু বিষ্ণু-লক্ষ্মীর পুরাণমন্ডল থেকে আহৃত প্রেমের চেয়েও গোবর্ধনের আর্যাসপ্তশতীতে গোপীপ্রেম ও রাধাপ্রেম এক সমুন্নত মহিমা লাভ করেছে। এতে গোপীপ্রেমবিষয়ক সাতটি ও রাধাপ্রেম বিষয়ক পাঁচটি শ্লোক পাওয়া যায়।

আর্যাসপ্তশতীর গোপিনীরা দধিমন্থনজনিত ক্লান্তির মধ্যেও কান্ত-কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে।[৯৩] গোবর্ধনধারী কৃষ্ণের বক্ষোভারও তারাই প্রেমালিঙ্গনের সময় গ্রহণ করেছে। এই গর্বেই গোপিনীরা রোমাঞ্চিতা।[৯৪] আবার কৃষ্ণের বাঁশীর ধ্বনিও ব্যাকুল করে তোলে গোপিনীদের মন।[৯৫] এই ব্যাকুলতা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় পরবর্তীকালের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাকে। সেই সুতীব্র আর্তি, এবং যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয়ানুভূতির কূলপ্লাবী উৎসারের পূর্বসূচনা যেন গোপিনীদের এই ব্যাকুলতায়। সরলা গ্রাম্য আভীর রমণীর যে প্রেম সামাজিক বিধিনিষেধ ও গুরুজনের রক্তচক্ষুর শাসনকেও এখানে গ্রাহ্য করে নি, তা অনেকটাই যেন ভাগবতীয় প্রেমের প্রতিচ্ছবি। এই প্রেম নিশ্চপল, সংযত ও ভাবগম্ভীর।

গোপীপ্রেম ছাড়াও আর্যাসপ্তশতীর কবি মাত্র পাঁচটি শ্লোকে রাধার যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন, তাতেই সকল কৃষ্ণপ্রণয়িনীর তুলনায় বৃন্দাবনেশ্বরী রাধার অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রেমগভীরতা প্রকাশিত হয়েছে। রাধাচরিত্রেরও একটি উজ্জ্বল, পূর্ণ পরিচয় কবি পাঠকের সামনে রেখেছেন। তাঁর রাধা অভিমানিনী, কিন্তু তাঁর অভিমান উচ্ছ্বসিত,-অশ্রুজলে অথবা ক্রোধের বহিঃপ্রকাশে ব্যক্ত নয়। অত্যন্ত চাতুর্যময় বৈদগ্ধ্যের দ্বারা তিনি বহুবল্লভ কৃষ্ণকে লজ্জা দিয়েছেন। আপন কৃষ্ণপ্রেমের ঐকান্তিকতার পাশে কৃষ্ণের বহুচারিতায় ব্যথিতা রাধা, এক পত্নীর অর্ধাংশেই তুষ্ট শিবের কুশল প্রশ্ন প্রসঙ্গে আপন অন্তর্গূঢ় অভিমানকে উন্মোচিত করেছেন।[৯৬] কৃষ্ণের মস্তক রাজ্যাভিষেকের জন্য তীর্থবারিতে প্রক্ষালিত হয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে 'গর্বভর মন্থরাক্ষী' রাধা শুধু একবার নিজের 'পদপঙ্কজে' দৃষ্টিপাত করেছেন, যেখানে পূর্বে বহুবার কৃষ্ণের মস্তক লুণ্ঠিত হয়েছে। আত্মমর্যাদা ও মূল্যবোধের এই নীরব অথচ পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি গোবর্ধনের রাধাকে মহাভাবময়ী ও গাম্ভীর্যময়ী করে তুলেছে।[৯৭] আর এক শ্লোকে গোপিনীদের সঙ্গে নৃত্যরত কৃষ্ণ চতুর্দিকে কেবল রাধাকেই দেখতে পেয়েছেন।[৯৮] এখানেও সেই রাধারই শ্রেষ্ঠত্ব। অন্য দুটি শ্লোকে বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী ও কৃষ্ণের মস্তকস্থিতা তুলসীর তুলনায় রাধার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে।[৯৯]

আর্যাসপ্তশতী ছাড়া সদুক্তিকর্ণামৃত ও পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত অপর একটি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক শ্লোকও গোবর্ধনের নামে পাওয়া যায়।[১০০] পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার যে পর্যায় বৈষ্ণব পদাবলীতে মাথুর নামে অভিহিত—শ্লোকটি সেই পর্যায়ের। বিরহিণী গোপিনীরা দ্বারকাগামী পান্থকে অনুরোধ করেছে, দেবকিনন্দন কৃষ্ণের কাছে তাদের একটি প্রশ্ন উপস্থাপিত করার জন্য। গোপিনীদের প্রেম তো কৃষ্ণ বিস্মৃত হয়েছেন—কিন্তু সেই প্রেমের পটভূমি 'কেলিকদম্বধূলিপটলৈরালোকশূন্যা' কালিন্দী তটভূমিও কি তিনি বিস্মৃত? বিরহাতুরা গোপিনীদের মর্মযন্ত্রণা প্রকাশক এই শ্লোকের অনুরূপ পদ পরবর্তীকালের বৈষ্ণব সাহিত্যেও বিরল নয়।

ধোয়ী ঃ গোবর্ধনের পর জয়দেব ব্যতিরিক্ত পঞ্চরত্নের এক রত্ন 'কবিক্ষ্মাপতি ধোয়ী'। জয়দেবের মতে ধোয়ী ছিলেন শ্রুতিধর। কিন্তু সদুক্তিকর্ণামৃতে সঙ্কলিত ধোয়ীর নামাঙ্কিত শ্লোক এবং কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে রচিত 'পবনদূত' নামক দূতকাব্যটি শ্রুতিধর ধোয়ীর কাব্য প্রতিভারও পরিচায়ক। সদুক্তিকর্ণামৃতে সংকলিত ধোয়ীর নামাঙ্কিত শ্লোকসমূহে রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কোনো পদ নেই। কিন্তু তাঁর 'পবনদূত' কাব্যের কয়েকটি স্থানে বিষ্ণু-লক্ষ্মী ও রাধাকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গের আভাস পাওয়া যায়। রাজা লক্ষ্মণসেন দিগ্বিজয়ে গেলে দক্ষিণ দেশের গন্ধর্বকন্যা কুবলয়-বতী তাঁর প্রেমপাশে আবদ্ধ হন এবং বিরহযন্ত্রণায় ব্যাকুল হয়ে মলয় বাতাসকে রাজার কাছে দূতরূপে প্রেরণ করেন—এই হ'ল পবনদূত কাব্যের বিষয়বস্তু।

এই কাব্যের চারটি শ্লোকে আমাদের আলোচিতব্য প্রসঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায়। একটি শ্লোকে 'কমলাকেলিকারো মুরারিঃ'র কথা বলা হয়েছে।[১০১] অপর এক শ্লোকে কুবলয়বতীর বিরহতীব্র প্রেমরূপায়ণে কবি যে অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন—তাতে বিশ্বরূপ কৃষ্ণ ও বহুবল্লভ কৃষ্ণের উল্লেখ রয়েছে।[১০২] এখানে শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়েছে

'কৈটভারি'। কবির ঈষৎ পূর্ববর্তী কালিকাপুরাণে (কামরূপে সঙ্কলিত) এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই কৈটভারির প্রসঙ্গ রয়েছে। কাব্যের শেষ ভাগের একটি শ্লোকে কবি জন্মান্তরেও লক্ষ্মীপতির চরণে ভক্তিমান থাকার বিনম্র প্রার্থনা জানিয়েছেন।[১০৩] তবে কাব্যের সমাপ্তি শ্লোকের পূর্বশ্লোকে কবি 'রাধারমণতরুণীকেলিসাক্ষীকদম্বে'র উল্লেখ করেছেন।[১০৪] সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক শ্লোকাবলী রচনা না করলেও কবির ভাবপ্রকাশ ও অলঙ্কার নির্মিতিতে অনিবার্যভাবে সুপ্রচলিত এই ধারাটি স্থান পেয়েছে।

জয়দেব ছাড়া সেন রাজসভায় কৃষ্ণকথার অন্য দুই রূপকার কবি হলেন স্বয়ং রাজা লক্ষ্মণ সেন ও তাঁর পুত্র কেশব সেন। লক্ষ্মণ সেন বিরচিত পদগুলির মধ্যে সদুক্তিকর্ণামৃত ও পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত দুটি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক শ্লোক পাওয়া যায়। একটি শ্লোকে গোপবেশী বিষ্ণুর রূপবন্দনায় কবি বৃন্দাবনবিহারী রাধারমণ কৃষ্ণকে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করেছেন। তাঁর কর্ণভূষণ অংসস্পর্শী, কৃষ্ণকেশপাশ উজ্জ্বল ময়ূর পুচ্ছে শোভিত, ভ্রূলতা কুটিল। শুধু তাই নয়—কবি পর্যবেক্ষণ করেছেন 'গুঞ্জদ্বেণুনিবেশিতাধরপুট', ও 'সাকূত রাধাননন্যস্তামীলিত দৃষ্টি' কৃষ্ণকে।[১০৫] কোনও ঘটনার বর্ণনা তো দূরের কথা—আভাসমাত্র না দিয়েও কেবল বিশ্লেষণের সাহায্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথা এখানে প্রস্ফুটিত। অন্য এক শ্লোকে রাধাকৃষ্ণের গোপন কুঞ্জমিলনের ঘটনা স্নিগ্ধমধুরভাবে বর্ণিত। এক দুগ্ধমুখ গোপশিশু কুঞ্জ থেকে কৃষ্ণের বনমালা কুড়িয়ে এনে তুলে দিয়েছে রাধাকৃষ্ণের হাতে। আর সামান্য এক বালকের কাছেও নিজেদের গোপন মিলনের অনবধানতাজনিত প্রমাণ ধরা পড়ে যাওয়ায় লজ্জিত হয়েছেন রাধাকৃষ্ণ।[১০৬] দুটি শ্লোকেই রাধাকৃষ্ণ ও কুঞ্জবনের ছবি। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই শ্লোকটির শেষ পংক্তি এবং গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের শেষ পংক্তি সাদৃশ্যযুক্ত।

কেবলমাত্র রাজা নয়, রাজনন্দন কেশব সেনের রচনায়ও অনুরূপ অন্ত্যভাণিতা-যুক্ত পদ পাওয়া যায়।[১০৭] অনুমান করা বোধহয় অসঙ্গত হবে না, রাজসভায় সম্ভবতঃ এই ধরনের পদ রচনার প্রতিযোগিতা হতো। উৎসব রাত্রিতে যশোদা কর্তৃক আমন্ত্রিতা রাধাকে গৃহে প্রেরণ করার জন্য যশোদা কৃষ্ণকেই অনুরোধ করেছেন। এই অনুরোধ দুজনের নিভৃত মিলনের সুযোগ করে দিয়েছে। ফলে তাঁদের দৃষ্টি হয়ে উঠেছে 'মধুরস্মেরালস'। কেশব সেনের অপর এক পদে বিষ্ণু-লক্ষ্মীর প্রেম-প্রসঙ্গে অনঙ্গরঙ্গময় বিষ্ণুর অনাবৃত কামনার প্রকাশ সমসাময়িক অন্যান্য কবিদেরই ঐতিহ্যবাহী।[১০৮]

দেখা যাচ্ছে পঞ্চরত্নের মধ্যমণি জয়দেবের গীতগোবিন্দকে বাদ দিলেও লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় অন্যান্য কবিদের রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদগুলি উপেক্ষণীয় নয়। এঁদের রচনায়ও রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার বিভিন্ন পর্যায় নানাভাবে অভিব্যক্ত।[১০৯] শুধু তাই নয়, —পৌরাণিক ও লৌকিক কৃষ্ণকথার সংমিশ্রণে ধারাবাহিক কৃষ্ণকথার নানা ঘটনা ও চরিত্র এই বিচ্ছিন্ন পদগুলিতেও উপস্থিত।

রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর ধারাবাহিকতা সৃষ্টিতে শ্রীধর দাসের কৃতিত্বও নেহাৎ কম নয়। তাঁর সংকলন গ্রন্থের দেব-প্রবাহে কৃষ্ণবিষ্ণুলীলার বিভিন্ন পর্যায়ের ধারাবাহিক সুষ্ঠু

সন্নিবেশ ঘটেছে। কথারম্ভ থেকে কথা বিকাশের একটি পরিণতিতে তিনি বিচ্ছিন্ন শ্লোক-গুলিকে সংবন্ধ করেছেন। এই ধরনের পর্যায়বিভাগে রাধাকৃষ্ণ ও বিষ্ণু-লক্ষ্মীর প্রেমলীলা অধিকতর উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদসঙ্কলনগুলির পর্যায় বিভাগের ভিত্তিও শ্রীধর দাসেরই হাতে প্রাথমিক ভাবে গড়ে উঠেছে।

॥ ৪ ॥

জয়দেব

শ্রীধরদাস বিচ্ছিন্ন কৃষ্ণকথাকে ধারাবাহিকতায় আবন্ধ করেছিলেন। শ্রীধর দাসেরই সমকালীন 'কবিনৃপজয়দেব' সর্বপ্রথম কৃষ্ণকথাকে নিয়ে রচনা করলেন এক অখণ্ড উজ্জ্বল কাব্য, যা আজও পর্যন্ত কৃষ্ণকথা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ গুরুত্বে আলোচিতব্য বিষয়। মধ্যযুগের কবি-সাহিত্যিকেরাও জয়দেবের কাব্যকৃতির অসাধারণ গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। অবশ্য সাহিত্য সমালোচনা বলতে আজকের দিনে আমরা যা বুঝি, মধ্যযুগে তার কোন আদর্শ ছিল না বা প্রচলন ছিল না বলেই জয়দেবকে নিয়ে সুসংবদ্ধ কোন সমালোচনা-নিবন্ধ রচিত হয় নি। কিন্তু জয়দেবের গুরুত্ব মধ্যযুগের কবিসাহিত্যিকগণ যে বুঝেছিলেন তার প্রমাণ আছে। স্বয়ং চৈতন্যদেব জয়দেবের গীতগোবিন্দ আস্বাদন করে পরম তৃপ্তি অনুভব করতেন। এ বিবরণ আমরা পাই কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন চরিতামৃতে—

চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দে ॥[১১০]

বিদ্যাপতিও নিজেকে 'অভিনব জয়দেব' বলে চিহ্নিত করে আত্মশলাঘা অনুভব করেছেন। 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' গোবিন্দদাস এই ভক্ত কবি সম্পর্কে লিখেছেন—

শ্রীজয়দেব কবীশ্বর সুরতরু
যছু পদপল্লবছাহে।
তাপ তাপিত মঝু হৃদয় বিয়াকুল
জুড়াইতে করু অবগাহে ॥[১১১]

বাঙালী কবি ছাড়াও 'ভক্তমাল' গ্রন্থের কবি নাভাজীদাস জয়দেব ও তাঁর গীতগোবিন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে—

জয়দেব কবি নৃপচক্কৈব, খণ্ডমণ্ডলেশ্বর আন কবি।
প্রচুর ভয়ো তিহুঁলোক গীতগোবিন্দ উজাগর ॥[১১২]

অর্থাৎ জয়দেব রাজচক্রবর্তী কবি এবং অন্যান্যরা ভূঞ্যা মাত্র এবং গীতগোবিন্দ ত্রিভুবন উজ্জ্বলকারী কাব্য। জয়দেবের এই দুই প্রশস্তির কোনটিকেই আধুনিকতার মানদণ্ডে সমালোচনা বলা যায় না। এগুলি জয়দেব বন্দনাতেই পর্যবসিত। রঘুনাথ দাস গোস্বামীও গীতগোবিন্দ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"শ্রীগীতগোবিন্দ / গ্রন্থ সুধাময় / বিরচিত মনহর ছন্দ।"[১১৩] গীতগোবিন্দের ছন্দোমাধুর্য মধ্যযুগের পাঠকদেরও

স্বীকৃতি পেয়েছিল—এই পংক্তিটি তারই প্রমাণ। গৌরসুন্দর দাস তাঁর কীর্তনানন্দের সঙ্কলনে গীতগোবিন্দের 'অপরূপ বর্ণনাবন্ধ' অর্থাৎ style এর প্রশংসা করেছেন—

শ্রীজয়দেব কয়ল গীতগোবিন্দ অপরূপ—বর্ণন-বন্ধ।
সাধু রসিকজন সো রস পিবি পিবি পায়ই বড়ই আনন্দ ॥[১১৪]

আধুনিক যুগের প্রারম্ভ থেকেও জয়দেব সাহিত্যিক ও সমালোচকদের আকর্ষণের বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, সুনীতিকুমার, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ শক্তিমান কবি ও সমালোচকবৃন্দ বার বার জয়দেবকে নিজেদের আলোচ্য বিষয় করে তুলেছেন। কিন্তু এঁরা সকলেই আধুনিক কালের, আধুনিক মনের মানুষ। তাই মধ্যযুগের মতো নিছক প্রশস্তি রচনাও এঁদের কারো কাম্যপথ নয়। এঁরা প্রত্যেকে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে জয়দেবের বিভিন্ন দিককে মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগর দেখেছেন জয়দেবের 'রচনা বিষয়ে' 'অসামান্য নৈপুণ্য'। সেই সঙ্গে জয়দেবের 'কবিত্বশক্তি'র অভাববোধও তিনি করেছেন।[১১৫] মধুসূদন তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীর 'জয়দেব' নামক কবিতায় 'গোকুলভবনে'-র প্রেমানুকূল সৌন্দর্যলোকে জয়দেবের সহগামী হতে চেয়েছেন।[১১৬] বিবিধ প্রবন্ধের বঙ্কিমের মতে জয়দেবের 'অন্তঃপ্রকৃতি' অপেক্ষা 'বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য'। অবশ্য জয়দেবের 'মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠ গীতি'র সৌন্দর্যকে বঙ্কিম প্রশংসা করেছেন, কিন্তু নিন্দা করেছেন 'বহিরিন্দ্রিয়ের' আনুগত্যকে।[১১৭] 'কৃষ্ণচরিত্রে'ও বঙ্কিম প্রসঙ্গক্রমে গীতগোবিন্দের কথা আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে—'শব্দ ভাণ্ডারে যত সুকুমার কুসুম আছে, সকলগুলি বাছিয়া বাছিয়া চতুর গোস্বামী এই কিশোর কিশোরী রচিয়াছেন'।[১১৮] জয়দেবের শব্দ প্রয়োগ নৈপুণ্য বিষয়ে বঙ্কিমের এই উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়। রমেশচন্দ্র দত্তও তাঁর জয়দেব সম্পর্কিত আলোচনায় জয়দেবের কাব্যের 'exquisite music' এবং 'soft and voluptuous description' সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[১১৯] অক্ষয়চন্দ্র সরকারও তাঁর 'জয়দেব' প্রবন্ধে গীতগোবিন্দ কাব্যের সঙ্গীতময়তা, প্রকৃতি বর্ণনার মাধুর্য এবং জয়দেবের কাব্য-কাহিনীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১২০] প্রমথ চৌধুরী জয়দেবের কাব্যে প্রশংসনীয় কিছুই পান নি। জয়দেবের রূপ বর্ণনা, প্রকৃতি বর্ণনা, মিলন, বিরহ, অভিসার প্রভৃতি সমস্ত কিছুকেই তিনি অত্যন্ত তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। কারণ, তাঁর মতে জয়দেব 'মানবদেহের সৌন্দর্য' দেখেন নি, 'মানবদেহকে কেবল ভোগের বিষয় বলিয়াই মনে করেন'। কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও তিনি স্বীকার করেছেন, জয়দেবের ভাষা 'অতিশয় সুললিত' এবং শ্রুতিমধুর।[১২১] বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রমথ চৌধুরীর মতাবলম্বী। তাঁর মতে জয়দেবের শৃঙ্গার-সম্ভোগ নাগরিক বিলাসের কৃত্রিমতায় আক্রান্ত। তবে 'গীতগোবিন্দের গীত' অর্থাৎ সঙ্গীতধর্মিতার অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেছেন, কিন্তু স্বীকার করতে চান নি গোবিন্দের অস্তিত্ব।[১২২] রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন জয়দেবের কাব্য কালিদাসের মতো 'মানসী মায়া' বিস্তার না করে কানকে প্রতারিত করে।[১২৩] অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভোগেই জয়দেবের কাব্যের আবেদন শেষ হয়, মনে পৌঁছয় না।

কিন্তু পরবর্তীকালে জিতেন্দ্রলাল বসু (নবপর্যায় বঙ্গদর্শন—১৯১৯) ড. সুশীল কুমার দে (নানা নিবন্ধ—জয়দেব ও গীতগোবিন্দ), হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ জয়দেবের কবিত্বে ও আধ্যাত্মিকতায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছেন। ড. দে জয়দেবের কাব্যের ভাব বা বিষয়বস্তুর মধ্যে নতুনত্ব খুঁজে না পেলেও 'রসরূপ' সৃজনে জয়দেবের সর্বাঙ্গীণ কৃতিত্ব স্বীকার করেছেন।[১২৪] অর্থাৎ রস হিসেবে হৃদ্যবেদ্যভাব এবং রূপ হিসেবে কাব্যের বহিরঙ্গ—উভয়ত্রই জয়দেব সিদ্ধ শিল্পী। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পূর্ণ ভক্তের দৃষ্টিকোণ থেকে জয়দেবকে দেখে, গীতগোবিন্দকে প্রেমধর্মের কাব্য হিসেবে অভিহিত করেছেন। প্রমাণ হিসেবে তিনি গম্ভীরার গুপ্তকক্ষে শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর এবং রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর ভক্তিতত্ত্ব আলোচনায় গীতগোবিন্দের ভূমিকার উল্লেখ করেছেন।[১২৫]

আচার্য সুনীতিকুমারও অবশ্য জয়দেব সম্পর্কিত আলোচনার আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আলোচনা ছিল সম্পূর্ণতঃ বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের ভূমিকা। সর্বভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে জয়দেবের স্থান, উদ্ভবকালের বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভাব, গীতগোবিন্দে দেবমহিমাজ্ঞাপক মঙ্গলকাব্যের লক্ষণ এবং সংযোজিত পদসমূহের পদাবলী হিসেবে মূল্যায়নই হলো সুনীতিকুমারের প্রধান আলোচ্য বিষয়।[১২৬]

অতি সংক্ষিপ্ত হলেও গবেষকের মন নিয়ে কবি বুদ্ধদেব বসু কালিদাসের মেঘদূতের ভূমিকায় জয়দেব সম্পর্কিত বিষয়নিষ্ঠ অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করেছেন। 'যা দৃশ্য ও স্পৃশ্য বস্তু নয়' অর্থাৎ যা হৃদয়স্পর্শী—এমন উপাদান বিরল সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে তিনি জয়দেবের মধ্যেই আবিষ্কার করলেন—

'ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্'।

"সারা 'গীতগোবিন্দে' এই একবারই ভাষা হয়ে উঠলো কবিতার দ্বারা আক্রান্ত—আক্রান্ত, উন্নত ও রূপান্তরিত, যেন এক ঝাপটে চলে গেলো যুক্তি নির্ভর কার্পণ্যকে ছাড়িয়ে। 'তুমিই আমার ভূষণ'—এই একটি কথাই বলে দিচ্ছে যে জয়দেব এক সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন : ভারতীয় সাহিত্যে প্রাচীনের অস্তরাগ তিনি, এবং আধুনিকের পূর্বরাগ"।[১২৭]

এ পর্যন্ত আমরা যে সমস্ত কবি সাহিত্যিক সমালোচকদের অনুধাবন করলাম, তাঁরা একটি বিষয়ে একমত, অন্ততঃ বিরোধী নন যে জয়দেব ছন্দে, অলঙ্কারে, চিত্রে, সঙ্গীতে, ললিত শব্দ বিস্তারে কাব্যের বহিরঙ্গকে সুবিন্যস্ত করার সামর্থ্য রাখতেন। কিন্তু সার্থক কাব্যের হৃদয়বেদ্যতা গুণ সম্পর্কে অনেকেই আপত্তি তুলেছেন। জোরালো বিপরীত মতেরও সাক্ষ্য আমরা গ্রহণ করলাম।

এছাড়া অন্য যে সব বিষয়ে আলোচনা কিংবা তর্ক বেধেছে তার অনেকগুলি বিষয়েই স্বয়ং জয়দেব আমাদের প্রবৃত্ত করার মত উপাদান যুগিয়েছেন। যেমন প্রথমতঃ, 'হরিস্মরণ' ও 'বিলাসকলা'—আপাত বিপরীত দুই প্রবণতার সমীকরণ প্রয়াস সচেতনভাবে জয়দেব তাঁর কাব্যে করলেন। কিন্তু আমরা প্রশ্ন তুললাম, কাব্যে কোন্‌টি প্রাধান্য লাভ করেছে ? অথবা এমন সংশয়ও প্রকাশ করলাম—জয়দেবের কাব্যে আদৌ হরির অস্তিত্ব আছে কি ?

দ্বিতীয়তঃ 'সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং'—যে সচেতন আঙ্গিকনির্মাতার আত্মমূল্যায়ন, তাঁর কাব্যেই প্রতিষ্ঠিত কোন সন্দর্ভানুসরণ ঘটলো না কেন ? কেন এটি সংস্কৃত ছন্দে বাহিত কিছু শ্লোকের ফ্রেমে প্রাকৃত ছন্দোরীতির গীতিগ্রন্থনা হয়ে উঠলো ? প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে নানা অনুমানও প্রশ্রয় পেল আমাদের মনে। পিশেলের মতো কিছু কিছু পণ্ডিত মনে করলেন, মূল গ্রন্থটি প্রথমে প্রাকৃত অথবা অপভ্রংশ ভাষায় রচিত হয়েছিল—পরে সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই ধরনের অনুমানের পেছনে কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে 'পদাবলী' শব্দটি সংস্কৃত নয়, যা জয়দেব রচনা করতে চেয়েছেন। কিন্তু 'পদ' শব্দটি বাল্মীকির রামায়ণ, ভরতের নাট্যশাস্ত্র ও কালিদাসের কাব্যে গীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১২৮] অতএব শব্দটির মূল সংস্কৃত নয় বলে, জয়দেবের কাব্য যে প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল এমন অনুমান ভ্রান্তিকর।

তৃতীয়তঃ, জয়দেব নিজেই গীতগোবিন্দের গানগুলিকে 'মধুরকোমলকান্ত-পদাবলী' বলে যেমন অভিহিত করেছেন, তেমনি 'মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি' বলেও চিহ্নিত করেছেন। কথাধর্মী মঙ্গলকাব্য-শৈলীর সঙ্গে গীতিধর্মী পদসাহিত্যের সহাবস্থানও জয়দেব জিজ্ঞাসার অন্যতম বিষয়।

চতুর্থতঃ, জয়দেবের কাব্যে নাট্যধর্মিতা ও কাব্যধর্মিতার সমন্বয়ও আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। রাধা, সখী ও কৃষ্ণের পারস্পরিক উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে যে নাট্যরস সৃষ্টি হয় তার উৎস কোথায় ? এ কি আমাদের প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রা শ্রেণীর রচনা ? উইলিয়াম জোন্‌স, ল'সেন, ভন শ্রোয়েডার, পিশেল প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত-দের মতে এটি রাখালিয়া নাটগীতি, গীতিনাট্য অথবা অতিনাটকের লক্ষণাক্রান্ত কাব্য। প্রত্যেকেই তাঁদের মতের স্বপক্ষে কিছু কিছু যুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে ড. সুকুমার সেন মহাশয়ের গীতগোবিন্দকে নিশ্চিত 'নাটগীতি' হিসেবে উপস্থাপিত করার চেষ্টাটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ।[১২৯] যথাযোগ্য বিনয়ের সঙ্গেই তাঁর যুক্তি-গুলির মূল্য আমরা যাচাই করে দেখতে চাই। ড. সেনের বিশ্লেষণে গীতগোবিন্দের সর্গ বিভাগ নাটগীতির দৃশ্য বিভাগ হিসেবে উপস্থাপিত। নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করে তিনি আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন কোন্‌টি নান্দী, কোন্‌টি প্রস্তাবনা, কোথায় পালার শুরু এবং কি ভাবে পালার পর পালা এগিয়ে চলেছে। সর্বোপরি ধর্মপুরাণের গঙ্গাবতরণ প্রসঙ্গে বিষ্ণুর সামনে শিবের গাওয়া নাটগীতিটির সঙ্গে গীতগোবিন্দের বিষয়গত ঐক্য দেখিয়ে, গীতগোবিন্দ যে 'নাটগীতি' তা অভ্রান্তভাবে ড. সেন প্রমাণ করতে চেয়েছেন।[১৩০]

কিন্তু ড. সেন গীতগোবিন্দের ওপর নাটগীতির বিশেষণটিকে প্রয়োগ করতে গিয়ে আদ্যন্ত মেলাতে পারেন নি। কতকগুলি শ্লোকের উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন —"শ্লোকগুলি পরে যোগ হয়েছে, তবে অপরের দ্বারা, এমন অনুমান অপরিহার্য নয়। শ্লোকগুলি জয়দেবের লেখা হতে বাধা নেই……" আমাদের বক্তব্য—উদ্দিষ্ট শ্লোকগুলি যদি আদি ও অকৃত্রিম বলে মেনে নেওয়া হয় তবে অসুবিধা যেটুকু তা হ'ল, গীতগোবিন্দকে নাটগীতি বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, ড. সেন যে শ্লোক-গুলিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেছেন সেগুলো যে প্রক্ষিপ্ত নয় তার বড় প্রমাণ, সব পুঁথিতেই

এদের উপস্থিতি। হয়তো সেই কারণেই ড. সেন স্বয়ং জয়দেবকেই প্রক্ষেপকর্তা ভেবে নিয়েছেন। কেবল অনুমান-নির্ভর এমন সহজ সমাধানে কি আমাদের মন ভরে? সর্বোপরি শ্লোকগুলির অসঙ্গতি নিরূপণে ড. সেন যে সব যুক্তি দিয়েছেন তা অপ্রত্যাশিত। "দিবালোকে দন্তরুচিকৌমুদীর তিমিরহরণের কথা ওঠে না"—এই মন্তব্যের পাশে আমরা যদি বলি, রাত্রির অন্ধকারেও কি দন্তরুচি কৌমুদীর কথা উঠতে পারে? দন্ডরুচিকৌমুদীর প্রসঙ্গ কি বিরহক্লিষ্ট কৃষ্ণের হৃদয়-অন্ধকারের প্রতি উদ্দিষ্ট নয়? আর কাব্যে "মানিনী প্রণয়িনীর জবাব বারো চৌদ্দ ষোল ঘণ্টা পরে" যে দেওয়া চলে সেকথা তর্কাতীত। কারণ নাটকে উক্তির অব্যবহিত প্রত্যুক্তি। কিন্তু কাব্যে এই উক্তি-প্রত্যুক্তির ব্যবধান দীর্ঘ হতে বাধা কোথায়? অতএব যে গীতগোবিন্দ আমরা পেয়েছি তা কাব্যই, 'নাটগীতি' নয়। তাছাড়া কোন প্রাচীন উল্লেখে গীত-গোবিন্দকে নাটগীতি বলা হয়েছে বলে আমরা জানি না।

কিন্তু গীতগোবিন্দের নাট্যোপযোগিতা অন্য সংস্কৃত কাব্যের তুলনায় বহুগুণ বেশি একথা আমরাও স্বীকার করি। জনশ্রুতি সত্য কিনা তা জানি না, কিন্তু এটুকু জানি প্রযোজনার গুণে পদ্মাবতী নাম্নী কোন রমণীর লীলায়িত নৃত্যে, সুকবি জয়দেব ও সুকণ্ঠ পরাশরের সহযোগিতায় গীতগোবিন্দ শ্রবণসুভগ, নয়নলোভন নাটগীতি হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তাই বলে একে নাটগীতি, গীতিনাট্য অথবা অতিনাটক কোন কিছুর বিশেষ সংজ্ঞায় বন্ধ করা যায় না। এতে গীতিঅংশগুলো মুখ্য স্থান অধিকার করলেও,-এর মধ্যে যে সংস্কৃত শ্লোকগুলো রয়েছে তা অভিজাত সংস্কৃত কাব্যেরই উত্তরাধিকারসঞ্জাত।

পঞ্চমতঃ, মহাকাব্যানুসারী অষ্টাধিক (এখানে দ্বাদশ) সর্গে বন্ধ এই কাব্য। এ ছাড়া মহাকাব্যের অন্য লক্ষণ—'নাম্না নায়কস্য,' 'নায়কঃ সুরঃ'—ইত্যাদি লক্ষণের সঙ্গে 'খণ্ডকাব্যং ভবেৎ কাব্যস্য একদেশানুস্মরী চ'—সূত্রের প্রয়োগও এই কাব্যে সহজেই করা চলে। ফলে এটি মহাকাব্য কি খণ্ডকাব্য—এ নিয়েও বিরোধ সুপরিচিত। কিন্তু বাহ্যিক লক্ষণ মিলিয়ে আজ আর আমরা কাব্যবিচারের পক্ষপাতী নই। ধাতব-কাঠিন্যবর্জিত কোমলতা এবং অসামান্য সঙ্গীতগুণেই মহাকাব্য হিসেবে গীতগোবিন্দের প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায়।

ষষ্ঠতঃ, কাব্যকাহিনীর বিষয়বস্তু যতখানি পৌরাণিক প্রায় ততখানিই অপৌরাণিক, প্রাকৃতজ।

কিন্তু জয়দেবে কি আছে আর কি নেই, কি পেরেছিলেন আর কি পারেন নি এ আলোচনার সার্থকতা তখনই যখন আমরা পরিষ্কার করে বুঝে উঠতে পারবো এই অস্তি-নাস্তি, সার্থকতা-ব্যর্থতার পশ্চাদ্‌বর্তী কারণকে। জয়দেব প্রতিভার পরিচয় সন্ধানে আমাদের কাছে এই প্রশ্নটি অগত্যা অনিবার্য হয়ে দেখা দিচ্ছে।

আগেই আমরা আলোচনা করেছি পৌরাণিক কৃষ্ণকথার সংস্কৃত ঐতিহ্য যেমন গড়ে উঠেছিল, তেমনি লোককথার কৃষ্ণও লোক-সাহিত্যে, প্রকীর্ণ-কবিতায়, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে বিকাশলাভ করছিল। স্বাভাবিক কারণেই লোককথার কৃষ্ণপ্রসঙ্গ লোক-জীবন ও লোক-রুচির ঐশ্বর্যে ঋদ্ধ হবে। আবার পুরাণসমূহও সমাজে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান

বিশেষ। কোন কবিরই সাধ্য নেই সেই পুরাণহর্ম্যে সুপ্রতিষ্ঠিত দেবতাকে প্রণিপাত না করে শুধু লোককথার প্রেমনায়ক কৃষ্ণকে কাব্যায়িত করে সর্বশ্রেণীর সামাজিকের হৃদয়সম্বাদী করে তোলেন। জয়দেবের কৃষ্ণকথার স্বরূপসন্ধানে এই সংশ্লেষধর্মী বৈশিষ্ট্য আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি।

একই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্বীকৃত দুই দেবতা শিব ও বিষ্ণু। শৈব সেনবংশের কৌলিক ঐতিহ্য ত্যাগ করে লক্ষ্মণ সেনের বিষ্ণুতে প্রবণতান্তরণের পেছনে সমকালের কতখানি প্রভাব ছিল তা হয়ত প্রমাণের অভাবে আজ অনুমানের বিষয় হতে পারে, কিন্তু আমাদের ধারণা, তেমন কিছু প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল। বিপরীত পক্ষে লক্ষ্মণসেনের এই প্রবণতান্তরণ যে সমকালের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল তাতে কোন সন্দেহমাত্র নেই। অভিজাত, অনভিজাত, উচ্চ-নীচ, এককথায় সমাজের সর্বস্তরের সর্বাধিক মানুষ সেদিন বৈষ্ণবধর্মের উপাস্য কৃষ্ণকে ঘিরে নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে উজ্জীবিত করে তুলছিল। পূর্ব থেকেই কৃষ্ণ লোক-সংস্কৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এখন রাজধর্মের প্রশ্রয়ে সর্বব্যাপ্ত পরিণতি লাভ করলেন। যাঁরা ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতায় এতদিন দূরে ছিলেন, একালের সর্বগ্রাসী কৃষ্ণকথার মায়াজালে তাঁরাও ধরা পড়লেন। সেনবংশের অব্যবহিত পূর্ববর্তীকাল অবধিও বাংলাদেশে বৌদ্ধদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তৃত ছিল। একালের গানে সেই অবশিষ্ট বৌদ্ধদেরও প্রত্যয়শালী করে তোলা হল—'কেশব, ধৃত বুদ্ধশরীর'।[৩১] মোটকথা, দীক্ষিত, অদীক্ষিত, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, ধনী-নির্ধন, সর্বশ্রেণীর বাঙালী সেদিন বৈষ্ণবধর্মে না হলেও কৃষ্ণকথায় দীক্ষিত হলেন। ফলে জয়দেব তাঁর কৃষ্ণলীলাকথার আসরে হরিস্মরণে প্রত্যাশী শ্রোতাদের যেমন ডাক পাঠালেন, তেমনি ডেকে আনলেন তাঁদেরও—যাঁরা হরিস্মরণের মর্ম বুঝবেন না ; কেবল নর্মকেলির মর্ত্যলীলায় তৃপ্ত হবেন। শিল্পী হিসেবে এই বিষম ধাতুর মিলন ঘটাতে যে পরিমাণ সচেতনতা প্রয়োজন তা পুরোমাত্রাতেই জয়দেবের ছিল। 'সন্দর্ভশুদ্ধি'র ব্যাপারে জয়দেবের আত্মকথন যে কেবল অহংমন্যতা মাত্র নয়, সচেতন আত্মসমীক্ষা, তা-ও সহজেই বোঝা যায়। পুরাণানুসারী ব্রাহ্মণ্য রাজধর্মের কৃষ্ণানুরক্তির সঙ্গে লোকজীবনের মর্মনিবাসী কামকেলির নায়ক-কথার সামগ্রিক শিল্প-রূপায়ণে জয়দেবের সামনে যে শিল্পতত্ত্বগত সমস্যাটি সমুপস্থিত হয়েছিল তাতে প্রথাবন্ধ বিষয় কিংবা আঙ্গিক তাঁকে কোন পথই দেখাতে পারে নি। পথ তিনি খুঁজে পেয়েছেন আপন কালের মর্মলোক থেকে—গীতগোবিন্দ যার বাস্তব রূপায়ণ। এর বিষয় নিয়ে, গোত্র নিয়ে আমরা বাগ্‌বিতণ্ডা করেছি। কিন্তু কবি তো 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা'র অধিকারী। শিল্পী হিসেবে তাঁর সামনে সেদিন যে সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল, বলা বাহুল্য তার কোনো পূর্বনির্দিষ্ট আদর্শ-প্রকরণ থাকা সম্ভব ছিল না। ফলে তাঁকে নিজেরই প্রয়োজনে যা গড়ে নিতে হল তা বহু বিচিত্র উপাদানের এক বিমিশ্র প্রকরণ। সৃষ্টির মর্যাদায় তাই গীতগোবিন্দ আজও ভাস্বর।

এখন কাব্যের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণে আমরা পৌরাণিক বিষয়ের সমীকরণ পদ্ধতিটির পরিচয় নিতে পারব। জয়দেবের কাব্যের বহিরঙ্গে সর্বত্র পৌরাণিক কৃষ্ণেরই পরিচয় মুদ্রিত। প্রথম সর্গের দ্বিতীয় গীতে কবি যে কৃষ্ণকে বন্দনা করেছেন, তাঁর দিনমণি-

মণ্ডলমণ্ডন' বিশেষণটি বৈদিক-বিষ্ণুর পৌরাণিক কৃষ্ণে রূপান্তরের ইঙ্গিতবাহী। কালিয় নাগ দমনে বৃন্দাবনলীলার আভাস এবং মধুমুরনরক বিনাশপ্রসঙ্গে দ্বারকা-লীলার পরিচয় বিধৃত। কাব্যের বারোটি সর্গের নামকরণে নায়ক কৃষ্ণের যে বিভিন্ন নাম ব্যবহৃত হয়েছে তার বেশীর ভাগই পৌরাণিক কৃষ্ণ-বিষ্ণুরই বিভিন্ন নাম। কৃষ্ণের পৌরাণিক বাল্যলীলার কিছু কিছু প্রসঙ্গও কবি এখানে উপস্থিত করেছেন। চতুর্থ সর্গে কৃষ্ণের গোবর্ধনধারণ, অষ্টম সর্গে রাধার উক্তিতে পূতনাবধপ্রসঙ্গ, দশম সর্গের শেষ শ্লোকে কুবলয়াপীড় হত্যার প্রসঙ্গ প্রভৃতি নানা পৌরাণিক বৃত্তান্ত এবং পৌরাণিক কৃষ্ণের দেবমহিমাও বারবার জয়দেব এই কাব্যে ঘোষণা করেছেন। অন্তত একটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করি—

সান্দ্রানন্দ পুরন্দরাদি দিবিষদ্‌বৃন্দৈরমন্দাদরা—
দানম্রৈর্মুকুটেন্দ্র নীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দিন্দিরম্‌।
স্বচ্ছন্দং মকরন্দ সুন্দর গলন্মন্দাকিনীমেদুরং
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে ॥[১৩২]

জয়দেব তাঁর কৃষ্ণকে মধুরিপু, কংসদ্বিষ্‌ প্রভৃতি বলেও সম্বোধন করেছেন বারবার।

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, এই মহিমান্বিত পুরাণপুরুষের মধুররসাশ্রিত প্রেমলীলাকেই কবি তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু করেছেন। কাব্যের পৌরাণিক চিহ্নসমূহ নিতান্তই বাইরের উপাদান। এবং সেই মধুররসময় রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকথা পরিবেশনে কবি তাঁর উপাদান সংগ্রহ করেছেন পুরাণ থেকে নয়—প্রাকৃত সাহিত্যসমূহ থেকে। এখন এ বিষয়ে প্রমাণ উপস্থাপিত করার আগে আমরা কাব্যের কথাবস্তু বিশ্লেষণ করে দেখব। প্রথম সর্গ 'সামোদ-দামোদর'। মাধবী কুসুমকোমলা রাধা নিভৃত প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করেছেন। রাধাকে ত্যাগ করে কৃষ্ণ অন্যান্য গোপীনীদের সঙ্গে প্রেমলীলায় রত। কৃষ্ণের পূর্বপ্রেমের কথা স্মরণ করে রাধা ভাবছেন তাঁর প্রিয় কৃষ্ণ আজ তাঁকে বিস্মৃত হয়ে অন্যান্য গোপীনীদের সঙ্গে বিহার করেছেন।

দ্বিতীয় সর্গে রাধা সখীর কাছে আবার কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্খা প্রকাশ করলেও কৃষ্ণের কোন ক্লেশ নেই। তাই এই সর্গের নাম 'অক্লেশ-কেশব'। তৃতীয় সর্গে কংসারি মধুসূদন 'রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরী'। তিনি রাধাপ্রেমে মুগ্ধ হয়েই ব্রজাঙ্গনাদের পরিত্যাগ করেছেন এখানে। তাই এই সর্গের নাম 'মুগ্ধ-মধুসূদন'। চতুর্থ সর্গ 'স্নিগ্ধ-মধুসূদন'-এ রাধার সখী কৃষ্ণের নিকট বিরহবিধুরা রাধার অবস্থা বর্ণনা করেছেন। পঞ্চম সর্গে রাধা, কৃষ্ণের সব অপরাধ মার্জনা করে তাঁর কাছে অভিসারে আসবেন এই আকাঙ্খায় কৃষ্ণ যমুনাতীরের কুঞ্জবনে রাধার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। এই সর্গের নাম 'সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষ'। ষষ্ঠ সর্গ 'ধৃষ্টবৈকুণ্ঠ'-তে সখী বাসকসজ্জিতা রাধার কথা কৃষ্ণের কাছে বলেছেন। সপ্তম সর্গ 'নাগর-নারায়ণ'-এ বহু-বল্লভ কৃষ্ণের ছলনায় রাধা বিপ্রলব্ধা নায়িকা। অষ্টম সর্গে মানিনী রাধা তাঁর প্রেমের গভীরতায় লক্ষ্মীকেও পরাজিত করেছেন। তাই এই সর্গে বিস্মিত কৃষ্ণের নাম 'বিলক্ষ-লক্ষ্মীপতি'। নবম সর্গ 'মুগ্ধ-মুকুন্দ' ও দশম সর্গ 'মুগ্ধ-মাধব'-এ কৃষ্ণ রাধার মান-ভঞ্জনে রত। একাদশ সর্গ 'সানন্দ-গোবিন্দ'-এ রাধার মানভঞ্জন হওয়ায় কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে

মিলন সম্ভাবনায় আনন্দিত। দ্বাদশসর্গ 'সুপ্রীত-পীতাম্বরে' কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে মিলিত।

গীতগোবিন্দের এই কথাবস্তু নির্মিতিতে ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কিছু কিছু প্রভাব আছে বলে অনেকে মনে করেন। ভক্ত-পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ভাগবতের রাসলীলার সঙ্গে গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গ বর্ণিত রাসলীলার সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন।[১৩৩] কিন্তু ভাগবতে রাস শরৎকালীন। অন্যদিকে গীতগোবিন্দে বসন্তরাস বর্ণিত। শুধু সময়ের দিক দিয়ে নয়—অন্য দিক দিয়েও ভাগবতের রাসের সঙ্গে গীতগোবিন্দের পার্থক্য আছে। ভাগবতে রাসলীলা তত্ত্বে পরিণত—অন্যদিকে গীতগোবিন্দের কবি আমাদের কাছে কোন তত্ত্ব উপস্থিত করেন নি। ভাগবতে দেখি রাসলীলাকালে কৃষ্ণ বহু বল্লভ-নারীর মধ্য থেকে এক যুবতীকে নিয়ে অন্তর্হিত হয়েছেন।[১৩৪] অন্যদিকে গীতগোবিন্দে কৃষ্ণ রাধাকে পরিত্যাগ করে অন্যান্য যুবতীদের নিয়ে 'রাসরসে' মেতেছেন।[১৩৫] ভাগবতে কৃষ্ণের বাল্যলীলা ও বৃন্দাবনলীলার বর্ণনা থাকলেও রাধাপ্রসঙ্গ কোথাও নেই। অন্যদিকে গীতগোবিন্দে রাধাই কাব্যনায়িকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভাগবতের বিষয়বস্তুর সঙ্গে গীতগোবিন্দের কৃষ্ণলীলাকথার কোনও সাদৃশ্য নেই। তত্ত্বযুক্ত ভাগবতের অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা নয়, জয়দেবের কাব্যে রূপায়িত হয়েছে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার জীবন্ত প্রেমলীলার হৃদস্পন্দন।

আবার অন্যদিকে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের রাধাকৃষ্ণলীলার সঙ্গে জয়দেবের রাধাকৃষ্ণ লীলার সাদৃশ্য আছে বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত শ্লোক এবং বিষয়বস্তুর সঙ্গে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটির সাদৃশ্য আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে গীতগোবিন্দের মতোই কৃষ্ণলীলাকথার নায়িকা শ্রীরাধা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার বিবাহ সম্পাদিত হয়েছে। পরকীয়াবাদ সমর্থিত হয় নি। অন্যদিকে গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের বিবাহের প্রসঙ্গ না থাকলেও একস্থানে তাঁদের 'দম্পতি' [১৩৬] বলা হয়েছে। অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার 'পতি'ও [১৩৭] বলা হয়েছে। এবং পরকীয়াবাদেরও কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নেই। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন গীতগোবিন্দে 'পরকীয়াবাদের পরিস্ফুট স্বরূপ উপলব্ধি হয় না।'[১৩৮] গীতগোবিন্দের রাধাকৃষ্ণলীলা যেন নিত্যলীলার মতোই বর্ণিত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতো গীতগোবিন্দেও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য সমভাবে রূপ পেয়েছে। তবে গীতগোবিন্দের মূল কাহিনীর কোথাও ঐশ্বর্যভাবের অনুপ্রবেশ ঘটে নি। কিন্তু পুরাণ হয়েও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং গীতগোবিন্দ সমসাময়িক রচনা। কেউ কেউ আবার ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ গীতগোবিন্দের পরবর্তীকালে রচিত বলে মনে করে থাকেন। সুতরাং একথা মনে করতে পারি,ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকার ও কবি জয়দেব প্রায় সমকালীন সাংস্কৃতিক জীবনের সমউৎস থেকে রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথাকে গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে আমরা জানি, পুরাণকারেরা সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতির ব্যাপকতম কথাবস্তুকেই সঙ্কলন করে থাকেন। এবং এও আমরা দেখেছি যে ভাগবতে রাধার নাম বা রাধার প্রসঙ্গ না থাকলেও গীতগোবিন্দ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের পূর্ববর্তী ভারতীয় স্থাপত্যে এবং অপভ্রংশ-কবিতায় রাধার নামের উল্লেখ ও রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং

সমাজ মানসের যে সামগ্রিক অভীপ্সাকে রূপ দেওয়ার প্রবণতা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের রাধা-কৃষ্ণকথায় রয়েছে, সেই একই প্রবণতা জয়দেব অধিকতর শিল্প-শৃঙ্খলায় কাব্যের আধারে রূপায়িত করেছেন। তাই জয়দেবের গীতগোবিন্দের বহিরঙ্গে পৌরাণিক প্রসঙ্গের আপাত নির্মোক থাকলেও তাঁর রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা প্রাকৃত জীবনের, প্রাকৃত নরনারীর বাস্তব আনন্দ-বেদনায় উদ্বেলিত প্রেমকথার দ্বারাই প্রভাবিত। উদাহরণ দিয়ে আমাদের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করা যেতে পারে। গাথাসপ্তশতীর একটি পদে গোপীদের গান উল্লিখিত—

মহু-মাস-মারুআহঅ-মহুঅর-ঝংকার-নিব্ভরে রণ্ণে।
গাঅই বিরহক্খরাবদ্ধ পহিঅ-মণ-মোহণং গোবী।[১৩৯]

বসন্তকালীন মলয়বাতাসে ভ্রমর গুঞ্জন করছে আর গোপীরা গাইছে পথিকের মনোমোহনকারী বিরহসংগীত। প্রায় অনুরূপ পদ রয়েছে গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গে—

উন্মদ মদনমনোরথ পথিকবধূজনজনিতবিলাপে
অলিকুলসঙ্কুল কুসুমসমূহ নিরাকুল বকুল কলাপে।[১৪০]

ছন্দোমাধুর্যে ও ললিত শব্দ নির্বাচনে কবি একই ভাবকে কান্তকোমল পদে রূপায়িত করেছেন।

গাথাসপ্তশতীর অন্যত্র দেখি মুক্তাধরের শ্লোকে আছে—

ভরিমো সে গহিআহর-ধুঅ-সীস-পহোলিরাল-আউলিঅং
বঅণং পরিমল-তরলিঅ-ভমরালি-পইণ্ণ কমলং ব।[১৪১]

গীতগোবিন্দে রয়েছে—

চিন্তয়ামি তদাননং কুটিল ভ্রূকোপভরেণ।
শোণ পদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ ॥[১৪২]

আমি তাঁর ক্রোধকুঞ্চিত ভ্রূযুক্ত মুখমণ্ডল মনে করছি যেন রক্তকমলে ভ্রমরের সঞ্চরণ। গাথাসপ্তশতীর শ্লোকটির অর্থও অনুরূপ। পার্থক্য কেবলমাত্র এইটুকু, গাথাসপ্তশতীতে সাধারণ নায়কের চিন্তাকে রূপ দেওয়া হয়েছে আর গীতগোবিন্দের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর নায়িকা প্রাকৃত নায়িকার পরিবর্তে শ্রীরাধা।

জয়দেবের সমকালীন পবনদূত-রচয়িতা কবি ধোয়ীর একটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত হয়েছে—

হারং পাশবদাচ্ছিনত্তি দহনপ্রায়াং ন রত্নাবলীং
ধত্তে কণ্টকশঙ্কিনীব কলিকাতল্পে ন বিশ্রাম্যতি।
স্বামিন্ সম্প্রতি সান্দ্রচন্দনরসাৎ পঙ্কাদিবোদ্বেগিনী
সা বালা বিষবল্লরীবলয়িতো ব্যালাদিব ত্রস্যতি ॥[১৪৩]

এখানে বিরহিণী লৌকিক নায়িকার অবস্থাই বর্ণনা করেছেন কবি। হার তাকে পাশের মতো কষ্ট দিচ্ছে। রত্নাবলী গাত্র দগ্ধ করছে। কোমল শয্যাও তার কাছে কণ্টক সদৃশ। চন্দন পঙ্কের মতো। বিষবল্লরীবলয়িত সর্পের মতো সে তা থেকে ভয় পাচ্ছে। এই নায়িকার পাশাপাশি গীতগোবিন্দের বিরহিণী রাধাকে রাখা যাক—

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্‌ ।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্‌ ।[১৪৪]

এবং এই রাধাও—

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্‌ ।
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্‌ ॥[১৪৫]

উদাহরণের তালিকা বেশী বাড়িয়ে লাভ নেই। এই উদাহরণগুলি থেকেই বুঝি, গীতগোবিন্দে যে গোবিন্দের প্রেমকথা বর্ণিত হয়েছে তিনি গোত্রে পৌরাণিক হলেও আচরণে মর্ত্যধূলিধূসর প্রাকৃত নায়ক। তাঁর নায়িকার আচরণও মর্ত্যমানবীর অনুরূপ।

শুধুমাত্র বিষয়বস্তুই বা বলি কেন, সমকালীন প্রাকৃত জীবন-অভীপ্সার রূপায়ণ ঘটাতে জয়দেব তাঁর কাব্যের ছন্দ এবং ভাষাকেও সংস্কৃত সাহিত্যের গণ্ডীবদ্ধ আভিজাত্য থেকে বিস্তৃততর জীবন-পরিধিতে অবাধ মুক্তি দিয়েছেন। তিনি একদিকে গ্রহণ করেছেন শার্দূলবিক্রীড়িত, বসন্ততিলক, শিখরিণী, হরিণী, মালিনী, বংশস্থ, অনুষ্টুপ, পুষ্পিতাগ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, স্রগ্ধরা ও আর্যার মতো প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত ছন্দ। কিন্তু তাঁর গানগুলির ছন্দে তিনি পুরাতন ছন্দকেই ভেঙেচুরে তৈরি করেছেন নবতর ছন্দপ্রকরণ। সংস্কৃতের হ্রস্ব দীর্ঘ ধ্বনির গতানুগতিক নির্ভরতা বাদ দিয়ে কবি প্রাকৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দোরীতিকে গ্রহণ করেছেন। পাদাকুলক ছন্দ এক ধরনের মাত্রাসমক চতুষ্পদী, অপভ্রংশ ছন্দ। সংস্কৃতের মতো এতে লঘুগুরু ব্যবহারের কোনো বিধিনিষেধ নেই। জয়দেবও এই ছন্দই ব্যবহার করেছেন। তবে দ্বিপাদরূপে। যেমন—

স্তনবিনি/হিতমপি/হা—রমু/দা-রম্‌
সা—মনু/তে কৃশ/তনুরিব/ভা—রম্‌ ॥
সরসম/সৃণমপি/মলয়জ/পঙ্কম্‌ ।
পশ্যতি/বিষমিব/বপুষি/সশঙ্কম্‌ ॥

এইভাবে জয়দেব তাঁর গীতগুলিতে শাস্ত্রসম্মত ছন্দকে বাদ দিয়ে এক নবতর ছন্দ পদ্ধতির সৃষ্টি করলেন। কখনও কখনও তিনি ষোলমাত্রার পাদাকুলককে ৪+৪+৪+৩ =১৫ মাত্রার ছন্দে পরিণত করেছেন। আবার সংস্কৃত ছন্দের গুরুস্বরের দ্বিমাত্রিকতা ও ধ্বনিবৈশিষ্ট্যকেও কবি বাদ দেন নি। উদ্ধৃত পদটিতে সেই বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। জয়দেব একদিকে তাঁর ছন্দকে সংস্কৃত ছন্দের পংক্তিনির্ভরতা এবং অন্যদিকে প্রাকৃতের পর্বনির্ভরতা দান করে মিশ্র ছন্দের সৃষ্টি করেছেন—যা সর্বসাধারণের আস্বাদনীয় এক অভিনব ছন্দ হয়ে উঠেছে।

জয়দেবের কাব্যশরীরে ভাষা ও ছন্দ পারস্পরিক সামঞ্জস্যে যুক্ত। তাঁর পদাবলীর ছন্দ যেমন মলয় সমীরের মতো মৃদুসঞ্চরণশীল, ভাষাও তেমনি ললিত-লবঙ্গলতার মতো কোমলকান্তি বিশিষ্ট। প্রচলিত শাস্ত্রীয় ছন্দে আবদ্ধ এই কাব্যের পদগুলির ভাষা পূর্বতন সংস্কৃত কাব্যেরই ভাষা। যেমন—

সভয়চকিতং বিন্যস্যন্তীং দৃশৌ তিমিরে পথি
প্রতিতরু মুহুঃ স্থিত্বা মন্দং পদানি বিতন্বতীম্ ।
কথমপি রহঃ প্রাপ্তামঙ্গৈরনঙ্গতরঙ্গিভিঃ
সুমুখি সুভগঃ পশ্যন্ ন ত্বামুপৈতু কৃতার্থতাম্ ॥[১৪৬]

কিন্তু গীতে আবদ্ধ এই অভিসারের পদই আবার ধ্বনিঝঙ্কারে নবতর আস্বাদন বহন করেছে—

মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্ ।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্ ॥[১৪৭]

প্রাকৃত ছন্দের অনুগামী রূপেই ভাষা এখানে সংস্কৃত হয়েও অপভ্রংশের প্রায় যুক্তাক্ষর-হীন সহজ উচ্চারণ ও সহজবোধ্যতাকে আয়ত্ত করেছে। এর ফলে জয়দেবের যা লক্ষ্য তাই-ই সাধিত হয়েছে। সংস্কৃত হয়েও তাঁর কাব্যশৈলী সেই উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সমস্ত সামাজিকের শ্রবণ মননকে অধিকার করতে সমর্থ হয়েছে।

সব শেষে জয়দেবের কাব্য সম্পর্কে আর একটি প্রশ্নের পুনঃসমীক্ষা আমরা করতে চাই। প্রশ্নটি হল গীতগোবিন্দে ভক্তির প্রসঙ্গ। জয়দেবের কাব্যে ভক্তির আনুগত্য নিয়ে বহুকাল তর্ক হয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় সে তর্ক অবসানের সময় এখন উপস্থিত। কারণ ইতিহাসের কিছু সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমাদের হস্তগত হয়েছে, যার ফলে জয়দেবের ওপর ভক্তিধর্মের প্রভাব অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। সেন রাজারা ছিলেন দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ। দাক্ষিণাত্য আবার ভক্তি ধর্মের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যে অগ্রগণ্য—একথা আগেই আলোচিত হয়েছে। লক্ষ্মণ সেনের প্রথম বয়সের আবাস 'সেন পাহাড়ী গড়' জয়দেবের কেন্দুবিল্বের অদূরে, অজয়ের পরপারে। তাছাড়া লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে জয়দেবের সখ্যও আজ আর কেবল জনশ্রুতি নয়। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ 'সুবর্ণলেখা'য় 'ভক্তমাল' পুঁথির পরম্পরায় 'জয়দেব পদ্মাবতী কথা'—শীর্ষক প্রবন্ধে বিশ্বভারতীর পুঁথি বিভাগে সংরক্ষিত দ্বিজমোহন দাস কৃত 'ভক্তমালা' নামক একটি দুশো বছরের প্রাচীন পুঁথির পরিচয় প্রসঙ্গে জয়দেব ও লক্ষ্মণ সেনের সখ্যকে স্বীকার করেছেন।[১৪৮] আর একটি তথ্যও এই প্রসঙ্গে জরুরী। পদ্মাবতী ছিলেন কর্ণাটী ব্রাহ্মণ কন্যা। তিনিই জয়দেবের জীবনের ওপর অনুমেয় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাব। উল্লিখিত পুঁথিটি গবেষণাগার থেকে সাধারণ্যে প্রবন্ধকর্তার বর্ণনানুরূপ অস্তিত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলে জয়দেব জিজ্ঞাসার বহু উত্তর পাওয়া যাবে আশা করি। সে পর্যন্ত আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করবো। এই সঙ্গে আর একটি কথা যোগ করি—দক্ষিণী ভক্তিধর্মের প্রত্যক্ষ প্রেরণা হিসেবে বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃতও একালের হাওয়ায় আপন প্রেরণার বীজ ছড়াচ্ছিল। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য থেকে কর্ণামৃত আহরণ হয়তো ঐতিহাসিক ঘটনা কিন্তু এও সত্য যে চৈতন্যপূর্ব বাংলা দেশের কৃষ্ণকথায় কৃষ্ণকর্ণামৃত অজ্ঞাত ছিল না। শ্রীধরদাস সঙ্কলিত

সদুক্তিকর্ণামৃতে কর্ণামৃতের শ্লোক সংকলনই এর পাথুরে প্রমাণ। এই সব প্রমাণের বলেই আমরা আমাদের বিশ্বাসকে জয়দেবের ভক্তিভাবুকতার পক্ষে নির্ধারিত করতে আশ্বস্ত হচ্ছি। কিন্তু চৈতন্যোত্তর রাগানুগা ভক্তি বলতে আমরা যা বুঝি জয়দেবে তা নেই। আবার বৈধী ভক্তিও তার স্বরূপ থেকে কিঞ্চিৎ বিচলিত। কামের আর প্রেমের যথার্থ সীমারেখাটি জয়দেবের চেতনায় সুস্পষ্ট নয়। সেইটি স্পষ্ট হয়ে উঠলে, জয়দেব ভক্তির কোন মার্গে বিচরণ করতেন বোঝা যেতো। তবে ভক্তি এবং কামকলানুবর্তন দুয়ে মিলে জয়দেবের প্রচেষ্টা যে জনানুগ তা সুনিশ্চিত।

উল্লেখ পঞ্জী

১. বঙ্গভূমিকা ; সুকুমার সেন ; পৃ. ১৫০।
২. E. I. Vol. XXI Page-83.
৩. E. I. Vol. XIII, Page-133.
৪. বঙ্গভূমিকা, সুকুমার সেন ; পৃ. ১৫০।
৫. হরিবংশ ; ২।১৯।৪৫
৬. বঙ্গভূমিকা ; সুকুমার সেন ; পৃ. ১৫০।
৭. বাঙ্গালীর ইতিহাস ; নীহাররঞ্জন রায় ; পৃ. ৬০০
৮. পরবর্তী অংশে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।
৯. K. N. Dikshit ; Excavations at Paharpur, Bengal, Page-44.
১০. গৌড়লেখমালা ; অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত। পৃ. ৯।
১১. তদেব ; পৃ. ৭০২।
১২. কামরূপ শাসনাবলী।
১৩. Epigraphic Discoveries in East Pakistan, D.C. Sircar, Sanskrit College, Calcutta, 1973, pp 74, 76.
১৪. বঙ্গভূমিকা ; সুকুমার সেন ; পৃ. ১৫০।
১৫. Inscriptions of Bengal, Vol. III, Page-25.
১৬. তদেব ; পৃ. ৪২।
১৭. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা ; শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ. ১৫ (দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ থেকে পুনরুদ্ধৃত)।
১৮. পঞ্চতন্ত্র ; ১, ৫।
১৯. A. B. Keith ; A History of Sanskrit Literature.
২০. ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, (১৩৭৩) পৃ. ৩৭৯।
২১. M. Winternitz ; A History of Indian Literature
২২. গাথাসপ্তশতী ; পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য ২।৫১।
২৩. তদেব ; ২।১২
২৪. তদেব ; ২।১৪
২৫. তদেব ; ২।২৮
২৬. গীতগোবিন্দ : ১।২৯
২৭. গাথাসপ্তশতী ; পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ১।৪৫
২৮. তদেব ; ২।৪০
২৯. তদেব ; ৩।৪৯
৩০. কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয় ; ৫।১৯
৩১. কন্টক গাঢ়ি কমলসম পদতল...ইত্যাদি, পদটি।
৩২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; ১ম খণ্ড ; (১ম সংস্করণ) পৃ. ১০৩।
৩৩. তদেব ; পৃ. ১০২
৩৪. PRAKRITA-PAINGALAM (Part I) Edited by Dr. Bhola Sankar Vyas ; Page-II
৩৫. বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পুঁথিতে কিংবা অন্যান্য দু-একটি পুঁথিতে 'রাঙ্গ' শব্দের পাঠান্তর হিসেবে 'ধাই' শব্দটি পাওয়া গেলেও বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা জৈন উপাশ্রয়ের (রাণাঘাট, বারাণসী) পুঁথিতে 'রাঙ্গ' পাঠই পাওয়া যায়।
৩৬. PRAKRITA-PAINGALAM (Part I) ; Page-56
৩৭. তদেব-পৃ. ১৭৬-৭৭
৩৮. তদেব ; পৃ. ২০১
৩৯. ভাস এবং কালিদাসের কবিতাও এতে সঙ্কলিত হয়েছে।
৪০. The Subhasita Ratnakosa Edited by D. D. Kosambi and V.V. Ghokhale, Harvard Oriental Series ; Vol.-42
৪১. তদেব ; হরিব্রজ্যা ; ১০ম শ্লোক।
৪২. তদেব ; ১৫শ শ্লোক।
৪৩. তদেব ; ২৫, ২৭ শ্লোক।
৪৪. তদেব ; ২২ শ্লোক।
৪৫. তদেব ; ২৫ শ্লোক।
৪৬. তদেব ; ২০ শ্লোক।
৪৭. সুভাষিত রত্নকোষ ; ৪২ শ্লোক

৪৮. ঈশ্বরের নামে মন্ত্র পড়ে হস্ত দিয়া।
নৃসিংহ বীজবদ্ধমণি গলে বান্ধে লইয়া
(পদামৃতমাধুরী ; ৩।১৪৮)
এবং
বিপিনে গমন দেখি হৈয়া সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী
গোপালেরে কোলে নিয়া প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষামন্ত্র পড়েন আপনি। (পদামৃতমাধুরী ; ৩। পৃ. ১৬১)

৪৯. সুভাষিত রত্নকোষ ; হরিব্রজ্যা ; ৭ শ্লোক।

৫০. তদেব, ২৬শ শ্লোক।

৫১. তদেব, হরিব্রজ্যা ; ৩৭ শ্লোক।

৫২. তদেব ; হরিব্রজ্যা ২৮ ; শ্লোক।

৫৩. তদেব ; ৩৩ শ্লোক।

৫৪. তদেব ; ৬ শ্লোক।

৫৫. তদেব ; ১৯শ শ্লোক।

৫৬. তদেব, ৩৬ শ্লোক।

৫৭. তদেব, ৪৪ শ্লোক।

৫৮. তদেব ; অসতীব্রজ্যা ; ৪৮০ ৮ শ্লোক।

৫৯. তদেব ; ৮১ ৯ শ্লোক।

৬০. তদেব, ৮১৫ শ্লোক।

৬১. ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস (ড. সুকুমার সেন) পৃ. ৩৯৮ হ'তে পুনরুদ্ধৃত।

৬২. Sadukti Karnamrita of Sridhar-dasa, Edited by Suresh Chandra Bandyopadhyay : Page-2
পরবর্তী আলোচনার পাদটীকায় এই সংস্করণটির শ্লোকসংখ্যাই কেবল দেওয়া হবে।

৬৩. সদুক্তিকর্ণামৃত ; ২৫৪ শ্লোক।

৬৪. তদেব ; ২৫৫ শ্লোক।

৬৫. তদেব ; শ্লোক ২৫৬, ২৫৭

৬৬. তদেব ; শ্লোক—২৫৮

৬৭. তদেব ; শ্লোক—২৬০

৬৮. তদেব ; কৃষ্ণপ্রায়িতম্ ; শ্লোক—২৬১

৬৯. তদেব ; শ্লোক—২৬৫

৭০. তদেব ; হরিক্রীড়া ; শ্লোক ২৫৯

৭১. তদেব ; শ্লোক ২৭১

৭২. তদেব ; বেণুনাদ: শ্লোক ২৮৫।

৭৩. তদেব ; গীতম্ ; শ্লোক ২৮৯

৭৪. শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ; ড. শশিভূষণ দাসগুপ্ত ; পৃ. ১১৫

৭৫. সদুক্তিকর্ণামৃত ; কৃষ্ণভুজ: ; শ্লোক ২৯৩

৭৬. তদেব ; শ্লোক ২৯৫

৭৭. বাচ: পল্লবয়িত্যুমাপতিধর:—গীতগোবিন্দ ; ১।৪

৭৮. বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি

৭৯. রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিত জলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়াম্
রুক্মিণ্যাপি প্রবলপুলকোদ্ভেদমালিঙ্গিতস্য
বিশ্বং পায়াম্মসৃণ যমুনাতীর বানীর কুঞ্জে
স্বাভীরস্ত্রীনিভৃতরচিত ধ্যানমূর্চ্ছা মুরারে:।
সদুক্তিকর্ণামৃত, দেবপ্রবাহ/৬১/৩০১

৮০. তদেব ; দেবপ্রবাহ ; হরিক্রীড়া ; ২৭৩ শ্লোক

৮১. তদেব ; কৃষ্ণকৌমারম্ ; শ্লোক ২৫৯

৮২. তদেব ; ২৬০ শ্লোক

৮৩. তদেব ; ২৭৪ শ্লোক।

৮৪. শ্রীগীতগোবিন্দম্ ; ১/৪

৮৫. সদুক্তিকর্ণামৃত ; দেবপ্রবাহ ; ৩৬৯ শ্লোক

৮৬. তদেব ; উচ্চাবচ প্রবাহ ; বিশেষ নদী : ২০৫৪ শ্লোক

৮৭. পদ্যাবলী ; ২৬১ শ্লোক

৮৮. তদেব ; ৩৭০ শ্লোক ; সদুক্তিকর্ণামৃত ; দেবপ্রবাহ ; ৩০৩ শ্লোক

৮৯. পদ্যাবলী—২৬৫ শ্লোক

৯০. তদেব ; ২৩৫ শ্লোক—
মুরারিং পশ্যন্ত: সখি সকলমঙ্গ ন নয়নং
কৃতং যচ্ছৃণ্বন্ত্যা হরিগুণগণং শ্রোত্র নিচিতম্
সমং তেনালাপং সপদি রচয়ন্ত্যা মুখময়ং
বিধাতুর্নে বায়ং ঘটন পরিপাটীমধুরিমা।

৯১. শ্রীমদ্ভাগবত ; ১০।৩১।১৫

৯২. গোবর্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতি।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥

৯৩. আর্যাসপ্তশতী ; দ-কার ব্রজ্যা ; ২৮৬ শ্লোক

৯৪. তদেব ; প-কার ব্রজ্যা ; ৩৭৯ শ্লোক

৯৫. তদেব ; ম-কার ব্রজ্যা ; ৪৩৭ শ্লোক

৯৬. ল-কার ব্রজ্যা ; ৫০৮ শ্লোক

৯৭. র-কার ব্রজ্যা ; ৪৮৮ শ্লোক

৯৮. তদেব ; ব-কার ব্রজ্যা

৯৯. ম-কার ব্রজ্যা ; ৪৩১ শ্লোক

১০০. পদ্যাবলী; সদুক্তিকর্ণামৃতে শ্লোকটি গোবর্ধনের নামাঙ্কিত নয়।
১০১. পবনদূত; ২৮ শ্লোক
১০২. তদেব; ৯৭ শ্লোক
১০৩. তদেব; ১০২ শ্লোক
১০৪. তদেব; ১০৩ শ্লোক
১০৫. তদেব; ২৬০ সংখ্যক শ্লোক
১০৬. সদুক্তিকর্ণামৃত; দেবপ্রবাহ; কৃষ্ণযৌবনম্।
১০৭. তদেব;
১০৮. তদেব;
১০৯. এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা— বর্তমান লেখিকার 'সেন রাজসভায় কৃষ্ণকথা' (সমকালীন; ২৫ বর্ষ; আষাঢ় সংখ্যা—১৩৮৪)
১১০. চৈতন্যচরিতামৃত; মধ্যলীলা; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত; দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃ.—১১৯
১১১. বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পদসংখ্যা —৪৪
১১২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড); ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃ. ৭৭ হতে পুনরুদ্ধৃত
১১৩. শ্রীশ্রীপদকল্পতরু—৪র্থ খণ্ড; পৃ. ৩২৯
১১৪. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত বৈষ্ণব পদাবলী হ'তে উদ্ধৃত।
১১৫. বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ; ৩য় খণ্ড (বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি প্রকাশিত,) পৃ. ১১২
১১৬. মধুসূদন রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ—১ম সংস্করণ) পৃ. ১৬০
১১৭. বঙ্কিম রচনাবলী; ২য় খণ্ড (সাহিত্য সংসদ ষষ্ঠ মুদ্রণ) পৃ. ১৯১
১১৮. বঙ্গদর্শন, (১২৮১ চৈত্রসংখ্যা) কৃষ্ণ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোবিবর্তন ক্রমে ক্রমে ঘটেছে—ফলে 'কৃষ্ণ চরিত্র'ও ক্রমসংস্কৃত হয়েছে। কিন্তু জয়দেব সম্পর্কে মন্তব্যটি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করার যোগ্য।
১১৯. The Literature of Bengal, (1882)
১২০. জয়দেব প্রবন্ধ; নবজীবন—১২৯৩
১২১. প্রবন্ধ সংগ্রহ; (প্রথম খণ্ড); বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫৭; পৃ. ১৪, ১৬।
১২২. জয়দেব; সাধনা (১৩০০)
১২৩. রবীন্দ্ররচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ); ১৪শ খণ্ড পৃ. ৭৩৪
১২৪. নানা নিবন্ধ; ড. সুশীলকুমার দে (১৯৫৪) পৃ. ৫১
১২৫. কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (দে'জ পুনর্মুদ্রণ) পৃ.—৪২-৪৩
১২৬. শ্রী জয়দেব কবি—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৫০)
১২৭. কালিদাসের 'মেঘদূত'—বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত; (চতুর্থ সংস্করণ) ভূমিকা; পৃ.—২৮
১২৮. 'পদ' শব্দের বিস্তৃত আলোচনা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 'পদাবলী কীর্তনের ইতিহাসে' (১ম ভাগ) করেছেন।
১২৯. বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ; (১৯৭০) ড. সুকুমার সেন; পৃ. ৬৩
১৩০ তদেব পৃ. ৬৯
১৩১. মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতি বিদগ্ধ পণ্ডিতদের মতে এযুগে বৌদ্ধধর্ম থেকে বিচিত্র তত্ত্ব ও উপাদান আত্মসাৎ করে হিন্দুধর্ম পরিপুষ্টিলাভ করেছিল। তাঁদের ধারণায় ছদ্মবেশী হিন্দু দেবদেবীরা বেশীর ভাগই ছিলেন বৌদ্ধ দেবদেবী। হিন্দুদের সরস্বতী, কালী, বজ্রবারাহী, গণেশ, অপরাজিতা, দুর্গা প্রভৃতি এর নিদর্শন। ব্রাহ্মণ্যধর্মযুগে কৃষ্ণকথার বৃত্তে বৌদ্ধদের স্বীকরণ প্রয়াস যুগগত ধর্মসংশ্লেষেরই প্রবণতাপুষ্ট। এদিক থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত যুগগত মূল প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গতি-সম্পন্ন।
১৩২. শ্রীশ্রী গীতগোবিন্দম্; নবম সর্গ; ১১শ শ্লোক; পৃ.—২৯১ (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি জয়দেব ও শ্রী গীত-গোবিন্দ; দে'জ পুনর্মুদ্রণ)।
১৩৩. তদেব; পৃ. ১১৮-১১৯

১৩৪. শ্রীমদ্‌ভাগবতম; দশম স্কন্ধ; ত্রিংশ অধ্যায় ষড়বিংশ শ্লোক।

১৩৫. রাসরসে সহ নৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে; শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম; প্রথম সর্গ:, ৪৫ সংখ্যক শ্লোক

১৩৬. তদেব: পঞ্চমঃসর্গ:: ১৯শ শ্লোক।

১৩৭. তদেব: দ্বাদশ: সর্গ; চতুর্দ্দশ শ্লোক।

১৩৮. কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়; পৃ. ৪০

১৩৯. গাথাসপ্তশতী; পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত; দ্বিতীয় শতক, ২৮শ শ্লোক; পৃ.—৪৬

১৪০. শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত; প্রথম সর্গ; ২৯শ শ্লোক।

৪১. গাথাসপ্তশতী; প্রথম শতক, ৭৮ শ্লোক

১৪২. শ্রীশ্রী গীতগোবিন্দম; তৃতীয় সর্গ: ৫ম শ্লোক

১৪৩. সদুক্তিকর্ণামৃত; সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত; ২/৩৫/৫

১৪৪. শ্রীশ্রী গীতগোবিন্দম; চতুর্থ: সর্গ: (৮ম গীত)

১৪৫. তদেব; নবম গীত।

১৪৬. শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম; পঞ্চম: সর্গ:; বিংশ শ্লোক

১৪৭. তদেব; ১১শ গীত

১৪৮. 'সুবর্ণলেখা'য় (আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) সঙ্কলিত 'ভক্তমালা' পুথির পরম্পরায় 'জয়দেব পদ্মাবতী কথা' নামক প্রবন্ধ। লেখক—পঞ্চানন মণ্ডল।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা কৃষ্ণকথার আদিপর্ব

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় দেখেছি বাংলা ভাষায় কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গ নিয়ে কাব্যরচনার আগেই বাংলাদেশে কৃষ্ণকথার একটি সুস্পষ্ট পূর্ণাঙ্গ ঘরানা গড়ে উঠেছিল। হরিবংশ থেকে আরম্ভ করে জয়দেবের কাব্য—সর্বত্রই কৃষ্ণকথার দুটি দিকও আমরা দেখেছি। কৃষ্ণজীবনের আদি পর্ব—এর অবলম্বন কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ; কৃষ্ণজীবনের উত্তর পর্ব—এর উপজীব্য কৃষ্ণের মথুরা ও দ্বারকালীলা। চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সাহিত্যও এই দুটি বিষয়কে অবলম্বন করেছে। তবে সেখানে সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্যই প্রধানতঃ মাধুর্যরসনিসৃত।

কিন্তু বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে চৈতন্যের আবির্ভাব আকস্মিক নয়। তাঁর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ে কৃষ্ণকথায় একদিকে ঐশ্বর্যপ্রকাশ ও অন্যদিকে মাধুর্যরসরসিকতায় দ্বিধাবিভক্ত প্রবণতা সেই সত্যেরই প্রমাণ। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ধর্ম দুদিক দিয়েই উন্নত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। একটি বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব ও দর্শনের দিক—যার প্রকাশ ষড়গোস্বামীর জীবনাচরণে, রূপ, সনাতন ও শ্রীজীবের দর্শন গ্রন্থ রচনায় ; আর অন্যটি বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত সাহিত্য সৃজনের দিক—জীবনীসাহিত্য, পদাবলী সাহিত্য শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, এমনকি মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য শাখায় যার প্রকাশ। তত্ত্ব-দর্শন ও রসরূপের এই উভয় ধারাই কৃষ্ণকথাকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে দশম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে ক্রমোদ্ভিন্ন হয়েছে ; রচনা করেছে চৈতন্য-আবির্ভাবের উপযোগী কাল-সোপান।

শ্রী, রুদ্র, সনক ও ব্রহ্ম নামক দাক্ষিণাত্যের চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রামানুজাচার্য, মাধবাচার্য, বল্লভাচার্য ও নিম্বার্ক প্রচারিত ভক্তিবাদ পরবর্তীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদকে প্রভাবিত করেছে। এঁদের প্রত্যেকের মতেই ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত।

শ্রী সম্প্রদায়ের প্রবক্তা রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে ব্রহ্ম ভক্ত-বৎসল বিষ্ণু। অগ্নি ও অগ্নির উত্তাপে, সূর্যে ও সূর্যকিরণে যে সম্পর্ক, ব্রহ্ম এবং জীবেরও সেই সম্পর্ক। নিম্বার্ক ছিলেন সনক সম্প্রদায়ের। তাঁর মতে জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক সুবর্ণ পিণ্ড ও সেই পিণ্ডনির্মিত অলঙ্কারের সম্পর্কের মতো। নিম্বার্কের ব্রহ্ম এবং বিষ্ণু অভিন্ন। পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণই এই সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতায় পরিণত হয়েছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর ব্রহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তাঁর মতে হরি, বিষ্ণু ও ব্রহ্ম এক। আর রুদ্র সম্প্রদায়ের বল্লভাচার্যের প্রচারিত ধর্মে ভগবান গোকুলের শ্রীকৃষ্ণ, এবং তাঁর দর্শন পাওয়াই ভক্তি সাধনার চূড়ান্ত পর্যায়। সুতরাং ভক্তিদর্শনের এই ক্রম-পারম্পর্যযুক্ত সোপান অতিক্রম করেই যেন শেষ পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যের ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ও মুক্তিবাসনাহীন ভক্তিধর্মের উত্তরণ ঘটেছে। বাংলাদেশে এই ভক্তিধর্মের প্রত্যক্ষ উদ্গাতা মাধবেন্দ্রপুরী। তাঁর ভক্তিধর্মের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের এই চারটি বৈষ্ণব

সম্প্রদায়ের ভক্তিবাদের সঙ্গে ভাগবতীয় আদিরসাশ্রিত উজ্জ্বল রসের বিস্তার ঘটেছে। পুরী রচিত এবং তাঁর অন্তিম সময়ে উচ্চারিত 'অয়িদীনদয়াদ্র' নাথ হে' শ্লোকটি শ্রীচৈতন্যেরও অত্যন্ত প্রিয় শ্লোক ছিল।

অন্যদিকে সাহিত্যশাখায় জয়দেবের প্রসঙ্গ আগেই আলোচিত হয়েছে। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি এবং বড়ু চণ্ডীদাসও কৃষ্ণকথাকে সাহিত্যসৃষ্টির উপাদান করে তোলেন। এর মধ্যে কবিদের ব্যক্তিগত প্রবণতা যতটা না কাজ করেছে, তার তুলনায় যুগের প্রভাবই জয়ী হয়েছে বেশী। সেই কারণে এঁদের কাব্যে লোক-জীবনের উষ্ণতার অনুভূতি পরিপূর্ণভাবে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি ভক্তি ভাবুকতার বিকাশও লক্ষ্য করা যায়। এই কবিদের কাব্যে পূর্ববর্তী অলঙ্কারশাস্ত্র, কৃষ্ণকথাশ্রিত বিভিন্ন পুরাণ ও লৌকিক সাহিত্যের উত্তরাধিকারও এক সঙ্গেই মিশ্রিত হয়েছে। মালাধরের শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের মধ্যে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে গৃহীত ভাগবতীয় ভক্তিধর্মের প্রকাশ ঘটেছে। বিদ্যাপতির বিরহ পর্যায়ে, ভাবসম্মেলনে, প্রার্থনার পদে, এবং বড়ু চণ্ডীদাসের বংশীখণ্ডের রাধার আকুতিতেও ভক্তিভাবুকতার অনিবার্য মিশ্রণ ঘটেছে। এই সমস্ত চৈতন্যপূর্ব কৃষ্ণকথাশ্রিত সাহিত্য লৌকিক কাব্যধর্মের সঙ্গে ভক্তিধর্মকে সমভাবে গ্রহণ করেত পারায় চৈতন্যদেবের ভক্তিভাবুকতার পটভূমি সহজেই গড়ে উঠেছে।

॥ ১ ॥

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

চর্যাপদ-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের যে নিদর্শন আমরা পেয়েছি—তা আদিমধ্যযুগের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শনই শুধু নয়, একই সঙ্গে বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত কৃষ্ণলীলাকথা নিয়ে রচিত প্রথম কাব্যও বটে। বলা বাহুল্য, গ্রন্থটির নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং এর অবলম্বন কৃষ্ণলীলাকথার বৃন্দাবন পর্ব। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিষয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক ও সংশয়ের জাল ভেদ করে শেষ পর্যন্ত যে সত্য আমাদের মনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—তা হ'ল এই কাব্যে পৌরাণিক এবং লৌকিক উভয় কৃষ্ণকথারই সংমিশ্রণ ঘটেছে। কবি কাব্যটি রচনার উপাদান সংগ্রহে পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্যসমূহের সঙ্গে সঙ্গে লোকজীবন প্রচলিত কথাবস্তুকেও সযত্নে স্থান দিয়েছেন। তাঁর কাব্যের প্রবণতা এবং পটভূমি উভয়ই গ্রামীণ। জয়দেবের কাব্যে আদিরস প্রাধান্য পেলেও ভক্তির প্রকাশও যে রয়েছে—সেকথা আগেই আলোচনা করেছি। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা থাকলেও জয়দেবের মত প্রত্যক্ষ ভক্তির প্রসঙ্গ আমরা তেমন পাই না। তাই পুরাণ থেকে উপাদান আহরণ করলেও এটি দেবতার খোলসে যেন মানুষের কাব্য—কোন কোন সমালোচকের মতে মহাকাব্য।[১]

অন্যদিকে এরই সামান্য পরবর্তী সময়ে রচিত হয়েছে বলে অনুমিত মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশে নবতর দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। বৈষ্ণবের বেদরূপে পরিচিত ভাগবতের অনুবাদে মালাধর বসু কৃষ্ণকথার

ভাগবতবর্ণিত কাহিনী বাংলা সাহিত্যে পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিভাবুকতার নতুন উপসর্গকেও বাংলা কৃষ্ণকথার আসরে আবাহন করে এনেছে। এই দুই কাব্যের মধ্যে বিপরীতমুখী যে দুই প্রবণতাকে আমরা লক্ষ্য করবো পরবর্তী অংশে বিশ্লেষণের মুখে বিস্তৃতভাবে তার পরিচয় গ্রহণ করা যাবে। তবে এই দুই প্রবণতার মাত্রাগত হেরফেরের বিমিশ্রতাই যে বাংলা কৃষ্ণকথার মৌলিক স্বভাব—এ ব্যাপারে আমরা নিঃসংশয়।

ইতিবৃত্তমূলক তথ্যাদি ঃ ১৩১৬ সালে (১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে) বনবিষ্ণুপুরের কাছে কাঁকিল্যা গ্রামনিবাসী, শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্রবংশাবতংস দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অযত্নরক্ষিত অবস্থায় একটি বৃহদায়তন কৃষ্ণলীলাকাব্য পাওয়া যায়। পুঁথিটির প্রথম ও শেষ পাতা না থাকার জন্য গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় নি। পুঁথিটির আবিষ্কারক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কাব্যটির নাম দেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। কিন্তু পুঁথিটির মধ্যে প্রাপ্ত একটি রসিদে গ্রন্থের 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দবর্ব' নামটি দেখে কোন কোন পণ্ডিত এর 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামটিই গ্রহণযোগ্য মনে করেন।[২] কাব্যের বিভিন্ন স্থানে কবির ভণিতা পাওয়া যায়। বেশীর ভাগ ভণিতা 'বড়ু চণ্ডীদাস'। কখনও কখনও 'চণ্ডীদাস'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত হওয়ার আগে চৈতন্যপূর্ব পদাবলীকার চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সমালোচকদেব অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু এখন একাধিক চণ্ডীদাসকে নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। এই সমস্যার জটিল জাল ছেদন করার কোনও প্রয়োজন বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের নেই। চণ্ডীদাস যে কজনই থাকুন না কেন—একজন চণ্ডীদাস যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করেছিলেন—এ বিশ্বাস এখন প্রায় সর্বজনমান্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাল নিয়েও। এ ব্যাপারে নানা মতভেদের জটিলতা পেরিয়ে একটি সুদৃঢ় সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন আমাদের আছে।

পুঁথির ভেতরে প্রাপ্ত রসিদে ১০৮৯ সালকে বঙ্গাব্দ বলে ধরা হলে পুঁথিটি ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দেও বনবিষ্ণুপুরের রাজগ্রন্থাগারে ছিল। সুতরাং পুঁথিটির লিপিকাল সপ্তদশ শতাব্দী অথবা এর অল্প পূর্ববর্তী সময়ের বলেই মনে হতে পারে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি পুঁথিটিকে প্রথমে অর্বাচীন বলে মনে করলেও পরবর্তীকালে এর প্রাচীনত্বে বিশ্বাসী হয়েছিলেন।[৩] ১৩২২ সালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় লিপিবিশারদ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মিলিতভাবে 'কৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল' নামক প্রবন্ধে এই পুথি ১৫শ শতাব্দীর শেষে বা কাছাকাছি সময়ে লেখা হয়েছে বলে মনে করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থে তিন প্রকারের হস্তাক্ষর দেখতে পেয়েছেন এবং এই অক্ষর বৈচিত্র্যের কারণ হিসেবে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে, অক্ষরগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক বলে মনে হচ্ছে আসলে সেগুলি অতি পুরাতন। প্রাচীন যুগে যে আকারে ব্যবহৃত হত তার তুলনায় অল্প পরিবর্তিত মাত্র।

ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও ড. রাধাগোবিন্দ বসাক প্রমুখ পণ্ডিতেরা এর লিপিকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বলে অনুমান করেছেন। তাহলে মূল গ্রন্থটি এঁদের মতে আরও পূর্ববর্তী সময়ের লেখা। ড. সুকুমার সেন এই পুঁথির

অনুলেখন ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের বলে অনুমান করেন। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিতের মতে তাঁর এ সিদ্ধান্ত যথাযথ নয়।[৪]

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *The Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাকে ১৫শ শতাব্দীর পূর্ববর্তীই বলেছেন। ড. সুকুমার সেন কিন্তু এ ব্যাপারেও আচার্য সুনীতিকুমারের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। পুথিতে কয়েকটি মুসলমানী শব্দ থাকার জন্য তিনি এই গ্রন্থের ভাষাকে ষোড়শ শতাব্দীর বলে মনে করেন। কিন্তু এ বিষয়ে বলা যায়. ইসলামী শাসন শুরুর অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের রচনা বলেই এতে মাত্র অল্প কয়েকটি ইসলামী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সুতরাং এর ভাষাকে ১৫শ শতাব্দীরই ভাষা বলে অভিহিত করা যায়। চৈতন্যপূর্ববর্তী রচনা হিসেবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই ভাষাগত প্রাচীনত্বের প্রমাণ অবশ্যই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা যে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী এ বিষয়ে অন্য একটি জোরালো প্রমাণও আমাদের হাতে আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা অসমীয়া ভাষার সঙ্গেও সাদৃশ্যযুক্ত। এ ব্যাপারে অসমীয়া পণ্ডিত বাণীকান্ত কাকতির উক্তি স্মরণ-যোগ্য—"Like the Dohas, Krsna-Kirtana represents the pre-Bengali and Pre-Assamese dialect groups In Krsna-Kirtana, for instance, the first personal affixes of the present indicative are-i and-o; the former is found in Bengali at present and the latter in Assamese."[৫]

অসমীয়া ও বাংলাভাষা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে পৃথক হয়েছে ষোড়শ শতাব্দী থেকে। বাংলা এবং অসমীয়া ভাষার স্বাতন্ত্র্যময় পৃথকীকরণের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত বলেই এর মধ্যে একাধারে বাংলা এবং অসমীয়া ভাষার বিমিশ্র বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি। ঠিক অনুরূপভাবে ওড়িয়া ভাষার সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার সাদৃশ্য আমরা লক্ষ্য করব। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের মতে ওড়িয়া ও বাংলা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যে এর অল্প পরবর্তী সময়ে রচিত হয়েছিল—ভাষাগত সাদৃশ্যই তার প্রমাণ।

এ ছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনের জন্য আর একটি মূল্যবান প্রমাণ গৃহীত হয়ে থাকে। সনাতন গোস্বামী তাঁর বিখ্যাত বৈষ্ণবতোষণী টীকায় ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের ২৬ সংখ্যক শ্লোক ব্যাখ্যায় 'কাব্যকলা' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন "কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদি প্রসিদ্ধাস্তথা শ্রী চণ্ডীদাসাদি দর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ"। সনাতন গোস্বামীর এই শ্রীচণ্ডীদাস যে আমাদের আলোচ্য চণ্ডীদাসই, তার প্রমাণ তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের একটি অংশ অধিকার করে আছে এই দানখণ্ড ও নৌকা-খণ্ড। অবশ্য পরবর্তীকালের কিছু কিছু কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য এবং বৈষ্ণব পদাবলীরও একটি বিশেষ অংশে এই দানলীলা ও নৌকালীলা বর্ণিত হয়েছে। সংস্কৃত গ্রন্থের সংস্কৃত টীকায় এইভাবে বাংলা কাব্যের উল্লেখও তার প্রাচীনত্বের অন্যতম জোরালো প্রমাণ।

কারও কারও মতে চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ সংস্কৃতে দানলীলা ও নৌকালীলাকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই ধরনের কাব্য আমরা হাতে পাই নি। অথচ অন্যদিকে দেখছি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুটি খণ্ড দান ও নৌকাখণ্ড। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষকে ছেড়ে অনুমানকে অবলম্বন করা হয়েছে। বিরোধিতা করার জন্য এই ধরনের কুতর্ককে প্রয়োগ করা গেলেও গ্রহণীয় হয়ে ওঠে না। কারণ সনাতন গোস্বামী স্বতন্ত্র কাব্য হিসেবে যদি শব্দগুলির ব্যবহার করতেন তবে তা কি দানলীলা নৌকালীলা হত না? খণ্ড তো অপূর্ণতাজ্ঞাপকই। সম্পূর্ণ কাব্য হিসেবে গীতগোবিন্দের উল্লেখ করার পর তিনি এই খণ্ডগুলির উল্লেখ করেছেন। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড শব্দগুলি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা দেখে আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই সনাতনের উদ্দিষ্ট বিবেচনা করি।

কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য আদৌ এ নয় যে, সনাতন উদ্দিষ্ট কাব্য হিসেবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের উদ্দেশ্য চৈতন্য-পূর্ববর্তী কৃষ্ণকথার স্বরূপ সন্ধান। সনাতন কৃষ্ণকথার যে দুটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন এবং জীবনীকারের উল্লেখে শ্রীচৈতন্যদেব যে দুটি লীলা অভিনয় করতেন তা বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে চৈতন্যপূর্ব কাল থেকেই বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল—এইটিই সত্য হিসেবে প্রতিভাত হয়। এবং বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য চৈতন্যদেবের আস্বাদনধন্য যদি নাও হয়ে থাকে কিংবা সনাতন যদি এই কাব্যটিকে উল্লেখ নাও করে থাকেন, তবুও একথা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে চৈতন্যপূর্বকালের এই জনপ্রিয় প্রসঙ্গ-দুটি বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য মারফৎই আমরা পেয়েছি। অন্যত্র কোথাও এর সন্ধান পাওয়া যায় নি। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মহাপ্রভু আস্বাদন করতেন কিনা—এই বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও এই কাব্য-বিষয়টিকে চৈতন্যপূর্ববর্তী বলে গ্রহণ করার পক্ষে বেশ কিছু প্রমাণ আমরা পেয়েছি। অতএব পঞ্চদশ শতাব্দীর কাব্য-বিষয় হিসেবেই আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণকথার বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতার সন্ধান করব।

ঐতিহ্য ও উত্তরণ ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির প্রথমাংশ, শেষাংশ এবং মাঝখানের কিছুটা অংশ পাওয়া যায় নি। এজন্য কিন্তু কাহিনী অনুধাবনের অসুবিধা হয় না। ভূমিভারহরণের জন্য দেবতাদের অনুরোধে মর্ত্যে কৃষ্ণের জন্ম, মথুরাগমন, মথুরা থেকে কিছু সময়ের জন্য প্রত্যাবর্তন এবং রাধার সঙ্গে মিলনের পর কৃষ্ণের পুনরায় মথুরা যাত্রা ও বিরহিণী রাধার ব্যাকুল ক্রন্দন পর্যন্ত এসে পুঁথিটির পাতা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই কাব্যটি মিলনান্ত অথবা বিয়োগান্ত তা বোঝা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি মোট ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত—জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ।

কাব্যটিতে এর কাহিনী অংশ আমরা যেটুকু পাচ্ছি, এবার তা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। দেবতাদের প্রার্থনায় কংসাসুরের অত্যাচার-পীড়িত পৃথিবীর ভার-মোচনের জন্য বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে জন্মালেন। আর লক্ষ্মী রাধারূপে জন্মালেন সাগর গোয়ালা ও পদুমার কন্যারূপে। এরপর কাহিনীতে কৃষ্ণ এক গ্রাম্য গোপ-যুবক আর রাধা তখন আইহন গোয়ালার পত্নী। বড়ায়ির কাছে রাধার অসামান্য

রূপলাবণ্যের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বড়ায়ির হাতে তাম্বুল দিয়ে রাধাকে প্রেম নিবেদন করলেন। রাধাচন্দ্রাবলী এই প্রেম প্রত্যাখ্যান করে বড়াইকে অপমান করলেন। অপমানিত কৃষ্ণ বড়ায়ির সহযোগিতায় রাধার প্রেম লাভের জন্য ষড়যন্ত্র করলেন। দানী সেজে কৃষ্ণ রাধার দধিদুগ্ধ বিনষ্ট করলেন এবং রাধাকে জোর করে ভোগ করলেন। নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে সম্ভোগ করার জন্য কাণ্ডারী সেজে গোপীদের যমুনা পার করে দিলেন এবং শেষে নৌকা ডুবিয়ে রাধার সঙ্গে জলকেলি করলেন। এবার রাধা কৃষ্ণের প্রতি কিছুটা অনুকূলা হলেন। অতঃপর ভারবাহীরূপে কৃষ্ণ রাধার ভার বহন করলে ও রৌদ্রনিবারণের জন্য রাধার মস্তকে ছত্রধারণ করলে রাধা রতিদানের আশ্বাস দিলেন। পরে কৃষ্ণ, রাধা ও অন্যান্য গোপিনীদের সঙ্গে বনবিলাস করলেন। এই কাব্যে কৃষ্ণের বীর্যপ্রকাশক একটিমাত্র যে লীলা রয়েছে তা কালীয়দমন। কালীয়দমনের পর গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের জলক্রীড়া ও বস্ত্র-হরণলীলা। এরপর দেখি কৃষ্ণ রাধার হার চুরি করেছেন এবং রাধা যশোদার কাছে গিয়ে কৃষ্ণের দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন। এজন্য ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ রাধার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে মদনবাণ নিক্ষেপ করলে রাধা মূর্চ্ছিতা হলেন। রাধার অবস্থা দেখে কৃষ্ণ ভীত ও অনুতপ্ত হলেন। রাধার শোকে ব্যাকুল বড়াই কৃষ্ণকে বন্ধন করে ফেলল, কিন্তু কৃষ্ণের কাতর অনুরোধে পরে তার বন্ধন মোচন করল। পরে রাধার জ্ঞান ফিরে এলে রাধা এবং কৃষ্ণ মিলিত হলেন। এরপর বংশীখণ্ডে দেখা যায়, একদা কৃষ্ণবিমুখী রাধা এখন কৃষ্ণপ্রেমব্যাকুলা। কৃষ্ণের বাঁশীর সুর রাধাকে ব্যাকুল করে তোলে। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য রাধা বড়াইর সাহায্য প্রার্থনা করলে বড়াই রাধাকে কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করার পরামর্শ দিল। বাঁশীর শোকে কাতর কৃষ্ণ বহু অনুনয় বিনয় করলে রাধা তাঁর কাছ থেকে মিলনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাঁশী ফিরিয়ে দিলেন। সর্বশেষ অংশ 'রাধাবিরহে' বিরহব্যাকুল রাধা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন। মিলনের পর ক্লান্ত রাধা কৃষ্ণের কোলে মাথা রেখে নিদ্রিত হলে কৃষ্ণ বড়াইর হাতে তাঁর ভার দিয়ে সেই অবস্থায় তাঁকে পরিত্যাগ করে মথুরা যাত্রা করলেন। এরপরই পুঁথি খণ্ডিত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথা-অংশের বিভিন্ন দিকে সংস্কৃত সাহিত্যের ও পুরাণের প্রভাব যেমন রয়েছে—তেমনি প্রত্যক্ষভাবে কাহিনীর ধারাবাহিক বর্ণনায় পুরাণ ও লৌকিক সংস্কৃতির সম্মেলনও লক্ষ্য করা যায়। দানখণ্ড নৌকাখণ্ডকে অনেকেই সম্পূর্ণ লৌকিক উপাখ্যান বলে থাকেন। এগুলি বহু প্রাচীনকাল থেকে লোকমুখে প্রচলিত। স্থায়িত্ব ও জনপ্রিয়তার জোরেই পুরাণ ও সাহিত্যে এগুলি স্থান পেয়েছে। জাতক এবং বৈদিক সাহিত্যেও লোকজীবনের দৈনন্দিনতার স্পর্শে উজ্জ্বল এই ধরনের অনেক গল্প পাওয়া যায় এবং আপাত দৃষ্টিতে অপৌরাণিক উপাদানই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বেশী গৃহীত হয়েছে। জন্ম-খণ্ডে কবি বেশী প্রভাবিত হয়েছেন ভাগবতের দ্বারা। তবে ভাগবতকে তিনি এই অংশে হুবহু অনুসরণ করেন নি। তার প্রমাণ হল, ভাগবতে বসুমতী গোরূপ ধারণ করে ব্রহ্মার কাছে নিজের দুঃখ নিবেদন করেছেন। এই কাহিনী কবি পুরোপুরি বাদ দিয়েছেন। আবার পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মত দুটি সুপ্রচলিত কৃষ্ণলীলাকথার পুরাণ

থেকেও কবি সবসময় উপাদান গ্রহণে উৎসাহিত হন নি। সেই কারণে পদ্মপুরাণের রাধা বৃষভানুনন্দিনী হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা সাগর গোয়ালার কন্যা। পদ্মপুরাণে কৃষ্ণ ও রাধার সখাসখীদের নামের বিস্তৃত বর্ণনা থাকলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এদের নামের কোন উল্লেখ নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের রাধাচন্দ্রাবলী নামটুকু গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের রাধা স্বকীয়া নায়িকা, ব্রহ্মা তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ দিয়েছেন। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা কৃষ্ণের মাতুলানী। আবার ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে রাধার প্রসঙ্গ আদৌ না থাকলেও, পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখেছি রাধাপ্রসঙ্গ বহু প্রাচীনকাল থেকেই লৌকিক সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা কেবলমাত্র পুরাণসম্ভবা নন।

তবুও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রধানত পৌরাণিক অংশ ভাগবত থেকেই নেওয়া হয়েছে। তবে ভাগবতের শারদ রাসের প্রসঙ্গ এখানে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের কাহিনী কোন পুরাণে নেই। ছত্রখণ্ড ও ভারখণ্ড এই দানলীলারই পোষক আখ্যান। বংশীখণ্ডও প্রচলিত অপৌরাণিক আখ্যান। হারখণ্ড বাণখণ্ড প্রভৃতিও লৌকিক কাহিনী থেকে নেওয়া বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বৃন্দাবনখণ্ডের কাহিনীর আভাস ভাগবতে আছে। সেখানে আছে গোপীদের নিয়ে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ভ্রমণ করছেন। ফুলচুরি, বৃন্দাবনে ক্রীড়া, নৌকালীলা, বাঁশী চুরি, বস্ত্রহরণ ও দানলীলা প্রভৃতি রূপগোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণিতে শৃঙ্গারভেদ প্রকরণে রয়েছে। এক্ষেত্রে রূপ গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পরিচয়ের প্রসঙ্গ না তুলে আমরা বলতে পারি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকার এবং উজ্জ্বলনীলমণিরচয়িতা একই সাধারণ উৎস থেকে এই সমস্ত কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। আমাদের অনুমান, এই সাধারণ উৎসটি হলো লোক-কথা।

এ ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কাহিনীর মধ্যে পূর্ববর্তী শতাব্দী অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবাহিত কৃষ্ণকথার স্তরপরম্পরা লক্ষ্য করা যায়। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে কবি তাঁর কাব্যকাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করেছেন। অগ্নি, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণের কিছু কিছু প্রসঙ্গও চণ্ডীদাসের এই কাব্যে পাওয়া যায়। কবি কৃষ্ণকে পদ্মনাভ, চক্রপাণি, গদাধর, সারঙ্গধর প্রভৃতি নামে সম্বোধন করে পুরাণানুসরণেরই পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কিশোর কৃষ্ণ, স্বাভাবিকভাবেই মনে করিয়ে দেয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের 'মায়াবালকবিগ্রহঃ' কৃষ্ণকে। কিন্তু এই পুরাণের মত কবি রাধাকে কৃষ্ণের বয়োজ্যেষ্ঠা করে রাখেন নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধার অপেক্ষা কৃষ্ণ 'বএসে' জ্যেষ্ঠ'। এখানে পুরাণপারঙ্গম কবি সচেতনভাবেই পুরাণকে অস্বীকার করে স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে চেয়েছেন। বাস্তবতার প্রতি এই আকর্ষণ নিঃসন্দেহে লোক-রুচির অনুগ। বংশীধারী কৃষ্ণের মূর্ত্তি বর্ণনায়ও বড়ু চণ্ডীদাসের বিশিষ্ট কবি-মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সদুক্তিকর্ণামৃতের কোনও কোনও পদে এবং গীতগোবিন্দে বংশীবাদনরত কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণের হাতে বাঁশী নেই—এমন কি রাসলীলাতেও নয়। ভাগবতে প্রথম বংশীবাদনরত কৃষ্ণকে দেখা যায়।[৬] শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি বংশীধারী কৃষ্ণপ্রসঙ্গে প্রাচীন পুরাণ ও লৌকিক কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এই কাব্যে গোচারণের প্রথম থেকেই

কৃষ্ণ বেণুবাদনরত। তাঁর কাব্যের একটি খণ্ডের নামই বংশীখণ্ড। তাঁর কৃষ্ণের বাঁশী আবার মণি ও স্বর্ণনির্মিত। অবশ্য স্বর্ণনির্মিত বংশীর কথা সনাতন গোস্বামী তাঁর ভাগবতের টীকায় উল্লেখ করেছেন। তবে কৃষ্ণের বংশীধ্বনির গীত সম্পর্কে এই কবি যা বলেছেন—কৃষ্ণকথার ইতিহাসে তা অনন্য, একক। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, গীতগোবিন্দ এমন কি পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যেও এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তিনি বলেছেন কৃষ্ণের বাঁশীতে ওঁকার ধ্বনিত হত এবং চতুর্বেদ গীত হ'ত—

১· হরিষে পুরিআঁ কাহ্নাঞিঁ তাহাত ওঁকার (পৃ· ১১৬)

২· ঋগ্ যজু সাম অথর্ব্ব চারী বেদ গাওঁ মে বাঁশীর সরে।" (পৃ· ১২৭)

কবি তাঁর কাব্যে কৃষ্ণকথার উপাদান সংগ্রহে নানাবিধ আকর অনুসন্ধান করেছেন—এটি তার অন্যতম উদাহরণ।

চণ্ডীদাস কৃষ্ণের যে প্রসাধন কল্পনা করেছেন তা কিন্তু এক গ্রাম্য গোপকিশোরের কথাই মনে করিয়ে দেয়। কৃষ্ণের মাথায় ঘোড়া চুল, পায়ে একদা বাংলাদেশে সুপ্রচলিত মগর খাড়ু এবং হাতে বলয়। শুধু তাই নয়, তাঁর রাখালরূপকে সম্পূর্ণতা দানের জন্য বাঁশীর সাথে হাতে লগুড়ও কবি দিয়েছেন। গ্রামীণ সাধারণের রুচিকে পরিতৃপ্ত করার জন্যই কবি কৃষ্ণের এই গ্রাম্যরূপ অঙ্কন করেছেন। নিঃসন্দেহে এটিও কবির লোকমুখিতারই প্রমাণ।

কিন্তু অন্যদিকে আবার এই বড়ু চণ্ডীদাসই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার মহাযোগেশ্বর কৃষ্ণের সাদৃশ্যে তাঁর কৃষ্ণকে বলেছেন 'মহাযোগী' এবং একসময় রাধার প্রণয় নিবেদনের উত্তরেও কৃষ্ণ বলেন 'অহোনিশি যোগ ধেয়াই'। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে যোগস্বামী বিষ্ণুর মূর্তিবর্ণনা পাওয়া যায়। ধর্মপূজাবিধানেও কৃষ্ণকে যোগনিদ্রাসমাশ্রিত ও ধ্যায়ী বলা হয়েছে। পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে আমরা মহাযোগী কৃষ্ণের দৃষ্টান্ত পাই না। এটিও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্বের অন্যতম প্রমাণ।

কিন্তু একদিকে মহাযোগী কৃষ্ণ এবং অন্যদিকে ঘোড়াচুলা, মগর-খাড়ু বলয়পরিহিত, লগুড়ধারী কৃষ্ণ—এই বৈপরীত্য আপাত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলেও এটিও কবির লোকরুচি পরিতৃপ্তি করার প্রবণতা থেকেই জাত। যুক্তিসিদ্ধ প্রামাণিকতা অথবা রসসিদ্ধ স্বাভাবিকতার চেয়ে ঐশ্বর্যমিশ্রিত বিস্ময়রস এবং গ্রাম্যতা উভয়ই অশিক্ষিত সাধারণের রুচিকে আকৃষ্ট ও পরিতৃপ্ত করে। লোক-মনস্তত্ত্বের এই সাধারণ সত্যটুকু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবির জানা ছিল। তাই কালীয়দমনলীলার কৃষ্ণকে তিনি গরুড়বাহন বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য গীতগোবিন্দেও গরুড়বাহন কৃষ্ণের উল্লেখ রয়েছে।

সব মিলিয়ে বলা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কাহিনীতে কোথাও অনন্যতা নেই। কবির মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে আদিরস ও লোক-কথাকে পুরাণের কাঠামোয় ফেলে নতুন স্বাদে উপস্থিত করার মধ্যে। এবং দ্বিধাহীনভাবে আমাদের স্বীকার করতে হবে, পৌরাণিক কাঠামো থাকলেও লোক-কথার সমুচ্ছল মদিরা পরিবেশন করাই ছিল এই কবির প্রধান লক্ষ্য।

এই ঐতিহ্য আর উত্তরণ প্রসঙ্গেই আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গীতগোবিন্দের তুলনা-মূলক সম্পর্কটিও যাচাই করতে চাই। এক্ষেত্রে প্রথমেই মনে রাখতে হবে, গীতগোবিন্দের কবিও হয়ত বাংলা দেশে বসে কাব্য রচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর শ্রোতা সর্বভারতীয়। আর অন্যদিকে বড়ু চণ্ডীদাস কাব্য লিখেছেন শুধু বাঙালী শ্রোতার জন্য—বিশেষ করে পল্লী বাংলার মানুষের জন্য। জয়দেবই প্রথম কবি, যিনি কেবল রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথাকে ধারাবাহিকতায় আবদ্ধ করে একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনা করেছেন। বড়ু চণ্ডীদাসও জয়দেবের মতই কৃষ্ণকথার অন্যান্য অংশ বাদ দিয়ে শুধু রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার অংশটুকুকে তাঁর আখ্যায়িকা কাব্যের কথাবস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রেও বড়ুর নিজস্বতা লক্ষ্য করার মত। জয়দেব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লোককথার রাধা চরিত্রটিকে ইংগিতময় রূপ দিয়েছেন, কিন্তু লোক প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ-লীলার কাহিনীগুলি তিনি কাব্যে কোথাও গ্রহণ করেন নি। তাঁর রাধাকৃষ্ণপ্রেমের পটভূমি বৃন্দাবন হলেও গোচারক আভীর বালক কৃষ্ণ এবং গোপবধূ রাধার কোনও পারিবারিক পরিচয়ই তাঁর কাব্যে নেই। পৌরাণিক রাসলীলার প্রসঙ্গ এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের নায়ক-নায়িকা প্রকরণকে গ্রহণ করে তিনি তাঁর কাব্যের কথাবস্তু গড়ে তুলেছেন। অন্যদিকে, এইসব বৈশিষ্ট্যসহ বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যে রাধাকৃষ্ণের পারিবারিক পরিচয় দিয়েছেন; লোকজীবনে ছড়িয়ে থাকা রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার বিচ্ছিন্ন অংশকে নিজের কাব্যে ধারাবাহিকতায় সংযুক্ত করেছেন। জয়দেবের কাব্যে অন্তত একবার হলেও রাধাকৃষ্ণকে 'দম্পতি' বলা হয়েছে।[৮] এবং এদের প্রেমকে সুস্পষ্টভাবে পরকীয়া প্রেম হিসেবে চিহ্নিত করা হয় নি। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেম যে পরকীয়া প্রেম, এ ব্যাপারে সংশয়ের তিলমাত্র অবকাশ নেই। সুতরাং কথাবস্তু নির্মাণে জয়দেবের ঋণ গ্রহণ করেও বড়ু চণ্ডীদাস সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রেখেছেন।

শুধু বড়ু চণ্ডীদাসই নন, অন্য প্রদেশের আর এক প্রতিভাবান কবিও প্রায় একই সময় রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা নিয়ে পদ রচনা করেছেন এবং জয়দেবের প্রভাব অঙ্গীকার করে নিজেকে 'অভিনব জয়দেব' আখ্যা দিয়েছেন। বিদ্যাপতির পদে 'বিলাসকলাকুতূহল' এবং মণ্ডনকলা দুই-ই জয়দেবের অনুরূপ। কিন্তু জয়দেবের মত একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য তিনি রচনা করেন নি। অন্যদিকে বড়ু চণ্ডীদাস কিন্তু বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনা করলেন। কৃষ্ণ-লীলার অন্যান্য প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথাকে নিয়ে কাব্য রচনার পরিকল্পনা বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের কাছ থেকেই পেয়ে থাকবেন—এটি আমাদের দৃঢ় অনুমান।

কাব্য প্রকরণের দিক থেকেও বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের কাছে ঋণী। জয়দেবের কাব্যে মোট বারোটি সর্গ আছে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মোট বারোটি খণ্ড। অতিরিক্ত অংশটির নামকরণে তিনি 'খণ্ড' শব্দ ব্যবহারই করেন নি। জয়দেব তাঁর কাব্যে যে গীতগুলি রচনা করেছেন তার ভাষা সংস্কৃত হলেও সেই ভাষা সহজ, সাবলীল, বাংলা ভাষার নিকটবর্তী। এর ছন্দও লৌকিক-অপভ্রংশ ছন্দ। কিন্তু এই গীতগুলির আগে, সর্গারম্ভে কবি ব্যবহার করেছেন গতানুগতিক সংস্কৃত শ্লোক। সর্গ সমাপ্তিতেও কবি ব্যবহার করেছেন শিখরিণী, পুষ্পিতাগ্রা, শার্দুলবিক্রীড়িত প্রভৃতি অভিজাত সংস্কৃত ছন্দে বদ্ধ শ্লোকাবলী। এই ধরনের 'বিষম ধাতু'র মিলন ঘটানোর পেছনে যে সামাজিক ও ধর্মীয় সমীকরণের প্রেরণা কবির মনে কাজ করেছে তা আমরা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। বড়ু চণ্ডীদাসও তাঁর কাব্যে মাঝে মাঝে কোন কোন পদের আরম্ভে অথবা শেষে সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহার করেছেন। কিন্তু জয়দেব সর্গ প্রারম্ভে অথবা শেষের সংস্কৃত শ্লোকে নিজেই কৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভক্তি নিবেদন করেছেন, অন্যদিকে বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণের নিজের মুখে বা অন্য চরিত্রের মুখ দিয়ে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব ঘোষণা করলেও নিজে ব্যক্তিগতভাবে কোন সময়েই কৃষ্ণের চরণে ভক্তি নিবেদন করেন নি। শুধু জয়দেবের কাব্য-কৌশলটুকুকে অংগীকার করে গ্রাম্যতাসর্বস্ব হওয়ার অপবাদ থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন।

এ ছাড়া জয়দেবের গীতগোবিন্দের সংলাপ-প্রাধান্যকেও বড়ু চণ্ডীদাস গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জয়দেবের কাব্যের তিনটি চরিত্রের সংলাপ অলংকারশাস্ত্র সম্মত নায়ক-নায়িকার ও তাদের মধ্যস্থ দূতীর মিলন-মান-অভিমান, আপাত-বিরাগ ও অনুরাগের আলংকারিক রীতিমাফিক প্রকাশ। আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তিনটি চরিত্রের সংলাপ জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে একটা বিশেষ যুগের, বিশেষ পরিবেশের মানুষের ব্যক্তিত্বের তীব্র সংঘাতের উত্তাপ আর দীপ্তিতে উজ্জ্বল। জয়দেবের কাব্যে চরিত্র তিনটি-রাধা, কৃষ্ণ ও প্রেমসহায়িকা সখী। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যেও প্রধান চরিত্র তিনটি। কিন্তু তাঁর কাব্যে সখীর জায়গা দখল করেছে বড়াই। এক্ষেত্রে বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবকে অনুসরণ করেও স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। তাঁর রাধাকৃষ্ণ জয়দেবের রাধা-কৃষ্ণের মত নিত্যবৃন্দাবনের নিত্যলীলার নায়ক-নায়িকা নন, তাঁরা মধ্যযুগের বাংলাদেশের দুটি গ্রামীণ নরনারী। গ্রামীণ পরিবেশে তাদের তথাকথিত পরকীয়া প্রেমের দূতিয়ালি করাও কোনো যুবতী সখীস্থানীয়ার পক্ষে সামাজিক কারণেই সম্ভব ছিল না। জয়দেবের কাব্যের মত রাজসভার আবহও সেখানে নেই। তাই পূর্ব ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে বড়ু চণ্ডীদাসের প্রতিভা বড়াইর মতো একটি জীবনস্পন্দনে স্পন্দিত চরিত্রে জীবনের কমিটমেণ্টকেই উপহার দিয়েছে।

বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যের বৃন্দাবনখণ্ডে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার বর্ণনায় ভাগবত এবং গীতগোবিন্দ উভয় উৎস থেকেই ঋণ গ্রহণ করেছেন। তবে ভাগবতের অনুরূপে জয়দেব এই লীলাকে রাসলীলাই বলেছেন, কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস বৃন্দাবনখণ্ডের কোন স্থানেই এই লীলাকে রাসলীলা বলেন নি। অবশ্য কাল নির্বাচনে বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবকেই গ্রহণ করেছেন। ভাগবতের শরৎকালীন শান্ত প্রাকৃতিক পটভূমি নয়, তিনি বেছে নিয়েছেন গীতগোবিন্দের বসন্ত ঋতুকে। এখানেও শিল্পী হিসেবে বড়ু চণ্ডীদাসের সচেতনতার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। ভাগবতে রাসলীলা পরিপূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক বলেই সেখানে পটভূমি শান্ত শরৎকালের। কিন্তু হরিস্মরণের সঙ্গে সঙ্গে 'বিলাসকলাকুতূহল' যাঁর উপজীব্য তিনি প্রেমলীলার পটভূমি হিসেবে বসন্ত ঋতুকেই বেছে নেবেন এটাই স্বাভাবিক। বড়ু চণ্ডীদাসও জয়দেবের মতই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অংশটুকু কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাঁর কাব্যেও জয়দেবের রাসলীলার অনুরূপ প্রেমলীলার পটভূমি বসন্ত ঋতু।

বর্ণনা এবং কবিত্বের জন্য মাঝে মাঝেই বড়ু কবি গীতগোবিন্দ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। তাম্বূল খণ্ডে কবি রাধার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মহুয়া ফুলের মত রাধার কপোল, ওষ্ঠ অধর বাঁধুলি ফুলের মত, নাসা তিলফুলের মত, আর কণ্ঠ কম্বুর মত। এই বর্ণনা একেবারেই গীতগোবিন্দের দশম সর্গের রাধারূপ বর্ণনার অনুরূপ—

বন্ধূকদ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধূকচ্ছবি—
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিন-শ্রীমোচনং লোচনম্।[৯]

সব সময়েই যে কবি গীতগোবিন্দের আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন তা নয়, অনেক সময় গীতগোবিন্দের ভাবানুবাদও তাঁর কৃষ্ণকথাকে ঐশ্বর্যময় করেছে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ডে নীলোৎপলনয়না রাধার কাছে তার চোখ দুটির জন্য কৃষ্ণ পাঁচ লক্ষ দান চেয়েছে। তাই জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দের দশম সর্গে কৃষ্ণের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—'নীল-নলিনাভমপি তন্বি তব লোচনম্'।[১০] গীতগোবিন্দে মানিনী রাধাকে কৃষ্ণ বলেছেন—

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়নশরঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনম্
যেন বা ভবতি সুখজাতম্।[১১]

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণও রাধাকে অনুরোধ করেন—'ভুজযুগে বান্ধী রাধা দশনদংশনে। মোর সমুচিত ফল কর রুষ্ট মনে।'[১২] অনুবাদ এখানে আক্ষরিক নয়। কিন্তু তবুও গীতগোবিন্দের মূল শ্লোকের প্রসঙ্গ নিতান্ত অন্যমনস্ক পাঠকেরও অনায়াসগোচর হবে। গীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গ 'স্নিগ্ধঃ মধুসূদনঃ'-এ বিরহিণী রাধার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। পদটির প্রথম দুই পংক্তি হল—

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্॥[১৩]

কবি এই পদটির একেবারেই মূলানুবাদ করেছেন—'নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।

গরল সমান মানে মলয়পবনে ॥'[১৪] তবে জয়দেবের ছন্দের ললিত হিল্লোল ও শব্দের লাবণ্যময় কমনীয়তা বজায় রাখা এই ধরনের অনুবাদে সম্ভব হয় নি। গীতগোবিন্দে বিরহিণী রাধার বর্ণনা দিতে গিয়ে সখী কৃষ্ণকে বলেছে—

অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্।
স্বহৃদয়মর্মণি বর্ম্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্ ॥[১৫]

আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়াই বলেছে—'আহোনিশি মদন মারে তারে শরে। হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে।'[১৬] এখানেও অনুবাদ আক্ষরিক, তবে এই ধরনের মূলানুবাদ করতে গিয়ে কবি মাঝে মাঝে সঙ্গতি রাখতে পারেন নি। বিষয় এক হলেও গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কথাবস্তু এবং চরিত্রের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য। তাই গীতগোবিন্দের মূলানুবাদ কোন কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চরিত্র ও ভাবে অসঙ্গতির সৃষ্টি করেছে। গীতগোবিন্দের দশম সর্গে মুগ্ধমাধব বলেন—'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদি। হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।'[১৭] বৃন্দাবন খণ্ডের কৃষ্ণও অনুরূপভাবেই মানিনী রাধাকে বলেন—'যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ দশন-রুচি তোহ্মারে। হরে দুরুবার ভয় আন্ধকার সুন্দরি রাধা আহ্মারে।'[১৮] এখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি কৃষ্ণের মধ্যে গীতগোবিন্দের ধীরললিত নায়কের ভাব আরোপ করেছেন। কিন্তু রাধার মান কৃষ্ণের এই একান্ত অনুরোধেও দূর না হওয়ায় কাব্যের পরবর্তী অংশে কৃষ্ণ যে রূঢ় অশালীন বর্বর আচরণ করেছেন তা মোটেই গীতগোবিন্দের নায়কের অনুরূপ নয়। যে কৃষ্ণ একটু পরেই জয়দেবের কৃষ্ণের অনুকরণে বলেছেন—'তোহ্মে সে মোহোর রতন ভূষণ তোহ্মে সে মোহোর জীবনে।'[১৯] (ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্ ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্[২০]), তিনিই ঠিক পরমুহূর্তে বলেন—'যত বা ফুল ফল নিল তার দেন্ত কৌড়ী। নহে বা বান্ধিআঁ রাখিবোঁ দৃঢ় দোৌড়ী'।[২১] ফলে কৃষ্ণচরিত্রে কাব্যের এই অংশে বিসদৃশ অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়েছে।

আঙ্গিকের দিক থেকে জয়দেবকে অনুসরণ করে বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকথা অধিকতর লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু পদ অনুবাদের ক্ষেত্রে কোন কোন সময়ে জয়দেবের অন্ধ অনুকরণ বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের ঐশ্বর্য হয়ে ওঠে নি, রসাভাস সৃষ্টি করেছে। আসলে বড়ু গ্রামীণ রসসংস্কারকে জয়দেবের সুপরিশীলিত কাব্যকৌশলের অনুসারী করতে চাওয়ায় মাঝে মাঝেই এই রস-বিপর্যয় ঘটেছে।

জয়দেবের কাব্য-প্রকরণের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় প্রসঙ্গে নাটগীতি, রাখালিয়া নাটগীতি ইত্যাদি নানা বিপরীত মত যেমন কাজ করেছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আঙ্গিক সম্পর্কেও ঐ একই ধরনের অনিশ্চয়তা নানা বিপরীত মতের আবর্ত সৃষ্টি করেছে। এটিকেও কেউ বলেছেন ঝুমুর, কেউ বলেছেন লোকনাট্য। এর কারণ বোধহয় আঙ্গিকগতভাবে জয়দেবকে বড়ু চণ্ডীদাসের স্বীকরণ প্রচেষ্টা। কিন্তু এই স্বীকরণ সম্পূর্ণ অনুকরণ হয়ে ওঠে নি রাধাবিরহ অংশটির জন্য। জয়দেবের কাব্য রাধাকৃষ্ণের মিলনেই শেষ। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে বিরহিণী রাধার মর্মযন্ত্রণা পরবর্তী পদাবলীর গীতি-প্রবণতার উৎসমুখ খুলে দিয়েছে। জয়দেবের কাব্য দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত, অনুরূপভাবে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যেও বারোটি খণ্ড। কিন্তু শেষের 'রাধাবিরহ' অংশটি অতিরিক্ত। এটিকে 'খণ্ড' বলে কবি অভিহিত করেন নি। কোন কোন পণ্ডিত এর কারণ হিসেবে

রাধাবিরহকে প্রক্ষিপ্ত বলেছেন। আবার অনেকে এর প্রতিবাদ করে রাধাবিরহকে বড়ু চণ্ডীদাসেরই রচনা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে অভিহিত করেছেন।

ড. বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য' গ্রন্থে নানা যুক্তি দেখিয়ে রাধাবিরহকে প্রক্ষিপ্ত বলেছেন। এর মধ্যে প্রথম কারণ হল, 'রাধাবিরহ' অংশের নামকরণে 'খণ্ড' শব্দের অনুপস্থিতি। এ ছাড়া অন্যান্য কারণগুলি হল-- (১) রাধাবিরহ অংশে বড়াইর উক্তি "কেমন বেড়াএ কাহ্ন কিবা রূপ ধরে। একে° একে° সব কথা কহ তোঁ তোহ্মারে" থেকে মনে হয় যেন কৃষ্ণ বড়াইর অপরিচিত। (২) রাধাকৃষ্ণের পূর্ববর্তী দৈহিক মিলনের কোন উল্লেখ রাধাবিরহে নেই। (৩) এর মধ্যে কিছু কিছু ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলে মনে হয়। (৪) বিনিময় মুদ্রা হিসেবে দানখণ্ডে কড়ির উল্লেখ আছে, কিন্তু রাধাবিরহে সোনার উল্লেখ পাওয়া যায়। (৫) রাধাবিরহ অংশে এমন কিছু ভণিতা পাওয়া যায়, যা পূর্ববর্তী খণ্ডে দেখা যায় না।

কিন্তু পরবর্তী আলোচনায় ড. মজুমদার-এর এসব যুক্তি খণ্ডিত হয়েছে।[২২] হয়তো অনবধানতাবশতই রাধাবিরহ অংশটি 'খণ্ড' নামে চিহ্নিত হয় নি। কারণ, কালীয়দমনখণ্ডের পরবর্তী খণ্ডটির নাম পুঁথিতে নেই, সম্পাদক বসন্তরঞ্জনই এই অংশের নাম দিয়েছেন 'যমুনাখণ্ড'। এ ছাড়া 'রাধাবিরহ' অংশের শেষ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি, এতে 'খণ্ড' শব্দটি থাকতেও পারতো। দ্বিতীয়ত, 'রাধাবিরহ' অংশের বড়াই চরিত্রে অসঙ্গতির অভিযোগও যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে নি। বড়াই রাধাকে কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করতে বলেছে বলে কৃষ্ণ বড়াইয়ের কাছে অপরিচিত— এই ধারণাও ঠিক নয়। কারণ কাব্যের মধ্যে নানা ভাবেই বারবার চরিত্রগুলির মুখে রূপ বর্ণনার প্রসঙ্গ এসেছে। আর শুধু রাধাবিরহেই নয়, দানখণ্ডেও কৃষ্ণের একটি উক্তি পাওয়া যায়, যা থেকে মনে হয় ইতি পূর্বে রাধাকৃষ্ণের দৈহিক মিলন ঘটে নি—'বোল রাধিকারে° বড়ায়ি আহ্মার বচনে। তাহাক করিল আহ্মে আনেক যতনে॥ তভোঁ আনুমতী মোক নাঁ দিলেক ভালে। তাহার মণ থীর নহে কোন কালে॥'[২৩] সুতরাং ড. মজুমদার-এর এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। বিনিময় মুদ্রা হিসেবে কড়ির পরিবর্তে সোনার উল্লেখও রাধাবিরহকে প্রক্ষিপ্ত অংশ হিসেবে প্রমাণ করে না। কারণ সোনারূপা বহুকাল আগে থেকেই বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভণিতা সম্পর্কে তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন তাও মেনে নেওয়া যায় না। কারণ রাধা বিরহের যে আটটি ভণিতার অন্যত্র উল্লেখ নেই বলে তিনি মনে করেছেন, সেগুলির মধ্যে পাঁচটির উল্লেখই অন্যত্র পাওয়া যায়। এ ছাড়া 'রাধাবিরহে'র ভাষা সম্পর্কেও আধুনিকতার অভিযোগ আনা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ 'রাধিকা কাহ্নাঞির সঙ্গে আছে'—উক্তিটিকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে 'কাহ্নাঞি' শব্দটিকে কোনমতেই আধুনিক ভাষার উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

তবে একথা ঠিক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের 'রাধাবিরহ' অংশের ভাব ও সুরের মধ্যে পূর্ববর্তী খণ্ডগুলির তুলনায় কিছু অনন্যতা আছে। প্রেমতন্ময়া বিরহিণী রাধার হৃদয়ার্তি প্রকাশে যে ভাবগভীরতা রাধাবিরহ অংশে সঞ্চারিত হয়েছে এবং অন্যান্য খণ্ডের (বংশীখণ্ডের অংশবিশেষ ছাড়া) দেহসর্বস্বতার স্তর অতিক্রম করে প্রেমের

সূক্ষ্মতর অনুভূতি যে ভাবে রূপলাভ করেছে, তাতেই এর ভাষা ও সুর অন্যান্য খণ্ডগুলির তুলনায় স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। বংশীখণ্ডের দ্বিধান্দোলিতা রাধার বিরহবেদনা এখানে তন্ময়তা লাভ করেছে। ব্যক্তিচিত্তের গভীরতম অনুভূতির এমন আন্তরিক উন্মোচন অন্য খণ্ডে তেমন দেখা যায় না। এই কারণেই আমাদের মনে হয় কবি সচেতনভাবেই দ্বাদশ খণ্ডের পর ত্রয়োদশ অংশ 'রাধাবিরহ' সংযুক্ত করেছেন। এ ছাড়া কাব্যের সমগ্র অংশইতো বড়ু কবির পূর্বপরিকল্পিত। তাম্বুলখণ্ডেই তিনি তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুর সূচী শ্রোতা বা পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন। কৃষ্ণের দূতী বড়াইকে রাধা অপমান করলে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ কাব্যের পরবর্তী অংশে কি ভাবে রাধাকে শাস্তি দেবেন তারই বর্ণনা প্রসঙ্গে দানখণ্ড, হারখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, বাণখণ্ড ও রাধাবিরহের ঘটনাগুলির পূর্বাভাষ দিয়েছেন।

তোর আনুমতী লআঁ বলে রাধাক ধরিআঁ
লআঁ যাইবোঁ মাঝ বৃন্দাবনে ॥
পাছে মদনবাণে হাণিআঁ তাক পরাণে
রহিবোঁ ধরি মুনিবেশে।[২৪]

এই 'রহিবোঁ ধরি মুনিবেশে' কথাটি রাধাবিরহের তন্ত্রসাধক যোগীকৃষ্ণের পূর্বাভাষ। এই পাথুরে প্রমাণ পাওয়ার পর রাধাবিরহ অংশকে নিশ্চয় আর কেউ প্রক্ষিপ্ত বলবেন না। আসলে গীতগোবিন্দের মধ্যে যে মাত্রায় গীতি-উপাদান ছিল তাকে মহাকাব্যিক সর্গবন্ধে কোনভাবে বেঁধে রাখা জয়দেবের পক্ষে সম্ভব হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গীতি-উপাদানের আনুপাতিক প্রবল বেগ সেই মহাকাব্যিক সুনির্দিষ্ট সর্গোপম 'খণ্ড' বন্ধনে আর বন্ধন করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। কৃষ্ণকথাবস্তুর প্রবাহধারা এখন অনাগত পদাবলীর গীতিনাগরসঙ্গমের সমীপবর্তী হয়ে আসায় 'রাধাবিরহ' অংশটুকু যেন খণ্ডের সীমাশাসন ভেঙ্গে কূলপ্লাবী হয়েছে লিরিকেরই বেগবান প্রবাহে। বংশীখণ্ডে যার সূত্রপাত, রাধাবিরহের সমগ্র অংশ জুড়ে যে গীতি প্রাণতার বিস্তার, তাকে আর আমরা জয়দেব প্রভাবিত অংশ বলবো না। এই অংশে বড়ু একেবারেই আপন প্রতিভার দ্যুতিতে ভাস্বর। তিনি লিরিকপ্রবণ বাংলা কৃষ্ণকথা-কাব্যের প্রথম দীপ্তিমান অরুণ। এইখানেই ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করে নিয়ে কবি হিসেবে, শিল্পী হিসেবে বড়ু কবির ঐতিহাসিক উত্তরণ।

কাব্যকাহিনীর গঠন ঃ এখন আমরা কাব্যটির অপরাপর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করে দেখতে পারি। কাব্যটির মধ্যে একাধারে নাট্যরস, গীতিরস ও আখ্যান-বিবৃতির ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছে। লোকজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্তি ঘটাতেই যেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার এই ধরনের আঙ্গিক আশ্রয় করেছেন। আগে জয়দেবের গীতগোবিন্দে আমরা নাটগীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছি। রাধা, কৃষ্ণ ও সখী—এই তিনটি চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়েই এখানে কাহিনী এগিয়ে চলেছে। প্রধান হয়ে উঠেছে গীত। গীতগুলিই সংলাপ, সেগুলির মাধ্যমেই রাধা ও সখীরা তাঁদের মনোভাব প্রকাশ করেছেন। এর আগে রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা নানাভাবে সারা ভারতে বিস্তৃত থাকলেও তার মধ্যে নাটকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল না। বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যায় জয়দেবের গীতগোবিন্দই যাত্রাধর্মী নাটগীতের প্রথম উৎস। জয়দেবের আগে বাংলা দেশ ও উড়িষ্যায় সংস্কৃত নাটক

উত্তররামচরিত, মালতীমাধব, অনর্ঘরাঘব ইত্যাদির অভিনয় হত। বাংলা দেশে নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ পাল আমলে বুদ্ধদেবের জীবনের বিভিন্ন অংশ নিয়ে বুদ্ধ নাটক অভিনীত হয়েছে। এরপর হিন্দু সেন রাজাদের আমলে জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করলেন। তাঁর গীতগোবিন্দের গীতিধর্মিতা ও নাট্যধর্মিতা শুধু বাংলা, বিহার উড়িষ্যাই নয়, অন্ধ্র, রাজস্থান ও কেরালা প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণের মাধ্যমে মানুষের ভক্তিরসপিপাসাই চরিতার্থ হয়েছে। কিন্তু জয়দেব কৃষ্ণলীলার অধিকতর জনপ্রিয় অংশ রাধাকৃষ্ণলীলাকথাকে কেবলমাত্র বর্ণনাত্মক পদ্যবন্ধে আবদ্ধ না রেখে নাটকীয়তা দান করলেন।[২৫] ফলে কাব্যটি ভাগবত প্রভৃতি পুরাণের মত কেবলমাত্র পাঠ্য হয়েই রইল না। তিনটি চরিত্রের কথোপকথনকে নৃত্য ও গীতির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সর্বস্তরের মানুষের কাছেও পৌঁছে দেওয়া হল। শুধু বিষয় নয়, গীতগোবিন্দের এই বিশিষ্ট গঠনও তার সর্বভারতীয় বিপুল জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ। এর ফলে গীতগোবিন্দের প্রচুর অনুবাদও হল। একমাত্র উড়িষ্যাতেই গীতগোবিন্দের ছ'টি অনুবাদ হয়েছে। তার মধ্যে ধরণীধর ও বৃন্দাবনদাসের অনুবাদ খুবই জনপ্রিয়। মিথিলায় উমাপতি উপাধ্যায় জয়দেবকে অনুসরণ করে পারিজাতহরণ রচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলার একটি ঘটনা এর কথাবস্তু। নাটক এবং গানের সমাহারে এটি রচিত। এখানে জয়দেবের মত বিবৃতি নেই। এটি একটি সম্পূর্ণ নাটক।[২৬] বাংলা সাহিত্যে বড়ু চণ্ডীদাসই এর প্রথম অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তিনি উমাপতির মত নাটক রচনা করেন নি। গীতগোবিন্দের মতই বিবৃতি ও সংলাপ মিশিয়ে তাঁর কাব্য রচনা। গীতগোবিন্দের সংলাপ গীতসর্বস্ব, অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সংলাপ যথার্থই নাটকীয়, তীক্ষ্ম ইঙ্গিতগর্ভ। রাগ, বিরাগ, ঘৃণা, গর্ব—ইত্যাদি বিচিত্র ভাবের প্রকাশে এ কাব্য সার্থক। তাই সমালোচকের মতে "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যথার্থই গীতিনাট্য কাব্য।"[২৭]

গীতগোবিন্দের কিছু কিছু পুঁথিতে যেমন তালের উল্লেখ পাওয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও অনুরূপ উল্লেখ আছে। এ ছাড়াও দন্তকলগনী, চিত্রকলগনী, প্রকীর্ণক-লগনী, বিচিত্র-লগনী প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ এই কাব্যে পাওয়া যায়। জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণ(ন) রত্নাকর' মৈথিল ভাষায় চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থটিতেও একই ধরনের গীত অভিনয়ের সংকেত আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্বের এটিও অন্যতম প্রমাণ।

সাগর নন্দীর নাটক লক্ষণ রত্নকোষে তিনটি চরিত্রের দ্বারা অভিনেতব্য যে বীথি নাটকের কথা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। আবার জাগের গান ও ঝুমুর গানের সঙ্গেও এর সাদৃশ্য আছে। জাগের গান কথোপকথনমূলক আদিরসাত্মক 'ধামালি'। সারারাত্রি জেগে গান করা হয় বলে এর নাম জাগের গান। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সারারাত জেগে গান করা না হলেও এতে উক্তি-প্রত্যুক্তি আছে। 'ধামালি' শব্দের অর্থ হল সঙ্গম কামনা, নষ্টামি ও নাগরালি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য এত প্রকটভাবে আছে যে, ড. বিমানবিহারী মজুমদার কাব্যটি সম্পর্কে বলেছেন—"বসন্তরঞ্জন বাবুর আবিষ্কৃত খণ্ডিত পুঁথির

নাম রাধাকৃষ্ণের ধামালী বলিলে অধিকতর সঙ্গত হয়।"[২৮] আবার ঝুমুর গানও শৃঙ্গার রস বহুল, মাধবীকের মত মধুর ও মৃদু এবং বর্ণাদির বাঁধাধরা নিয়মহীন। ঝুমুর গানে গীত প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং এটি নাটকের মত কথোপকথন আকারের হয়। গায়কেরা দুটি দলে বা দুটির বেশী দলে বিভক্ত হয়ে এক এক দল এক একটি ভূমিকা গ্রহণ করে এবং পরস্পরের উক্তি-প্রত্যুক্তি গীতের মাধ্যমে রচিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনও এই ধরনের লোকগীতি। কথকতার ভিত্তিতেই এর কাঠামো তৈরি হয়েছে বলে এখানে মাত্র কয়েকদিনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এই কারণেই বোধহয় কাব্যটিতে মাঝে মাঝে কালগত ও স্থানগত অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য দেখা যায়। তারাপদ মুখোপাধ্যায় এ ধরনের কিছু অসঙ্গতির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[২৯] ছত্রখণ্ড পর্যন্ত রাধা এগার বছরের বালিকা। কিন্তু যমুনাখণ্ডে সেই রাধাকেই যুবতীরূপে দেখা যায়। ছত্রখণ্ড থেকে যমুনাখণ্ডের সময় তিন বছর। আবার এর মধ্যে গ্রীষ্ম, বসন্ত ও বর্ষা—তিনটি ঋতুর বর্ণনা আছে। অথচ কাব্যের ঘটনা মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে ঘটেছে বলেই বর্ণনা থেকে মনে হয়। এ-ছাড়াও একই ধরনের ঘটনার বারবার বর্ণনা, একই উক্তির বারংবার ব্যবহার এবং অন্যান্য কিছু কিছু তথ্যগত অসঙ্গতিও এর মধ্যে আছে। যেমন, বয়সের ক্ষেত্রে অসঙ্গতি আছে রাধার নিজেরই কথায়। সে একবার বলেছে তার বয়স এগারো, বারো বছর পূর্ণ হয় নি—"এগার বরিষে কাহ্নাঞিঁ বার নাহি পুরে।"[৩০] আবার একসময় বলেছে, দধি দুগ্ধ বিক্রয় করার জন্য সে মথুরা নগরে বারো বছর ধরে যাচ্ছে—'এহি মথুরা নগরে যাওঁ বারহ বৎসরে' এবং 'দধি বিকে জাই এ বড়ায়ি বারহ বৎসর।'[৩১] এ ছাড়া ঘটনাতেও নানা অসঙ্গতি লক্ষ্য করার মত। রাধা প্রত্যেকদিন মথুরা নগরে দধিদুগ্ধ বিক্রয় করতে যায় এ বর্ণনা কাব্যের মধ্যে আছে—

হেনমতে নিতি নিতি মথুরা নগরে।
দধিদুধ বিকিনিআঁ রাধা আইসে ঘরে।।[৩২]

কিন্তু অন্যত্র আবার রাধা বড়াইকে বলেছে—'ঘরত বাহির নহোঁ বড়ায়ি গো স্বামীর বড়ই দুলালী।'[৩৩] রাধা এক জায়গায় বলেছে—

এক ঠাঁই বাঢ়িলাহোঁ নান্দের ঘরে।
চণ্ডাল কাহ্নাঞি এবেঁ বল করে।।[৩৪]

অথচ কাব্যের প্রথমে দেখছি রাধা এবং কৃষ্ণের মধ্যে কোন পরিচয় নেই। পরিচয় তো দূরের কথা, কৃষ্ণ রাধাকে দেখেও নি। তাই বড়াই কৃষ্ণের কাছে রাধার রূপ বর্ণনা করেছে। অবশ্য এই ধরনের কিছু কিছু অসঙ্গতি মঙ্গলকাব্যগুলিতেও পাওয়া যায়। কিন্তু কাব্যগঠনের এই ত্রুটি ঢেকে গেছে বড়ু চণ্ডীদাসের নাট্যরস সৃষ্টিতে, কাব্য শেষে বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহের নিবিড়তন্ময় গীতিপ্রবাহে এবং চরিত্রসৃষ্টির অসামান্য দক্ষতায়।

তাই ঝুমুর, জাগের গান ইত্যাদির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সাদৃশ্য থাকলেও এটি সম্পূর্ণ লোক-রীতির নয়। কবি বড়ু চণ্ডীদাসের পাণ্ডিত্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে পৌরাণিক মণ্ডন সৌন্দর্যও দান করেছে। এই কাব্য কতগুলি কথোপকথনের সমষ্টি মাত্রও নয়। কাহিনীর সূত্র ও ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য কবি সংস্কৃত শ্লোকও ব্যবহার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কবির এই শ্লোক সংযোজন সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, বড়ু চণ্ডীদাস

সংস্কৃত জানতেন কিনা কিংবা শ্লোকগুলি তাঁরই লেখা কিনা সে সম্পর্কে সংশয় থেকে যায়। শ্লোকগুলি পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্তও হতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র বড়ু চণ্ডীদাসের সংস্কৃত জ্ঞানে সন্দিহান হয়ে কেউ এই ধরনের মন্তব্য করলে তা সঙ্গত মনে হয় না। কারণ ভাগবত এবং গীতগোবিন্দ যে কবি খুব ভালভাবেই অধ্যয়ন করেছিলেন—তার প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেই আছে। আর জয়দেবের গীতই শুধু নয়, জয়দেবের কিছু কিছু শ্লোকও তিনি যে ভাবে অনুবাদ করেছেন, তা তাঁর সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের পরিচয়ই বহন করে। অতএব কেবলমাত্র সংস্কৃত না জানার অভিযোগে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলা যাবে না। বড়ু চণ্ডীদাসই এই শ্লোকগুলির রচয়িতা। গীতগোবিন্দের দৃষ্টান্ত সামনে রেখেই কাহিনীর সূত্র ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য কবি সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহার করেছেন। ঝুমুর গান লোকগীতি, তাই তার গীতগুলিও লোকসঙ্গীত; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে অভিজাত রাগরাগিনীর ব্যবহারও আছে। সুতরাং কেবলমাত্র আখ্যায়িকার দিক দিয়েই নয়, প্রকরণের দিক দিয়েও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার তাঁর বৈদগ্ধ্যকে ব্যবহার করেছেন, অথচ প্রাধান্য দিয়েছেন লৌকিকতাকে। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে ঝুমুর গানের বহু বিশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও একে কেবলমাত্র ঝুমুর গান বলা যাবে না।

একদিকে পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্য এবং অন্যদিকে লৌকিক জীবনের মর্মনিঃসৃত জীবনরসের মিশ্রণে রচিত এই কাব্যের মধ্যে কোন কোন সমালোচক মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছেন। রসবিচারে এটিকে মহাকাব্য বলা যেতে পারে। কারণ অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত শৃঙ্গার, বীর, করুণ ও শান্ত—এই চারটি রসের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শৃঙ্গার রসকে আশ্রয় করেছে। কিন্তু বাইরের গঠনের দিক দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মহাকাব্যের লক্ষণ কিছুটা থাকলেও মহাকাব্যের বিশালতা ও ব্যাপ্ত বিচিত্র জীবনবোধ এর মধ্যে নেই। এছাড়া গ্রাম্য উক্তি-প্রত্যুক্তির আধিক্য এবং স্থূল যৌনতা-সর্বস্ব বর্ণনাও কাব্যটিকে মহাকাব্যের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করেছে। কিন্তু এর মধ্যে সুগঠিত কাহিনী আছে এবং সুচিত্রিত চরিত্র আছে। বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহে বিরহযন্ত্রনাবিদ্ধা রাধার আর্তিতে যে গীতিমূর্ছনার সৃষ্টি হয়েছে—তাও বড়ু চণ্ডীদাসের কবি প্রতিভার পরিচয় বহন করে। তাই কাব্যটিকে নাট্যরস সমৃদ্ধ, গীতিরস সম্পৃক্ত আখ্যায়িকা কাব্য বলাই সঙ্গত ও সমীচীন মনে করি।

বাণী শিল্প—বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যের বাণীবয়নে, চিত্ররচনায় এবং অলঙ্কার নির্মাণে লোকরুচিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে পরিবেশিত কৃষ্ণকথা যে সর্বতোভাবে জনরুচির অনুপন্থী এটি তারই সমর্থক। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিদ্রুপ-ব্যঙ্গে ঝলসিত খরদ্যুতি বাক্য-বিন্যাস খুব বেশী দেখা যায় না। কিন্তু আদি-মধ্যযুগীয় এই কবির কাব্যে তার বেশ কিছু দৃষ্টান্ত আছে। বিরহ ব্যথিতা রাধাকে কৃষ্ণ যখন বলেন—'পোটলী বান্ধিঞা রাখ নহুলী যৌবন'[৩৫] তখন ভাষা ব্যবহারের এই বিশিষ্টতাই কৃষ্ণ চরিত্রের নির্মমতাকে বুঝিয়ে দেয়। কৃষ্ণ রাধাকে প্রেম নিবেদন করে বাঁশীটি দিয়ে দিতে চাইলে রাধা বলে—

> তোর বাঁশী মোঞঁ ঘসি না ঘাটোঁ।
> তাক হাথে করী দুধ না আউটোঁ ॥[৩৬]

চিত্র রচনাতেও বাংলা দেশের প্রকৃতিকে তিনি তাঁর কাহিনীর উপযুক্ত পটভূমি রূপে ব্যবহার করেছেন। বসন্তের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে কবি কৃষ্ণের উদ্যানের ছবি এঁকেছেন—

ফুটিল গুলাল মাহলী মালতী মাধবী লতা
লবঙ্গ দোলঙ্গ নেআলী।
শেবতী কনক যূথী সুখী কনক কেতকী
পারলি দুলালি ॥[৩৭]

রাধা বিরহ অংশে কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্তা রাধা অভিসারে বেরিয়েছে। সেই অভিসারের পটভূমি অন্ধকার রাত্রি। তার বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও সুপ্রযুক্ত 'মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ংকর নিশী'। রাধার মুখ দিয়ে তার বিরহবেদনা বর্ণনা করিতে গিয়েও কবি বিভিন্ন প্রাকৃতিক পটভূমির ছবি এঁকেছেন—

ফুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল ॥[৩৮]

আষাঢ়ের মেঘ-কজ্জল দিবসে বেদনার্তা রাধা বলে—

জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ।
সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ ॥
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন।[৩৯]

ভাদ্রমাসেও যখন 'আহোনিশি অন্ধকার', তখন রাধাভাবে কৃষ্ণের বিরহবেদনায় হয়তো তার বুক ফেটে যাবে। বিভিন্ন ঋতুর পটভূমিকায় রাধার এই বিরহবেদনা মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ণিত বারমাস্যার অনুরূপ। তবে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক প্রভৃতি অলংকারের বহুল ব্যবহারে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য চিত্রসময় হয়ে ওঠে।

এই অলংকার নির্মিতিতেও কবি সংস্কৃত সাহিত্যের উত্তরাধিকার ও লোকায়ত জীবনের অভিজ্ঞতা—এই দুটি বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিবৃতির চেয়ে সংলাপই বেশী, তাই নারী অথবা পুরুষের রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে কবি নিজে যেমন উত্তম পুরুষে বর্ণনা করেছেন, তেমনি অনেক সময়ই আড়ালে থেকে পাত্র-পাত্রীর মুখে এই ধরনের অলংকারসমৃদ্ধ বর্নণা ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই অলংকারে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচলিত উপাদান যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি ব্যবহৃত হয়েছে লোকয়ত জীবনের নানা প্রসঙ্গ।

জন্মখণ্ডে রাধার রূপ বর্ণনায় কবি যে উপমানগুলি ব্যবহার করেছেন, তা একই সঙ্গে রাধার অতুলনীয় রূপ ও চরিত্রকে প্রকাশ করেছে। তাঁর রাধা অপরূপা 'তীনভুবনজনমোহিনী', সেই সঙ্গে সে 'রতিরসকামদোহনী'। কিন্তু তারপরই কবি যে উপমা দুটি ব্যবহার করলেন তা একই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলল নারীর ললিতলোভন কমনীয়তা ও দৃঢ়তাকে। রাধা শিরীষ কুসুমের মত কোমল, অথচ স্বর্ণ-প্রতিমার ঔজ্জ্বল্য আর কাঠিন্য তার অবয়বে। এই শিরীষ কুসুমকোমলাঙ্গী রাধার বর্ণনা কবির পূর্বসূরী জয়দেবের কাব্যেও আছে। কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গে কালিদাসও পার্বতীর বাহুযুগলকে 'শিরীষপুষ্পাধিক সৌকুমার্যৌ' বলে অভিহিত করেছেন। তবে কালিদাস ব্যবহার করেছেন ব্যতিরেক অলংকার, আর জয়দেব ও বড়ু চণ্ডীদাসের

কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে উপমা অলঙ্কার। আবার 'কনকপুতলী' রাধাও কুমারসম্ভবের উমার কথাই মনে করিয়ে দেয়—'ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চন-পদ্ম-নির্ম্মিতং মৃদু প্রকৃত্যা চ সসারমেব চ।[৪০] তাম্বুলখণ্ডে কিশোরী রাধার বেড়ে ওঠার বর্ণনাও আমাদের মনে করিয়ে দেয় কুমারসম্ভবের উমার কথা। উভয় ক্ষেত্রে একই উপমা ববহৃত হয়েছে। কুমারসম্ভবের কবি বলেন—

দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্ জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি।[৪১]

আর বড়ু চণ্ডীদাস বলেন—দিনে দিনে বাঢ়ে তনু লীলা।
পুরিল যেহেন চন্দ্রকলা ॥[৪২]

এখানে অবশ্য বড়ুর উপমা কালিদাসের তুলনায় নিষ্প্রাণ ও নিষ্প্রভ। এইভাবেই অনেক সময় সংস্কৃত সাহিত্যের অলঙ্কার ব্যবহার করতে গিয়ে কবি গতানুগতিকতায় আবদ্ধ হয়েছেন। কখনও কখনও একই ধরনের উপমা আহরণে বৈচিত্র্যবর্জিত বিবর্ণ তাঁর রূপ বর্ণনা। জন্মখণ্ডে কবির নিজস্ব কৃষ্ণরূপ বর্ণনা আর দানখণ্ডে কৃষ্ণ-মুখে রাধারূপ বর্ণনা সেই ক্লান্তিকর নীরক্ত পৌনঃপৌনিকতায় আক্রান্ত। এ ছাড়া পুরুষ এবং নারীরূপ বর্ণনায় প্রায় একই ধরনের উপমান ব্যবহার কবির পরিশ্রমশূন্য অন্ধ অনুকরণ প্রবণতাকেই প্রকাশ করেছে।

রূপবর্ণনায় বড়ু চণ্ডীদাস যে উপমা ও উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারগুলি ব্যবহার করেছেন সেগুলিতেই তিনি সবচেয়ে বেশী পরিমাণে সংস্কৃত সাহিত্যের গতানুগতিক অলঙ্কার নির্মাণ পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু কখনও কখনও এর মাঝখানেই হঠাৎ তার স্বাতন্ত্র্য আমাদের চমকে দেয়। দানখণ্ডে বারংবার কৃষ্ণের মুখে রাধার গতানুগতিক রূপ বর্ণনার মাঝখানে অকস্মাৎ কৃষ্ণ রাধার শরীরকে দেখেন নদীরূপে—

নাভী তার নদ ঘাট ত্রিবলী
ঘন জঘন পুলিনে।[৪৩]

চোখের ওপর ভেসে ওঠে একটি স্রোতস্বিনী নারীমূর্তি। শুধু নারী মূর্তি নয়, বেগবতী সে চঞ্চলা। ছত্রখণ্ডেও রূপতৃষ্ণা-ব্যাকুল কৃষ্ণ রাধাকে সম্বোধন করে বলে—'সুন্দরি রাধা ল সরোঅরময়ী।[৪৪] রাধার লাবণ্য যেন সরোবরের তরল জলরাশি। ঘনশ্যাম শৈবালের মত তার নিবিড় কুন্তল, তার মুখ সরোবরে প্রস্ফুটিত কমল, আর তার হাসি কুমুদফুলের সৌন্দর্য। এ যেন পরবর্তীকালের বৈষ্ণবকবি জ্ঞানদাসের সেই অতি পরিচিত পদের পূর্বাভাষ— 'রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।' রবীন্দ্রনাথের 'যৌবন সরসীনীর'-এর যেন আর এক পূর্বরূপ সতৃষ্ণ কৃষ্ণের এই রূপ বর্ণনা। অবশ্য পূর্ববর্তী শৃঙ্গার তিলকেরও একটি শ্লোকে এই রূপ বর্ণনার ইংগিত কেউ পেতে পারেন। তবে শৃঙ্গার তিলকের শ্লোকটির সঙ্গে কবির পরিচয় ছিল কিনা সে ব্যাপারে সংশয় থেকেই যায়।

এই কাব্যে রাধার রূপেই সবচেয়ে বেশীবার বর্ণিত হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত দুএকটি ছাড়া আর সব রূপবর্ণনাই আলঙ্কারিক প্রথাসর্বস্ব। কৃষ্ণের রূপ বর্ণনাতেও কবি সংস্কৃত সাহিত্যের গতানুগতিক উপমাই ব্যবহার করেছেন। তবে বংশীখণ্ডে

বাঁশী হারানোর পর বড়াইর মুখে শোকগ্রস্ত কৃষ্ণের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সেখানে কবি সাধারণ উপমানের সাহায্যেই বাচ্যোৎপ্রেক্ষার সৃষ্টি করেছেন—

মেঘ যেহ্ন আষাঢ় শ্রাবণে।
ঝরে তার পানী নয়নে গো ॥[৪৫]

এখানে এই সাধারণ উপমানই কৃষ্ণের স্বভাবের গ্রামীণ স্বাচ্ছন্দ্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। মাঝে মাঝে আবার গতানুগতিক উপমানকে আশ্রয় করে দেহবর্ণনার পৌনঃপৌনিকতা কাহিনীর প্রবহমানতায় বাধা সৃষ্টি করেছে। কখনও কখনও গীতগোবিন্দের একেবারে আক্ষরিক অনুবাদের অলংকারে কবির সেই গতিহীন জড়ত্ব বড় প্রকটভাবে চোখে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার মানভঞ্জন প্রসঙ্গ গীতগোবিন্দের দশম সর্গের 'মুগ্ধ মাধব' অংশে কৃষ্ণের অনুনয়ের অনুবাদ। জয়দেবের মুগ্ধ-মাধব রূপক ও উপমা অলংকারে মানিনী রাধার রূপ বর্ণনা করেছেন। রাধার শুভ্র দন্তরুচি রূপে জ্যোৎস্না কৃষ্ণের হৃদয়ের হতাশারূপে ঘোর অন্ধকারকে দূর করবে। নীল পদ্মের মত রাধার চোখ দুটি এখন অভিমানের অশ্রুবর্ষণে রক্তপদ্মের শোভা ধারণ করেছে। রাধার পল্লবের মত কোমল চরণ কৃষ্ণের মদনরূপে গরল দূর করবে। গীতগোবিন্দের মত বড়ু চণ্ডীদাসও বৃন্দাবনখণ্ডে একই অলংকার ব্যবহার করেছেন। ব্যবহৃত উপমানগুলি জয়দেবেরও নিজস্ব সৃষ্টি নয়, পূর্ব ঐতিহ্য থেকে ঋণ করা। কিন্তু ধ্বনি-সমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষাকে যথাসম্ভব সুললিতভাবে ব্যবহার করায় এবং লোকায়ত ছন্দকে সংস্কার করে সেই ভাষায় অনায়াস লাবণ্য-প্রবাহ বইয়ে দেওয়ায় বহু ব্যবহারে জীর্ণ উপমাই জয়দেবের কাব্যে নতুন আস্বাদ আর নতুন ঔজ্জ্বল্যে প্রতিভাত হয়েছে। অন্যদিকে বড়ু চণ্ডীদাস তারই আক্ষরিক অনুবাদে একই রূপক ও উপমা অলংকার ব্যবহার করেছেন। কিন্তু জয়দেব ভাষা ও ছন্দের যাদুকাঠিতে যা সজীব করে তুলেছিলেন, বড়ুর হাতে তা নিছক অনুকরণে নিষ্প্রাণ। এই দশম সর্গের শ্লোকেই জয়দেবের কৃষ্ণ রাধার মুখের সৌন্দর্যকে বিচিত্র পুষ্পলাবণ্যের উপমায় প্রকাশ করেছেন—

বন্ধূকদ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধূকচ্ছবি—
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিন-শ্রীমোচনং লোচনম্।
নাসাভ্যেতি তিল প্রসূন-পদবীং কুন্দাভদন্তি প্রিয়ে
প্রায়স্তন্মুখসেবয়া বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ ॥[৪৬]

বড়ু চণ্ডীদাসও উপমা ব্যবহারে জয়দেবকে হুবহু অনুসরণই করেছেন। কিন্তু রাধা সম্পর্কে গ্রাম্য রাখাল যুবক কৃষ্ণের মুখে যে সব শব্দ কাব্যে বহু উচ্চারিত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণের এই সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ যেন কিছুটা অসঙ্গত মনে হয়। আবার তাম্বুলখণ্ডে বড়াই চরিত্রের মুখে ব্যতিরেক অলংকারের সাহায্যে কবি রাধার রূপ যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা-ও গতানুগতিক। যেমন—

কনককমলরুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে ॥

* * * *

আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।
জলে পসি তপ করে নীল উতপল ॥[৪৭]

তবে গতানুগতিক হলেও বড়াইর এই উক্তি নিছক রূপ-প্রশস্তি নয়। এর মধ্য দিয়ে রাধার প্রতি তার অকৃত্রিম স্নেহই প্রকাশিত হয়েছে। গীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গে সখী কৃষ্ণের কাছে বিরহিণী রাধার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলে—

অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্।
স্বহৃদয়মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্ ॥[৪৮]

বড়ু চণ্ডীদাস এই গীতটিও হুবহু অনুবাদ করেছেন। এক্ষেত্রে অলংকার সুপ্রযুক্ত হলেও জয়দেবের কাছেই বড়ু চণ্ডীদাস প্রত্যক্ষভাবে ঋণী।

শুধু দেহরূপ বর্ণনার ক্ষেত্রেই নয়। চরিত্রগুলির মনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশের জন্যও কবি উৎপ্রেক্ষা অথবা রূপক অলংকার ব্যবহার করেছেন। বংশীখণ্ডের রাধা বলে—

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী ॥[৪৯]

এই অলংকার নির্মাণে গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতাই কাজ করেছে। তবে সংস্কৃত সাহিত্যেও অনুরূপ অলংকার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ভবভূতির উত্তররামচরিতে সীতা-বিরহী রামের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে নাট্যকার বলেছেন—

অনির্ভিন্নো গভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতিকাশো রামস্য করুণো রসঃ ॥[৪৯]

দানখণ্ডে নিজের যৌবনকে রাধা কালভুজঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেছে। কুমারসম্ভবে অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায় শিবের মুখে—'কঃ করং প্রসারয়েৎ পন্নগ রত্ন-সূচয়ে।'[৫০] অর্থাৎ রত্নভূষিত সাপের দিকে হাত বাড়াতে কে সাহস করে? কুমারসম্ভবের কবি কাকুবক্রোক্তি অলংকার ব্যবহার করে পরোক্ষভাবে নিষেধ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু রাধার উক্তি—

আহ্মার যৌবন কালভুজঙ্গম ছুইলেঁ খাইলে মরী।[৫১]

এখানে অলংকার লুপ্তোপমা এবং এই অলংকারের সাহায্যে রাধার নিষেধ প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত। ফলে কৃষ্ণবিরাগ এবং নিজের রূপযৌবন সম্পর্কে সচেতনতা—দর্পিতা রাধা চরিত্রের এই দুটি বৈশিষ্ট্যও এখানে ফুটে উঠেছে। 'রাধাবিরহে' কৃষ্ণবিরহিণী রাধার উদ্বেগ ও আর্তি-ব্যাকুলতার চিত্র আঁকতে গিয়ে কবি বলেন—

বনের হরিণী যেন তরাসিলী মনে।
দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নয়নে।[৫২]

এই উৎপ্রেক্ষা অলংকারটি গীতগোবিন্দের রাধার কথাই মনে করিয়ে দেয়—

সাপি ত্বদ্বিরহেন হন্ত হরিণীরূপায়তে হা কথং[৫৩]

কাব্যের অন্যান্য অংশের মত এখানেও গীতগোবিন্দ থেকে কবি সচেতনভাবেই ঋণ গ্রহণ করেছেন। রাধার কাছে কৃষ্ণের অন্যাসক্তির প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে বড়াই সাধারণভাবে পুরুষের বহুলোলুপতার দিকে ইঙ্গিত করেছে—

পুরুষ ভ্রমর দুইগো এক মান।
নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান ॥
নানা রঙ্গে রহে কাহ্নাঞিং আন নারী পাশে।[৫৪]

ভাগবতের দশম স্কন্ধে গোপিনীরাও উদ্ধবকে অনুরূপ কথা বলেছে—

পুষ্পিভিঃ স্ত্রীষু কৃতা যদ্বৎ সুমনঃস্বিবষট্‌পদৈঃ।[৫৫]

কাব্যের অন্যান্য অংশে ভাগবতের প্রভাব লক্ষ্য করে বলা যায় এই অলংকার ব্যবহারে কবি ভাগবত থেকেই ঋণ গ্রহণ করেছেন। ভাগবত থেকে গৃহীত হয়েও কিন্তু অলঙ্কারটি বিসদৃশ হয় নি, বর্ষীয়সী বড়াইর জীবন সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতাকেই প্রকাশ করেছে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর হংসপদিকার গানটিও এক্ষেত্রে মনে পড়ে—

অহিণবমহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চুঅমঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্তণিব্বুদো মহুঅর বিসুমরিদোসি ণং কহং[৫৬]

এই ধরনের ভাবগ্রহণ, অলঙ্কার ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যত্রও দেখা যায়। তাম্বূল খণ্ডে রাধার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেন 'ডমরু সদৃশ মধ্য নাভি গম্ভীরে।' কালিদাস উমার ক্ষীণ কটির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—'মধ্যেন সা বেদীবিলগ্নমধ্যা বলিত্রয়ং চারু বভার বালা'।[৫৭] কবি বড়ু চণ্ডীদাস পল্লীবাংলার কথাকার। তাই তাঁর কাব্যে ক্ষীণকটির উপমানরূপে ব্যবহৃত হয় ডমরু, বেদে-বাজীকরের যা নিত্যসঙ্গী। আর কালিদাস ঐশ্বর্যদৃপ্ত রাজসভার কবি হয়েও শান্তিসমাহিত তপোবনের আধ্যাত্মিক মহিমার রূপকার। তাই তাঁর কাব্যে উমার ক্ষীণ কটির তুলনায় আসে যজ্ঞবেদীর প্রসঙ্গ। দুজন কবির পৃথক মানসিকতা এইভাবে একই উপমিতকে উজ্জ্বল করার জন্য পৃথক উপমান ব্যবহার করেছে। তাম্বূলখণ্ডে কিশোরী রাধার ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠার বর্ণনা আমাদের আবার কুমারসম্ভবের উমার কথা মনে করিয়ে দেয়। উভয় ক্ষেত্রেই উপমা অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে, উপমানও হয়েছে অভিন্ন।

বিদ্যাপতির অলঙ্কার নির্মিতির সঙ্গেও বড়ু কবির সাদৃশ্য আছে। চৈতন্যপূর্ব এই দুই কবি একই রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথাকে নিয়ে কাব্যরচনা করেছেন। কিন্তু কবিধর্মে দুজনের বিস্তর পার্থক্য। বিদ্যাপতি নাগরিক কবি। তাই তাঁর রাধাকৃষ্ণের প্রেমে নাগরিক চতুরালির বিলাস-বিভ্রম। অন্যদিকে বড়ু চণ্ডীদাস গ্রাম্য কবি—তাই তাঁর রাধাকৃষ্ণের ভাষা অমার্জিত। কৃষ্ণের আচরণও পরুষ এবং স্থূল। তবুও অলঙ্কার ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝেই দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দানখণ্ডে রাধা বলে—

ননীর পুতলী যেহ্ন বড়ায়ি ল লো
রৌদ্রে দাণ্ডায়িলেং মিলাওং[৫৮]

বিদ্যাপতিও তাঁর পদে রাধা সম্পর্কে বলেছেন—

নবনিক পুতলি তনু তোয়
আতপ তাপে মিলায়।[৫৯]

রাধাবিরহে রাধার রূপ বর্ণনা—

গিএ গজমুতী হার মণি মাঝে শোভে তার
উচ কুচযুগল উপরে।

হঞাঁ সমান আকারে সুরেশরী দুঈ ধারে
পড়ে যেন সুমেরুশিখরে ॥[৬০]

আর বিদ্যাপতির পদেও রাধারূপে বর্ণনায় একই ধরনের উপমা ব্যহৃত হয়েছে—

পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর
উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার ॥[৬১]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিরহ ব্যাকুলা রাধা বলে—'পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁতথা'।[৬২] আর বিদ্যাপতির রাধাও বলে—'পাখী জাতি যদি হও পিয়া পাশ উড়ি যাও। সব দুঃখ কহোঁ তছুপাশে'।[৬৩] এই ধরনের অলংকার-সাদৃশ্য আরও পাওয়া যাবে। কিন্তু এই সাদৃশ্য থেকে আমরা এমন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি না যে কবি কুমারসম্ভব; অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ অথবা বিদ্যাপতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আসলে প্রাচীন সংস্কৃত উপমাগুলি একটা নির্দিষ্ট নিয়মের আওতায় থেকে কতগুলো ধরাবাঁধা বস্তু বা ভাবকে অলংকারের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত বা অবহট্‌ঠ কবিতাতেও সেই একই অলংকারের অনুসৃতি দেখা যায়। সুন্দরী নারী অথবা সুন্দর পুরুষের চুল, চোখ, কান, নখ, ঠোঁট, কপাল, কবরী, বাহু, স্তন ইত্যাদির সঙ্গে প্রায়ই কতগুলো ধরাবাঁধা নির্দিষ্ট জিনিসের তুলনা করা হয়। বেণীর সঙ্গে সাপের তুলনা করা হয়। সুতরাং কোন কবির কাব্যে যদি পূর্ববর্তী কাব্যে ব্যবহৃত একই ধরনের চিত্র দেখা যায় তাহলে সবসময় তাকে অনুকরণ না বলে বিশেষ আলংকারিক রীতির আনুগত্যজনিত সাদৃশ্য বলাই সঙ্গত। আসলে একই ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রায় একই ধরনের সামাজিক ব্যবস্থা নীতিবোধ-মূল্যবোধ এবং একই ধরনের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে মানুষের বিশ্বাস-সংস্কার এবং সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদি একই ভাবে গড়ে ওঠে।

তবু বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে কেবলমাত্র এই প্রথাবদ্ধ অলংকারই নেই। যে গ্রাম্য পরিবেশের মাঝখানে বসে তিনি কাব্যরচনা করেছেন; সেই পারিপার্শ্বিক থেকে অর্থাৎ লোকজীবন থেকে সংগ্রহ করে তিনি যে উপমাগুলি ব্যবহার করেছেন—সেখানেই তাঁর চিত্র এবং ভাব স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা লাভ করেছে। জন্মখণ্ডে নারদ ও বড়াইর রূপবর্ণনার কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসে। বর্ণনাগুলিতে বড়ু চণ্ডীদাস যেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতই কথায় ছবি এঁকেছেন, তাঁর লেখনী হয়ে উঠেছে তুলি। নারদের অবয়ব বর্ণনায় কবি দেবর্ষির ভক্তিস্নিগ্ধ আধ্যাত্মিক মহিমামণ্ডিত বার্ধক্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে গ্রামের নিতান্ত সাধারণ হাস্যোদ্রেককারী বৃদ্ধ চরিত্রে পরিণত করেছেন—

নাচএ নারদ ভেকের গতী।
বিকৃত বদন উমত মতী ॥
* * *
মেলে ঘন ঘন জীহের আগ।
রাঅ কাড়ে যেন বোকাছাগ ॥[৬৪]

ভেকের মত নৃত্যভঙ্গি আর বোকা ছাগলের মত হর্ষধ্বনি—এই দুটি উপমার সাহায্যেই নারদের দৈবী মহিমা সম্পূর্ণ অপসৃত হয়েছে। বড়ায়ির রূপ বর্ণনাতেও কবি একইভাবে গ্রামজীবনের অতি সহজলভ্য উপাদানগুলোকে নিয়ে অলঙ্কার নির্মাণ করেছেন। বড়ায়ির শ্বেত চামরের মত চুল, চুনের রেখার মত ভ্রূ, বাঁটুলের মত দুটি কোটর-প্রবিষ্ট চোখ আর কাঠির মত দুটি হাত। এই বর্ণনায় কবি যেন একেবারে সচেতন ভাবেই সমস্ত ধরনের পরিমার্জিত প্রথাবদ্ধ উপমাকে বাদ দিয়েছেন। কবি গ্রাম বাংলার অন্তঃপুরের চুনের ভাঁড়েই তুলি ডুবিয়ে বড়ায়ির ভ্রূদুটি এঁকে দিয়েছেন। এই ধরনের উপমা ব্যবহারে চরিত্র দুটি একেবারে জীবন্ত হয়ে ভেসে ওঠে আমাদের চোখের সামনে।

নারদ এবং বড়ায়ির রূপ বর্ণনা কবির বিবৃতি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যে এই ধরনের লৌকিক জীবন থেকে আহৃত অলঙ্কার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে চরিত্রগুলির মুখে। অলঙ্কার ব্যবহারের মধ্য দিয়েই অনেক সময় চরিত্রগুলির লোকায়ত বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। দানখণ্ডে কৃষ্ণের সঙ্গে দৈহিক মিলনে অনিচ্ছুক রাধা যখন বলে—

নহুলী যৌবন কাঁচ শিরিফল
তাহাক কেহো নাহিঁ খাএ ॥[৬৫]

তখন এই নিষেধাত্মক উপমার সাহায্যেই কৃষ্ণের সঙ্গে দৈহিক মিলনের প্রস্তাবে তার তীব্র ঘৃণা ও অনিচ্ছা প্রকাশ পায়। এই দানখণ্ডেই দেহভোগলুব্ধ কৃষ্ণের সামনে রাধা নিতান্ত কাতর হয়ে নিজেকে হরিণীর সঙ্গে তুলনা করে বলে—

কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী
আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী ॥[৬৬]

একটি প্রচলিত প্রবাদকেই রাধা এখানে উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু এই প্রবাদটির সাহায্যেই নিরুপায় রাধার আশঙ্কাগ্রস্ত মনের ছবি স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। বড়ু চণ্ডীদাস লোকজীবন থেকে যে উপমাগুলি গ্রহণ করেছেন, সেগুলি সবই এইভাবে চরিত্র ও কাহিনীর নাটকীয়তাকে যথার্থ রূপ দেওয়ার কাজে ব্যবহার করেছেন। যেমন—দেহলোভী কৃষ্ণের প্রতি রাধার তীব্র তীক্ষ্ম ব্যঙ্গোক্তি—

এ বোল বুলিতেঁ তোর মণে বড় সুখ
পরঘর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক ॥[৬৭]

অথবা রূপে ও বংশমর্যাদায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সচেতন রাধার দম্ভোক্তি—

(১) খুদ বড়সীএঁ রুহী বান্ধসী
(২) আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মরণ ইছসি।
সাপের মুখেতে কেহে আঙ্গুল দেসী ॥[৬৮]

একটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও বাকীটি লুপ্তোপমা। দুটিই গ্রামজীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা প্রসূত আর দুটিই সংলাপের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে রাধাচরিত্রকে নাটকীয়তায় উজ্জ্বল করে তুলেছে।

কৃষ্ণপ্রেমাতুরা রাধা যখন তার মর্মনিংড়ানো বিরহবাণী উচ্চারণ করে, তখন তার সেই অনুভবকে রূপ দিতে গিয়ে কবি গ্রামজীবনের প্রাত্যহিকতায় জড়িয়ে থাকা

তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রসঙ্গকেই উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কৃষ্ণের বিরহে রাধার মনে হয়, তার আঁচলের সোনা কেউ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। কখনও নিরুপায় গৃহ-বন্দিনী রাধা নিজেকে পিঞ্জরের শুকপাখির সঙ্গে তুলনা করে। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হ'ল না—এই দুঃখে রাধা বলে—

একেঁ দহদহ ঘসির আগুণ
আরে কে না জালে ফুকে।
ভিড়ি আলিঙ্গন দিতেঁ না পাইলোঁ
এ শাল থাকিল বুকে ।।[৬৯]

পিঞ্জরের শুক একটি সাধারণ উপমা। কিন্তু কৃষ্ণবিরহিণী রাধার ব্যাকুলতা প্রকাশে অমোঘ। 'আচলের সোনা' আর 'ঘসির আগুন'কে উপমান করায় মধ্যযুগের এক গ্রাম্য নারীই তার বেদনানুভবের অকৃত্রিম তীব্রতা ও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা নিয়ে আমাদের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

বড়াই এবং কৃষ্ণচরিত্রের সংলাপে যে উপমা-অলঙ্কারগুলি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলিও পারিপার্শ্বিক জীবনাভিজ্ঞতালব্ধ। বড়াই বিরহিণী রাধার সংবাদ নিয়ে কৃষ্ণের কাছে গেছে। কিন্তু কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রস্তাব নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করল। অথচ এই কৃষ্ণই একদা রাধার জন্য কি পরিমাণ উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল, তার একমাত্র সাক্ষী বড়াই। তাই কৃষ্ণের এই শঠতায় বিরক্ত বড়াই তার উষ্মা প্রকাশ করে বলে—

ভাত না খাইলি তবেঁ তাহার কারণে।
শাকর খাইতেঁ তোহ্মে আদরাহ কেহ্নে ।।[৭০]

এর উত্তরে কৃষ্ণও সদর্পে বলে—

সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপায় জুড়িএ আগুণ তাপে
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ জুড়ি এ কাহার বাপে।[৭১]

অলঙ্কার এখানে উপমা ও কাকুবক্রোক্তি। কিন্তু এই অলঙ্কারগুলি সৌন্দর্য সৃষ্টির চেয়েও কৃষ্ণ চরিত্রের নিষ্ঠুরতা ও দর্প প্রকাশ করে নাটকীয় প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করেছে। বড়াইও এর উত্তরে নাটকীয় ভাবে বলেছে, সোনার ঘট ভাঙ্গলে সে জুড়ে দিতে পারে, উত্তম ব্যক্তির প্রেম সোনার ঘটের মত। কিন্তু যে ব্যক্তি অধম ও যার অন্তর কপট তার প্রেম মাটির ঘটের মত, ভেঙ্গে গেলে আর জোড়া যায় না। কৃষ্ণ ও বড়ায়ির এই অলঙ্কৃত সংলাপগুলি আপাতদৃষ্টিতে নীতিকথা মনে হয়, কিন্তু চরিত্রের যথার্থ প্রতিক্রিয়া প্রকাশে এগুলি অপরিহার্য ও সুপ্রযুক্ত। লোকজীবনে দীর্ঘকাল ধরে প্রবাহিত হয়ে আসা অভিজ্ঞতা এদের চরিত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। বড়ু চণ্ডীদাসের অলঙ্কার নির্মিত সেই জীবন সত্যকেই প্রকাশ করেছে। তাঁর কাব্যে লোকজীবন থেকে সংগৃহীত এইসব প্রবাদ কবিরই জীবন ঔৎসুক্য ও মানব চরিত্র জ্ঞানের সার্থক পরিচয়বাহী।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে প্রধানতঃ তিনটি ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্র তিনটি হল পুরুষ অথবা নারীর দেহরূপ বর্ণনা, চরিত্রগুলির মনোভাব প্রকাশ এবং তীক্ষ্ম আক্রমণাত্মক অথবা পরস্পরের প্রতিরোধে ব্যবহৃত সংলাপে নিজেদের

বক্তব্যকে উজ্জ্বল, স্পষ্ট এবং অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী করার জন্য। এ ছাড়া, আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হল শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যে শব্দালংকারের ব্যবহার খুবই কম, আর সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণকথা আখ্যায়িকা কাব্য হিসেবে জীবনধর্মী এবং উপন্যাসের লক্ষণ বিশিষ্ট হলেও পদলালিত্যহীন। অথচ এই শব্দালংকারেরই বহুল প্রয়োগে পূর্ববর্তী জয়দেব-পদাবলীও পরবর্তী বৈষ্ণব-পদাবলী অনেক বেশী চিত্তগ্রাহী।

বড়ু চণ্ডীদাসের আর একটি কৃতিত্ব হল প্রবাদ-প্রবচনগুলিকে অলঙ্কার নির্মাণে ব্যবহার করে চলমান সমাজকে কাব্যের চরিত্রগুলির মর্মে প্রতিফলিত করা। এর কয়েকটি উদাহরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচনগুলি কেবলমাত্র চরিত্রের প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করে নি, সমাজ-জীবনেব নানা দিককেও কাব্যে প্রতিফলিত করেছে।

সাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার চিরকালের। বাংলা সাহিত্যে একেবারে চর্যাপদ থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক সাহিত্য পর্যন্ত সর্বত্রই প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়। এর কারণ বহু মানুষের অভিজ্ঞতায় গড়ে ওঠা এই সংক্ষিপ্ত সারবান উক্তিগুলি শিল্পীর বক্তব্যকে ইঙ্গিতগর্ভ যথার্থ তাৎপর্য দিতে পারে। এই প্রবাদের মধ্যে কখনও থাকে জীবনের অসঙ্গতির প্রতি তীব্র বিদ্রূপ, কখনও থাকে নিছক কৌতুক, আবার কখনও বা থাকে জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা জনিত বেদনা। প্রাকৃতিক কারণে অথবা সামাজিক কারণে যাদের অন্যায় অবিচার ও বঞ্চনা সহ্য করতে হয়—সেইসব মানুষের অশ্রুজলও মাঝে মাঝে নিটোল মুক্তার মত উজ্জ্বল, কঠিন, সংক্ষিপ্ত এবং মূল্যবান প্রবাদের জন্ম দেয়। তবে প্রবাদ-প্রবচন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রামজীবনে গড়ে ওঠে। তাই মাঝে মাঝে এর প্রকাশভঙ্গীতে লক্ষ্য করা যায় স্থূলতা ও গ্রাম্যতা। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রবাদগুলি সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যেতে পারে। রাধা যখন বলে 'আপণার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী'[৭২] তখন তার বেদনার্ত কণ্ঠে পুরুষের নারীদেহলুব্ধতার কাছে অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণকারী চিরকালের অসহায় নারীর কণ্ঠই বেজে ওঠে। রাধা কৃষ্ণকে ব্যঙ্গ করে বলে সে ছোট বঁড়শীতে বড় রুইমাছ বিঁধতে চায়।[৭৩] রাধার এই উক্তিতে বঁড়শীতে মাছ ধরার ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এ ছাড়া, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিভিন্ন খণ্ড থেকে গরম দুধ জুড়িয়ে খাওয়ার প্রসঙ্গ,[৭৪] বেদেদের সাপ ধরার প্রসঙ্গ (সাপের মুখেতে কেহ্নে আঙ্গুল দেসী),[৭৫] পান খাওয়ার প্রসঙ্গ (চুণ বিহনে যেহ্ন তাম্বুল তিতা)[৭৬], বাঙ্গালীর ভাতের প্রতি একান্ত আসক্তি (ভাতের ভোখ কাহ্নাঞিঁ ফলেঁ না পালা এ),[৭৭] কুমোরের মাটির জিনিস তৈরীর প্রক্রিয়া (বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী),[৭৮] সোনার ব্যবহার (সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাত্র জুড়িএ আগুন তাপে। পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ জুড়িএ কাহার বাপে)[৭৯], বিষাক্ত তীর দিয়ে বন্যজন্তু শিকার (বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী)[৮০] ইত্যাদি গ্রাম সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের নানা চিত্র এখানে ভেসে ওঠে।

আবার কিছু কিছু প্রবাদের ব্যবহার একেবারেই চিরকালের। যেমন—'হাথ বাঢ়ায়িলেঁ কি চান্দের লাগ পাই',[৮১] 'মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী',[৮২] 'দেখিআঁ সাধুর ধন চোর পড়ী মরে',[৮৩] 'কাটিল ঘাঅত লেম্বু রস দেহ কত'[৮৪] 'আখায়িল ঘাঅত বিষ জালিল কাহ্নাঞি'[৮৫] যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিঞাঁ

পড়ে। নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে'[৮৬] ইত্যাদি। সবগুলি প্রবাদই দেশকাল নির্বিশেষে বহু প্রচলিত। প্রথম প্রবাদটিতে আছে মানুষের দুষ্প্রাপ্যকে পাওয়ার অসম্ভব বাসনার প্রতি বক্রোক্তি, দ্বিতীয়টিতে আছে তীব্র ব্যঙ্গ। আর তৃতীয়টিতেও আছে অসম সমাজ-ব্যবস্থায় যারা দারিদ্র্যের জন্য অসৎ পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয় তাদের প্রতি করুণাহীন ঘৃণা। শেষের তিনটি প্রবাদে অপমানিত মানুষের অপমানের জ্বালা আর সহায়হীন অবলম্বনহীন মানুষের হতাশার গ্লানি অমোঘ উপমার ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত। প্রায় সবগুলি প্রবাদই সার্থক উপমা-উৎপ্রেক্ষার নিদর্শন। সমাজের তথা মানবজীবনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত বিভিন্ন সত্য যুগপ্রবাহিত সংক্ষিপ্ত সাহিত্যরসযুক্ত বাক্যে পরিণত হলেই তা হয়ে ওঠে প্রবাদ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও প্রবাদ-প্রবচনগুলি সমাজ-জীবনকেই তুলে ধরেছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি কেবলমাত্র প্রবাদ-প্রবচনের মধ্য দিয়েই সমাজ-মানসকে রূপ দেন নি। তাঁর কাব্যে মধ্যযুগের গ্রামীণ বাঙ্গালী সমাজের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই আরও নানা প্রসঙ্গে।

সমাজ-জীবন: মধ্যযুগীয় বাঙ্গালী সমাজ ছিল সম্পূর্ণ ধর্ম নির্ভর। তুর্কী আক্রমণের পর প্রথম এই বাংলা কাব্যটির সঙ্গেই আমরা পরিচিত হয়েছি। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামাজিক সংশ্লেষ ঘটে তার কোন পরিচয়ই এখানে নেই। হিন্দু দেবকথা নিয়ে রচিত এই কাব্যে সমাজ-জীবনের যেটুকু পরিচয় আমরা পাই—তা সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রাম্য হিন্দু সমাজের। মধ্যযুগীয় বাংলার গ্রামীণ হিন্দুসমাজের ধর্ম-নির্ভর জীবনাচরণে যুক্তি ও স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধির স্থান একেবারে নেই বললেই চলে। নানা ধরনের সংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারাই এই সমাজ পরিচালিত হত। সেই সংস্কার এবং বিশ্বাস কিভাবে এই যুগের মানুষকে পরিচালিত করত—তারই পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিভিন্ন চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে। দানখণ্ডে কৃষ্ণের প্রস্তাব শুনে বিপন্না রাধা বলেছে—

কমণ আসুভ ক্ষণে বাঢ়ায়িলোঁ পা।
হাঁছী জিঠী তাত কেহো নাহিঁ দিল বাধা ।।[৮৭]

অর্থাৎ রাধার বেরোনোর সময় কেউ হেঁচেছিল অথবা সামনে টিকটিকি পড়েছিল। কিন্তু তাতেও রাধাকে কেউ বাধা দেয় নি। রাধার বিশ্বাস এই অযাত্রার জন্যই সে বিপদে পড়েছে। এ ছাড়াও রাধা বলেছে—

ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ
কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।
আগেঁ সুনা ঘটে নারী হাঁছী জিঠিহো না বারী
চলিলোঁ তাহার উচিত পাওঁ ফলে ।।[৮৮]

এই বিশ্বাস কেবল রাধার নয়, সে যুগের সব মানুষেরই। বংশীখণ্ডের দুটি পদেও অযাত্রা-কুযাত্রা সম্পর্কে লৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় রাধার উক্তি থেকে। রাধা বলছে সে অশুভ সময়ে পথে পা বাড়িয়েছিল। হাঁচি টিকটিকির বাধা মানে নি। শূন্য কলসী নিয়ে সখী আগে আগে যাচ্ছিল। শেয়াল বাঁ দিক দিয়ে ডান দিকে যাচ্ছিল। এ ছাড়া পথে রাধা শকুন দেখেছে। মড়ার খুলি হাতে করে যোগিনীকে ভিক্ষে করতে দেখেছে, কাঁধে ভার তেলি রাধার সামনে সামনে গেছে।

আর শুকনো ডালে বসে কাক ডাকছিল—এ সবই যাত্রার পক্ষে অশুভ লক্ষণ। এ ছাড়াও ভাদ্র মাসের চতুর্থী তিথিতে চন্দ্র দেখা, পূর্ণ কলসে হাত ঢোকানো, গুরুজনের আসনে বসে পড়া, জল দিয়ে মাটিতে অক্ষর লেখা, ভাঙ্গা কুলোর বাতাস গায়ে লাগা ইত্যাদি অমঙ্গলজনক ও অশুভ বলে মনে করা হত। এই ধরনের অন্ধবিশ্বাসে বেশী পরিচালিত হত স্ত্রীলোকেরাই, কিন্তু সাধারণভাবে এটি ছিল সব মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। বাণখণ্ডে কৃষ্ণের বাণের আঘাতে রাধা মূর্চ্ছিতা হলে বড়াই কৃষ্ণকে বেঁধে ফেলেছে। তখন বিপন্ন কৃষ্ণ রাধার মতোই বলেছে—

হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্র মাসে।
হাথ ভরিলোঁ কিবা পূরিল কলসে।
ভূমিত আখর কিবা লিখিলোঁ জলে।
মিছা দোষে বন্ধন আহ্মার তার ফলে।।[৮৯]

এই ধরনের শুভাশুভ সংস্কার যে মধ্যযুগের বাঙ্গালী সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ কাব্য এবং বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে আখেটি এবং বণিক—দুটি খণ্ডেই এই ধরনের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। যাত্রার সময় গোধিকাদর্শন অমঙ্গলজনক বলেই কালকেতু শিকার পায় নি—এই বিশ্বাসেই সে ফেরার পথে ক্রুদ্ধ হয়ে গোধিকাটিকেই পুড়িয়ে খাওয়ার জন্য বেঁধে এনেছিল। বৈষ্ণব পদাবলীতে ভাবোল্লাসের পদে দেখা যায় রাধা শুভ চিহ্ন দেখেই কৃষ্ণ আসবেন ভেবে আনন্দিত হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে জ্ঞানদাসের একটি পদ উদ্ধৃত করা যায়—

আজু পরভাতে কাক কলকলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
বন্ধু আসিবার নাম সোধাইতে
উড়িয়া বৈঠল ঠায়।।[৯০]

অন্যত্র— আজুক প্রাতর সময়ে
বাম বাহু সঘনে কাঁপয়ে।।
খঞ্জন কমলিনী সঙ্গ
পুলকে পূরয়ে সব অঙ্গ
বাম নয়ন করু পন্দ।
সঘনে খসয়ে নিবিবন্ধ।।
এলক্ষণ বিফল না যাব।
মাধব নিজ গৃহে আব।।[৯১]

এই ধরনের সংস্কার-বিশ্বাস এখনও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মনে অনেকাংশে বদ্ধমূল হয়ে আছে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে রাধাকৃষ্ণের কোন পারিবারিক পরিবেশ নেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা এবং কৃষ্ণের পারিবারিক পরিচয় পাওয়া যায়। রাধার স্বামী, শাশুড়ী ও ননদ নিয়ে সংসার মধ্যযুগেরই সাধারণ বাঙ্গালীর সংসার। সে যুগে শাশুড়ী, ননদী ও স্বামীর অধীনে সব সময়েই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হত

গৃহবধূকে। ননদী প্রতি কথাতেই বধূর দোষ ধরত (প্রতি বোল ননন্দ বাছে)। আর স্বামী ও শাশুড়ীর কাছে প্রহৃত ও তিরস্কৃত হওয়াও মধ্যযুগের বাঙালী বধূর দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ ছিল। তাই রাধার হাতে চড় খেয়ে আহত অভিমানে বড়াই গর্ব করে বলেছে যে তার স্বামী রেগে গেলেও তাকে প্রহার করা তো দূরের কথা, কোনদিন হাতেও স্পর্শ করে নি আর শাশুড়ী ও তাকে কোনদিন গালাগাল দেয় নি।[৯২] কৃষ্ণের পিতামাতা নন্দ-যশোদা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম, এ ছাড়া অন্য কোন পরিজনের কথা বলা হয় নি! গোপললনা ও গোপবধূ রাধাকে দধিদুগ্ধ বিক্রয় করার জন্য পথে বেরোতে হয়, আর তাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করা হয় বড়াইকে। তরুণী অথবা যুবতীর নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নায়ক-নায়িকা দুজনেই গোপ। কৃষ্ণ গরু চরায় আর রাধা দধিদুগ্ধ বিক্রয় করে। এ ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কুমার, তেলী, নাপিত এবং পরোক্ষভাবে স্বর্ণকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। যোগী-যোগিনী সম্প্রদায়ের কথাও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে। কিন্তু এদের বিশেষ সুনজরে দেখা হত না বলেই মনে হয়। এছাড়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র ইত্যাদি চতুর্বর্ণের উল্লেখও পাওয়া যায়। মধ্যযুগের গ্রাম্যসমাজে একঘরে করার প্রথাও ছিল। রাধার শাশুড়ী রাধাকে দই-দুধ বেচার জন্য বাইরে পাঠাতে রাজী না হলে অন্যান্য গোপগৃহিণীরা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে—

আপণ আপণ বহু হাটক পাঠায়িব।
তোহ্মার ঘরত অন্ন পাণি না খাইব।।[৯৩]

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেও খুল্লনা বনে বনে ছাগল চরিয়েছিল বলে বণিকেরা ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ নিতে রাজী হয় নি। খুল্লনাকে তার সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এই ধরনের একঘরে করার প্রথা শরৎ-উপন্যাসের গ্রাম সমাজেও পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা গ্রাম বাংলার এক নিতান্ত সাধারণ বধূ। তার কাজকর্মের মধ্য দিয়ে এক পল্লীবধূর দৈনন্দিন কাজের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাধাকে ঘুঁটে দিতে হয়, দুধ গরম করতে হয় (তোর বাঁশী মোএঁ ঘসি না ঘাটোঁ। তাক হাথ করী দুধ না আউটোঁ)।[৯৪] এ ছাড়াও সে যমুনার ঘাটে জল আনতে যায়, প্রতিদিন রান্না বান্না করতে হয়! বাড়ীর ভেতরে এই সমস্ত কাজ করার পরও তাকে বাইরের হাটে দই-দুধ বিক্রি করার জন্য যেতে হয়। বংশীখণ্ডে রাধার রান্নার বর্ণনা থেকে মধ্যযুগের বাঙালীর দৈনন্দিন খাদ্যের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। ভাত বাঙালীর প্রধান খাদ্য। এ ছাড়াও আছে শাক, ভাজা, ঝোল, অম্বল প্রভৃতি পরিচিত পদ। নিমপাতা, পটল, ঘি, লেবু ইত্যাদি রান্নার উপকরণের বর্ণনাও পদটিতে পাওয়া যায়। তবে পরবর্তী মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে, যেমন চণ্ডীমঙ্গলে, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতিতে আমিষ ও নিরামিষ খাদ্যের আরও বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।

খাদ্য ছাড়াও বস্ত্র, অলঙ্কারের ও প্রসাধনের কিছু কিছু বর্ণনা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ একবার রাধাকে বলেছে—

আতি বিতপনী রাধা পরিধান পাট
আলকে তিলক তোর শোভএ ললাট।[৯৫]

এ ছাড়াও রাধার গলায় হার, কানে রত্ন কুণ্ডল, কটিদেশে রত্নকিঙ্কিনী, হাতের আঙ্গুলে আংটি এবং পায়ের আঙ্গুলেও 'পাসলী'র উল্লেখ আছে। মাথার মুকুট এবং পায়ের নূপুরেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে পায়ের নূপুর সম্ভবত নর্তকীরাই বেশী ব্যবহার করত। কারণ যমুনাখণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে খাঁটি সোনার নূপুর উপহার দিতে চাইলে রাধা সদর্পে বলেছে—

গোআলিনী আহ্মে নহোঁ নাচুনী
মোর কাজ নাহিঁ তোর কিঙ্কিনী।[৯৬]

তবে এসব অলঙ্কার সম্পন্ন ঘরের মেয়েরা ব্যবহার করত। মধ্যযুগের অন্যান্য কবিদের কাব্যেও এই ধরনের অলঙ্কার-বর্ণনা পাওয়া যায়।

সে যুগের রাজশাসনের প্রসঙ্গ এখানে কিছুই পাওয়া যায় না। তবে দানখণ্ডে দানী কৃষ্ণের প্রসঙ্গ থেকে মনে হয় রাজকর নেওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়িই ছিল। সমাজপতিদের বা সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের যথেচ্ছাচারের ইঙ্গিত পাওয়া যায় কৃষ্ণের আচরণ ও উক্তি থেকে। রাধা শাস্ত্রের এবং পাপপুণ্যের দোহাই দিয়ে কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করতে চাইলে কৃষ্ণ বলেছে—

কিবা বেদ শাস্ত্র আহ্মা কিবা পুণ্য পাপ
সহিতেঁ না পারী আহ্মে বিরহের তাপ ॥[৯৭]

কাব্যের শেষ প্রান্তে কৃষ্ণের নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অসহায়তাকেই তুলে ধরে। তবে যে সমাজের পরিচয় এখানে পাওয়া যায় তা খণ্ডিত, কেবল বাংলার পল্লীসমাজের আংশিক ছবি মাত্র। চর্যাপদের মত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও কৃষিভিত্তিক পল্লীসমাজের কৃষকদের দিনচর্যার কোন বর্ণনা অথবা প্রসঙ্গই পাওয়া যায় না। তবু এই কবিরা তাঁদের অজ্ঞাতসারেই যুগজীবনের যে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত চিত্র আমাদের উপহার দেন, সেই আংশিকতা থেকেও হারিয়ে-যাওয়া কালের কিছু পরিচয়ের আভাস আমরা পেয়ে যাই। পরবর্তীকালের মুকুন্দরাম, ঘনরাম প্রভৃতির কাব্যে এই পরিচয় আরও স্পষ্ট।

ছন্দোনির্মিতিতেও কবি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছন্দোবৈচিত্র্য অবশ্য চর্যাপদেও আছে। পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দের বৈচিত্র্যে চর্যাপদের কবিদের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের পয়ার ত্রিপদীতে মাত্রাসমকতা সব সময় না থাকলেও পয়ার ত্রিপদীর কাঠামো বজায় আছে। এই কাব্যে সাত রকমের পয়ার বৈচিত্র্য দেখা যায়। কিন্তু গ্রন্থটি পড়া হত না, গান করা হত। সেই কারণে অক্ষর সমকতা সৃষ্টির চেষ্টা না থাকায় মাঝে মাঝে ছন্দে শৈথিল্য এসে গেছে। এটি কেবল বড়ু চণ্ডীদাসের ত্রুটি নয়—মধ্যযুগীয় কাব্য পরিবেশে এই ত্রুটি অনেকের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের কোন কোন জায়গায় এক ধরনের শিথিল চটুল ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে যাকে কোন নিয়মের নিগড়ে বাঁধা যায় না। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আবেগ প্রকাশ করার সময় কবি এই ধরনের চটুল ছন্দ ব্যবহার করেছেন। ছন্দব্যবহারেও কবির এই লোকমনস্কতা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের চরিত্রসৃষ্টিও কবির জীবনাভিজ্ঞতার ও লোকজীবন নৈকট্যের পরিচয়বাহী। পূর্ববর্তী চর্যাপদের কবিদের কবিতায় ধর্মীয় বাতাবরণ থাকা সত্ত্বেও

শিল্পগুণ বর্তমান ছিল। কিন্তু চরিত্রসৃষ্টির অবকাশ সেখানে ছিল না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই এখনও পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রথম আখ্যায়িকা কাব্য—এর পটভূমি ও চরিত্র একই সঙ্গে পৌরাণিক ও লৌকিক। তবে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি বেশীমাত্রায় রক্তমাংসের মানুষ, লৌকিক জীবনেরই মধ্যবর্তী।

এই কাব্যের প্রধান চরিত্র তিনটি। রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ি। অপ্রধান চরিত্র হল নারদ, যশোদা, বলরাম, আইহনের মা।

রাধা ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চরিত্রগুলির মধ্যে কবির সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে রাধাচরিত্র অঙ্কনে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রাধা প্রথম পরিপূর্ণা মানবী, অস্তিত্বের তীব্র দ্যুতিতে ভাস্বর। জন্মখণ্ডে এই নারীর রূপ বর্ণনায় কবি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রাধা 'তীনভুবন' জনের 'মনোমোহিনী'। তার রূপে মানব-দানব-দেবতা সবাইকেই মোহিত করে। তাই রাধা রূপের বর্ণনাতেই কৃষ্ণ রূপলুব্ধ। কিন্তু রাধা মোহিনী নয়, কামিনীও বটে। পুরুষের কামনাকে আকর্ষণ করে নেওয়ার মাদকতা তার সর্বাঙ্গে, তাই সে 'রতিরস কামদোহনী'। তার অঙ্গলাবণ্য শিরীষকুসুমের মতো কোমল, কিন্তু সেই সঙ্গে তার রূপে আছে স্বর্ণপ্রতিমার ঔজ্জ্বল্য আর কাঠিন্য। এই কাঠিন্যের পরিচয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সর্ব অবয়বে মুদ্রিত। কৃষ্ণ এই কাঞ্চন-প্রতিমাকে ভাঙ্গতে পারে নি। তার তীব্র কামনার আগুনে এই স্বর্ণপ্রতিমার কায়াকান্তি বিগলিত হয়ে জন্ম হয়েছে আর এক রাধার।

একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচক রাধাকে বলেছেন "সরল সুস্থ প্রাণোচ্ছলা।"[৯৮] বালিকা রাধার স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে এই বিশেষণগুলির মধ্যে। তার "দেহ এবং মনে দুর্বলতা কোথাও নেই। হিন্দুর ঘরের মেয়ে, মনে সতীত্ববোধ গাঁথিয়া আছে, সংস্কার তাহার চিরকালের সম্পদ। অবস্থাপন্ন ঘরের বধূ—সে কারণে গর্বও অল্প নয়";[৯৯] রাধা চরিত্র সম্পর্কে সমালোচকের এই বিশ্লেষণও যথার্থ।

কিন্তু রাধার সংস্কার যদি সম্পদই হয়, তা হলে বলবো একে রক্ষা করার ক্ষমতা কিংবা অধিকার—কিছুই সমাজ তাকে দেয় নি। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা পুরুষ-শাসিত সমাজে পুরুষের কামনার বলিমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। অসামান্য মানসিক দৃঢ়তা আর সমস্ত প্রতিরোধ নিয়েও কামকাতর কৃষ্ণের কাছে রাধাকে অনিচ্ছায় দেহদান করতে হয়েছে। নারীর সতীত্ব সংস্কার যতই দৃঢ় হোক, তা তাকে লম্পট পুরুষের কামনা থেকে বাঁচাতে পারে না। আবার তার সামাজিক সংস্কার-অতিক্রমণকারী প্রবল প্রেমাবেগ যতই গভীর আর আন্তরিক হোক না কেন—পুরুষের কাছে তার কোন মূল্য নেই, নারীত্বের এই অপমানিত ধূলিলুণ্ঠিত সত্তার আর্তনাদই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা চরিত্রের কণ্ঠে উচ্চারিত। তার মন যখন পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রথাবদ্ধ নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার মধ্যে নিজের অস্তিত্বের অবস্থানে আনন্দিত, তখন নিজের কামনা চরিতার্থ করার জন্য এক পুরুষ তার অনিচ্ছুক শরীরের ওপর বলাৎকার করেছে। আর সেই কারণেই সরল সুস্থ নারীর মন ও শরীর দুই-ই যখন সেই পুরুষকে পাওয়ার জন্য আকুল, তখন সে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যাত। সেই পুরুষের কাছে নারীর সতীত্বের যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনি নারীর অকুণ্ঠ আন্তরিক প্রেমেরও কোন মূল্য নেই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যকাহিনীতে রাধার প্রেমিকা সত্তার বেদনাময় জাগরণের ইতিহাস এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

পুরাণচারী যে কৃষ্ণকথাকে জয়দেব বাঙালী সর্বসাধারণের অঙ্গনে একদিন সঙ্গীতধারায় প্রবাহিত করেছিলেন, কালের জারকরসে সেই কৃষ্ণকথা ধীরে ধীরে তার আপন হয়ে নিজেরই জাতীয় জীবনের সামগ্রিক অভীপ্সাকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। দীর্ঘ ব্যবধানের পর তাই বড়ু চণ্ডীদাসে এসে আমরা হঠাৎ দেখি সামন্ত-শাসিত বাঙালী জীবনের বিশাল আকাশ সে কথার বুকে বিম্বিত। রাধাচরিত্রে আমরা প্রতিফলিত দেখেছি এই সমাজেরই নারীভাগ্যের সামগ্রিক প্রতিবিম্ব। অনিচ্ছুক বা ইচ্ছুক রাধার উভয় প্রান্তই এই সমাজে নারীভাগ্যের সীমানা। কৃষ্ণের হাতে আত্মসমর্পণের অনিচ্ছা প্রকাশে সে বিদ্রোহিনী আবার আত্ম-নিবেদনে ইচ্ছুক রাধাও সামাজিক বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তার বিদ্রোহ সফল নয়। সে সামন্ত-শাসিত বাঙালী সমাজের প্রথম নতজানু বিদ্রোহিনী।

জন্মখণ্ডে রাধাকে লক্ষ্মীর অবতার বলা হয়েছে। কৃষ্ণের উপভোগের জন্যই তার জন্ম। কিন্তু সে নিজের ঐশী মহিমা সম্পর্কে অসচেতন। এ রাধা তাই একান্তই মানবী। কাব্যের প্রথম দিকে রাধা নিজের রূপে সম্পর্কে যেমন সচেতন, তেমনি নিজের শ্বশুরকুল ও পিতৃকুলের আভিজাত্য সম্পর্কেও সচেতন। কৃষ্ণের প্রণয় প্রস্তাবকে সে তীব্র ঘৃণা নিয়ে প্রত্যাখ্যান করে এবং দূতি বড়ায়িকে অপমান করে। কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম করলে বিষ্ণুপুরে স্থিতি হবে—বড়ায়ির এই প্রলোভনকে ধিক্কার জানিয়ে সে বলে—

ধিক জাউ নারীর জীবন
দহেঁ পসু তার পতী।
পর পুরুষের নেহাএঁ যাহার
বিষ্ণু পুরে [হএ] স্থিতী।[১০০]

যুগ-যুগান্তর বাহিত হিন্দু নারীর সতীত্ব সংস্কারই এখানে রাধার কণ্ঠে বাণীরূপ লাভ করেছে। যে পুরুষ তার স্বামী নয়, সে দেবতা হলেও তার প্রেম-প্রস্তাব ঘৃণ্য। কিন্তু এই সামাজিক সংস্কারকে আসলে রাধা তার ব্যক্তিগত অনিচ্ছার রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করেছে। দান খণ্ডেও কৃষ্ণের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে রাধা বলেছে—

যদি গাঙ্গ উজান বহে।
তভোহোঁ তোহ্মার বোল নহে॥
নিজ সামী আছে মোর ঘরে।[১০১]

বীর স্বামীর পত্নী হওয়ার জন্যও রাধার গর্ব কম নেই। কৃষ্ণ বারবার তার ঐশী মহিমা ঘোষণা করলেও রাধা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি। কৃষ্ণের অবতারত্বকে অস্বীকার করে রাধার এই তীব্র বিরাগ মধ্যযুগীয় সমাজে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেই প্রকাশ করে। কিন্তু পুরুষের দৈহিক শক্তির কাছে অসহায় অরক্ষিত নারী শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তখনও রাধা কৃষ্ণকে তিরস্কার করতে ছাড়ে নি—

ধরম লঙ্ঘিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাপে দিলি মন।[১০২]

শেষ পর্যন্ত হৃতাভরণা, লাঞ্ছিতশরীরা রাধা কাতর কণ্ঠে বড়াইকে বলেছে—'নিজ পতি

বিহানে আবথা মোর দেখ।'

কিন্তু নৌকাখণ্ডে দেহবিলাসের মধ্য দিয়ে রাধার মন অনিচ্ছাসত্ত্বেও কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এই খণ্ডের শেষে কৃষ্ণের সঙ্গে জলকেলি সমাপনের পর রাধা সেই প্রসঙ্গ বড়ায়ি ও তার সখীদের কাছ থেকে গোপন করার চেষ্টা করেছে। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণের সম্পর্কে তার উক্তিও লক্ষণীয়—

ডুবিআঁ মরিতোঁ যবেঁ না থাকিত কাহ্নে
আহ্মা লআঁ সান্তরিআঁ রাখিল পরাণে।[১০৩]

বিরূপ বালিকার হৃদয়ে ধীরে ধীরে সম্ভোগের মধ্য দিয়ে প্রেমের জাগরণ ও সেই প্রেমকে গোপন করার চেষ্টাতেই যুবতী রাধার রক্তমাংসের মানবী সত্তার পরিচয় কবি অঙ্কন করেছেন। একান্তই মনস্তাত্ত্বিক পথে কালিয়দমন খণ্ডে কৃষ্ণ কালিয়বিষজর্জর হলে ব্যাকুলা রাধার হাহাকার প্রমাণ করে দেয় রাধার প্রেম এবার দেহকে অতিক্রম করে হৃদয়ের গভীরতম স্তরে ঘা দিয়েছে।

তাম্বুলখণ্ড ও দানখণ্ডে কামনা-জর্জর কৃষ্ণের অনুচিত প্রস্তাবে রাধার প্রতিকূলতা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি কাব্যের পরবর্তী অংশে ঘটনার প্রভাবে রাধা চরিত্রের পরিবর্তনও একান্তভাবে স্বাভাবিক। কামকাতর কৃষ্ণকে নিজের কাজে লাগানোর মধ্যে একদিকে রাধার অপসৃয়মাণ প্রাথমিক বিরাগ ও অন্যদিকে যুবতীসুলভ চাপল্যের মিশ্রণ ঘটেছে। রতির লোভ দেখানোয় কৃষ্ণ তার ভারবহন করেছে, মাথায় ছাতা ধরেছে। কিন্তু কাজ করিয়ে নেওয়ার পর রাধা তার বাসনা পূর্ণ করে নি। কৃষ্ণকে 'মাগু কিলে' প্রহার করার ভয় দেখানোও তার পরিহাস প্রবণতা মাত্র। কৃষ্ণ রাধার হার চুরি করে রাখলে এই রাধাই আবার কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যশোদার কাছে দুশ্চরিত্রতার ও অশালীন আচরণের অভিযোগ আনেন। একদিকে অনিচ্ছাজাত দেহাকর্ষণ আর অন্যদিকে এখনও পর্যন্ত পরকীয়া প্রেমকে মেনে নিতে না পারার তীব্র দ্বন্দ্বই এখানে রাধাচরিত্রে পরিস্ফুট।

বাণখণ্ডে নিজের নিন্দায় রুষ্ট কৃষ্ণ রাধাকে বাণ মেরে এর প্রতিশোধ নিয়েছে। এরপরই আমরা বংশীস্বরব্যাকুলা রাধার তীব্র প্রেমবেদনার জাগরণ লক্ষ্য করি। কিন্তু এখন রাধার আকুল আত্মনিবেদনের বিপরীতে কৃষ্ণ তাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করে। তখন যে রাধা একদা 'পর-পুরুষের নেহা'-কে বিষ্ণুপুরে স্থিতির প্রলোভন সত্ত্বেও তীব্র কণ্ঠে ধিক্কার জানিয়েছিল, সেই একই নারী বলে—

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘুগুরু জনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে॥[১০৪]

রাধার হতাশ বেদনাময় স্বীকৃতিতেই আমরা দেখি কৃষ্ণের জন্য সে সমাজবন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে কিন্তু বিনিময়ে তার ভাগ্যে জুটেছে প্রত্যাখ্যানের গ্লানি। নারীর সহজ স্বাভাবিক প্রেম—যে প্রেমের জাগরণের জন্য একজন পুরুষই দায়ী—সেই প্রেম স্বীকৃতি পায় নি। অথচ সমাজে তথা পারিবারিক জীবনে রাধার যে সহজ অবস্থান ছিল, সেখান থেকেও সে বিচ্যুত। তাই রাধার কণ্ঠে নিষ্ঠুর কৃষ্ণের প্রতি আকুল

আবেদন—

অনাথী নারীক সঙ্গে নে।[১০৫]

রাধা এখন দুকুল হারা। সামাজিক শক্তির অনুমোদন এবং প্রেমিকের ভালবাসা—কিছুই তার ভাগ্যে জোটে নি। একটি অনিচ্ছুক নারীর শরীর আর মনের ক্ষুধাকে জাগ্রত করে তাকে প্রত্যাখ্যান করার এই বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি কৃষ্ণের নয়—যেন সমগ্র পুরুষ সমাজের। 'রাধা বিরহে' বর্ষীয়সী বড়ায়ি তার সারা জীবনের এই অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে রাধাকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে—

পুরুষ ভ্রমর দুইহো একমান।
নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান ॥[১০৬]

কৃষ্ণের কাছেও কাতর রাধা একান্ত ব্যাকুলভাবে প্রেম ভিক্ষা করলে কৃষ্ণ সদর্পে বলেছে—

সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ
জুড়িএ আগুনতাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ
জুড়িএ কাহার বাপে ॥[১০৭]

বড়াই আর কৃষ্ণ—দুজনেরই কথা থেকে বোঝা যায় রাধার প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণকে ব্যক্তি কৃষ্ণের অন্যায় বলে তারা মনে করে না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পুরুষ জাতিরই এটি সাধারণ স্বভাব; প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই স্বাভাবিক। পুরুষের অবিচারের ভার নারীকে বহন করতেই হবে। রাধার ভাগ্য সেই অবধারিত পথেই নির্ধারিত হয়েছে। রাধা চরিত্রের উপস্থাপনে এই নির্বিশেষ ব্যাপ্তির প্রতিফলন শিল্প এবং শিল্পী উভয়কেই অসাধারণ সাফল্য দান করেছে।

কিন্তু বড়ুকবির রাধা নাম্নী নারীটির অভিনবত্ব এইখানে যে, পদাবলীর রাধার মত অথবা বিদ্যাপতির নায়িকার মত সে কৃষ্ণের কাছে নির্দ্বিধায় অথবা বিনা প্রতিবাদে নিজেকে সমর্পণ করে নি। সমাজের মধ্যে বাস করেও যে পুরুষ সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে তাকে পেতে চেয়েছে তার বিরুদ্ধে সে তার নিতান্ত সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে সংগ্রাম করেছে। আবার যখন অকৃত্রিম প্রেম তার মনে জাগ্রত হয়েছে—তখন সেই সত্যকে মূল্য দেওয়ার জন্যও সে সমাজের বিরুদ্ধে গেছে। কিন্তু এখানেও শেষ পর্যন্ত তাকে চরম পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। ভালবেসেও প্রতিদানে ভালবাসা না পাওয়ার মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিই 'রাধাবিরহ' অংশের রাধার বেদনাকে বাড়িয়ে তুলেছে। চৈতন্য-পূর্ব অথবা চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যে কোন সময়েই রাধার উন্মুখ প্রেম এমন করে অপমানিত হয় নি। এদিক দিয়ে বিচার করলেও বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা আসলে মধ্যযুগের পুরুষ-শাসিত সমাজে লাঞ্ছিতা নারীসত্তার প্রতিনিধি।

অন্যদিক থেকে বড়ুকবির রাধা পরিপূর্ণভাবেই একটি individual। স্বামী ও সমাজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কৃষ্ণে অনিচ্ছুক তার প্রাথমিক নারীসত্তাকে সে যেমন রক্ষা করেছে—তেমনি তার ভালবাসার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের প্রতিটি পর্যায়কে নানা কলাকৌশলে আপেক্ষিক মর্যাদা দিতে দিতে রাধাবিরহে অন্তিম পরিণতি লাভ করেছে।

মধ্যযুগের একটি বিশেষ নারী হয়েও সে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-জীবনের সামগ্রিক নারীভাগ্যকে যেমন ধারণ করেছে, তেমনি সে চিরকালের ক্যানভাসেও ফুটে ওঠা একটি আত্মসত্তা। কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশে বড়ুর হাতেই রাধাচরিত্রের এই উত্তরণ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ের।

রাধাবিরহ অংশে সেই চূড়ান্ত রাধা চরিত্রের বিকাশই লক্ষ্য করা যায়। কাব্য প্রারম্ভের সেই খরবাক্যবর্ষিণী রাধা, আর কাব্যশেষের নৈষ্ঠিক রতির অধিকারিণী রাধা কবি বড়ু চন্ডীদাসের নারী চরিত্র চিত্রণের চরম ক্ষমতাকেই প্রকাশ করে। তাম্বুলখণ্ড থেকে বংশীখণ্ড পর্যন্ত যে রাধার পরিচয় আমরা পাই—সে রাধা এক গ্রাম্য বালিকা। তার বিরাগের বিষোদ্গার ও প্রেমের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা এক মানবীরই হৃদ্‌স্পন্দনে আন্দোলিত। কিন্তু রাধাবিরহের রাধা যেন জন্মান্তরিতা নারী। যে স্থির প্রেমের ঊর্ধ্বায়িত শিখা তার অন্তরের ঐকান্তিক আত্মনিবেদনের আকূতিতে ফুটে উঠেছে তা পদাবলীর চন্ডীদাসের রাধাকেই মনে করিয়ে দেয়। উত্তরকালে এই চরিত্রে হয়তো সূক্ষ্ম বর্ণালিম্পন কিছু বাড়বে, কিন্তু আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার মূলে কাজটিই এখানে সম্পূর্ণ।

কৃষ্ণঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন জনৈক সমালোচকের মতে 'রাধাসর্বস্ব'। কৃষ্ণের নামে কাব্যটির নাম হলেও এই কাব্যের আদ্যন্ত জুড়ে রয়েছে রাধা। রাধার পাশে এই কাব্যের নায়ক কৃষ্ণ একান্তভাবেই অসঙ্গত একটি চরিত্র। পৌরাণিক কৃষ্ণের মধ্যে শক্তির বিপুল মহিমার সাথে প্রেমের কমনীয়ভার যে মিশ্রণ রয়েছে—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণে তার কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। কৃষ্ণচরিত্রের পৌরাণিক কাঠামোটাই মাত্র উপস্থিত। কিন্তু ওই পর্যন্তই। অবতার পুরুষের সমুন্নত মহিমা ও বীর্যবত্তা এখানে অনুপস্থিত। অন্যদিকে জয়দেবের গীতগোবিন্দে ধীরললিত নায়ক কৃষ্ণের মধ্যে যে কমনীয় প্রেমের বিকাশ এবং প্রেমিকা রাধার মানময় প্রেমের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতিদান লক্ষ্য করা যায়—তার কোনটাই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণে পাওয়া যায় না। এই কৃষ্ণ এক উদ্ধত, জেদী, হৃদয়হীন অথচ নারীদেহলোলুপ গ্রাম্য বর্বর, অসংস্কৃত যুবক। বড়ু চন্ডীদাস সম্পূর্ণ পৌরাণিক পটভূমিকায় কৃষ্ণকে স্থাপন করলেও গোটা কাব্য জুড়ে তাঁর কৃষ্ণচরিত্র পূর্ব-পরিকল্পনার বিরোধিতা করে গেছে। লৌকিক উপাদান কৃষ্ণচরিত্রে এমনভাবে মিশ্রিত যে তাকে কোনমতেই পৃথক করা যায় না। ভূভার হরণের জন্য কৃষ্ণের মর্ত্যে জন্মগ্রহণ পৌরাণিক কাহিনী। বড়ু চন্ডীদাস এটি গ্রহণ করেছেন। কাব্যের মধ্যেও কৃষ্ণ আত্মবিস্মৃতা রাধাকে তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য পুরাণ প্রসঙ্গেরই উল্লেখ করেছেন এবং বার বার নিজের ঐশী শক্তি ও মহিমার আস্ফালনে রাধাকে অভিভূত করতে চেয়েছেন। কালিয়দমন খণ্ডে কৃষ্ণ কালিয়ের বিষে অভিভূত হলে বলরাম তাঁকে তাঁর ঐশী মহিমা সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন, রাধার প্রেমভিক্ষা করার সময় কবি কৃষ্ণের মুখে গীতগোবিন্দের নায়ক কৃষ্ণের উক্তি অনুবাদ করে দিয়েছেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়, গীতগোবিন্দে ব্যক্ত কবির ভক্তিভাবুকতার যে স্পর্শ বার বার পাওয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের স্বরূপ-বিস্মৃতা নায়িকা রাধা যেমন একটি গ্রাম্য যুবতী,' কৃষ্ণ নিজের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়েও তার বেশী আর কিছু হয়ে

উঠতে পারেন নি।

কৃষ্ণচরিত্রকে অনেকে অসঙ্গত বলে থাকেন, কারও কারও মতে আবার কৃষ্ণচরিত্র এমন না হলে রাধাচরিত্রের ক্রমবিকাশ এভাবে চোখে পড়ত না। অন্য এক বিশিষ্ট সমালোচক কিন্তু রাধা, কৃষ্ণ এবং বড়ায়ি—তিনটি চরিত্রকেই 'নিজ নিজ চারিত্র্যে উজ্বল'[১০৮] বলে অভিহিত করেছেন। কাব্যকাহিনীকে অনুসরণ করে কৃষ্ণচরিত্র সম্পর্কিত এই মতগুলির যাথার্থ্য অনুসরণ করা যেতে পারে। জন্মখন্ড থেকে রাধা বিরহ পর্যন্ত কাব্যের সর্বত্রই কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপস্থিতি রয়েছে। তাম্বুল-খন্ডে বড়াই যখন রাধাকে অন্বেষণ করছে—তখন তার মুখে রাধার রূপবর্ণনা শুনে কৃষ্ণ তীব্র কাম অনুভব করেন। রাধার দেহ ভোগ করে নিজের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া কৃষ্ণের অন্য কোন চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় নি। বৃন্দাবনখন্ডে অবশ্য কৃষ্ণ জয়দেবের কৃষ্ণের অনুকরণে রাধাকে বলেছেন—

তোহ্মে সে মোহোর রতন ভূষণ
তোহ্মে সে মোহোর জীবনে।[১০৯]

অন্যত্র আর একবার কৃষ্ণের মুখে শোনা যায়—

মন ঝুরে তোর নামে ল.
সংসারত তোহ্মা কৈলোঁ সারে।
তোর বোলেঁ গোপীগণে ল
তুষিআঁ তেজিলোঁ পরকারে ॥[১১০]

এখানেই কিন্তু রয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণের বিশিষ্টতা। গীতগোবিন্দের কৃষ্ণ রাধাকে ত্যাগ করে অন্যান্য গোপিনীদের নিয়ে বিহার করেছেন। আর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণ রাধারই অনুরোধে গোপিনীদের সাথে বিহার করেছেন। তাঁর আকর্ষণ একমাত্র রাধার প্রতি। কাব্যের পরবর্তী অংশে কৃষ্ণ রাধার দেওয়া অপমান কখনও ভোলেন নি। রাধা সমস্ত বিরূপতা পরিত্যাগ করে যখন কৃষ্ণের কাছে আত্মনিবেদন করতে চেয়েছেন, তখন কৃষ্ণ তাকে কুৎসিৎভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। আবার এই কৃষ্ণই বাঁশি চুরি যাওয়ার পর নিজের ভগবৎমহিমা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে অবোধ বালকের মত তারস্বরে রোদন করেছেন, রাধাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বাণ মেরেছেন এবং অবশেষে রাধার নিতান্ত কাতর প্রার্থনায় ও বড়ায়ির অনুরোধে তাঁর সাথে মিলিত হলেও নিদ্রিত অবস্থায় তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন।

কাহিনীর এই ধারা অনুসরণ করলে কৃষ্ণের মধ্যে স্থূল, নির্লজ্জ দেহলোলুপতা, বৃথা দম্ভ ও উগ্র প্রতিশোধবাসনা ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। সেজন্য এই চরিত্রের মধ্যে কোন কোন সমালোচক মানবিক গুণের একান্ত অভাবও লক্ষ্য করেছেন এবং মহাপ্রভুর এই কাব্য আস্বাদনের কিংবদন্তীকেও অস্বীকার করতে চেয়েছেন। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র বিচারে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, কৃষ্ণ এক অমার্জিত গ্রাম্য গোপ যুবক। লৌকিক রস পরিবেশনের প্রবণতা কথাবস্তুতে ও ছন্দে—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের উভয়ত্রই আমরা লক্ষ্য করেছি। কবি তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যে কৃষ্ণের পৌরাণিক মহিমা প্রচার করে একদিকে সাধারণের মনে ঐশ্বর্যমিশ্র ভক্তিরস জাগ্রত করতে চেয়েছেন আর অন্যদিকে কাব্যকে লোকরঞ্জক করার জন্য

চরিত্রগুলিকে বাস্তব করে তুলেছেন, কাব্যপরিবেশের লৌকিকতায়ও ফাঁকি নেই। তাই তাঁর কৃষ্ণ মধ্যযুগের এক রক্তমাংসের গ্রাম্য গোপ যুবক। আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে যত্রতত্র সুন্দরী নারী দর্শনে জিতেন্দ্রিয় মুনিঋষিদেরও কেবলমাত্র কামাবেগ-প্রসূত চিত্তবিভ্রমের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। সে তুলনায় এক গ্রাম্য যুবকের সুন্দরী নারীর রূপবর্ণনা শ্রবণে কামাবেগ বোধ করা কতখানি অনুচিত হয়েছে? কৃষ্ণের মনে রাধার প্রতি প্রেম জাগ্রত না হওয়ার অভিযোগও যথার্থ বলে মনে হয় না। কারণ কৃষ্ণ তাঁর ঐশ্বরিক মহিমার দম্ভ একমাত্র রাধাকে আকৃষ্ট করার কাজেই বারবার প্রয়োগ করেছেন। শুধু তাই নয়, এই একটি নারীর মনস্তুষ্টির জন্য নিজের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকেও তাঁর ভারবহন করেছেন এবং তাঁর মস্তকে ছত্র ধারণ করেছেন। রাধার প্রতি কৃষ্ণের বাণনিক্ষেপের নিষ্ঠুরতার কলঙ্কও একা কৃষ্ণের প্রাপ্য নয়। কারণ বড়ায়িও এ কাজে কৃষ্ণকে অনুমোদন জানিয়েছে এবং বাণ নিক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ করেছে। বাঁশি হারিয়ে কৃষ্ণের কান্নাও তার ভীরুতা নয়—অপরিশীলিত মানসবৃত্তির ফল। আসলে কৃষ্ণচরিত্র-নির্মিতিতে কবি বড়ু চণ্ডীদাস পৌরাণিক সংস্কারের ঊর্ধ্বে লোকায়ত জীবন-প্রবণতাকে জয়ী করেছেন। এই কারণে তাঁর কৃষ্ণ চরিত্রকে অসঙ্গত বলা যায় না। বরং মথুরায় যাওয়ার আগে বড়ায়ির প্রতি রাধিকার যত্ন নেওয়ার জন্য অনুরোধ দেহলোলুপতার আড়ালেও হৃদয়ানুভূতি উন্মেষের স্বাক্ষরবাহী।

বড়ায়িঃ বড়ায়ি চরিত্র নির্মাণেও বড়ু চন্ডীদাস যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তবে রাধা এবং কৃষ্ণচরিত্রের মত এই চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারেও কবির মনে পূর্ববর্তী সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতা কাজ করেছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা সদুক্তিকর্ণামৃতের 'কৃষ্ণযৌবনম্' পর্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে গোপীকের একটি শ্লোকে চিত্রিত জরতী চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই বড়ায়ি চরিত্রের পূর্বাভাষ লক্ষ্য করেছি। দামোদর গুপ্তের 'কুট্টনীমতম্,' বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' অথবা জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণনরত্নাকরে' যে কুট্টনী চরিত্র আছে সেগুলির মধ্যেও বড়ায়ি চরিত্রের পূর্বাভাষ লক্ষ্য করা যায়। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' একটি সুপরিচিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের 'পারদারিকাধিকরণম্' অংশের চতুর্থ অধ্যায় হল 'দূতীকর্ম্মাণি'। এই অধ্যায়ে পরকীয়া প্রেমের সহায়িকা দূতীকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে—নিসৃষ্টার্থা, পরিমিতার্থা ও পত্রহারিণী। যে দূতী নায়কের বা নায়িকার অভিপ্রায় অনুসারে নিজের উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে নানা কৌশল অবলম্বন করে কার্যসিদ্ধি করে তাকে বলা হয় নিসৃষ্টার্থা; যে দূতী নায়ক বা নায়িকার বক্তব্য পরস্পরের কাছে চাতুর্যের সঙ্গে নিবেদন করে, তাদের প্রণয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, তাকে বলা হয় পরিমিতার্থা; আর যে দূতী কেবলমাত্র পত্রের আদান-প্রদান করে তাকে বলা হয় পত্রহারিণী। বড়াইর মধ্যে নিসৃষ্টার্থা ও পরিমিতার্থা—উভয় দূতীর বৈশিষ্ট্যই কিছু পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত দূতীরা সাধারণতঃ অর্থের বিনিময়েই নিযুক্ত হয়। কামশাস্ত্রের এই দূতীদের মত নাগর-নাগরীর মধ্যস্থতা করা বড়াই-র জীবিকা কিনা তা কাব্যে পরিষ্কার করে বলা নেই। তবে রাধার কাছে অপমানিতা হওয়ার পর তাম্বুলখন্ডে বড়াই নিজে বলেছে যে, অন্য অনেকের এই কাজও সে করেছে—

আনেক জনের কাজেঁ গেলোঁ নানা থানে।
সব নারী জনে মোর করিল সম্মানে ॥
তোহ্মার আন্তরেঁ গেলোঁ রাধিকার থানে।
পাএ পেলাইল রাধা তোর গুআ পানে ॥[১১১]

বড়াই-র এই উক্তি থেকে মনে হয় কুট্টিনীর কাজ করাও এই গ্রাম্য বৃদ্ধার অন্যতম বৃত্তি ছিল। 'রাধাবিরহে'ও রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে বড়াইকে 'শতপল সোনা' দিতে চেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বড়ায়ি-র মধ্যে মমতাময়ী বৃদ্ধা বয়স্কা মহিলারই পরিচয় পাওয়া যায়। আর সেই মমত্ববোধই গোটা কাব্য জুড়ে তাকে একবার কৃষ্ণ ও একবার রাধার দিকে চালিত করেছে। নায়ক-নায়িকা উভয়েই তার স্নেহের পাত্র। তাই স্নেহের বশবর্তী হয়েই সে অবৈধ প্রেমে দূতীয়ালি করেছে। কাব্যের প্রথমেই রাধার অভিভাবিকা বড়াই-র আন্তরিক স্নেহের ও দায়িতজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। রাধা পথ হারিয়ে ফেললে উদ্বিগ্না বড়াই তাকে সব জায়গায় খুঁজে ফিরেছে। এবং অবশেষে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হওয়ায় কৃষ্ণের কাছেই রাধার সন্ধান জানতে চেয়েছে। কৃষ্ণের সঙ্গেও বড়াই-র স্নেহের সম্পর্ক কত নিবিড়, তাম্বুলখন্ডেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। বড়ায়ি কৃষ্ণকে বলেছে—

'তোঁ মোর নাতি যেহ্ন দুঅজ পরাণ'।[১১২]

কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে প্রেম করতে চাইলে বড়াই বলেছে—

আযোড় যোড়ন আহ্মে করিবাক পারি
সে কি রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী ॥[১১৩]

বড়ায়ির এই উক্তির মধ্যে যে দাম্ভিকতা প্রকাশ পেয়েছে—তা একান্তই স্বাভাবিক। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যেই তাকে রক্তমাংসের মানবীরূপে চিনিয়ে দেয়। কৃষ্ণের অনুরোধে বড়াই দুবার প্রত্যাখ্যাত হয়েও তৃতীয়বার রাধার কাছে কৃষ্ণের প্রস্তাব নিয়ে গেছে। এই প্রচেষ্টা বড়ায়ি-র ধৈর্যের পরিচয় দেয়। কিন্তু এরপর রাধা তাকে প্রহার করলে সে ক্রুদ্ধ হয়ে রাধার মুখই দেখতে চায় নি এবং কৃষ্ণকে বলেছে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে। বড়াই-র এই প্রতিশোধ বাসনা অসঙ্গত নয়, বরং রাধার বিরূপতায় তার চরিত্রের এই প্রতিক্রিয়াই বাস্তবসম্মত। এবং সেই কারণেই বড়ুর আঁকা চরিত্রগুলি যেন ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট চরিত্র হয়ে উঠেছে।

এরপর দানখন্ড এবং নৌকাখন্ডে বড়ায়ির কৌশলেই রাধা কৃষ্ণের কবলে এসে পড়ে। বড়ায়ি রাধার শাশুড়িকে একঘরে হয়ে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে রাধার বাইরে যাওয়ার অনুমতি আদায় করেছে। রাধা কৃষ্ণকে এড়িয়ে যেতে চাইলে বড়াই চাতুর্যের সঙ্গে তাকে কৃষ্ণের কাছে এনে ফেলেছে। এই অংশে বড়ু চন্ডীদাস বড়াইকে 'ঠেঁঠালি' অর্থাৎ চতুর কৌশলী বলেছেন।

নৌকাখন্ডেও বড়ায়ির পরিকল্পনা অনুযায়ী রাধা আবার গৃহের বাইরে এসেছে এবং শেষ পর্যন্ত তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন ঘটেছে। এইভাবে তাম্বুলখন্ড থেকে বাণখন্ড পর্যন্ত বড়ায়ি সব সময়েই কৃষ্ণের পক্ষ নিয়ে উদ্ধতা সতীত্বাভিমানিনী রাধাকে পর্যুদস্ত করতে চেয়েছে। ছত্রখন্ডে কৃষ্ণ রাধার মাথায় ছত্র ধারণ করেছে বড়াইরই পরামর্শে। বড়াই কৃষ্ণকে বুঝিয়ে বলেছে—

তোর ভাগেঁ দিল রাধা রতি আনুমতী।
হরিষ করিআঁ তার মাথে ধর ছাতী ॥
আলপ কাম কৈলেঁ হৈব বড় কাজ।
এহাত না করিহ কাহ্ন মনে ছিল লাজ ॥[১১৪]

তারই পরামর্শে কৃষ্ণ বাণখণ্ডে নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে রাধাকে বাণ মেরেছে। অথচ পরের মুহূর্তেই বাণাহতা রাধার করুণ অবস্থা দেখে বড়ায়ি পূর্ব অপমান ভুলে গিয়ে কৃষ্ণকে তিরস্কার করেছে—

মোরে নাহিঁ ছো কাহ্নাঞি বারাণসি যা।
আঘোর পাপেঁ তোর বেআপিল গা ॥
তির বধী বইলি কাহ্নাঞিঁ আপণ মনে।
আপযশ থাকিল তোর তীন ভুবনে ॥[১১৫]

এরপর বড়াই নিজেই উদ্যোগী হয়ে রাধাকৃষ্ণের মিলনও ঘটিয়ে দিয়েছে। কেবলমাত্র যুবতী রাধা নয়—এই বৃদ্ধা জরতীর চরিত্রাঙ্কনেও বড়ু চণ্ডীদাস যথেষ্ট মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। দুই স্নেহভাজনের মধ্যে যখন যাকে বঞ্চিত মনে হয়েছে—বড়াই তখন তারই পক্ষ নিয়েছে। গোটা কাব্যটিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়েছে বড়ায়ির চেষ্টায়। তাই বাণখণ্ডের শেষে রাধামাধব দুজনকে একত্রে রেখে বড়াই দূরে গিয়ে অবস্থান করেছে।

বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহে কৃষ্ণপ্রেমতন্ময়া বিরহবেদনাতুরা রাধার প্রতি বড়ায়ির করুণা ও সহানুভূতি তার মানবিক বোধেরই পরিচয় দেয়। বড়ায়িরই পরামর্শে রাধা ঘুমন্ত কৃষ্ণের বাঁশি চুরি করে এবং এরপর বড়ায়ি রাধারই পক্ষ অবলম্বন করে। এরপর বড়ায়ি কৃষ্ণকে রাধার ষোলশ সখীর কাছে জোড়হাতে মিনতি করে বাঁশি চাইতে বলে। রাধাবিরহ অংশে বার্দ্ধক্যজীর্ণা বড়াই বারবার মৌখিকভাবে নিজের আপত্তি জানিয়েও শেষ পর্যন্ত রাধার জন্য কৃষ্ণান্বেষণে বেরিয়েছে। যে বড়ায়ি একদা কৃষ্ণের জন্য দূতীয়ালি করতে গিয়ে বয়ঃকনিষ্ঠা রাধার কাছে অপমানিতা ও প্রহৃতা হয়েছিল, সেই বড়ায়ি তার অপমানের বেদনা ভুলে গিয়ে সেই রাধারই দুঃখ দূর করার জন্য চেষ্টা করেছে—এ তার মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। রাধার দুঃখ দেখে সে আবার রাধাকে নানাভাবে উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণপ্রেম থেকে তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছে। কখনও কঠোর ভাবে তিরস্কার করে নির্মম ভাষায় বলেছে—

কাহ্নের তাম্বুল রাধা দিলোঁ তোর হাথে।
সে তাম্বুল রাধা তোঁ ভাঁগিলি মোর মাথে ॥
এবেঁ ঘুসঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন ॥[১১৬]

কিন্তু রাধার গভীর বেদনা আর আর্তিতে বিচলিত হয়ে সেই বড়ায়ি আবার আন্তরিক স্নেহ নিয়ে তাকে বলেছে—

মলিন না কর রাধা চান্দসম মুখ।
তোর দেহগতি দেখি মোতে লাগে দুখ ॥
হৃদয়ে ভরস কর থাক মোর থানে।

আপণে মেলিব তোক গোকুলের কাহে ॥[১১৭]

শুধু রাধার ক্ষেত্রে নয়, কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে। একদা কৃষ্ণের হয়েই বড়াই দূতীগিরি করেছিল। কিন্তু সেই কৃষ্ণই যখন রাধাকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে—তখন বড়াই কৃষ্ণকে পরোক্ষভাবে কপট ও অধম বলে তিরস্কার করেছে। এই পক্ষপাতহীন স্পষ্টভাষিতাও সাধারণ গ্রামবৃদ্ধার এই চরিত্রটিকে অসামান্য উজ্জ্বলতা দান করেছে।

পরবর্তীকালে রূপ গোস্বামীর নাটকে বড়াই চরিত্রের আদলে যে বৃদ্ধার চরিত্রটি পাওয়া যায় তার নাম পৌর্ণমাসী। অবশ্য বড়ায়ি চরিত্রটির সঙ্গে এই চরিত্রের অনেক পার্থক্য। পরবর্তী অধ্যায়ে চরিত্রটি আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া পদাবলী সাহিত্য এবং কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যেও বড়ায়ি চরিত্র আছে। পরবর্তীকালের কৃষ্ণযাত্রাগুলিতেও বড়ায়ি একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। স্নেহের বশেই সে কৃষ্ণ এবং রাধার মিলন ঘটিয়েছে। যে দুর্নীতিপরায়ণতা গতানুগতিক কুট্টিনীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য, বড়ায়ি সে দোষ থেকে কিছুটা মুক্ত। কারণ কৃষ্ণের ঐশী সত্তা সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। অবশ্য রাধাকে সে স্বর্গভ্রষ্টা লক্ষ্মী বলে জানত না। পরবর্তীকালের পদাবলী সাহিত্যে কিন্তু বড়ায়ি চরিত্র এতখানি গুরুত্ব পায় নি। কারণ সেখানে রাধা প্রথম থেকেই কৃষ্ণপ্রেমতন্ময়া, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার মতো কৃষ্ণবিমুখী নয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে স্বল্প অবকাশে কলহপ্রিয় নারদের পৌরাণিক ইমেজটি কবি রক্ষা করেছেন। কিন্তু তার অঙ্গভঙ্গী সঙের মত। অন্যান্য চরিত্রগুলির আভাসমাত্র রয়েছে, স্ফুটমানতার কোন পরিচয় নেই। তাই আলোচিতব্য নয়। তবু স্বল্প পরিসরে যশোদার জননী হৃদয়ের স্নেহ ব্যাকুল শঙ্কা এবং রাধার শাশুড়ীর পুত্রবধূ সম্পর্কে সন্দিগ্ধ মনোভাব ও সমাজভীরুতা লক্ষ্য করার বিষয়।

সব শেষে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তো বটেই—কৃষ্ণকথার ক্রম বিকাশেও একটি দিক-নির্দেশক স্তম্ভ, পূর্ববর্তী কৃষ্ণকথার বহু বৈশিষ্ট্যকে আত্মসাৎ করেও এর জনরুচির অনুগামিতা সত্যিই বিস্ময়কর। কিছুটা পরিমাণে উত্তরকালের পদাবলী সাহিত্য এবং কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলি কৃষ্ণকীর্তনেরই অভিন্ন ধারাপথের ক্রমোদ্ভিন্ন রূপ। লোকরঞ্জক কৃষ্ণযাত্রাগুলির বীজও হয়তো জীবনের সমউৎস থেকেই উপ্ত হয়ে থাকবে।

॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিজয়

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পৌরাণিক ও লোকায়তজীবনের বিচিত্র উপাদানের স্বীকরণে, চরিত্রায়ণের মর্ত্যধূলিমাখা বাস্তবতায় কাব্য রসাস্বাদযুক্ত; আর অন্যদিকে মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয় চৈতন্য-পূর্ব কৃষ্ণকথা সাহিত্যে বিশুদ্ধ ভক্তিভাবুকতার প্রবাহসৃষ্টিতে ভিন্নপথগামী। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে শুধু ভাগবত নয়, কবি অন্যান্য পুরাণপ্রসঙ্গও গ্রহণ করেছেন। কখনও কখনও এসেছে অল্পবিস্তর লৌকিক উপাদান। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঐশ্বর্যময় বিরাট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ও বৈকুণ্ঠভ্রষ্টা লক্ষ্মীর কাহিনী হয়েও শেষ পর্যন্ত লৌকিক সমাজের মর্মনিংড়ানো জীবনরস আমাদের উপহার দেয়।

অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণবিজয় পাঠের ফলশ্রুতিতে পাঠকের মনে জেগে থাকে ভাগবতীয় ভক্তিরসের স্নিগ্ধতা—যদিও মালাধর যান্ত্রিক ভাবে ভাগবতকে হুবহু অনুবাদ করে যান নি তাঁর কাব্যে।

কাহিনী ও কাহিনীর উপাদান ঃ কবি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের কাহিনী অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যটি রচনা করেছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিষয়বস্তু হ'ল কৃষ্ণের জন্ম থেকে দ্বারকালীলা পর্যন্ত। ঘটনাস্বল্পতা ও তত্ত্বপ্রাধান্য একাদশ স্কন্ধের বৈশিষ্ট্য। মালাধর এই স্কন্ধ থেকে যদুকুলধ্বংস ও কৃষ্ণের নরদেহত্যাগের ঘটনাটুকু গ্রহণ করেছেন, তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন খুবই কম। বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ও অন্যান্য পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্র থেকেও মালাধর তাঁর কাহিনীর উপাদান কখনও কখনও সংগ্রহ করেছেন। এ ছাড়া কথক-গায়কদের পাঁচালীও কবিকে অনুপ্রাণিত করে থাকবে—কারণ তিনি পাঁচালী রচনার উদ্দেশ্য তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তাঁর কাব্য ভাগবতের হুবহু অনুবাদ না হলেও লঘুভঙ্গীর পাঁচালী তাঁকে বলা চলে না।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা বর্ণিত হয়েছে। বৃন্দাবনলীলায় রাস, নৌকালীলা ও দানলীলা প্রভৃতি যে সমস্ত লৌকিক কৃষ্ণকথার উপাদান পাওয়া যায় তা সবই প্রক্ষিপ্ত বলে পণ্ডিতদের অনুমান। কারণ শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের পুরানো পুঁথিগুলির মধ্যে এই লীলাগুলি পাওয়া যায় নি। ভাগবতে রাধাপ্রসঙ্গ নেই, মালাধরের কাব্যেও রাধার উল্লেখমাত্রই আছে বলা চলে।

বৃন্দাবনলীলার মধ্যে যে আদিরস আছে—তাকে অঙ্গীকার করে নিয়েই আমরা এই কাব্যকে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও বীরত্বপ্রকাশক একটি কাব্য বলতে পারি। বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি ও ভগবান কৃষ্ণের নায়কত্ব এটিকে বীররসাত্মক মহাকাব্যের মর্যাদাও দিতে পারে। তবে কথাবস্তুর ব্যাপ্তি প্রসঙ্গে ভাগবত অনুবাদক মালাধরের কাব্যের কথাবস্তুর সঙ্গে ভাগবতের কথাবস্তুর পার্থক্যটিও আমাদের নিরূপণ করা প্রয়োজন। মূল ভাগবতের কলেবর বিরাট। এর বারোটি স্কন্ধ, তিনশ বত্রিশটি অধ্যায় এবং আঠারো হাজার শ্লোক। কৃষ্ণের জন্মপ্রসঙ্গ শুরু হয়েছে দশম স্কন্ধে। দশম ও একাদশ দ্বাদশ স্কন্ধে কৃষ্ণের জীবনকাহিনীর সঙ্গে রয়েছে তত্ত্বকথা ও অজস্র উপকাহিনী। কারণ ভাগবত সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর আর বংশানুচরিত নিয়ে গঠিত পুরাণ কলেবর। এই আকর থেকে কবি কাহিনীর যে অংশটুকু গ্রহণ করেছেন,—তা তাঁর পরিমাণবোধেরই পরিচায়ক। আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত একটি মহাকাব্যের কাহিনী যেমন হওয়া প্রয়োজন কবি ঠিক সেই পরিমাণ কাহিনীই গ্রহণ করেছেন। এই কাব্যের আদিকাহিনী কৃষ্ণের জন্ম থেকে বৃন্দাবনলীলার সমাপ্তি পর্যন্ত। মধ্য-কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে মথুরায় কংসবধ থেকে দ্বারকাগমনের পূর্ববর্তী ঘটনা। এবং অন্ত্যকাহিনীতে রয়েছে কৃষ্ণের দ্বারকাপুরীতে গমন থেকে ইহলীলা-ত্যাগের ঘটনা।

মালাধরের কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত লৌকিক রুচিকে প্রশ্রয় দেয় নি বটে—কিন্তু চৈতন্যপূর্ব বাঙালী জনসাধারণের কাছে ভাগবতীয় ভক্তির রসটি দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বকে বাদ দিয়ে তুলে ধরেছে।

কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় সত্তাই এই কাব্যের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। মহাশক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বীদের অবহেলায় পরাজিত করার মধ্যেই অনন্ত শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব

ফুটে উঠেছে। এই ঐশ্বর্যভাবকে প্রকাশ করার জন্য কবি কখনও কখনও পুরাণের মুখাপেক্ষী না থেকে স্বাবলম্বী হয়েছেন। যেমন, উদ্ধবের মুখে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনা ভাগবতে নেই। বীররসের বর্ণনায়ও সম্ভবতঃ সেই কারণেই কবি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অরিষ্টাসুরের বর্ণনা এর অন্যতম উদাহরণ। মালাধরের কাব্যে বাৎসল্য রসের বর্ণনা ভাগবতের তুলনায় নিতান্তই অনুজ্জল। ভাগবতের রজ্জুবন্ধনলীলায় শিশু কৃষ্ণের মনোরম স্বভাববৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে—শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তার কোনটাই উপস্থিত নয়।

আবার জয়দেব পরবর্তী কবি হলেও এবং গোপীপ্রেমের রূপকার হয়েও মালাধর তাঁর কাব্যে রাধার নাম গ্রহণ করেন নি। কোন কোন পুঁথিতে কেবল রাধার নামটুকুই মাত্র পাওয়া গেছে—অন্য কোন প্রসঙ্গ নয়। ফলতঃ মধুর রসের পরাকাষ্ঠা পরকীয়া ঈশ্বর প্রেমের প্রতি কবির অনীহাও লক্ষ্য করার মতো। অথচ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের এইটাই বিষয়বস্তু।

ভাগবতের অপর একটি ঘটনা কৃষ্ণ-বিপ্রনারী সংবাদেও এই অনীহার প্রমাণ আছে। একসময় ক্ষুধার্ত ব্রজবালকেরা কৃষ্ণের কাছে অন্ন প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ প্রথমে যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদের কাছে তাদের পাঠালেন। কিন্তু তারা অন্ন দান না করায় আবার তাদের সেই সব ব্রাহ্মণের পত্নীর কাছে পাঠালেন। এই বিপ্রপত্নীরা কৃষ্ণভক্তি পরায়ণা ছিলেন। তাঁরা বহুবিধ খাদ্য ও অন্ন নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন। কৃষ্ণকে দর্শন করে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করলেন এবং অবশেষে কৃষ্ণের শরণাগতি প্রার্থনা করলেন—

গৃহ্ণন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরো সুতা বা
নভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে।
তস্মাম্ভবৎ প্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো
নান্যা ভবেদগতিররিন্দম তদ্বিধেহি ॥[১৮]

আমাদের পতি ও পুত্র এবং বন্ধু ও ভ্রাতারা আমাদের গ্রহণ করবেন না, অন্যদের আর কথা কি? অতএব হে শত্রুদমন, আপনার চরণে পতিত হলাম। আমাদের অন্যগতি নেই। এখানে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির পরিচয় ফুটে উঠেছে। কিন্তু মালাধরের কাব্যে এটিও পরিণত হয়েছে ঐশ্বর্যমিশ্রা ভক্তিতে। তাঁর কাব্যের ব্রাহ্মণজায়ারা বলেছেন—

কি করিব ঘর দ্বার সব মায়াবন্ধ।
তুমি সবে সত্য আর মিথ্যা সব ধধ ॥

*   *   *   *

সিব সুখ নারদ প্রসাদ দৈত্য সিসু
তোমার মহিমা তারা গাএ কীছু কীছু ।।
ব্রহ্মা সনকাদি তারা অন্ত নাহি পাএ।
উদ্দেসে তোমার গুন ভক্তসব গাএ ॥

তোঁঞ সে দেখিল প্রভু তোমার চরণ।
সফল হইল আজি আমার জনম ।।[১১৯]

এখানে মালাধর কৃষ্ণভক্তিকে ঐশ্বর্যমিশ্রা করে তুলেছেন। শুধু তাই নয়—ব্রজলীলার অন্তর্গত অসুরনিধনের ঐশ্বর্যলীলাও তাঁর লেখনীতে অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মথুরা এবং দ্বারকার কিছু কিছু যুদ্ধলীলাও এই কবির কাব্যে সুবর্ণিত। এই সিদ্ধান্তকে আরও একটি উদাহরণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মিণীকে শিশুপালের হাতে সমর্পণ করতে চাইলে রুক্মিণী কৃষ্ণের শরণাগত হয়ে গোপনে পত্র প্রেরণ করলেন। কিন্তু যেদিন বিবাহ—সেদিন সকাল পর্যন্ত কোন সংবাদ না পেয়ে রুক্মিণী যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে দিয়েও স্বকীয়া প্রেমের ঐশ্বর্যমিশ্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কবি নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী ভাগবতীয় কৃষ্ণকথাকে কখনও সংক্ষিপ্ত কখনও বিস্তৃত এবং কখনও বা বর্জন করেছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণ বলরাম ও গোপসখাদের বাল্যলীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। কেবলমাত্র গোচারণ-লীলাই দুটি অধ্যায় জুড়ে বর্ণিত। কিন্তু কৃষ্ণ বলরামের শৈশবলীলা 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'-এ অনুপস্থিত এবং গোচারণলীলা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত। অন্যদিকে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব প্রকাশে উৎসাহী কবি সংক্ষিপ্ত কাহিনীকেও বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধের অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়ের করুণ কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত। কিন্তু কৃষ্ণের বীরত্বমহিমা প্রকাশক এই কাহিনী মালাধর বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন ভাগবত-বহির্ভূত অন্যান্য ঘটনাবলীকে স্থান দিয়ে। আবার কৃষ্ণের মথুরা-গমনে গোপীদের ক্রন্দন ভাগবতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত।[১২০] কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে এই বর্ণনা একান্ত সংক্ষিপ্ত। শাল্ববধের বিবরণ ভাগবতে খুবই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। কখনও কখনও আবার মালাধর কাহিনীর কিছু পরিবর্তন অথবা অন্যতর বিন্যাস ঘটিয়েছেন। যেমন কংস যখন মহামায়াকে শিলায় নিক্ষেপ করলেন, তখন তিনি আকাশে উঠে বলেছিলেন, যে তোমাকে হত্যা করবে সে কোনও এক স্থানে জন্মেছে।[১২১] কিন্তু মালাধর জন্মের স্থান গোকুলও নির্দিষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। স্যমন্তক মণি উদ্ধারের ঘটনা ভাগবতে যেভাবে আছে—তার সঙ্গে মালাধর বসু নিজস্ব কল্পনা যোজনা করেছেন। এমনকি ভাগবতের ঘটনার ক্রমকেও মালাধর নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য কিছুটা পরিবর্তিত করেছেন। কৃষ্ণের বাল্যলীলায় বিভিন্ন অসুরবধে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। ভাগবতে কালযবন বধের পর জরাসন্ধ পুনরায় মথুরাপুরী আক্রমণ করেছে। কিন্তু মালাধর কালযবন প্রসঙ্গ পরে দিয়েছেন। ভাগবতে বলরাম-রেবতীর বিবাহ একান্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত।[১২২] কিন্তু মালাধর বলরাম-রেবতীর বিবাহ বিস্তৃতভাবেই বর্ণনা করেছেন। আবার শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে রতি যে মায়ানারী সৃজনের কথা প্রদ্যুম্নের কাছে বলেছে—তাও মালাধরের নিজস্ব কল্পনা। ভাগবতে আছে রতি সম্বরের গৃহে পাচিকা নিযুক্ত ছিলেন। এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণযোগ্য কারণ সবসময়ে আবিষ্কার করা না গেলেও এটি নিঃসন্দেহে মালাধরের ভাগবতীয় কৃষ্ণকথায় অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রয়াস।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কথাবস্তু নির্মিতিতে কবি কেবলমাত্র ভাগবত নয়—অন্যান্য শাস্ত্র এবং পুরাণ দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। যেমন, বসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যমুনা পার হচ্ছিলেন—তখন শৃগালীর পথ দেখানোর কথা ভাগবতে নেই। কিন্তু

ভবিষ্যপুরাণে বশিষ্ঠ-দিলীপ-সংবাদের জন্মাষ্টমী ব্রতকথায় আছে। মালাধর ঐ পুরাণ অনুসারে বলেছেন—'স্রিগালীরূপে দেবি আষে মহামায়া'।[১২৩] গীতার দ্বারাও যে প্রভাবিত হয়েছিলেন তার একটি উদাহরণ উদ্ধবের বিশ্বরূপ দর্শন। এ ছাড়াও কবি মহাভারত থেকে সুভদ্রা হরণের কাহিনী নিয়েছেন। ভাগবতে পারিজাতহরণের কাহিনী নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, এক্ষেত্রে কবি পারিজাতহরণের কাহিনী সংগ্রহ করেছেন হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণ থেকে। এই দুই পুরাণেই পারিজাত হরণের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। ইন্দ্রের গৃহে পাণ্ডুর দর্শন, জরাসন্ধের জন্মকাহিনী, শিশুপালের জন্মকাহিনী প্রভৃতি বৃত্তান্ত মহাভারতের সভাপর্ব থেকে গৃহীত হয়েছে।

এই প্রধান প্রধান পুরাণগুলি ছাড়াও মালাধর অন্য কিছু সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণের উপাদান প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি—

অতিত আসিয়া জাএ বৈমুখ হইয়া
তার পুণ্য লৈয়া জায় আপন পাপ দিয়া ॥

হিতোপদেশের— অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুস্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥

—শ্লোকটির অনুবাদ। সেই একই প্রসঙ্গে অর্থাৎ উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মধ্যে এসেছে গরুড়পুরাণ উত্তরখণ্ড (৪।১২) পাতঞ্জল যোগসূত্র (৫৪৭৮-৭৯) প্রভৃতির প্রসঙ্গ।

এই সমস্ত পুরাণের প্রভাব ছাড়াও মালাধরের কাব্যের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, কৃষ্ণকথা নিয়ে রচিত এই কাব্যে শাক্তপ্রভাবের অজস্র নিদর্শন যত্রতত্র রয়েছে। ভাগবতের অন্তর্গত শাক্তপ্রভাব এখানে বহু বিস্তৃতি লাভ করেছে। স্যমন্তক মণি উদ্ধার ঘটনায় রুক্মিণী দেবকীকে বলেছেন—'পূজ দেবী চণ্ডিকা ভবানী।' অবশ্য এই প্রসঙ্গ ভাগবতেও রয়েছে। তবে নরকাসুরের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ প্রসঙ্গে দেখি—

উথা বন্দিঘরে জত রাজার কুমারি।
ঘটপাতি পুজে তারা দেবি মাহেস্বরি ॥[১২৪]

ভাগবতে এই প্রসঙ্গে শক্তিপূজার কোন উল্লেখ নেই। ঘট পেতে দেবী মহেশ্বরীর এই পূজা প্রসঙ্গ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডীপূজার কথাই মনে করিয়ে দেয়। এ ছাড়া যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্রের বহু প্রসঙ্গ বারবার শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে গৃহীত হয়েছে। রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের চারদিকে দাঁড়ানো গোপীদের যে বর্ণনা এই কাব্যে রয়েছে—তা পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের রাসলীলার বর্ণনার সঙ্গে মেলে না। এখানে কি কবি চৈতন্য-পূর্ব কোন তন্ত্রগ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন? মোক্ষযোগ শ্রবণ করার পর উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের কাছে কর্মযোগ শ্রবণ করতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণ যোগশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী ঈশ্বর আরাধনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। কবির কাব্যের এই অংশে তন্ত্রের বিস্তৃত বর্ণনার উপাদান যোগবাশিষ্ঠ, ঘেরণ্ডসংহিতা, স্কন্দপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ যোগচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। যোগশাস্ত্রের নিতান্ত অল্প কিছু প্রসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও রয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এই ব্যাপক শাক্তপ্রভাব বাংলাদেশের মূল ধাতু ধর্ম্মকেই প্রকাশ করেছে। বৈষ্ণব কাব্যরচনা করতে গিয়েও মালাধর তাই

শক্তি সাধনার বিশেষ প্রকরণকে তাঁর কাব্যে বর্জন করতে পারেন নি। পরবর্তীকালের কৃষ্ণকথা সাহিত্যে তন্ত্রনির্ভর যে শাখাটি লক্ষ্য করা যায় তার পূর্বসূচনা মালাধরের কাব্যেই—এ মন্তব্য নিতান্ত অযৌক্তিক হবে না।

শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের কিছু কিছু পুঁথিতে ভাগবত বহির্ভূত অন্য কিছু লৌকিক কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ যুক্ত রয়েছে। যেমন দানলীলা, নৌকালীলা, ভারখণ্ড প্রভৃতি। এখানকার দানলীলার সাথে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানলীলার সাদৃশ্য আছে। এখানেও বড়ায়ি রাধাকৃষ্ণের প্রেমে দূতীর কাজ করেছে। নৌকাখণ্ডও খুব বিস্তৃতভাবেই বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভারখণ্ডও নানা ঘটনায় পরিপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময়। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন সামান্যা গোপীদের ভারবহন করলেন—এর কারণ এখানে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

একটি পুঁথিতে [১২৫] নতুন ধরনের একটি কৃষ্ণলীলার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আয়ান গোপ যখন দুগ্ধদোহন করত, তখন তার পত্নী রাধা দোহনস্থানে গিয়ে গোবৎসকে আটকে রাখত। একদিন সেখানে বালক কৃষ্ণ উপস্থিত হলেন এবং রাধার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এমন সময় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় আয়ান ও নন্দগোপ গাভীগুলিকে আনার জন্য রওনা হলেন। কৃষ্ণকে বাড়ী পৌঁছে দেবার ভার নন্দ অর্পণ করলেন রাধিকার ওপর। রাধা কৃষ্ণকে নিয়ে গন্তব্যে যাবার সময় পথে প্রবল দুর্যোগ উপস্থিত হ'ল। রাধা আর অগ্রসর হ'তে না পেরে একটি গাছের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং রাধা-কৃষ্ণের মিলন হল।

কিন্তু রাধাকৃষ্ণলীলার এই অংশগুলি নানা কারণে মালাধরের কাব্যে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। এর প্রধান কারণ হল, সব পুঁথিতে এই লীলাগুলি পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, যেসব পুঁথিতে এগুলি পাওয়া যায় তার একটির সাথে আর একটির কোন মিল নেই। সুতরাং নিঃসন্দেহে এগুলি পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। অতএব মালাধরের কাব্যে অনুপ্রবিষ্ট লৌকিক কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গটি বাধ্য হয়ে পরিহার করতে হয়। কিন্তু এতে কৃষ্ণকথাকার মালাধরের কৃতিত্ব খর্ব হয় না। তার কারণ, আগেই আমরা দেখিয়েছি ভাগবতানুসারী হলেও কবি নানা পৌরাণিক সাহিত্যের উত্তরাধিকারকে তাঁর কাব্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে শ্রীহরিসাধনার পন্থারূপে এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে তিনি শক্তিসাধনা ও শক্তিপূজা প্রসঙ্গ এনে বাঙালীর বিশেষ ধর্মচেতনার মৌল স্বভাবটিকে তাঁর কাব্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের একটি নির্ভরযোগ্যসংস্করণ আমাদের হাতে আসছে—ততক্ষণ পর্যন্ত এই সব বিষয়ের আলোচনা অনেকটাই সংশয়সঙ্কুল হয়ে থাকতে বাধ্য।

মালাধরের কবিত্ব ঃ ভাগবতীয় ভক্তিধর্মের সাধারণবোধ্য রূপনির্মিতি মালাধরের উদ্দেশ্য হলেও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তাঁর কবিস্বভাব নিজেকে প্রকাশ করেছে। কাহিনীবয়নে যেমন তিনি মাঝে মাঝে মৌলিকতার পরিচয় দিতে পেরেছেন, তেমনি বর্ণনসৌকর্যে ও অনুভূতি-প্রকাশের আন্তরিকতায় কখনও তাঁর কাব্য প্রাণময় হয়ে উঠেছে।

বাংলা সাহিত্যে মালাধরের গ্রন্থই প্রথম পুরাণের অনুসরণে বা অনুকরণে লিখিত। কৃত্তিবাসের রামায়ণ যতই জনপ্রিয় হোক্ না কেন, এই মর্যাদা তার প্রাপ্য নয়—এ

সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ মূলানুগত্যে উভয়ের পার্থক্য বিস্তর।

এ ছাড়া চৈতন্য পূর্ববর্তী ঐশ্বর্যপ্রধান কৃষ্ণভক্তির স্বরূপটিও এই গ্রন্থের মধ্যেই পাওয়া যায়। এই কাব্যে রাসলীলা, গোপীলীলা প্রভৃতি মধুররসাত্মক কৃষ্ণলীলার পরিবর্তে মথুরা ও দ্বারকা পর্বের বীর কৃষ্ণের ঐশ্বর্যমূর্তিই প্রাধান্যলাভ করেছে। জয়দেবের দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও মালাধরের এই ঐশ্বর্য-আসক্তি সমকালীন মুসলমান আক্রমণে পযুর্দস্ত বাঙালী মানসের আত্মরক্ষার অবচেতন আকাঙ্খা কিনা সে নিয়ে অবশ্যই বিতর্ক দেখা দেবে। কারণ কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদে এর বিপরীত প্রবণতাই দেখা যায়।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কবির বাঙালী মানসিকতা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাই বৃন্দাবন-মথুরা-দ্বারকার জীবন বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বাঙালী জীবনের কথা এনে ফেলেছেন। তাঁর বর্ণনায় জননী যশোদা বাঙালীমায়েদের মত কৃষ্ণ বলরামকে বলেছেন—

আইস বাপু বলরাম কানাঞিত লইয়া।
ভাত খায়্যা পুনরপি খেলাহ আসিয়া ॥

অঘাসুর বধের পর ক্ষুধার্ত কৃষ্ণ সখাদের বলেছেন—

সুন ভাই খুধা বড় পাইল আমারে।
সিকা মুকাইয়া ভাত খাই জমুনার তিরে।
এবং সব ছাওালে ভাত কৃষ্ণ বাঁটিয়াত দিল ॥

কবি মথুরার গুয়া, জলপাই, কামরাঙ্গার গাছ দেখতে পেয়েছেন এবং দ্বারে দ্বারে গুয়া, নারিকেলের শোভা দেখেছেন। বৃন্দাবনের বৃক্ষ বর্ণনার সময় কবি আমলকী, বাসক, নারিকেল, তমাল, পাকুড়, তাল, মিশুলি, পলাশ, গুয়া, জলপাই প্রভৃতি বাঙলা দেশের পরিচিত গাছ-পালার বর্ণনা দিয়েছেন। আবার কৃষ্ণ কেশী দৈত্যের দেহ বিদীর্ণ করে মাটিতে ফেললে কবি বলেন 'ফুটি কাঁকুড় জেন হৈল খান খান'। এতো একান্তভাবে বাঙলা দেশেরই বাস্তব অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত।

শান্তভক্তিরসযুক্ত শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যটি কবি রচনা করেছেন 'লোকনিস্তারিতে'। সম্ভবতঃ তাই কবিত্বপ্রকাশের কোন চেষ্টা এর মধ্যে নেই। তবুও মাঝে মাঝে বর্ণনার সৌকুমার্য দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। যোগমায়া যশোদার গর্ভ হ'তে জন্মগ্রহণ করলে—

উঙা উঙা করিয়া কান্দএ কন্যাখানি।
চিয়াইল প্রহরি সব ক্রন্দন শুনি ॥

সদ্যোজাতা কন্যার ক্রন্দনের শব্দ এখানে যেন সজীব হয়ে উঠেছে। রাসলীলা বর্ণনার সময় মালাধর ভাগবতের মনোরম বর্ণনাকে যথাযথ অনুসরণ করেন নি। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমতদ্গত গোপীদের চিত্র অংকনে তিনি কোমল ভক্তিনিষ্ণাত মাধুর্যের ছোঁয়া দিতে ছাড়েন নি। বাঁশীর স্বরে ব্যাকুলা গোপীরা কৃষ্ণের কাছে এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালে তিনি তাদের উপদেশ দিলেন গৃহে ফিরে পতিপুত্রের সেবা করতে। তখন—

এতেক বিপ্রিয় যবে গোবিন্দ বলিল।
হেট মাথা করি গোপী কাঁদিতে লাগিল ॥
স্তন বাহিয়া আঁখির জল পড়ে ভূমিতলে।
বসন মলিন হৈল নয়ানের জলে ॥

কি করিব কি বলিব অনুমান করি।
পদাঙ্গুলি ভূমে লিখি বলে ধীরি ধীরি ॥

গোপীপ্রেমের আর্তি ও একান্ত শরণাগতি এখানে অত্যন্ত সহজ ভাষায় ও সহজভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

কৃষ্ণের সুমধুর বংশীধ্বনি শ্রবণে জীব ও জড়জগতের আনন্দিত প্রতিক্রিয়া মালাধরের কাব্যে বড় সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে মালাধরের কবিত্ব ভাগবতকেও অতিক্রম করে গেছে—

কদম্বের তলে যবে বংশি নাদ দিল।
তা সুনি মউর পক্ষ নাচিতে লাগিল ॥
সুখান যতেক বৃক্ষ ছিল বৃন্দাবনে।
বংসির নাদে ফুল ফল ধরে তরুগণে ॥

কৃষ্ণকথার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বংশীধ্বনীর অমোঘ প্রভাব পরবর্তীকালীন বৈষ্ণবসাহিত্যকে অতিক্রম করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও ব্যাপ্ত হয়েছে। মালাধরের কাব্যে তার সুমধুর সুরলহরী কবির নিজস্ব কল্পনাতেই বেজে উঠেছে। এই মালাধর একাধারে ভক্ত ও কবি অভিধালাভের যোগ্য।

মালাধরের কাব্যে পয়ার-ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এই ছন্দ তাবার সর্বত্র সমাক্ষরযুক্ত নয়। এর কারণ মধ্যযুগে এই কাব্যগুলি গান করা হত।

তবে মালাধরের কাব্যে অলঙ্কার ব্যবহারে অল্প কিছু কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বাঙ্গালী জীবনের সাধারণ বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কবি অলঙ্কার নির্মাণের কাজে লাগিয়েছেন। যেমন পুতনার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেন--

লাঙ্গলের ঈস যেন দন্ত সারি সারি।
গিরিসম কন্ধ নাসিকা দেখিতে ভয়ঙ্করি ।।

আবার মূর্চ্ছিতা রুক্মিণীকে দেখে কবির মনে হয়—

কদলির গাছ যেন পড়ে অল্প ঝড়ে ॥

কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মালাধর বসু অলঙ্কার ব্যবহারে গতানুগতিক পথ অনুসরণ করেছেন।

তবে এখানে আমাদের লক্ষণীয় কলাকৃৎ-মালাধর নয়, কৃষ্ণকথার রূপকার মালাধর। মালাধরের কাব্যে কৃষ্ণকথার স্বরূপ নিয়ে আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। তারই সূত্রে বলতে পারি চৈতন্যপূর্ব শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কবি মালাধর ভাগবতের কাহিনী-অংশটুকু গ্রহণ করে ভাগবত বর্ণিত বৈধীভক্তির রসপ্রস্রবণ সর্বসাধারণের মাঝে প্রবাহিত করতে চেয়েছেন এবং পেরেছেনও। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের জনপ্রিয়তাই এর প্রমাণ। জয়দেব এবং বড়ু চণ্ডীদাসের বহুল জনপ্রিয়তার প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও মালাধর বৃন্দাবন-বিহারী প্রেমিক কৃষ্ণের পরিবর্তে অনন্ত ঐশ্বর্যবান যোদ্ধা এবং বীর কৃষ্ণের পরিচয়কেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস এবং পরবর্তী পদাবলীকারদের অনুশীলনে কৃষ্ণকথায় সূক্ষ্ম কলানৈপুণ্যের যে পরিচয় পাই, তাকে অনুভবের জন্য ও তার রসাস্বাদনের জন্য

প্রয়োজন অনুশীলিত মানসবৃত্তির পাঠক ও শ্রোতা। দীক্ষিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অনুশীলন ছিল। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত সূক্ষ্ম রোমান্টিক অনুভূতিসম্পন্ন পাঠকের কাছে এই পদাবলী সাহিত্য হয়ে উঠেছে মধ্যযুগের সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে একমাত্র আস্বাদনীয় সামগ্রী। একে আশ্রয় করে গড়েও উঠেছে এক অসত্য প্রবাদ—ভাগবত বা ভাগবতাশ্রয়ী কৃষ্ণকথা-কাব্যসমূহ মধ্যযুগীয় সাহিত্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে নি। কিন্তু মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ঐশ্বর্যঋদ্ধ কৃষ্ণকথার অপেক্ষাকৃত অ-সূক্ষ্ম ধারাটিও যে মধ্যযুগে জনপ্রিয় হয়েছিল—তার নিশ্চিত প্রমাণ আছে শতাধিক কৃষ্ণমঙ্গলকারের অনুবর্তনে। শুধু শিল্পীর সংখ্যাই নয়—সহস্রাধিক প্রাপ্ত পুঁথিও আমাদের বিশ্বাসের অন্যতম প্রমাণ। সূক্ষ্মতা সাংস্কৃতিকমানের উত্তুঙ্গতাকে নির্দেশ করলেও ব্যাপ্তির দিকটি ইতিহাস এড়িয়ে থাকতে পারে না। প্রবাদে যা প্রতিফলিত, তথ্যের আলোকে সত্য তার বিপরীত বলেই প্রতিভাত হয়।

॥ ৩ ॥

বিদ্যাপতি

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি মিথিলার অধিবাসী হয়েও বাংলার পদাবলী সাহিত্যে এমন একটি ঐতিহাসিক স্থান অধিকার করে রয়েছেন যে, তাঁকে বাদ দিয়ে আমাদের এই কৃষ্ণকথার আলোচনা সম্পূর্ণতা লাভ করতেই পারে না। চৈতন্যচরিতামৃতের সাক্ষ্যে আমরা জানি বিদ্যাপতির পদ চৈতন্যদেবের আস্বাদনধন্য হয়েছিল। সে যুগে মিথিলা এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ব্যাপকভাবেই ঘটত। তাই 'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতির পদাবলী বাংলা দেশেও ব্যাপকভাবেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে আবার বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ মিথিলার তুলনায় বাংলাদেশেই আদৃত হয়েছে বেশি পরিমাণে। বাংলাদেশে রচিত কাব্য গীতগোবিন্দ থেকে ঋণ গ্রহণ করে বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের কাছ থেকে পাওয়া 'অভিনব জয়দেব' উপাধিতে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছেন। অন্যদিকে চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যে নানাভাবে বিদ্যাপতির প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির মণ্ডন-মাধুর্যকে আত্মসাৎ করে নিজেই 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' উপাধি ধারণ করেছেন। তাই বিদ্যাপতি বাংলাদেশের অধিবাসী না হয়েও বাংলার প্রাণের কবি। মিথিলায় তাঁর শিব বিষয়ক পদের সমাদরই বেশী। অন্যদিকে ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরু প্রভৃতি বৈষ্ণবপদ সংকলনে বিদ্যাপতির পদ সংগৃহীত হয়ে বাঙালীর রসচৈতন্যে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

এই কারণেই বিদ্যাপতি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার আগে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তাঁকে বাঙালী বলেই ধরে নিয়েছিলেন। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বাঙালী পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। ১৮৫৮-৫৯ খ্রীস্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম তাঁর বিবিধার্থসংগ্রহে 'বঙ্গভাষার উৎপত্তি' নামক প্রবন্ধে অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে বিদ্যাপতির পদ ও উদ্ধৃত করেন। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে বিদ্যাপতির সংক্ষিপ্ত কাব্যপরিচয় দিয়েছিলেন।

এ ছাড়াও হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবিচরিত' (১৮৬৯), মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' (১৮৭১) ইত্যাদিতেও বিদ্যাপতি সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এঁরা কেউই জানতেন না যে বিদ্যাপতি অবাঙালী। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে জন বীম্‌স Indian Antiquary পত্রিকার ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় The Early Vaisnava Poets of Bengal নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাতেও বিদ্যাপতিকে তিনি বাঙালী বলেছেন এবং অন্য আর একজন পদকর্তা বসন্ত রায়ের সঙ্গে তাঁকে অভিন্ন মনে করেছেন। পণ্ডিত ও অনুসন্ধিৎসুদের এই বিভ্রান্তি থেকেও বাঙালী কাব্যরসিকের মনে কবি বিদ্যাপতির অক্ষয় প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'বিদ্যাপতি' নামে যে প্রবন্ধটি লেখেন, তাতেই বিদ্যাপতির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক নিজে দ্বারভাঙা অঞ্চলে গিয়ে বিদ্যাপতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেন। এরপর গ্রীয়ার্সন সাহেব ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে An Introduction to the Maithili Language of North Bihar নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। এতে বিদ্যাপতির ভনিতায় ৮২টি পদ আছে। এছাড়া Indian Antiquary পত্রিকায় বিদ্যাপতি সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর ফলে বিদ্যাপতির জীবনী ও কবিত্ব সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানা যায়। পরবর্তীকালে আরও অনেক পণ্ডিত বিদ্যাপতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ড. বিমানবিহারী মজুমদারের সম্পাদনায় বিদ্যাপতির পদাবলী বিস্তৃত ভূমিকা ও গবেষণাপ্রাপ্ত তথ্যাদিসহ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা আলোচনায় এই মিত্র-মজুমদার সংস্করণেরই পদ প্রধানত গ্রহণ করেছি।

মিথিলার দ্বারভাঙা জেলার অন্তর্গত মধুবনী মহকুমার বিসফী গ্রাম বিদ্যাপতির জন্মস্থান। পিতার নাম গণপতি ঠাকুর, বাংলায় যা রূপান্তরিত হয়েছে 'ঠাকুরে'। বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষদের অনেকেই মিথিলার রাজসভায় প্রভাব প্রতিপত্তিশালী কর্মচারী ছিলেন। আবার কেউ কেউ রাজসভার প্রতিপত্তির মোহে আকৃষ্ট না হয়ে দেবপূজা ও শাস্ত্রচর্চায় জীবন কাটিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিদ্যাপতির পিতামহ জয়দত্ত। বিদ্যাপতির পিতা রাজ দরবারে প্রতিপত্তি না পেলেও পূর্বপুরুষদের সুবাদে বিদ্যাপতি রাজসভায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। বেশ কয়েকজন রাজার রাজত্ব কালে বিদ্যাপতি মিথিলার রাজসভা অলঙ্কৃত করে ছিলেন। কিন্তু রাজসভায় বসে তিনি শুধু বৈষ্ণব পদাবলী ও শিব বিষয়ক পদাবলীই রচনা করেন নি, তিনি একাধারে ছিলেন পদকর্তা, সভাসদ, রাজকর্মচারী, সেনাপতি এবং সংস্কৃত ও মৈথিল ভাষায় নানা গ্রন্থের গ্রন্থকার।

নানা তথ্য প্রমাণ থেকে মনে হয় বিদ্যাপতি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৩৮০ খ্রীস্টাব্দে অথবা তার কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। মিথিলার বিভিন্ন রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। কীর্তিসিংহ থেকে ভৈরবসিংহ পর্যন্ত ছ'জন রাজা এবং একজন রানীর পৃষ্ঠপোষকতা তিনি লাভ করেছিলেন। এ পর্যন্ত পাওয়া বিদ্যাপতির মোট আটশতাধিক পদের মধ্যে রাজা শিবসিংহের নাম আছে ২০১ টি পদে। প্রথম যৌবনে বিদ্যাপতি কীর্তিসিংহের রাজসভায় বসে রচনা করেন কীর্তিলতা। দেব সিংহের রাজত্বকালে রচিত হয় ভূপরিক্রমা এবং শিবসিংহের সময়ে বিদ্যাপতি রচনা

করেন কীর্তিপতাকা ও পুরুষপরীক্ষা। পদ্মসিংহ ও বিশ্বাস দেবীর আমলে রচিত হয় শৈবসর্বস্বসার ও গঙ্গাবাক্যাবলী। নরসিংহ, পুরাদিত্য ও ভৈরবসিংহের রাজত্বকালে রচিত হয় যথাক্রমে বিভাগসার, দানবাক্যাবলী, লিখনাবলী ও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী। এরই ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর সমগ্র সারস্বত-জীবন ধরে বিভিন্ন বিষয়ক পদাবলী রচনা করেছেন।

বিদ্যাপতির এই বিপুল সৃষ্টি থেকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অতি অল্প পরিচয় আমরা পাই। এর মধ্যে বলা যায়, পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সূত্রে বিদ্যাপতির ব্যক্তিত্বে দুটি বৈশিষ্ট্য বর্তেছিল। তার একটি হচ্ছে রাজসভার ঐশ্বর্য, ভোগবিলাস ও আড়ম্বরে আসক্তি, আর অন্যদিকে শাস্ত্রচর্চা ও দেবপূজার দ্বারা শুচিস্নিগ্ধ ভক্তিনম্র জীবনের প্রতি আগ্রহ। বিদ্যাপতির কবিব্যক্তিত্বের মধ্যেও এই দুই সত্তার প্রতিফলনই আমরা লক্ষ্য করি। আবার মিথিলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ তাঁর দীর্ঘ পরমায়ুকে নানাভাবে আন্দোলিত করেছে। এর মধ্যে বিদ্যাপতির আবেগ আনন্দময় রাধাকৃষ্ণলীলার বেশীর ভাগ পদই রচিত হয়েছে রাজা শিবসিংহের রাজত্বকালে। মাত্র তিন বছর ন'মাস রাজত্ব করার পর শিবসিংহ সম্ভবত মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। কারণ এরপর তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। ফলে বিদ্যাপতিও ভাগ্যবিপর্যয়ের মুখোমুখি হন। তখন জীবিকা অর্জনের জন্য, পদ রচনা ছেড়ে তিনি 'লিখনাবলী'র মতো কেজো গ্রন্থ রচনা করেছেন। পরে পদ্মসিংহের আমলে মিথিলায় ফিরে আসেন, এবং পর পর বিভিন্ন রাজার নির্দেশে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তাই বিদ্যাপতি একাধারে শৈব ও বৈষ্ণব পদরচয়িতা, মুসলমান আক্রমণে পর্যুদস্ত মিথিলার হিন্দুসমাজ-সংস্কারক স্মার্ত এবং ইতিহাস সচেতন পণ্ডিত।

হরগৌরীলীলা ও রাধাকৃষ্ণ সংক্রান্ত পদ ছাড়া প্রাকৃত প্রেমলীলার পদও কবি রচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তী ভারতীয় সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। তাঁর পদাবলী সাহিত্যের প্রেরণামূলে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ কবিতা সংকলন সমূহ। গাথা সপ্তশতী, অমরুশতক, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গারাষ্টক ও শৃঙ্গারশতক প্রভৃতি সংস্কৃত ও প্রাকৃত আদিরসের কবিতাগুচ্ছ থেকেই বিদ্যাপতি তাঁর ভাবসমূহ আত্মসাৎ করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বলতম শিল্পীব্যক্তিত্ব কালিদাসের প্রভাব এবং প্রত্যক্ষভাবে জয়দেবের প্রভাবও তাঁর কাব্যে আছে। আসলে পূর্বসূরীদের ঋণ গ্রহণ করতে যে কোন শিল্পীই বাধ্য ; শিল্পসৃষ্টির এটি অন্যতম সূত্র। আর বিদ্যাপতির মত বৈদগ্ধ্যমার্জিত শিল্পীর পক্ষে এই ধরনের ঋণ গ্রহণ ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। কিন্তু শিল্পীর উৎকর্ষ নির্ধারিত হয় ঋণ স্বীকরণের ক্ষমতায়, বিদ্যাপতি সেক্ষেত্রে উজ্জ্বল সিদ্ধির অধিকারী। আর কেবলমাত্র এই কবিরাই নন, বিদ্যাপতির এক শতাব্দী পূর্ববর্তী, বাংলাদেশে প্রায় অপরিচিত আর এক মৈথিল কবি উমাপতি উপাধ্যায়ের পদের সঙ্গেও বিদ্যাপতির পদের সাদৃশ্য আছে। উমাপতি কৃষ্ণের দ্বারকালীলার একাংশ অবলম্বন করে 'পারিজাতহরণ' নামক যে সংস্কৃত নাটকটি রচনা করেছেন, তার গীতগুলি মৈথিল ভাষায় রচিত। এই গীতগুলি সব সময় নাটকের কাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ না হলেও, বিচ্ছিন্ন পদ হিসেবে কিন্তু এদের

আবেদন অসামান্য। এই গীতগুলির সঙ্গে বিদ্যাপতির পদেরও যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বিদ্যাপতির কাব্যের বিলাসকলা ও মণ্ডন মাধুর্য জয়দেবের কাছ থেকে নেওয়া হলেও তাঁর খণ্ডিতা রাধার মধ্যে যে রোমাণ্টিক বেদনার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তা জয়দেবে দুর্লক্ষ্য। এখানে উমাপতির সঙ্গেই তাঁর সাদৃশ্য।[১২৬] পূর্ববর্তী কবিদের সৃষ্টি থেকে বিদ্যাপতির কবিঋণের কিছু কিছু পরিচয় আমরা পদগুলি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দেখার চেষ্টা করব। একই কাব্যরীতিকে অবলম্বন করে বিদ্যাপতির সমসাময়িক মৈথিলকবি অমৃতকর বা অমিয়কর, জীবনাথ, ভীষ্ম, বীরেশ্বর, ভানু, কংসনারায়ণ প্রভৃতিও পদ রচনা করেছেন। কিন্তু এঁদের সকলের মধ্যে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র নিঃসন্দেহে বিদ্যাপতি।

কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে বিদ্যাপতির সামনে যে বহুবিচিত্র বিষয় উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল—তার মধ্যে কৃষ্ণকথাকে গ্রহণ করার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আমরা খুঁজে পাই না। কারণ যে বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ক বিদ্যাপতির সঙ্গে সেই ধর্মের বিশেষ যোগাযোগও যে প্রমাণিত হয় নি বিদ্যাপতির ধর্মমত আলোচনা প্রসঙ্গে সে বিষয়টি আমরা দেখব। কেবল কৃষ্ণকথার আদিরসমুখীন শিল্পসম্ভাবনাই হয়ত প্রেমসৌন্দর্যের এই মহৎ রূপকারকে আকৃষ্ট করে থাকবে। ভক্তজন আমাদের এই সিদ্ধান্তে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন; কিন্তু নিতান্তই আদিরসাশ্রিত অসতীব্রজ্যাতেও রাধাকৃষ্ণকথা বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। অতএব কৃষ্ণকথা কেবল ভক্ত বৈষ্ণবের একক অধিকারের বিষয় ছিল না, রসসৃষ্টির মুখ্য প্রেরণা আদিরসের বিস্তার প্রসঙ্গেও গৃহীত হচ্ছিল এবং বিদ্যাপতিও সেই সূত্রেই গ্রহণ করেছিলেন—এটি আনুষঙ্গিক তথ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ ছাড়া দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অন্য দেবদেবী বিষয়ক প্রসঙ্গের তুলনায় বৃহৎ-বঙ্গের ভৌগোলিক পরিবেশে কৃষ্ণকথার ক্রমপ্রসারণশীল প্রভাবও বিদ্যাপতির ওপর ক্রিয়াশীল হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

ধারাবাহিক কৃষ্ণকথার আলোচনায় বিদ্যাপতির পদাবলী শুরু করতে হয় বয়ঃসন্ধি সময়ের শ্রীরাধিকার বর্ণনা ও সেই সদ্যকৈশোর অতিক্রান্ত তরুণীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কামনা-বিহ্বল প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ থেকে। বয়ঃসন্ধি অবস্থা সাধারণভাবেই সাহিত্যের সামগ্রী। কেবলমাত্র মধ্যযুগে নয়, আধুনিক সাহিত্যেও বয়ঃসন্ধির বর্ণনা সমাদৃত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও বয়ঃসন্ধি বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। যেমন রজনী উপন্যাসে অমরনাথের ভবানীতে লবঙ্গর রূপবর্ণনা। বঙ্কিমচন্দ্র এই রূপাস্বাদনকে বলেছেন ইন্দ্রিয়সম্পর্কশূন্য।[১২৭]

কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের উত্তরাধিকারী বিদ্যাপতি নববিকশিত নারীদেহের অপূর্ব মধুরিমাকে ইন্দ্রিয় বিলাস হিসেবেই আস্বাদন করেছেন। তবে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বিলাস নয়, কবি সেইসঙ্গে আয়ত্ত করেছেন সৌন্দর্যদৃষ্টিও। তাই বয়ঃসন্ধির পদে যে রাধাকে আমরা দেখতে পাই সে রাধা কৃষ্ণের মনের মাধুরী মেশানো লাবণ্য প্রতিমা। কিছু কিছু সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোকে বয়ঃসন্ধি সময়ের দেহমনের ছবি রসোত্তীর্ণভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু বিদ্যাপতির কৃতিত্ব হল এই ধরনের বহুসংখ্যক পদরচনা এবং বয়ঃসন্ধির পদ রচনার ক্ষেত্রে কবি পূর্ববর্তী সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতার ধারা অনুসরণ করেও নিজস্ব সৌন্দর্য দৃষ্টি এবং চিত্রনির্মাণ দক্ষতায় সেইসব পূর্বদৃষ্টান্তকে বহুদূর

ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

রাধার রূপের প্রতি কৃষ্ণ আকৃষ্ট হয়েছেন দূতী ও সখীর বাক্যে। কৈশোর আর যৌবনের মধ্যপথে থমকে দাঁড়ানো শ্রীরাধিকার দিকে শ্রীকৃষ্ণের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য দূতী বলে, রাধার সদ্যযুবতী শরীরে যে কিশোরী মনটি এখনও আছে সে বালিকার খেলায় আনন্দ পায়, অন্যদিকে তার যুবতী সত্তার 'লোক দেখি লাজ' বড়ই মধুর।[১২৮] কৈশোর ও যৌবনের এই দ্বন্দ্বে উন্মথিতচিত্তা তরুণী কখনও চুল বেঁধে রাখে, আবার কখনও খুলে ফেলে। কখনও দেহ আবৃত করে, অভ্যাস না থাকায় পরমুহূর্তেই অনাবৃত করে।[১২৯] এখানে কৃষ্ণের আবরণে রাজসভাসদ কবিই যেন সপ্রেম সাকাঙ্ক্ষ কৌতূহলে একটি বালিকার যুবতী হয়ে ওঠার স্তরান্তর লক্ষ্য করেছেন। তাঁর এই রাধাকৃষ্ণ একটি বিশেষ কালের বিশেষ পরিবেশের মানবমানবী হয়েও নিত্যকালের রূপলিপ্সু প্রেমিক ও নবোদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী। সদুক্তিকর্ণামৃতে রাজশেখরের একটি শ্লোকে উদ্ভিন্নযৌবনা নারীর বর্ণনায় বলা হয়েছে—'পদ্ভ্যাং মুক্তাস্তরলগতয়ঃ সংশ্রিতা লোচনাভ্যাং'।[১৩০] এরই প্রভাবে বিদ্যাপতি রচনা করলেন—

চরণ চপলগতি লোচন লেল [১৩১]

শতানন্দের একটি পদেও এই বয়ঃসন্ধির নায়িকার চমৎকার বর্ণনা আছে—

গতেবাল্যে চেতঃ কুসুমধনুষা সায়কহতং
ভয়াদ্বীক্ষবাস্যাঃ স্তনযুগভূর্নির্জিগমিষু।
সকম্পা ভ্রূবল্লী চলতি নয়নং বর্ণকুহরং
কৃশং মধ্যং ভুগ্না বলিরলসিতঃ শ্রোণিফলকঃ ॥[১৩২]

বাল্যবাল গত হয়েছে। তাই চিত্ত কুসুমধনু মদনের দ্বারা তীরবিদ্ধ হয়েছে। তাই দেখেই যেন তার স্তনযুগ ভয়েই নির্গত বা নিষ্ক্রান্ত হতে ইচ্ছুক হয়েছে। ভয়ে ভ্রূবল্লী কম্পিত হচ্ছে, নয়ন কর্ণকুহরের দিকে চলেছে, মধ্যভাগ কৃশ হয়ে গিয়েছে। বলি বক্রতালাভ করেছে, নিতম্বযুগল অবসন্ন হয়েছে।

এর সঙ্গে বিদ্যাপতির 'সৈসব যৌবন দরসন ভেল' অথবা 'সৈসব যৌবন দুহু মিলি গেল' ইত্যাদি পদ তুলনীয়।[১৩৩] দ্বিতীয় পদটির সঙ্গেই উপরোক্ত শ্লোকের সাদৃশ্য বেশী। কবি রাধা সম্পর্কে বলছেন—

কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
ইহিকে খীন উনকে অবলম্ব

*   *   *   *

চরণ চলন গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে জাব।[১৩৪]

(রাধার) কটিদেশের গৌরব বা স্থূলত্ব নিতম্ব পেল। চরণের চপলগতি চোখ নিল, চোখের ধৈর্য পদতল গ্রহণ করল।

সাহিত্যদর্পণের একটি শ্লোকের সঙ্গেও এর সাদৃশ্য আছে—

মধ্যস্য প্রথিমানমেতি জঘনং বক্ষোজয়োর্মন্দতা
দূরং যাত্যুদরঞ্চ রোমলতিকা নেত্রার্জবংধাবতি।
কন্দর্পং পরিবীক্ষ্য নূতনমনোরাজ্যাভিষিক্তং ক্ষণা—
দঙ্গানীব পরস্পরং বিদধতে নির্লুণ্ঠনংসুভ্রুবঃ ॥[১৩৫]

কিন্তু শুধু শরীর নয়, রাধার মনোলোকের সূক্ষ্ম পরিবর্তনেরও একটি চমৎকার চিত্র এঁকেছেন কবি। সঙ্গীতমুগ্ধা হরিণীর মত রাধা রসকথা অর্থাৎ নরনারীর প্রেমের কথা একাগ্র হয়ে শোনে।

সুনইতে রসকথা থাপয়ে চিত
যৈসে কুরঙ্গিনী সুনয়ে সঙ্গীত।[১৩৬]

এই চিত্রটিতে কবি সদ্যযৌবনে সমাগতা বালিকার সঙ্গে অরণ্যচারিণী হরিণীর তুলনায় শুধু তার সারল্যকেই নিয়েছেন। নিষ্কলঙ্ক কৈশোরের পটভূমিতে এখনও প্রেমের বেদনা, হতাশা আর যন্ত্রণার ছায়াপাত ঘটে নি। রাধা শুধু এখানে অপরিজ্ঞাত প্রেমরহস্য সম্পর্কে আবেশময় মুগ্ধতার একটি ছবি। শৈশব ও তারুণ্যের সন্ধিস্থলে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় হৃদয়-অরণ্যের প্রবেশ পথে দাঁড়ানো উজ্জ্বল মানবী। কবি বালিকা ও তরুণী সত্তার দ্বন্দ্বের আভাসটুকু রাখলেও রসকথামুগ্ধতায় তারুণ্যেরই অবিসংবাদী জয় ঘটেছে। এইভাবে অনাড়ম্বর অথচ সুনির্বাচিত অলঙ্কারে, মনস্তত্ত্বের একটি স্বাভাবিক সত্যকে পর্যবেক্ষণ করে কবি তাঁর রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার মধ্যে বাস্তব জীবনের ও রক্তমাংসের মানুষের উত্তাপ সঞ্চার করতে পেরেছেন। এই জীবনানুগামিতাই বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথার প্রাণ।

'খনে খনে নয়ন কোন অনুসরঈ'[১৩৭] বয়ঃসন্ধির একটি অনবদ্য পদ। এখানে রাধার নাম নেই। পদের শেষে বিদ্যাপতি শুধু কৃষ্ণকে যে সম্বোধন করেছেন, তাতেই জানা যায় এটি রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদ। এই ধরনের পদ আরও আছে। আসলে এই পদগুলিতে কবি রাধাকৃষ্ণের মাধ্যমে লৌকিক প্রেমকেই রূপায়িত করেছেন। উপরোক্ত পদটি কৃষ্ণের জবানীতে। বালিকা রাধা কখনও কটাক্ষপাত করেন, আবার কখনও বা তাঁর আঁচল ধুলোয় লুটায়। কখনও বিকশিত হাস্যে তাঁর দন্তরুচিকৌমুদী বিচ্ছুরিত, আবার কখনও বা সেই হাসি উচিত হচ্ছে কিনা বুঝতে না পেরে রাধা 'অধর আগে কর বাস'। রাধার স্তনবিন্দু এখন মুকুলিত। কিন্তু রাধা কখনও বুকে আঁচল দেয়, আবার কখনও বা দিতে ভুলে যায়। রাধার এই শৈশব আর তারুণ্যের দ্বন্দ্বের মাঝখানে পড়ে কৃষ্ণ বিভ্রান্ত। কৃষ্ণের এই বিভ্রান্তিটুকুও মধুর।

পূর্ববর্তী কবি জয়দেবের কাব্যে রাধা নিত্যযৌবনা। তাঁর কোন পারিবারিক পরিবেশ নেই, নেই বালিকা থেকে নারী হয়ে ওঠার মানবিক অভিজ্ঞতা। বিদ্যাপতিই আমাদের সামনে এক মুকুলিকা মানবীর অপূর্ব রূপচিত্র অংকন করলেন। বিদ্যাপতিরই সমকালে বড়ু চণ্ডীদাসও বালিকা রাধার ছবি এঁকেছেন। কিন্তু সেখানে বালিকার শরীর ও মনের কমনীয় সৌন্দর্য পুরুষের উদগ্র দেহবুভুক্ষায় লাঞ্ছিত। অনিচ্ছুক বালিকা তীব্র দেহমিলনের মধ্য দিয়ে প্রেমের আনন্দ যন্ত্রণাকে অনুভব করতে বাধ্য হয়েছে। তাই বয়ঃসন্ধির বয়সটুকু সেখানে আছে, নেই তার বিকাশমান সৌন্দর্যের মুগ্ধ অনুভব। অন্যদিকে বিদ্যাপতির কৃষ্ণ শুধু অনঙ্গশরজর্জর নন, তিনি সৌন্দর্য-রসিকও। তিনি কামকলার বিদগ্ধ নায়ক। তাই কিছু মুগ্ধতা, কৌতূহলী ভালবাসা আর তীব্র মিলনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি দেহেমনে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠা মানবীর জন্য সহিষ্ণু আগ্রহে অপেক্ষমান। পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের পর কৃষ্ণের সংশয়ের মধ্যেই

সেই সহিষ্ণুতার পরিচয়—'লখএ ন পারিঅ জেঠ কনেঠ'। আর এই পর্যবেক্ষণেই প্রেমিকের চোখ দিয়ে দেখা নারীলাবণ্যের শিল্পিত প্রকাশ।

'খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ'[১৩৮] শীর্ষক পদটিতে সখী অথবা দূতী কৃষ্ণর কাছে রাধার বয়ঃসন্ধির মধুরিমা বর্ণনা করেছে। শৈশবের ক্রীড়াচাপল্য এখনও রাধার ঘোচে নি। নির্জনে বালিকার খেলায় মত্ত থাকেন তিনি, কিন্তু লোক দেখলেই লজ্জা পান। এই লজ্জাতেই নিজের বালিকাত্ব অস্বীকার করে রাধার যৌবন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার অনিবার্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত। রাধার রূপেরও সীমা নেই। তার মুখ আর অধরে যেন একই সঙ্গে কমল ও বাঁধুলির অবস্থান ; চোখ যেন স্থির ভ্রমর, মধুপানে মত্ত হয়ে উড়তে অপারগ, আর ভ্রূ যেন কাজলের ধনু। শুধু রাধার সৌন্দর্যই নয়, অলংকার সৃষ্টিতেও কবি এখানে তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। 'সৈসব জোবন দরসন ভেল' শীর্ষক পদটিতে[১৩৯] শৈশব ও যৌবনের তীব্র দ্বন্দ্বের বর্ণনা। কিন্তু এই দ্বন্দ্বেও যৌবনেরই জয়। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদে শৈশবের সঙ্গে দ্বন্দ্বে যৌবনের এই জয় সর্বত্র ঘোষিত। 'কিন্তু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল' এবং 'সৈসব জোবন দুহু মিলি গেল' পদদুটির মধ্যেও সেই যৌবনেরই জয়।[১৪০] তবে প্রথমটিতে দেখি 'সৈসব এবং যৌবনের 'উপজল বাদ' কিন্তু দ্বিতীয়টিতে 'সৈসব যৌবন দুহু এক ভেল'। বয়ঃসন্ধির রাধার এই রূপ-রূপান্তর কখনও সখী নিজে দেখে কৃষ্ণকে দেখাচ্ছেন, আবার কখনও কৃষ্ণ নিজেই দেখেছেন। শেষের পদটিতে রাধার রূপ এবং সেই রূপে সম্পর্কে তাঁর নিজেরই মুগ্ধতা বর্ণিত। কবি ধীরে ধীরে রাধার যৌবন-বিকাশকে তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণে রূপ দিয়েছেন। এর আগেও রাধার আঁচল ধুলোয় লুটোতে দেখেছি। কিন্তু এখানে রাধা সেই স্তর পেরিয়ে এসেছেন। তার পরিবর্তে—

মুকুর লঈ অব করঈ সিঙ্গার।
সখি পুছই কইসে সুরতবিহার ![১৪১]

'না রহে গুরুজন মাঝে' শীর্ষক পদটিতেও রাধার মধ্যে বালিকা আর তরুণীর দ্বন্দ্ব। কিন্তু এখানে যৌবনের আধিপত্য আরও বিস্তৃত। রাধা এখন গুরুজনদের মাঝখানে থাকে না। সখীরা পরিহাস করে বলে যে তারা মাধবের জন্য রমণী দেখল। এখন কেলিবিলাসের বর্ণনা রাধা খুব মন দিয়ে শোনেন। কিন্তু এজন্য যদি কেউ পরিহাস করে, তবে কান্নামাখা হাসি নিয়ে তাকে গালি দেন। শুধু রূপমুগ্ধতা বা কামনা-জর্জরতা নয়, বিদ্যাপতি যেন সাকাঙ্ক্ষ প্রেমের সঙ্গে সস্নেহ স্মিত কৌতুক নিয়ে বয়ঃসন্ধির বালিকার স্বভাব বৈশিষ্ট্যকেও পর্যবেক্ষণ করেছেন। এইখানেই বয়ঃসন্ধির পদে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব। শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে মনোজগতের বিচিত্র পরিবর্তনও কবি সাগ্রহে লক্ষ্য করেছেন। কবি এখানে শুধু কবি নন, মনস্তত্ত্বসন্ধানীও বটে। 'পহিল বদরি কুচ'—শীর্ষক পদে[১৪২] কবি নারীর একটি বিশেষ অঙ্গের বিভিন্ন স্তরান্তর বর্ণনা করে নায়িকার শৈশব থেকে যৌবনপ্রাপ্তিকে চিহ্নিত করেছেন।

মিত্র মজুমদার সংস্করণের গোড়ার দিকে সংকলিত দুটি বয়ঃসন্ধির পদে রাধামাধবের কোন উল্লেখ নেই।[১৪৩] বালিকা বধূর যৌবনবতী হয়ে ওঠার ইঙ্গিত আছে। এর ফলে উভয়ের প্রেমজাগরণের জন্য এখন আর দূতীর প্রয়োজন হয় না। দুজনের চোখের দৃষ্টিই দূতীর কাজ করে। অর্থাৎ

যে নায়িকার চোখে এতদিন শৈশবের সারল্য ছিল, এখন তার চোখে যৌবনের প্রেমময় কটাক্ষ। এখন আবার নায়িকার ভ্রূ হয়েছে ধনুর মত আর কাজলরেখা হচ্ছে গুণ। সে তারই সাহায্যে নায়কের প্রতি তার নয়ন শর নিক্ষেপ করবে। এই চমৎকার উপমা অলঙ্কার ব্যবহার করে কবি নায়িকার যৌবনাগমই শুধু বোঝান নি, তার যৌবনের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণী শক্তিকেও পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদ মুগ্ধ মাধবের চোখ দিয়ে দেখা বালিকা রাধার যৌবনে পদার্পণের মধুর ছবি। এই যৌবন মন আর শরীর উভয়েরই। আর তারই সঙ্গে এখনও বর্তমান কিশোরীর সারল্য রাধার ক্রমবর্ধমান যৌবনলাবণ্যের অপরূপত্বকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। রাধার এই ক্রমসমাগত যৌবন-সৌন্দর্যের বর্ণনায় কবি বিদ্যাপতি কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের ঋণও একসময় গ্রহণ করেছেন। কুমারসম্ভবে উমার যৌবনসমাগমের বর্ণনায় দেখি—

দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা
লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্
জ্যোৎস্নান্তরানীব কলান্তরানি।[১১৪]

বিদ্যাপতি তাঁর বয়ঃসন্ধির রাধারূপ বর্ণনায় কালিদাসের এই পদটিকে আরও সার্থক ভাবে অনুসরণ করেছেন--

আজ দেখলিসি কালি দেখলিসি
আজি কালি কত ভেদ।
সৈসব বাপুড়ে সীমা ছাড়ল
জউবনে বাঁধল ফেদ॥
সুন্দরি বনক কেআ মুতি গোরী।
দিনে দিনে চান্দ কলা সঞে বাঢ়লি
জউবন শোভা তোরী॥[১৪৫]

কালিদাসের তুলনায় বিদ্যাপতির পদটিতে সজীব মনের ছোঁয়া, কাব্য-সৌন্দর্যকেও বাড়িয়ে তুলেছে। কালিদাস সশ্রদ্ধভাবে পার্বতীর রূপ নিরীক্ষণ করেছেন। অন্যদিকে বিদ্যাপতি সস্নেহে ও মুগ্ধতায় রাধারূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। আজ দেখা আর কাল দেখার মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য তা একই সঙ্গে রাধার সৌন্দর্যের ক্রমবর্ধমানতা এবং কবির সানুরাগ ও সহিষ্ণু মিলন প্রতীক্ষাকেই প্রকাশ করেছে। বিদ্যাপতির এই বয়ঃসন্ধির রাধা ভারতীয় সাহিত্যের এক অনন্য সৌন্দর্যপ্রতিমা।

বয়ঃসন্ধির পর আমরা পূর্বরাগ ও রূপানুরাগ পর্যায়ের আলোচনায় আসতে পারি। চৈতন্যপূর্ব ও চৈতন্যোত্তর—উভয় যুগেই এই পর্যায়ে বহু সার্থক পদ রচিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কৃষ্ণরূপতন্ময়া, বংশীস্বরবিদ্ধা রাধার প্রেম ব্যাকুলতার ছবি। চণ্ডীদাসের পদেও সেই একই রাধার পরিচয় পাই। অন্যদিকে বিদ্যাপতির এই পর্যায়ের বেশীর ভাগ পদেই কিন্তু রূপমুগ্ধ, আসঙ্গলিপ্সু কৃষ্ণের চোখ দিয়ে রাধার সৌন্দর্যকেই দেখানো হয়েছে। চণ্ডীদাস ছিলেন মরমিয়া সাধক কবি, আর চৈতন্যসমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর কবিদের মানসলোকে রাধা এবং

শ্রীচৈতন্য—উভয়েই ছিলেন অভিন্ন। কৃষ্ণপ্রেমতন্ময় শ্রীচৈতন্যকে সামনে রেখেই তাঁরা পূর্বরাগতন্ময়া রাধার মূর্তি অঙ্কন করেছিলেন। অন্যদিকে বিদ্যাপতির সাহিত্যরুচি গড়ে উঠেছিল গতানুগতিকতাবদ্ধ যৌন আবেদন সমৃদ্ধ সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নারীদেহ বর্ণনা দিয়ে এবং তাঁর সামনে কাব্য শ্রোতারা ছিলেন আদিরসলোলুপ রাজ-পুরুষবৃন্দ। কবি যেন কৃষ্ণকে তাঁদেরই একজন ভেবে নিয়ে তাঁরই চোখ দিয়ে নবযুবতী রাধার রূপকে প্রতিফলিত করেছেন। তাই ভক্তির উপস্থিতি সত্ত্বেও বিদ্যাপতির কৃষ্ণ উজ্জ্বলনীলমণি নন, তাঁর রাধাও নন মহাভাবময়ী। রাধা প্রথম দিকে প্রেমে অনভিজ্ঞা হলেও পরিণত যৌবনে একজন প্রেমকলানিপুণা অভিজাত অন্তঃপুরিকা।

অনুরাগ পর্যায়ের প্রথম স্তরে দেখা যায় সদ্যোযুবতী রাধার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণ দূতীর মাধ্যমে রাধাকে প্রেম নিবেদন করলেও রাধা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ রাধার মনে প্রেম এখনও জাগ্রত হয় নি। অন্যদিকে কৃষ্ণের রূপমুগ্ধতা ফুটে ওঠে সিক্তবসনা রাধার সৌন্দর্য বর্ণনায়—

তিতল বসন তনু লাগু।
মুনিহুক মানস মনমথ জাগু॥[১৪৬]

এই ধরনের নিছক অনঙ্গ উদ্দীপক আরও কিছু পদও বিদ্যাপতি রচনা করেছেন। পদগুলিতে একদিকে রাধার প্রতি কৃষ্ণের নিছক রূপমুগ্ধতাজনিত লালসা এবং রাধার প্রেম সম্পর্কে কৃষ্ণের সংশয় ব্যক্ত হয়েছে। স্নানান্তে রাধার রূপবর্ণনা সম্বলিত বেশ কিছু পদ কবির আছে। এই পদগুলিতে কামনাতুর পুরুষের দৃষ্টিতে কামোদ্দীপক নারীদেহদর্শনের বর্ণনা আছে। 'নাহি উঠল তিরে সে ধনি রাঈ' শীর্ষক পদটিতে[১৪৭] স্নানাবসানে রাধাকে কৃষ্ণ দেখেছেন, রাধাও অবনত আননে কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণের সংশয়, রাধা তাঁর প্রতি অনুরক্ত না বিরক্ত। 'আজু মঝু শুভদিন ভেলা' শীর্ষক পদটিতে স্নানের পর রাধাকে দেখে কৃষ্ণ নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছেন। পদটিতে আলঙ্কারিক চমৎকারিত্বও আছে। রাধার সিক্ত চিকুরের জলধারা দেখে কৃষ্ণের মনে হল—'মেহ বরিখে জনু মোতিম হার।'[১৪৮] কৃষ্ণের কামনা অনাবৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছে রাধার স্নানের অন্য একটি পদে। স্নানান্তে রাধার সিক্তবসন থেকে নির্গলিত জলধারা দেখে কৃষ্ণের মনে হয়েছে—

অবহুঁ ছোড়ব মোহে তেজব দেহা॥
ঐছে কেরি রস না পাওব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥[১৪৯]

কৃষ্ণের রূপানুরাগের একটি পদে প্রেমের তৃষ্ণাতুর অতৃপ্তি কবি উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন—

সজনী ভল কএ পেখল ন ভেল।
মেঘ-মাল সঁয় তড়িত-লতা জনি
হিরদয়ে সেল দেঈ গেল॥[১৫০]

ক্ষণপ্রভার তীক্ষ্ণ তীব্র দীপ্তির সঙ্গে রাধার রূপের তুলনা একই সঙ্গে কৃষ্ণের সৌন্দর্যরসিকতা ও তীব্র দেহনির্ভর প্রেমাকাঙ্ক্ষাকেই রূপ দিয়েছে। এই পদগুলি শুধু

রূপানুরাগের নয়, রূপোল্লাসেরও বটে। যৌবনধন্য কবি রাজসভার বিদগ্ধ আদিরস উপাসকদের সামনে রাধাকৃষ্ণের জবানীতে এক নাগরিকের প্রেমবিলাসকে অলঙ্কৃত আড়ম্বরে রূপায়িত করেছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে এই অলংকার ব্যবহারই সর্বস্ব হয়ে অলংকারিক চাতুর্যে পরিণত হয়েছে এবং এর ফলে প্রেমের সৌন্দর্য ও পদের সৌন্দর্য দুই-ই নষ্ট হয়েছে। তবে কখনও কখনও এরই মাঝখানে কবি দেহ বর্ণনাতেই দেবারাধনার পবিত্র শংখ বাজিয়েছেন। রাধার স্তনযুগ সম্পর্কে কবির কৃষ্ণ বলেন—

কাম কম্বুভরি কনক সম্ভু পরি
ঢারত সুরধনি-ধারা[১৫১]

নারীদেহকে এইভাবে দেববিগ্রহে তথা শিববিগ্রহে পরিণত করার প্রবণতা বিদ্যাপতির পদে অন্যত্রও দেখা গেছে। তাঁর ধর্মীয় প্রবণতার ইঙ্গিতও এর মধ্যে লুকিয়ে আছে মনে হয়।

বিদ্যাপতির কৃষ্ণ কামনাকাতর হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নায়কের মত রাধার ওপর বলপ্রয়োগের বাসনা যেমন তাঁর নেই, তেমনি নিজের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করে রাধাকে অভিভূত করার চেষ্টাও নেই। অন্যদিকে বিদ্যাপতির রাধা কিন্তু কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধার মতই নিজের রূপ নিয়ে গর্ব করেছেন—

কত এক হমে ধনি কত এ গোয়ালা।
জলে থরে কুসুম কৈসনি হো মালা॥[১৫২]

নিজের রূপ নিজের মুখে বিস্তৃতভাবে বর্ণনায়ও রাধার লজ্জা নেই। তিনি কৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলেন, তাঁর মুখকে রাহুভীত চাঁদ মনে করে মন্মথ অধরে সুধা এনে রেখেছে। মন্মথ নিজের ধনুই রাধার ভ্রূভঙ্গিমায় দান করে গেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রথমদিকে পূর্বরাগ বা অনুরাগ কৃষ্ণেরই এক তরফা। রাধা নিজেকে বলেছেন নাগরী, আর কৃষ্ণ তাঁর মতে গ্রাম্য গোঁয়ার।[১৫৩]

তাঁর এই নাগরিক ছলাকলার পরিচয় নানাভাবেই পাওয়া যায়। তিনি কৃষ্ণকে নানা কৌশলে দর্শন করেছেন, কখনও বা নানাবিধ ছলে কৃষ্ণের কামনা সচেতনভাবে বর্ধিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।[১৫৪]

কৃষ্ণের পূর্বরাগ প্রধানতঃ বয়ঃসন্ধির সদ্যতরুণী রাধার সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করে। অন্য দিকে রাধার পূর্বরাগ ও অনুরাগ কখনও সাক্ষাৎ দর্শনে আবার কখনও বা স্বপ্নদর্শনে। একটি পদে[১৫৫] দেখা যাচ্ছে যমুনার তীরে সংকীর্ণ পথে তরুতলে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার দেখা হল। কিন্তু পথ সংকীর্ণ হলেও রাধার এই অনুরাগের পটভূমি নগর পরিবেশে। কারণ পরমুহূর্তেই রাধা বলেছে জনাকীর্ণ নগরের মধ্যে কৃষ্ণ তার হৃদয় হরণ করে নিল। মদনের পঞ্চবাণ রাধার মর্মস্থলে এসে বিঁধল। অর্থাৎ রাধার এই পূর্বরাগ সম্পূর্ণই কামনা নির্ভর। অন্য একটি পদে রাধা স্বপ্নে কৃষ্ণকে দেখেছেন—

নীল কলেবর পীতবসন
চন্দনতিলক ধবলা।
সামর মেঘ সৌদামিনী মণ্ডিত
তথিহি উদিত সসিকলা॥

হরি হরি অনতয় জনু পরচার।
সপনে মোএ দেখল নন্দকুমার ॥[১৫৬]

পদের প্রথম পংক্তিতে কৃষ্ণের যে রূপ বর্ণনা আছে—তা জয়দেবের 'চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর পীত বসন বনমালী'র অনুকরণে।[১৫৭] এখানে রাধার রূপমুগ্ধতার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে। পদটি শিবসিংহের রাজত্বকালে লেখা। কখনও বিদ্যাপতির রাধা কৃষ্ণরূপ দেখার আনন্দে বিভোর হয়ে সখীকে সম্বোধন করে বলে ওঠেন—'এসখি পেখলি এক অপরূপ'।[১৫৮] কিন্তু এই রাধা ভো নাগরিকা নায়িকা। তাই অপরূপকে দেখার আনন্দে তিনি আত্মহারা হয়ে যান না। সম্বৃত শিল্প-কুশলতায়, অলংকৃত চাতুর্যে কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেন—

কমল জুগলপর চাঁদক মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল।
তাপর বেঢ়লি বিজুরি-লতা।
কালিন্দি তীর ধীর চলি জাতা ॥
সাখা-সিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহি নব পল্লব অরুণক ভাঁতি ॥
বিমল বিম্বফল জুগল বিকাশ।
তাপর কীর থীর করু বাস ॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন জোর।
তাপর সাপিনি ঝাঁপল মোর ॥

বিদ্যাপতি এখানে উপমানের তুলিতে কৃষ্ণের পদনখকান্তি থেকে মাথার ময়ূরপুচ্ছের শোভাকে পর্যন্ত নিখুঁতভাবে এঁকেছেন। এ যেন দেহসৌন্দর্যকে অপরূপত্ব দেওয়ার জন্য রূপসন্ধানী কবির প্রকৃতিলোক সন্ধান। এর অলঙ্কার হল রূপক অতিশয়োক্তি। পদের শেষে রাধা বলছেন কৃষ্ণকে আবার দেখতে গিয়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। প্রথমবার কিন্তু তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবেই কৃষ্ণরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন। রাধার এই সচেতন রূপাস্বাদন রাজঅন্তঃপুরের এক বিদগ্ধ নায়িকারই উপযুক্ত মানস ধর্ম।

অমরুশতকের একটি বিখ্যাত শ্লোকের ভাবানুবাদে বিদ্যাপতি তাঁর অনুরাগবতী রাধার দেহকামনার তীব্র উল্লাসকে প্রকাশ করেছেন। অমরুশতকের শ্লোকটি হল—

তদ্বক্ত্রাভিমুখং বিনমিতং দৃষ্টিঃ কৃতা পাদয়োঃ
তস্যালাপ কুতূহলাকুলতরে শ্রোত্রে নিরুদ্ধে ময়া।
পানিভ্যাঞ্চ তিরস্কৃতঃ সপুলকঃ স্বেদোদ্গমো গণ্ডয়োঃ
সখ্যঃ কি করবাণি যান্তে শতধা যৎকঞ্চুকে সন্ধয়ঃ।[১৫৯]

অন্যদিকে 'অবনত আনন কএ হাম রহলিহুঁ বারল লোচন চোর' শীর্ষক পদটি[১৬০] শিবসিংহের রাজত্বকালে লেখা। এই ধরনের পদগুলিতে যৌবনধন্য কবির রূপোল্লাস ও রক্তমাংসের কামনার উত্তাপ যেন উদ্দাম হয়ে উঠেছে। এই পদেও রাধার পরিপূর্ণ যৌবনের তীব্র দেহচাঞ্চল্যের বর্ণনা। এই তীব্রতা প্রকাশিত হয়েছে কাঁচুলি ছিঁড়ে যাওয়া ও বলয় ভেঙে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। কিন্তু অমরুর ভাবানুবাদ হলেও এই পদে কবি যে অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন, তাতেই তাঁর সৌন্দর্যসৃষ্টির ক্ষমতা

এবং মৌলিকতার পরিচয়। কৃষ্ণকে দেখে রাধার মুখ নীচু করায় একদিকে আছে রাধার লজ্জা, অন্যদিকে দৃষ্টির তীব্র অনুরাগকে কৃষ্ণের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা। কিন্তু রাধার চোখ চোরের মতই তাঁর অবাধ্যতা করল। চকোর যেমন চন্দ্রকিরণ পান করে, রাধার চোখও তেমনি প্রিয়তমের মুখের সৌন্দর্য পান করার জন্য ধাবমান হল। রাধা চরণে চোখের দৃষ্টিকে স্থির রাখতে চাইলেন। কিন্তু মধুপানোন্মত্ত ভ্রমর যেমন বারবার ডানা নেড়েও উড়ে যেতে পারে না, তেমনি রাধার চোখও বারবার কৃষ্ণের মুখ দেখার চেষ্টা করল। এই অনবদ্য অলঙ্কার ব্যবহারে একদিকে প্রকাশ পেয়েছে অনুরাগের লজ্জা, অন্যদিকে প্রিয়রূপদর্শনের আকুল অস্থিরতা। অবাধ্য ভ্রমর উড়তে পারে না। কেবল শাসন-অসহিষ্ণু পক্ষদুটি (নেত্র পক্ষ্ম) বিধুনিত করে। একদিকে সমাজের বৈধী জীবন সংস্কার, অন্যদিকে স্বভাবের আত্মমনোরম প্রত্যাশা— এই ভাবদুটির দ্বন্দ্ব কবি রাধার চোখে চঞ্চল মধুকরের রূপে এঁকে দিয়েছেন।

কৃষ্ণ মধুর কথা বললেন। রাধা আত্মসংবরণ করার জন্য দুটি কান বন্ধ করলেন। আর সেই অবসরে মদন পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করল। এখানে দেহকেন্দ্রিক প্রেমের অপূর্ব আবেগকে বিদ্যাপতি যে আলংকারিক সুষমায় মণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন, সেই শিল্প সৌন্দর্য অমরুশতকের পদে নেই। শিল্পী হিসেবে এখানেই বিদ্যাপতির মহত্তর উত্তরণ। প্রকাশভঙ্গীর প্রথম ধাপ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর কথাবস্তুকে শোভনসুন্দর করে তোলার শিল্পিত প্রয়াসে সার্থক। তাঁর এই অনুরাগময়ী রাধা সংস্কৃত সাহিত্যের নায়িকার মৈথিল ভাষা নির্মিতা শিল্প-প্রতিমা।

আবার অন্যদিকে বিদ্যাপতির রাধা নিজেকে নাগরী বলে গর্ব করলেও লোক-ঐতিহ্যের গোপিনী রাধাকে কবি একেবারে বাদ দিতে পারেন নি। তাঁর রাধা মথুরায় দধিদুগ্ধ বিক্রয় করতে যাওয়ার সময়ই কৃষ্ণকে প্রথম দেখে প্রেমে পড়ে যান।[১৬১] দধিদুগ্ধ বিক্রয়ের কাজ তখন তাঁর কাছে অনর্থক মনে হয়। কারণ 'মনহু ন মধুরিপু বিসারিঅ', কৃষ্ণকে রাধা কোনমতেই ভুলতে পারছেন না। এর আগে দূতী রাধার কাছে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের প্রস্তাব নিয়ে গেলে তিনি কৃষ্ণকে গোয়ালা বলে নিজের আপাত অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, কিন্তু মুখে বলেন—'করিএ পেম জঔ বিরহ ন হোই।' এতে তাঁর সুস্পষ্ট সম্মতিরও আভাস পাওয়া যায়। রাধা এখানে বাস্তব সংসারের বাস্তববুদ্ধি সম্পন্না নারী। প্রেমের গভীরতার পরিবর্তে তাঁর চূড়ান্ত হিসেবিপনার পরিচয়ই প্রকাশ পেয়েছে। রাধা মাঝে মাঝেই কৃষ্ণকে 'গমার' বলে সম্বোধন করেছেন। যে কৃষ্ণ গোকুলে গরু চরান, গোপবধূদের সঙ্গে যাঁর বিলাস, 'তহি কি বিলসব নাগরি পাএ'।[১৬২] রাধার এই উক্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার কথাই মনে করিয়ে দেয়—'নান্দের ঘরের গরু রাখোআল তা সমে কি মোর নেহা'?[১৬৩] এই ধরনের সাদৃশ্য দেখে আমরা যদি এই সিদ্ধান্তে আসি, বিদ্যাপতি বড়ু কবির দ্বারা অথবা বড়ু কবি বিদ্যাপতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তাহলে কিন্তু ভুল হতে পারে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বোধ হয় অসঙ্গত হবে না, রাখাল কৃষ্ণ ও নাগরী রাধার পূর্বরাগ অনুরাগ প্রভৃতি প্রেমকথা একই লোক-কথার উৎস থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। সেই লোক-উৎসই উভয় ঋণ-গ্রহীতা কবির সাদৃশ্যমূলে বর্তমান।

'নহাই উঠল তীরে রাই কমলমুখী' শীর্ষক পদটিতে[১৬৪] চতুরা রাধা সুকৌশলে

কৃষ্ণকে দেখে নিয়েছেন। রাধা স্নান করে উঠে সামনেই দেখতে পেলেন কৃষ্ণকে। পুরজনদের সঙ্গে রাধা লজ্জায় নতমুখী। কি করে কৃষ্ণকে দেখবেন? রাধা তাঁর গলার মতির মালা ছিঁড়ে ফেললেন। সবাই যখন মুক্তো কুড়োতে ব্যস্ত—তখন রাধা কৃষ্ণকে দেখে নিলেন। রাধার এই চাতুর্যও একজন অভিজাত নাগরিক নায়িকারই। পদটি যদি মৈথিল কবি বিদ্যাপতির নাও হয়, তবু আমরা বলব এই রাধা মৈথিলী রাধারই ভাব প্রতিমা।

কারণ বিদ্যাপতির রাধার কামনা-প্রগাঢ়তার মধ্যেও ঘটে একই চাতুর্যের প্রকাশ। কৃষ্ণকামনায় ব্যাকুলা রাধা বলেন—

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হমারি।
হম নহ সংকর হুঁ বরনারী ॥[১৬৫]

মদন যেন শিব ভেবেই রাধাকে দগ্ধ করছে। কিন্তু রাধার শিরে তো জটা নেই, আছে বেনী; তাতে গঙ্গা নেই, আছে মালতীমালা। কপালে চন্দ্রের বদলে আছে মতির গুচ্ছ আর তৃতীয় নয়নের পরিবর্তে আছে সিন্দুরবিন্দু। বক্ষে সর্পরাজ নেই, আছে মণিহার, আর পরিধানে বাঘছাল নেই, আছে নীল পট্টাম্বর। এই অপহ্নুতি অলঙ্কারটির জন্য অবশ্য বিদ্যাপতি প্রত্যক্ষভাবে জয়দেবের কাছেই ঋণী। জয়দেবের কৃষ্ণ অনুরূপভাবে মদনকে সম্বোধন করে বলেছেন—

হৃদি বিসলতা হারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দল শ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জ রজো নেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি
প্রহর ন হর ভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি ॥[১৬৬]

কিন্তু রাধার প্রেম কেবল চাতুরি সর্বস্বই নয়। 'হাথক দরপণ মাথক ফুল' শীর্ষক পদটিতে[১৬৭] দেখা যায় প্রেমের গভীরতম স্তরে এসে রাধার মনে হয়েছে কৃষ্ণ তাঁর হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, চোখের কাজল আর মুখের তাম্বুল। যে দর্পণে রাধার রূপ প্রতিবিম্বিত হয় কৃষ্ণই যেন সেই দর্পণ, অর্থাৎ আজ কৃষ্ণের চোখ দিয়ে দেখা না হলে রাধার কাছে তাঁর রূপের কোন মূল্য নেই। আবার রূপবর্ধক অঞ্জন ও তাম্বুল, হৃদয়ের মৃগমদ আর গলার হার—অর্থাৎ রাধার প্রসাধনভূষণও কৃষ্ণ। এরপরই রাধা বলছেন কৃষ্ণ তাঁর—'দেহক সরবস গেহক সার'। দেহকে অস্বীকার করে নয়, দেহকে অঙ্গীকার করে নিয়ে রাধা এখানে নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে কৃষ্ণকে জড়িয়ে নিয়েছেন; রাধার অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছেন কৃষ্ণ। তাই পদটির পরবর্তী অংশে রাধা বলেন—

পাখিক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি ॥

প্রেম সম্পর্কে এই অনুভব অনুরাগবতী রাধার শুধু নয়; এ অনুভব চিরকালের মানব-মানবীর। এ প্রেম বিলাসকলা নয়, অস্তিত্বকে প্রসারিত করার এবং অর্থবহ করে তোলার যাদুকাঠি। পাখী যেমন পাখা ছাড়া অনন্ত আকাশের নীলিমায় নিজেকে প্রসারিত করতে পারে না, মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচতেই পারে না, ঠিক তেমনিভাবে কৃষ্ণকে ছাড়াও রাধার অস্তিত্ব সংকুচিত, সীমাবদ্ধ, অর্থহীন হয়ে

যায়। তাই কৃষ্ণের প্রেম রাধার কাছে প্রাণীর প্রাণের মত। প্রাণহীন দেহ যেমন বেঁচে থাকার সজীব আনন্দকে উপলব্ধি করতে পারে না, বরং নিজেই বিকৃত ধ্বংস হয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে কৃষ্ণকে ছাড়া রাধাও নিজেকে নিরর্থক মনে করেন। পদটিতে রাধাপ্রেমের গভীর থেকে গভীরতম স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার ক্রমিক বর্ণনাকে কবি শুধু কতকগুলি উপমার সাহায্যেই ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথমে বাইরের প্রসাধনভূষণ, তারপর প্রাণীর প্রয়োজন, অবশেষে প্রাণীর জীবন—এইভাবে রাধার কৃষ্ণপ্রেম বাইরের জগৎ থেকে অস্তিত্বের অনিবার্যতায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এইভাবে রাধা তাঁর অনুরাগকে নব নব অভিধায় ভূষিত করেও শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভালবাসাকে প্রকাশে অতৃপ্ত হয়ে ব্যাকুল আকুতিতে বলেন 'তুহু কইসে মাধব কহ তুহু মোয়'। ভক্ত বৈষ্ণব বলবেন এখানে অসীম রহস্যময় ঈশ্বরকে জানার জন্য ভক্তের যে সাধনা, যে আকুতি, যে জিজ্ঞাসা, সেই জিজ্ঞাসাই রাধার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু আমরা যারা কৃষ্ণকথার কথা-রস প্রার্থী তারা বলব, এখানে নরনারীর প্রেমের চরম রোমান্টিক অতৃপ্তি ও অস্থিরতা শিল্পরূপ পেয়েছে। বিদ্যাপতি তাই শেষে রাধাকে সম্বোধন করে বলেছেন —তাঁরা দুজনেই দুজনের কাছে অনুপম।

অনুরূপভাবে কৃষ্ণের অনুরাগের তীব্রতাও কবি বর্ণনা করেছেন। একটি পদে দেখা যায় দূতী রাধার কাছে বলছে, হরি বহু নারীর মধ্যে কেবলমাত্র রাধাকেই আকাঙ্ক্ষা করেন। স্বপ্নে রাধার নাম নিয়ে বারবার উঠে পড়েন এবং আলিঙ্গন দান করেন।[১৬৮] আর একটি পদে দূতী রাধার কাছে এসে রাধাপ্রেমোন্মত্ত কৃষ্ণের বর্ণনা দেয়—

> কারণ বিনু খেনে হাস।
> কি কহএ গদ গদ ভাস ।।
> আকুল অতি উতরোল।
> হা ধিক হা ধিক বোল ।।
> কাঁপএ দুরবল দেহ।
> ধরই না পারই কেহ ।।[১৬৯]

এই বর্ণনা একেবারে ভাবোন্মত্ত মহাপ্রভুর ছবিই আমাদের সামনে মেলে ধরে। অথচ বিদ্যাপতির এই পদটির ভণিতায় রূপনারায়ণ অর্থাৎ রাজা শিবসিংহেরই উলেখ আছে। অর্থাৎ এটিও কবির প্রগাঢ় যৌবনেরই রচনা। কিন্তু এখানে কৃষ্ণের প্রেমের যে গভীরতম স্তরটিকে কবি রূপ দিয়েছেন, তা স্থূল দেহক্ষুধাকে অতিক্রম করেছে। পরিপূর্ণ যৌবনোন্মাদনার দিনেও কবির মধ্যে দেহকামনা অতিক্রমী প্রেমিক সত্তার উপস্থিতি যে ছিল—এই পদটি তারই প্রমাণ। এই পদটির সাহায্যে আমরা এও বুঝতে পারি, প্রার্থনা পদের পরম ভক্তিমান বিদ্যাপতির পরিবর্তন পরিণত বার্ধক্যের আকস্মিক পরিবর্তন নয়। এ তাঁর সত্তার অন্তর্লীন আর এক পরিচয়।

আক্ষেপানুরাগের অল্প কিছু পদে রাধার অনুরাগের গভীরতা ও কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে না পারার যন্ত্রণা প্রকাশিত হয়েছে। বাঁশীর শব্দ যেন বিষের মত রাধার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। যখনই কানে বাঁশীর শব্দ যাচ্ছে, তখনই রাধার 'বিপুল পুলকে পরিপূরএ দেহ।'[১৭০] কিন্তু গুরুজনের সামনে তাকে প্রকাশ করারও উপায়

নেই। তাই রাধা 'জতনহি বসন ঝাঁপি সব অঙ্গ'। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষ্ণের বংশীধ্বনির প্রভাবে রাধার শরীর অবশ হয়ে যায়, নীবিবন্ধ শিথিল হয়ে পড়ে। পদটিকে ড. বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর পাঁচশত বৎসরের পদাবলীতে আক্ষেপানুরাগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু এটি আক্ষেপানুরাগের পদ ঠিক নয়। কারণ বাঁশীর নিন্দা এখানে নেই বললেই চলে, তার বদলে বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার প্রতিক্রিয়াই পদটির প্রধান অংশ অধিকার করে আছে। শার্ঙ্গধর পদ্ধতির একটি শ্লোকের সঙ্গে এর সাদৃশ্য দেখা যায়। শ্লোকটি হল—

গোপয়ন্তী বিরহজনিতং দুঃখমগ্রে গুরূণাং
কিংত্বং মুগ্ধে নয়নবিসৃতং বাষ্পপূরং রুণৎসি ॥[১৭১]

আবার কখনও প্রেমের অপরিমেয় উম্মাদনায় কৃষ্ণরূপমাধুরী সীমাহীন বিস্তার লাভ করেছে প্রেমিকা রাধার কাছে। তাই রাধা কৃষ্ণরূপ নিরীক্ষণ করার জন্য এবং কৃষ্ণের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য সুরপতির কাছে সহস্রলোচন ও গরুড়ের কাছে দ্রুতগামী পক্ষ প্রার্থনা করেন।[১৭২] এটিকেও রাধার আক্ষেপানুরাগের পদ না বলে রূপানুরাগের পদই বলা ভালো।

পারস্পরিক অনুরাগের পরই মিলনের জন্য প্রয়োজন হয় অভিসারের। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণলীলাকথায় অভিসার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই পর্যায়ের পদেও কবি হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধির সংযোগ ঘটিয়েছেন। অভিসারিকা রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন হয় যমুনার অপর পারে সংকেত কুঞ্জে। এপারে মিলিত হওয়ার কোন উপায় নেই, 'পুরল পুর পুরজন পিসুনে।'[১৭৩] নগরীতে মানুষের এবং ছিদ্রান্বেষী মানুষের অভাব নেই। রাধা নানা ইঙ্গিতে কৃষ্ণকে অভিসারের সময় জানিয়ে দেন। নায়িকার এই চাতুর্য কৃষ্ণের প্রেমকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সখীর উক্তিতে তারই ইঙ্গিত—

বড় কৌসলি তুঅ রাধে
কিনল কাহাই লোচন আধে।[১৭৪]

অভিসারের পদে বিদ্যাপতি কখনও কখনও সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্বিচার দাসত্ব করেছেন। অভিসারিকার দুর্জয় প্রেম, তীব্র উৎকণ্ঠা ও প্রবল সাহসিকতার পরিবর্তে কতগুলি বাঁধাধরা উপমার সাহায্যে অভিসারিকা রাধার দেহ বর্ণনাতেই কবি অধিকতর মনোযোগী থেকেছেন। উদাহরণ হিসেবে 'করিবর রাজহংস জিনি গামিনি'[১৭৫] পদটির কথা উল্লেখ করা যায়। পদটিতে কবি কতকগুলি গতানুগতিক উপমার সাহায্যে রাধাদেহের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন মাত্র। অভিসারিকার মানসিক অবস্থার বর্ণনা বিন্দুমাত্র নেই। তাই অভিসারের পদ হিসেবে এ জাতীয় পদ সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

কিন্তু সর্বত্র নয়। প্রেমের দুর্বার আবেগে বিদ্যাপতির রাধা শেষ পর্যন্ত অসমসাহসিকা। এই অবস্থায় এসে পৌঁছোতে অবশ্য রাধাকে অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে রাধা অভিসারে অনিচ্ছুক, ভীতা বালিকা মাত্র—দূতীর উক্তি থেকে একথা জানা যায়। বালিকা রাধা অনভিজ্ঞা, তাই কৃষ্ণসান্নিধ্যে আসার জন্য সে দুর্গম কণ্টকময় পথ অতিক্রম করতে উৎসাহী নয়। এই রাধা নিতান্তই বালিকা। 'চল চল সুন্দরি হরি অভিসার' শীর্ষক পদটিতে[১৭৬] রাধাকে সখী বা দূতীই হরি

অভিসারে যেতে নির্দেশ দিয়েছে। পূর্ণিমা রাত্রির পটভূমিতে রাধাকে কি ধরনের বেশভূষা করতে হবে তাও সখীই বলে দিয়েছে—

জৈসন রজনি উজোরল চন্দ।
ঐসন বেস ভূসন করু বন্ধ ॥

সখী বলে "তুমি রসিকা নাগরী আর নাগরও রসিক—সুতরাং শীঘ্র কুঞ্জে চল। সেখানে কৃষ্ণ একা তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছে।" এখানেও রাধার নিজস্ব ইচ্ছার কোন প্রকাশ নেই। বরং দূতীই নানাভাবে রাধাকে অভিসারের জন্য প্ররোচিত করেছে। দূতীর এই প্ররোচনা আরও কয়েকটি অভিসারের পদে আছে। অভিসারে উৎসাহিত করার জন্য দূতী রাধাকে বলেছে—'চোরী পেম সংসারেরি সার।'[১৭৭] আবার পথের বাধা সম্পর্কেও ঐ একই পদে বলেছে—'কিছু ন গুনব পথক সংকা। একদিকে সখী রাধাকে লোভ দেখাচ্ছে। আবার অন্যদিকে অভয়ও দিচ্ছে। পূর্ববর্তী কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দেও সখীই রাধাকে অভিসারে প্ররোচিত করে বলেছে—'চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীল নিচোলম।'[১৭৮]

পরবর্তী স্তরে অভিসারে গিয়ে রাধা যদি সংকেত কুঞ্জে কৃষ্ণের দেখা না পেয়ে ফিরে আসেন, তাহলে সখী কৃষ্ণকে কঠোর ভৎর্সনা করে।[১৭৯] অন্যত্রও সখী কৃষ্ণকে বলেছে, মেঘগর্জন মুখরিত রাত্রে বাড়িতে শাশুড়ি থাকা সত্ত্বেও রাধা অভিসারে বেরিয়েছিল, কিন্তু শূন্য সংকেতকুঞ্জ থেকে ফিরে এসেছে। হরি যদি নাই আসবে—তাহলে মালতী-মালা দিয়ে সংকেত করেছিল কেন?[১৮০] এইভাবে দেখা যায় বিদ্যাপতির পদে অন্যান্য পর্যায়ের মত অভিসার পর্যায়েও দূতী বা সখীর সক্রিয় সহযোগিতা বর্তমান।

অভিসারিকা নায়িকার প্রতি সখীর এই সহায়তার বর্ণনা পূর্ববর্তী সাহিত্যেও আছে। বিদ্যাপতির একটি পদে পূর্ণিমা রাত্রিতে রাধাকে অভিসারে প্রবর্তিত করার জন্য সখী তাঁর কাছে এসে বলেছে—

আজ পূর্ণিমা তিথি জানি মোয়ে ঐলিহু
উচিত তোহর অভিসার।
দেহ-জ্যোতি সসি কিরণ সমাইতি
কো বিভিনাব এ পার ॥[১৮১]

গাথা সপ্তশতীতেও অনুরূপভাবে সখী অথবা দূতী নায়িকাকে সম্বোধন করে বলেছে—

গম্মিহিসি তস্স পাসং সুন্দরি মা তুরঅ বড্‌ঢউ মিঅঙ্কো
দুদ্ধো দুদ্ধং মিঅ চন্দিআই কে পেচ্ছই মুহং দে ॥[১৮২]

হে সুন্দরি, তার পাশে যেতে পারবে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ির প্রয়োজন নেই। চন্দ্র আরও বর্ধিত হোক। দুগ্ধের মত চন্দ্রিকাতে তোমার মুখ দেখতে কে সমর্থ হবে?

অভিসারের পদে বিদ্যাপতি জয়দেবসহ অন্যান্য পূর্বসূরীদের ঋণ গ্রহণ করেও স্বকীয়তার পরিচয় দিতে পেরেছেন। জয়দেবের কাব্যে অভিসারের বর্ণনা আছে, কিন্তু অভিসার-পথের প্রতিকুলতা নেই। অভিসারের প্রাণাবেগ অতিললিত শব্দ ঝংকারে সেখানে বিলুপ্ত। কিন্তু অভিসারের ভেতর দিয়ে যে দৃঢ়সংকল্প,

অকল্পনীয় দুঃসাহস এবং অদম্য মনোবলের প্রকাশ ঘটে, তাকে ললিত শব্দবিন্যাসের কোমল লাবণ্যে প্রকাশ করা যায় না। তাই জয়দেব যেখানে ব্যর্থ, সেখানে বিদ্যাপতির সিদ্ধি। তাঁর পরবর্তী গোবিন্দদাসের পদে এই সিদ্ধির আরও উজ্জ্বল বিস্তার।

বিদ্যাপতির অভিসার পর্যায়ের পদকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়। আমাদের আলোচনায় তার ইঙ্গিতও আছে। কিছু পদে অভিসারের পূর্ববর্তী অবস্থার বর্ণনা, কিছু পদে আছে রাধিকার তীব্র আত্মদ্বন্দ্ব। শেষ পর্যন্ত এই দ্বন্দ্ব দূরীকরণে সখী বা দূতীই সহায়তা করেছে। আর এক শ্রেণীর পদে আছে কেবল অভিসারিকার আলংকারিক বর্ণনা। কিছু পদে আছে দুর্গম পথের ভয়ংকর সুন্দর চিত্র। অন্য ধরনের কিছু পদে অভিসারের পরবর্তীকালে রাধার পরিজনদের সংশয় এবং সংকেতকুঞ্জে গিয়ে ব্যর্থ অভিসারিকার অভিমানক্ষুব্ধ বেদনা বর্ণিত।

রাধা যখন সখীর নানা উৎসাহবাক্যের পর অভিসারের পথে বেরিয়েছেন, তখন সেই নব অনুরাগিনী রাধার বিঘ্নতুচ্ছকারী অভিসারের গতিকে কবি উপযুক্ত শব্দ ও ছন্দ ব্যবহারে জীবন্ত করে তুলেছেন। মনে রাখতে হবে এই নব অনুরাগ চৈতন্য পূর্ববর্তী রাধার। তাঁর এই অনুরাগে কাম ও প্রেম এক সঙ্গেই মিলেমিশে আছে। কিন্তু কামনার তীব্রতাও যে দুর্জয় সংকল্পকে সহস্র বাধা অতিক্রম করে সিদ্ধির পথে নিয়ে যেতে পারে—এই পদটিই তার প্রমাণ। রাধা একাই পথে বেরিয়েছেন। নারীর একান্ত প্রিয় অলংকারও আজ রাধার কাছে অনাবশ্যক বর্জনীয় ভার। তাই রাধা গলার হার, হাতের কঙ্কণ আর অঙ্গুরীয়—সবই পথে ত্যাগ করলেন, এমনকি চরণের মনিময় মঞ্জীরও ত্যাগ করে দূরে ফেললেন। রাত্রি ঘন অন্ধকার, কিন্তু কামনার আলোক-প্রভায় রাধার হৃদয় তো উজ্জ্বল। পথে বিঘ্ন বিস্তীর্ণ, কিন্তু সেই বাধাবিঘ্ন প্রেমরূপ অস্ত্রেই কেটে গেল। এই অনুরাগবতী অভিসারিকার সমতুল্য নায়িকা বিদ্যাপতি আর দেখেন নি।[১৮৩] এই রাধা রক্তমাংসেরই অশঙ্কিনী নায়িকা। কিন্তু পরবর্তীকালের বিঘ্নবিজয়িনী রাধা অধ্যাত্মপথযাত্রিনী, ঈশ্বরসঙ্গাভিলাষিনী। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রাধার এই অভিসারের সঙ্গে সেণ্ট জন অফ দি ক্রশ-এর খ্রীস্টীয় অভিসারের তুলনা করেছেন—

> Upon an obscure night,
> Fevered with love's anxiety
> (O hapless, happy plight !)
> I went, none seeing me,
> By night secure from slight,
>
> * * *
>
> Without a light to guide,
> Save that which in my heart burnt in my side.
> That light did lead me on
> More surely than the shining of noontide.
> Where well I knew, that one
> Did for my coming bide.[১৮৪]

খ্রীস্টান মিস্টিকের এই অভিসার-গীতি থেকেও বোঝা যায়, লৌকিক প্রেমই শেষ পর্যন্ত লৌকিকতার সীমা ছাড়িয়ে বৈকুণ্ঠের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পেঁছোয়।

অভিসারের আগে রাধার অভিসার-প্রস্তুতির চিত্রও বিদ্যাপতির পদে পাওয়া যায়—

মৃগমদ তিলক-অগর অনুলেপিত
সামর বসন সমারি।
হেরহ পছিম দিস কখন হোয়ত নিস
গুরুজন নয়ন নিহারি।।
বিনু কারণ গৃহ করহ গতাগত
মুনি নয়ন অরবিন্দা।[১৮৫]

গাথাসপ্তশতীতেও আমরা এই ধরনের একটি পদ পাই—

অজ্জ মএ গন্তব্বং ঘণন্ধআরে বি তস্স সুহঅস্স।
অজ্জা নিমীলিঅচ্ছী পঅ পরিবাড়িং ঘরে কুণই।।[১৮৬]

অভিসার প্রস্তুতির পর রাধা সখীকে সম্বোধন করে বলেছেন—

সখি হে আজ জায়ব মোহী।
ঘর গুরুজন ডর ন মানব/বচন চুকব নহী।।[১৮৭]

এই দৃঢ় সংকল্প একদিকে রাধাকে যেমন সমাজ সংসারের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করার সাহস যুগিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বাইরের পৃথিবীর দুর্যোগ ও দুর্গম পথের বিভীষিকাকেও অতিক্রম করার প্রাণশক্তি দান করেছে। কাজলের মত নিবিড় নিকষ অন্ধকার উদ্গীরণকারী রাত্রি, বিষধর সর্প ও বজ্রের গর্জন কিছুই রাধাকে দমিয়ে রাখতে পারে নি।

আসলে বর্ষণমুখরিত মেঘমন্দ্রিত অন্ধকার রাত্রিতে প্রকৃতির তীব্র প্রতিকূলতার পটভূমি অভিসারিকার অভিসারের যেমন উপযুক্ত সুযোগ, তেমনি তার সর্ববিঘ্নজয়ী প্রেম এবং সুদৃঢ় সংকল্পকে প্রকাশ করারও সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। 'আএল পাউস নিবিড় অন্ধার' পদটিতে[১৮৮] ঘন অন্ধকার, মেঘস্তনিত বর্ষণমুখর বিদ্যুৎদীপ্তি-শিহরিত রাত্রিতে উৎকণ্ঠিতা নায়িকার চিন্তার শেষ নেই। কারণ যে রাত্রিতে পথিক পথ চলতে সাহস পায় না, সেই রাত্রে তাঁর প্রিয়তম কেমন করে আসবেন ? অভিসারিকারও ভীতির অন্ত নেই, গুরুজনের ঘর থেকে নিজের শয়ন কক্ষে যাওয়ার সাহসও তিনি অর্জন করতে পারছেন না। এই পদটিতে রাধাকৃষ্ণের নামোল্লেখ নেই, তবু রাধাকৃষ্ণের প্রেমের সঙ্গে একে মিলিয়ে নেওয়া যায়। বিদ্যাপতির পদে এইভাবে লৌকিক নায়ক-নায়িকার ও রাধাকৃষ্ণের প্রেম মাঝে মাঝেই একাকার হয়ে গেছে। বর্ষাঋতু প্রেমিক-প্রেমিকার মনে প্রিয় বিরহবেদনাকে উত্তাল করে তোলে। কালিদাসের মেঘদূতে সেই অমর বিরহগাথা। আর বর্ষাঋতুর প্রতিকূল প্রকৃতি বিরহিণী অভিসারিকাকে সমাজের সহস্র সতর্ক চক্ষু এড়িয়ে প্রিয় মিলনের সুযোগ করে দেয়। এই দুঃখদায়িনী

প্রকৃতি তাই অভিসারিকার প্রেমসহায়িকা বন্ধু। সেই কারণেই বিদ্যাপতির একটি পদে অভিসারিকা বলেছে—

সাওন সয়ঁ হম করব পিরীত।
যত অভিমত অভিসারক রীত॥
* * *
কোটি রতন জলধর তোহেঁ লেহ
আজুক রয়নি ঘন তম কএ দেহ।[১৮৯]

নায়িকা শ্রাবণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান, আর মেঘকে কোটি রত্নের প্রলোভন দেখান। যেন সে শ্রাবণ রজনীর নিবিড় তমিস্রাকে নিবিড়তর করে তোলে। এখানে মেঘদূতের বিরহোন্মাদ যক্ষের মতই রাধাও প্রেমোন্মাদিনী। যক্ষ মেঘকে সজীব ভেবে তাকে দিয়েই প্রিয়ার কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিল, আর রাধা মেঘকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে বশীভূত করতে চেয়েছেন। কি লৌকিক প্রেমে, কি রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত প্রেমে, সর্বত্রই অভিসার পর্যায়ের সবচেয়ে রসোত্তীর্ণ পদগুলি হল বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রির। নায়িকার ঐকান্তিকতার ও মানসিক শক্তি পরীক্ষার সবচেয়ে বড় সুযোগ এইখানে। সামনের দুস্তর কঠিন বাধা যেমন সমুদ্রগামিনী নদীতে প্রবল গতির সঞ্চার করে, ঠিক তেমনি ভাবে বাধা বিঘ্ন যত প্রবল হয়, পথ যত দুর্গম হয়—ততই তাকে অগ্রাহ্য করে অতিক্রম করে প্রেমের বিপুল শক্তি প্রতিষ্ঠার আগ্রহও প্রেমিকার মনে জেগে ওঠে। প্রেম যে কি অসাধ্যসাধন করতে পারে, কামনার ঐকান্তিকতা যে কি বিপুল শক্তির উদ্বোধন ঘটাতে পারে, কি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে—বিদ্যাপতির এই পদগুলি তার প্রমাণ।

'মাধব করিহ সুমুখি সমাধানে' পদটিতে সখী কৃষ্ণের কাছে রাধার অভিসারের বর্ণনা করেছে।[১৯০] এখানেও পটভূমি সেই বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রি। নিজের স্বামীকে ছেড়ে, বিষম নদী সাঁতরে ও কুলের কলঙ্ক অঙ্গীকার করে রাধা অভিসারে এসেছে। অবশেষে কবির নিজস্ব মন্তব্য "কামপেম দুহু একমত ভএ রহু কখনে কী ন করাবে।" কামনা রাধাকে প্রতিকূল প্রকৃতির শক্তি অগ্রাহ্য করার প্রেরণা যুগিয়েছে আর প্রেম দিয়েছে সামাজিক বিধিনিষেধকে অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস। বিদ্যাপতির রাধা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মহাভাবময়ী নন, কিন্তু তাঁর এই প্রেমের শক্তি বিপুল অসাধ্যসাধন পটিয়সী। এখানে তাঁর প্রেমদ্যুতি মৃৎপ্রদীপসম্ভব হয়েও অমর্ত্যবিভা বিকীর্ণ করেছে।

বিদ্যাপতির পদে রাধার জ্যোৎস্নাভিসার এবং দিবাভিসার দুই-ই আছে। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ব্যাকুল আগ্রহে কখনও কখনও রাধা মেঘাচ্ছন্ন দিনকে রাত্রি ভেবে অভিসারে বেরিয়ে পড়েন। বসন্তরাত্রিতে রাধার অভিসারের প্রসঙ্গও আছে। চৈত্র মাসের স্বল্পকাল স্থায়ী রাত্রিতে অভিসারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাধার পথে বেরোতে না পারার সংকট পদটিতে বর্ণিত হয়েছে।[১৯১] চাঁদ উঠে পড়ার আশঙ্কায় রাধা আকাশে দৃষ্টিপাত করেন; ঘরে গুরুজনেরা জেগে আছে, তাই পদে পদে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। "অবহু রাজপথ পুরুজন লাগি' পদটিতে দেখা যায় রাধা পুরুষের ছদ্মবেশে

অভিসারে বেরিয়েছেন।[১৯২] বিদ্যাপতির কৃষ্ণকথায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ। পরবর্তীকালে সুবলের ছদ্মবেশে কৃষ্ণের কাছে রাধার যাত্রার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে যদুনন্দনের পদে। এখানে রাধা বক্ষদেশ আবৃত করার জন্য 'বাজনযন্ত্র হৃদয় করি লেল' আর সেখানে সুবল বেশী রাধা বাছুর কোলে তুলে নিয়েছেন।

মাঝে মাঝে রাধার অভিসার ব্যর্থও হয়। বর্ষা রজনীতে সর্পদংশন সহ্য করেও কুঞ্জে উপনীত হয়ে রাধা দেখতে পান—তখনও কৃষ্ণ এসে পৌঁছান নি। রাত্রির চতুর্থ প্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কৃষ্ণের দেখা না পেয়ে অবশেষে অভিমানিনী রাধা গৃহে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রত্যাখ্যানের অপমানে ব্যথিতা রাধার মনে হয় "মোরিও সব সহচরি জানতি হোইতি ই বড়ি সাটি"।[১৯৩] নারীমনস্তত্ত্বের এই সুনিপুণ ও স্বাভাবিক চিত্রণ শুধু রাধার নয়—আমাদের সামনে যে কোনও প্রত্যাখ্যাতা নারীর বেদনাকেই তুলে ধরে। রাধাকৃষ্ণের মিলনের ব্যাপারে দূতী প্রত্যক্ষ সহায়িকা হলেও আসলে দূতীর ভুলের জন্যই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে যায়। দূতী ভুল করে রাধা এবং কৃষ্ণ—উভয়কেই মিলনের ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দেশ করার জন্যই কেউ কারও সঙ্গে মিলতে পারেন না।[১৯৪] এইভাবেই ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা নাটকীয় তাৎপর্য লাভ করতে থাকে।

কখনও কাজলের মত নিবিড় নিকষ অন্ধকার উদ্গীরণকারী রাত্রি, বিষধর সর্প ও বজ্রের গর্জনের মাঝখানেই রাধা পথে বেরিয়ে পড়েন।[১৯৫] যে রাধা গৃহভিত্তিতে সাপের ছবি দেখলে ভয় পান, পথে সেই রাধার পায়ের নূপুরকে সর্প বেষ্টন করলে রাধা এই ভেবে আনন্দিত হয়েছেন যে নূপুরের শব্দ আর শোনা যাবে না। রাধার এই ভয়হীনতা দেখে কবি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন—

সুমুখি পুছওঁ তোহি সরূপ কহসি মোহি
সিনেহক কত দূর ওর ॥[১৯৬]

এইভাবে দুর্গম পথাতিক্রমণের পর রাধা কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে নিজের কষ্টের কথা বর্ণনা করেছেন।[১৯৭] মেঘ ঘন ঘন গর্জন করছে। বৃষ্টিও হচ্ছে, দশদিকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পথ বিপথও কেউ চিনতে পারছে না। রাধা বলছেন যে আজ তিনি মাধবের কাছে বড় কষ্টে এসেছেন। সুখের জন্য এসেও পাপ মন্মথের চক্রান্তে তাঁকে বড় দুঃখ পেতে হল। কণ্টকিত পঙ্কময় পথ রাধা বড় দুঃখে অতিক্রম করলেন। মাথার ওপর মেঘ বারিবর্ষণ করছে। যত দুঃখ রাধা পেলেন, তা কার কাছে বলবেন? লাভের লোভে দুস্তর পথ রাধা অতিক্রম করলেন। বহু ভাগ্যে তাঁর প্রাণ বাঁচল। এখন কৃষ্ণের মুখ দেখে রাধা সব দুঃখ ভুলে গেলেন। পরবর্তীকালে গোবিন্দ দাস এই পদটিরই প্রেরণায় তাঁর বিখ্যাত "মাধব কি কহব দৈব বিপাক" পদটি রচনা করেন বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু গোবিন্দদাসের পদে আছে সাধিকার আত্মবিস্মৃতি। আর পূর্বসূরী বিদ্যাপতির রাধা নিজের কৃচ্ছ্রসাধন সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তবুও তিনি প্রেমিকা। তাঁর কৃষ্ণসান্নিধ্যধন্য বিহ্বল প্রেমের মুগ্ধমাদির ঘোষণা পদের শেষ পংক্তিতে—'হেরইতে ওমুখ বিসরল সব দুখ এ নেহ কাহু জানি লাগি।' কিন্তু রসগ্রাহী সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে এই "রাধা আত্মসচেতন, সতর্ক ও লাভালাভ বিষয়ে বাস্তববোধ সম্পন্ন।"[১৯৮]

অভিসারিকা রাধা বিপর্যস্তভূষণ ও ভোগলাঞ্ছিত শরীর নিয়ে গৃহে উপস্থিত হলে সন্দিগ্ধা ননদিনীর সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে।[১৯৯] রাধার মলিন দেহ, ভগ্ন বলয় ও ছিন্ন হার দেখে ননদিনী সরাসরি প্রশ্ন করে—"কোন পুরুষ সয়ঁ নয়লি নেহা"। প্রত্যুৎপন্নমতি রাধা নিজের দোষ তো স্বীকার করেনই না—উপরন্তু উল্টে এই বলে অভিযোগ করেন—ননদিনী মিথ্যে কথায় শাশুড়ীর ক্রোধ উৎপাদনের চেষ্টা করছে। কারণ মৃণাল থেকে পদ্ম তোলার সময় পদ্মের ভেতরকার ভ্রমর এসে রাধাকে দংশন করেছে, সরোবর থেকে ফেরার সময় কণ্টকতরুর শাখায় স্তন বিক্ষত হয়েছে, জলের কলসী মাথায় স্থির থাকে না বলেই মাথার কেশ আলুথালু।[২০০] দেখা যাচ্ছে বিদ্যাপতির রাধা পদ্মসরোবরে স্নান করতেন আর কাঁখে করে নয়, মাথায় করে জলের কলস নিয়ে ঘরে ফিরতেন।

কবি কৃষ্ণের অভিসারের দু একটি পদও রচনা করেছেন। কিন্তু সেই একটি দুটি পদেও রাধাপ্রেমিক কৃষ্ণের আবেগ ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে "রাইকো নবিন প্রেম সুনি দূতি মুখে"[২০১] পদটির উল্লেখ করা যায়। দূতীর কাছে কৃষ্ণ শুনলেন রাধার নবীন প্রেম জাগ্রত হয়েছে। এ সংবাদে কৃষ্ণের "আনন্দে হরল গেআন"। কৃষ্ণ দূতীকে বললেন—

সজনি বিহি কি পুরায়ব সাধা।
কত কত জনমক পুন ফলে মিলব
সে হেন গুণবতী রাধা॥
এরপর—এত কহি মাধব তুড়িত গমন করু
পথ বিপথ নাহি মান।

অবশেষে যেখানে সখীদের সঙ্গে রাধা আছেন সেই কুঞ্জে দুজনের দেখা হল। স্বভাবতই পুরুষের অভিসারে প্রেমমুগ্ধতা ছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ পুরুষের জন্য সমাজের রক্তচক্ষু বিধি-নিষেধ উদ্যত হয়ে নেই, নেই অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে মুক্তির বাধা। অবরুদ্ধা রাধার অভিসার তাই সমাজ শাসনের সীমাবদ্ধতার বাইরে প্রেমের আকাশে নারীর বাঞ্ছিত মুক্তির পক্ষ প্রসার। আর কৃষ্ণের এই অভিসার প্রেমিকাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল আকুতি মাত্র। তাই অভিসার পর্যায়ের চমৎকারিত্ব রাধারই অভিসারের পদে, কৃষ্ণের নয়।

বিদ্যাপতির পদাবলীতে নৌকাখণ্ডের নিতান্ত অল্প কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। যমুনার তীরে রাধা তাঁর সখীদের সঙ্গে নদীর ওপারে যাওয়ার জন্য এসে দাঁড়িয়েছেন। একে একে সব সখীরা যমুনা পার হয়ে গেল। কিন্তু রাধাকে পার করার সময় কৃষ্ণ নৌকায় চাপিয়েও পারে না নিয়ে যাওয়ায় বিচলিত রাধা অগত্যা কৃষ্ণের গুণ ও স্বভাবের প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁকে অনুরোধ করলেন যাতে সে হঠকারিতা না করে। কৃষ্ণ পরপুরুষ এবং রাধা পরনারী, এটিও রাধা কৃষ্ণকে আর একবার মনে করিয়ে দেন।[২০২] শিবসিংহের ভণিতাযুক্ত আর একটি পদে নৌকার মধ্যে কৃষ্ণ রাধাকে উপভোগ করতে উদ্যত হলেন। তিনি রাধার গলার হারের দিকে হাত বাড়ালে বাধা দিয়ে রাধা উচিত মত খেয়ার পারানি কড়ি নেওয়ার জন্য কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। এবার আর পর-পুরুষ, পরনারী বলে নয়, রাধা অন্যভাবে কৃষ্ণের মন ভেজাতে চেষ্টা করলেন। তিনি

কৃষ্ণকে নিজেদের কুলমর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।[২০৩] এতেও যখন কিছু হল না, তখন কৃষ্ণের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার আর কোন উপায় না দেখে রাধা অত্যন্ত ভীত হলেন। কারণ ইতিমধ্যেই সখীরা পার হয়ে কোন্ পথে চলে গেছে—তা রাধা জানেন না। অগত্যা তিনি কানাইকেই বললেন হাতে ধরে ঘাটে পেঁছে দিতে। বিনিময়ে রাধা তাঁর অপূর্ব হারটিই কানাইকে দিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু কৃষ্ণের ভাবভঙ্গি দেখে সন্দেহ হওয়ায় রাধা বললেন—'হম ন জাএব তুঅ পাশে।' এবং রাধা চলে যেতে চাইলেন আঘাটা দিয়ে। পদটিতে এক রূপলিপ্সু যুবক ও আশংকাগ্রস্ত যুবতীর ছবি চমৎকার ফুটেছে। ভণিতায় বিদ্যাপতি জোর করে রাধাকে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে সজাগ করে দিতে চেয়েছেন।[২০৪] কিন্তু রাধা এবং পাঠক কেউই কৃষ্ণের ঐশী মহিমা এই পদ থেকে উপলব্ধি করতে পারবেন বলে মনে হয় না। সুস্পষ্টভাবেই এই পদটি আমাদের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দেয়। কবি বিদ্যাপতি এবং বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা যে একই উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছে এটি তার আর একটি প্রমাণ। কিন্তু বিদ্যাপতি মিথিলার রাজসভার নাগরিক রসরুচি চরিতার্থ করতে চেয়েছেন, তাই তাঁর পদে নৌকালীলার গ্রাম্য স্থূলতা নেই; মাত্র দু' একটি পদের বর্ণনা আছে। অন্যদিকে বড়ু চণ্ডীদাসের সামনে শ্রোতারা ছিল পল্লীবাংলার অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষ। তাই তাঁর কাব্যে দানখণ্ড আর নৌকাখণ্ডের স্থূলতা বিস্তীর্ণ পরিসর জুড়ে রয়েছে।

অবশেষে কৃষ্ণ কর্তৃক নৌকায় উপভুক্তা রাধা পরপারে পা দিলেন এবং সখীদের সঙ্গেও মিলিত হলেন। কিন্তু বিলুপ্ত প্রসাধনা, ভোগচিহ্নলাঞ্ছিতা, ছিন্ন হার ও ভগ্ন-বলয়া রাধাকে দেখে সখীরা কানাকানি করতে আরম্ভ করলে রাধা কাতরভাবে বললেন—'এ সখি এ সখি ন বলো মন্দ।' রাধা সখীদের বোঝাতে লাগলেন যে বালক কানাই নৌকা সামলাতে পারে নি—তাই জলে সাঁতার দিয়েই রাধাকে যমুনা পার হতে হয়েছে; সেইজন্যই মুখের অলকাতিলকা মুছে গেছে, নদীতীরে পথ না পাওয়ার জন্য কুচযুগে কাঁটার আঘাত লেগেছে আর জলের মাঝখানে কুণ্ডল খসে পড়ায় সেই কুণ্ডল খুঁজতে গিয়েই সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাধার এই বচন কৌশলে রাধাই জয়ী হলেন অর্থাৎ রাধার কথাই সখীদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হল।[২০৫]

বিদ্যাপতির পদাবলীতে নৌকালীলার পদ এই চারটিই পাওয়া যায়। চারটিই রাধার একতরফা উক্তি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নৌকাখণ্ডের বিস্তৃতি এখানে নেই। কিন্তু তা হলেও সংস্কৃত ভাণিকার মত এই একই ব্যক্তির উক্তিতে আসঙ্গলিপ্সু কৃষ্ণ, আশংকা-গ্রস্তা রাধা এবং অবশেষে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন গোপনকারিণী রাধা ও সন্দেহপরায়ণা সখীদের কানাকানি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত কথায়, ইঙ্গিত-নির্ভর আবেদনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

দানলীলার উল্লেখ বিদ্যাপতির পদে নেই। কিন্তু দু-একটি পদ পড়ে মনে হয় এগুলি দানলীলার ইঙ্গিতবহ। যেমন একটি পদে দেখা যায় পথের মাঝখানেই কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে মিলিত হতে চাইছেন। কিন্তু রাধা কৃষ্ণকে অনুরোধ করছেন পথের মধ্যে জোর না করতে। অবশ্য পদটিকে সুস্পষ্টভাবে দানলীলার পদ বলে গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

বিদ্যাপতির বাসকসজ্জিকা ও খণ্ডিতা নায়িকা রাধা জয়দেবের সগোত্রীয়া। রাধা সারারাত্রি বিফল প্রতীক্ষায় কাটালেন। পরে রাত্রি অবসানে অন্য নায়িকাকে উপভোগ করে কৃষ্ণ তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন বিদ্যাপতির রাধা বিস্তর তিরস্কার করে জয়দেবের রাধার মতই নির্মমভাবে বলেন—

জাহি রমণীসঙ্গে রয়নি গমওলহু
ততহি পলটি পুনু জাহে।[২০৬]

অন্য নায়িকার তুলনায় বিদ্যাপতির পদে খণ্ডিতা রাধার শ্রেষ্ঠত্ববোধ লক্ষণীয়। এখানে বিদ্যাপতির রাধা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও গীতগোবিন্দের রাধার বিপরীত। জয়দেবের খণ্ডিতা রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে বিহারকারিণী অন্য এক 'অধিকগুণা' যুবতীকে কল্পনা করেছেন।[২০৭]

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিরহিণী রাধাও বলেন—

সে নারীর সফল জীবন এ
জারে কাহ্ন সুরতীএঁ তোষে।[২০৮]

অন্যদিকে বিদ্যাপতির রাধা বলেন কৃষ্ণ 'কমলিনী এড়ি কেতকি গেলা।'[২০৯]

আবার অন্যত্র বলেন—কাচ কাঞ্চন দুহু সব কএ লেখলহু
ন জানহ রতনক মূলে।[২১০]

জয়দেব ও বড়ুচণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণপ্রেয়সীরূপে অন্য নায়িকার তুলনায় নিজেদের নিকৃষ্ট মনে করেছেন। অন্যদিকে বিদ্যাপতির রাধা রূপ গুণ ও নারী হিসেবে নিজের মূল্য সম্পর্কে অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন। এই সচেতনতাও নাগরিক জীবনবোধেরই ফল মনে করি।

কিন্তু রাধার কাছে নিজের অন্য নায়িকাবিলাস প্রকাশিত হয়ে গেলেও বিদ্যাপতির কৃষ্ণ লজ্জিত হন না। বরং তিনি রাধার তিরস্কারের উত্তরে স্বাভাবিক ভাবেই বলেন সারারাত শিবপূজা করার জন্যই তাঁর শরীর মলিন হয়েছে। কৃষ্ণের প্রতি রাধার তীব্র অভিমান জয়দেব এবং পূর্ববর্তী সংস্কৃত কবিতার অনুসারী হলেও কৃষ্ণের পূর্ব-প্রতিশ্রুতি এবং মাধবের প্রতি ব্যক্ত রাধার সুগভীর প্রেমের বৈপরীত্য নিতান্ত প্রথানুগ নয়। বহুজনবল্লভ কৃষ্ণকে রাধা হৃদয় দান করেছিলেন—কারণ কৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি ছিল তিনি ষোড়শ সহস্র গোপিনীর মধ্যে রাধাকে পাটরানী করবেন।[২১১] কৃষ্ণের এই ধরনের প্রতিশ্রুতি গীতগোবিন্দে দেখা যায় না, চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে তো নয়ই। বিদ্যাপতির রাধার চরম হিসেবি মনোভাবের পরিচয় আর একবার এখানে পেলাম। রানী হওয়ার লোভে রাধার কৃষ্ণকে ভালবাসার এই ঘটনাটি তাঁকে লৌকিক নায়িকা হিসেবেও নিতান্ত সাধারণ স্থূল রুচির মানবীতে পরিণত করেছে। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণও নানা প্রলোভনে রাধাকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। কৃষ্ণের দূতীও একসময় রাধাকে বলেছিল কৃষ্ণ রাধার প্রেমে এতখানি আচ্ছন্ন যে তিনি ষোড়শ সহস্র গোপিনীকে পরিহার করেই রাধাকে চান।[২১২] কৃষ্ণের এই প্রতিশ্রুতিতেই রাধা তাঁর সমস্ত হৃদয় দিয়ে কৃষ্ণকে ভালবেসেছেন। অভিমানিনী রাধা তাই কৃষ্ণকে বলে পাঠালেন, তিনি তাঁর ষোড়শ সহস্র যুবতীর সঙ্গেই বিহার করুন। রাধার নামে যেন জলাঞ্জলি দেন অর্থাৎ কৃষ্ণের বিরহে রাধা দশমী দশায় উপস্থিত হয়েছেন। রাধার এই

একনিষ্ঠ গভীর প্রেম কৃষ্ণকেও বিস্মিত করেছে। বিদ্যাপতির এই রাধা যে নিতান্তই লৌকিক নায়িকা—তা তাঁর প্রবঞ্চিত হওয়ার ধরন থেকে জানা যাচ্ছে। প্রবঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভে মানিনী রাধার আক্ষেপও বড় করুণ—

ঝাঁপল কূপ দেখহি নহি পারল
আরতি চললহু ধাঈ।
তখন লঘুগুরু কিছু নহি গুনল
অব পচতাবকে জাই ।।[২১৩]

কৃষ্ণের প্রতি রাধার কটূক্তিও মাঝে মাঝে তীব্র, নির্মম হয়ে উঠেছে। কিন্তু রাধার ব্যঙ্গ যত তীব্রই হোক, আচরণ যত নিষ্ঠুরই হোক না কেন—এর পেছনে অপমানিত, অভিমানিনী নারীহৃদয়ের বেদনাই বড় হয়ে উঠেছে। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নারীর বিদ্রোহবহ্নিমা বিদ্যাপতির পদেও দীপ্ত শিখায় উজ্জ্বল। হয়তো মিথিলার রাজসভায় বসে যে অভিজাত নাগরিকদের বহুচারিতা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ বিদ্যাপতির ঘটেছিল, তারই ছায়া পড়েছে এখানে।

কিন্তু মান পর্যায়ে নায়িকার এই মানভঙ্গ করার জন্য নায়কেরও ছলাকলার অন্ত থাকে না। জয়দেবের কৃষ্ণ নানা মিষ্টবাক্যে রাধার মানভঞ্জন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নায়িকার পদধারণও করেছিলেন। অন্যদিকে মানের চরম অবস্থায় বিদ্যাপতির রাধা কৃষ্ণের শত অনুনয় বিনয়েও কর্ণপাত করেন না। বিদ্যাপতি শ্রীরাধার সেই অবস্থা বর্ণনা করে বলেন—

কত কত অনুনয় করু বরনাহ,
ও ধনি মানিনি পলটি ন চাহ।[২১৪]

এবং শেষ পর্যন্ত রাধার এই ক্রোধ দেখে—

গদ গদ নাগর হোরি ভেল ভীত।
বচন ন নিকসয়ে চমকিত চীত ।।
পরশিতে চরণ সাহস নাহি হোয়।
কর জোড়ি ঠাড়ি বদন পুনু জোয় ।।[২১৫]

এমনকি রাধার পদধারণের সাহসও এখানে কৃষ্ণের নেই। তাই বিদ্যাপতি নিজেই রাধার এই মানকে বলেন দুর্জয়মান।

মান পর্যায়েও দূতীর ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কৃষ্ণের অনুরোধে দূতী নানাভাবে রাধাকে বুঝিয়েছে। দূতীর বোঝানোর ভঙ্গীতেই তার যথেষ্ট বচন পারিপাট্য ও লোক চরিত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমেই সে রাধাকে 'গুণবতি' বলে সম্বোধন করে এবং বলে যে মাধবকে বধ করে তার কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে?[২১৬] কিন্তু দূতীর এত অনুরোধেও কোন কাজ হয় না। তাই সে হতাশ হয়ে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলে— জতনহি কত পরকার বুঝায়লুঁ তভু ধনি উতর ন দেল।[২১৭] শেষ পর্যন্ত দূতী সিদ্ধান্ত করেছে যে মানিনী রাধার হৃদয় বজ্রের মতই কঠিন। অবশেষে কৃষ্ণকেই রাধার মানভঙ্গ করার জন্য যেতে হয়। কৃষ্ণ রাধারূপের চূড়ান্ত প্রশংসা করেন। কিন্তু তাতেও মানিনীর মানভঙ্গ হয় না। তখন জয়দেবের কৃষ্ণের মতই বিদ্যাপতির

কৃষ্ণও রাধার কাছে প্রণয়শাস্তি দাবী করেন। আবার কখনও এতে রাধার মানভঙ্গ না হওয়াশ, কৃষ্ণ দূতীর সঙ্গে স্ত্রীলোক সেজে রাধার কাছে এসে উপস্থিত হন।[২১৮] অন্য একটি পদে দেখা যায় কৃষ্ণ যোগী সেজে রাধার বাড়ীতেই ভিক্ষে চাইতে গেলেন। রাধা ভিক্ষে নিয়ে গেলে যোগী কৃষ্ণ বলেন -'মানরতন দেহ মোয়'। কৃষ্ণকে রাধা ছাড়া অন্য কেউ চিনতে পারলেন না। যে কৃষ্ণকে রাধা একদা গোঁয়ার গোপ বলে উপহাস করেছিলেন, আজ তারই সম্পর্কে সখীর কাছে বলতে বাধ্য হলেন– 'বড়ই চতুর মোর কান।'[২১৯] রাধার কাছে যাওয়ার জন্য কৃষ্ণের এই ছদ্মবেশ ধারণ আমাদের কুমারসম্ভব কাব্যের ছদ্মবেশী শিবের কথা মনে করিয়ে দেয়। পরবর্তীকালের পদাবলী সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের এই ছদ্মবেশ ধারণ কবিদের একটি প্রিয়প্রসঙ্গ।

এরপর মানান্তে মিলনে রাধা আর সেই অনভিজ্ঞা মুকুলিকা বালিকা নন। এখন তিনি দেহে ও মনে পূর্ণ যুবতী। তাই কৃষ্ণ আলিঙ্গন প্রার্থনা করলে 'প্রেমভরে সুবদনি তনু জনি স্তম্ভ'।[২২০] কিন্তু মানান্তে মিলন প্রেমের পরিপূর্ণ অবস্থা। তারও আগে অনিচ্ছুক অনভিজ্ঞা বালিকার সঙ্গেও কৃষ্ণের মিলন ঘটাতে এগিয়ে এসেছে দূতী। সে একদিকে রাধাকে পরামর্শ দিয়েছে, অন্যদিকে কৃষ্ণকেও সতর্ক করেছে। প্রথম মিলনের আগেও সখী কৃষ্ণকে সতর্ক করে বলেছে, কৃষ্ণ যেন রাধার শক্তি জেনে রতিলীলা করেন, কারণ, ক্ষুধার্ত হলেও কেউ দুহাতে খায় না। বিদ্যাপতি নিজেও সখীর হয়ে বলেছেন শিরীষকুসুমকে মধুকর যেমন কৌশলে উপভোগ করে, তেমনি ভাবেই যেন রাধাকে কৃষ্ণ উপভোগ করেন।[২২১] আবার কখনও দূতী কৃষ্ণকে বলে, কৃষ্ণেরই আর্তি দেখে সে পরস্ত্রীকে চুরি করে এনেছে। সুতরাং মাধব যেন শীঘ্র কেলি করে, তাহলে তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠাতে পারবে।[২২২] পরবর্তী পদেও দূতীর মুখেই প্রথম মিলন সমাপ্তির বর্ণনা আছে। চুম্বনে রাধার চোখের কাজলের ধারা মুছে গেছে। ওষ্ঠ বিশুষ্ক, গলার হারও ছিঁড়ে গেছে। মিলনের প্রথম পর্যায়ে এই ভাবেই রাধার প্রতিক্রিয়া সমস্তই ব্যক্ত হয়েছে দূতীর মুখে। তার সঙ্গে, সমাজবহির্গত প্রেমে সহায়তা করার জন্য দূতীর নিজের ধরা পড়ার আশঙ্কাও বারবার ব্যক্ত হয়েছে। দূতীর প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, এই প্রেমের বিচিত্র বর্ণমাধুরী কাব্যে যতই অভিনন্দিত হোক না কেন, সামাজিক মানুষ একে ঘৃণার চোখেই দেখত।

রাধার মিলনের প্রতিক্রিয়াও বিদ্যাপতি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করেছেন। রাধার স্তনযুগে নখরেখা যেন নূতন চন্দ্ররেখার মত, তিনি একবার দেখেন এবং একবার ঢেকে রাখেন। নব অভিসারিণী রাধা নিজের প্রথম মিলন ও রতিকৌতুকের কথা স্মরণ করে পুলক বোধ করে ; আর গুরুজন, স্বজন-পরিজনকে লুকিয়ে হাতের রত্নদর্পণে মুখ দেখেন।[২২৩] কবি বিদ্যাপতির অপূর্ব মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় বয়ঃসন্ধির পদে দেখেছি, আবার এখানেও আর একবার উল্লেখযোগ্যভাবে দেখলাম। রাধা এখন গুরুজনকে লুকিয়ে গোপনে দর্পণে মুখ দেখেন কেবল ওষ্ঠে প্রিয়তমের দশনচিহ্ন দেখার জন্য নয়, প্রিয়মিলনের সুখমাদকতায় তার পুলক-হিল্লোলিত অস্তিত্বের প্রতিচ্ছবিকে দেখার জন্য। নিজের চোখ দিয়ে নিজের সৌন্দর্যকে নিরীক্ষণ করে রাধা তার প্রিয়তমের রূপমুগ্ধতাকেই যেন অনুভব করতে চান।

রসোদ্গারের পদে রাধার নিজের মুখেই সেই মিলনের বর্ণনা পাওয়া যায়—

পহিল বাস মঝু নাহি রতিরঙ্গ।
দূতি মিলায়ল কানুক সঙ্গ ॥[২২৪]

কৃষ্ণকে দেখেই রাধার শরীর কাঁপতে লাগল। আর লুব্ধ প্রেমিক সেই প্রেমে ও প্রথম মিলনাশঙ্কায় কম্পিত তনুতে ঝাঁপ দিলেন। আলিঙ্গনের বিপুল সুখে রাধার জ্ঞান হারিয়ে গেল, মিলনের আনন্দ কেমন—তা তিনি জানেন না। সমবয়সিনী সখীদের কৌতূহলী জিজ্ঞাসার উত্তরে রাধার এই পুলকিত প্রতিক্রিয়া বর্ণনা লৌকিক সমাজেরই যে কোন নব-বিবাহিত দম্পতির বলে মনে হয়। কখনও আবার রাধা সখীদের কাছ থেকে নিজের প্রেমকে গোপন করতে চান। কিন্তু সখীরা ধরে ফেলে। রাধাব কণ্ঠ ও অধরের আকৃতি মলিন, রাত্রি জাগরণে রক্তবর্ণ অলস নিমীলিত দুই চোখ। মনে হয় যেন ভ্রমর রক্তপদ্ম থেকে মধু পান করে সেই পদ্মের কোলেই শায়িত।[২২৫]

বিদ্যাপতির বিপরীত-রতির প্রত্যক্ষ বর্ণনা সম্বলিত কোন কোন পদ শিল্পসৌন্দর্যে আদিরসকে অলংকৃত চারুত্বদান করেছে। এই ধরনের পদ পাঠ করার পর আদিরসের উন্মাদনার পরিবর্তে অলংকারের উতরোল উল্লাসই মনোলোকে ঝঙ্কার তোলে—

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল
চাঁদ বেঢ়ল ঘনমালা।
মনিময় কুণ্ডল স্রবণে দুলিত ভেল
ঘামে তিলক বহি গেলা।

*　　*　　*

কিঙ্কিনী কিনি কিনি কঙ্কণ কনকন
কলরব নূপুর বাজে।
নিজমদে মদন পরাভব মানল
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে ॥[২২৬]

কৃষ্ণ রাধাকে বলেছেন বিপরীত রতিকালীন রাধার মুখশ্রীই মঙ্গলদাতা। হরিহর বিধাতার কোন প্রয়োজন নেই। স্পষ্টতই বোঝা যায় এই পদ বিদ্যাপতির মদ-বিহ্বল যৌবনের ভোগ রঙিম প্রহরের সৃষ্টি। বিপরীত-রতির এই বর্ণনায় কবি জয়দেবের কাছে প্রত্যক্ষভাবেই ঋণী। তবে বিশেষভাবে উপরোক্ত পদটি সম্পর্কে বলা যায়, উপমা ও অনুপ্রাসে ঐশ্বর্যখচিত এই পদটি কবির মৌলিক সৃষ্টি নয়। তিনি এর প্রেরণা পেয়েছেন অমরুশতকের একটি পদ থেকে—

আলোলমলকাবলিং বিলুলিতাং বিভ্রচ্চলৎকুণ্ডলং।
কিঞ্চিন্মৃষ্টবিশেষকং তনুতরৈঃ স্বেদাম্ভসাং শীকরৈঃ ॥
তন্ব্যা যৎ সুরতান্তনয়নবক্ত্রং রতিব্যত্যয়ে।
তৎ ত্বাং পাতু চিরায় কিং হরিহর ব্রহ্মাদিভির্দৈবতৈঃ ॥[২২৭]

বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ না থাকলেও বিপরীত রতির আরও বহু পদই[২২৮] বিদ্যাপতি রচনা করেছেন।

পূর্ণ মিলনের পদে কৃষ্ণের তীব্র দেহ পীড়নের অনাবৃত বর্ণনা দূতীর মুখে পাওয়া যায়।[২২৯] মিলনের পটভূমিও কম চমৎকার নয়। সন্ধ্যাবেলায় যমুনার তীরে কৃষ্ণ অকস্মাৎ

রাধার সঙ্গে মিলিত হলেন। কৃষ্ণের আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে রাধা একটি উপমার আশ্রয় নিয়েছেন—'নিধনে পাওল জনি কনককটোরা।'[২৩০] আবার কখনও রাধা কৃষ্ণকে গোঁয়ার এবং রতিরসঅনভিজ্ঞ বলেও উপহাস করেছেন।[২৩১] রাধার মুখে যে মিলনের পদগুলি কবি বর্ণনা করেছেন—তার সবগুলিই সখীর কাছে বলা। রাধা যেন নিজেরই মিলনানন্দ সখীর কাছে ব্যক্ত করে আর একবার তার রস আস্বাদন করেন। অন্যদিকে সখীও সাগ্রহ কৌতূহলে যেন—'তারপর কি?' প্রশ্ন করে একে একে রাধার মিলনকাহিনী শুনে নিচ্ছেন।[২৩২] দুটির সজীব মনের পারস্পরিক আদান-প্রদানে কৃষ্ণকথা এখানে নাটকীয় রম্যতা লাভ করেছে। শেষ পর্যন্ত রাধা নিজের মিলনানন্দকে এইভাবে প্রকাশ করেন—'অপন আইতি নহি অপনা অঙ্গ।' অর্থাৎ রাধার নিজের অঙ্গই তার নিজের আয়ত্বে থাকে না। এইভাবে নরনারীর বিচিত্র প্রেমবিলাস ও উন্মাদনার দেহ চাঞ্চল্যকে বিদ্যাপতি নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সর্গেও রাধাকৃষ্ণের দেহমিলনের বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু নায়িকার ব্যক্তিগত পুলকোন্মাদনা, সখীর কাছে তার নিভৃত প্রকাশ, মিলনের এমন বিচিত্র পটভূমি, প্রথম মিলনের এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা জয়দেবের পদে নেই। বিদ্যাপতির মিলনের পদ যেন ভোগরসিক রাজপুরুষদের আদিরস আস্বাদনের রসটলমল মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণভৃঙ্গার।

বিদ্যাপতির একটি রসোদ্গারের পদে (সখি হে, কি পুছসি অনুভব মোয়), মিলনের আর এক তাৎপর্য পাওয়া যায়।[২৩৩] বহু চৈত্ররজনী কেলিরসে কাটিয়েও কেলি কি তা রাধা বুঝতে পারলেন না। লক্ষ লক্ষ যুগ হৃদয়ে হৃদয় রেখেও হৃদয় জুড়ালো না। প্রেমের এই অতৃপ্তি, মিলনের পরমমুহূর্তের পরও এই না পাওয়ার যন্ত্রণা পদটিকে আদ্যন্ত রোমান্টিক করে তুলেছে। তবে পদটি বিদ্যাপতির কিনা, এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বাদানুবাদ আছে। এটিকে অনেকে কবিবল্লভের রচনা বলতে চান। পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় এটিকে কবিবল্লভের বলে অভিহিত করেছেন। কারণ যে যে পুঁথিতে পদটি আছে—সর্বত্রই ভণিতায় কবিবল্লভের নাম। এছাড়া পদটিতে যেন উজ্জ্বলনীলমণির অনুরাগ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে বিদ্যাপতির মত বড় কবি ছাড়া এই ধরনের পদ আর কেউ রচনা করতে পারেন না। তাঁর মতে—"চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের কতকগুলি পদে অনুরূপ সুরের গভীরতা মিলে, কিন্তু উহার প্রকৃতি বিভিন্ন। প্রেমের রহস্যময় বিপরীতধর্মিত্ব, ইহার আনন্দবেদনায় অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত প্রকৃতি, ইহার সর্বনাশা আকর্ষণ, সব ভোলানো মোহ এই সমস্ত পদে সার্বভৌম ব্যঞ্জনার সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছে।"[২৩৪]

মিলনের এই প্রবল উন্মাদনার পর আসে বিচ্ছেদের অবধারিত দূরত্ব। প্রেমের তীব্রতা, মিলনের উচ্ছ্বাস, দেহের অঙ্গনে মধুসখা মদনের অপরাজিত অবস্থান যত উজ্জ্বল, বিরহও তেমনি বর্ণবিরলতা থেকে স্তরে স্তরে শেষ পর্যন্ত বর্ণহীন সমাহিত গভীরতার মহাসমুদ্রে পরিণত হয়। বিদ্যাপতির বিরহের পদে শেষ পর্যন্ত সেই নম্রগম্ভীরের বন্দনা। নরনারীর প্রেমমিলন সত্তার পরিপূর্ণতারই রূপ, তাই উপনিষদের ঋষি ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে প্রিয়াকর্তৃক আলিঙ্গিত মুহূর্তের তুলনা করেছেন। বিরহে তাই পূর্ণতাবিচ্ছিন্ন সত্তার রক্তাক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আর খণ্ডিত আত্মার আর্তনাদ। বিদ্যাপতি তাঁর বিরহের পদকে সেই গভীরতায় নিয়ে যেতে পেরেছেন।

কিন্তু বিদ্যাপতির বিরহ পর্যায়েরও নানা স্তরবিভাগ আছে। তাঁর মিলনের মত বিরহ

পর্যায়কেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়েই রাধার মানস পরিবর্তনের ধারাটি সহজেই অনুধাবন করা যায়।

রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেম অন্তত বারো বছর ধরে চলেছে! তার প্রমাণ রাধার উক্তি—'বরস দাদশ ভ্‌ূত অনুরাগ'।[২৩৫] কিন্তু তারপর মাধবের অনুপস্থিতিকে রাধা প্রেম-হীনতা বলেই ধরে নিয়েছেন। মাধব কেন আর তাঁকে সমাদর করেন না—এর কারণ খুঁজতে গিয়ে রাধা বলেন, যখন যৌবন ছিল তখনই তিনি কৃষ্ণের আদর পেয়েছেন। এখন যৌবন আর না থাকার জন্যই কৃষ্ণ তাঁর সমাদর করেন না। বিদ্যাপতির রাধা এখানে সম্পূর্ণভাবেই রক্তমাংসের মানবী। লৌকিক নায়িকার নিতান্ত সাধারণ আচরণই তাঁর মধ্যে লক্ষণীয়। বিদ্যাপতি তাঁর রাধাকৃষ্ণ লীলার কেন্দ্রস্থলে যে রাধা চরিত্রটিকে রেখেছেন, তিনি সাধারণ নবযৌবনা তরুণী। কৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভালবাসার পূর্বসংস্কার কিছু নেই। তিনি নিতান্তই প্রাণের আবেগে, যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী কৃষ্ণকে ভালবেসেছেন। তাঁর ভালবাসায় তাই পার্থিব প্রেমের মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু এই রাধাই রভসোল্লাসে মধুযামিনী যাপনের পর, মানে-অভিমানে, আবেগে-অনুরাগে উদ্বেল কামনাময় ভালবাসার নানা স্তর পেরিয়ে যখন মাথুর পর্যায়ে এসে উপনীত হন—তখন তাঁকে দেখা যায় আর এক মূর্তিতে। কৃষ্ণের বিরহ শেষ পর্যন্ত এই রাধাকে শান্ত নম্র সৌন্দর্যের ও সমাহিত প্রেমের অধিকারিণী করে তুলেছে।

অন্যান্য পর্যায়ের মত বিরহ পর্যায়েও বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা মর্ত্যজীবনেরই রক্তমাংসের মানুষের প্রেমগাথা। পার্থিব সৌন্দর্যকে অবলম্বন করেই এখানে তিনি অপার্থিব লোকে যাত্রা করেছেন। অনুভবের এই জগৎকে আমরা বলি অলৌকিক, বলি আধ্যাত্মিক। কিন্তু এই অলৌকিক আসলে লৌকিক জীবনেরই গাঢ়তম অনুভবের দুর্লভ মুহূর্ত, আধ্যাত্মিকতা আসলে মানুষের চেতনারই সমুন্নতি। এদিক দিয়ে বিদ্যাপতির ওপর কালিদাসের প্রভাবও কিছু পরিমাণে আছে বলা যায়। কালিদাসের কাব্যে নাটকেও দুঃখ-বেদনার অগ্নিদাহনে শুদ্ধ নায়ক-নায়িকা কেবলমাত্র ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা পানের মাদকতাকে অতিক্রম করে একইভাবে স্নিগ্ধ শুচিতামণ্ডিত লাবণ্যের অধিকারী হয়েছে। বিদ্যাপতির রাধা চরিত্রটিও একই পরিণতি লাভ করেছে। এমনকি বিদ্যাপতি প্রত্যক্ষ-ভাবেই কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের বিরহী পুরূরবাকে নিয়ে একটি পদ রচনা করেছেন।[২৩৬] এছাড়াও তাঁর রাধা, বিরহে সংস্কৃত কাব্যনায়িকা এবং জয়দেবের রাধার মতই শীতল চন্দন ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন।

বিদ্যাপতির বিরহিণী রাধার মানস পরিবর্তনের স্তরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম স্তরে দেখা যায় কৃষ্ণবিরহিণী রাধার কাতরতা কৃষ্ণের অভাবে ভোগবিলাসের অপূর্ণতার জন্য। কোকিলকূজিত পুষ্পময় বসন্তে সখীকে সম্বোধন করে রাধা বলেন, এই বসন্তকালই কৃষ্ণের সঙ্গে বিলাসের উপযুক্ত সময়।[২৩৭] আবার রাধা খেদ করেন, তাঁর প্রথম বয়স কিন্তু সাধ পূর্ণ হল না। কৃষ্ণ যে বিনা দোষে কেন তাঁকে পরিত্যাগ করলেন তার কারণও রাধা খুঁজে পান না।[২৩৮] 'সজল নয়ন করি' পদটিতে দেখা যায় সখীর কাছে প্রিয়তম বিদেশে যাওয়ার জন্য রাধা আক্ষেপ করছেন—

কি মোর করম ফলে পিয়া গেল দেশান্তরে
নিতি নিতি মদন ঝঙ্কার[২৩৯]

এখানেও বিরহিণী রাধার সেই একই দেহ কামনার প্রকাশ ঘটেছে। বিদ্যাপতির রাধা এই স্তরে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিনী আর এক কৃষ্ণপ্রেমিকার কথা ভেবে নিয়ে তাকে অভিশাপ দিয়েছেন। আবার কখনও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধার মতই বলেছেন—

পাখিজাতি যদি হও পিয়াপাশে উড়ি যাও
সব দুখ কহোঁ তছু পাশে ॥[২৪০]

'অংকুর তপন তাপে যদি জারব' শীর্ষক পদটিতেও[২৪১] নব যৌবন বিরহে যাপন করতে হবে—এই বেদনায় রাধা অধীর। তিনি বলছেন, যদি প্রখর বিরহরূপ সূর্যকিরণে তাঁর নব বিকশিত প্রেমাঙ্কুরই শুকিয়ে যায়, তারপর বারিবর্ষণে আর কি ফল ? সমুদ্রের কাছেই যদি কণ্ঠ শুকিয়ে যায়, তবে কে আর পিপাসা দূর করবে ? রাধার প্রতি কৃষ্ণের এই বিমুখতা যেন চন্দন তরুর সৌরভ ত্যাগ, চাঁদের অগ্নিবর্ষণ আর চিন্তামণি রত্নের নিজ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ। এখানেও রাধার প্রেম দেহনির্ভব। কৃষ্ণপ্রেমের যে গম্ভীর মধুর রূপ কতগুলি উপমার সাহায্যে ফুটে উঠেছে, তাতে রাধার কৃষ্ণপ্রেমানুভূতির স্বরূপও প্রকাশিত। কৃষ্ণের প্রেমে সমুদ্রের মতই বিপুলতা আর গভীরতা। অন্যদিকে এই কৃষ্ণ-প্রেমে আছে সিগ্ধ চন্দন সৌরভ আর চন্দ্রকিরণের মধুর উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ লাবণ্য। চিন্তামণির মতই এই প্রেম অভীষ্ট বস্তুদায়ী, শ্রাবণমেঘের মত সুপ্রচুর বর্ষণকারী, কল্পতরুর মত বাঞ্ছিত বস্তুদানে সক্ষম। কিন্তু রাধার পক্ষেই এই প্রেম বিপরীত হল। এখানে রাধার প্রেমে দেহকামনার স্পর্শ কিছুটা আছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমের প্রকৃত উপলব্ধি তাঁর প্রেমে দেহাতীত লাবণ্য সঞ্চার করেছে। রাধার কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির অপরিমেয় আনন্দ আর সেই প্রেমকে হারানোর তীব্র বেদনাও এই উপমাগুলির মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায় ভোগের আগুন অনেকখানি নির্বাপিত। কিন্তু এখনও রাধা কৃষ্ণের প্রেমের কোন মহিমাই স্বীকার করেন না। বরং বলেন—

জোবন রতন আছল দিন চারি।
সে দেখি আদর কএল মুরারী॥[২৪২]

এখানে রাধার কাছে কৃষ্ণ সাধারণ নায়কমাত্র। রাধিকার রূপযৌবনে মুগ্ধ হয়ে তাকে কয়েকদিনের জন্য ভোগ করে চলে গেছেন। আবার কখনও রাধা আক্ষেপ করে বলেন—

কি ক্ষণে বিহি মোহে বিমুখ ভেল রে
পলটি দিঠি নহি দেল[২৪৩]

বিভিন্ন ঋতুর বিচিত্র পরিবেশে কৃষ্ণের বিরহে রাধার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বসন্তের আগমনে রাধা তাঁর পূর্বের রাসবিলাস স্মরণ করে বেদনার্ত হয়ে পড়েন।[২৪৪] এখানে স্পষ্টতই বিদ্যাপতি জয়দেবের বসন্তকালীন রাসের কথা বলেছেন। তারই সঙ্গে রাধা তার দুঃখের বারমাস্যার বর্ণনাও দিয়েছেন। বিদ্যাপতির বহু প্রেমলীলার পদে রাধাকৃষ্ণের নামের উল্লেখ নেই। সেগুলিকে আমরা রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদ বলে সাধারণত গ্রহণ করিনি। এই পদটিতেও রাধাকৃষ্ণের নামের উল্লেখ নেই। কিন্তু রাসবিলাস প্রসঙ্গই এটিকে রাধাকৃষ্ণলীলার পদ হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়।

'পিয়া গেল মধুপুর হম কুলবালা'[২৪৫] পদটিতে রাধা বিরহবেদনার সঙ্গে সঙ্গে নিজের রূপযৌবন সম্পর্কেও পরিপূর্ণভাবে সচেতন। তাই তিনি বলেন, কৃষ্ণ মথুরাপুরে

চলে যাওয়ায় মালতীমালা যেন বিপথে পড়ল। অর্থাৎ মালতীমালা যেমন উপযুক্ত সমাদর-কারীর অভাবে ধূলিলুণ্ঠিত হয়, তেমনি মালতীমালার মতই রাধার সযত্নরচিত রূপযৌবনও কৃষ্ণের সমাদরের অভাবেই ধূলিলুণ্ঠিত। কৃষ্ণের সঙ্গেই রাধার চোখের ঘুম, মুখের হাসি আর মনের সুখ চলে গেছে। রাধার জন্যে শুধু পড়ে আছে দুঃখ। ভণিতায় কবি বিদ্যাপতি সান্ত্বনাদাতার ভূমিকা নিয়ে বলেন—সুজনের কুদিন বেশীদিন থাকে না।

এই বিরহিণী রাধার যে ম্লান মূর্তি কবি অঙ্কন করেছেন তা আমাদের কালিদাসের যক্ষপ্রিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়—

করতল লীন সোভএ মুখচন্দ।
কিসলয় মিলু অভিনব অরবিন্দ॥[১৪৬]

অবশেষে একসময় প্রতীক্ষার গুরুভার রাধার হৃদয়কে প্রশ্নাতুর করে তোলে। রভসরজনীর সুখস্মৃতি সর্বাঙ্গে বহন করে ব্যাকুলা রাধা প্রশ্ন করেন, কতদিনে তাঁর এই হাহাকার, এই গুরুদুঃখের ভার ঘুচবে? কামনার মদিরা এখনও আচ্ছন্ন করে আছে রাধার সত্তাকে। তাই তিনি প্রশ্ন করেন—

কতদিনে পিয়া মোরে পুছব বাত।
কবহুঁ পয়োধরে দেওব হাত॥[১৪৭]

কিন্তু পরবর্তী স্তরে এই ভোগলুব্ধতা আর নেই। দীর্ঘ বিরহের শোকসজল দিনগুলির বিবশ প্রহর ক্রমশঃ কৃষ্ণের সান্নিধ্যটুকুকেই মূল্যবান করে দেয়। রাধার কাছে এখন নন্দপুর-চন্দ্রহীন বৃন্দাবন অন্ধকার মনে হয়। 'অব মথুরাপুর মাধব গেল'[১৪৮] পদটিতে রাধার সেই স্মৃতিভার পীড়িত বেদনা, বিদীর্ণ সত্তার আর্ত হাহাকার "গোকুল মানিক কো হরি লেল"। শূন্য নগরীতে শূন্য মন্দিরে বসে রাধা ভাবেন—কি করে তিনি যমুনাতীরে যাবেন, কৃষ্ণবিহীন কুঞ্জকুটিরের দিকে দৃষ্টিপাত করার কল্পনাও তাঁর পক্ষে কষ্টকর। কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গেই রাধার 'নয়নক নিন্দগেও বয়নক হাস'। সহচরীর সঙ্গে যেখানে তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে ফুলখেলা খেলেছেন, সেই দিকে তাকিয়ে রাধা যেন বাঁচতেই চান না। পূর্বমিলনের সুখস্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলিই আজ বিরহিণী রাধার মনের বেদনাকে জাগিয়ে তুলছে। নিরুপায়ভাবে এই বেদনাদহনকে বহন করেন যে রাধা, তিনি আমাদের এই পরিচিত সংসারেরই। যে সংসারে প্রতি মুহূর্তে প্রিয়জনের অনাকাঙ্খিত বিচ্ছেদের পর স্মৃতিভার নিয়ে পড়ে থাকা মানুষ শুধু সারাজীবন হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের কথা ভেবে চোখের জল ফেলে—রাধা তাদেরই একজন। এই রাধাকে কোন দেশকালের পরিধিতে আবদ্ধ করা যায় না।

'চিরচন্দন উরে হার ন দেলা' পদটিতে রাধার হাহাকার আরও মর্মস্পর্শী, ক্রন্দন আরও তীব্র।[১৪৯] নিবিড় আলিঙ্গনের ঘনিষ্ঠতম মুহূর্তেও ভূষণ প্রসাধন যাঁর বাধা হয়ে উঠেছিল একদা, আজ নদীগিরির পরপারবর্তী তাঁরই কথা ভেবে রাধা অন্তরের গভীরতম ক্ষতচিহ্নটিকে উন্মোচিত করেন—

আন অনুরাগে পিয়া আনদেশে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥

শুধু প্রিয়কে হারানোর বেদনাই নয়, সেই সঙ্গে কৃষ্ণের অন্য নারীর প্রতি আসক্তির জন্য ঈর্ষা এবং বেদনাও এখানে প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তী পংক্তিতে রাধা বলছেন একদিন

প্রিয়তমের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে তিনি সবাইকে তুচ্ছ করেছেন। আজ প্রিয়বিহীনা রাধাকে 'কে কি না কহলা'। প্রেমই রাধার জীবনের সর্বস্ব, তাঁর গৌরবও বটে। প্রিয়তমের অনুপস্থিতিতে গৌরবভ্রষ্টা রাধার বেদনাই এখানে অনুরণন তুলেছে।

'প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল'[২৫০] পদটিতেও রাধার আক্ষেপ ও বেদনা ধ্বনিত। রাধা বলছেন তাঁর প্রেম যেন এক সুকুমার শ্যামল নবোদ্গত অঙ্কুর। কিন্তু তার দুটি পাতা হওয়ার আগেই অর্থাৎ প্রেমের বিকাশ হওয়ার আগেই বিরহের উত্তাপে তা শুকিয়ে গেল। প্রতিপদের চাঁদ যেমন উদিত হয়েই অস্তে চলে যায়, তেমনি রাধার সুখের আশাও নিরাশায় পরিণত হল। রাধা বলছেন, কে জানত যে চাঁদ চকোরিণীকে আর সুজনভ্রমব মাধবীকে বঞ্চনা করবে। রাধা বলছেন, তাঁর প্রাণ তো আর কাউকে জানে না, কেবলই কানু কানু করে রোদন করে। কতগুলি উপমার সাহায্যে রাধার প্রেমের স্বল্পকালস্থায়িত্ব আর সেই হীন-পরমায়ু প্রেমের জন্য রাধার বেদনাই এখানে অনুরণিত।

পরবর্তী স্তরে বিরহের দশমীদশায় দূতী মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণকে রাধার অবস্থা জানায়। এখন রাধার —

অবিরত নয়নে বারি ঝরু নিঝর
জনু ঘন সাওন মালা।[২৫১]

রাধার সেই অনর্গল অশ্রুনীরে নদী বয়ে যায় 'লোচন নীরে তটিনী নিরমান'।[২৫২] কৃষ্ণবিরহিণী রাধা এখন তাঁরই অশ্রুনীরে নির্মিত সরোবরে স্ফুটিত শতদল। বিদ্যাপতির কবিকল্পনার এই চারুত্ব বিরহিণী রাধাকে অপূর্ব সৌন্দর্য দান করেছে। রাধা এখন অবিরত কৃষ্ণনাম জপ করেন। কৃষ্ণের বিরহাগ্নিজ্বালা হৃদয়ে বহন করে রাধা যেন বৃন্দাবনে তপস্যা করছেন, আর তাতে আহুতি দেবেন নিজের শরীরকে। এ যেন কুমারসম্ভবের চন্দ্রশেখর বিরহিণী উমারই আর এক রূপ। রাধা এখানে জীবনকে ইন্ধন করে স্মৃতির দাহে আত্মাহুতি দান করছেন। প্রেমের রাজ্যে প্রথমে প্রসাধন, পরে সাধনার শুচিতা — বিরহিণী রাধার প্রেমতপস্যা এই সত্যকেই প্রমাণ করে।

এরপর দেখা যায় রাধা—

হরি হরি বোলি ধরণি ধরি লুঠই
সখি বোধে নপাওয়ে কাণ।[২৫৩]

এ কোন্ রাধা? কোথায় সেই বয়ঃসন্ধির যৌবন রসোচ্ছলা চটুলা বালিকা? এই রাধার একান্ত প্রেমতন্ময়তা, মাধবের জন্য নয়নক্ষরিত অনর্গল অশ্রু আর অবিরল হরিনাম জপ আমাদের মনে করিয়ে দেয় সেই হিরণ্যবর্ণ ভাবতন্ময় সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের কথা। চৈতন্যোত্তর পদাবলীকারেরা শ্রীচৈতন্যের দিব্যপ্রেম প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে দর্শন করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাপতি কোথায় পেলেন এই কৃষ্ণপ্রেম-তন্ময়া কৃষ্ণনাম জপবিহ্বলা রাধাকে? আমরা বলব তাঁর আপন কবিচেতনার মর্মলোক থেকে। যৌবনের মদমুকুলিত, ভোগবিহ্বল দিনগুলিতে যিনি বয়ঃসন্ধির বালিকার লীলাচাপল্য এঁকেছেন, রূপ দিয়েছেন প্রথমসমাগমমুগ্ধা রাধা ও কামনিপুণ কৃষ্ণকে, বারংবার বর্ণনা করেছেন অসংবৃতবাসা যুবতীর অকস্মাৎ উদ্ঘাটিত কামোদ্দীপক বরতনু—প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসে সেই বিদ্যাপতিই রাজা ও রাজ পরিবারের বহু উত্থান পতনের সাক্ষ্য নিজের জীবনে বহন করে শান্ত সমাহিত ভক্তির পরম সান্ত্বনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন মাধবের পায়ে।

নিধুবনে রমণীরসরঙ্গের জ্বালাময় স্মৃতিতে বেদনামথিত কবিচিত্তের আন্তরিক উৎসারণ ঘটেছে বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদে। এই বিদ্যাপতির সঙ্গে আমরা তাঁর রাধাকে মিলিয়ে নিতে পারি। এইখানেই পূর্বসূরী জয়দেবের সঙ্গে বিদ্যাপতির পার্থক্য—ইতিহাসের দৃষ্টিতে আমরা বলব উত্তরণ। অবশ্য বিরহ পর্যায়ে অনুভূতির এক গভীরতম স্তরে বিদ্যাপতির রাধা জয়দেবের রাধারই সগোত্রীয়া। জয়দেবের বিরহিণী রাধা সম্পর্কে সখী কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলেছেন—

মুহুরবলোকিত মণ্ডনলীলা
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥[২৫৪]

অনুরূপ ভাবে বিদ্যাপতির রাধাও—

অনুখন মাধব মাধব সঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।[২৫৫]

কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমতন্ময়া যে রাধা বিদ্যাপতির ব্যক্তিক অনুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশে জীবন্ত —সেই রাধাকে আমরা জয়দেবের কাব্যে পাই না। জয়দেবের রাধা এবং তিনি পৃথক। কিন্তু বিদ্যাপতির কাব্যে প্রার্থনার পদগুলিই প্রমাণ করে দেয় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের যৌবনবয়সের ভোগোল্লাসের মাঝখানে যে স্নিগ্ধ ভক্তিরসপ্রবাহ প্রচ্ছন্ন ছিল, তা শেষ জীবনে এসে শান্ত সমাহিত আত্মনিবেদনময় প্রার্থনার পদে পরিণতিলাভ করেছে। তেমনি পূর্বরাগ, মিলন ও অভিসারের কামনায় উদ্বেল রাধাও বিরহ পর্যায়ে এসে শান্ত নম্র মঙ্গলশ্রী লাভ করেছেন। নিপুণ নাট্যকারের মত বিদ্যাপতি বেদনার অপরিমেয় অশ্রুজলে রাধার যৌবন কামনার সমস্ত স্থূলতার আবর্জনা মুইয়ে দিয়ে তাঁকে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী করে তুলেছেন। তাই রাধার দূতী মথুরায় কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলেছে—

বেরি এক মাধব তুঅ লাগি জীবই।
জব তুঅ রূপ নয়ন ভরি পিবই ॥[২৫৬]

এখন আর দেহমিলনের জন্যে রাধা ব্যাকুল নন। একবার মাত্র কৃষ্ণের দেখা পেলে নয়ন ভরে তার রূপসুধা পান করে রাধা প্রাণ ফিরে পাবেন। আজ বিরহ সাগরের অতল গভীরে রাধার কামনার অগ্নি নির্বাপিত। তাই এখন—'তুঅ গুণ গণইতে নিন্দ ন হোই।' কৃষ্ণের গুণের কথা স্মরণ করেই রাধার চোখে ঘুম আসে না। একদা বিদ্যাপতি তাঁর অভিসারিকা রাধা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—কাম এবং প্রেম একত্রে মিললে কি না করতে পারে? আজ রাধার হৃদয়ে কাম নেই, আছে শুধু প্রেম। তাই বিচ্ছেদাতুরা নায়িকা প্রেমতাপসী পূজারিণী রাধায় পরিণত হয়েছেন। তিনি বলেন—

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে ॥[২৫৭]

রাধার অঙ্গ হবে তাঁর পূজা বেদী, তাঁর চিকুররাশি সেই বেদীকে মুছে দেবে, রাধার মোতির হার হবে আল্পনা আর স্তনযুগল হবে মঙ্গল ঘট, তাঁর গুরু নিতম্ব হবে কদলী-বৃক্ষ আর তাতে আম্র পল্লব হবে রাধার কিঙ্কিনী। এইভাবে রাধা যেন দেহদীপ জ্বালিয়ে কৃষ্ণের আরতি করবেন। এ যেন ধাপে ধাপে দেহের সোপান পেরিয়ে দেব-দেহলীতে প্রেমিকা রাধার পদার্পণ। আসলে এই পদার্পণ কবি বিদ্যাপতিরও। ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরাপানকারী কবির সত্তার গভীরে ধূপপুষ্পবাসিত দেবপূজা-

মন্দিরের স্নিগ্ধ সুগন্ধই এখানে বিকীর্ণ! আমরা আগেই বলেছি লৌকিক অনুভবের গভীর মুহূর্তেই লোকোত্তর চেতনার দ্যুতিতে ঝলসে ওঠে। বিদ্যাপতির রাধাও ক্রম-বিকাশের মধ্য দিয়ে সেই লোকোত্তর অনুভূতির দীপ্তিময় প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বিদ্যাপতির বিরহের পদে কৃষ্ণের বেদনাও গভীরতা লাভ করেছে। একদা রাধা-অনুরাগী কৃষ্ণ রাধার জন্য বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সেই বিহ্বলতা যে ক্ষণিকের মোহ নয়, মাথুরের কিছু কিছু পদই তার প্রমাণ। দূতী মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণের কাছে বিরহিণী রাধার অবস্থা বর্ণনা করেছে। আর কৃষ্ণ বলেছেন তাঁর পক্ষে রাধাকে ভুলে যাওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। মথুরায় আসার সময় কৃষ্ণও রাধার অনুমতি প্রার্থনা করলে রাধা মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছিলেন। এখন কৃষ্ণও রাধাবিরহে কাতর—

তা বিনে রাত দিবস নহি ভাওই
তাতে রহল মন লাগি।
আন রমনিসঞে রাজসম্পদমো
অছি এ যৈছে বৈরাগী।[২৫৮]

রাধাকে ছাড়া রাত্রি দিন কোন সময়ই কৃষ্ণের ভাল লাগে না, রাধারই কাছে কৃষ্ণের মন পড়ে আছে। অন্য রমণীর সঙ্গে রাজসম্পদের মধ্যেও কৃষ্ণ বৈরাগীর মত দিন কাটাচ্ছেন। রাধার বিরহে দ্বারকার কৃষ্ণের এই অবস্থার বর্ণনা—আমরা ইতিপূর্বেই উমাপতিধরের শ্লোকে পেয়েছি। কিন্তু সেখানে কৃষ্ণের হৃদয়ের আর্তি ও নিদারুণ শূন্যতার করুণ সুর এমন করে বেজে ওঠে নি। কৃষ্ণের 'সো ফিরে বিছুরণ যায়'—দেহাতিরিক্ত অন্য কোন বেদনারই অনুরণন তোলে। এই একটিমাত্র পদে বিদ্যাপতি যে কৃষ্ণকে এঁকেছেন—তাতে বোঝা যায় কৃষ্ণের কামনায়, দেহসম্ভোগে হৃদয়েরও স্পর্শ ছিল। না হলে বিগত দিনের উল্লাস উতরোল রভসরজনীর নানা স্মৃতিকে রাজসম্পদের মধ্যে এবং অন্য রমণীর সান্নিধ্যে ভুলে যেতে তাঁর দেরি হত না। রাধাকে ছাড়া প্রাচুর্যের মাঝখানেও কৃষ্ণের দিনরাত এমন নিরর্থক হয়ে উঠত না। এই কৃষ্ণ কেবল কামকলানিপুণ ভোগী রাজ-পুরুষেরই প্রতীক নন, তিনি চিরন্তন প্রেমিকও। নাগরিক জীবনের সমস্ত কৃত্রিমতা ও প্রাচুর্যকে অতিক্রম করে প্রেমের স্পর্শ হৃদয়ে যে চিরচিহ্ন এঁকে দিয়ে যায়, সেই সত্যকে ধারণ করেই বিদ্যাপতি শিল্পীর শাশ্বত লোক লাভ করেছেন।

এখানেও বিদ্যাপতির কৃতিত্ব। বিচ্ছিন্ন পদরচনা করেও তিনি তাঁর কৃষ্ণকথাকে একটি কাহিনীর রস পরিণতি দানে সক্ষম হয়েছেন। এই পদগুলির পারম্পর্যযুক্ত সন্নিবেশকে তাই গীতিনাট্যের বৈশিষ্ট্যযুক্ত বলা যায়। শুধু তাই নয়, রাধা চরিত্রের মত এখানে কৃষ্ণচরিত্রেরও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণ বারবার রাধার কাছে নিজের ঈশ্বরত্ব ঘোষণা করেও কেবলমাত্র দেহলোলুপ রিরংসাগ্রস্ত এক অভব্য গ্রাম্য যুবক। কিন্তু বিদ্যাপতির কৃষ্ণ কোথাও রাধার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিজের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করতে চান নি। অথচ শেষ পর্যন্ত নিজেকে বিশ্বস্ত প্রেমিক বলে প্রমাণ করেছেন। তিনি দূতীকে বলেছেন—

দুই এক দিবসে নিচয় হম আওব
তুহু পরবোধবি রাঈ।[২৫৯]

এই সান্ত্বনা দানের অনুরোধে, ফিরে আসার প্রতিশ্রুতিতেই কৃষ্ণ প্রেমিক-পুরুষ।

কৃষ্ণের এই আশ্বাসেই আনন্দিতা রাধা নিজের দেহকে মঙ্গল বেদী করে কৃষ্ণের আগমনের অপেক্ষা করেছেন। (পদটিকে ভাবোল্লাসের অথবা মাথুরের শেষ পর্যায়ের পদ বলা যায়। আমরা পদটিকে মাথুরের শেষ পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত করেছি।) ভাবলোকে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আনন্দে উচ্ছলা রাধার চিত্রও কবি এঁকেছেন। এই ভাবোল্লাসের বর্ণনা জয়দেবের গীতগোবিন্দে অথবা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নেই। বিদ্যাপতির পদেই বিরহিণী রাধা কল্পনা করেছেন যে কৃষ্ণ তাঁর কাছে ফিরে এসেছেন। এই ভাব-সম্মিলন প্রকৃতপক্ষে বিরহ অবস্থারই একটি বিশিষ্ট মানসিক পর্যায়। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রত্যাশা নিশ্ছিদ্র বিরহের অন্ধকারে খাদ্যোতের মত জ্বলতে জ্বলতে অকস্মাৎ বাসনার অনুরূপ মিলনের চেতনাকে এমনভাবে বিস্ফারিত করে তোলে, যেখানে বাস্তব মিলন নয়, কল্পনার মিলনই ভাবসৌন্দর্যে বাস্তব মিলনের সৌন্দর্যকে ছাড়িয়ে যায়। বিরহিণীর প্রেমতন্ময় অবস্থার এ এক অপূর্ব মানস বিকাশ। বিদ্যাপতির হাতে প্রেমমনস্তত্ত্বের এই শিল্পিত রূপায়ণ সম্ভবত তার সৌন্দর্যের দাবীতেই উত্তরকালের বৈষ্ণবশাস্ত্রকারদেরও স্বীকৃতি আদায় করেছিল। কিন্তু সেই স্বীকৃতি অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলোকে বিরহোত্তর মিলনের যাথার্থ্য প্রতিপাদী সম্ভোগ শৃঙ্গারের অন্তর্গত।

ভাবসম্মিলনে আনন্দিতা বিদ্যাপতির রাধা বলেন—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখ চন্দা।[২৬০]

রাধা আজ নিজের জীবন যৌবনকে সফল মনে করেছেন। যে রাধা একদিন কৃষ্ণবিরহে দশ দিকই শূন্য দেখেছিলেন, তাঁর কাছে আজ দশ দিকই আনন্দময় মনে হয়েছে। রাধা নিজের দেহকে আজ দেহ বলে মানলেন, নিজের গৃহ আজ তাঁর কাছে এতদিন পর গৃহ। তাঁর শরীরী অস্তিত্বই অনর্থক মনে হয়। গৃহবাসের মধ্যে শুধু নিরাপত্তাই থাকে না, থাকে প্রিয়জনের সান্নিধ্যে থাকার আনন্দ। কৃষ্ণকে ছাড়া রাধা সেই গৃহবাসের আনন্দও পান না। এতদিন বিধাতা যেন রাধার প্রতি নির্দয় ছিলেন, এখন অনুকূল হলেন। কৃষ্ণের প্রেম সম্পর্কে রাধার যে সংশয় ছিল—তা এতদিনে ঘুচল। একদা বসন্তের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃষ্ণবিরহিণী রাধার মনে কৃষ্ণের বিরহবেদনা জাগ্রত করে তাঁকে দুঃখ দিচ্ছিল। কিন্তু রাধা এখন আর কোকিলের কুহু তান, চন্দ্রের কিরণ, মলয় পবন অথবা মদনের পঞ্চবাণ—কোন কিছুকেই ভয় পান না। কারণ তিনি আজ কৃষ্ণকে কাছে পেয়েছেন। ভাববৃন্দাবনে কৃষ্ণবিরহিণী এই রাধার প্রেমগভীরতা এবং কৃষ্ণ-সর্বস্বতাও কবিকে বিস্মিত করে। কবি তাই বলেন—'ধনি ধনি তুয়া নব লেহা।"

আবার কখনও রাধা সখীকে সম্বোধন করে বলেন, তাঁর আনন্দের সীমা নেই। কারণ মাধব চিরদিনই তাঁর গৃহে অবস্থান করছেন।[২৬১] রাধাকে যদি কেউ আঁচল ভরে মহারত্ন দান করে তবুও তিনি তাঁর প্রিয়তমকে আর দূরদেশে পাঠাবেন না। প্রিয়তম তাঁর বস্ত্রাচ্ছাদন, গ্রীষ্মের শীতল বাতাস, বর্ষাকালের ছত্র আর অকূল সমুদ্রের তরণী। এখানেও রাধার একাগ্র তন্ময় কৃষ্ণপ্রেমের অপূর্ব ব্যাখ্যা ভাবসম্মেলনের পদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। জীবনের সমস্ত প্রয়োজনের মতই কৃষ্ণ তাঁর কাছে অপরিহার্য, তাঁর জীবন যাপনের ও জীবনধারণের অনন্য উপায়।

অবশেষে প্রার্থনার পদ। প্রার্থনার পদে রাধাকৃষ্ণ লীলার বর্ণনা নেই। কবি কখনও

তাঁর ইষ্টদেবতা শিবের কাছে, আবার কখনও বা মাধবের কাছে সকরুণভাবে নিজের ভোগ-ক্লিষ্ট, তাপদগ্ধ জীবনের আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। কখনও বার্দ্ধক্যজীর্ণ কবি তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে এসে নিজের নারীলুব্ধতার জন্য নিজেকে তিরস্কার করেছেন। যৌবনের ভোগপ্রমত্ত দিনগুলির অবসানে বার্দ্ধক্যের নির্বীর্যতার প্রতি নিজেই ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। [২৬২] সব শেষে কবি বলেছেন হরিহরের পদপঙ্কজ সেবা করলে আর বার্ধক্যের অবসাদ থাকবে না। কখনও অনুতপ্ত কবি বলেন, দেবসেবা ভুলে গিয়ে তিনি বাণিজ্য করলেন, কিন্তু মন্মথচোরই তাতে লাভবান হল। অর্থাৎ বিপুল অর্থ উপার্জন করলেও সে সমস্তই রমণীর জন্য বিসর্জন দিলেন। যদি মাধব-ধন নিয়ে ব্যবসা করতেন, তবেই লাভ হত। [২৬৩] জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে কবি বুঝেছেন পুত্র, বালক, সহোদর, বান্ধব—সবাই তাঁকে প্রতারণা করেছে। অনুতপ্ত কবি নিজের পাপকর্মও অকাতরে স্বীকার করে শিবের চরণে শরণাগতি প্রার্থনা করেছেন।[২৬৪] রাজসভার ঐশ্বর্যআবিল পরিবেশ কি ভাবে কবিকে চরিত্রভ্রষ্ট করেছিল এখানে যেন তারই একটি আভাস পাওয়া যায়।

মাধবের প্রতি নিবেদিত 'মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়'[২৬৫] মৈথিল ভাষায় রচিত মাধব স্তোত্র। জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে কবি আর ঐশ্বর্য সম্পদ চান নি, তিল তুলসী দিয়ে নিজ দেহকে তাঁর কাছে সমর্পণ করেছেন। দোষগুণ বিচার করতে বসলে তাঁর মধ্যে গুণের লেশমাত্রও পাওয়া যাবে না—একথা কবি সবিনয়ে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তবুও তিনি জানেন জগন্নাথ তাঁকে গ্রহণ করবেন, কারণ তিনি তো ঈশ্বরের জগতেরই অন্তভুক্ত। কবি বলছেন কর্মবিপাকে তাঁকে বারবার পৃথিবীতে যাতায়াত করতে হবে। হয়তো কখনও তিনি মানুষ হবেন। কিন্তু তাঁর মন যেন মাধবের সঙ্গেই থাকে। এই বিপুল ভবসিন্ধু পার হওয়ার জন্য বিদ্যাপতি তাই অত্যন্ত কাতর চিত্তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন। তাঁর পদপল্লবের এক তিলও যেন তিনি লাভ করেন। পূর্ববর্তী পদগুলিতে জীর্ণ বার্ধক্যের প্রতি, যৌবনের অদম্য ভোগস্পৃহার প্রতি যে তীব্র ঘৃণা এই পদে তা অনুপস্থিত। সেখানে একটিতে প্রার্থনা শিবের কাছে, অপরটিতে মাধবের কাছে। কিন্তু আত্মনিবেদনে নম্র এই পদটি মাধবের চরণেই সমর্পিত। কবি এখানে শান্ত ভক্তিরসের পূজারী। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পূর্ববর্তী, তাই মাধব তাঁর কাছে পরম ঐশ্বর্যময় জগন্নাথ। জয়দেবের কাব্যেও আমরা 'দিনমণিমণ্ডল মণ্ডন, ভবভয়ভঞ্জন' কৃষ্ণের বন্দনা পাই। কিন্তু সেখানে ব্যক্তি জয়দেবের নয়, সমষ্টির জন্য কবির ভক্তিময় প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে 'তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু'।[২৬৬] বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে অনাবৃত দেহসম্ভোগ বর্ণনা, আছে রাধাবিরহে সমাজসংসারত্যাগিনী রাধার শরণাগতির আর্ত হাহাকার—"আনাথী নারীক সঙ্গে নে"।[২৬৭] কিন্তু সেখানে কবির এই শরণাগতি তো দূরের কথা ভক্তিপ্রাণতারই কোন ইঙ্গিত নেই। অন্যদিকে বিদ্যাপতির এই প্রার্থনা পদে জীবনের অন্তিম প্রান্তে, অবসন্ন পরমায়ুর প্রহরে ব্যথারক্তিম গোধুলি আলোর করুণ বিষণ্নতা। তাঁর রাধা দেহকে পূজাবেদী করে মাধবের অর্চনা করেন। তাঁর বেদনার অশ্রুসরোবরে ফুটে থাকে তপস্যার অমেয় লাবণ্য। ঠিক তেমনি করে এই কবিও তাঁর সুখদুঃখ, ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও পাপ-পুণ্য নিয়ে শরণাগত, দীনও আর্ত চিত্ত নিয়ে পরিত্রাণপরায়ণ মাধবের চরণে আপন সত্তাকে পূজাপুষ্পের মত অঞ্জলি দিয়েছেন। রাজসভার ভোগখিন্নতা, ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার উত্থান পতনের বাস্তব

অভিজ্ঞতা এবং তাঁর পূর্বপুরুষের ত্যাগনম্র জীবনাগ্রহের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার—এই সব কিছু মিলে গড়ে উঠেছে বিদ্যাপতির এই কবিসত্তা।

'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম' পদটিতেও কবির সেই অনুতাপ, আত্মনিবেদনের একান্ত আকুতি।[২৬৮] এখানে কবির অনুতাপের এবং বেদনার সুর আরও তীব্র। তপ্ত বালুকা বেলায় একবিন্দু জল যেমন কোন চিহ্ন রেখে যায় না, ঠিক তেমনি করে যৌবনের আনন্দ উচ্ছল প্রহরে কবি ব্যস্ত ছিলেন 'সুত-মিত রমণী' নিয়ে। তখন মাধবের প্রতি ভক্তি নিতান্ত ক্ষীণ বারিবিন্দুর মতই বিলুপ্ত। তাই কবির মনে হচ্ছে তাঁর পরিণামে অকূল নৈরাশ্য ছাড়া আর কিছুই নেই। মাধব জগতের ত্রাণকর্তা, দীনের প্রতি দয়াময়, তাই অন্তকালে কবি তাঁরই ওপর বিশ্বাস রেখেছেন। এখানেও কবির ঐশ্বর্যভাবযুক্ত শান্ত রসের কৃষ্ণ আরাধনা তাঁকে নিশ্চিতভাবে চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের কবিরূপেই আমাদের সামনে তুলে ধরে। কবি বলছেন অর্ধেক জন্ম তিনি নিদ্রায় কাটালেন, শৈশব আর পরিণত বার্ধক্যের সময়ও তাঁর দিন প্রায় অচেতনভাবে কাটল, যৌবনে তিনি মেতে উঠলেন 'রমণী রস রঙ্গে।' এর মাঝখানে তাঁর হরিভজনার সময় কোথায়? আজ তাই জীবনের উপান্তে এসে মাধবের পরম ঐশ্বর্যময় রূপকে কবি স্মরণ করেছেন। কত ব্রহ্মা লীন হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু হরির আদিও নেই আর পর্যাপ্তিও নেই। সমগ্র সৃষ্টি তাঁর মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে, আবার তাঁর মধ্যেই লীন হয়ে যায়। তাই বিদ্যাপতি বলছেন শেষ শমনের ভয়ে কৃষ্ণছাড়া তাঁর আর গতি নেই। কারণ তিনিই আদি অনাদির নাথ, এই পৃথিবীর জ্বালাময় জীবন থেকে তারণ করার ভার তাঁরই। বিদ্যাপতির এই প্রার্থনার পদেও ঈশ্বরের বিরাট রূপ এবং একই সঙ্গে তাঁর পরমকারুণিক রূপের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তিনি শৈব অথবা পঞ্চোপাসক—সে তর্কে যাওয়ার আগে বলা যায়, এখানে তিনি সর্বদেবতার ঊর্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারূপেই মাধবের বন্দনা করেছেন। তাই এই পদটি পড়ে কেউ তাঁকে পরম ভাগবত বলেও অভিহিত করতে পারেন।

কিন্তু বিদ্যাপতি তাঁর পদে শিবের কাছেও প্রার্থনা জানিয়েছেন, বন্দনা করেছেন গঙ্গার। তাই তাঁকে আমরা কেবল বৈষ্ণব কবি বলতে পারি না। তাঁর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদের নায়ক-নায়িকা আসলে লৌকিক প্রেমেরই নায়ক-নায়িকা। বিদ্যাপতির পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কিত যে সমস্ত পদ আছে, সেগুলি ছাড়া লৌকিক নায়ক-নায়িকাকে নিয়ে লেখা পদের সংখ্যাই বেশী। এবং উভয় ধরনের পদের প্রেমলীলার বৈশিষ্ট্যও একই ধরনের। সুতরাং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলীর সাক্ষ্যে তাঁকে বৈষ্ণব বলা যায় না।

তিনি তাঁর প্রার্থনার পদে হরি এবং হর—একসঙ্গে দুজনেরই বন্দনা করেছেন,[২৬৯] হরি এবং হর যে মূলত অভিন্ন, তাও তিনি বলেছেন,[২৭০] আবার কোনও কোনও সমালোচকের মতে বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন। কারণ, প্রথমত তাঁর শিব বিষয়ক প্রার্থনা পদ মাধব বিষয়ক প্রার্থনা পদের তুলনায় অনেক বেশী। এ ছাড়াও কবির কৃষ্ণমূলক পদের ভণিতায় ভক্তিভাবের বিকাশ তত লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু শিব বিষয়ক পদের অধিকাংশ ভণিতাতেই ভক্তিভাবের প্রকাশ। রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদের ভণিতায় কবি প্রত্যক্ষভাবে নিজের ভক্তি বা প্রার্থনার কথা বলেন নি। কিন্তু শিববিষয়ক পদে নিতান্ত অল্প হলেও দেখা যায়, ভণিতায় কবির প্রত্যক্ষ ভক্তিচেতনার বিকাশ ঘটেছে।[২৭১] আবার কিছু কিছু পদে কবি শিবকে অন্য সব দেবতার তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলেছেন। একটি পদে বলা

হয়েছে মহেশ্বর ছাড়া অন্য কোন দেবতা নেই।[২৭২] মাধবকেও সব দেবতার তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কিন্তু মাত্র একবার। সুতরাং বিদ্যাপতি শৈবই ছিলেন। বাংলা দেশে তাঁর রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদের সমাদর বেশী এবং মিথিলার অধিবাসীরা তাঁকে শৈব বলেই দাবী করেন। আবার শিবসিংহের রাজত্বকালেই কবি অসুরবিনাশিনী দুর্গার বন্দনা করেছেন.[২৭৩] এছাড়া বিদ্যাপতির গঙ্গাবিষয়ক পদের কথা আগেই বলা হয়েছে। রামসীতাকে নিয়েও কবি পদরচনা করেছেন। অন্যদিকে রাজা শিবসিংহেরই রাজত্বকালে গোরক্ষবিজয় নাটক লিখেছেন। অর্থাৎ মুসলমান প্রভাব প্রতিরোধে হিন্দু সমাজকে পুনর্গঠিত করার জন্য কবি সব ধরনের হিন্দু দেবদেবীকেই তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন এমন অনুমান হয়তো অযথার্থ নয়।

বিদ্যাপতির অন্যান্য গ্রন্থের সাক্ষ্য নিলে দেখা যায়, একদিকে তিনি ভাগবতের পুঁথি নকল করেছিলেন, অন্যদিকে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী, শৈবসর্বস্বহার এবং গঙ্গাবাক্যাবলী ইত্যাদিও রচনা করেছিলেন। সুতরাং শিবভক্তির দিকেই পাল্লাভারী। তাই বিদ্যাপতির সমগ্র বিদগ্ধ সৃষ্টির সাক্ষ্যেও আমরা তাঁকে শৈবই বলবো। কালিদাসের প্রিয় দেবতা ছিলেন শিব। কিন্তু কালিদাস শিবভক্ত হয়েও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই তিনজনকেই সমান মর্যাদা দিয়েছেন। অনুরূপভাবেই বিদ্যাপতিও মাধব এবং মহেশ্বরকে একই দেবতার বিভিন্ন রূপ বলে অভিহিত করেছেন—

> ভল হর ভল হরি ভল তুঅ কলা।
> খন পিত বসন খনহি বঘছলা॥
> খন পঞ্চানন খন ভুজচারি।
> খন সঙ্কর খন দেব মুরারি।[২৭৪]

একই দেবতা কখনও গোকুলে গাভী চরান, আবার কখনও বা ডমরু বাজিয়ে ভিক্ষা করেন. কখনও কৃষ্ণ হয়ে বৃন্দাবনে মহাদান গ্রহণ করেন, আবার কখনও ভস্ম মেখে কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি গ্রহণ করেন। কৃষ্ণকথার আলোচনাতেও এই পদটির গুরুত্ব আছে বলা যায়। প্রথমত এখানে পরোক্ষভাবে হলেও দানলীলার লৌকিক প্রসঙ্গটির উল্লেখ আছে, দ্বিতীয়ত. চতুর্দশ, পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে দেবতা হিসেবে শিব এবং বিষ্ণু অভিন্ন অস্তিত্বের রূপভেদ হিসেবে চিত্রিত হচ্ছেন এবং একই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

বিদ্যাপতির পদে কোন্ দেবতার কতবার উল্লেখ ঘটেছে কিংবা শিববিষয়ক পদের ভনিতা আর মাধব বিষয়ক পদের ভণিতায় ভক্তিনিবেদনের কতটা মাত্রাগত হেরফের ঘটেছে. এসব পরিসংখ্যানগত তত্ত্বপদ্ধতির প্রয়োগ করে আমরা ব্যক্তিকবির ধর্মবিশ্বাসের সন্ধান করতে গেলে হয়তো কিছুটা নিরাশই হব। আসলে শিব ও মাধবের প্রতি অনুরক্ত পৃথক অস্তিত্বময় জনগোষ্ঠীর সামনে বিদ্যাপতির কবি চেতনা যে সংশ্লেষধর্মী শিল্প-সূত্র স্থাপন করল বিদ্যাপতির শিল্পী ব্যক্তিত্ব সন্ধানে তারই গুরুত্ব অপরিসীম। সমকালীন সামন্ততান্ত্রিক ধর্মনির্ভর সমাজে সাংস্কৃতিক সংশ্লেষসাধকের শিল্প সাফল্যই সেদিন বিদ্যাপতিকে হিন্দু সামন্ত শ্রেণীর স্বার্থসাধক যে ব্যক্তিত্ব দিয়েছিল, তাতে শিব ও মাধব সংশ্লিষ্ট হয়ে বিদ্যাপতির প্রতিভার মতোই তাঁর ধর্মবিশ্বাসের স্বভাবেও অপূর্ব শিল্প নির্মাণক্ষম চরিত্র যুক্ত করেছিল ; তাকে প্রচলিত বাঁধাধরা ছকের মধ্যে খুঁজতে যাওয়াটাই নৈরাশ্যের কারণ হবে।

একদিকে পদাবলী রচয়িতা, অন্যদিকে হিন্দুধর্মের সংরক্ষণ প্রয়াসী স্মার্ত পণ্ডিত—স্রষ্টা বিদ্যাপতির এই দুটি সত্তারই বিকাশ ঘটেছে রাজসভার পরিবেশে। বিদ্যাপতি মিথিলা-রাজসভার কবি। তাঁর কাব্য, স্মৃতিগ্রন্থ, দেব মহিমা প্রচারমূলক রচনা—সবই রাজদাক্ষিণ্যের প্রশ্রয়পুষ্ট। কীর্তিলতা ও কীর্তিপতাকা নামক দুটি রাজ প্রশস্তি কাব্য প্রত্যক্ষভাবেই মিথিলার রাজসভার সঙ্গে বিদ্যাপতির যোগাযোগের পরিচয়ই বহন করে। এছাড়াও কবি তাঁর লৌকিক নায়ক-নায়িকার প্রেম সংক্রান্ত পদাবলী, ঋতুবিষয়ক পদাবলী এবং আমাদের আলোচ্য কৃষ্ণকথামূলক পদাবলীর মধ্যেও রাজসভার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্বাক্ষর ফুটে উঠেছে। প্রেম ও সৌন্দর্যের রূপকার কবি বিদ্যাপতির বহু পদেরই ভণিতায় বিভিন্ন রাজার নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে আবার রাজা শিবসিংহের নামই বেশীরভাগ রাজনামাঙ্কিত পদে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির বসন্ত ঋতু বিষয়ক যে পদগুলি আছে, সেখানে কবি বসন্তকে রাজারূপে কল্পনা করেছেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দে এর আভাস মাত্র আছে। কিন্তু বিদ্যাপতি বিস্তৃত ভাবেই বসন্তের রাজমহিমা বর্ণনা করেছেন। বসন্তের আগমনে কবি বলেন—

আএল ঋতুপতি-রাজ বসন্ত।

* * *

নৃপ-আসন নব পীঠল পাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ ॥[২৭৫]

এবং শেষ পর্যন্ত—'নব বৃন্দাবন রাজবিহার।' এখানে 'বৃন্দাবন' শব্দে কৃষ্ণলীলারই অনুষঙ্গ এসেছে এবং এক্ষেত্রে কবি জয়দেব থেকেও ঋণ গ্রহণ করেছেন বলা যায়। কিন্তু বসন্তের এই পরিপূর্ণ রাজরূপ, শীতের সৈন্যদলকে পরাজিত করে রাজা বসন্তের আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি চিত্রকল্প কবির রাজসভানুষঙ্গ জাত কিনা সে সম্পর্কে আমাদের ভাবিয়ে তোলে। বসন্ত ঋতুর আর একটি পদেও রাধাকৃষ্ণ লীলার আভাস এবং সেখানেও নাগরিক প্রেমই বর্ণিত।[২৭৬] 'মধু ঋতু মধুকর পাঁতি' পদটিতে রাজকীয় জীবনের আড়ম্বর পূর্ণ বসন্ত-উৎসবই প্রভাব ফেলে থাকতে পারে—

মধুর মৃদঙ্গ রসাল।
মধুর মধুর করতাল ॥
মধুর নটন-গতি ভঙ্গ।
মধুর নটিনী নটসঙ্গ ॥[২৭৭]

মৃদঙ্গ করতালের সঙ্গে সঙ্গে নর্তক-নর্তকীর মধুর নৃত্যে রাজসভার বসন্ত বিনোদন উৎসবের ছবিই যেন এখানে চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বিদ্যাপতির প্রেমকাব্যের নায়ক-নায়িকাও রাজ পরিবেশের নাগরিক-নাগরিকা। তাঁর বিভিন্ন পর্যায়ের রাধাকৃষ্ণ লীলার পদে শুধু যে রাজাদের নামই ভণিতায় আছে তা নয়, কাব্যের প্রকার এবং প্রকারণেও রাজসভার রসরুচিকে পরিতৃপ্ত করার প্রবণতা আছে। এটি আমরা রাধাকৃষ্ণ লীলার বিভিন্ন পর্যায় আলোচনার সময় দেখেছি। বয়ঃসন্ধি ও রূপানুরাগের পদে কৃষ্ণ শুধু কামনাতুর নন। তিনি সেইসঙ্গে সৌন্দর্যরসিকও। এই সৌন্দর্য উপভোগের ক্ষমতা রাজসভার পরিবেশে প্রাপ্ত নাগরিক রুচিরই প্রকাশ। প্রেমের বিচিত্র বিলাসবিভ্রম, নায়কের দেহসম্ভোগের নানা রীতি, বিপরীত রতির বিচিত্র বর্ণনা,—

সবই রাজসভার রসরুচিকে পরিতৃপ্ত করার জন্যই কবি বিদ্যাপতির শৃঙ্গার চর্চা। বিদ্যাপতির পূর্বরাগের পদে কৃষ্ণের রূপ বর্ণনার চেয়ে রাধার রূপ বর্ণনার অংশই বেশী। এর কারণ আগেই বলেছি ; রূপ-লোলুপ রাজপুরুষের দৃষ্টির সামনে কবি যেন নারীর অবগুণ্ঠিত সৌন্দর্যকে উন্মোচিত করেছেন। বিদ্যাপতির রাধাও রাজান্তঃপুরের বিলাস-বিভ্রম নিপুণা নায়িকা, তিনি ভাবতন্ময়া যোগিনী নন। তাই তাঁর শ্রীরাধার কৃষ্ণদর্শন প্রচেষ্টার নাগরিক চতুরালির পরিচয়। কখনও কৃষ্ণকে দেখার জন্য রাধা গলার মুক্তমালা ছিঁড়ে ফেলেন, আবার কখনও বা তিনি চোখ পায়ের দিকে রেখে সুকৌশলে কৃষ্ণকে দেখে নেন।

বিদ্যাপতির রাজনামাঙ্কিত পদগুলির মধ্যে সংখ্যায় সব চেয়ে বেশী হল মিলনের ও সখীশিক্ষার পদ। এগুলিতে নায়ক-নায়িকার উচ্ছল মিলনের যে আলংকারিক বর্ণনা আছে—তা রাজসভার রসরুচিকে পরিতৃপ্ত করার জন্যই। মান পর্যায়ে বহুচারী পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যথিতা নারীর ক্রোধ বর্ণিত। এখানেও বিদ্যাপতি পূর্ববর্তী সংস্কৃত কাব্যের নায়কের মানভঞ্জন রীতিকেই অবলম্বন করেছেন। সংস্কৃত কাব্য এবং নাটক রাজসভার জন্যই। জয়দেবের কাব্যও রাজসভায় রচিত। সেই একই ধারাপথে বিদ্যাপতিও মানিনী নায়িকার তীব্র ক্রোধ, নায়কের প্রত্যাখ্যান, নায়কের অনুনয় বিনয়, নায়িকার দুর্জয় বিমুখতা এবং অবশেষে সখী বা দূতীর সাহায্যে মিলনের বর্ণনা করেছেন। বিরহের পদেও বিদ্যাপতির আলংকারিক চাতুর্য রাজসভার আবহকেই তুলে ধরে। রাজা শিবসিংহের ভণিতায় রচিত একটি বিরহের পদে সখী রাধার অবস্থা কৃষ্ণের কাছে বর্ণনা করে বলেছে—

সরদক সসধর মুখরুচি সোপলক
হরিনকে লোচন লীলা।
কেসপাস লএ চমরিকে সোপল
পাএ মনোভব পীলা ॥[২৭৮]

বিরহিণী রাধা শরতের চাঁদকে তাঁর মুখশোভা, হরিণকে লোচনলীলা ও চমরীকে কেশদাম ফিরিয়ে দিলেন। রাধা দাড়িম্বকে দন্তশোভা, বান্ধুলিকে অধর রুচি ও বিদ্যুৎকে দেহকান্তি ফিরিয়ে দিলেন এবং কোকিলকে কণ্ঠস্বর দিয়ে দিলেন। এখানে বিরহিণী রাধার অবস্থা-দৈন্য বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর বেদনার চেয়ে কবি আলংকারিক চাতুর্যকেই বেশী প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছেন। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলীতে ধর্মের চেয়ে শিল্পই বড় হয়ে উঠেছে। ভক্তিতন্ময়তার পরিবর্তে রাজসভার রাজপুরুষদের মনোরঞ্জনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই প্রণয়ের বিচিত্র কুটিল রীতির ছবি ফুটিয়ে তোলাই তাঁর আকাঙ্ক্ষার বিষয়। মাঝে মাঝে রাধার রূপ বর্ণনা অথবা অভিসারিকা রাধার বর্ণনা দিতে গিয়েও কবি অতিরিক্ত অলংকার প্রয়োগে কাব্যকে নিষ্প্রাণ করে ফেলেছেন। যেমন—

হরিপতি হিত রিপু নন্দন বৈরী বাহন ললিমগমনী
দিতি নন্দন রিপু বিনন্দ নন্দন নাগরিরূপে সে অধিক রমণী ॥[২৭৯]

পদটিতে রাধার রূপের মাধুর্য বিন্দুমাত্র প্রকাশিত হয় নি। বরং বুদ্ধির অতি চর্চায় এটি একটি দুর্বোধ্য প্রহেলিকা হয়ে উঠেছে। এই অতি আলংকারিকতার প্রতি মোহও রাজসভার পরিবেশ থেকেই এসেছে বলা যায়। তবে বেশীর ভাগ সময়ই তাঁর অলঙ্কার

সুপ্রযুক্ত। বয়ঃসন্ধির রাধার রূপকে কবি বলেন নব জলধরে বিদ্যুৎ রেখা, সযত্নরচিত পুষ্পমালা। এই অলঙ্কারের মধ্য দিয়েই তখন কবির চোখে দেখা রাধার দীপ্ত সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বর্ষারজনীর অভিসার বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বর্ষার যে চিত্ররূপ অঙ্কন করেন, সেই ছবিই বর্ষণমুখর রাত্রির অন্ধকার দুর্গম প্রতিকূলতাকে ফুটিয়ে তোলে। সুতরাং বলা যায় অলঙ্কার নির্মাণে বিদ্যাপতির এই একান্ত যত্ন কখনও তাঁর কাব্যশরীরে অঙ্গনা লাবণ্যের মাধুর্য সঞ্চার করেছে, আবার কখনও নিষ্প্রাণ কৃত্রিমতায় রাজসভার আবহকে মাত্র অনুবর্তন করেছে। বিদ্যাপতি তাঁর কাব্যে নানা ধরনের শব্দ ও অর্থালংকার ব্যবহার করেছেন। যেমন—অনুপ্রাস, যমক, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, স্বভাবোক্তি, অতিশয়োক্তি, দৃষ্টান্ত, প্রতিবস্তুপমা, নিদর্শনা, সমাসোক্তি, বিষম, ভ্রান্তিমান প্রভৃতি। এছাড়াও তাঁর পদাবলী প্রবাদবাক্যে, সুভাষিত সহযোগে দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

অনেক সময় বিদ্যাপতি প্রত্যক্ষভাবেই তাঁর পদের ভণিতায় রাজার চাটুকারিতা করেছেন। কোন কোন পদে তিনি রাজা শিবসিংহকে বলেছেন "একাদস অবতারা।"[২৮০] স্বপ্নে রাধা নন্দকুমারকে দেখেছেন। ভণিতায় কবি বলছেন, আসলে তিনি শিবসিংহকেই দেখেছেন, কিন্তু মনের ভ্রমে কানু কানু করছেন—

সিব সিংঘ রায় তোরা মন জাগল
কাহ্ন কাহ্ন করসি ভরমে ॥[২৮১]

এই অতিরঞ্জিত চাটুকারিতা রাজপ্রসাদজীবী বিদ্যাপতিরই পরিচয় বহন করছে।

প্রার্থনার পদে বিদ্যাপতির যে ক্লান্তি ও হতাশা, নিজের ভোগপ্রমত্ত যৌবন রসোচ্ছল দিনগুলির জন্য কখনও অনুতাপ, কখনও আর্তি— তা-ও মনে হয় রাজসভার ঐশ্বর্য আবিল পরিবেশেরই ফলশ্রুতি। বলা যায় বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ লীলাকথার মধ্যেই শুধু নয়, সমগ্র শিল্পীব্যক্তিত্বের মধ্যেই রাজমনোরঞ্জনের প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে রাজসভা-পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এসবের উর্দ্ধেও বিদ্যাপতির বড় পরিচয়—তিনি জীবন রসিক কবি। তাই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে দেহকামনার উর্দ্ধলোকচারী মানুষের অন্তরঙ্গ সত্তার পরিচয়ও ফুটে উঠেছে। তাঁর কাব্য যেন একদিকে রাজসভার অলঙ্কৃত ঐশ্বর্যের রত্নচ্ছটা, অন্যদিকে কবিমর্মের মৃণালে জীবন বেদনায় আন্দোলিত উর্ধ্বলোকের আলোক পিপাসু রক্তকমল। তাই দেহ এবং দেহাতীত, মর্ত্য এবং অমর্ত্যের মিলন সম্পাদনে বিদ্যাপতি যেন মৃৎপ্রোথিত কৈলাসে চন্দ্রচূড়।

জীবনের যে সত্য বাইরের দেশকালের চিহ্নকে ধারণ করে বিচিত্র, গ্রাম আর নগর-জীবনের অবয়বে যে সত্যের বৈচিত্র্যময় রূপ উদ্ভাসিত, বড়ু চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতির কাব্য উভয়ে মিলে যেন বাংলা কৃষ্ণকথার অবয়বে সেই বৈচিত্র্যের পূর্ণতা। মানব জীবনের নিত্য স্বরূপের এই বৈচিত্র্যময় তথ্যরূপকে ধারণ করে কৃষ্ণকথার সামগ্রিক পরিচয় যেন গ্রাম-নগরের ব্যাপক পরিধিতে বিকশিত হয়ে ওঠা জীবনেরই বিকাশ। ব্যাপ্তির এই পূর্ণতার সঙ্গে জীবনের পূর্ণ গভীরতা যুক্ত হলেই বাংলা কৃষ্ণকথা হয়ে উঠবে অন্তরে বাহিরে মিলে পরিপূর্ণ জীবনের আর এক ভিন্ন অভিধা। চণ্ডীদাসের মধ্যেই দেখবো আমাদের সেই প্রত্যাশার পূর্তি।

চণ্ডীদাস

পদাবলীকার চণ্ডীদাসকে নিয়ে নানা বিতর্কের ধূম্রজাল এখনও বাংলা সাহিত্যের পরিমণ্ডল রহস্যের অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সেই অস্পষ্টতার আবরণ থেকে তথ্যভিত্তিক যে সত্যটুকু আবিষ্কার করা যায়—তার আলোকে আমরা বলতে পারি—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস এবং পদাবলীকার চণ্ডীদাস পৃথক ব্যক্তি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। পদাবলীকার চণ্ডীদাস একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যিনি চৈতন্যপূর্ববর্তী—তিনিই বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনার বিষয়। এ ছাড়াও আছেন চৈতন্য পরবর্তী দীন চণ্ডীদাস ও সহজিয়া চণ্ডীদাসগণ। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আগে যে পদরচয়িতা চণ্ডীদাসকে পাওয়া যাচ্ছে—তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি। তাঁরও আগে চতুর্দশ শতাব্দীতে এক চণ্ডীদাসের উল্লেখ পাওয়া যায় বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্য-দর্পণের চতুর্থ পরিচ্ছেদে। এ ছাড়া 'ধ্বনি-সিদ্ধান্ত' ও 'কাব্য প্রকাশ ব্যাখ্যা' নামক গ্রন্থরচয়িতা আর এক চণ্ডীদাসকেও পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং চণ্ডীদাস নামধারী বহু ব্যক্তিকেই পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের মধ্যে অন্ততঃ চার পাঁচজন পদরচয়িতা ছিলেন। ড. বিমানবিহারী মজুমদার একুশখানি প্রাচীন পুঁথি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর পাঁচটি মুদ্রিত পদাবলী সংকলন থেকে আহরণ করে ১২০টি পদকে নিশ্চিতভাবে চৈতন্যপূর্ব চণ্ডীদাসের রচনা বলে স্থির করেছেন। এ ছাড়া আরও কিছু পদকে তিনি চণ্ডীদাসের পদ হিসেবে ধরেও কিছুটা সংশয়ের মধ্যে রেখেছেন। আমরা এই দুধরনের পদকেই আমাদের আলোচনার জন্য প্রধানত গ্রহণ করেছি।

চণ্ডীদাস সহজতম ভাষায় প্রেমের গভীরতম আনন্দ-বেদনার রূপকার। চৈতন্য-পূর্ববর্তী কৃষ্ণকথা সাহিত্যে জয়দেবের নিত্যলীলা আর বিদ্যাপতির বিস্তৃত কৃষ্ণলীলা বর্ণনায় যে পরিশীলিত নাগরিকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—চণ্ডীদাস তার বিপরীত, তিনি গ্রামীণ কবি। কিন্তু তাঁর গ্রামীণতা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গ্রাম্যতা হতে পৃথক। বাংলার পল্লীজীবনের রূপ, রং ও রস, তার বর্ণবিরল সহজ প্রগাঢ় শ্যামলিমা নিয়ে চণ্ডীদাসের পদে উপস্থিত। চণ্ডীদাসের কাব্য রাধাময়। তাঁর 'গোরোচনা গোরী' রাধাও বাংলা দেশেরই এক লোকগঞ্জনাভীতা কুলবধূ। কিন্তু তাঁর অসাধারণত্ব তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের অসাধারণ মহিমায়। চণ্ডীদাসের পদাবলীর সমস্ত পর্যায়েই ছড়িয়ে আছে এই কৃষ্ণপ্রেমেরই জন্য রাধা হৃদয়ের ব্যাকুল আর্তি আর গভীর যন্ত্রণা। সামন্ত সমাজের পটভূমিতে এক বাঙালী গৃহবধূর গণ্ডীবদ্ধ জীবনের নিরুপায় বন্দীত্বে, পরিবার পরিজনের অরণ্যে একাকিনী রাধা কখনও প্রেমের বেদনায়, কখনও গৌরবে, আবার কখনও বা নিজের দ্বিধান্দোলিত সত্তার ব্যাকুলতায় ব্যথাদীর্ণ। চণ্ডীদাসের সমগ্র পদাবলী যেন সেই রাধার হৃদয়-নিংড়ানো অশ্রুবিন্দু দিয়ে গাঁথা মুক্তমালা, ধূসর গোধূলির মত ম্লান, অসংজ্ঞেয় বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন। পূর্বরাগ থেকে মাথুর এবং অবশেষে নিবেদন—সর্বত্রই সেই মুক্তাবিন্দুর শুভ্রতা, সেই বিষণ্ণতার গোধূলি-ম্লান ছায়া।

বিদ্যাপতির নাগরিকা রাধা বয়ঃসন্ধির বিচিত্র স্তর অতিক্রম করে কৃষ্ণপ্রেমিকায় পরিণত হয়েছেন। বিদ্যাপতির রাধা অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার মত এতখানি অনিচ্ছুক নন। কিন্তু তাহলেও অপরিস্ফুট নারীহৃদয়ের প্রেম সম্পর্কে কৌতূহল, দ্বিধা, সংশয়—সমস্ত কিছুকেই কবি রূপায়িত করেছেন। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ বয়ঃসন্ধিস্থলে থমকে দাঁড়ানো

রাধার প্রতি সানুরাগ সৌন্দর্যমুগ্ধ দৃষ্টিপাত করেছেন। অন্যদিকে চণ্ডীদাসের পদে আমরা কৃষ্ণের রূপদর্শনে চকিত-বিস্ময়ে চমকিতা রাধাকেই দেখতে পাই। কৃষ্ণকে দেখে মুগ্ধা, চকিতা ও বিস্মিতা রাধার প্রতিক্রিয়া কবি চমৎকার ভাবে প্রকাশ করেছেন। যমুনায় জল আনতে গিয়ে নীপতরুর মূলে কৃষ্ণকে দেখে রাধার ধৈর্য বিলুপ্ত হয়। কৃষ্ণের মধুর হাসিতেও রাধার প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়—

জাতিকুল শীল সব তিয়াগিঞা
হইব কানুর দাসি।[২৮২]

কৃষ্ণদর্শনের পর রাধা এক মুহূর্তেই কৃষ্ণপ্রেমে এতই নিমজ্জিত হন যে—জাতি, বংশমর্যাদা, চরিত্রগৌরব—সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করেই তিনি কৃষ্ণের দাসী হতে পারেন। তাই চণ্ডীদাসের পদে পূর্বরাগ আর অনুরাগের পদ একাকার হয়ে গেছে। রাধার প্রেম পূর্বরাগের প্রথমেই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের নামান্তর। কৃষ্ণরূপ দর্শনে বিমুগ্ধা রাধার সীমাহীন বিস্ময়ও প্রেমের মুগ্ধতারই আর এক রূপ—

কোথা হইতে মেন এ রূপ লাবণ্য
আইল নন্দের ঘরে।[২৮৩]

রাধার আরও বিস্ময়—

শ্যাম গুণনিধি গঠিল যে বিধি
সে বিধি কেমনে জীল॥[২৮৪]

শুধু রূপ নয়, কৃষ্ণের গুণও রাধাকে কতখানি সম্মোহিত করেছে দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি তারই প্রমাণ।

রাধার পূর্বরাগ পর্যায়ে শুধু রাধার কৃষ্ণানুরাগ নয়, তারই সঙ্গে ফুটে উঠেছে গ্রাম বাংলার নানা লৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাসে ভরা অন্তঃপুরিকাদের ছবি। পূর্বরাগের রাধাকে দেখে সখীদের মনে হয় তাকে ভূতে পেয়েছে। আবার কেউ বলেন, রাধা চেতনা ফিরে পাবেন 'কালার গলার ফুলে'।[২৮৫] এই উক্তি থেকেই মনে হয়, এটি রাধার সখীদেরই উক্তি এবং রাধার মূর্চ্ছিত হওয়ার আসল কারণটুকুও তাঁরা ভালভাবেই জানেন। কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে গেলে রাধা সখীদের গলা ধরে কাঁদতে থাকেন। রাধার বাণীহীন ক্রন্দনের এই চিত্রটিতে তাঁর প্রেমের গভীর যন্ত্রণা এবং সেই যন্ত্রণাকেও আর একাকী বহন করতে না পারার নিরুপায়তাই প্রকাশ করে। বিদ্যাপতি এবং চৈতন্য পরবর্তী গোবিন্দদাস উভয়েই পূর্বরাগের রাধার এই অবস্থা নিয়ে পদ রচনা করেছেন। সখীদের ভূমিকা চণ্ডীদাসের পদেও অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই পূর্বরাগে বিচলিতা রাধার অবস্থা দেখে হিতাকাঙ্ক্ষিণী সখীরা 'সতী কুলবতী' বলে খ্যাত রাধাকে সাবধান করে দিতে চান। রাধার অবস্থা চণ্ডীদাসের বড়াইকেও চিন্তিত করে তোলে, রাধা যে 'বড়ুয়ার বধূ', সেইটিই রাধাকে তাঁরা মনে করিয়ে দেন। স্নেহশঙ্কিতা বড়ায়ির রাধার জন্য চিন্তা বাংলাদেশের গ্রাম্য পরিবারের এক বয়স্কা পিতামহীর কথাই মনে করিয়ে দেয়—

সোনার নাতিনী এমন যে কেনি
হইলা বাউড়ী পারা।
সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা॥[২৮৬]

এই বড়ায়ির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বড়ায়ির মিল এবং অমিল দুই-ই আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ায়ি কৃষ্ণের দূতী এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন সহায়িকা। কিন্তু পদাবলীকার চণ্ডীদাসের বড়ায়ি রাধার প্রেমের কথা জানলেও প্রেমসহায়িকা বলে তাকে মনে হয় না। বরং এই অবৈধ প্রেমের জন্য তিনি রাধাকে তিরস্কার করেন। এইভাবে গুরুজন ও সখীজন উভয়েরই গঞ্জনায় রাধার কৃষ্ণপ্রেম ম্লান তো হয় না—বরং আরও প্রগাঢ় গভীর হয়ে ওঠে! কৃষ্ণপ্রেমতন্ময়া রাধা পরিবার পরিজনের ভীতি এবং লোকনিন্দার বহু ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হয়ে পরিণত হন সাধিকা যোগিনীতে। মরমিয়া কবি চণ্ডীদাসের আপন ভক্ত ও প্রেমিক হৃদয়ের মর্মস্থল-নিংড়ানো ভালবাসার রঙে আঁকা সেই রাধা—

বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারু কথা ॥

* * * *

আউলাইয়া বেণী ফুলেতে গাঁথনী
দেখয়ে খসাইয়া চুলি।
হসিত বদনে চাহি মেঘপানে
কি কহে দুহাত তুলি ॥[২৮৭]

শ্রীরূপ উজ্জ্বলনীলমণিতে ব্যভিচারীর উদাহরণ দিতে গিয়ে পদ্যাবলীর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—

আহারে বিরতিঃ সমস্ত বিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃপরা
নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ।
মৌনঞ্চেদমিদঞ্চ শূন্যমখিলং যদ্বিশ্বমাভাতি তে
তদ্ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিংবা বিয়োগিন্যসি ॥[২৮৮]

পদটি শ্রীরূপের নয়, কোন এক অজ্ঞাতনামা কবির। কৃষ্ণকথায় চৈতন্য পূর্বকালেই এই ভাবটি যে গভীর আস্বাদনের বিষয়বস্তু হয়েছিল, সংস্কৃত ও বাংলা রচনায় তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

'ঘরের বাহির দণ্ডে শতবার' পদটিতে[২৮৯] রাধা বারবার ঘরের বাইরে আসেন। তাঁর মন অস্থির, নিশ্বাস দ্রুত। তিনি বারবার কদম্বকাননের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। অন্তঃপুরিকারা ভেবেছে রাধার ওপর হয়তো কোন দেবতার ভর হয়েছে। রাধা সবসময়েই চঞ্চলমনা। তিনি তাঁর বসনাঞ্চল সম্বরণ করেন না। বসে থাকতে থাকতে চমকে ওঠেন, গায়ের গয়না একবার খোলেন, আবার পরেন। এখানেও কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধার তীব্র অস্থিরতারই ছবি। কবিতার ধ্বনি এখানে দূরবাহী।

আধুনিকগন্ধী মনে করেও 'একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা'[২৯০] শীর্ষক পদটিকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের বলেই অভিহিত করেছেন। কিন্তু বিমানবিহারী মজুমদার এ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তবে এই পদটিতেও চণ্ডীদাসের রাধারই তীব্র আকূতি ও বেদনা লক্ষ্য করা যায়। পদটি সখীর জবানীতে ব্যক্ত। রাধা কুলবতী অবলা নারী, কৃষ্ণের বিষম প্রেম তাঁর জ্বালাই বৃদ্ধি করল। এই প্রেম ব্যাধি একেবারেই অভিনব। যে-ই কৃষ্ণনাম করে, রাধা তাঁর পায়ে ধরেন। তাঁর চিকুর ধূলিলুণ্ঠিত হয়। রাধাকে দেখলে মনে হয় সোনার পুতুল যেন মাটিতে

লুটোচ্ছে। অন্য দিকে এই ধূলিলুণ্ঠিতা সুবর্ণপ্রতিমা রাধার কৃষ্ণপ্রেমতন্ময় আত্মবিস্মৃত আবেগ একেবারেই চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমতন্ময়তার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। রাধা ছল ছল চোখে সবাইকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করেন। 'কালা' শব্দের ব্যবহারের জন্যই প্রধানতঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ এই পদটিকে চৈতন্য পরবর্তী মনে করেছেন। আর বিমানবিহারী মজুমদারও বলেছেন যে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতে গয়া প্রত্যাগত গৌরাঙ্গের ভাব বর্ণনা পড়েই পদটি রচিত হয়েছে। 'কাহারে কহিব মনের বেদনা' পদটিকেও[১৯১] বিমানবিহারী মজুমদার চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের বলে নিঃসংশয়ভাবে গ্রহণ করেন নি। এর কারণ সজনীকান্ত দাসের প্রাচীন পদসংগ্রহের পুঁথিতে পদটি জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া গেছে। এই পদেও কৃষ্ণরূপ দর্শনে পুলকিতা রাধার সর্বত্র কৃষ্ণদর্শনের ছবি। পদটি রাধার নিজেরই মুখে নিজের কৃষ্ণরূপমুগ্ধতার বর্ণনা। কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধা তাঁর হৃদয়ের অতল গভীরে যে মন, সেই মনোরাজ্যে কৃষ্ণপ্রেমের বেদনাময় আনন্দকে উপলব্ধি করেছেন। এইখানেই চণ্ডীদাস লিরিক কবি হয়ে উঠেছেন। গভীরতম মনোরাজ্যের আলোড়ন তাঁর কবিতায় উদ্ভাসিত। গুরুজনের সামনে রাধা দাঁড়াতে পারেন না, কারণ তাঁর চোখ কৃষ্ণকে দেখার ব্যাকুলতায় সর্বদাই অশ্রুসজল। সখীর সঙ্গে রাধা যমুনা-জল আনতে যান, কিন্তু সেখানেও যমুনাজলের নীল লাবণ্য দর্শনে উজ্জ্বল কৃষ্ণরূপের কথাই মনে আসে।

শুধু রূপদর্শনেই নয়, কৃষ্ণ নাম শ্রবণেও রাধার তন্ময়তার আশ্চর্য রূপকার এই গ্রাম-বাংলার কবি। 'সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম' শীর্ষক পদটিতে[১৯২] আমরা নাম তন্ময়া রাধার সেই ছবিই দেখতে পাই! এই পদটিও চৈতন্যপূর্ববর্তী কিনা সে সম্বন্ধে বিমান-বিহারী মজুমদারের সংশয় আছে! মনীন্দ্রমোহন বসু এটিকে চৈতন্যপরবর্তী দীন চণ্ডীদাসের পদ বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, এতে বিদগ্ধমাধবের 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং' শ্লোকটির প্রভাব আছে। কিন্তু প্রবীণ অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর মতে এটি চৈতন্যপূর্ববর্তী রচনা। এটি পূর্বরাগের একটি সহজসুন্দর স্বতঃস্ফূর্ত পদ। রূপ গোস্বামীর দেওয়া সংজ্ঞায় রচিত নয়। এছাড়া আমরা জানি যে শ্রীচৈতন্য চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করে আনন্দ পেতেন। সুতরাং চণ্ডীদাসের এই সমস্ত পদের সঙ্গে ভক্ত পণ্ডিত শ্রীরূপ গোস্বামীর পরিচয় থাকাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে বলা যায় শ্রীরূপ গোস্বামীই চণ্ডীদাসের পদটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এই পদটির 'না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো' পংক্তিটির আক্ষরিক অনুবাদ হ'ল শ্রীরূপের 'নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী'। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল চণ্ডীদাসের বাংলা পদে আছে 'শ্যামনাম' আর রূপগোস্বামীর সংস্কৃত শ্লোকে আছে 'কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী'। 'শ্যাম' শব্দের ব্যবহার চৈতন্যপূর্ব যুগের, অন্যদিকে 'কৃষ্ণ' শব্দটি শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণনামমন্ত্র প্রচারের ফলেই শ্রীরূপের পদে স্বাভাবিকভাবে স্থান পেয়েছে। এই যুক্তি দিয়েও আমরা পদটিকে চৈতন্যপূর্ববর্তী বলে গ্রহণ করতে পারি। চৈতন্যপূর্ববর্তী বিদ্যাপতির পদেও কৃষ্ণনামজপবিহ্বলা ভূলুণ্ঠিতা রাধার চিত্র পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি তাঁর কবিহৃদয়ের মর্মলোকে এই রাধার সন্ধান পেয়েছিলেন, আর চণ্ডীদাস নিজেই ভাবতন্ময় মরমিয়া কবি। তাই তাঁর রাধা কৃষ্ণনাম শ্রবণে বলেন—

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

নামের মাধুর্যে রাধা কৃষ্ণনাম ছাড়তে পারেন না। নাম জপ করতে করতে তাঁর শরীর অবশ হয়ে যায়। শ্যামনামের প্রতাপেই যদি এই হয়, তাহলে তাঁর অঙ্গস্পর্শে রাধার কি হবে? রাধা প্রাণপণে শ্যামকে ভুলে যাওয়ারই চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সক্ষম হন না। কৃষ্ণরূপের নিবিড় আকর্ষণ ব্যক্ত করতে গিয়ে রাধা বলেন, সেই রূপসুধা পান করতে গিয়ে তাঁর নয়নচকোর—'পিতে করে উতরোল, নিমিখে লখিল নাহি হয়'।[২৯৩] অর্থাৎ নিমেষপাতের যে ব্যবধান, সেই ব্যবধানটুকুতেও কৃষ্ণের অদর্শন রাধা সহ্য করতে পারেন না। রাধার এই আক্ষেপ ভাগবতের গোপীদের আক্ষেপের কথা মনে করিয়ে দেয়—'জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দশাম্'।[২৯৪] পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টকেও অনুরূপভাবে কৃষ্ণদর্শনের ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা যায়—'যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্'। এই পদটিতে রাধার নয়ন চকোরের কৃষ্ণরূপসুধাপানের উপমাটি গতানুগতিক হলেও চাঁদের সুধা পান করার জন্য 'উতরোল' নয়নের বর্ণনায়, ভাবলালিত্য সৃজনে কবির মৌলিকত্ব পরিস্ফুট।

কখনও কখনও কুলবধূ গৃহবন্দিনী রাধার গোপন ভালবাসা কৃষ্ণকে দেখার ব্যাকুল আগ্রহে নিজের গৃহগণ্ডীর মধ্যেই অভিনব উপায় উদ্ভাবন করে। রাধা চোখের কাজলে কৃষ্ণের মূর্তি অঙ্কন করে, কপালের সিঁন্দুর দিয়ে তাঁর চোখ আঁকেন। কৃষ্ণের বর্ণসাদৃশ্যে তিনি কালো রঙের শাড়ী পরেন, আর হাতে রাখেন কৃষ্ণের চোখের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত কুবলয় পুষ্প।[২৯৫]

আবার কখনও রাধা সখীকে ডেকে বলেন, কৃষ্ণকে ছাড়া তিনি এক মুহূর্তও বাঁচতে পারবেন না। কারণ—

সে রূপসায়রে মন যে ডুবিল
সে গুণে বান্ধল হিয়া।
সে সব চরিতে মন যে সঁপিলু
আনিব কি ধন দিয়া।[২৯৬]

চণ্ডীদাসের রাধা এখানে পূর্বরাগ পর্যায়েই আত্মনিবেদনের আকূতিতে মুখর। রাধার গৃহবদ্ধ জীবন কৃষ্ণকে ছাড়া অর্থহীন। রাধা বলেন—"খাইতে খাইছি, শুইতে শুইছি, আছিতে আছিয়ে ঘরে"।[২৯৭] রাধার পূর্বরাগের পদেও তাই বিরহবেদনার আর্ত সুর। এমন সহজ সুরে, সহজ ভাষায় মনের গভীর কথা বলতে চণ্ডীদাস ছাড়া আর কেউ পারেন নি। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণানুরাগিনী রাধার গভীর প্রেম কখনও আবেগে অস্থির, কখনও বেদনায় বিধুর, আবার কখনও বা যোগিনীর বৈরাগ্যধূসর শান্ত তন্ময়তায় সমাজ সংসারের কলরবতুচ্ছকারী আত্মার গভীরতম স্রোতে অবগাহী।

এই কবি রাধার প্রতি কৃষ্ণের পূর্বরাগের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা রূপতৃষ্ণার ব্যাকুলতায় কিছুটা অস্থির হলেও, কৃষ্ণ যখন বলেন—'হিয়ার ভিতর কাটিয়া পাঁজর মরমে রহিল পশি'।[২৯৮] তখন এই প্রেমকে নিছক রূপতৃষ্ণাসম্বল মনে হয় না। রাধার মত কৃষ্ণও রাধাপ্রেমে দশমী দশায় উপনীত হয়েছেন। কাঠের পুতুলের মতই তিনি অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছেন। তাঁর দূতী এসে রাধার কাছে বলেছেন, এই কৃষ্ণকে দেখলে মনে হয় জীবন নেই, নাকের কাছে তুলো এনে ধরে তবে বোঝা গেল যে কৃষ্ণের জীবন আছে।

কৃষ্ণের এই অবস্থায় দূতী নিজেও আশঙ্কাগ্রস্তা। তাই রাধাকে দিব্য দিয়ে তিনি বিলম্ব না করার অনুরোধ করেন। দেখা যাচ্ছে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণও রাধার মতই সখীর কাছে মনোবেদনা ব্যক্ত করেন এবং কৃষ্ণের অবস্থা দেখে সেই সখীই সম্ভবত দূতী হয়ে চলে আসেন রাধার কাছে। এই কৃষ্ণহিতৈষিণী সখীর সাক্ষাৎ অবশ্য আমরা বিদ্যাপতির পদেও পেয়েছি।

চণ্ডীদাসের রাধা অভিসারে বেরোতে পারেন না। তিনি একান্তভাবেই বাংলাদেশের শাশুড়ীননদীশাসিতা ভীরু কুলবধূ! তাঁর প্রেম শুধু বেদনা পাওয়ার জন্য, অন্তরের গভীর গহনে রক্তক্ষরণের তীব্র যন্ত্রণা অনুভবের জন্য। তাই চণ্ডীদাসের পদে কৃষ্ণই রাধার জন্য অভিসারে বেরিয়েছেন। কিন্তু কৃষ্ণর প্রতীক্ষাস্থল কোন নিভৃত নিকুঞ্জ নয়, রাধার গৃহের আঙ্গিনা। বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রিতে কৃষ্ণ রাধার জন্য পথে বেরিয়েছেন। তাঁকে দেখে রাধা একই সঙ্গে কষ্ট আর আনন্দ দুই-ই পাচ্ছেন। প্রবল প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় তাঁরই সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রিয়তম কৃষ্ণের কষ্ট রাধার মনে বেদনার উদ্রেক করেছে। আবার অন্যদিকে কৃষ্ণের প্রেমের বিশ্বস্ততা, গভীরতা ও নিষ্ঠা রাধাকে আনন্দিতও করেছে।[২৯৯] রাধার এই প্রিয়তম কৃষ্ণ 'আপনার দুখ সুখ করি মানে' এবং রাধার 'দুখের দুখী'। কৃষ্ণের এই কৃচ্ছ্রসহনদীপ্ত ভালবাসা রাধাকে সাহসিকা করে তোলে। কৃষ্ণের প্রেমার্তি দেখে রাধা ভাবেন কৃষ্ণের জন্য মাথায় কলঙ্কের ডালি বহন করতেও তিনি প্রস্তুত। পদটি রবীন্দ্রনাথের আস্বাদনে নবতর মহিমা লাভ করেছে—"রাধা হাসিবে, কি কাঁদিবে, ভাবিয়া পাইতেছে না। রাধা সুখে দুঃখে আকুল হইয়া পড়িয়াছে। শেষে রাধা এই মীমাংসা করিল, শ্যাম আমার জন্য কত কষ্ট পাইয়াছে, আমি শ্যামের জন্য ততোধিক কষ্ট স্বীকার করিয়া শ্যামের সে ঋণ পরিশোধ করিব।"[৩০০] প্রেমিকের প্রেমের যথার্থ অনুভবই এখানে রাধাকে সাহসিকা করে তুলেছে।

চণ্ডীদাসের মিলনের কোন প্রত্যক্ষ পদ নেই। তাঁর রাধার প্রেম এত করুণ, কোমল আর স্নিগ্ধ যে স্থূল দেহমিলন বর্ণনা কবিকে উৎসাহিত করে নি। কিন্তু মিলনের পরবর্তী আনন্দ বর্ণনায় চণ্ডীদাসের রাধা প্রেম-সুখের প্রাপ্তিতে উদ্ভাসিত। তাঁর পদে আছে রসোদ্গারের রোমাঞ্চিত অনুভবকে প্রিয় মিলন স্নিগ্ধা রাধার প্রকাশ চেষ্টা। দেহকামনার উতরোল উল্লাস নয়, সেখানে মধুর সান্নিধ্যের সৌরভ বিকীর্ণ। স্থূল ইন্দ্রিয়নির্ভর দৈহিক মিলন বর্ণনা এই কবির স্বভাব বিরোধী, তাই 'রতিসুখসার' মুহূর্তকে তিনি তাঁর পদে রূপায়িত করতে পারেন নি। রসোদ্গারের পদে সেই অব্যক্ত আনন্দের কলগুঞ্জন রাধার মুখে ব্যক্ত হয়েছে। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণেরও মিলনের পর হারানোর ভয়। তাই 'যাই, যাই' শব্দটি কৃষ্ণ বারবার উচ্চারণ করেন, যাওয়ার আগে বারবার রাধাকে চুম্বন করেন, এক-আধ পা যাওয়ার পরই ফিরে ফিরে তাকান, কাতর হয়ে রাধার মুখ দেখেন, হাতে হাত ধরে আবার দেখা হওয়ার শপথ করিয়ে নেন।[৩০১] প্রেমিক কৃষ্ণের এই ধরনের আর্তি পরবর্তী অনেক কবির পদেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অথবা বিদ্যাপতির পদে কৃষ্ণচরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না। কৃষ্ণের মধ্যে পরিপূর্ণ মিলন মুহূর্তে যে বিচ্ছেদাশঙ্কা, রাধার মধ্যেও সেই একই আশঙ্কার ব্যাকুলতা। রাধার প্রেম তাঁর নিজের কাছে বড় মহার্ঘ। হৃদয়লালিত সেই

গোপন দুর্লভ প্রেমের জন্য রাধার দুঃখ, কলঙ্ক আর বেদনার সীমা নেই। রাধা তাই বলেন—

অনেক সাধের পিরিতি বন্ধু হে
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে পরাণে মরিব
এমতি মনে সে লয়॥[৩০২]

রাধা সখীর কাছে তাঁর মিলন রজনীর পরবর্তী প্রভাতে মনের কথা বলছেন। নিদ্রোত্থিতা রাধা দোয়েল-কাক-কোকিলের ডাক শুনে বুঝতে পারলেন রাত্রি শেষ হয়েছে।[৩০৩] কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি উঠে বাড়ী গেলেন। রাধার মনে দুঃখ থেকে গেল যে তিনি রাধাকে বিদায় জানিয়ে গেলেন না। চণ্ডীদাসের রাধা প্রেমিকের এই সামান্য অনবধানতাতেই অভিমানিনী। মিলনের পর রসালসে রাধার 'ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।' প্রভাতে ভালভাবে চেয়ে দেখে বুঝলেন কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বসনভূষণ বদল হয়ে গেছে। রাধার এই উক্তিতেই পদটি সার্থকভাবে রসোদ্গারের পদে পরিণত হয়েছে, কারণ রাধাকৃষ্ণের মিলনের সুস্পষ্ট আভাস এই পদটিতে পাওয়া যায়। ননদীকে সম্বোধন করে বলা একটি পদেও[৩০৪] রাধাকৃষ্ণের মিলনের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এই পদটিতে রাধার উক্তি থেকে তাঁকে নিরীহ ননদীভীতা বধূ বলে মনে হয় না। বরং তাঁর আচরণে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ননদী বিলুপ্ত প্রসাধনা রাধাকে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য তিরস্কার করলে রাধা বলেন ননদীর 'কুবোল' শুনে তাঁর বিষ খেয়ে মরে যেতে ইচ্ছে করে। কৃষ্ণ কে, সে কালো, না ফর্সা, তাই-ই তিনি জানেন না। ননদী শুধু মিথ্যে কথা বলে স্বামীর কান ভাঙানোর জন্য; তাঁর স্বামী ভালো—তাই এসব কথায় কান দেন না। আসলে রাধা যমুনায় পদ্মফুল দেখে তুলতে গিয়েছিলেন, সেই যমুনার জলেই তাঁর অগুরু, চন্দন, কস্তুরী কুঙ্কুম সব ধুয়ে গেছে! রাধার ঠিক এই ধরনের উক্তি আমরা বিদ্যাপতির পদেও পেয়েছি। এর আগে দ্বাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণ-কথাতেও রাধার এই চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আসলে লোক জীবনে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণলীলাকথাই এক্ষেত্রে বিভিন্ন যুগের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। চণ্ডীদাসের এই পদটিকে রসোদ্গারের পদ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু বিলুপ্ত প্রসাধনা রাধার এই চিত্র কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের—একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

চণ্ডীদাসের পূর্বরাগে আত্মনিবেদনের নিবিড় আকুতি, আর তাঁর রাধার আক্ষেপানুরাগে কৃষ্ণপ্রেমের প্রতিকূল সর্ববিধ অবস্থার বিরুদ্ধে অশ্রুসজল অভিযোগ। বিদ্রোহের অনির্বাণ বহ্নিশিখা অসহায়া রাধার ব্যাকুল অশ্রুজলে সিঞ্চিত হয়ে শুধু দীর্ঘনিশ্বাসের ধূম্রজালই বিস্তার করেছে—

হেদে রে দারুণ বিধি তোরে সে বাখানি।
অবলা করিলি মোরে জনম দুখিনী॥[৩০৫]

শেষ পর্যন্ত বিশ্বসংসারের বিরুদ্ধে, স্বজন-পরিজনের বিরুদ্ধে রাধার ব্যর্থ অভিমান উচ্চারিত হয়—'অভাগি মরিলে হয় সকলের ভাল।'[৩০৬] কিন্তু তারও আগে রাধা বলেন, যেখানে গেলে কৃষ্ণকে পাবেন, তিনি সেখানেই উড়ে যাবেন। রাধার এই উক্তি

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধার কথা মনে করিয়ে দিলেও পদটি যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রচয়িতার নয়—তার প্রমাণ, এখানে রাধা বড়ায়িকে নয়, সখীকে সম্বোধন করে তাঁর দুঃখের কথা জানিয়েছেন।

আক্ষেপানুরাগে কবি চণ্ডীদাসের প্রতিভার চরম বিকাশ। কবি হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতা, বাংলা দেশের গ্রামীণ সমাজ এবং তারই সঙ্গে কবির নিজস্ব ধর্মবোধ, সমস্ত কিছুই রূপায়িত হয়েছে আক্ষেপানুরাগের পদে। এত বাধাবিঘ্ন আর প্রতিকূলতার মাঝখানে রাধার প্রেমের দীপশিখাটি জ্বলে উজ্জ্বল দীপ্তিতে। পল্লী বাংলার একটি পরিবারের বধূরূপে সমাজভীতি ও সতীত্ববোধের দৃঢ়মূল সংস্কারে বন্দিনী রাধার বেদনা বড়' মর্মস্পর্শী। একদিকে অনিবারণীয় কৃষ্ণ প্রেমের বহির্মুখী আকর্ষণ আর অন্যদিকে অন্তঃপুরের পরিজনভীতি ও সংস্কার—এই উভয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত রাধার বেদনাই ফুটে উঠেছে চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের পদে। কৃষ্ণানুরাগিনী রাধা কৃষ্ণ ছাড়া তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপনের দুর্বিষহ ক্লান্তি আর আনন্দহীনতাকে সখীর কাছে তুলে ধরেন—

খাইতে খাইছি শুইতে শুইছি
আছিতে আছিয়ে ঘরে।[৩০৭]

আবার কখনও আরও স্পষ্টতর ভাষায় রাধা সখীর কাছে বলেন—'এ ঘর করণ বিষের সমান, অতি বিপরীত দেখি'।[৩০৮] রাধার অবস্থা দেখে সখী রাধাকে ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করেন! কিন্তু রাধা নিরুপায়। তিনি তো কৃষ্ণকে ভুলতেই চান। তাই—

কালিন্দীর জল নয়ানে না হেরি
বয়ানে না বলি কালা।
তভু ত সে কালা অন্তরে জাগয়ে
কালা হৈল জপমালা ॥[৩০৯]

অবশেষে কৃষ্ণকে ভুলতে না পারার নিরুপায় ক্ষোভে রাধা যোগিনী হওয়াই স্থির করেন। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি গহন বনেই চলে যাবেন। গুরু পরিজন যারা কু-কথা বলে তাদের পাড়াতেও তিনি যাবেন না। সমাজ সংসারের বিরুদ্ধে রাধার এই ব্যর্থ বিদ্রোহ ঘোষণা তাঁর নারী হৃদয়ের অসহায়তা বোধকেই আরও প্রকট করে তোলে। রাধার জাগরণে আর স্বপ্নে সর্বত্রই ব্যাপ্ত হয়ে থাকেন কৃষ্ণ। তাই রাধা বলেন—

কেশ আউলাইয়া বেশ বনাইতে
হাত না সরে যে বাঁধি।
সে কালা ভরমে কেশ কোলে করি
কালা কালা করি কাঁদি ॥[৩১০]

এই বিমুগ্ধ প্রেমের, এই নিবিড় তন্ময়তার চিত্র আঁকতে চণ্ডীদাসই পারেন। মনে হয় প্রাণের ·পরিপূর্ণ অনুভব, সমস্ত সুখদুঃখবোধ এবং আনন্দ-বেদনা গলিয়ে তিনি যেন রাধার প্রেমময়ী মূর্তিটি নির্মাণ করেছেন। আবার অনেক সময় রাধা মরীয়া হয়ে গুরুজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে শ্যামকে না ছাড়ার সংকল্প করেন। রাধার পাঁজর কেটে শ্যামরূপ হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, কিন্তু তবুও রাধার ভয় হয়তো পাঁজর কেটে কেউ

শ্যামকে নিয়ে যাবে। তাই সখীর কাছেই রাধার মর্মশায়ী বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই শ্যামকে যদি কেউ ত্যাগ করতে বলে—এমনকি সখীও যদি বলেন, তবে রাধা বিষপান করে আত্মহত্যা করবেন। অবশেষে সতীত্ব গৌরবকেও রাধা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে বলেন—

'পুরুক মনের সাধ ধরম যাউক দূরে'।[৩১১]

চণ্ডীদাসের পদাবলীতে প্রেম বা পিরিতি জৈব ব্যাপার নয়। সাধক কবি চণ্ডীদাসের কাব্যে প্রেমই ঈশ্বর। তাঁর আক্ষেপানুরাগের পিরিতি গঞ্জনা তাই ব্যাজস্তুতির মধুর ছলনা—

জানিতুঁ পিরিতি এমন বলিয়া
তবে কি বাড়াতুঁ পা।
পিরিতি বিচ্ছেদে জীবন না রহে
এলায়ে পড়িছে গা।[৩১২]

রাধার পিরিতি বড় যন্ত্রণার, বড় বেদনার। লোকনিন্দার ভয়ে বাইরে ভাণ করতে হয় ঔদাসীন্যের—অথচ ভেতরে ভেতরে চোরের নারীর মত তাঁর হৃদয় গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকে। জ্বলন্ত আগুনে জল ঢেলে দিলে সে আগুন তখনি নিভে যায়, কিন্তু রাধার মনের আগুন তো অনির্বাণ। তাই রাধা তাঁর পিরিতিকেও তীব্র গঞ্জনা দিয়ে বলেন—

এ দেশে না রহিব সই দূর দেশে যাব,
এ পাপ পিরিতের কথা শুনিতে না পাব।[৩১৩]

এমন কি 'পিরিতি' এই তিনটি অক্ষর তিনি দুচোখে দেখবেন না, যে 'পিরিতি' শব্দটি উচ্চারণ করবে, তাকেও তিনি দুচোখে দেখবেন না---এই-ই রাধার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

মাঝে মাঝে রাধার মনে হয় সখী হয়ত তাঁর এ সমস্ত কথায় বিশ্বাস করছেন না। তাই সখীর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য অথবা আরও একটু সহানুভূতি পাওয়ার জন্য রাধা বলেন---

হের দেখ মোর গায়ে হাত দিয়া
উঠিছে বিরহ আগি।[৩১৪]

চণ্ডীদাসের রাধার নিষ্ঠুরা ননদিনী কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম করার জন্য সখীর সামনেই তাঁকে তিরস্কার করেন। রাধা সখীকে বলেন, সত্যিই যদি তিনি কানুকে পেতেন, তাহলে ওই অপবাদের বেদনা তাঁকে হয়ত স্পর্শ করত না। কিন্তু এই মিথ্যা অপবাদের বেদনা রাধার প্রাণকে অস্থির করে তুলেছে। রাধার দুঃখের কাহিনী শুনে সখীও সম্ভবত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু নিরুদ্ধ হৃদয়ের ব্যক্ত হাহাকার শোনার জন্য সখী ছাড়া আর কে-ই বা রাধার আছে? রাধা তাঁকে জোর করে বসিয়ে রাখতে চান, তারপর বোঝাতে থাকেন—কৃষ্ণের বাঁশীই দুপুরে ডাকাতি করে তাঁর কুলধর্ম, ধৈর্য, সতীত্বধর্ম আর লজ্জা—সব কিছুই হরণ করে নিয়ে যায়। কৃষ্ণের বাঁশী যেন শিকারীর মত রাধার প্রাণ-পাখীকে তীরবিদ্ধ করে।[৩১৫] ব্যাধের পাখী শিকারের উপমা দিয়ে একদিকে কৃষ্ণের প্রেমের শক্তি এবং অন্যদিকে রাধার যন্ত্রণা উভয়কেই কবি ব্যক্ত করেছেন। আবার কখনও কৃষ্ণের বিষম বাঁশী রাধাকে কেশে ধরে শ্যামের কাছে নিয়ে যায়। কৃষ্ণের বাঁশীর সুরে সতী ভুলে যায় নিজের স্বামীকে, মুনিরও মন ভোলে, এমনকি তরুলতারাও পুলকিত হয়।[৩১৬] রাধার

নিভৃত মন্দিরের নিরুদ্ধ কক্ষে বাঁশীর সুর গিয়ে পৌঁছায়। সেই সুরে বেজে ওঠে রাধার নাম। সেই সুরের 'মোহনিয়া ফাঁদে' বন্দিনী রাধা অনর্গল অনিবারণীয় অশ্রুজলে সিক্ত হতে হতে ভাবেন—'বাঁশী কেনে ডাকে থাকি থাকি।'[৩১৭] বাঁশীর বিরুদ্ধে রাধার হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা এই বেদনাময় অভিযোগ আর রাধার অসহায় আত্মসমর্পণের ভাষা শুনে মনে হয় বাঁশী যেন জড় নয়, একটি জীবন্ত বস্তু। কামোন্মাদ যক্ষের আত্মবিস্মৃতি এখানে প্রেমোন্মাদিনী রাধারও ঘটেছে।

মাঝে মাঝে কৃষ্ণের প্রতি রাধার অভিযোগ বেড়ে ওঠে। মত্ত হস্তী যেমন অঙ্কুশের বারণ না মেনে ছুটে চলে, রাধার প্রেমও তেমনি বিপুল আবেগে উচ্ছ্বসিত হতে চায়। রাধা ভাবেন চীৎকার করে কেঁদে উঠে তিনি মনের ভার লাঘব করবেন—কিন্তু তাতেও বাধা তাঁর গুরুজন। গৃহের নিভৃত কোণে বসে কৃষ্ণের কথা ভাবতে ভাবতে রাধার মনে হয়—একদিন হয়ত এইভাবেই তিনি শরীর ত্যাগ করবেন। কারণ জেলেকে দেখে মাছেরা যেমন ভয়ে কাঁপে- ঠিক তেমনি করে রাধার ঘরকন্নাও শাশুড়ী ননদীর বচন বিষে সদাকম্পিত। এত দুঃখ-বেদনারও সান্ত্বনা থাকত, যদি কৃষ্ণ রাধার এই মর্মবেদনা অনুভব করতেন। তাই সখীর কাছে রাধার আক্ষেপ—

> ঘরে গুরুজন বলে কুবচন
> যদি বা সহিতে পারি।
> যাহার লাগিয়া এতেক সহিব
> সে রহে ধৈরজ ধরি।।[৩১৮]

শুধু তাই নয়, কৃষ্ণের জন্য রাধা সর্বস্ব বিসর্জন দিলেও কৃষ্ণ অন্যকে ভালবাসেন। কৃষ্ণ যেন স্বর্ণকুম্ভে ভরা পয়োমুখ বিষ। আর কানুর পিরিতি যেন শংখ বণিকের করাত। আসতে যেতে রাধার হৃদয়কে কেটে কেটে রক্ত ঝরায়।[৩১৯] কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে, কৃষ্ণের প্রেমেও রাধার যন্ত্রণা আর আশঙ্কা, আবার কৃষ্ণ বিরহে ও কৃষ্ণের ঔদাসীন্যেও রাধার তীব্র বেদনা। চণ্ডীদাসের এই ধরনের উপমাগুলি সহজ-সরল হয়েও অর্থপ্রকাশে অমোঘ।

যাঁরা আপন, রাধা আজ তাঁদেরই পর করেছেন। তাই রাধার আজ মূল নেই। স্রোতের শেওলার মত তিনি ভেসেই বেড়ান, কেউ তাঁকে আপন ভাবে না; একমাত্র কৃষ্ণই তাঁর সম্বল। সেই কৃষ্ণই যদি রাধার প্রতি নিদারুণ হন, তবে রাধা তাঁর সামনে দাঁড়িয়েই মরবেন। এইটিই হবে কৃষ্ণের রাধাকে অবহেলা করার শাস্তি।[৩২০]

'ধিক রহুঁ জীবনে যে পরাধীনী হয়ে' শীর্ষক পদটিতে[৩২১] রাধার আক্ষেপের আর্তনাদ বড় তীব্র মর্মস্পর্শী। অবশ্য এটিও চৈতন্য-পূর্ব চণ্ডীদাসের কিনা সে সম্পর্কে বিমান বিহারী মজুমদারের সংশয় আছে। রাধার আক্ষেপ, তাঁকে পরাধীনভাবে বেঁচে থাকতে হয়। আরও আক্ষেপ তিনি পরবশ অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমের বশ। অমৃতের সমুদ্র তাঁর ভাগ্যে গরল হয়ে যায়, শীতল মনে করে তিনি পাষাণ কোলে নিলে তাঁর দেহের আগুনের তাপে পাষাণ গলে যায়। ছায়া দেখে তিনি যদি তরুলতায় ছায়াচ্ছন্ন বনে গিয়ে বসেন, তবে সেখানে দাবানল জ্বলে ওঠে। যমুনার জলে গিয়ে ঝাঁপ দিলে প্রাণ শীতল হওয়ার পরিবর্তে আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কুলবধূ রাধার ভালবাসার এই নিরুপায় যন্ত্রণা অন্য কোন কবির পদে এত জীবন্তভাবে ফুটে ওঠে নি।

আবার কখনও কৃষ্ণের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যথিতা রাধা আকুলভাবে সখীকে বলেন

সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া ৩২২

যে নারী কৃষ্ণকে এমন করে রাধার কথা ভুলিয়ে দিয়েছে, তার প্রতি রাধার অভিশাপ হল—

'আমার অন্তর যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে।।৩২৩

এছাড়া আর কোন অভিশাপের ভাষা রাধা খুঁজে পান না। কৃষ্ণের জন্য তিনি সব পরিত্যাগ করেছেন, লোকে তাঁর অপযশ করে। অথচ তাঁর সেই 'পরাণরতন'কে অন্য এক নারী চুরি করে নিয়েছে। চণ্ডীদাসের রাধা যেন বিষাদের নম্র প্রতিমা। তাই তাঁর আক্ষেপানুরাগের পদই বেশী। বিদ্রোহের বহ্নিমান ক্রোধ নয়, সকরুণ আক্ষেপের অশ্রুসজল অসহায়তাই চণ্ডীদাসের রাধার কণ্ঠে বেজে উঠেছে।

'বন্ধু, সকলি আমার দোষ' শীর্ষক পদটিতেও রাধার সমাহিত বেদনার অনুত্তেজিত উচ্চারণ।৩২৪ কৃষ্ণের প্রতি তীব্র অভিমানে রাধা নিজেকেই দোষী করেছেন, কারণ রাধা না জেনে শুনে কৃষ্ণের মত লোকের সঙ্গে প্রেম করেছেন। রাধা কৃষ্ণপ্রেমকে সুধার সমুদ্র মনে করেছিলেন, কিন্তু সেই সুধাই তাঁর ভাগ্যে বিষে পরিণত হল। রাধা যদি জানতেন যে তাঁর প্রেমের এই অবস্থা হবে তাহলে তিনি এমন করে জাতিকুলশীল মজাতেন না। কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর যে প্রথম প্রেম —তার তিনভাগের অর্ধেকের অর্ধেকও এখন নেই। যার জন্য এত কষ্ট— সে যদি এমন বঞ্চনা করে, তাহলে আর দুঃখের সীমা থাকে না। রাধা আজ সেই দুঃখেরই সম্মুখীন হয়েছেন।

আবার কখনও রাধা বলেন— 'কাণুর পিরিতি চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়।'৩২৫ চন্দন যতই সুগন্ধের আধার হোক না কেন, সে এমনি সুগন্ধ বিতরণ করে না। ঘর্ষণের বেদনায় সে স্নিগ্ধ সৌরভ বিকীর্ণ করে। কৃষ্ণের প্রেমও তেমনি, চন্দনের মত। প্রতি-কূলতার ঘর্ষণে তার সৌরভের জাগরণ। পরশ পাথর শীতল, কিন্তু রাধার কৃষ্ণরূপ স্পর্শমণি অগ্নিতুল্য। এই পদটিও চণ্ডীদাসের কিনা— তা নিয়ে সম্পাদক সংশয় পোষণ করেন, কিন্তু সংশয়ের উপযুক্ত কারণ দেখান নি।

রাধা সর্বতোভাবে কৃষ্ণকে ভুলে থাকার চেষ্টা করেন, কিন্তু কালো জল ঢালতে গেলেই কালো কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে। রাধা শয়নে, স্বপ্নে সবসময় কৃষ্ণকে দেখতে পান। কৃষ্ণের কথা যাতে মনে না পড়ে, সেজন্য রাধা কালো কেশ এলিয়ে বেশ করেন না, চোখে কালো কাজলও পরেন না। কিন্তু তবুও তিনি কৃষ্ণের কথা কোনমতেই ভুলতে পারলেন না।৩২৬ মাঝে মাঝে রাধা নিজের ভাগ্যকেও দোষ দিয়ে বলেন—'বিধিরে কি দিব দোষ করম আপনা'৩২৭ কারণ তিনি তো সুজনের সঙ্গেই প্রেম করেছিলেন, কিন্তু কর্মদোষে সে দুর্জনে পরিণত হল। নিজের ওপর ক্রোধই রাধার সবচেয়ে বেশী। রাধা নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকেই নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। তিনি অন্যপথে যেতে চান, কিন্তু তাঁর মন তাঁকে কাণুর পথেই নিয়ে যায়। তিনি কৃষ্ণনাম নিতে চান না, কিন্তু তাঁর জিহ্বা কৃষ্ণনাম গ্রহণ করে। একই ভাবে তাঁর নাসিকা শ্যামগন্ধ পায় এবং কানও কৃষ্ণপ্রসঙ্গ শুনতে উৎসুক

হয়ে ওঠে। এখানে রাধার সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে কৃষ্ণানুশীলনের বর্ণনা। রাধা সক্ষোভে বলেন—

ধিক রহুঁ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥[৩২৮]

চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের পদে প্রেমিকা রাধার যন্ত্রণা, ভালবেসেও ভালবাসাকে চোরের মায়ের মত গোপন রাখার করুণ চেষ্টা, সমাজ ও পরিবারের শাসন শৃঙ্খলে বন্দী এক মধ্যযুগীয় বাঙালী গৃহবধূর ভালবাসার গভীর যন্ত্রণাকেই তুলে ধরেছে। রাধা পাড়া-পড়শী ও গুরুজনের কুবচন সহ্য করতে পারেন না, আবার কৃষ্ণের প্রেমও ছাড়তে পারেন না। তাই পিরীতি গঞ্জন রাধার আক্ষেপানুরাগের একটি বিশিষ্ট জায়গা দখল করে আছে। রাধা কখনও সখীকে সম্বোধন করে বলেন কৃষ্ণের প্রেম যেন আকস্মিক বজ্রপাতের মতই তাঁর মাথায় এসে পড়ল।[৩২৯] আবার কখনও বলেন প্রেমের জন্য ধর্ম, লাজলজ্জা, কাজকর্ম সবই তিনি ছাড়লেন। তাঁর সোনার বরণ কালি হয়ে গেল, এমনকি রাধার জীবনসংশয়ও দেখা দিল।[৩৩০] কখনও প্রেমের যন্ত্রণায় রাধা বিষ খেয়ে জীবন বিসর্জন দেওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেন। কৃষ্ণপ্রেমের অসহনীয় যন্ত্রণায় রাধা তাঁর ঘরকন্নার কাজে আগুন লাগিয়ে দিতে চান।[৩৩১] রাধা বলেন কৃষ্ণের কপট প্রেমকে তিনি প্রথমে সোনা বলে ভুল করেছিলেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন তা সোনা নয়, পিতল।[৩৩২] কখনও রাধার জবানীতে তাঁর প্রেম নানা ফুল তুলে এনে যত্নে গড়ে তোলা পিরিতি মালা। কিন্তু সেই মালা গলায় দিয়ে রাধা সুগন্ধ অথবা শীতলতা কিছুই পেলেন না, তাঁর বরং 'জ্বালাতে জ্বলিল মালা।' এই মালার ফুলের মালী কৃষ্ণ মালায় বিষ মিশিয়ে দিয়েছে—তাই রাধার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল।[৩৩৩]

কখনও কখনও রাধার কণ্ঠে বেজে ওঠে প্রেমসায়রে অবগাহনের অপার আনন্দ—

রসের স্বরূপ পিরিতি মুরতি
কেবা করে পরতীত।[৩৩৪]

রাধা বলেন কৃষ্ণের রূপের সমুদ্রে তাঁর নয়ন ডুবেছে, তাঁর গুণ হৃদয়কে বেঁধে ফেলেছে। তিনি তাঁর মনকে নিবারণ করবেন কি বলে? এই প্রেমের জন্যই তো তিনি তাঁর কুলধর্মকে বিসর্জন দিয়েছেন।[৩৩৫] রাধার কণ্ঠের এই পিরিতি গঞ্জন আসলে প্রেমের বিষামৃতময় আস্বাদের মধুর বন্দনা—

পরাণ ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে
এ বড় সুখ যে লাগে॥[৩৩৬]

রাধার এই সুখের অনুভূতি প্রেমের মোহন রূপেরই বন্দনা। কিন্তু প্রেম সরোবরে অবগাহনের পর রাধার সুখের অনুভূতি চলে যায়, গায়ে লাগে দুঃখের বাতাস। প্রেমের পৃথিবী-বিস্মৃত গভীরতার অতলে অবগাহনের পর বাইরের পরিবেশে তাকিয়ে রাধা দেখেন সেখানে জলের শেওলার মত গুরুজনেরা আছেন, আছে প্রতিবেশীরূপ জিয়ল মাছ, আছে কুল-পানিফলের কাঁটা। এ ছাড়াও প্রেমসায়রের জল ভরে আছে কলঙ্ক পানায়। সেই জল ছেঁকে খেলেও অর্থাৎ কলঙ্ককে অগ্রাহ্য করলেও, তা কিন্তু অন্তরে বাহিরে কুটকুট করে। রাধার প্রেমের আনন্দ পরিণত হয় বিষাদে। তাই চণ্ডীদাস ভণিতায় বলছেন, সুখ আর দুঃখ যেন দুটি ভাই, তারা পাশাপাশি থাকবেই। শুধু সুখের জন্য

প্রেম করলেও দুঃখও সঙ্গে সঙ্গে আসবেই। চণ্ডীদাসের এই ভণিতায় শুধু রাধার প্রতি সহানুভূতিই প্রকাশ পায় নি, ফুটে উঠেছে জীবনের করুণ অমোঘ সত্য। বাংলার গ্রামীণ পরিবেশের একটি নিতান্ত তুচ্ছ উপাদানকে অবলম্বন করে রাধার পিরিতি স্বরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে, মূর্ত হয়ে উঠেছে অতল-স্পর্শী জীবন-বোধের শিল্প-রূপও।

কখনও রাধার মনে হয় তিনি সারা পৃথিবী খুঁজে যত্ন করে প্রেমের বীজ এনে রোপণ করেছিলেন। কিন্তু তাতে জলসেচন করতে করতেই রাধার দিন কেটে গেল। অবশেষে অমৃতের পরিবর্তে তাতে ফলল বিষফল।[৩৩৭]

গোপঘরণী রাধা কখনও নিজের কৃষ্ণপ্রেমকে সযত্নে বসানো দধির সঙ্গে তুলনা করেন। পাত্র ভাল করে ধুয়ে রাধা তাতে যত্ন করেই দুধ সাজিয়েছিলেন, কিন্তু দই বসল না।[৩৩৮] কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার প্রেম ঘুচে গেছে, তবু কলঙ্কের জ্বালা রাধার ঘুচলো না। তাই অবশেষে রাধা তাঁর এই প্রেমের জন্য জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার কথাই ভাবেন। চণ্ডীদাসের রাধা বড় অসহায়। প্রেম তাঁকে টানে, কলঙ্ক তাঁকে কাতর করে। উভয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত রাধার কাছে কুলবধূর একমাত্র পথ মৃত্যুকে বেছে নেওয়াই সহজ মনে হয়। সখীর কাছেই রাধা বলেন, তাঁর প্রেম যেন ব্যাধির মতই তাঁর অন্তর জুড়ে আছে। সেই ব্যাধির জ্বালায় তাঁর প্রাণে বড় ব্যথা।[৩৩৯] সারা জগৎ জুড়ে তাঁর নামে কৃষ্ণকলঙ্কের অপবাদ। রাধার ব্যাধি শান্ত করে, তাঁকে উপদেশ দিয়ে মনের আগুন ঘোচায়—এমন কেউ-ই নেই। জন্মাবধি রাধার ননদী কাঁটার মতই তাঁকে বিদ্ধ করে। আবার কৃষ্ণের মত খল ব্যক্তির প্রেম রাধার জ্বালা আরও বাড়িয়ে তুলল। লোকগঞ্জনায় জর্জরিতা রাধা এক সময় সখীকে বলেন, তিনি আর গঞ্জনা সহ্য করতে পারছেন না, ননদীর দুর্বাক্যে তাঁর আপাদমস্তক, শরীর ও প্রাণ পুড়ে যাচ্ছে। কলঙ্কের জন্য এত তীব্রভাবে ব্যথিতা রাধাকে একমাত্র চণ্ডীদাস ছাড়া আর কারও পদেই পাওয়া যায় না। এই রাধার প্রেম তার প্রাণ, তার দ্বিতীয় অস্তিত্ব। কিন্তু সমাজশক্তির রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করার সাধ্য এই কুলবতীর নেই। বড়ু চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতির রাধা নিজেদের রূপ যৌবন ও বংশমর্যাদার জন্য যথেষ্ট গর্বিত। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার নিজের সম্পর্কে লেশমাত্র গর্ব নেই। তিনি তাঁর সমাজ, কুল, পরিবার সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির হাত থেকে অন্তরের নিভৃতে কৃষ্ণপ্রেমকে সযত্নে সন্তর্পণে রাখতে চান, কিন্তু পারেন না, ব্যর্থ বেদনায় বারবার ভেঙে পড়েন। তাই রাধার মুখে 'পিরিতির' এত ব্যাখ্যা, এতবার প্রেমযন্ত্রণার কথা সখীকে ডেকে শোনানো। ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে পরিবারের তথা সমাজশক্তির তীব্র দ্বন্দ্ব, রাধার নিজের সামাজিক সত্তার সঙ্গে তাঁর অন্তরের গভীর গহনের প্রেমিকা সত্তার দ্বন্দ্বই ফুটে উঠেছে এই সব পদে। 'পিরিতি' এই তিনটি অক্ষরের শক্তি কি ভীষণ, আকর্ষণ কি তীব্র, মধুর ও অপ্রতিরোধনীয়, তারই প্রকাশ ঘটেছে রাধার এই পিরিতি বন্দনায়, পিরিতি গঞ্জনায়। আক্ষেপানুরাগের এই পদগুলি থেকে চণ্ডীদাস-রামীর প্রেমসম্পর্কের কিংবদন্তীর সত্যতাই যেন অনুভব করা যায়।

চণ্ডীদাসের প্রেমবৈচিত্ত্যের পদে আবার এই রাধার মুখেই শোনা যায় কৃষ্ণের প্রেম-সম্পর্কে রাধার মুগ্ধ মদির স্বগত ভাষণ—

এমন পিরিতি কভু দেখি নাহি শুনি
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি ॥[৩৪০]

রাধা সামনে বসে থাকেন—আর কৃষ্ণ তাঁকে বদনে বীজন করেন। রাধা মুখ ফেরালে কৃষ্ণের শরীর বিচ্ছেদের আশঙ্কায় কাঁপে। একতনু হয়ে তাঁরা রাত্রি যাপন করেন, অতলান্ত সুখের সাগরে ডুবে যান। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হলে দুজনেই কাতর হন। কৃষ্ণ যখন চলে যান, তখন রাধার মনে হয় তাঁর দেহ ছেড়ে যেন প্রাণই বেরিয়ে যাচ্ছে। কখনও কবি নিজেই রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গভীরতায় ও অসাধারণত্বে অবাক হয়ে যান। এই যুগল প্রেমিকের প্রেমের মত প্রেম দেখাও যায় না, শোনাও যায় না।। দুজনেরই যেন প্রাণে প্রাণে বাঁধা। দুজনে দুজনকে আধ তিল না দেখলেও অধৈর্য্য হয়ে যান। ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যেও বিরহ যন্ত্রণা দূর হয় না। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচে না, রাধা কৃষ্ণ তেমনি পরস্পরকে ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচতে পারেন না। রাধাকৃষ্ণের এই প্রেম যেন মানুষী প্রেম নয়। বিমানবিহারী মজুমদার পদটির সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন, কারণ শ্রীরূপের আগে বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রেমবৈচিত্ত্য ছিল কিনা—এ নিয়েই তাঁর মনে সংশয় আছে। কিন্তু এটি যে তাঁর সন্দেহমাত্র, তাও তিনি বলেছেন। প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমের চরমতম স্তরে পৌঁছেও গভীর বিচ্ছেদ বেদনায় আক্রান্ত হয়, পরিপূর্ণ মিলনের আনন্দের মাঝখানে কোথাও থেকে যায় অতৃপ্তির যন্ত্রণা—এটি মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক সত্য, রোমান্টিক কবি মানসও এই অতৃপ্তির যন্ত্রণাতেই আক্রান্ত। মরমিয়া কবি চণ্ডীদাস আপন প্রেমানুভূতির গভীরতা দিয়ে সেই সত্যকে রূপায়িত করতে পেরেছেন। তাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমের সঙ্গে পার্থিব কোন আদর্শ প্রেমের তুলনা তিনি দিতে পারেন না। সূর্য আর পদ্মের যে প্রেম—তার সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের তুলনা চলতে পারে না। কারণ শীতে যখন পদ্ম মরে যায়, তখনও সূর্য সুখেই থাকে। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ সব ঋতুতেই পরস্পরের অভাবে কাতর। চাতক আর মেঘের সঙ্গেও রাধাকৃষ্ণের প্রেমের তুলনা চলতে পারে না। কারণ সময় না হলে তৃষ্ণার্ত চাতক যতই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকুক না কেন, মেঘ তাকে এক ফোঁটাও জল দেয় না। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ সর্বদাই পরস্পরকে স্নিগ্ধ সুশীতল প্রেমবারি দান করেন। ফুল আর ভ্রমরের তুলনাও এক্ষেত্রে করা চলে না। কারণ ভ্রমর যদি ফুলের কাছে না যায়, তাহলে ফুল এগিয়ে এসে তাকে মধুদান করে না। কিন্তু রাধা সবসময়েই কৃষ্ণকে প্রেমদানে উৎসুক। তাই প্রকৃতি জগতের এই প্রেম সম্পর্কগুলির সঙ্গে তুলনা করার পর চণ্ডীদাস সিদ্ধান্তে আসেন—"ত্রিভুবনে হেন নাহি।"[৩৪১] এই পদটি প্রেমবৈচিত্ত্যের নয়, এখানেও পিরীতি বন্দনা। পদটি জীবনানুভবের দীপ্ত স্পর্শে উজ্জ্বল, জীবন রসের স্বাদু পরিবেশনে মধুর।

চণ্ডীদাসের খণ্ডিতা ও কলহান্তরিতা রাধার বেদনা এবং কৃষ্ণকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করার ক্ষমতা দুই-ই সম পরিমাণে সত্য। খণ্ডিতা রাধার হৃদয়-নিংড়ানো যন্ত্রণার ভাষা সখীর প্রতি উচ্চারিত সেই পরিচিত উক্তিটিতে অকৃত্রিমভাবে ধরা পড়েছে—

> যে হেন কালিয়া না চাহে ফিরিয়া
> এমতি করিল যে।
> আমার অন্তর যেমতি করিছে
> তেমতি হউক সে।[৩৪২]

কখনও বা খণ্ডিতা রাধার কৃষ্ণকে আঘাত করার প্রবণতায় তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উগ্র ক্রোধ, তাই তিনি কৃষ্ণের অবিশ্বস্ত প্রেমকে আক্রমণ করেছেন। কৃষ্ণের যে গভীর

প্রেম একদা রাধাকে কুলশীল ভুলিয়েছিল, সেই প্রেমের ত্রিভাগের আধের-আধও আর অবশিষ্ট নেই। তাই গভীর হতাশায় রাধা কৃষ্ণকে দোষ না দিয়ে নিজেকেই দোষী করেন। এরপর ধীরে ধীরে রাধার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়। তিনি আপাত নির্বিকার ঔদাসীন্যে পিরীতি ঘোচানোর জন্য কৃষ্ণকে সাধুবাদ দেন। কিন্তু এরপর একদা প্রভাতে যখন কৃষ্ণ অধরে কাজল আর কপালে সিন্দুর নিয়ে রাধার সামনে এসে দাঁড়ান—তখন রাধার ধৈর্য আর বাঁধ মানে না। তীব্র ব্যঙ্গে তিনি কৃষ্ণকে 'সোনার বন্ধু' বলে সম্বোধন করে আঙ্গিনার কাছেও আসতে বারণ করে দেন। তারপর কৃষ্ণকে প্রণাম জানিয়ে দূরে থাকার অনুরোধ করেন। গোটা পদটিতে রাধার এই তীব্র ক্রোধজনিত ব্যঙ্গের নির্মম নিষ্ঠুরতা দেখে মনে হয় আক্ষেপানুরাগের রাধা কতখানি আঘাত পেয়ে তারপর ক্রোধের এই বিষ উদ্গীরণ করেছেন। নিজেরই সৃষ্ট রাধার এই দুর্দমনীয় ক্রোধে সন্ত্রস্ত চণ্ডীদাস ভণিতায় বলেন—

............ইহা বলিলা কেমনে।
চোর ধরিলেহ এত না কহে বচনে ॥[৩৪৩]

কিন্তু এতেও রাধার ক্রোধ শান্ত হয় না। কৃষ্ণের মুখ শুকিয়ে গেছে দেখে রাধা কপট সহানুভূতি জানান। যে নারীর প্রেম কৃষ্ণকে এমন বিপর্যস্ত করে দিয়েছে তাকে তিরস্কার করে রাধা যখন বলেন—

ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই
কাছে বস আঁচলেতে মুখখানি মুছাই ॥[৩৪৪]

তখন এই ব্যঙ্গের আড়াল থেকেও কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার পরিচিত মূর্তিটি ক্রোধের ছদ্ম আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসে। এই প্রসঙ্গে একটি পদ সম্পূর্ণই উদ্ধৃতির যোগ্য—

নীল বরণ ঝামর হয়েছে, মলিন হয়েছে দেহ।
কোন্ কুলবতী, রজনি পেয়ে, নিঙ্গাড়ি লয়েছে সেহ ॥
তাম্বুলের দাগ, অধরে লেগেছে, কালায় উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া, ও মুখ দেখিলাম, দিবস যাইবে ভাল ॥
ভালের উপরে সিন্দুরের বিন্দু, ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও, ফিরিয়া দাঁড়াও, ভাল করে তোমা দেখি ॥
ছি ছি পুরুষ হইয়া, এমন করহ, নারী হৈয়া সহি মোরা।
চণ্ডীদাস কয়, আপন স্বভাব, ছাড়িতে না পারে চোরা ॥[৩৪৫]

প্রতিদ্বন্দ্বিনী নায়িকার তীব্র সমালোচনায় রাধা এখানে মুক্তকণ্ঠ। প্রতিনায়িকার প্রসাধন চিহ্নিত কৃষ্ণের শরীর দেখে ব্যঙ্গ, অবশেষে ভালো করে দেখার জন্য ফিরে দাঁড়ানোর অনুরোধ—সব কিছুর মধ্যেই অপেক্ষমানা অপমানিতা প্রেমিকার ব্যর্থ রজনীযাপনের গ্লানির ব্যঙ্গবিদ্ধ প্রকাশ। কিন্তু শেষে যখন রাধা বলে ওঠেন—

ছি ছি পুরুষ হইয়া, এমন করহ, নারী হৈয়া সহি মোরা।

তখন ক্রোধের জ্বালা নয়, ঈর্ষার তীব্রতা নয়, ঘৃণার অকুণ্ঠ প্রকাশ নয়—আমরা বুঝতে পারি ক্রোধস্ফুরিতা রাধার বিদ্যুৎবর্ষী দুটি চোখ জলে ভরে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি আর একক ব্যক্তিসত্তা নন, হয়ে উঠেছেন স্বেচ্ছাচারী পুরুষের অসঙ্গত প্রেমের ফাঁদে পড়া মধ্যযুগীয় বাংলার তথা দেশকাল নির্বিশেষে সমগ্র নারীসমাজের প্রতিনিধি। ক্রোধের স্ফুরণের পর নিরুপায় বেদনায় ভেঙ্গে পড়া এই রাধাই চণ্ডীদাসের রাধা। বিষাদের

অশ্রুজলরচিতা জীবন্ত প্রতিমা। খণ্ডিতা রাধার এই ক্রুদ্ধ উক্তির প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ যথারীতি নিজের দোষস্খালনের চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু তাতে রাধা আরও বেশী ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কলহান্তরিতা রাধার আক্ষেপের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রেমের যন্ত্রণাময় স্বরূপটি পরবর্তী সময়ে অভিব্যক্ত—

মনের দুঃখের কথা মনেতে রহিল।
ফুটিল সে শ্যামশেল বাহির না হইল॥[৩৪৬]

কিন্তু বিরহ পর্যায়ে রাধার কণ্ঠে কৃষ্ণের প্রতি অগ্নিক্ষরা অভিযোগ নয় বেজে ওঠে হাহাকার—

অগোর চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
পিয়া বিনু হিয়া মোর ফাটিয়া যে যায়॥[৩৪৭]

পদটিতে একদা প্রিয়মিলন মুগ্ধা, প্রিয়সান্নিধ্যে আনন্দিতা রাধার তীব্র বেদনাই অনুরণিত। পদটির পটভূমি যমুনাতীর, সম্ভবত রাধাকে সখীরা বলেছেন যে কৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে নেই, কিন্তু সে কথা রাধার বিশ্বাস হয় নি। সখীদের সঙ্গে মিলন স্থান যমুনার তীরে গিয়ে রাধা দেখলেন সত্যিই কৃষ্ণ চলে গেছেন। চণ্ডীদাসের মুগ্ধা, অবোধ রাধার ছবিটি এখানে বড় জীবন্ত। রাধা বললেন, কৃষ্ণ তাঁকে ছেড়ে কোন দেশে গেলেন? কৃষ্ণ বিরহে তিনি বিষ খেয়ে মরবেন। কৃষ্ণের চূড়ার ফুলটুকু তাঁর কাছে থেকে গেছে, সেই ফুল গলায় গেঁথে তিনি আগুনে পুড়ে মরবেন। অবশেষে রাধা সখীদের বলেন—

তোমরা চলিয়া যাহ আপনার ঘরে।
মরিব অনলে পুড়ি যমুনার তীরে॥[৩৪৮]

নিতান্ত সহজ সরল ভাষায় রাধার হৃদয়ের গভীরতম বিরহার্তিই এখানে প্রকাশিত। বিরহিণী রাধা তাঁর অলক্ষ্য অন্তরালবর্তী প্রেমিককে সম্বোধন করে তাঁর সারাজীবনের সাধের কথা বলেন। রাধার সাধ ছিল—

চাঁচর কুন্তলে, ধরি দুই করে, মুছিব ও রাঙ্গা পায়।
চন্দন ঘসিয়া শ্রীঅঙ্গে লেপিব, চামর ঢুলাব গায়॥[৩৪৯]

সেবাময়ী শ্রীরাধার এই সাধই চিনিয়ে দেয় চৈতন্যপূর্ব রাধাকে। চৈতন্যপরবর্তী কালে রাধা নয়—রাধার সখীরাই এইভাবে রাধাকৃষ্ণের সেবা করে। আবার কখনও এই রাধাই কৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল হয়ে, কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার কথা ভেবে অধীর যন্ত্রণায় মাটিতে গড়াগড়ি দেন। রাধার এই অবস্থা দেখে সখীরা সারি সারি কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে। রাধার এই আন্তরিক গভীর দুঃখে সখীরা সান্ত্বনা দেওয়ারও সাহস হারিয়ে ফেলে। অবশেষে শোকের এই দুর্নিবার আবেগ স্তিমিত হলে বেরিয়ে আসে মর্মনিংড়ানো রক্তে আর অশ্রুতে মেশানো বিন্দু বিন্দু বেদনার মণি—

পিয়া গেল দূর দেশে হাম অভাগিনী
শুনিতে না বাহিরায় এ পাপ পরাণী॥[৩৫০]

শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ বিরহিণী রাধা বলেন—

গরল গুলিয়া দেহ জিহ্বার উপরে।
ছাড়িব পরাণ মোর কি কাজ শরীরে॥[৩৫১]

এই বিষামৃতময় প্রেম, অস্তিত্বের অনলজ্বালা, সলিলসিক্ত এই সারসুরভির মধুর দহনে দুর্মোচ্য ক্ষতের প্রলেপ রূপে অবশেষে মরমিয়া চণ্ডীদাসের সান্ত্বনার স্নিগ্ধকণ্ঠ উচ্চারিত হয় রাধাকে লক্ষ্য করে—

পিরিতি নগরে বসতি করহ
থাকহ পিরিতি মাঝে।
সকল তেজিয়া পিরিতে মজহ
কি করে লোকের লাজে ॥
পিরিতি বলিয়া নিশান তুলিয়া
দাও না ভুবন ভরি।
পিরিতি রসের কলঙ্ক পাইলে
বিলম্ব নাহিক করি ॥ [৩৫২]

প্রেমই চণ্ডীদাসের সর্বস্ব। 'সমাজসংসার' আর 'জীবনের কলরব' তাঁর কাছে মিথ্যা, সত্য কেবল হৃদয় দিয়ে 'হৃদি অনুভব'। তাই অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অবধারিত যে আশ্রয় সেই আশ্রয়ের জন্য তিনি পরিকল্পনা করেন 'পিরিতি নগরের'। পিরিতির সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করতে পিরিতি লাঞ্ছিত পতাকা উত্তোলনের সংকল্পও তাঁরই।
আবার চণ্ডীদাসের রাধার নম্র ভালবাসায় পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব স্ফুরিত হয়েছে নিবেদনে। গীতায় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ [৩৫৩]

চণ্ডীদাসের রাধাও একইভাবে কৃষ্ণকে বলেছেন—

সব সমর্পিয়া কায় মন হিয়া—
নিশ্চয় হইল দাসী ॥[৩৫৪]

কিন্তু রাধার ভক্তির মধ্যে ঐশ্বর্যভাব বিন্দুমাত্র নেই। তাঁর কৃষ্ণপ্রেম তাঁর জীবনের একমাত্র সম্বল। তাই রাধা জন্মে জন্মে, জীবনে মরণে সবসময়েই কৃষ্ণকে প্রাণনাথ মনে করেন। সমগ্র বৃন্দাবনে শ্বশুরকুলে, পিতৃকুলে, কোন কুলেই রাধার কৃষ্ণছাড়া আর কেউ নেই। ত্রিভুবনে তিনি কৃষ্ণ ছাড়া আর কাউকে আপন বলে ভাবতে পারেন না। তাই রাধা বলেন—

শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়।[৩৫৫]

চণ্ডীদাসের এই নিরাভরণ পদগুলির মধ্যে রাধার হৃদয়ের এই নিঃশেষ সমর্পণের সুর যেন স্নিগ্ধ চন্দনগন্ধ বাসিত। চণ্ডীদাসের রাধার পূর্বরাগে হৃদয়মথিত বেদনার সুর, মিলনের আনন্দেও প্রেমবৈচিত্ত্যের সশঙ্ক বেদনা; আক্ষেপানুরাগে সমাজ, পরিবার ও প্রেমের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত সত্তার আর্ত হাহাকার। বিরহ পর্যায়েও সেই অনির্বাণ বেদনা-ধারার অবিরল প্রবাহ। কিন্তু অবশেষে নিবেদনের পদে রাধার অশ্রু-স্রোতস্বিনী যেন কৃষ্ণসমুদ্রের মাঝখানে বিলীন। এই সমর্পণেই তাঁর শান্তি, তাঁর বিশ্রাম; তাঁর সত্তার দ্বিধাবিভিন্ন যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি। কিন্তু এই কবির রাধা বড় ভীরু। দুর্ভাগ্যের

হাতে লাঞ্ছিত, হতভাগ্যের মত নিজের সৌভাগ্যে অবিশ্বাসী। তাঁর মনে ভয়, আবার কোন্ অতর্কিত বাধা আসবে, আবার বাজবে বিচ্ছেদের করুণ রাগিণী। তাই জয় করেও তাঁর ভয় যায় না। তিনি কাতরভাবে বলেন—

না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।[৩৫৬]

অন্য নায়িকা বিলাসী কৃষ্ণের প্রতি রাধার ব্যঙ্গমিশ্রিত বাক্যবাণ এখন হারিয়ে গেছে। তিনি কৃষ্ণকে অনুনয় করে বলেন—

বঁধু, ভিন না বাসিও তুমি।
পতি গুরুজন এ ঘর করণ
সকল ছাড়্যাছি আমি॥[৩৫৭]

কৃষ্ণই রাধার ঐশ্বর্য, তাঁর জীবন যৌবন, তাঁর গলার হার। কৃষ্ণকে দেখার জন্য রাধা বারবার নাচদুয়ারে যান। আবার সেই সঙ্গে ভয়ও হয়—পাছে কেউ তাঁকে দেখে ফেলে। গুরুজনের কুবচন রাধার কাছে কালসাপের মতই মনে হয়। এই বিরুদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বস্ব সমর্পণ, একান্ত আতুরভাবে কৃষ্ণের প্রণয় প্রার্থনা চণ্ডীদাসের বিষাদপ্রতিমা রাধার মূর্তিকে আরও করুণ করে তুলেছে।

এই রাধাকে, এই রাধার বেদনাকে, তাঁর প্রেম আর প্রেমের সমস্যাকে রূপায়িত করার জন্য চণ্ডীদাস গ্রাম বাংলার মুখের ভাষাকেই ব্যবহার করেছেন। পল্লীসমাজের বাস্তব পরিবেশেই স্থাপিত হয়েছে তাঁর রাধাকৃষ্ণপ্রেমকথার নিরাভরণ অথচ গভীর সৌন্দর্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি গ্রামজীবনের সমস্ত স্থূলতাকে কাব্যের মূলরস-প্রবাহের সঙ্গে মিশিয়ে আমাদের তিনটি জীবন্ত চরিত্র উপহার দিয়েছেন। আর এই চণ্ডীদাস গ্রামজীবনের কোমল শ্যামল মধুরিমা দিয়ে গড়ে তুলেছেন তাঁর রাধাকে। জীবনানন্দের "শান্ত, অনুগত, বাংলার নীল সন্ধ্যা"র মত কোমল রাধার ভাবমূর্তি। তাঁর মর্মবেদনার প্রকাশ ঘটেছে চণ্ডীদাসের সহজ অথচ গভীর, অনাড়ম্বর অথচ অতলান্ত অর্থবহতায় উজ্জ্বল ভাষার মধ্যে। ভাষা ভঙ্গিমাই তাঁকে শুধু রোমান্টিক থাকতে দেয় নি, মিস্টিক করে তুলেছে। রাধার বড় সাধের শ্যামপিরিতিকে তিনি বলেন 'ডাকাতিয়া'। এই ডাকাতিয়া প্রেমে বাধা আসে 'ডাহিনী সদৃশ' পাড়া-পড়শীর কাছ থেকে। রাধাকে 'বংশীদংশন' করে। রাধার প্রেমসায়রে আছে 'জলের শেহলা' গুরুজন; 'কুল পানিফল', আছে 'কলঙ্ক পানা', গায়ে লাগলে কুটকুট করে। একেবারে মুখে বলা আটপৌরে, তাৎপর্যহীন শব্দগুলোকে কি আশ্চর্য নৈপুণ্যে ব্যবহার করে কবি তাঁর কাব্যকে নন্দিত করেছেন, পানা, শ্যাওলা, কুটকুট করা, ছাঁকা, জিয়ল মাছ প্রভৃতির মত একেবারে গদ্যময় শব্দকে জীবনের গভীরচারী সত্য প্রকাশের জন্যই জীবনানন্দের কত আগে ব্যবহার করেছেন এই কবি। এই শব্দগুলোই আবার রাধাচরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তার চারপাশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে তুলে ধরেছে। ননদিনীর অভিযোগের উত্তরে রাধা যখন বলে "রাবে রাবে তুমি কাণ ভাঙ্গা দাও", তখন একেবারে বাংলাদেশের অন্তঃপুরের মুখের ভাষাই শোনা যায়। সর্পবহুল পল্লীবাংলায় ঘরের ভেতর সাপের অবস্থান এখনও পর্যন্ত একটি পরিচিত ঘটনা।

'পরবশ পিরিতি' তাই 'আঁধার ঘরে সাপে'র মতই বিপজ্জনক। গুরুজনদের কুবচনও রাধার কাছে কালসাপ দংশনের মতই ভয়ংকর। অন্তরের বিচিত্র গভীর ভাবকে প্রকাশের জন্যই কবি এই ভাষা ব্যবহার করেছেন। এই ভাষার মাধুরীতেই তাঁর রাধাকৃষ্ণপ্রেমকথা অনন্য হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণকথার বিকাশের ধারায় এ পর্যন্ত আমরা দেখেছি কলরবমুখর বহির্মুখী জীবন চাঞ্চল্যই ছিল কৃষ্ণকথার অবলম্বন। চণ্ডীদাসেই দেখা গেল তার প্রথম ব্যতিক্রম। জীবনের গভীর—গভীরচারী প্রেম ব্যক্ত কবির অনুভবে যে গূঢ় আলোড়ন সৃষ্টি করে, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকথা তাকেই অবধারণ করে প্রকাশ করল অসাধারণ জীবনানুগত্য। তাঁর রাধাকৃষ্ণলীলাকথা শুধু প্রেম সর্বস্বই নয়, প্রেমের গভীরতম রহস্য উন্মোচনে সিদ্ধ। পরবর্তীকালে প্রেমধর্মের যে বিপুল গৌরব ও মহিমা মহাপ্রভুর জীবন সাধনায় রূপলাভ করেছিল—চণ্ডীদাসে যেন তারই পূর্ব পটভূমি।

উল্লেখ পঞ্জী

৬. সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ; পৃ. ১৮১ (৬ষ্ঠ সং)।

৮. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৯ (২য় সং)।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা; ১ম সংখ্যা, ১৩২৬।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪-৯৫।

সুখময় মুখোপাধ্যায়; প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, পৃ. ৬৩

ভাগবত; ১০।২১।২, ১০।২১।১৪, ১০।২৯।৩

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (৭ম সং) পৃ. ২৯৩, ৩২৩।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ' (১৩৮৪) ৫।১৯

তদেব—১০।১৫

তদেব—১০।১৬

তদেব—১০।৪

শ্রী. কৃ (দানখণ্ড); পৃ. ২৯

১৩. গীতগোবিন্দম্—৪।২

১৪. শ্রী. কৃ (রাধাবিরহ) পৃ. ১৪৯

১৫. গীতগোবিন্দম্—৪।৩

১৬. শ্রী. কৃ (রাধাবিরহ) পৃ. ১৫০

১৭. গীতগোবিন্দম্—১০।২

১৮. শ্রী. কৃ (বৃন্দাবন খণ্ড) পৃ. ৮৫

১৯. তদেব; পৃ. ৮৬

২০. গীতগোবিন্দম্—১০।৫

২১. শ্রী. কৃ (বৃন্দাবন খণ্ড) পৃ. ৮৬

২২. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (৩য় সং) গ্রন্থের ভূমিকা; পৃ. ১৪৩-৪৮

২৩. শ্রী. কৃ (বাণ খণ্ড) পৃ. ১০৭

২৪. শ্রী. কৃ (তাম্বুল-খণ্ড) পৃ. ১১

২৫. Traditional Indian Theatre; Kapila Vatsyan, 1980, pp. 138-39 শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাট্য প্রকৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য 'বাংলা লোক-নাট্য সমীক্ষা' গ্রন্থে। পৃ. ১৪৭-১৫২

২৬. সত্যবতী গিরি ; কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়—বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৯-৮০ ; প্রবন্ধ—'উমাপতির পারিজাত-হরণম্ঃ একটি সমীক্ষা'।
২৭. ড. সুকুমার সেন ; বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, প্রবন্ধ—'মঙ্গলযাত্রা, নাটগীত ও পাঁচালী কীর্ত্তন' পৃ. ৭৪
২৮. 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য'—ড. বিমানবিহারী মজুমদার (১৯৬১) পৃ. ২৩৩-৩৫
২৯. তারাপদ মুখোপাধ্যায় ; শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (১৩৭৮) : পৃ. ৯৭ (এই গ্রন্থের 'স্থান-কাল' নামক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য)
৩০. শ্রী. কৃ (দান খণ্ড) পৃ. ২৩
৩১. তদেব ; পৃ. ৫০ এবং পৃ. ৩৮
৩২. তদেব (তাম্বুল খণ্ড) পৃ. ১২
৩৩. শ্রী. কৃ (দান খণ্ড) ; পৃ. ২৫
৩৪. তদেব ; পৃ. ২০
৩৫. তদেব (রাধাবিরহ) ; পৃ. ১৪১
৩৬. তদেব (যমুনা খণ্ড) ; পৃ. ৯৫
৩৭. তদেব (বৃন্দাবন খণ্ড) ; পৃ. ৮০
৩৮. তদেব (রাধাবিরহ) ; পৃ. ১৫৪
৩৯. তদেব ; পৃ. ১৭৫
৪০. কুমারসম্ভবম্ (৫ম সর্গ) ; শ্লোক—১৯
৪১. তদেব ; ১।২৫
৪২. শ্রী. কৃ (জন্ম খণ্ড) ; পৃ. ৩
৪৩. তদেব (দান খণ্ড) ; পৃ. ২৯
৪৪. তদেব (ছত্র খণ্ড) ; পৃ. ৭৭ শৃঙ্গারতিলকের তুলনীয় শ্লোকটি—
বাহূ দ্বৌ চ মৃণালমাস্যকমলং লাবণ্য-লীলাজলং,
শ্রেণীতীর্থশিলা চ নেত্র-শফরং ধম্মিল্ল-শৈবালকম।
কান্তায়াঃ স্তনচক্রবাক-যুগলং কন্দর্পবাণান-লৈর্দ্দগ্ধানামব
গাহনায় বিধিনা রম্য সরো নির্মিতম্।
৪৫. শ্রী. কৃ (বংশী খণ্ড) ; পৃ. ১২৯
৪৬. গীতগোবিন্দ ; ১০।১৫
৪৭. শ্রী. কৃ (তাম্বুল খণ্ড) ; পৃ. ৫
৪৮. গীতগোবিন্দ ; ৪।৩
৪৯. শ্রী. কৃ (বংশী খণ্ড) ; পৃ. ১১৬। তুলনীয়—উত্তররামচরিত ; ৩।১
৫০. কুমারসম্ভব ; ৫।৪৩
৫১. শ্রী. কৃ (দান খণ্ড) পৃ. ৩৯
৫২. তদেব (রাধাবিরহ) ; পৃ. ১৫০
৫৩. গীতগোবিন্দ, ৪।১০
৫৪. শ্রী. কৃ. (রাধাবিরহ) ; পৃ. ১৪৭
৫৫. ভাগবত ; ১০।৭৪।৬
৫৬. অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ; ৫ম অঙ্ক, ১ম গীতি।
৫৭. কুমারসম্ভবম্ ; ১।৩৯
৫৮. শ্রী. কৃ (দান খণ্ড) ; পৃ. ২৪
৫৯. শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা সর্বস্ব টীকা থেকে পুনরুদ্ধৃত ; পৃ. ২০৯
৬০. শ্রী. কৃ (রাধাবিরহ) ; পৃ. ১৭০
৬১. খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলী (পরবর্তী উল্লেখ বি. প) ; পদ—৩০
৬২. শ্রী. কৃ (রাধাবিরহ) ; পৃ. ১৭৫
৬৩. শ্রী. কৃ (ভাষা সর্ব্বস্ব টীকা) পৃ. ২৮১
৬৪. শ্রী. কৃ (জন্ম খণ্ড) পৃ. ১
৬৫. তদেব (দান খণ্ড) ; পৃ. ৩৯
৬৬. তদেব (দান খণ্ড) ; পৃ. ৩৫
৬৭. তদেব (দান খণ্ড) ; পৃ. ১৯
৬৮. তদেব (যমুনা খণ্ড) ; ৯৫, (ভার খণ্ড) ; পৃ. ৬৮
৬৯. তদেব (রাধাবিরহ) পৃ. ১৩৮
৭০. তদেব ; ১৫৭
৭১. তদেব ; ১৪৫
৭২. তদেব (দান খণ্ড) ; পৃ. ৩৫
৭৩. তদেব (যমুনা খণ্ড) ; পৃ. ৯৫
৭৪. তদেব (দান খণ্ড) পৃ. ৩৯
৭৫. তদেব (ভার খণ্ড) পৃ. ৬৮
৭৬. তদেব ; ৬৮
৭৭. তদেব (দান খণ্ড) পৃ. ৫০
৭৮. তদেব (বংশী খণ্ড) পৃ. ১১৬
৭৯. তদেব (রাধাবিরহ) পৃ. ১৪৫
৮০. তদেব ; পৃ. ১৫৫
৮১. তদেব (ভার খণ্ড) ; পৃ. ৭১
৮২. তদেব (দান খণ্ড) পৃ. ৪৮
৮৩. তদেব (ছত্র খণ্ড) ; পৃ. ৭৮

৮৪. তদেব (রাধাবিরহ) ; পৃ. ১৫৭
৮৫. তদেব (বংশী খণ্ড) ; পৃ. ১২৫
৮৬. তদেব (রাধাবিরহ) ; পৃ. ১৪৭
৮৭. তদেব (দান খণ্ড) ; পৃ. ৪০
৮৮. তদেব ; পৃ. ৪৬
৮৯. তদেব ; (বাণ খণ্ড) পৃ. ১১২
৯০. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী ; ৪৬৭
৯১. তদেব ; পৃ. ৪৮৬
৯২. শ্রী. কৃ (তাম্বুল খণ্ড) ; পৃ. ১০
৯৩. তদেব (বৃন্দাবন খণ্ড) ; পৃ. ৭৯
৯৪. তদেব (যমুনা খণ্ড) ; পৃ. ৯৫
৯৫. তদেব (দান খণ্ড) ; পৃ. ১৭
৯৬. তদেব (যমুনা খণ্ড) ; পৃ. ৯৫
৯৭. তদেব (ছত্র খণ্ড) ; পৃ. ৭৮
৯৮. অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, মধ্য যুগের কবি ও কাব্য (৫ম সং) পৃ. ৫৯
৯৯. তদেব : পৃ. ৫৯
১০০. শ্রী. কৃ (তাম্বুল খণ্ড) পৃ. ৮
১০১. তদেব (দান খণ্ড) ; পৃ. ২১
১০২. তদেব ; পৃ. ৪২
১০৩. তদেব (নৌকা খণ্ড) ; পৃ. ৬৫
১০৪. তদেব (রাধাবিরহ) ; পৃ. ১৩৫-৬
১০৫. তদেব (বংশী খণ্ড) ; পৃ. ১২২
১০৬. তদেব (রাধাবিরহ) ; পৃ. ১৪৭
১০৭. তদেব ; পৃ. ১৪৫
১০৮. ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড—পূর্বার্দ্ধ (৬ষ্ঠ সং), পৃ. ১৮১
১০৯. শ্রী. কৃ (বৃন্দাবন খণ্ড) পৃ. ৮৬
১১০. তদেব ; পৃ. ৮৯
১১১. তদেব (তাম্বুল খণ্ড) ; পৃ. ১০
১১২. তদেব ; পৃ. ৫
১১৩. তদেব ; পৃ. ৬
১১৪. তদেব (ছত্র খণ্ড) ; পৃ. ৭৭
১১৫. তদেব (বাণ খণ্ড) ; পৃ. ১১১
১১৬. তদেব (রাধাবিরহ) ; পৃ. ১৩২
১১৭. তদেব ; পৃ. ১৩৬
১১৮. ভাগবত ; ১০।১৩।৩০
১১৯. মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৪৪ ; পৃ. ১২৪
১২০. ভাগবত ; ১০।৩৯।১৪-৩১
১২১. তদেব ; ১০।৪।১২
১২২. তদেব ; ৯।৩
১২৩. শ্রীকৃষ্ণবিজয় ; পৃ. ২০৭
১২৪. তদেব ; শ্লোক—২৬৮৪
১২৫. অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের সৌজন্যে তথ্যটি প্রাপ্ত
১২৬. সত্যবতী গিরি, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা—১৯৭৯-৮০ (প্রবন্ধ 'উমাপতি উপাধ্যায়ের পারিজাত হরণ : একটি সমীক্ষা')
১২৭. অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু, 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' পৃ. ২৩২
১২৮. বিদ্যাপতির পদাবলী (মিত্র মজুমদার সং) ; পদ—৬১১
১২৯. তদেব ; পদ-৬১২
১৩০. সদুক্তিকর্ণামৃত , ২।২।৪
১৩১. বিদ্যাপতির পদাবলী ; পদ-৬১৩
১৩২. সদুক্তিকর্ণামৃত ; ২।২।৫
১৩৩. বিদ্যাপতির পদাবলী ; পদ-৬১৪, ৬১৫
১৩৪. তদেব ; পদ-৬১৫
১৩৫. সাহিত্য দর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ ; বিদ্যাপতির পদাবলী হতে পুনরুদ্ধৃত, পৃ. ৩১৯
১৩৬. বিদ্যাপতির পদাবলী ; পদ-৬১৩
১৩৭. তদেব ; পদ-৬১০
১৩৮. তদেব ; পদ-৬১১
১৩৯. তদেব ; পদ-৬১২
১৪০. তদেব ; পদ-৬১৩, ৬১৪
১৪১. তদেব ; পদ-৬১৪
১৪২. তদেব ; পদ-৬১৭
১৪৩. তদেব ; পদ-১৭, ১৮
১৪৪. কুমারসম্ভব ; ১।২৫
১৪৫. বিদ্যাপতির পদাবলী ; পদ-১৮
১৪৬. তদেব ; পদ-২১৮
১৪৭. তদেব ; পদ-৬২৫
১৪৮. তদেব ; পদ-৬২৬
১৪৯. তদেব ; পদ-৬২৬
১৫০. তদেব ; পদ-৬২৪
১৫১. তদেব ; পদ-৬২৩

১৫২. তদেব ; পদ-৫৪
১৫৩. তদেব ; পদ-৩৪৬
১৫৪. তদেব ; পদ-৬২৬
১৫৫. তদেব ; পদ-৩৩
১৫৬. তদেব ; পদ-৩৫
১৫৭. গীতগোবিন্দ ; ১।৪৬
১৫৮. বিদ্যাপতির পদাবলী ; পদ-৬৩০
১৫৯. অমরুশতক, বিদ্যাপতির পদাবলী থেকে পুনরুদ্ধৃত ; পৃ. ২৯
১৬০. বিদ্যাপতির পদাবলী ; পদ-৩৪
১৬১. তদেব ; পদ-২৪১
১৬২. তদেব ; পদ-৩৪৬
১৬৩. শ্রী. কৃ (তাম্বুল খণ্ড) ; পৃ. ৮
১৬৪. পদটি বাঙ্গালী বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত, বৈষ্ণব পদাবলী (ক. বি.) পূর্বরাগ ও অনুরাগ, পদ-১২
১৬৫. বিদ্যাপতির পদাবলী ; পৃ. ৭০৫
১৬৬. গীতগোবিন্দ, ৩।১১
১৬৭. বিদ্যাপতির পদাবলী ; পদ-৭০৪
১৬৮. তদেব ; পদ-৪৩
১৬৯. তদেব ; পদ-৪৪
১৭০. তদেব ; পদ-৬৩৩
১৭১. শার্ঙ্গধর পদ্ধতি-১০৯৫
১৭২. বিদ্যাপতির পদাবলী ; পদ-২৩৮
১৭৩. তদেব ; পদ-৯১
১৭৪. তদেব ; পদ-১১২
১৭৫. তদেব ; পদ-৮৯
১৭৬. তদেব ; পদ-৬৩৫
১৭৭. তদেব ; পদ-৮৬
১৭৮. গীতগোবিন্দ ; ৫।১২
১৭৯. বিদ্যাপতির পদাবলী ; পদ-৩৬১
১৮০. তদেব ; পদ-৩৬৫
১৮১. তদেব ; পদ-৩৩৫
১৮২. গাথাসপ্তশতী ; ৭।৭
১৮৩. বিদ্যাপতির পদাবলী ; পদ-৬৩৬
১৮৪. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রচনাবলী, ১ম খণ্ড ; পৃ. ২৫০
১৮৫. বিদ্যাপতির পদাবলী ; পদ-৯৪
১৮৬. গাথাসপ্তশতী ; ৩।৪৯
১৮৭. বিদ্যাপতির পদাবলী ; পদ-৯৫
১৮৮. তদেব ; পদ-৩২৮
১৮৯. তদেব পদ-৩১৬
১৯০. তদেব পদ-৩৩২
১৯১. তদেব পদ-৩১৫
১৯২. তদেব পদ-৯২২
১৯৩. তদেব পদ-১০৮
১৯৪. তদেব পদ-১০৯
১৯৫. তদেব ; পদ-১০৪
১৯৬. তদেব ; পদ-১০৪
১৯৭. তদেব ; পদ-১০৬
১৯৮. চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি—শঙ্করীপ্রসাদ বসু পৃ. ২৭৯
১৯৯. বিদ্যাপতির পদাবলী ; পদ-৬৮, ৬৯
২০০. তদেব ; পদ-৭০
২০১. তদেব ; পদ-৭০৩
২০২. তদেব ; পদ-৪৯
২০৩. তদেব ; পদ-৫১
২০৪. তদেব ; পদ-৩৪৪
২০৫. তদেব ; পদ-৩৫১
২০৬. তদেব ; পদ-৩৭২
২০৭. গীতগোবিন্দ ; ৭।১৩
২০৮. শ্রী. কৃ (রাধাবিরহ) ; পৃ. ১৩৯
২০৯. বিদ্যাপতির পদাবলী ; পদ-৩৭০
২১০. তদেব ; পদ-৩৭৪
২১১. তদেব ; পদ-৪১৭
২১২. তদেব ; পদ ১২৪
২১৩. তদেব ; পদ-৩৯৪
২১৪. তদেব ; পদ-৬৪৯
২১৫. তদেব ; পদ-৬৪৯
২১৬. তদেব ; পদ-৬৫১
২১৭. তদেব ; পদ-৬৫০
২১৮. তদেব ; পদ-৬৫৭
২১৯. তদেব ; পদ-৬৭৯
২২০. তদেব ; পদ-৬৬০
২২১. তদেব ; পদ-২৯২
২২২. তদেব ; পদ-২৯৪
২২৩. তদেব ; পদ-২৯৭
২২৪. তদেব ; পদ-৬৯২
২২৫. তদেব ; পদ-৬৯৪
২২৬. তদেব ; পদ-৬৯৭
২২৭. তদেব ; পৃ. ৪৩৫

২২৮. তদেব ; পদ-৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭
২২৯. তদেব ; পদ-২৯১
২৩০. তদেব ; পদ-৭৬
২৩১. তদেব ; পদ-৭৮
২৩২. তদেব ; পদ-৪৮৯
২৩৩. তদেব ; পদ-৭৬২
২৩৪. তদেব ; পৃ. ৪৭৩ (পুনরুদ্ধৃত)
২৩৫. তদেব ; পদ-৬৫৯
২৩৬. তদেব ; পদ-১৯২
২৩৭. তদেব ; পদ-৭১৩
২৩৮. তদেব ; পদ-৭২২
২৩৯. 'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী'—বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত; পদ-২৫
২৪০. তদেব
২৪১. বৈষ্ণব পদাবলী (ক. বি.), মাথুর ; পদ-
২৪২. বিদ্যাপতির পদাবলী ; পদ-৪৫৫
২৪৩. তদেব পদ-৭১৬
২৪৪. তদেব পদ-৭১৭
২৪৫. তদেব পদ-৭২৬
২৪৬. তদেব পদ ১৭০
২৪৭. তদেব ৭২৫
২৪৮. তদেব ৭৩৩
২৪৯. তদেব পদ ৭২৭
২৫০. তদেব : পদ ৯১১
২৫১. তদেব ; পদ ৭৩৫
২৫২. তদেব পদ ৫৪৩
২৫৩. তদেব ; পদ ৭৩৬
২৫৪. গীতগোবিন্দ ; ৬। ১২শ গীত। ৫ম শ্লোক
২৫৫. বিদ্যাপতি পদাবলী ; পদ ৭৫১
২৫৬. তদেব ; পদ ৭৪৭
২৫৭. তদেব ; পদ ৭৫৪
২৫৮. তদেব ; পদ ৭৪৮
২৫৯. তদেব ; পদ ৭৪৮.
২৬০. বৈষ্ণব পদাবলী (ক. বি.) পৃ. ১০৩
২৬১. তদেব
২৬২. বিদ্যাপতির পদাবলী ; পদ ৬০৭
২৬৩. তদেব পদ ৬০৮
২৬৪. তদেব ; পদ ৬০৯
২৬৫. বৈষ্ণব পদাবলী (ক. বি.) পৃ. ১০৫
২৬৬. গীতগোবিন্দ ; ১। গীত ২। ২৪
২৬৭. শ্রী. কৃ. ; পৃ. ১২২
২৬৮. বিদ্যাপতির পদাবলী ; পদ ৭৬৩
২৬৯. তদেব ; ৬০৭
২৭০. তদেব ; পদ ৭৭৬
২৭১. বিদ্যাপতির পদাবলী পদ ৫৯৯, ৫৯৪, ৭৭৬ প্রভৃতি।
২৭২. তদেব , পদ ৬০৯
২৭৩. তদেব , পদ ১০
২৭৪. তদেব পদ ৭৬৭
২৭৫. তদেব পদ ৭১০
২৭৬. তদেব ; পদ ৭১২
২৭৭. তদেব ; পদ ৭১১
২৭৮. তদেব ; পদ ২৮১
২৭৯ তদেব ; পদ ৫৭৭
২৮০ তদেব ; পদ ৮৯
২৮১. তদেব ; পদ ৩৫
২৮২. চণ্ডীদাসের পদাবলী—ড. বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত ; পদ ১ [অতঃপর চ. প এবং পদ সংখ্যা অর্থে শুধু সংখ্যাই উল্লিখিত হবে।
২৮৩. তদেব
২৮৪. তদেব
২৮৫. চ. প ২
২৮৬. ,, ৫
২৮৭. ,, ৬
২৮৮. ব্যভিচারি প্রকরণ ৬৭ ; পদাবলী ২৩৮
২৮৯. চ. প ১২৪
২৯০. ,, ১২১
২৯১. ,, ২০০
২৯২. ,, ১২২
২৯৩. ,, ৭
২৯৪. ভাগবত ১০।৩১।১৫
২৯৫. চ. প ৯
২৯৬. ,, ১৪
২৯৭. তদেব
২৯৮. চ. প ১০
২৯৯. ,, ৪৫
৩০০. চণ্ডীদাসের পদাবলী থেকে পুনরুদ্ধৃত ; পৃ. ৫০
৩০১. চ. প ৪৬
৩০২. ,, ৫৭

৩০৩. চ. প ৫২
৩০৪. ,, ৫৩
৩০৫. ,, ৮
৩০৬. তদেব
৩০৭. চ. প ৯৪
৩০৮. তদেব
৩০৯. চ. প ১৮
৩১০. ,, ১
৩১১. ,, ২১
৩১২. ,, ৩২
৩১৩. ,, ১৩৮
৩১৪. ,, ৩৪
৩১৫. ,, ৪০
৩১৬. ,, ৪১
৩১৭. ,, ৪২
৩১৮. ,, ২৩
৩১৯. ,, ৬২
৩২০. ,, ২০৪
৩২১. ,, ১১০
৩২২. ,, ৫৯
৩২৩. তদেব
৩২৪. চ. প ৬৫
৩২৫. ,, ১৮১
৩২৬. ,, ৭৫
৩২৭. ,, ৭৬
৩২৮. ,, ১২৬
৩২৯. ,, ৮৩
৩৩০. ৮৪
৩৩১. চ. প ৮৫
৩৩২. ,, ৮৮
৩৩৩. তদেব
৩৩৪. চ. ত ৯৪
৩৩৫. ,, ৯৫
৩৩৬. ,, ৯৬
৩৩৭. ,, ৯৭
৩৩৮. ,, ৯৮
৩৩৯. ,, ৯৯
৩৪০. ,, ১৩৯
৩৪১. ,, ১৩৮
৩৪২. ,, ৫৯
৩৪৩. ,, ৬৭
৩৪৪. ,, ৬৮
৩৪৫. ,, ৬৯
৩৪৬. ,, ৭৫
৩৪৭. ,, ৭৫
৩৪৮. ,, ১৩০
৩৪৯. চ. প ১১৭
৩৫০. ,, ১১৯
৩৫১. তদেব
৩৫২. চ.প ১২০
৩৫৩. গীতা ৯।২৭
৩৫৪. চ. প ৫১
৩৫৫. তদেব
৩৫৬. চ.প ৫১
৩৫৭. চ. প ২৩

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও গোস্বামিগণ

॥ ক ॥

শ্রীচৈতন্যের অলোকসামান্য জীবন ও তাঁর ভক্তির একনিষ্ঠতা ও প্রাবল্য সমগ্র বাঙালী জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিল। ক্রমপ্রসারণশীল মুসলমানধর্ম হিন্দু সমাজের যে সীমাসংকোচন ঘটাচ্ছিল তাতে সেদিনের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু বাঙালী হয়ে পড়েছিল আরও বেশী রক্ষণশীল। জাতিভেদ প্রথাব প্রাচীর তুলে নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাকে আরও বেশী গাঢ়তর করে তুলেছিল। ধর্ম বিকৃত হয়েছিল প্রাণের স্পর্শশূন্য ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে, দেবোপাসনা পরিণত হয়েছিল ভক্তিহীন আচার পরায়ণতায়, কখনও কখনও নীরস বিশুষ্ক জ্ঞান চর্চায়। বৃন্দাবনদাস তাঁর চৈতন্যভাগবতে সমকালীন সমাজের সেই অদ্ভুত আঁধারকে রূপ দিয়েছেন।

এই পটভূমিতেই নবদ্বীপে, যেখানে ঐশ্বর্য আর বিদ্যার দম্ভ যুগপৎ বিকৃত করেছিল মানুষের প্রাণসত্তাকে, সেখানে আবির্ভাব ঘটল মহাপ্রভুর। কারও কারও মতে তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন দরিদ্র, আবার কোন কোন জীবনীকারের মতে তিনি মোটামুটি সচ্ছল অবস্থারই লোক ছিলেন। ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে ফাল্গুন দোল পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বহু সন্তানের মৃত্যু ও জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের সন্ন্যাসগ্রহণ জননী শচীদেবী ও পিতা জগন্নাথ মিশ্রকে একটু বেশী পরিমাণেই আশঙ্কাগ্রস্ত করে তুলেছিল। তাই এই কনিষ্ঠ সন্তান গৌরাঙ্গকে তাঁরা বিদ্যাভ্যাস করাতে চান নি। বালক গৌরাঙ্গ সুকৌশলে পিতামাতার কাছ থেকে বিদ্যাভ্যাসের অনুমতি আদায় করে নিলেন এবং অল্পবয়সেই অদ্বৈত আচার্যের কাছ থেকে কাব্য স্মৃতি ব্যাকরণে পাণ্ডিত্য অর্জন করে অধ্যাপক হলেন। পিতা জগন্নাথের মৃত্যুতে তাঁকে সংসারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হল। স্বনির্বাচিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে ষোল বছর বয়সে নিমাই বিবাহ করলেন। প্রথম জীবনে তাঁর মধ্যে ভক্তিভাবতো দেখাই যায় নি, উপরন্তু পাণ্ডিত্যের অহংকারে নবদ্বীপের বৈষ্ণবভক্ত বয়োজ্যেষ্ঠ মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতিকেও তিনি বিব্রত করে তুলেছেন। তেইশ বছর বয়সে গয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধ দিতে গিয়ে বিষ্ণু পদচিহ্নদর্শনে অকস্মাৎ এই পাণ্ডিত্যদর্পী উদ্ধত যুবকের পরিবর্তন ঘটল। এই পরিবর্তনের স্বরূপ অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠল গৃহ প্রত্যাবর্তনের পর সর্পাঘাতে প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে।

বৈদিক ধর্মের মানবিকতাবর্জিত অনুষ্ঠানসর্বস্বতার প্রতিবাদে যে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল, এক সময় তাকেই অবদমিত করে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল বিদ্যা, বিত্ত ও জাতিগত কৌলীন্যের অহংকার। মহাপ্রভু ধর্মের সেই গ্লানিকে আবার দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ, যীশুর মত শ্রীচৈতন্য ধর্ম প্রচারের

কাজে নামেন নি। তাঁর দিব্যভাবপূত জীবনাচরণই ভক্ত পরিকরদের প্রেরণা যুগিয়েছিল বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারের ও ভক্তিদর্শনের নবতর নির্মিতিতে। এ ব্যাপারে হয়তো কখনও কখনও কাজ করেছে তাঁর নিজেরও নির্দেশ।

গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীগৌরাঙ্গ এতখানি কৃষ্ণভাবে ভাবিত হয়ে পড়লেন যে, তাঁর পক্ষে আর পঠন-পাঠন সম্ভব হল না। শ্রীবাসের গৃহে সানুচর শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন সংকীর্তন গানে। এই সময়েই তাঁর সাত্ত্বিক ভাববিকাশে অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস প্রমুখ তাঁকে স্বয়ং কৃষ্ণ বলে অনুভব করলেন। এই সংকীর্তনগানে নবদ্বীপের তথাকথিত উচ্চবিত্ত ও অবৈষ্ণবেরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেও যাঁরা এতকাল অবহেলিত ও দৈন্যগ্রস্ত বলে দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছিল, তারা এই ভক্তিরসের ধারায় নবতর লোকধর্মের সন্ধান পেলেন।

এইভাবে নবদ্বীপের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চৈতন্যদেবের নবধর্ম ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করল। কিন্তু দেশের বৃহত্তর পরিধিকে স্পর্শ করার জন্য এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাসগ্রহণ করলেন চব্বিশ বছর বয়সে। কেশবভারতীর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করে তাঁর নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

জননীর অনুরোধে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনে না থেকে নীলাচলে থাকলেন। পুরীতে জগন্নাথ দর্শনের ব্যাকুলতায় ভাবাবেগে শ্রীচৈতন্য মন্দিরের দরজায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। পরে তিনি নদীয়ার পূর্বতন অধিবাসী নৈয়ায়িক ও অদ্বৈতবাদী বাসুদেব সার্বভৌমের গৃহে আশ্রয় পেলেন। এই অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতকে ভক্তিমতে বা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে বিশ্বাসী করে তোলা শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান কীর্তি। কিন্তু যুক্তিতর্কের সাহায্যে নয়, চৈতন্যদেব তাঁকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁর অলৌকিক ভাবাবেশ-সমৃদ্ধ কৃষ্ণভক্তির দ্বারা। এবং এই একই প্রভাব কাজ করেছিল সমকালীন ও পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য রচয়িতাদের উপরও। এক দিকে শ্রীচৈতন্যের কঠোর যতিজীবন এবং অন্যদিকে তাঁর দিব্যপ্রেমোন্মাদনা, উভয়ে মিলে জনসাধারণকে তাঁর ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে দৃঢ়নিশ্চয় ও তাঁর প্রেমধর্ম গ্রহণে উৎসুক করে তুলেছিল। এরপর শ্রীচৈতন্যের জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের প্রথমেই গোদাবরী তীরে প্রতাপরুদ্রের কর্মচারী রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও কয়েকদিনের আলোচনায় রাগভক্তির প্রতিষ্ঠা। ব্রজভাব, গোপীপ্রেম, রাধিকার মহাভাব এবং রাগাত্মিকা কৃষ্ণভজনের বিভিন্ন রীতিও প্রেমরসের সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য আলোচনায় মধুররসাশ্রয়ী কৃষ্ণকথা নতুন দীপ্তি ও দৃঢ়তা লাভ করল। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহু বিরুদ্ধধর্মবাদী ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে তাঁর প্রেমধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য নিজে দাক্ষিণাত্য থেকে সংগ্রহ করে আনেন ব্রহ্মসংহিতা নামক ভক্তিগ্রন্থ এবং লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের রাগভক্তিময় কাব্য কৃষ্ণকর্ণামৃত। এই গ্রন্থে মধুর রসের পরাকাষ্ঠা, গোপী প্রেমের উৎকর্ষ ও আর্তি এবং শ্রীরাধা প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করলে বহু ভক্ত পরিকর ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এসে মিলিত হতে লাগলেন। এই ভক্ত পরিকরদের মধ্যে উড়িষ্যার ও অন্যান্য প্রদেশের কিছু ব্যক্তি যেমন ছিলেন, তেমনি শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান নবদ্বীপ

থেকেও এলেন বহু ভক্ত পরিকর। এঁদের মধ্যে সর্বশেষে যিনি এসেছিলেন তিনি স্বরূপ দামোদর। শ্রীচৈতন্যের শেষ বারো বছরের দিব্যোন্মাদ অবস্থায় ইনি এবং রামানন্দ রায় ছিলেন সঙ্গী। মহাপ্রভুর ভাববৈচিত্র্যকে শ্লোকসংবন্ধ করে রাখতেন এই স্বরূপ দামোদরই। এইভাবে নীলাচলে মহাপ্রভুকে ঘিরে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম' নামের একটি লোকধর্মসম্প্রদায় বিপুল বিস্তৃতিলাভ করতে থাকল। শ্রীচৈতন্যের এই অলোকসামান্য ভক্তিব্যাকুলতা ও লোকোত্তর চরিত্রের ঐশী মহিমা উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রকেও তাঁর ভক্ত করে তুলেছিল। কিন্তু কঠোর সন্ন্যাসব্রতধারী শ্রীচৈতন্য রাজাকে দর্শন দিতে কোনমতেই স্বীকার করেন নি। অশ্রুতন্ময়, মধুরভাবের মূর্ত বিগ্রহ, 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিততনু' চৈতন্যের এই কঠোরতা আরও কিছু কিছু ঘটনাতেও প্রকাশ পেয়েছে। সন্ন্যাসজীবনযাপনের এই কঠোরতার প্রেক্ষাপটেই তাঁর দিব্যোন্মাদনার ঐশী মহিমা আরও বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ভক্তচিত্তে। ১৪৩৪ শকাব্দের রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্য সাতটি সম্প্রদায়ের সংকীর্তন ও নৃত্যের আয়োজন করলেন। তিনি নিজে রথের সম্মুখে নৃত্য করতে করতে মিলনভাবপ্রাপ্ত হওয়ার পরও অকস্মাৎ ঐশ্বর্যমূর্তি জগন্নাথ দর্শনে ভাবান্তর প্রাপ্ত হলেন এবং তাঁর প্রিয় পরকীয়া প্রেমের 'যঃ কৌমার হরঃ' শ্লোকটি বারবার আবৃত্তি করতে লাগলেন। এই মধুররসের প্রতি একান্ত আকর্ষণ ও ঐশ্বর্য বিমুখতা মহাপ্রভুর সমকালীন ও পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মাশ্রিত কৃষ্ণকথার একান্ত আশ্রয়।

এরপর মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাওয়া স্থির করে নবদ্বীপে শচীমাতাকে দর্শন করে রাজধানী গৌড়ের কাছাকাছি রামকেলি পর্যন্ত চলে এলেন। এই রামকেলি গ্রামেই মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল শ্রীরূপ ও সনাতনের। এর ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ও সাহিত্যের ইতিহাস অনন্যপূর্ব তাৎপর্যলাভ করতে সমর্থ হল। যতি জীবনের কঠোর সংযম ও নিয়মনিষ্ঠা মহাপ্রভুর দুকূলপ্লাবী রাগানুগা ভক্তিকে যেমন ধারণ করে রেখেছিল, তেমনি মহাপ্রভুরই নির্দেশে এই ভক্তভ্রাতৃদ্বয় শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মধুর সাধনার তরল আবেগকে দর্শন ও সাহিত্যের সুসংবদ্ধ আধারে দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব দান করার ব্যবস্থা করলেন।

মহাপ্রভুর জীবনে এর পরের ইতিহাসও দীর্ঘভ্রমণের এবং বহু বিরুদ্ধবাদী বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিজের প্রভাবে স্বমতে আনার ইতিহাস। বৃন্দাবনে গিয়ে অলৌকিক ভাবচালিত হয়ে মহাপ্রভু লুপ্ত লীলাস্থলী গুলির স্থান নির্দেশ করেন। প্রয়াগে শ্রীরূপের সঙ্গে এবং দাক্ষিণাত্যের কয়েকজন কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এর পর কাশীতে তিনি দুমাস অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁর সাহচর্যে সনাতন বৃন্দাবনে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে নেতৃত্ব করার যোগ্য হয়ে ওঠেন আর অন্যদিকে প্রকাশানন্দের মত অদ্বৈত-বাদী সন্ন্যাসীরাও জ্ঞানমার্গ পরিত্যাগ করে তাঁরই প্রভাবে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন।

এরপর শ্রীচৈতন্য আবার নীলাচলে ফিরে এলে রূপ বৃন্দাবন থেকে এসে তাঁর সঙ্গে দশমাস বাস করেন। এই সময়েই মহাপ্রভু তাঁকে তাঁর নাটক সম্পর্কে উপদেশ দেন। রথাগ্রে নৃত্যকারী মহাপ্রভুর মুখে 'যঃ কৌমারহর' শ্লোকটি শুনে রূপ তার নিহিতার্থ পরকীয়া রতির শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে নিজেও একটি শ্লোক রচনা করেন।

এইভাবে মহাপ্রভুর উপদেশ ও প্রভাবে ষড় গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ গোস্বামী রূপের রাগানুগা ভক্তিতে উপলব্ধি ঘটে।

পরবর্তী পর্যায়ে নীলাচলে সনাতনের আগমন ঘটল। এক বছরের মত সময় নীলাচলে থেকে মহাপ্রভুর নির্দেশে তিনি নবধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনে যাত্রা করলেন। নীলাচলে এই বারের অবস্থানের সময়ই ষড়গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামী কঠোর বৈরাগ্য ব্রতী রঘুনাথ দাসের আগমন ঘটে। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তি, কঠোর বৈরাগ্য ও রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক রচনা বৈষ্ণব সাহিত্যে উজ্জ্বলরসাত্মক কৃষ্ণভক্তিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। এই সময়েই মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বাংলাদেশে ভক্তি ধর্মপ্রচারের নেতৃত্ব দিয়ে প্রেরণ করলেন। এরপর ধীরে ধীরে নব মানবধর্মের মূর্তিমান্ বিগ্রহ এই লোকোত্তর পুরুষের বাহ্যিক জীবনের কার্যাবলী ক্রমশঃ কৃষ্ণপ্রেমের অতল সমুদ্রে অবলুপ্ত হল। জীবনের শেষ বারো বছর তাঁর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটে।

এই বারো বছরের ঘটনা-বিরলতার মধ্যেও কিছু কিছু বিশেষ ঘটনা সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরিত্রের বজ্রকঠোর দিকটিকে প্রকাশ করে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর কৃচ্ছ্রসাধন থেকে স্খলন—নিজের কিংবা অপরের—তিনি কোনমতেই সহ্য করতেন না। ছোট হরিদাসের আত্মবিসর্জন, তাঁর ভোজন সম্পর্কে রামচন্দ্রপুরীর কটাক্ষে অর্ধঅনশন গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনা তারই উদাহরণ। অথচ অন্যদিকে তাঁর তীব্র অনুভূতিময় কোমল মনের পরিচয় পাওয়া যায় শচীমাতার প্রতি তাঁর একান্ত ভক্তিতে, অধম পতিত নীচ জাতির প্রতি তাঁর পক্ষপাতে এবং ভক্তদের প্রতি বাৎসল্যযুক্ত স্নেহে।

শেষের দিকে মহাপ্রভুর এই দিব্যোন্মাদনা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করল। রোমকূপ থেকে রক্ত নির্গত হতে লাগল। কখনও শরীর ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হল, আবার কখনও ফুলে যেতে লাগল। কখনও বা বিরহবেদনার তীব্রতায় মহাপ্রভু গম্ভীরার দেওয়ালে মুখ ঘসতেন, ওষ্ঠ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যেতো। আবার কখনও গরুড় স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর চোখ থেকে অনর্গল অশ্রু নির্গত হত। মহাপ্রভুর এই অবস্থাকে মহাভাবের প্রকাশ বলে স্বরূপ দামোদর ব্রজের মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার অবস্থার সাথে মিলিয়ে নিতেন। মহাপ্রভুর মধ্যে এই অনন্যপূর্ব ভক্তির বিকাশ অবলম্বন করেই স্বরূপ, রঘুনাথ ও রূপ গোস্বামীর কাছে রাধাকৃষ্ণলীলা নতুন তাৎপর্যে প্রকাশিত হয়েছিল। এই দিব্যভাবোন্মাদনারই ছায়া পড়েছে শ্রীরূপ রঘুনাথ দাস প্রমুখের চিত্রিত রাধা চরিত্রের মধ্যে। এই অবস্থাতেই মহাপ্রভু তাঁর মরদেহ ত্যাগ করেন আটচল্লিশ বছর বয়সে, ১৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসে।

কিন্তু স্বল্প পরিসরব্যাপী আয়ুষ্কালের মধ্যে এই 'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ কলিযুগ ভগবান' দর্শনে, সাহিত্যে জীবনীকাব্যে, সংকীর্ত্তন গানে এবং হরিনামে মুখর করে তুলেছিলেন সারা পূর্বভারত ও দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশকে। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই মহাপুরুষেরই প্রভাবে কৃষ্ণকথা ও চৈতন্যকথায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল ভারতের পূর্বাঞ্চল। ঐহিক সম্পদ ও জাতিভেদের দুস্তর বাধাকে অতিক্রম

করে কৃষ্ণকথাশ্রয়ী যে ভক্তিরসস্রোত গণমানসে প্রবাহিত হয়েছিল তা পদাবলী সাহিত্য ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যসমূহকে যেমন প্রভাবিত করেছিল—তেমনি স্পর্শ করেছিল সবধরনেরই সাহিত্য সৃষ্টিকে।

॥ খ ॥

কৃষ্ণকথা ও ছয়গোস্বামী

কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশের সূত্রটি অনুসন্ধান করতে করতে যে পর্যন্ত আমরা অগ্রসর হয়েছি—তাতে দেখছি শ্রীচৈতন্যের পূর্ব পর্যন্ত কৃষ্ণকথার ধারা ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য—কৃষ্ণলীলার এই দুই বৈশিষ্ট্যকে বিমিশ্রভাবে অঙ্গীকার করে নিয়েছে। কিন্তু মহাপ্রভুর লোকোত্তর জীবন বৃন্দাবনলীলাশ্রিত মধুর রসাত্মক কৃষ্ণকথাকেই দীপ্তোজ্জ্বল করে তুললো। যে মধুর রসাত্মক কৃষ্ণকথাকে অশ্লীল অমেধ্য লোককথার আবর্ত থেকে উদ্ধার করে পরিশীলিত কাব্যরূপ দিয়েছিলেন কবি জয়দেব সেই রাধাকৃষ্ণ প্রেমই যেন রৌদ্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল শ্রীচৈতন্যের জীবনে।

কিন্তু এই আবেগ ও ভাবাবেশ সাময়িকভাবে বিপুল জনমানসকে আলোকিত করতে সক্ষম হলেও শরতের রোদের মত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আবার মুছে যাবে—একথা শ্রীচৈতন্য বুঝেছিলেন। তাই ধর্মকে স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা দান করার জন্য গোপীকৃষ্ণ তথা রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথাকে তিনি দার্শনিক ভিত্তি দান করতে চাইলেন। আগেই বলেছি মহাপ্রভু নিজে প্রত্যক্ষভাবে কিছু করেন নি—কিন্তু পরিকর নির্বাচনে তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা ছিল অভ্রান্ত। তাই এক্ষেত্রেও রাধাকৃষ্ণলীলাস্থলী বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ-গৌরব ফিরিয়ে আনতে ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন রচনা করার জন্য তিনি যাঁদের নির্বাচন করলেন—সেই ছয় গোস্বামী চৈতন্য প্রভাবিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে সমুন্নত মহিমা ও স্থায়িত্ব দান করতে সক্ষম হলেন। তাই এই প্রসঙ্গে তাঁরাও অবশ্যই আলোচিতব্য। শুধু তাই নয়—এঁদের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদ অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শী কেউ কেউ সাহিত্যেও সেই বহির্গৌর অন্তর্কৃষ্ণ পুরুষের ভক্তি গভীরতাকে তাঁদের রচিত দর্শনের ভিত্তিতে স্থাপন করে পূর্ববর্তী কৃষ্ণকথা সাহিত্যের ধারা থেকে নিজেদের পার্থক্য সূচিত করলেন। নিছক মানবীয় লীলাসাদৃশ্যের কাহিনী নয়—এর সঙ্গে তত্ত্ব যুক্ত হয়ে তাঁদের রচনা একটি বিশিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মার্জিত ঔজ্জ্বল্য লাভ করল।

॥ ১ ॥

সনাতন গোস্বামী

ষড় গোস্বামীর অগ্রগণ্য গোস্বামী সনাতন। সনাতন, রূপ ও অনুপম এই তিন ভ্রাতা দক্ষিণদেশীয় কর্ণাটকবাসী বৈদিক শাস্ত্রে পরম প্রাজ্ঞ অনিরুদ্ধের বংশধর। এঁদের মধ্যে সনাতন জ্যেষ্ঠভ্রাতা। তাঁর জন্মকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মত-বিরোধ আছে। সেই মতবিরোধের মধ্য থেকে সার সংগ্রহ করে আমাদের মনে হয়েছে তাঁর জন্ম ১৪৮২ খ্রীস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে। সন্ন্যাসের পঞ্চম বছরে

(১৫১৪-১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ) শ্রীচৈতন্যদেব রামকেলি গ্রামে এলে সনাতন ও রূপ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা দুজনেই তখন গৌড়ের রাজা হোসেন শাহের মন্ত্রী।

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাতের পর রূপ ও সনাতন উভয়েই সংসার ত্যাগ করতে মনস্থ করেন। রূপ আগেই তাঁর পরিবার পরিজনদের ও অর্থাদি সরিয়ে ফেলেন এবং সনাতনের জন্য দশহাজার মুদ্রা কোনও এক মুদির কাছে গচ্ছিত রাখেন।[১]

রূপ আগে চলে গেলে সনাতনও অসুস্থতার ভান করে রাজসভায় যাওয়া বন্ধ করে দেন। হোসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করার সময় সনাতনকে সঙ্গী হিসেবে পেতে চাইলে সনাতন রাজী হন নি। তখন হোসেন শাহ তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করে উড়িষ্যা অভিযান করেন। পরে কারারক্ষীকে প্রচুর অর্থ উৎকোচ দিয়ে সনাতন পলায়ন করেন। নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে উপস্থিত হন কাশীতে। সনাতন কাশীতে দুমাস শ্রীচৈতন্যের কাছে ভক্তিসিদ্ধান্ত বুঝে নিয়ে তাঁরই নির্দেশে বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে তিনি চৈতন্যের নির্দেশ মতই কাজ করতে থাকেন—

ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্বের নির্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবা প্রবর্তন
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ।[২]

সনাতন রচিত গ্রন্থগুলির নাম হল—১। বৃহদ্‌ভাগবতামৃত ২। হরিভক্তিবিলাস ৩। লীলাস্তব বা দশম চরিত (এটি পাওয়া যায় নি) ৪। বৈষ্ণব তোষণী।

এছাড়াও সনাতন গোস্বামী রচিত 'তাৎপর্যদীপিকা' নামে মেঘদূতের টীকা পাওয়া গেছে। চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব জীবনীগ্রন্থে এই বইয়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ সনাতন গৌড়ে থাকার সময় এটি রচনা করেছিলেন।[৩]

বৃহদ্‌ভাগবতামৃত ঃ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে মৌলিকত্ব এবং গুরুত্ব উভয় দিক দিয়েই বৃহদ্‌ভাগবতামৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সনাতন এই গ্রন্থটিতে প্রেমভক্তিতত্ত্ব নির্ণয় করেছেন। এটি পুরাণধর্মী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মসংক্রান্ত কাব্য। বইটি যেন ভাগবতের সার এবং তারই উত্তরখণ্ড রূপে লেখা। এর বক্তা জৈমিনী, শ্রবণ করছেন জনমেজয়। শুক শিষ্য পরীক্ষিৎ রূপক কাহিনীর মধ্য দিয়ে মাতা উত্তরার কাছে ভাগবতের তত্ত্বকথা বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটিতে দুটি খণ্ড রয়েছে। প্রথমটিতে ভক্তিমার্গে গোপীপ্রেম ও রাধাপ্রেমের চরমোৎকর্ষ ঘোষণা করা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথাকে এইভাবে সমুন্নত আধ্যাত্মিক মহিমা দান করে সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর নির্দেশকে কার্যকর রূপ দিয়েছেন।

প্রথম খণ্ডের নায়ক নারদ। তিনি মাঘমাসে প্রয়াগতীর্থে এক ভক্ত ব্রাহ্মণকে দেখে তাঁকে ভগবানের পরম প্রিয় মনে করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ বলেন দাক্ষিণাত্যের এক ক্ষত্রিয় রাজাই ঈশ্বরের সর্বাপেক্ষা প্রিয়। নারদ ঐ রাজার কাছে গেলে তিনি ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা আবার শিবকে, শিব প্রহ্লাদকে কৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত রূপে নির্দেশ করেন।

কিন্তু প্রহ্লাদ তাঁকে দাস্যভাবের ভক্ত হনুমানের সন্ধান দেন, হনুমান আবার সখ্যভাবের ভক্ত পাণ্ডবদের নির্দেশ করেন। পাণ্ডবেরা কিন্তু নারদকে প্রকৃত কৃষ্ণ-ভক্তের অনুসন্ধানে যাদবদের কাছে দ্বারকায় পাঠান, যাঁরা প্রীতি প্রেয় ইত্যাদি সূত্রে কৃষ্ণের ভজনা করেছিলেন। যাদবদের পরামর্শে নারদ আবার গেলেন উদ্ধবের কাছে এবং উদ্ধব আবার নারদকে বললেন গোপীদের প্রেম এবং তার মধ্যে রাধা প্রেমই শ্রেষ্ঠ। এই রাধা প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে সনাতনগোস্বামী বৃন্দাবন-লীলা কৃষ্ণের কতখানি প্রিয় তা বর্ণনা করেছেন। নারদ বৃন্দাবন প্রসঙ্গ তুললে শ্রীকৃষ্ণ মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তখন রৈবতকে নব বৃন্দাবন সৃজন করে তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য প্রবোধ দেওয়া হল। এই অংশে তত্ত্বব্যাখ্যাতা সনাতন মধুর রসযুক্ত ভাগবতাশ্রয়ী কৃষ্ণকথাকে নিজস্ব প্রতিভার আলোকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। বলরাম কৃষ্ণবিহীন বৃন্দাবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—

গবাং কেব কথা কৃষ্ণ। তে তেঽপি ভবতঃ প্রিয়াঃ।
মৃগা বিহঙ্গাভাণ্ডীর কদম্বাদ্যাশ্চ পাদপাঃ ॥
লতানি কুঞ্জপুঞ্জানি শাদ্বলান্যপি জীবনং।
ভবত্যেবার্পয়ামাসুঃ ক্ষীণাশ্চ সরিতোঽদ্রয়ঃ ।[৪]

কৃষ্ণ, গোগণের কথা কি! তোমার প্রিয় মৃগকুল, বিহগকুল, ভাণ্ডীর, কদম্বাদি পাদপকুল, লতাসকল, নিকুঞ্জসকল ও তৃণান্বিত ক্ষেত্রসকল তোমাকেই তাদের জীবন অর্পণ করেছে। সরিৎ ও অদ্রিসকল দিন দিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে।

আবার নিদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকে জাগ্রত করে নব বৃন্দাবনে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলদেবের উক্তির মধ্যে একই সঙ্গে বলরাম ও শ্রীদাম প্রভৃতি সখার সখ্যভাব, নন্দ যশোদার বাৎসল্যভাব ও গোপীদের মধুর প্রেমভাব ফুটে উঠেছে।[৫] কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিবাসী এক তীর্থযাত্রী ব্রাহ্মণ ও মথুরার কৃষ্ণভক্ত এক গোপ বালকের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ধর্ম সম্পর্কে সনাতনের নিজস্ব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনীটি হল—

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে কামাখ্যা দেবীর কোন এক উপাসক ব্রাহ্মণ একদা দেবীর কৃপায় পাওয়া দশাক্ষরী গোপালমন্ত্র জপ করতে করতে তীর্থযাত্রীরূপে মথুরায় উপস্থিত হলে তিনি গোবর্ধননিবাসী এক গোপনন্দনের কৃষ্ণকৃপালাভের কাহিনী শ্রবণ করেন। এক সময় যমুনাতীরে ঐ গোপকুমারের সঙ্গে এক ধার্মিক মথুরাবাসী জয়ন্ত নামক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয়। এই ব্রাহ্মণের প্রেমভাবোন্মত্ত যে মূর্ত্তি সনাতন অংকন করেছেন—তা চৈতন্যের বর্ণনা বলে চিনে নিতে ভুল হয় না—

কীর্ত্তয়ন্তং মুহুঃ কৃষ্ণং জপধ্যানরতং কচিৎ।
নৃত্যন্তং কাপি গায়ন্তং কাপি হাসপরং কচিৎ
বিক্রোশন্তং কচিদ্ভূমৌ স্খলন্তং কাপি মত্তবৎ।
লুঠন্তং ভুবি কুত্রাপি রুদন্তং কচিদ্বশ্চ বৈঃ ॥[৬]

এবং এই শিষ্যও যে স্বয়ং সনাতন তা বোঝা যায়। ব্রাহ্মণ সেই গোপবালকের গুরু হয়ে তাকে দশাক্ষরী মন্ত্রে দীক্ষা দেন ও পুরী যাওয়ার নির্দেশ দেন। পুরীতে

কিছুকাল জগন্নাথদেবের উপাসনা করার পর পুরীর রাজা তাঁকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। রাজার মৃত্যুর পর এই গোপনন্দন কিছুকাল রাজসিংহাসনে বসলে এক সময় স্বপ্নে জগন্নাথদেব তাঁকে মথুরা যেতে বলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কাহিনীতে এই গোপনন্দন সাধনা প্রভাবে ক্রমশঃ ভক্তিমার্গের উচ্চতম স্তরপরম্পরায় আরোহণ করেছেন। অবশেষে তৃতীয় অধ্যায়ে বৈকুণ্ঠ ভ্রমণের সময় গোপনন্দন যে দেবমূর্ত্তির সন্ধান পেলেন—তিনি ব্রাহ্মণ জয়ন্তকেই স্বয়ং কৃষ্ণ বলে অভিহিত করলেন। এইভাবে সনাতনও তাঁর কাব্যমধ্যে শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্বকে প্রতিপন্ন করলেন। অতঃপর নারদ সেখানে উপস্থিত হয়ে গোপকুমারকে বৈষ্ণব ধর্ম-সংক্রান্ত নানাবিধ উপদেশ দিয়ে অযোধ্যা, মথুরা, দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থে যেতে উপদেশ দিলেন। সেই সমস্ত স্থানে গিয়ে ঐ গোপনন্দন হনুমানের রামভক্তি এবং দ্বারকায় গিয়ে উদ্ধবের কৃষ্ণ ভক্তি দর্শন করলেন। নারদ আবার তাঁকে বৃন্দাবনে যেতে উপদেশ দিলেন এবং বৃন্দাবনলীলাপ্রসঙ্গ বললেন। শেষ দুটি অধ্যায়ে কৃষ্ণের মথুরা ও বৃন্দাবনলীলাই বর্ণিত। কৃষ্ণের গোচারণ-লীলা, গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ, কালীয় দমন প্রসঙ্গে সনাতন নূতনত্বের সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন কৃষ্ণ তাঁর উত্তরীবাস কালীয়নাগের নাসিকায় স্থাপিত করে ঘোড়ার লাগামের মত ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়া কৃষ্ণের মথুরাযাত্রা প্রসঙ্গেও তিনি ভাগবতের কাহিনীকে নতুনত্ব দান করেছেন। ভাগবতে আছে অক্রূর কৃষ্ণবলরামকে রথারোহণে মথুরা নিয়ে যাওয়ার সময় গোপীরা ক্রন্দন করতে করতে পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন। কিন্তু সনাতন বলেছেন সবার অলক্ষ্যে কৃষ্ণ রথ থেকে নেমে এসে গোপীদের সঙ্গে কুঞ্জে প্রবেশ করেন। কৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে অক্রূর বলরামের সঙ্গে কুঞ্জদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হন এবং গোপীদের অনুরোধ করেন কৃষ্ণকে মথুরা যাওয়ার অনুমতি প্রদান করতে। কিন্তু গোপীরা অক্রূরকে মিথ্যাবাদী ও কংসের গুপ্তচর বলে অভিহিত করে এবং বলে যে, কৃষ্ণের জনকজননী বসুদেব দেবকী নন। এর কিছুক্ষণ পরেই কৃষ্ণ মথুরায় চলে যান। সনাতনের মতে কৃষ্ণের ব্রজলীলা ও মথুরালীলা নিত্যকাল গোলোকধামে উদ্বর্তিত হয়ে চলেছে। একবারই মাত্র ঘটে নি। কৃষ্ণার্চনার জন্য কঠোর যতিজীবনের আদর্শ গ্রহণ করলেও তাঁর লেখনী মাধুর্যরস সৃষ্টিতে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। কৃষ্ণ প্রাতঃকালে গোচারণে গিয়ে প্রত্যাগমন করলে স্নেহবশতঃ মাতৃসকল, ধাত্রীসকল এবং বৃদ্ধাদের স্তন থেকে দুগ্ধ ঝরতে লাগল, এমনকি কালিন্দীর প্রবল জলবেগও প্রতিকূলবাহী হয়েছিল। সেই সময়ে ব্রজ গোপীদের প্রেমব্যাকুলতাও বর্ণিত হয়েছে—

কাশ্চিদ্বিপর্য্যগ্ ধৃতভূষণা যযুঃ।
কাশ্চচ্চ নীবিকচবন্ধনাকুলাঃ।
অন্যা গৃহান্তস্তরুভাবমাশ্রিতাঃ
কাশ্চিচ্চ ভূমৌ ন্যপতন্ বিমোহিতাঃ।[৭]

ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে অনুরূপ পরিস্থিতিতে গোপিনীদের এই ভাবই দেখা যায়।

পুত্রের প্রতি যশোদার স্নেহ, শ্রীকৃষ্ণের স্নানলীলা ও ভোজনলীলা প্রভৃতিও এই

গ্রন্থে মানবিক রসে পরিপূর্ণ ও বর্ণনার গুণে জীবন্ত। কৃষ্ণের এই দৈনন্দিন জীবনাচরণের মাঝখানে সনাতন রাধাকে যে ভূমিকায় রেখেছেন—তাতে মনে হয় রাধা কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী—পরকীয়া নায়িকা নন।

গোষ্ঠযাত্রার সময় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জননী যশোদার অনুরোধ—

ভো বৎস। দুর্গমেঽরণ্যে ন গন্তব্যং বিদূরতঃ।
সকণ্টক বনান্তশ্চ প্রবেষ্টব্যং কদাপি ন॥

"হে বৎস। দুর্গম অরণ্যে গমন করিও না। কণ্টকাকীর্ণ বনাভ্যন্তরে কদাপি প্রবেশ করিও না"। সখাদের প্রতি জননী যশোদার অনুরোধ—

ভো স্তাত। রাম। স্থাতব্যং ভবতাগ্রেঽনুজস্য হি।
ত্বয়া চ সখ্যুঃ শ্রীদামন্। সস্বরূপেন পৃষ্ঠতঃ॥
অংশো। হস্য স্হেয়ং দক্ষিণে বামে চ সুবল। ত্বয়া
ইত্যাদিকমসৌ প্রার্থ্য সতৃণং পুত্রমৈক্ষত॥

"হে তাত। হে রাম। তুমি অনুজের অগ্রে গমন করিবে। হে শ্রীদামন্, তুমি স্বরূপের সহিত তোমার সখার পৃষ্ঠদেশে থাকিবে। হে অংশো। তুমি ইহার দক্ষিণ দেশে থাকিবে। হে সুবল, তুমি বামদেশে থাকিবে। এইরূপে জননী দন্তে তৃণসংযোগপূর্বক বারম্বার প্রার্থনা করিয়া পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।"

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোদার এই সামান্য-রমণীসুলভ স্বার্থপর পুত্র-স্নেহ পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদেও দেখা যায়।[৯]

বৃহদ্‌ভাগবতামৃতের প্রথম খণ্ডে সনাতন বৃন্দাবনলীলা প্রসঙ্গে উগ্রসেন পত্নী কংসমাতা পদ্মাবতীর একটি মনোজ্ঞ চরিত্র অঙ্কন করেছেন। চিত্রটি পদ্মপুরাণের অনুরূপ। এই বৃদ্ধা প্রথমে ব্রজবাসীদের নিন্দা করেছিল বালক শ্রীকৃষ্ণের উপর অত্যাচার করেছে বলে। কিন্তু পরে রৈবতক প্রদেশে নির্মিত নব বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলা এবং ভাব দর্শন করে সেও ব্রজমাহাত্ম্য অবগত হয়েছে। রুক্মিণী, সত্যভামা ও জাম্ববতী প্রভৃতি মহিষীকে সম্বোধন করে বলেছে—

……স্বাভিমানং বিমুঞ্চত।
আভীরীণাং হি দাস্যায় তপস্যাং কুরুতোত্তমাং॥

নিজেদের সৌভাগ্যাভিমান ত্যাগ করে আভীরীদের দাসী হওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট তপস্যার অনুষ্ঠান কর।[১০]

বৃন্দাবনলীলামাহাত্ম্য ও ব্রজগোপীদের প্রেমোৎকর্ষ এই চরিত্রটির মুখ দিয়ে বলিয়ে সনাতন তাঁর কৃষ্ণকথাকে নাটকীয়তা দান করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্বকথা পৌরাণিক রীতিতে কাহিনীর মাধ্যমে এখানে বিবৃত হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে শ্লেষ অলঙ্কারে কৃষ্ণের ও চৈতন্যের বন্দনা একই সঙ্গে করা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্লোকে রাধিকা ও অন্যান্য গোপিনীদের বন্দনা করা হয়েছে। তৃতীয় শ্লোকে চৈতন্যের বন্দনা করা হয়েছে। সনাতনের এই কাব্যে একটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে

ব্রজলীলা ও গোপীপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হলেও রাধাকে কিন্তু কৃষ্ণের সমান অথবা কৃষ্ণের চেয়ে বড় করে দেখানো হয় নি।

হরিভক্তি বিলাস কোন কোন ক্ষেত্রে সনাতনের নামে প্রচলিত হলেও পণ্ডিতেরা এটিকে গোপালভট্ট রচিত বলে মনে করেন। এটি বৈষ্ণব কৃত্য ও বৈষ্ণব আচার সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। বৃহদ্‌ভাগবতামৃতের টীকা দিগ্‌দর্শিনীও তাঁর লেখা। এছাড়া সনাতন বৈষ্ণবতোষণী নামে ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিস্তৃত টীকা রচনা করেন। শ্রীজীব গোস্বামী এর একটি সংক্ষিপ্ত রূপ দেন। তখন সনাতনের গ্রন্থের নাম হয় বৃহৎ-বৈষ্ণবতোষণী এবং জীবের গ্রন্থের নাম হয় লঘু-বৈষ্ণবতোষণী। সনাতনের গ্রন্থটি ১৪৭৬ শকাব্দ বা ১৫৫৪ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়।

বৃহদ্‌ভাগতামৃতে ঐশ্বর্যভাববিমুক্ত গোপীপ্রেম ও বৃন্দাবনলীলার মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন হয়েছে। বৈষ্ণবতোষণীতেও সনাতনের সেই একই প্রবণতা দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যের নবধর্মপ্রেরণার লক্ষ্য ছিল ঈশ্বরকে ঐশ্বর্যযুক্ত পূজার আড়ম্বর থেকে, নানা আচার-বিচার, বিধিনিয়মের দূরত্ব থেকে আচণ্ডাল মানুষের মাঝখানে কেবল—মাত্র ভালবাসার মন্ত্রে নামিয়ে আনা। তাঁর ভক্ত-পরিকরদেরও তিনি এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন। তাই ভাগবতের ঐশ্বর্যভাবাশ্রিত ভক্তিকে সনাতন যথাসম্ভব পরিহার করে বিশুদ্ধ মাধুর্যে ভরে তোলার চেষ্টা করেছেন। সেই কারণে বৈষ্ণব তোষণীতে ভাগবতীয় কৃষ্ণকথা এক নবতর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। যশোদার ঐশ্বর্যমিশ্র বাৎসল্যকে সনাতন কখনও কখনও বিশুদ্ধ মানবিক বাৎসল্যে চিত্রিত করতে চেয়েছেন।[১১]

আবার ভাগবতে রাধার কোন উল্লেখ না পাওয়া গেলেও সনাতন তাঁর বৃহৎ-বৈষ্ণবতোষণীর বেশ কিছু স্থানে রাধার নাম উল্লেখ করে বলেছেন যে ঐসব স্থানে রাধাই উদ্দিষ্ট হয়েছেন।[১২] রাসের যে যে শ্লোকে গোপীদের মুখ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কথা বলিয়ে তাদের ঐশ্বর্যভাব সম্পর্কে সচেতনতা ব্যক্ত করা হয়েছে—সনাতন সেগুলিকে অন্যতর অর্থে ব্যাখ্যা করে মধুররসোজ্জ্বল করে তুলেছেন। যেমন-ভাগবতের একটি শ্লোকের [১৩] অর্থ 'তুমি গোপিকানন্দন নও, তুমি সকল দেহীর অন্তরাত্মা দর্শনকারী'। কিন্তু সনাতনের ব্যাখ্যা 'তুমি গোপিকানন্দন নও—কারণ যশোদার মত দয়াশীলা গোপীর পুত্র হলে তুমি আমাদের দুঃখ বুঝতে, আবার সর্বমানবের অন্তর্দ্রষ্টা হলেও তুমি আমাদের দুঃখ বুঝতে। সুতরাং তুমি এ দুটোর কোনটাই নও'। ব্রজগোপীদের এই অভিমান- ক্ষুব্ধতা সনাতনের ব্যাখ্যাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এগুলি সনাতনের মৌলিকতার ও প্রতিভা-বিশিষ্টতার পরিচায়ক।

সনাতনের বৃহদ্‌ভাগবতামৃত অনুবাদ করেছেন কানাই দাস ও জয়গোবিন্দ দাস। কানাই দাসের গ্রন্থের শেষে যে আত্মপরিচয় আছে—তা থেকে মাত্র এইটুকু জানা যায় যে তিনি হরিপ্রসাদ গোস্বামীর শিষ্য। এঁর বৃহদ্‌ভাগবতামৃতের আংশিক অনুবাদ বৃহদ্‌ভাগবতামৃতকণার ১৭৫৪ শকে (১২৩৮ বঙ্গাব্দে) অনুলিপিকৃত পুথি বরাহনগর পাটবাড়ীর শ্রীগ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত আছে। পুথি সংখ্যা—২২৫৬/২১

বৃহদ্‌ভাগবতামৃতের অপর এক অনুবাদক জয়গোবিন্দ বসু জাতিতে কায়স্থ। তাঁর পিতার নাম গোকুলচন্দ্র এবং তাঁর নিবাস বেনাপুর গ্রামে। গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি চৈতন্য বন্দনা করেছেন। গ্রন্থের শেষে সনাতন গোস্বামীর চরণে প্রণাম জানিয়েছেন। ইনি সম্পূর্ণ গ্রন্থটি অনুবাদ করেন নি, একটি অংশের কাহিনীটুকুই মাত্র অনুবাদ করেছেন। তত্ত্বরচনা মূল উদ্দেশ্য হলেও সনাতন বিরচিত 'বৃহদ্‌-ভাগবতামৃতে'র কৃষ্ণকথারও যে যথেষ্ট বিশেষত্ব ছিল—এই অনুবাদটি তার প্রমাণ। ১৩১০ সালে অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এটি প্রকাশ করেন।

॥ ২ ॥

রূপ গোস্বামী

সনাতন বৈষ্ণবদর্শন গ্রন্থ রচয়িতা। তিনি প্রধানতঃ বৈষ্ণবধর্মতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করেছেন। রূপ তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন নিজের সৃজনী শক্তিকেও। ষড় গোস্বামীর মধ্যে রচনা প্রাচুর্যে ও সৃষ্টি বৈচিত্র্যে রূপই আমাদের সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের ইতিহাসে তথা কৃষ্ণকথার নব-রূপায়ণে রূপ গোস্বামীর সৃষ্টির গুরুত্ব কতখানি তা বোঝা যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের একটি শ্লোক থেকে—

বৃন্দাবনীয়ং রসকেলিবার্ত্তাং
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃসঃ
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্‌ ॥[১৪]

"ঈশ্বর যেমন বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে বিধাতায় শক্তি সঞ্চার করেছিলেন, শ্রীচৈতন্যও তেমনি উৎকণ্ঠিত হয়ে বৃন্দাবনের হারিয়ে যাওয়া রাসলীলার কথা আবার জাগিয়ে তোলার জন্য শ্রীরূপ গোস্বামীতে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন"।

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে রূপ-সনাতনের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করেছি। সনাতনের আগেই রূপ ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম সংসার ত্যাগ করেন। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় প্রয়াগে। মহাপ্রভু শ্রীরূপকে প্রয়াগে বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দান করেন। সেখানে তাঁরা একমাস থেকে আবার গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। গৌড়ে অনুপমের মৃত্যু হয়। রূপ ও অনুপম গৌড় থেকে নীলাচলে যাত্রার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কিন্তু অনুপমের মৃত্যু হওয়ায় রূপের কিছু বিলম্ব হল। রূপ এরপর নীলাচল থেকে ফিরে গৌড়ে গিয়ে নিজের সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করে আবার বৃন্দাবনে ফিরে গেলে সনাতনের সঙ্গে দেখা হয়। রূপ এরপর থেকে আমৃত্যু বৃন্দাবন পরিত্যাগ করেন নি। সম্ভবতঃ ১৫৫৪ খ্রীস্টাব্দে সনাতনের তিরোভাবের দু'একবছর পর রূপ দেহত্যাগ করেন।

হংসদূতঃ শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই রূপ তাঁর 'হংসদূত' কাব্যটি রচনা করেন। 'উদ্ধব সন্দেশ' চৈতন্যের সঙ্গে-সাক্ষাতের আগে অথবা পরে রচিত, এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

জীব তাঁর লঘুতোষণীর উপসংহারে শ্রীরূপের যে গ্রন্থতালিকা দিয়েছেন—তার প্রথমেই রয়েছে হংসদূতের নাম। হংসদূতের মঙ্গলাচরণে কবি চৈতন্যদেবকে নমস্কার করেন নি। এ ছাড়াও এই কাব্যে সনাতন সম্পর্কে যে 'সাকরতয়া' শব্দটি আছে, তা সনাতনের সাকর মল্লিক উপাধিকে সূচিত করছে। সুতরাং গ্রন্থটি চৈতন্যের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই শ্রীরূপ রচনা করেছেন মনে হয়। কাব্যটি শিখরিণী ছন্দে ১৪২ টি স্তবকে রচিত।

কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে নির্বাসিত বিরহী যক্ষ অচেতন মেঘকে দূত করে তার প্রিয়ার কাছে নিজের বার্তা প্রেরণ করেছেন। এরই অনুকরণে পবনদূত, ভ্রমর-দূত প্রভৃতি দূত কাব্য রচিত হয়। এই দূত কাব্যের ধারানুসরণেই শ্রীরূপ গোস্বামী রচনা করেছেন তাঁর হংসদূত কাব্য।

কৃষ্ণ মথুরায় চলে যাওয়ার পর কৃষ্ণবিরহসন্তপ্তা রাধা বিরহবেদনা প্রশমনের জন্য যমুনাতীরে এসে কুঞ্জভবন ইত্যাদি দর্শন করে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। বিরহ-বিধুরা রাধাকে পদ্ম পত্র রচিত শয্যায় শয়ন করানোর পর সখী ললিতা যমুনার ঘাটে পা দিয়ে একটি শ্বেতহংসকে দেখতে পেয়ে তাকেই মথুরায় দূত করে পাঠালেন কৃষ্ণের কাছে। ললিতা সেই হংসের কাছে কৃষ্ণের বিরহে রাধার নিদারুণ অবস্থার কথা বিস্তৃতভাবে জানালেন। এছাড়াও মথুরা গমন কালে বৃন্দাবনের যে যে লীলা-স্থলীর ওপর দিয়ে ঐ হংসটিকে যেতে হবে—তারও একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা দিলেন। এরপর মথুরার ঐশ্বর্য-শোভার বর্ণনা করে ললিতা অনুরোধ করলেন হংস যেন উপযুক্ত সময়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে বিরহিণী রাধার অবস্থা উল্লেখ করে কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে আসতে অনুরোধ করেন। ললিতার মুখে রাধার ও ব্রজাঙ্গনাদের দুঃখের কথা শুনে ঐ হংস দৌত্যকার্য করতে স্বীকৃত হল।

পূর্ববর্তী দূতকাব্যের ধারা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও শ্রীরূপের কাব্যের উপস্থাপনা-গত বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিতে হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা থেকে উদ্ধবকে দূত করে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন গোপীদের সংবাদ জানার জন্য। ভ্রমরদূতের প্রসঙ্গও সেখানে রয়েছে। কিন্তু সখীর হংসকে দূতরূপে প্রেরণ করার কথা কোথাও নেই। নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানে নায়ক নল হংসকে দূত করে পাঠিয়েছেন—নায়িকা অথবা সখী নয়। পরবর্তীকালের কৃষ্ণকথা সাহিত্যে এই দূতীপ্রেরণ প্রসঙ্গ খুবই জন-প্রিয় হয়েছে।

উদ্ধবসন্দেশ : 'উদ্ধবসন্দেশ' হংসদূতের পরিপূরক কাব্য। এই গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে অথবা পরে, কখন শ্রীরূপ রচনা করেছিলেন—এ নিয়ে পণ্ডিত-দের মধ্যে যথেষ্ট সংশয় আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে[১৫] কৃষ্ণ মথুরা থেকে উদ্ধবকে দূত করে পাঠিয়েছেন বৃন্দাবনে গোপগোপীদের সংবাদ পাওয়ার জন্য। সম্ভবত এই আখ্যানটি হলো উদ্ধবসন্দেশ কাব্যের মূল উৎস। কাব্যটি মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত। এতে শ্লোক সংখ্যা ১৩১।

হংসদূত কাব্যে দেখেছি নায়িকা শ্রীরাধা পূর্বলীলাস্থলী যমুনার তীরে গিয়ে বিরহ যাতনায় পীড়িত হলে তাঁর হয়ে সখী ললিতা হংসকে দূত করে পাঠিয়েছেন

মথুরায়। এই কাব্যে মথুরার প্রাসাদশিখরে আরোহণ করে কৃষ্ণের হৃদয় বৃন্দাবনের পূর্ব-লীলাস্থলীসমূহের স্মৃতিতে বেদানার্ত হয়ে উঠেছে—

সান্দ্রীভূতৈর্নববিটপিনাং পুষ্পিতানাং বিতানৈ,
লক্ষ্মীবিত্তাং দধতি মথুরাপত্তনে দত্তনেত্রঃ।
কৃষ্ণঃ ক্রীড়াভবনবড়ভী মূর্দ্ধি বিদ্যোতমানো, দধৌ
সদ্যস্তরলহৃদয়ো গোকুলারণ্য মৈত্রীম্ ।।[১৬]

ক্রীড়াভবনের উচ্চশিখরে আরোহণ করে নববিটপীর পুষ্পশোভা যুক্ত উদ্যানের শোভায় দৃষ্টিপাত করে কৃষ্ণের মনে গোকুলারণ্যের মৈত্রী-স্মৃতি জাগ্রত হল।

সেই কারণেই প্রিয় বন্ধু উদ্ধবকে ডেকে তিনি দূত করে পাঠালেন বৃন্দাবনে গোপগোপীদের সংবাদ জেনে আসার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলে দিলেন, তিনি যেন গোপিনীদের জানান, মথুরায় সুখ যতই হোক না কেন, বৃন্দাবনই শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে প্রিয়। তাঁর মহিষীদের চেয়েও গোপিনীদের প্রগাঢ় প্রেমই তাঁর কাছে অধিকতর কাম্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বৃন্দাবনলীলার পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করেছেন উদ্ধবের কাছে এবং বলেছেন—

প্রাণেভ্যো মে প্রণয়বসতির্মিত্র তত্রাপি রাধা,
ধাতুঃ সৃষ্টৌ মধুরিমধরাধারণাদদ্বিতীয়া।[১৭]

বৃদ্ভাগবতামৃতে সনাতন নির্বিশেষ গোপীদের প্রেমোৎকর্ষ খ্যাপন করেছেন, কিন্তু এখানে রূপ গোস্বামীকে দেখা যাচ্ছে বিশেষ ভাবে রাধাকেই তিনি কৃষ্ণ প্রিয়তমা বলে এই শ্লোকে ঘোষণা করেছেন।

উদ্ধব কোন্ কোন্ পথ দিয়ে বৃন্দাবনে যাবেন এবং বৃন্দাবনে গিয়ে নন্দ-যশোমতী ও গোপ-গোপীদের কিভাবে সম্ভাষণ করবেন—কৃষ্ণ তাও বলে দিয়েছেন।

ভাগবতে এই কাহিনীর বীজ থাকলেও শ্রীরূপের কৃতিত্ব হল, মথুরার রাজৈশ্বর্যের মধ্যে বাস করেও মধুররসাভিলাষী শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের জন্য ব্যাকুলতা ও গোপী, বিশেষ করে রাধা প্রেমের প্রতি নিবিড় আকর্ষণের মাধ্যমে বৃন্দাবনলীলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন। এই সুকবি সুলভ প্রাণময় বর্ণনা ভাগবতে নেই। বরং লক্ষ্মণসেনের কোন কোন সভা কবির শ্লোকে আমরা এর প্রকাশ লক্ষ্য করেছি।[১৮] এই কাব্যের কিছু কিছু শ্লোক পরবর্তী বৈষ্ণব পদকারদেরও অনুপ্রাণিত করেছে।

স্তবমালা ঃ শ্রীরূপের লেখা বিভিন্ন স্তবকে একত্র সঙ্কলিত করে জীব স্তবমালা নাম দিয়েছেন। এই গ্রন্থে যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের বন্দনা রয়েছে। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার বিভিন্ন আলম্বনের স্তব রয়েছে এই গ্রন্থে। শ্রীরূপের এই বিচ্ছিন্ন শ্লোক সমূহ কৃষ্ণকথার ধারাগ্রসরণে কোন বিশিষ্টতার পরিচয় না রাখলেও এর শব্দসুষমা ও ধ্বনিঝঙ্কার পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবিত করেছিল।

স্তবমালার অন্তর্ভুক্ত গীতাবলিতে গীতসংখ্যা ৪২। এর ভনিতাতে সনাতনের নাম রয়েছে বলে একে সনাতনের রচনা মনে হয়, অথচ সনাতনের রচনা হিসেবে কোথাও এর পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু নানা প্রমাণ থেকে এগুলি যে রূপের রচনা এমন সিদ্ধান্তে আসা যায়। সব থেকে বড় প্রমাণ, শ্রীজীব গোস্বামী যিনি

রূপ ও সনাতন—উভয়েরই ভ্রাতুষ্পুত্র, তিনি এটিকে রূপেরই রচনার মধ্যে স্থান দিয়েছেন। গীতগুলির মধ্যে সনাতনের নামোল্লেখ সম্ভবতঃ অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্যই।

স্তবমালায় অষ্টাদশচ্ছন্দ বা ছন্দোঽষ্টাদশকে রূপ ভাগবতের দশম স্কন্ধানুসারে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করলেও মাঝে মাঝে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও ফুটে উঠেছে। যেমন—নন্দোৎসবাদি চরিতে কৃষ্ণজন্মে নর্ত্তনরত ব্রজগোপীদের বর্ণনা ভাগবতে নেই—কিন্তু শ্রীরূপের শ্লোকে আছে।[১৯] আবার কালীয়দমন লীলায় শ্রীরূপ ভাগবতানুসারী হয়েও ভাগবতাতিরিক্ত বাৎসল্যরস ও ভগবানের ঐশ্বর্যভাব বিস্মৃতি সৃষ্টি করছেন—

স্ববন্ধুবৃন্দনন্দনঃ কৃতার্যপাদবন্দনঃ
প্রহর্ষতোঽবিলম্বয়া বিচুম্বিতস্তুমম্বয়া।[২০]

কৃষ্ণ কালিয়দমনের পর নন্দ ও বলরাম প্রভৃতির পাদবন্দন করলেন। এই পাদবন্দন প্রসঙ্গ ভাগবতে নেই। ভাগবতে যশোদা পুত্রকে কোলে নিয়ে বারবার আনন্দাশ্রু মোচন করেছেন। কিন্তু রূপের জননী যশোদা পুত্রকে অবিলম্বে চুম্বন করেছেন। এটিও তাঁর ঐশ্বর্যবিস্মৃতির উদাহরণ।

শ্রীরূপের স্তবমালার ভাগবতানুগামী বস্ত্রহরণ লীলায় ও ভাগবতের সঙ্গে একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণ বস্ত্রহরণ করে পরিহাস করতে থাকলে ভাগবতের গোপীরা প্রেম পরিপ্লুতা ও লজ্জিতা হয়েছেন এবং শীতে কাঁপতে কাঁপতে বস্ত্র প্রার্থনা করেছেন। শ্রীরূপের গোপীরা কিন্তু প্রণয় কুপিতা। তাঁদের বিশেষণ 'প্রণয়-কোপিভিঃ'।[২১] এই সাভিমান প্রেম সর্বোৎকৃষ্টতার পরিচায়ক। যমলার্জুন ভঙ্গের আগে রূপ ভাগবত-বহির্ভূত একটি লৌকিক কৃষ্ণলীলাকেও শ্লোকবদ্ধ করেছেন।[২২] এইভাবে সম্পূর্ণ ভাগবতানুসরণের মাঝখানেই স্তবমালার কৃষ্ণকথা নির্মিতিতে রূপের মৌলিকত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

স্তবমালার গীতাবলী অংশে ৪২টি গীত পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণলীলার বিচিত্র পর্যায়কে অবলম্বন করে গীতগুলি রচিত। এখানে রাধার পূর্বরাগ (৭ম গীত), শ্রীরাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণের দূতীপ্রেরণ (১৬শ গীত), শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যমুনা প্রত্যাবর্তন-রতা শ্রীরাধার অঞ্চল ধারণ, (১৮শ গীত), উত্তর গোষ্ঠবর্ণন, শ্রীরাধার তিমিরাভিসার (১০ম সংখ্যক পদ) ও জ্যোৎস্নাভিসার (২৫ সংখ্যক গীত), শরৎকালীন রাস (১৭, ১৩ সংখ্যক গীত), শ্রীকৃষ্ণের বসন্তবর্ণনা (৩৯ সংখ্যক শ্লোক), শ্রীরাধাকৃষ্ণের জলকেলি প্রভৃতির বর্ণনা রয়েছে। পরবর্তীকালের পদাবলীকারেরা এই গীতগুলিতে বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।

শ্রীরূপ রচিত নাটকগুলিও কৃষ্ণকথা-বিকাশের একটি বিশেষ দিককে সূচিত করে। এই নাটকগুলির কথাবস্তু বিভিন্নভাবে পরবর্তীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন নির্মিতিতে প্রভাব ফেলেছে। এবং এইভাবে রূপ-নির্মিত কৃষ্ণকথা একটি সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির ওপর নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন কৃষ্ণলীলা অবলম্বন করে একটি নাটক লেখার পরিকল্পনা রূপের ছিল। বৃন্দাবনে নাটকের মঙ্গলাচরণ ও নান্দী শ্লোকও রচিত হয়েছিল।

নীলাচলে যাওয়ার সময় সত্যভামাপুর নামক একটি গ্রামে রাত্রি যাপনকালে দেবী সত্যভামা স্বপ্নে তাঁকে নির্দেশ দেন কৃষ্ণলীলাকে ব্রজ এবং পুর—এই দু'ভাগে পৃথক করে লিখতে। মহাপ্রভুও অনুরূপ আদেশ দেন। তখন রূপ কৃষ্ণলীলাকে 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিত মাধব' নামক দুটি নাটকে পৃথক পৃথক ভাবে ব্যক্ত করেন।[২৩]

বিদগ্ধমাধব : বিদগ্ধমাধব নাটকের নামকরণে রূপ 'বিদগ্ধ' শব্দটিকে বিশেষভাবে ব্যবহার করেছেন। লীলাবিলাসে নিপুণ বলেই মাধব এখানে বিদগ্ধ। উজ্জ্বল-নীলমণিতে অপ্রাকৃত নায়ক-নায়িকার অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ ও অপ্রাকৃত সম্ভোগরসের বিভিন্ন লক্ষণের উদাহরণ যেমন—রাধা, নায়িকাভেদ, দূতীভেদ, স্থায়িভাব, পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, গৌণসম্ভোগ প্রভৃতির উদাহরণ এই নাটক থেকেই নেওয়া হয়েছে। নাটকের সাতটি অঙ্ক। অঙ্কগুলি হ'ল যথাক্রমে—(১) বেণুনাদবিলাস (২) মন্মথলেখক (৩) শ্রীরাধাসঙ্গ (৪) বেণুহরণ (৫) শ্রীরাধা প্রসাদ (৬) শরদ্‌বিহার ও (৭) গৌরী-তীর্থবিহার।

এই নাটকে চরিত্রগুলির সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। পুরুষ চরিত্রে আছে শ্রীনন্দ, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সুদামা, মধুমঙ্গল, অভিমন্যু, সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিক। নারীচরিত্রে রয়েছে—শ্রীযশোদা, শ্রীরাধিকা, পৌর্ণমাসী, নান্দীমুখী, জটিলা, মুখরা সারঙ্গী, করালা, করালিকা, চন্দ্রাবলী, পদ্মা ও শৈব্যা। এই চরিত্রগুলির মধ্যে কতগুলি চরিত্র শ্রীরূপ মৌলিক ভাবে সৃষ্টি করেছেন ; যেমন—পৌর্ণমাসী, মধুমঙ্গল, শ্রীরাধা থেকে পৃথক চরিত্র চন্দ্রাবলী, শৈব্যা, মুখরা, করালা, করালিকা প্রভৃতি। এই নাটকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসসিদ্ধান্তের মূল রহস্য ব্যক্ত হয়েছে। রাধাকে আপাতদৃষ্টিতে পরকীয়া নায়িকা বলে মনে হলেও রাধা পরকীয়া নন। জটিলাপুত্র অভিমন্যু ও কংসের গোমণ্ডলাধ্যক্ষ গোবর্দ্ধন প্রভৃতিকে বঞ্চনা করে যূথেশ্বরী রাধা ও চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণের সর্বদা প্রীতিবিধান করেছেন এবং যোগমায়া কর্তৃক মিথ্যা বিবাহকে (রাধা ও চন্দ্রাবলীর সঙ্গে যথাক্রমে অভিমন্যু ও গোবর্দ্ধন) সত্য বলে প্রতীতির এই ব্যাখ্যা পৌর্ণমাসী করেছেন।

নাটকের আরম্ভে ললিতা ও বিশাখাকে সঙ্গী করে রাধা সূর্যপূজায় চলেছেন এবং চন্দ্রাবলী তাঁর সখী পদ্মা ও শৈব্যার সঙ্গে গৌরীতীর্থে চণ্ডীদেবীকে আরাধনা করতে যাচ্ছেন। সান্দিপনী জননী দেবী পৌর্ণমাসী রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটাতে চান। তার আগে যাতে উভয়ের পূর্বরাগ জন্মে সে চেষ্টাও তিনি করতে চান। কারণ পৌর্ণমাসী জানেন রাধার সঙ্গে অভিমন্যুর বিবাহ মিথ্যা বিবাহ।[২৪]

এদিকে রাধা এবং কৃষ্ণ পরস্পর পরস্পরকে না দেখে কেবলমাত্র নাম শুনেই প্রেমাতুর হয়ে পড়েছেন। সখীদের সঙ্গে বৃন্দাবনে প্রবেশ করার সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বিশাখা তখন নিজের হাতে আঁকা শ্রীকৃষ্ণের ছবি রাধাকে দেখালেন। চিত্রদর্শনে রাধার হৃদয়ে পূর্বরাগের সঞ্চার হল।

দ্বিতীয় অঙ্কে ললিতা প্রেমব্যাকুলা শ্রীরাধার পত্র নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলে কৃষ্ণ কপটভাবে নিজেকে ব্রহ্মচারী বলে রাধার পত্র প্রত্যাখ্যান করলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই হৃদয়হীন ব্যবহারে ব্যথিতা রাধা কালিদহে প্রাণ বিসর্জন করার সঙ্কল্প নিয়ে

সখীদের বললেন তাঁর মৃতদেহ যেন তমালতরুতে বেঁধে দেওয়া হয়—তাহলে মৃত্যুর পরেও অন্ততঃ তিনি শ্যামবর্ণধারী তমালতরুকে আলিঙ্গনের সৌভাগ্যলাভ করবেন। নেপথ্য থেকে শ্রীরাধার এই প্রেমগভীরতা দর্শন করে কৃষ্ণ রাধার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হলেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণের চিত্র না পেয়ে রাধা শ্রীকৃষ্ণর ধ্যানে বসলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। কিন্তু উভয়ের মিলনের আর সুযোগ হল না—কারণ অকস্মাৎ জটিলা সেখানে এসে পৌঁছলেন।

তৃতীয় অঙ্কে পৌর্ণমাসী শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি পূর্বরাগের গভীরতা পরীক্ষা করার জন্য রাধাকে বললেন কৃষ্ণের ঔদাসীন্য দূর করা গেল না।' এতে রাধার অবস্থা প্রায় মুমূর্ষুর মত হল। এদিকে বিশাখা কৃষ্ণের কাছে গিয়ে রাধার মথুরা চলে যাওয়ার মিথ্যা সংবাদ দিলে কৃষ্ণ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। বিশাখা কৃষ্ণকে সান্ত্বনা দিয়ে রাধার কুঞ্জের দিকে পাঠালেন। মাঝখানে মুখরা এসে পড়লেও পরে রাধাকৃষ্ণ উভয়েরই মিলন হল।

চতুর্থ অঙ্কে চন্দ্রাবলীর পূর্বরাগ, কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে অভিসার প্রভৃতি বর্ণিত। এই অঙ্কে অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা ও খণ্ডিতা রাধার বর্ণনা রয়েছে। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার সাক্ষাৎ হলে তিনি সুকৌশলে কৃষ্ণের বাঁশীটি লুকিয়ে রাখলেন। কৃষ্ণ অন্য নারী সম্ভোগ করেছেন জেনে রাধার মান হলে কৃষ্ণ ও বিশাখা মান ভাঙাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এতেও রাধার মানভঙ্গ না হওয়ায় শিখিপুচ্ছ-চূড় শ্রীকৃষ্ণ রাধার কৃপা প্রার্থনায় প্রণত হলেন। ইতিমধ্যে মুখরা এসে পড়লে শ্রীকৃষ্ণ বিদায় নিতে গিয়ে তাঁর বাঁশী খুঁজে পেলেন না। কৃষ্ণ রাধাকে অভিযুক্ত করলে রাধা পুরোপুরি অস্বীকার করলেন। মুখরাও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, রাধা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের গুরুজন, সে কারণে তাঁর সঙ্গে পরিহাস করা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য মধুমঙ্গল বললেন, কৃষ্ণ রাধাকে মান্যই করেন, কারণ কিছুক্ষণ আগেই তিনি রাধাকে প্রণাম করেছেন। এইভাবে স্নিগ্ধ কৌতুকরসোজ্জ্বল এই অঙ্কটি শেষ হয়েছে।

পঞ্চম অঙ্কে রাধাকৃষ্ণের মিলন ও মিলনের বাধায় একই সঙ্গে করুণ ও হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। কৃষ্ণ ভোগ বিলাস ত্যাগ করেছেন শুনে রাধা সখীর কাছে কৃষ্ণকে পেতে চাইলেন। বিশাখার পরামর্শে রাধা বায়ুমুখে বাঁশীটি ধরলে বাঁশী বেজে উঠল। জটিলা ছুটে এসে রাধাকে তিরস্কার করে তাঁর হাত থেকে বাঁশী কেড়ে নিল।

ইতিমধ্যে সুবল ও ললিতার সহায়তায় রাধাকৃষ্ণের মিলন হলে জটিলা সংবাদ পেয়ে ছুটে এল। কিন্তু বৃন্দার কৌশলে রাধা সুবলে পরিণত হলে জটিলা অপ্রস্তুত হল। এরপর শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধাকে বনবিহার করতে দেখে জটিলা কিছু বলল না—কারণ সে এবারও রাধাকে সুবলই ভেবে নিল।

ষষ্ঠ অঙ্কে চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মার কথা শুনে জটিলা কৃষ্ণের পীতবসন পরিহিতা রাধার ঘরে এলে বিশাখা তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে দীপান্বিতা পর্বে গোপীরা হরিদ্রা রঞ্জিত জল ছিটানোর জন্যই রাধার বসন পীতবর্ণ হয়েছে। ষষ্ঠ অঙ্কে রাধা ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে কে কৃষ্ণের প্রিয়তমা তা নিয়ে সখীদের মধ্যে তর্ক বেধেছে। রাধা শ্যাম তমালবৃক্ষকে কৃষ্ণ বলে ভুল করেছেন। এই অঙ্কে রাধাকৃষ্ণের মিলনের মধ্যে রাধার

বাম্যভাব, ললিতা ও বিশাখার অকৃত্রিম সখিত্ব এবং মধুমঙ্গলের পরিহাস-কুশলতায় নাট্যকার রূপের প্রতিভার পরিচয় দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সখীরা প্রমাণ করেছেন রাধা কৃষ্ণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। পূর্বের বনবিহারে রাধাকৃষ্ণের মিলনে সম্ভোগ ঘটেছিল—তা ললিতা বুঝতে পেরেছেন এবং কৃষ্ণ স্বীকার করেছেন।

সপ্তম অঙ্কে, শ্রাবণ মাসে সৌভাগ্যপূর্ণিমার রাত্রে রাধা কৃষ্ণের মিলন ঘটেছে। একদিকে চন্দ্রাবলী ও রাধাকে মথুরায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে—অন্যদিকে কৃষ্ণের সঙ্গে যথাক্রমে চন্দ্রাবলী ও রাধার মিলন ঘটেছে। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিতা রাধাকে হাতে-নাতে ধরার জন্য নিকুঞ্জগৃহে অভিমন্যু ও জটিলা প্রবেশ করে গৌরীদেবীর রূপধারী কৃষ্ণ এবং তাঁকে অর্চ্চনা কারিণী রাধাকে দেখতে পেল। গৌরীবেশী কৃষ্ণ সুকৌশলে রাধাসহ অভিমন্যুর মথুরাগমন বন্ধ করে দিলেন। রাধাকৃষ্ণের মিলনের বাধাও দূর হল।

ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত নয়, সুমধুর ভাব ও সুমধুর চিত্রাঙ্কনে এই নাটকরচনায় রূপ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এ ছাড়াও কৃষ্ণকথার ক্ষেত্রে শ্রীরূপ কতগুলি নতুন চরিত্র এই নাটকে আমাদের উপহার দিয়েছেন। কৃষ্ণের তুলনায় রাধার শ্রেষ্ঠত্বই ঘোষিত হয়েছে এখানে। রাধাকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে রাধার সুবলরূপ ধারণ, কৃষ্ণের গৌরী রূপ ধারণ প্রভৃতি নিজস্ব কল্পনাজাত ঘটনা সংযোগে কৃষ্ণকথায় অভিনবত্ব সম্পাদিত হয়েছে। পৌরাণিক আবহের গাম্ভীর্য ও তত্ত্বের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সত্ত্বেও এই কৌতুকোজ্জ্বল ঘটনাগুলি নাটকের বিশুদ্ধ কথা-অংশকে অনেকখানি জনানুগ করে তুলেছে। পরবর্তী কালের জনপ্রিয়কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যসমূহে এগুলির অনুসৃতিই তার প্রমাণ।

ললিতমাধবঃ শ্রীরূপের ললিতমাধব নাটক শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলা বিষয়ক দশ অঙ্ক সমন্বিত নাটক। নাটকের নামকরণ সম্পর্কে শ্রীরূপ গোস্বামী লিখেছেন—

নাটকে সমুচিতামপীশ্বরঃ স্বৈরমপ্রকটয়ন্নুদত্ততাম্‌।
অত্র মন্মথ মনোহরো হরি-লীলয়া ললিত ভাবমাযযৌ ॥

এই নাটকে কামদেবের মনোহরণকারী পরমেশ্বর শ্রীহরি নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাবশতঃ উদাত্তনায়কতা প্রকট করে লীলা দ্বারা ললিতভাব প্রাপ্ত হয়েছেন।

রচনাকাল সম্পর্কে বেশীর ভাগ পণ্ডিতেরই ধারণা, নাটকটি ১৫৩২-৩৩ খ্রীস্টাব্দে রচিত।[২৫] কিন্তু অনেকের মতে এটির রচনাকাল ১৫৪৯ খ্রীস্টাব্দ।[২৬]

এই নাটকে দশটি অঙ্ক আছে। অঙ্কগুলির নাম—১. সায়মুৎসব ২. শঙ্খচূড়বধ ৩. উন্মত্তরাধিক ৪. রাধাভিসার ৫. চন্দ্রাবলীলাভ ৬. ললিতোপলব্ধি ৭. নববৃন্দাবন-সঙ্গম ৮. নববৃন্দাবনবিহার ৯. চিত্রদর্শন ও ১০. পূর্ণমনোরথ। এই নাটকে চরিত্রসংখ্যাও বিদগ্ধমাধবের তুলনায় বেশী। নাটকটিতে পৌরাণিক, লোকপ্রচলিত ও শ্রীরূপের নিজস্ব কল্পনাসৃষ্ট চরিত্র রয়েছে। যেমন—পুরুষ চরিত্রে আছে নন্দ, কৃষ্ণ, বলরাম, মধুমঙ্গল, উদ্ধব, নারদ, গরুড়, মাধব, সুনন্দ, অভিমন্যু, ভীষ্মক, শঙ্খচূড়, নৃপতিদ্বয়, সূত্রধর, বিশ্বকর্ম্মা, শরৎ ও সুপর্ণ।

স্ত্রীচরিত্রে রয়েছে রাধা, ললিতা, বিশাখা, বৃন্দা, রোহিণী, পৌর্ণমাসী, কুন্দলতা, যশোদা, মাধবী, নববৃন্দা, চন্দ্রাবলী, পদ্মা, নান্দীমুখী, সুকণ্ঠী, তুলসী, মালতী,

পিঙ্গলা, বিন্ধ্যবাসিনী বা একানংশা, কুণ্ডকী, ভার্গবী, জটিলা, গার্গী, নটী, বৃন্ধা, মুখরা, ধাত্রী, বকুলা ও ভারুণ্ডা।

এই নাটকে স্রষ্টা রূপের কল্পনা স্বর্গমর্ত্যপাতাল থেকে সূর্যলোক পর্যন্ত বিহার করেছে। এই ব্যাপ্ত পৌরাণিক পটভূমিতে কল্পিত কাহিনী রূপের অসামান্য সৃজনী ক্ষমতারই পরিচায়ক। নাটকের কাহিনীটি সংক্ষেপে হল—

গৌরীপিতা হিমালয়ের কন্যাসৌভাগ্যের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে বিন্ধ্য পর্বত তপস্যায় দুটি কন্যালাভের বর প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার বরে এই কন্যাদ্বয়ের স্বামী শিবজয়ী হবেন। এদিকে রাধা ও চন্দ্রাবলী গোকুলের বৃষভানু ও চন্দ্রভানু এই দুই গোপের স্ত্রীর গর্ভে আবির্ভূতা হলে তাঁদের গর্ভ থেকে আকর্ষণ করে ঐ গর্ভদ্বয়কে বিন্ধ্যপর্বতের স্ত্রীর গর্ভে রাখা হয়। এরপর কন্যাদুটি জন্মগ্রহণ করলে কংসপরিচারিকা পুতনা, রাধা ও চন্দ্রাবলীকে চুরি করে। গোকুলে যাওয়ার সময় তার হাত থেকে চন্দ্রাবলী বিদর্ভ দেশগামী একটি নদীতে পড়ে যায়। রাধার সঙ্গে ললিতা এবং চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা, ভদ্রা, শৈব্যা ও শ্যামাকেও বৃন্দাবনে আনা হয়। যমুনায় ভেসে যাওয়ার সময় বিশাখাকে জটিলা তুলে আনে। পাঁচ বৎসর বয়স্কা চন্দ্রাবলীকে জাম্বুবান বিদর্ভ রাজ ভীষ্মকের গৃহ থেকে ব্রজে নিয়ে আসেন। পৌর্ণমাসী বা যোগমায়া চন্দ্রাবলীর সঙ্গে গোবর্ধনের, রাধার সঙ্গে অভিমন্যুর বিবাহ সম্পাদন করলেও ঐ বিবাহ আসল বিবাহ নয়, গোপেরা তাঁদের স্ত্রীরূপে দেখতে পায় নি।

নাটকের প্রথম দুটি অঙ্কে চন্দ্রাবলী ও রাধার প্রেমলীলা এবং সেই প্রেমলীলার পথে বিচিত্র বাধার সৃষ্টি হয়েছে। নন্দভ্রাতা উপনন্দ পৌরাণিক চরিত্র। শ্রীরূপ তাঁর পুত্রবধূ কুন্দলতা নাম্নী রাধাকৃষ্ণের মিলন সহায়িকা একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। কুন্দলতা সূর্যপূজার জন্য রাধাকে বনে নিয়ে গিয়ে দেবর কৃষ্ণকে পুরোহিত রূপে উপস্থিত করলেন। কংসের বন্ধু শঙ্খচূড় সেই সময়ে রাধাকে চুরি করলে কৃষ্ণ তাকে হত্যা করে তার মাথার স্যমন্তক মণি কেড়ে নিয়ে বলরামকে দিলেন। পুনরায় তিনি তা রাধাকে দিলেন। এই ঘটনাও শ্রীরূপের নিজস্ব উদ্ভাবন। কোন পুরাণেই এই কাহিনী আমরা পাই না।

তৃতীয় অঙ্কে অক্রূরের সঙ্গে কৃষ্ণের মথুরাগমন বর্ণিত। এই অঙ্কে ভবনু বিরহে শ্রীরাধার যে মূর্তি শ্রীরূপ অঙ্কন করেছেন—তা দিব্যভাবোন্মাদ শ্রীচৈতন্যেরই প্রেমতন্ময়গত মূর্ত্তির বাণী রূপ—

ক্ষণং বিক্রোশন্তী লুঠতি শতাঙ্গস্য পুরতঃ
ক্ষণং বাষ্পগ্রস্তাং কিরতি কিল দৃষ্টিং হরিমুখে।
ক্ষণং রামস্যাগ্রে পততি দশনোত্তম্ভিত তৃণা
ন রাধেয়ং কং বা ক্ষিপতি করুণাম্ভোধিকুহরে ॥[২৭]

বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনে অথবা জীবনীকাব্যেই শুধু নয়—কৃষ্ণকথাতেও শ্রীচৈতন্যের লোকোত্তর জীবনের প্রভাব বারবার এসে পড়েছে। নাট্যকাহিনীতে দেখি কৃষ্ণের শোকে রাধা ও বিশাখা দুজনেই যমুনার জলে ডুবে গেলেন। শোকার্তা ললিতা গোবর্ধনের চূড়া থেকে লাফ দিয়ে প্রাণত্যাগের সংকল্প করলেন।

ষষ্ঠ অঙ্কে ঘটনাস্থল বৃন্দাবন থেকে মথুরায় পরিবর্তিত হল। মথুরায় কৃষ্ণ গোপিনী ও রাধার বিরহে বেদনার্ত চিত্তে অবস্থান করছেন। ইতিমধ্যে জানা গেল চন্দ্রাবলী প্রকৃত পক্ষে রুক্মিণী। রুক্মী তাঁকে বৃন্দাবনে নিয়ে গিয়ে বিবাহের ব্যবস্থা করলেন শিশুপালের সঙ্গে। অন্যদিকে রাধা যমুনার কাছ থেকে সূর্যদেবের কাছে এবং সূর্যদেব কর্তৃক সত্রাজিতের কাছে গিয়ে তাঁর কন্যারূপে পালিতা হন। তাঁর নাম হয় সত্যভামা। এই কাহিনী পরিকল্পনায় রূপগোস্বামী হরিবংশ এবং অন্যান্য পুরাণের স্যমন্তক মণি ও সত্যভামা সম্পর্কিত কাহিনীকে পরিত্যাগ করে নিজস্ব কল্পনার সাহায্যে নতুনত্ব সঞ্চার করেছেন।

এদিকে নরকাসুর ষোল হাজার গোপিনীকে হরণ করে নিয়ে যায়। পদ্মা, শ্যামলী, ভদ্রা ও শৈব্যার নামও যথাক্রমে হল নাগ্নজিতী, মাদ্রী, লক্ষণা ও মিত্রবিন্দা। ললিতা পালিত হয় জাম্ববানের কন্যা জাম্ববতীরূপে। কৃষ্ণ নরকাসুরের কাছ থেকে গোপিনী-দের উদ্ধার করে বিবাহ করেন। এইভাবেই দ্বারকালীলার মহিষীরা যে বৃন্দাবনলীলার গোপীদের সঙ্গে অভিন্ন, তা শ্রীরূপ কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ললিতমাধব নাটকের ষষ্ঠ অঙ্ক থেকে দশম অঙ্ক পর্যন্ত কাহিনীতে স্বপ্নবাসবদত্তা ও রত্নাবলী নাটকের কিছুটা প্রভাব আছে। কৃষ্ণমহিষী রুক্মিণীর কাছে সত্রাজিৎ সত্যভামাকে রেখে গেলেন। রুক্মিণী ও তাঁর সখী মাধবী শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপথ থেকে সত্যভামাকে অর্থাৎ রাধাকে সরিয়ে রাখতে চান। তবুও একদিন দ্বারকার নববৃন্দাবনে রাধার অর্থাৎ সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের দেখা হয়ে গেল। কিন্তু রুক্মিণীরূপিণী চন্দ্রাবলীর আগমনে উভয়ের মিলন সম্ভব হল না।

নাটকের অষ্টম অঙ্কে রুক্মিণী ও সত্যভামা অর্থাৎ চন্দ্রাবলী ও রাধার মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। বহু বাধা সত্ত্বেও রাধা-কৃষ্ণের আবার দেখা হয়েছে। কিন্তু মিলন ঘটে নি। এই অঙ্কে চৈতন্যলীলামাধুরীর দর্শক শ্রীরূপ তাঁর শ্রীকৃষ্ণকে নিজের মাধুরী দর্শনে অভিভূত ও নিজ মাধুর্যভোগে ইচ্ছুক করে তুলেছেন—

শ্রীকৃষ্ণ—কোঽয়ং মাধুর্যেণ মমাপি মনোহরন্‌
মণিকুড্যমকণ্টভ্য পুরো বিরাজতে ?
(পুনর্নির্ভাল্য)
হন্ত। কথমত্রাহমেব প্রতিবিম্বিতোঽস্মি। (ইতি সোৎসুক্যম্‌)
অপরিকল্পিত পূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী—
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্যপূরঃ
অয়মহমপি হন্ত। প্রেক্ষ্য যংলুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥

অর্থাৎ" কে এই মাধুর্যের দ্বারা আমারও মনোহরণ করে মণিভিত্তি অবলম্বনে সম্মুখে বিরাজ করছে, (আবার ভাল করে দেখে) একি। আমিই যে মণিভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত হয়েছি।

(উৎসুক হয়ে)

এই চমৎকারী অদৃষ্টপূর্ব কোন মাধুর্যসার গরীয়ান হয়ে আমার সামনে প্রকাশ

পাচ্ছে? অহো আমিও এঁকে দেখে লুব্ধচিত্ত হয়ে সানন্দে শ্রীরাধিকার মত এঁকে উপভোগ করবার জন্য কামনা করছি।

ললিতমাধব নাটকের নায়ক এই শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীচৈতন্যেরই প্রতিরূপ—নাটকের এই অংশ পাঠ করে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

নবম অঙ্কের কাহিনীতে কিছুটা ভবভূতির উত্তররামচরিত নাটকের আলেখ্য-দর্শনের প্রভাব দেখা যায়। এখানেও শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে তাঁর বিগত বৃন্দাবন ও মথুরা লীলার নানা চিত্র প্রদর্শন করেছেন।

দশম অঙ্কে সত্রাজিৎ সত্যভামার জন্য স্যমন্তক মণি পাঠিয়েছেন। স্ত্রীবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধার তথা সত্যভামার মিলন ঘটেছে। অবশেষে রুক্মিণী অর্থাৎ চন্দ্রবলী সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহে সম্মত হলেন। গোকুল থেকে নন্দ, যশোদা, রোহিণী, শ্রীদাম, সুবল প্রভৃতি সবাই দ্বারকায় এলেন। তাঁদের সকলের সামনেই রাধারূপিণী সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ হল। ললিতা, বিশাখা এবং পদ্মাও উপস্থিত হলেন। এই অঙ্কে নরকাসুরের রাজধানী থেকে আসা ষোড়শ সহস্র গোপিনীর সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়েছে। এই কাহিনীতে শ্রীরূপ ভাগবতের ক্রমকে অস্বীকার করেছেন। কারণ ভাগবতে আছে কৃষ্ণের সঙ্গে সত্যভামার বিবাহের বহুকাল পর গোপিনীদের বিবাহ হয়েছিল।

নাটকের শেষে যশোদাকন্যা একানংশা দেবী শ্রীরাধাকে জানালেন, তাঁরা সর্ব-দাই গোকুলে অবস্থান করছেন—এই দ্বারকালীলা মায়া মাত্র।

নাটক হিসেবে ললিতমাধব বিদগ্ধ মাধবের তুলনায় নিকৃষ্ট। এর কাহিনীও জটিল। তবু এই কাহিনী পরিকল্পনায়ও রূপের কৃতিত্ব কম নয়। পৌরাণিক চরিত্র-গুলিকে গ্রহণ করে এবং সংস্কৃত নাটকের কিছু কিছু নিয়ে রূপ সম্পূর্ণ নতুন একটি কাহিনীর সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এই কাহিনীর অকারণ জটিলতা ও কষ্টকল্পনা পরবর্তী কৃষ্ণ কথাসাহিত্যকে খুব বেশী প্রভাবিত করতে পারি নি। সে তুলনায় ভাগবতীয় সরলরেখায় অঙ্কিত দ্বারকালীলার কাহিনী অধিকতর আদৃত হয়েছে।

রূপের এই দুটি নাটকেই পুরুষের নারী ছদ্মবেশ ধারণের প্রসঙ্গ রয়েছে। বিদগ্ধ-মাধব নাটকে সুবল রাধার বেশ ধারণ করেছেন, ললিতমাধব নাটকে শ্রীকৃষ্ণ নারীরূপ ধারণ করেছেন।

এ ছাড়া কাহিনী হিসেবে নাটক দুটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা ও অন্যান্য গোপীগণের প্রেমকে স্বকীয়া বলে প্রতিপন্ন করা। বিদগ্ধমাধব নাটকে তিনি বলেন, রাধার সঙ্গে অভিমন্যু গোপের বিবাহ সত্য নয়, এবং ললিতমাধব নাটকের দশম অঙ্কে চিত্রিত নব বৃন্দাবনে তিনি সত্যভামারূপিণী রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ সম্পাদন করেছেন। অথচ এই শ্রীরূপই আবার উজ্জ্বলনীলমণিতে বলেছেন পরকীয়ার মূল উপপতিভাবেই শৃঙ্গার রসের পরমোৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত।[২৮] তবে এ ব্যাপারে ললিতমাধবে তিনি যে একটি সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করেছেন—তা নাটকের

শেষে দেবী একানংশার উক্তি থেকেই বোঝা যায়। এই নাটকেও আমরা দেখি শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা সকলেই দ্বারকাপুরে গিয়ে সত্যভামা, রুক্মিণী, লক্ষণা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছেন। যাঁরা দ্বারকালীলার উপাসক, তাঁরা স্বকীয়াবাদী এবং ভগবানের ঐশ্বর্যরূপেই ভক্তিমান। কিন্তু যাঁরা ব্রজলীলা সমর্থন করেন —তাঁরা সম্পূর্ণভাবেই পরকীয়াবাদী। ঈশ্বরের ঐশ্বর্যমূর্ত্তি চিন্তা করায়ও রসাভাস ঘটে বলে তাঁরা মনে করেন। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বিরাট বিরোধও ছিল। ললিতমাধব নাটকের কথা-অংশের মাধ্যমে শ্রীরূপ সেই বিরোধ মেটানোর চেষ্টা করেছেন।

দানকেলিকৌমুদী: শ্রীরূপের অপর একটি একাঙ্ক নাটকের নাম দানকেলি-কৌমুদী। সংস্কৃতে একাঙ্ক নাটককে ভাণিকা বলা হয়। ভাণিকার নানা প্রকার সংজ্ঞার মধ্যে শারদাতনয় কৃত 'ভাবপ্রকাশন' নামক গ্রন্থে প্রদত্ত লক্ষণের সঙ্গে এই ভাণিকার অধিকতর সাদৃশ্য রয়েছে। শারদাতনয়ের মতে ভাণিকার বিষয়বস্তু হবে শ্রীহরিচরিত। এর অঙ্গীরস হবে শৃঙ্গার রস, এতে নৃত্য ও সঙ্গীত এবং চতুর পরিহাস বাক্য থাকবে।

কথিত আছে যে রঘুনাথ দাস গোস্বামী রূপ গোস্বামীর নাটক দুটি পড়ে শ্রীরাধার বিরহযন্ত্রণায় বিহ্বল হয়ে পড়লে তাঁকে কিছুটা শান্ত করার জন্য শ্রীরূপ এই হাল্কা হাস্য পরিহাসযুক্ত নাটক রচনা করেন। এর রচনাকাল ১৫৪৯ খ্রীস্টাব্দ।

এই ভাণিকাটির আখ্যানও রূপের নিজস্ব কল্পনা। বসুদেব নন্দগৃহস্থিত, পুত্র বলদেব ও নন্দপুত্র শ্রীকৃষ্ণের শান্তি কামনা করে গর্গের জামাতা ভাগুরিকে দিয়ে বনের মধ্যে একটি যজ্ঞানুষ্ঠান শুরু করেন। গুরুজনের আদেশে রাধা যজ্ঞস্থলে হৈয়ঙ্গবীন (সঙ্গে সঙ্গে তৈরী করা ঘি) বিক্রয় করার জন্য গমন করেন। পৌর্ণমাসী নান্দী-মুখীকে দিয়ে এই ঘটনা আগেই শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়ে দিলে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পাহাড়ে দানঘাটের রক্ষকরূপে রাধা ও তাঁর সখীদের কাছ থেকে শুল্ক দাবী করেন। এই ঘটনা নিয়েই নাটক আরম্ভ। অবশেষে পৌর্ণমাসী নিজে মধ্যস্থ হয়ে উপযুক্ত শুল্ক প্রদান করে বিবাদের নিষ্পত্তি করেন।

নাটকের মূল ঘটনা সখীদের সঙ্গে শ্রীরাধার গোবিন্দকুণ্ডে ঘৃত নিয়ে যাওয়া—দানলীলার কাহিনীতে মৌলিক সংযোজন। এই নাটকের প্রাসঙ্গিক দুটি ঘটনাও রূপের কবিকল্পনার চমৎকার নিদর্শন। ঘটনাদুটি হল, বৃন্দাবনেশ্বরীরূপে রাধার রাজ্যাভিষেক ও রাধা-কৃষ্ণের পাশাখেলা। পরবর্তীকালের কৃষ্ণকথা সাহিত্যে, বিশেষতঃ পদাবলী সাহিত্যে এই ঘটনা দুটিকে নিয়ে স্বতন্ত্র কাব্যও লেখা হয়েছিল।[২৯]

পদ্যাবলী: কাব্য এবং নাটক ছাড়াও 'পদ্যাবলী' নামক রূপের একটি শ্লোক সঙ্কলন গ্রন্থ কৃষ্ণকথায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এতে ১২৫ জন কবির ৩৮৭টি শ্লোক সংগৃহীত হয়েছে। সমসাময়িক ও সুপ্রাচীন বহু কবি ও মহাজনের কৃষ্ণকথা বিষয়ক পদগুলি এর মধ্যে সঙ্কলিত রয়েছে। এই ধরনের সঙ্কলন আগে আমরা সংস্কৃতে দুটি পেয়েছি—সুভাষিত-রত্নকোষ ও সদুক্তিকর্ণামৃত। কিন্তু পদ্যাবলীর বৈশিষ্ট্য হ'ল, এর সবগুলি পদই কৃষ্ণকথাবিষয়ক। কৃষ্ণলীলাকথার বহুবিধ পর্যায়ই এর বিষয়বস্তু।

এতে কৃষ্ণকথার যে বিষয়গুলি আমরা পেয়েছি তা হল-শ্রীকৃষ্ণের শৈশব (১২৯-১৩৪), শৈশবে তারুণ্য (১৩৫-১৩৯), গব্যহরণ (১৪০-১৪৫) শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শন (১৪৬-১৪৭), শ্রীনন্দ যশোদার বিস্ময় (১৪৮-১৫১), গো রক্ষণাদি লীলা (১৫২-১৫৩), গোপীগণের প্রেমোৎকর্ষ (১৫৪-১৫৫), গোপীগণের সহিত লীলা (১৫৬), গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভাব (১৫৭), শ্রীকৃষ্ণের প্রথমদর্শনে শ্রীরাধার প্রশ্ন (১৫৮-১৫৯), সখীর উত্তর (১৬০), শ্রীরাধার পূর্বরাগ (১৬১-১৭৯), অন্য চতুর সখীর বিতর্ক (১৮০), শ্রীরাধার প্রতি সখীর প্রশ্ন (১৮১-১৮৪), শ্রীরাধার প্রতি সখীর সপরিহাস আশ্বাস (১৮৫), শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগকথন (১৯১-১৯৩), শ্রীরাধাভিসার (১৯৪-১৯৬), শ্রীরাধার প্রতি সখীবাক্য (১৯৭-১৯৮), ক্রীড়া (১৯৯-২০০), ক্রীড়াত্মক মর্মজ্ঞাতা সখীগণের নর্মোক্তি (২০১), মুগ্ধবালবাক্য (২০২)' শ্রীরাধার সহিত দিনান্ত কেলি, সখীবাক্য (২০৩), শ্রীরাধার সাভিলাষ বাক্য (২০৪-২০৭), সখীর পরিহাস (২০৮), অন্যদিন অভিসারিকা, সখীবাক্য (২০৯), পরীক্ষণকারিণী সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য (২১০-২১১) বাসকসজ্জা (২১২), উৎকণ্ঠিতা (২১৩-২১৪), বিপ্রলব্ধা (২১৫), খণ্ডিতা (২১৬), শ্রীরাধার বাক্য (২১৭-২২১), সায়ংকালে মাধব আগত হলে সখীশিক্ষা (২২২), মানিনী (২২৩-২২৪) শ্রীকৃষ্ণ বহির্গত হলে সখীর বাক্য (২২৫), শ্রীকৃষ্ণের দূতীবাক্য (২২৬-২২৭), দূতীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য (২২৮), কলহান্তরিতা (২২৯), কর্কশ সখীবাক্য (২৩০), সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য (২৩১-২৩৫), সখীর অসূয়া-বাক্য (২৩৬), ক্ষুব্ধাশ্রীরাধিকার উক্তি (২৩৭), মানজ্বরগ্রস্তা শ্রীরাধার প্রতি সখীর বাক্য (২৩৮), সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য (২৩৯)' কৃষ্ণবিরহ (২৪০), রাধাপ্রসাদন (২৪১), শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার সখীর বাক্য (২৪২-২৪৩), দিনান্তরবার্তা, (২৪৪-২৪৬,) পুষ্পান্বেষণচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণকারিণী শ্রীরাধার প্রতি কোন নারীর উক্তি (২৪৭), শ্রীরাধাবাক্য (২৫০) স্বাধীনভর্তৃকা (২৫১), শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন (২৫২), বাঁশী চুরি (২৫৩), বংশীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য (২৫৪-৫৫), সায়ংকালে শ্রীহরির ব্রজে আগমন (২৫৬), কোন গোপীর উক্তি (২৫৭-২৫৮), শ্রীরাধার সৌভাগ্য (২৫৯-২৬১), গোদোহন (২৬২), শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চন্দ্রাবলীর বাক্য (২৬৩), গোবর্ধনধারণ (২৬৪—২৬৭), নৌক্রীড়া (২৬৮-২৮০), শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাকোবাক্য (২৮১-২৮৪), রাস (২৮৫-২৮৯) শ্রীকৃষ্ণবাক্য (২৯০—২৯১), ব্রজদেবীদের উত্তর (২৯২-২৯৪), শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে তাঁদের প্রশ্ন (২৯৫-২৯৬), শ্রীরাধার সখীর বাক্য (২৯৭-২৯৮), আকাশচারীদের উক্তি (২৯৯-৩০০), জলক্রীড়া (৩০১), শ্রীরাধার সখীদের প্রতি চন্দ্রাবলীর সখীর ঈর্ষাযুক্ত বাক্য (৩০২), শ্রীরাধার সখীর আকূতিপূর্ণ বাক্য (৩০৩), গান্ধর্বার প্রতি সখীবাক্য (৩০৪-৩০৯), তাঁহার প্রতি কোন রমণীর উক্তি (৩১০), চন্দ্রাবলীর প্রতি সখীর বাক্য (৩১১), তদ্‌ভক্তার প্রতি সখীর বাক্য (৩১২), নিত্যলীলা (৩১২ক—৩১২গ) কৃষ্ণ মথুরায় প্রস্থান করলে শ্রীরাধার সখীর বাক্য (৩১৩), শ্রীরাধাবাক্য (৩১৪), শ্রীহরির মথুরাপ্রবেশ (৩১৫), পুরস্ত্রীবাক্য (৩১৬-৩১৮), শ্রীরাধার বিলাপ (৩১৯—৩৩৭), মথুরায় যশোদাস্মরণে শ্রীকৃষ্ণবাক্য (৩৩৮), শ্রীরাধাস্মরণে

শ্রীহরির বাক্য (৩৩৯), উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য (৩৪০), উদ্ধবের দ্বারা শ্রীরাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ প্রেরণ (৩৪১-৪২), বৃন্দাবনে গমনরত উদ্ধবের বাক্য (৩৪৩-৩৪৬), ব্রজদেবীকুলের প্রতি উদ্ধবের বাক্য (৩৪৭), উদ্ধবদর্শনে সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য (৩৪৮), শ্রীরাধার প্রতি উদ্ধবের বাক্য (৩৪৯), উদ্ধবের প্রতি শ্রীরাধার সখীর বাক্য (৩৫০-৩৫২), শ্রীরাধার সখী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সন্দেশ (৩৫৩-৩৬৪), সখীর প্রণয়যুক্ত ঈর্ষাপূর্ণ জল্পনা(৩৬৫), ব্রজদেবীগণের উৎকন্ঠার সহিত সন্দেশ (৩৬-৬), যথার্থ সন্দেশ (৩৬৭-৬৮) দ্বারকাস্থ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ (৩৬৯-৩৭২), শ্রীবৃন্দাবনা-ধীশ্বরীর বিরহগীত (৩৭৩), ব্রজদেবীগণের সন্দেশ (৩৭৪-৩৭৬), সুদামার প্রতি শ্রী-দ্বারকেশ্বরের বাক্য (৩৭৭), নিজ গৃহ প্রভৃতি দর্শন করে সুদামার বাক্য (৩৭৮), কুরুক্ষেত্রে শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরীর চেষ্টা (৩৭৯-৩৮০), নির্জনে অনুনয়কারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার বাক্য (৩৮১), সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য (৩৮২-৮৩)।

দেখা যাচ্ছে পদ্যাবলীর পদগুলিতে বৃন্দাবনলীলাই প্রাধান্য লাভ করেছে এবং দ্বারকালীলার বর্ণনা একেবারেই নেই। উপরন্তু দ্বারকায়ও শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে বৃন্দাবনের স্মৃতিতে ব্যাকুল হয়েছিলেন তারই বর্ণনা রয়েছে। পদ্যাবলীর এই শ্লোক সংগ্রহও প্রমাণ করে কৃষ্ণলীলারসাস্বাদনে শ্রীরূপ সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বর্যভাববিমুক্ত, মধুররসসর্বস্ব পরকীয়াপ্রেমনির্ভর বৃন্দাবনলীলাকেই সমর্থন করতেন। এর প্রমাণ হিসেবে আরও বলা যায় 'যঃ কোমারহর' শ্লোকটির কথা। ৩০ বহুস্থানে উদ্ধৃত ৩১ লৌকিক পরকীয়া প্রেম প্রতিপাদক এই শ্লোকটি মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। রথযাত্রার সময় নৃত্য ও কীর্তন করতে করতে তিনি জগন্নাথদেবের ঐশ্বর্যমূর্তি দর্শনে ভাবাবিষ্ট হয়ে শ্লোকটি আবৃত্তি করতেন। এর মর্মার্থ একমাত্র স্বরূপ দামোদর ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারত না। শ্রীরূপ গৌড় থেকে প্রত্যাবর্তন করে নীলাচলে এলে রথযাত্রার সময় তার উপস্থিতিতে মহাপ্রভু এই শ্লোকটি আবৃত্তি করেন। প্রতিভাবান রূপ এর অন্তর্নিহিত অর্থটিই শুধু উপলব্ধি করলেন না। বৃন্দাবন-লীলার পরকীয়া রতির শ্রেষ্ঠত্বব্যঞ্জক একটি শ্লোকও রচনা করে ফেললেন—

> "প্রিয়ঃ সোহয়ং সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতস্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ
> সঙ্গমসুখম্। তথাপ্যন্তঃ খেল-মধুর মুরলী পঞ্চমযুষে মনো মে
> কালিন্দী পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি॥"

"হে সহচরি, সেই প্রিয় কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হয়েছে, আমিও সেই রাধা, সেই এই আমাদের উভয়ের সঙ্গম সুখ। তথাপি যে বনমধ্যে মধুর মুরলীর পঞ্চম স্বরের খেলা হতো—সেই কালিন্দিপুলিনবিপিনের জন্য আমার মনে বাসনা হচ্ছে"।

পরের দিন রূপ সমুদ্রস্নানে গেলে মহাপ্রভু ঐ শ্লোকটি পড়ে ভাবাবিষ্ট হন ও রূপকে অভিনন্দিত করেন।[৩২] এই শ্লোকটিও পদ্যাবলীতে গৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে মহাপ্রভুর পরকীয়া রতি-প্রীতিকে রূপ কাব্যরূপ দান করেছেন।

ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত ভারতীয় সাহিত্যে যে সব প্রেমকবিতা পাওয়া যায়—তা সব ধর্মীয় কবিতা নয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই

ধরনের কবিতা প্রচুর রচিত হয়। এই প্রেম কবিতাগুলির বেশীর ভাগেরই নায়ক-নায়িকা কৃষ্ণরাধা। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে এত প্রচুর পদ রচিত হয়েছিল যে এদের পারম্পর্য অনুযায়ী সজ্জিত করলে পূর্ণাঙ্গ লীলাকাব্যের আকার ধারণ করে। রূপ এই ধরনের কবিতাগুলিকেই ক্রম অনুযায়ী সজ্জিত করে পদ্যাবলী সংকলন করেছেন। তবে চৈতন্যপূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে কোন ভক্তিদর্শন কাজ করে নি। আর রূপ তাঁর সঙ্কলনকে শ্রীচৈতন্যের দিব্যভাবপূত জীবনের আলোকে বিশিষ্ট ধর্মদর্শনের ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছেন। এইভাবে চৈতন্যপূর্ববর্তী কেবলমাত্র আদিরসাশ্রিত রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা রূপের হাতে নবতর তাৎপর্য লাভ করেছে।

কিন্তু কাব্যনাটক ও কাব্যসঙ্কলন ছাড়াও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে যে কারণে রূপের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তা হ'ল তাঁর রচিত দর্শনগ্রন্থ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং অলঙ্কার-দর্শন 'উজ্জ্বলনীলমণি'। এই দুটি গ্রন্থকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তিভূমি বলে অভিহিত করলে কিছু অন্যায় হয় না।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১৪৬৩ শকাব্দে বা ১৫৪১ খ্রীস্টাব্দে রূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু রচনা করেন। এই গ্রন্থে ২১৪১টি শ্লোক রয়েছে। এর বিভাগ চারটি—পূর্ব পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর।

এই বিপুল পরিসর গ্রন্থে রূপ উত্তমা ভক্তি, সাধন, ভাব ও প্রেমভেদে তিন প্রকার শুদ্ধা ভক্তি, ভক্তিরসের আলম্বন ও উদ্দীপনবিভাব, সপরিকর ভক্তির বৈশিষ্ট্য পাঁচটি রস, বিবিধরসের মিশ্রণ ও তিন ধরনের রসাভাসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন।

বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তত্ত্ব আমরা আলোচনা করছি না। কিন্তু কৃষ্ণকথা এই তত্ত্বকে আশ্রয় করে কেমন দীপ্ত হয়ে উঠেছে তা তৃতীয় অর্থাৎ পশ্চিম বিভাগের রস-পর্যায় আলোচনায় অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

শ্রীরূপ পাঁচটি রসকে স্বীকার করে নিলেও বৃন্দাবনলীলায় শান্ত ও দাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায় না। আর মধুর রসের বিস্তৃত আলোচনা তিনি করেছেন উজ্জ্বলনীলমণিতে। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা সখ্য এবং বাৎসল্য এই দুটি রসকেই বিশেষ ভাবে পাই। সখ্যরসের পর্যায়ে সখাদের তিনি ব্রজ ও পুর অথাৎ দ্বারকালীলা-এই দুভাগে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে আবার ব্রজসখাদের প্রতিই তাঁর পক্ষপাত স্বাভাবিক ভাবে বেশী। কৃষ্ণকথায় বৃন্দাবনলীলার কিছু উপাদান আমরা এখানেই পাই। ব্রজের সখারা চারভাগে বিভক্ত—(১) সুহৃদ, (২) সখা, (৩) প্রিয়সখা, (৪) প্রিয়নর্মসখা। শ্রীরূপ এখানে কৃষ্ণসখাদের নাম নিজস্ব কল্পনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সুহৃদদের মধ্যে আছে—সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্ধন, গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় বলভদ্র। এই সুহৃদেরা কৃষ্ণের চেয়ে বয়সে কিছু বড় তাই এদের বন্ধুত্বে বাৎসল্যের ভাবও রয়েছে।

আর সখা তারাই যারা শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ। সেই কারণে তাদের সখ্যরসে স্বাভাবিক ভাবেই কিছুটা দাস্যভাব রয়েছে। এদের নাম—বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মকরন্দ, কুসুমপীড়, মনিবন্ধ ও করন্ধম।

তৃতীয় প্রকার সখারা শ্রীকৃষ্ণের সমবয়সী এবং বিশুদ্ধ ভাবে সখ্যরসাশ্রয়ী। এরা হল— শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন বিলাসী পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীদাম। পদাবলীতে ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে এই প্রিয়সখাদের উপস্থিতি বিরল-লক্ষ্য নয়।

সখাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিভাগ প্রিয়নর্মসখা। এদের নাম সুবল, অর্জুন, গন্ধর্ব, বসন্ত ও উজ্জ্বল। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বয়সকেও তিনি তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত পৌগণ্ড এবং পনের বছর বয়স পর্যন্ত কৈশোর। সখাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নানা প্রকার ক্রীড়ার মধ্যে বাহুযুদ্ধ ও নৃত্য শ্রীরূপের নিজস্ব কল্পনায় সৃষ্ট।

বাৎসল্যরস প্রকরণে শ্রীরূপ এই রসের আলম্বন হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ, নন্দ, যশোদা রোহিণী ব্রহ্মা কর্তৃক অপহৃত রাখালদের জননীরা, দেবকী, কুন্তী, বসুদেব প্রভৃতির নাম দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন নন্দ ও যশোদা। এঁদের বাৎসল্য প্রসঙ্গ ভাগবতেই বিস্তৃতভাবে আছে। শ্রীরূপের মৌলিকত্ব হল তিনি মথুরাপ্রবাসী কৃষ্ণের শোকে, যশোদার শোকতীব্রতাকে শেষ পর্যন্ত উন্মাদ ও মোহদশা পর্যন্ত নিয়ে গেছেন। তবে পরবর্তীকালের কৃষ্ণকথায় এর প্রভাব তত বেশী নয়।

উজ্জ্বলনীলমণি

কৃষ্ণকথার প্রধান আশ্রয় মধুর রস। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে এই মধুর রস বৈচিত্র্য আলোচনা করেছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে মধুর রস সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। তারই পরিপূরক রূপে যেন উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থটি রচিত। এই দুটি গ্রন্থকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বেদ বলা যায়। বিশেষতঃ উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থটি বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ও মৌলিক সিদ্ধান্তে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের ভিত্তিভূমি। পূর্ববর্তী অলঙ্কার শাস্ত্রগুলি থেকে এর পরিভাষাগুলি গৃহীত হলেও মধুর রসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শ্রীরূপের মৌলিক প্রতিভারই সৃষ্টি। লৌকিক প্রেম তাঁর গ্রন্থে ঈশ্বরসাধনার পন্থা ও ভক্তিতে পরিণত হয়েছে।

উজ্জ্বলনীলমণিতে মোট ১৫টি প্রকরণ আছে—(১) নায়কভেদ-প্রকরণ (২) সহায়-ভেদ-প্রকরণ (৩) শ্রীকৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণ (৪) শ্রীরাধা-প্রকরণ (৫) নায়িকাভেদ-প্রকরণ (৬) যূথেশ্বরীভেদ-প্রকরণ (৭) দূতীভেদ-প্রকরণ (৮) সখি-প্রকরণ (৯) শ্রীহরি-বল্লভা প্রকরণ (১০) উদ্দীপন-বিভাব-প্রকরণ (১১) অনুভাব-প্রকরণ (১২) সাত্ত্বিক-প্রকরণ (১৩) ব্যভিচারি-প্রকরণ (১৪) স্থায়িভাব-প্রকরণ (১৫) শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণ।

নায়কভেদ-প্রকরণে শ্রীরূপ বিভিন্ন ধরনের নায়কের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর উজ্জ্বলরসের একমাত্র নায়ক বা বিষয়াবলম্বন হলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা, গোপী প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেয়সীরা আশ্রয়-আলম্বন।

প্রথমত নায়ক চার প্রকার—(১) ধীরোদাত্ত, (২) ধীরললিত (৩) ধীরোদ্ধত (৪) ধীরশান্ত। এঁরা প্রত্যেকেই পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণভেদে বারো প্রকার। এঁরাও আবার পতি ও উপপতি ভেদে চব্বিশ প্রকার। এঁদের আবার অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট—এই চারভাগে ভাগ করা যায়।

যে নায়ক একমাত্র স্ত্রীতেই অত্যন্ত আসক্ত হয়ে অন্যনারী বিষয়ে স্পৃহা ত্যাগ করেন তাঁকে অনুকূল বলে। যিনি অন্য নারীতে আসক্ত হয়েও পূর্বনায়িকার প্রতি গৌরব, ভয় ও সারল্য ত্যাগ করেন না, তাঁকে দক্ষিণ নায়ক বলে। আবার যিনি নায়িকার সামনে প্রিয়ভাষী হন, অথচ আড়ালে অত্যন্ত অপ্রিয় ব্যবহার করেন এবং গোপনে অপরাধও করেন, তিনি শঠ নায়ক। যে নায়ক অন্য যুবতীর ভোগচিহ্ন শরীরে প্রকাশ পেলেও নির্ভয় ও মিথ্যাবাক্য বিন্যাসে দক্ষ, তাঁকে 'ধৃষ্ট' বলে। চৈতন্যপূর্ব যুগে জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদে আমরা এই নায়কের সাক্ষাৎ পাই।

সহায়ভেদ-প্রকরণে নায়কের সহায়কদের আবার পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—(১) চেট (২) বিট (৩) বিদূষক (৪) পীঠমর্দ ও (৫) প্রিয়নর্মসখা।

যারা চতুরভাবে সন্ধান করতে পারে, নিগূঢ়ভাবে কার্যসম্পন্ন করতে পারে অথচ প্রগল্ভ বুদ্ধিমান সেবক—তাদেরকেই বলা হয় চেট। যে বেশ রচনায় এবং উপচার প্রয়োগে কুশল, ধূর্ত, আলাপে দক্ষ ও কামশাস্ত্র-নীতিতে দক্ষ, সেই হ'ল বিট। যে ভোজনলোলুপ, কলহপ্রিয় আর নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গীতে, কথায়, ও সাজসজ্জায় হাস্যোদ্রেক করে—সেই বিদূষক, যেমন—বিদগ্ধমাধবের মধুমঙ্গল। যিনি নায়কের মত গুণবান হয়েও প্রেমভরে নায়কের অনুগত থাকেন, তিনি পীঠমর্দ, যেমন শ্রীদাম। যিনি সখিভাব আশ্রয় করেন এবং প্রণয়িগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি প্রিয়নর্মসখা, যেমন—শ্রীকৃষ্ণের সুবল, অর্জুন ইত্যাদি। এছাড়া নায়ক-প্রকরণে নায়ককে সাহায্য করার জন্য দূতীর কথাও বলা হয়েছে। এই দূতীদের প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়—(১) স্বয়ংদূতী ও (২) আপ্তদূতী। স্বয়ংদূতী তিনভাবে কাজ করে—কায়িক, বাচিক ও চাক্ষুষ। আর আপ্তদূতীকেও তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা (১) অমিতার্থা (২) নিসৃষ্টার্থা (৩) পত্রহারিণী। এই দূতী-বর্ণনা বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও পাওয়া যায়।

তৃতীয় বিভাগ হল শ্রীহরিপ্রিয়াপ্রকরণ। এই প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের নায়িকাদের বিভিন্ন বিভাগ দেখানো হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের নায়িকাদের দুভাগে ভাগ করা যায় (১) স্বকীয়া (২) পরকীয়া।

কাত্যায়নীব্রতপরা যে সব গোপকন্যার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়েছিল, তাঁরাই স্বকীয়া নায়িকা। রুক্মিণী, সত্যভামা, কালিন্দী, নাগ্নজিতী প্রভৃতি মহিষীরা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা। এঁরা স্বামীর আজ্ঞানুবর্তিনী এবং পাতিব্রত্যধর্ম থেকে কিছুতেই বিচলিত হন না। অন্যদিকে যে সব নায়িকা ঐহিক ও পারত্রিক ধর্মকে গ্রাহ্য না করে কেবলমাত্র আসক্তিবশে অপর পুরুষে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁরা পরকীয়া নায়িকা। এই নায়িকাদের মধ্যে যাঁরা কুমারী তাঁদের বলা হয় কন্যকা, আর যাঁরা অন্যের বিবাহিতা পত্নী, তাঁরা পরোঢ়া। এই পরোঢ়াদের আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়—সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া। সাধনপরাকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়—

যৌথিকী ও অযৌথিকী। যৌথিকীদেরও দুভাগে ভাগ করা যায়—মুনিচরী ও শ্রুতিচরী। দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিরা রামচন্দ্রকে দেখে পরবর্তী জন্মে কৃষ্ণ প্রাপ্তির আশায় সাধনা করে ব্রজে গোপীদেহ লাভ করে জন্মগ্রহণ করেন। এঁরাই মুনিচরী। অন্যদিকে যে সব মহোপনিষৎ সর্বথা সূক্ষ্মদর্শিনী ছিলেন, তাঁরা গোপীদের সৌভাগ্যে বিস্মিত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে তপস্যা করেন, এবং এর ফলে ব্রজে প্রেমসম্পদযুক্তা গোপী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন—এঁদেরকেই বলা হয় শ্রুতিচরী।

আবার যে সব ব্যক্তি গোপীভাবে লুব্ধচিত্ত হয়ে সাধনা করেন এবং ব্রজধামে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা হলেন অযৌথিণী।

পরোঢ়াদের দ্বিতীয় প্রকার হলেন দেবী। শ্রীকৃষ্ণ যখন অংশরূপে দেবযোনিতে অবতরণ করেন, তখন তাঁর তুষ্টির জন্য তাঁর নিত্যকান্তাদের অংশও দেবীরূপে প্রকট হয়ে থাকেন। এঁরাই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণাবতারে গোপকন্যা হয়ে সেই সেই অংশিনী নিত্যপ্রিয়াদের প্রিয়সখী হয়েছেন।

আর ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী। এ ছাড়া অন্যান্য নিত্যকান্তাদের মধ্যে আছেন খঞ্জনাক্ষী, মনোরমা, মঙ্গলা, বিমলা ও লীলা ইত্যাদি। এঁদের প্রত্যেকেরই শত শত যূথ আছে এবং এক এক যূথেও লক্ষ লক্ষ ব্রজাঙ্গনা আছেন। বিশাখা, ললিতা, পদ্মা এবং শৈব্যা—এই চার সখী ছাড়া অন্য সকলেই যূথেশ্বরী। কিন্তু সৌভাগ্যাধিক্যে শ্রীরাধা প্রভৃতি অষ্ট মূর্তিই প্রধানা বলে সম্মত।

চতুর্থ বিভাগ শ্রীরাধা-প্রকরণে শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্বসূচক নানা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। উজ্জ্বলনীলমণির শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপিণী, সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিগ্রহ, হ্লাদিনী শক্তি, তিনি সর্বশক্তিবরীয়সী। রাধা সুষ্ঠু কান্তস্বরূপা, ধৃতষোড়শশৃঙ্গারা এবং দ্বাদশ আভরণে সজ্জিতা। শ্রীরূপ তাঁর প্রধান প্রধান পঁচিশটি গুণের কথা বলেছেন—১) মধুরা, (২) নববয়াঃ, (৩) চলাপাঙ্গী, (৪) উজ্জ্বলস্মিতা, (৫) চারু-সৌভাগ্যরেখাঢ্যা, (৬) মধুরগন্ধোন্মাদিত মাধবী, (৭) সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা, (৮) রম্যবাক্, (৯) নর্মপণ্ডিতা (১০) বিনীতা (১১) করুণাপূর্ণা (১২) বিদগ্ধা (১৩) পাটবান্বিতা (১৪) লজ্জাশীলা (১৫) সুমর্যাদা (১৬) ধৈর্যশালিনী (১৭) গাম্ভীর্যশালিনী (১৮) সুবিলাসা (১৯) মহাভাব-পরমোৎকর্ষতর্ষিনী (২০) গোকুলপ্রেমবসতি (২১) জগচ্ছ্রেনী-লসদ্যশাঃ (২২) গুর্বর্পিত গুরুস্নেহা (২৩) সখিপ্রণয়িতাবশা (২৪) কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা (২৫) সন্ততাশ্রয়কেশবা। রাধার সখীদের আবার পাঁচভাগে ভাগ করা যায়—(১) সখী (২) নিত্যসখী (৩) প্রাণসখী (৪) প্রিয়সখী (৫) পরমপ্রেষ্ঠসখী। কুসুমিকা, বিন্ধ্যা ও ধনিষ্ঠা প্রভৃতি রাধার সখী। কস্তুরিকা ও মণিমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসখী; শশিমুখী, বাসন্তী ও লাসিকা ইত্যাদি প্রাণসখী। কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মঞ্জুকেশী, কন্দর্পসুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা ও শশিকলা প্রভৃতি প্রিয়সখী এবং ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী—এই আটজন সর্বগণ প্রধানা এবং পরমপ্রেষ্ঠসখী বলে পরিগণিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে এ বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

পরবর্তী প্রকরণের নাম নায়িকা ভেদ প্রকরণ। নায়িকা তিন প্রকার—স্বকীয়া, পরকীয়া ও সাধারণী। স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকাদের আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়—মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা। মুগ্ধা নায়িকার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শ্রীরূপ বলেছেন—

মুগ্ধা নববয়ঃকামা রতৌ বামা সখীবশা।
রতচেষ্টাসু সব্রীড়চারু গূঢ়প্রযত্নভাক্‌॥
কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা।
প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ চাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা॥ [৩৩]

মুগ্ধা বয়সে নবীন, প্রথম বাসনা, কামকলায়ও তাঁর অনভিজ্ঞতা। তিনি রতিবিষয়েও প্রতিকূলতা করেন এবং সখীদের অনুগতা হন। অতিরিক্ত লজ্জাহেতু নিজের গোপন মনোভাবের বহিঃপ্রকাশে সাবধানতা অবলম্বন করেন। প্রণয়ী অপরাধ করলে তিনি মান করতে পারেন না, শুধু রোদন করেন। চাটুপ্রিয়বাক্য অথবা অপ্রিয়বাক্য—দুয়ের কোনটাই তিনি প্রয়োগ করতে পারেন না। উদাহরণ হিসেবে বিদ্যাপতির পদ উদ্ধৃত করা যায়—

কত অনুনয় অনুগত অনুবোধি।
পতিগৃহ সখিহি সুতাওল বোধি॥
বিমুখি সুতলি ধনি সুমুখি ন হোএ।
ভাগল দল বহুলাব এ কোএ॥
বালমু বেসনি বিলাসিনি ছোটি।
মেল ন মিলএ দেলহু হেম কোটি॥
বসন ঝপাএ বদন ধর গোএ।
বাদর তর সসি বেকত ন হোএ॥ [৩৪]

মধ্যানায়িকা সম্পর্কে শ্রীরূপ বলেছেন—

সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী॥
কিঞ্চিৎপ্রগল্‌ভ বচনা মোহান্তসুরতক্ষমা॥
মধ্যা স্যাৎকোমলা ক্বাপি মানে কুত্রাপি কর্কশা। [৩৫]

যে নায়িকার লজ্জা ও মিলনেচ্ছা দুই-ই সমান, যার বাক্য ঈষৎ প্রগল্‌ভ, সে মধ্যা-নায়িকা। এই নায়িকা মান বিষয়ে কখনো কর্কশ, কখনো রূঢ়। গোবিন্দদাসের মধ্যা নায়িকা নিয়ে রচিত পদ হ'ল—

বেণুক শবদ দূত মঝু অন্তর
পৈঠল শ্রবণক বাট।
হৃদিমাহা ধৈরজ অর্গল তোড়ল
উধারল কুল কবাট॥
(সখি) কানু সে বরজ বাটোয়ার।
মঝু মন-গৃহপতি নিজ জোরে বান্ধল
কছু নাহি কয়ল বিচার॥

তৈখনে মদন সদন আসি ঘেরল
বাঁধল ধরম রাখোয়াল।
ধন মান যৌবন সব হরি লেঅল
উজোরি প্রেম উজিয়াল ॥[৩৬]

শ্রীরূপ প্রগল্‌ভার সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন—

প্রগল্‌ভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোসুরতোৎসুকা
ভূরিভাবোদ্গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্তবল্লভা ॥
অতি প্রৌঢ়োক্তি চেষ্টাসৌ মানে চাত্যন্তকর্কশা।[৩৭]

যে নায়িকার পূর্ণযৌবন, যিনি মদান্ধা, সুরতব্যাপারে যিনি বিশেষভাবে উৎসুক, যিনি বিচিত্র ভাবোদয়ে পটু, যিনি প্রেমরসে প্রিয়তমকে আক্রমণ করতে সক্ষম, এবং মান ব্যাপারে যিনি অত্যন্ত কর্কশ, তিনিই প্রগল্‌ভা নায়িকা। এই নায়িকার বর্ণনা দিয়েও গোবিন্দদাস পদ রচনা করেছেন—

কুটিল কটাখ বিশিখ ঘন বরিখনে
দূরে করি বিবিধ তরঙ্গ।
নিজ তনু ওষধি সরস পরশ দাধ
লেশে থকিত করু অঙ্গ ॥[৩৮]

এই তিন ধরনের নায়িকার মধ্যে মধ্যা নায়িকাকেই কাব্যে বেশী স্থান দেওয়া হয়েছে। আসলে একই নায়িকা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থায় এই তিন রূপ প্রাপ্ত হন।

অবস্থার দিক দিয়ে বিচার করে এই নায়িকাদের আবার আটভাগে ভাগ করা যায়— (১) অভিসারিকা (২) বাসকসজ্জিকা (৩) উৎকণ্ঠিতা (৪) খণ্ডিতা (৫) বিপ্রলব্ধা (৬) কলহান্তরিতা (৭) প্রোষিতভর্তৃকা (৮) স্বাধীনভর্তৃকা।

অভিসার অর্থে কোন সংকেত স্থানের দিকে এগিয়ে যাওয়া বোঝায়। এটি প্রেমিক-প্রেমিকার ক্ষেত্রেই বর্তমানে প্রযুক্ত হয়।

যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করান বা স্বয়ং অভিসার করেন, তাকে অভিসারিকা বলে— যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নীতামসী যান যোগ্যবেশাভিসারিকা
লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈক-সখিযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ।[৩৯]

এই নায়িকারা শুক্লপক্ষে অভিসারের উপযোগী শুক্লবর্ণ বেশ ও কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বেশ ধারণ করে যথাক্রমে জ্যোৎস্নাভিসারিকা ও তমোভিসারিকা হন। এই নায়িকা প্রিয়তমের কাছে যাওয়ার সময় লজ্জায় যেন নিজ অঙ্গেই আচ্ছন্ন হন। এঁর কঙ্কণ, কিঙ্কিণি ও নূপুর প্রভৃতি ভূষণ নিঃশব্দ থাকে। ইনি অবগুন্ঠনবতী হয়ে একটিমাত্র স্নেহপরায়ণা সখীর সঙ্গে অভিসারে যান। বর্ষাভিসার ও জ্যোৎস্নাভিসার নিয়ে বহু পদ রচিত হয়েছে।

বাসকসজ্জিকা— স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহং চ যা সা বাসকসজ্জিকা ॥[৪০]

নিজের অবসর মতো প্রিয়তম আসবেন—এই ভাবে যিনি নিজের দেহ ও বাসগৃহ সুসজ্জিত করেন, তিনিই বাসকসজ্জিকা। জয়দেবের কাব্যে দূতী বা সখী কৃষ্ণের কাছে বাসকসজ্জিকা রাধার বর্ণনা দিয়েছেন—

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্।
তদধরমধুরমধূনি পিবন্তম্ ॥
নাথ হরে। সীদতি রাধা বাসঘরে ॥[৪১]

উৎকণ্ঠিতা বা বিরহোৎকন্ঠিতা—

অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা।
বিরহোৎকন্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা ॥
অস্যাস্তু চেষ্টা হৃত্তাপো বেপথুর্হেতুতর্কণম্।
অরতির্বাষ্প মোক্ষশ্চ স্বাবস্থাকথনাদয়ঃ ॥[৪২]

নিরপরাধ প্রিয়তম বহুক্ষণ না এলে যে নায়িকা উৎসুক হয়ে থাকেন, তাকেই বলা হয় উৎকণ্ঠিতা। গোবিন্দদাসের পদে এই নায়িকার চিত্র পাওয়া যায়—

হাম রহু সংকেত অনত রহু কান।
একলি কুঞ্জে কুসুমশর হান ॥
হৃদয়ে জ্বলত মঝু আগি।
কঠিন পরান রহত কথি লাগি ॥[৪৩]

বিপ্রলব্ধা—

কৃতত্বাসংকেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিত বল্লভে।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ ॥[৪৪]

সংকেতস্থান এবং সময় ঠিক করেও প্রিয় না এলে সেই ব্যথিতা অপমানিতা নায়িকাকে বলা হয়, বিপ্রলব্ধা। উদাহরণ হিসেবে বিদ্যাপতির "রিপু পঁচসর জনি অবসর" শীর্ষক পদটি উল্লেখ করা যায়।[৪৫]

খণ্ডিতা— উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিতা হি সা ॥[৪৬]

পূর্বসংকেতিত কাল অতিক্রম করে যে নায়িকার প্রিয়তম অন্য নায়িকার সঙ্গে সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিত হয়ে প্রাতঃকালে আগমন করেন, তাঁকে খণ্ডিতা বলে। এঁর লক্ষণ হল ক্রোধ, দীর্ঘনিঃশ্বাস ইত্যাদি। যেমন, জগদানন্দের পদে খণ্ডিতা রাধা কৃষ্ণকে তিরস্কার করে বলেছেন—

অরুণ অধরে তুয়া কাজর হেরইতে
মনমথ-শরে জরি গেল।
উরপরি যাবক ভালহি সিন্দুর
পাবক-সমতুল ভেল ॥[৪৭]

কলহান্তরিতা—

যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা ॥[৪৮]

যে নায়িকা সখিজনসমক্ষে পাদপতিত প্রিয়তমকে ফিরিয়ে দিয়ে পরে অনুতাপ করেন, তাঁকেই কলহান্তরিতা বলে। এঁর লক্ষণ হল—প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস। উদাহরণ হিসেবে গোবিন্দদাসের একটি পদ উদ্ধৃত করা যায়—

যাকর চরণ নখর রুচি হেরইতে
মুরছিত কত কোটি কাম।
সো মঝু পদতলে ধরণি লোটায়ল
পালটি না হেরলুঁ হাম॥[৪৯]

প্রোষিতভর্তৃকা—"দূরদেশং গতে কান্তে ভবেৎপ্রোষিতভর্তৃকা।"[৫০] নায়ক দূর দেশে চলে গেলে সেই নায়িকাকে প্রোষিতভর্তৃকা বলে। ইনি সর্বদা প্রিয় নাম সংকীর্তন করেন। এ ছাড়া এঁর মধ্যে দৈন্য, কৃশতা, জাগরণ, মালিন্য, চিত্তের অনাসক্তি, জাড্য এবং চিন্তা প্রভৃতি ভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন বিদ্যাপতির পদ—

পিয়া গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতীমালা॥[৫১]

স্বাধীনভর্তৃকা—"স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা।[৫২] যে নায়িকার কান্ত অধীন হয়ে সবসময়ই তার কাছে অবস্থান করেন, সেই নায়িকাই স্বাধীনভর্তৃকা। ইনি জলকেলি, বনবিহার, কুসুম চয়ন ইত্যাদি করেন। যেমন, গোবিন্দদাসের পদ—

(ধনি ধনি রমনী শিরোমনি রাই
নয়নক ওত করত নাহি মাধব
নিশি-দিশি রস অবগাই॥[৫৩]

এই নায়িকা বিভাগে অবশ্য শ্রীরূপ কোন মৌলিকতার পরিচয় দেন নি। ১২০৫ সালে সংকলিত শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃতে এবং বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণে নায়িকাদের অনুরূপ বিভাগ লক্ষ্য করা যায়।

এরপর যূথেশ্বরীভেদ প্রকরণ। যূথেশ্বরীদের মোট বারোরকম ভাগ দেখা যায়—(১) আত্যন্তিকাধিকা (শ্রীরাধা), (২) আত্যন্তিক লঘু, (৩) সমলঘু (৪) অধিকমধ্যা (৫) সমমধ্যা (৬) লঘুমধ্যা (৭) অধিক প্রখরা (৮) সম প্রখরা (৯) লঘুপ্রখরা (১০) অধিকমৃদ্বী (১১) সমমৃদ্বী (১২) লঘুমৃদ্বী।

দূতীভেদ প্রকরণে দূতীদের দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। স্বয়ংদূতী এবং আপ্তদূতী। যে নায়িকারা অনুরাগ বশে ব্যাকুলা হয়ে লজ্জা পরিহার করে নিজেরাই মিলনকাল ও স্থান ইত্যাদি নির্দেশ করেন, তাঁদের স্বয়ংদূতী বলা হয়। আপ্তদূতীদের আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা ও পত্রহারিণী।

যে দূতী নায়কনায়িকার ইঙ্গিত জেনে নানা উপায়ে তাঁদের মিলন ঘটাতে পারে, তাকেই বলা হয় 'অমিতার্থা' দূতী। নায়ক বা নায়িকার দ্বারা কার্যভার পেয়ে যে দূতী যুক্তিবুদ্ধি দ্বারা উভয়ের মিলন সম্পাদন করে, তাকে বলা হয় 'নিসৃষ্টার্থা,।
যে দূতী নায়ক বা নায়িকার পারস্পরিক বার্তামাত্র বহন করে নিয়ে যায়, তাকে বলা হয় 'পত্রহারিণী'।

উজ্জ্বলনীলমণির সখি প্রকরণ পরবর্তীকালের কৃষ্ণকথায় প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে।

প্রেম, সৌভাগ্য ও সদ্‌গুণ ইত্যাদি দিক দিয়ে সখীদের নানা ভাগে ভাগ করা যায়। সখীদের মধ্যে যাঁর প্রেম, সৌভাগ্য ও সদ্‌গুণের সর্বাধিক আধিক্য, তাঁকে বলা হয় অধিকা, প্রেম প্রভৃতির সমতায় সম ও লঘুতার জন্য লঘু বলা হয়। অন্যদিকে যাঁর বাক্য দুর্লঙ্ঘ্য এবং যিনি সবসময় গৌরবযুক্তা হন, তিনি প্রখরা, গৌরবের ন্যূনতায় মৃদ্বী এবং সমতায় মধ্যা বলে কীর্তিতা হন। আবার নিজের যূথে যিনি যূথেশ্বরী তাঁকে আত্যান্তিকাধিকা বলে। তিনি কোনও যূথে প্রখরা, কোথাও মধ্যা আবার কোথাও বা মৃদ্বীও হন। এই সখীদের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এঁরা কখনও কখনও দূতীর কাজও করেন। এঁদের আবার নিত্যনায়িকা, দ্বিসমা ও সখিপ্রায়া—এই তিনভাগে করা যায়।

রাধাকৃষ্ণলীলায় সখীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বরাগ, মান, প্রবাস, মিলন ইত্যাদি পর্যায়ে সখীরা এই প্রেমলীলাকে পুষ্ট হতে সাহায্য করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে রাধাকৃষ্ণলীলায় সখিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্ণনা করেছেন—

> সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
> সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥[৫৪]

এই সখীরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে শ্রীরাধার প্রেমাতিরেক বর্ণনা করেন, আবার শ্রীরাধার কাছে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বর্ণনা করেন; এইভাবে এঁরা নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আসক্তি জন্মে দেওয়া, রাধাকৃষ্ণের অভিসার করানো, কৃষ্ণের হাতে নিজের সখীকে সমর্পণ, নর্ম, আশ্বাসদান, নেপথ্যরচনা, হৃদয়োদ্‌ঘাটনে পটুতা, দোষাবরণ, স্বামী প্রভৃতিকে বঞ্চনা, কালে সঙ্গমন, ব্যজন ইত্যাদি সেবা করা, উভয়ের প্রতি তিরস্কার, উভয়ের সংবাদ উভয়কে দান, বিরহিণী নায়িকার প্রাণরক্ষার জন্য যত্ন করা ইত্যাদি করেন। সখীদের মধ্যে কেউ কেউ সমস্নেহা, আবার কেউ অসমস্নেহা। সখীরা সমস্নেহা হলেও তাঁরা রাধার দাসী—এই গর্ববোধ তাঁদের মনে সব সময়েই থাকে। সখীরা কৃষ্ণ মিলনের সুযোগ পেলেও রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলনেই তাঁদের বেশী সুখ। শ্রীকৃষ্ণের কাছে শ্রীরাধার গুণকীর্তন অংশে শ্রীরূপ বর্ণনা করেছেন একজন সখী ছল করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে প্রার্থনা করলে তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন লক্ষ্মী যাঁর সৌন্দর্য দেখে নিজ দেহের নিন্দা করেন, যাঁর গুণ চাতুর্য বিচার করে পার্বতীও লজ্জা পান, সেই রাধা ছাড়া কৃষ্ণের অনুরূপা আর কোনও নারী নেই। কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে ছাড়া, অন্য কার সঙ্গে মিলিতা হবেন? কৃষ্ণদাস কবিরাজ সখীভাবের এই বর্ণনাও চমৎকারভাবে দিয়েছেন—

> সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
> কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন।
> কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
> নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥
> রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা।
> সখীগণ হয় তার পল্লবপুষ্প পাতা॥[৫৫]

শ্রীরূপ গোস্বামীর পূর্ববর্তী জয়দেব, চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির পদেও রাধাকৃষ্ণপ্রেমে

সখীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। রাধাকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের আন্তরিক ভালবাসা আর সেই গুণেই প্রয়োজনে তাঁদেরকে তিরস্কার করার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। দূতীপ্রকরণ ইত্যাদি সম্পর্কেও আমরা একই কথা বলতে পারি। শ্রীরূপ এই বৈশিষ্ট্য গুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্য নির্ধারণ করে তাঁদের নির্দিষ্ট নিয়মের গণ্ডীতে আবদ্ধ করেছেন। পরবর্তীকালের কৃষ্ণকথা তাঁরই প্রবর্তিত ছকে, বাঁধা পথ ধরে চলেছে। এবং এই কারণেই চৈতন্যদেবের প্রভাব অপসৃত হওয়ার পর বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্যে নির্জীব প্রথানুসারিতারই প্রাবল্য লক্ষ্য করা গেছে।

এরপর হরিবল্লভা প্রকরণ। হরিবল্লভা প্রকরণে গোপীদের চারটি ভেদ লক্ষ্য করা যায়—স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থ ও প্রতিপক্ষ।

উদ্দীপনবিভাব প্রকরণে হরি ও হরিপ্রিয়াগণের গুণ, নাম, চরিত্র, ভূষণ, তৎসমবন্ধী, তটস্থ, তদাশ্রিত ইত্যাদি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করা হয়েছে। গুণ তিন প্রকার—মানসিক, বাচিক ও কায়িক। মানসিক গুণ হচ্ছে কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা, করুণা ইত্যাদি। বাচিকগুণ হচ্ছে শ্রুতিমধুর কথা বলা। কায়িকগুণের মধ্যে পড়ে বয়স, রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য, অভিরূপতা ও মাধুর্য ইত্যাদি।

মধুররসে বয়সকে চারভাগে ভাগ করা যায়—বয়ঃসন্ধি, নব্য, ব্যক্ত ও পূর্ণ। বয়ঃসন্ধি বলা হয় বাল্য ও যৌবনের সন্ধি অর্থাৎ প্রথম কৈশোরকে। নব্যবয়স বলা হয় সেই স্তরকে—যখন চোখে কিছু চাঞ্চল্য, মুখে মৃদুমন্দ হাসি এবং চিত্তের প্রথম বিকারের ঈষৎ স্ফুরণ হতে থাকে। ব্যক্ত যৌবনে যৌবনের সমস্ত লক্ষণ পরিস্ফুট হয় আর পূর্ণযৌবনে যৌবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যৌবনের মধুর রসলীলার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত তৎসমন্ধী বস্তু হল—বংশীরব, শৃঙ্গধ্বনি, গীত, সৌরভ, ভূষণ-শিঞ্জিত, পদাঙ্ক, নির্মাল্য, বর্হা, গুঞ্জা, অদ্রিধাতু, লগুড়ী, ধেনুবৃন্দ, বেনু, শৃঙ্গ, গোধূলি, বৃন্দাবন ইত্যাদি। তদাশ্রিত হল—খগ, ভৃঙ্গ, মৃগ, কুঞ্জ, লতাদি, কর্ণিকার কদম্ব, গোবর্ধন, যমুনা, রাসস্থলী ইত্যাদি। তটস্থ হ'ল—জ্যোৎস্না, মেঘ, বিদ্যুৎ, বসন্ত, শরৎ, পূর্ণচন্দ্র, বায়ু, খগ।

অনুভাব প্রকরণে তিন ধরনের অনুভাবের কথা বলা হয়েছে। যেমন—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক। এই অলঙ্কারের আবার ২০টি বিভাগ। হাব, ভাব ও হেলা—এই তিনটি অঙ্গজ অলঙ্কার ; শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগল্ভতা, ঔদার্য ও ধৈর্য—এই সাতটি অযত্নজ অলংকার আর লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত—এই দশটি স্বভবাজ অলঙ্কার।

নিজাশ্রয় ভক্তদেহে যা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়—তাকেই বলা হয় উদ্ভাস্বর, নীবি, উত্তরীয় ও ধম্মিল্লের স্খলন, নিঃশ্বাসত্যাগ ইত্যাদিকে উদ্ভাস্বর বলা হয়।

আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, অতিদেশ, অপদেশ উপদেশ, নির্দেশ ও ব্যপদেশ—এই বারোটিকে বাচিক অনুভাব বলা হয়।

আলাপ বলা হয় চাটুবাক্যকে, বিলাপ দুঃখজনিত বাক্য। যেমন—উদ্ধব ব্রজধাম এলে তাঁর কাছে গোপিনীদের দুঃখময় বাক্য। সংলাপ বলা হয় উক্তিপ্রত্যুক্তিযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করা হলে। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় এই ধরনের উক্তিপ্রত্যুক্তিমূলক পদ

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে রচিত হয়েছিল, তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। সন্দেশ হ'ল প্রবাসী নায়কের কাছে নিজের বার্তা প্রেরণ। বিরহিণী ব্রজাঙ্গনাদের উদ্ধব কর্তৃক বার্তাপ্রেরণই এর উদাহরণ।

সাত্ত্বিক প্রকরণে শ্রীরূপ গোস্বামী পূর্ববর্তী আলংকারিকদের অনুসরণ করেই অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণের কথা বলেছেন। এগুলি হল স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়।

ব্যাভিচারি ভাব প্রকরণে তেত্রিশটি ব্যাভিচারীভাবের কথা বলা হয়েছে। যেমন—গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল, নিদ্রা, সুপ্তি, বোধ ইত্যাদি তেত্রিশটি ব্যাভিচারিভাব। তবে মধুর রসে ঔগ্র্য ও আলস্যের ভাব নেই।

এই ভাবে দশা চারটি—ভাবোৎপত্তি, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য ও ভাবশান্তি।

স্থায়িভাবপ্রবরণ—যথাযথ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যাভিচারীভাব স্থায়িভাব-রতির সঙ্গে একত্র মিলিত হয়ে অপ্রাকৃত রস হয়। এই রসে মধুরা রতিই হল স্থায়িভাব। রতির উদয় হয় সাতটি কারণে—অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমা ও স্বভাব। ভাবপ্রকাশকে বলা হয় অভিযোগ। অভিযোগ আবার দুরকমের—স্বাভিযোগ ও পরকৃত অভিযোগ।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস ও গন্ধ—এই পাঁচটিকে বিষয় বলে। অর্থাৎ এইগুলির সাহায্যেই কৃষ্ণরতি জাগ্রত হয়। সম্বন্ধ বলতে কুল, রূপ, বৈদগ্ধ্য, মাধুর্য, গাম্ভীর্য, শৌর্য ও সুশীলতা প্রভৃতি কৃষ্ণের অজস্র গুণ বোঝায়।

বহু মনোজ্ঞ বস্তু থাকলেও এটিই প্রার্থনীয়—এই ধরনের নিশ্চয়ীকরণকে 'অভিমান' বলা হয়। এক্ষেত্রে অন্য পুরুষের তুলনায় কৃষ্ণই একমাত্র প্রার্থনীয়—এটিই বোঝাচ্ছে।

তদীয় বিশেষ বলতে বোঝায় পদ, গোষ্ঠ ও প্রিয়াদি। পদ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চক্র, পদ্ম ও বজ্রচিহ্নে অঙ্কিত চরণচিহ্ন। গোষ্ঠ বলতে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের গোষ্ঠকেই বোঝায় এবং রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিই এই মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন বলে গণ্য হন।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে—এমন ব্যক্তিকে দেখে কৃষ্ণানুরাগ জাগ্রত হলে তাকে বলা হয় উপমা।

কোনও কারণের অপেক্ষা না রেখে যে রতি জাগ্রত হয়, তাকেই বলা হয় স্বভাব।

মধুরা রতিকে আবার অন্যদিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। যে রতি অতিগাঢ় হয় না, প্রায় শ্রীকৃষ্ণ দর্শনেই জাগ্রত হয় এবং যাতে সম্ভোগেচ্ছাই প্রধান হয়, তাকেই সাধারণী রতি বলে। যেমন কুব্জার রতি।

সমঞ্জসা—আমি এঁর পত্নী এবং ইনিই আমার পতি এই ধরনের স্ববিষয়ে আরোপিত সম্বন্ধ বিশেষ সম্পর্কে সচেতনতাই এই রতির বৈশিষ্ট্য। গুণ, চরিত এবং কীর্তি প্রভৃতির শ্রবণ থেকেই এর উদ্ভব এবং কখনও কখনও সুরতলালসাও এর যেমন—রুক্মিণী দেবীর রতি।

অন্যদিকে অনির্বাচ্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত যে রতিতে সম্ভোগেচ্ছা সর্বদা তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি করে, এবং যেখানে কেবল কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যই অশেষ বিশেষে বর্তমান থাকে, তাকেই বলা হয় সমর্থা। বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও সিতোপলের মত সমর্থা রতিই উত্তরোত্তর গাঢ়তা বা পরিপুষ্টিলাভ করে এবং প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব ইত্যাদিতে পর্যবসিত হয়।

প্রেমকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়—প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ। বিলম্বের জন্য, কখনও বা অনুপস্থিতির জন্য নায়ক বা নায়িকার চিত্তবৃত্তি না জানার জন্য অন্যজনের খেদোৎপাদক যে প্রেম তাকেই বলে প্রৌঢ় প্রেম। যে প্রেম অন্যান্য কান্তার উপলব্ধির জন্য সাদর অভিলাষ বহন করে, তাই-ই মধ্য প্রেম। সবসময়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে এবং সবসময়ের সান্নিধ্যে থাকার জন্য যাতে ত্যাগ বা আদর কিছুই থাকে না, তাকেই বলে মন্দ প্রেম।

প্রেম চরমসীমা প্রাপ্ত হয়ে হৃদয়কেও দ্রবীভূত করলে তাকে বলা হয় 'স্নেহ'। এই স্নেহের আবির্ভাব হলে দর্শন, শ্রবণ, স্মরণ ইত্যাদিতেও কখনও তৃপ্তি বোধ হয় না। স্নেহের দুটি প্রকার—ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ। ঘৃতস্নেহ চন্দ্রাবলীর, এবং মধুস্নেহ শ্রীরাধার। ঘৃতস্নেহের তুলনায় মধুস্নেহ উৎকৃষ্ট। কারণ ঘৃত যেমন শর্করা প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে মিলিত হয়ে আস্বাদ বাড়ায়, তেমনি ঘৃতস্নেহও গর্ব, অসূয়া প্রভৃতি ভাবের সঙ্গে স্বাদুতা লাভ করে। অন্যদিকে মধুস্নেহ নিজেই মাধুর্য বহন করে। প্রিয়ের প্রতি 'ইনি আমারই' এই ধরনের মদীয়তাতিশয়যুক্ত স্নেহকে মধুস্নেহ বলে। এটি অন্যভাবের অপেক্ষা না করেই স্বয়ং মাধুর্য প্রকট করে। এতে হাস্য, অদ্ভুত ইত্যাদি বিভিন্ন রসের সম্মেলন ঘটে।

শ্রীরূপ উজ্জ্বলনীলমণিতে মানের উদাহরণ দিয়েছেন এইভাবে—

স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা বাপ্ত্যা মাধুর্যং মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে।[৫৬]

যে স্নেহ উৎকর্ষ লাভ ক'রে প্রেমিক প্রেমিকাকে নতুন মাধুর্য অনুভব করিয়ে স্বয়ং বাইরে কৌটিল্য ধারণ করে, তাকেই মান বলা হয়। মানের দুটি ভেদ—উদাত্ত ও ললিত।

মানের সঙ্গে যদি গাঢ় বিশ্বাস যুক্ত থাকে, তবে তাকেই প্রণয় বলা হয়। প্রণয়ের দুটি ভাগ—মৈত্র ও সখ্য। গৌরবযুক্ত বিশ্রম্ভকে বলে মৈত্র, অন্যদিকে সম্ভ্রমবিহীন ও স্বাধীনতা প্রচুর বিশ্রম্ভকেই বলা হয় 'সখ্য'।

প্রণয়ের উৎকর্ষের জন্য যদি অতি দুঃখও অতি সুখরূপে অনুভূত হয়, তবে তাকে রাগ বলা হয়। রাগের দুটি ভাগ—নীলিমা ও রক্তিমা। নীলবৃক্ষ ও শ্যামালতা থেকে উৎপন্ন রাগকে 'নীলিমা' বলে। যে রাগের তিরোধান সম্ভাবনা নেই, যার বাহ্যে অতি প্রকাশ হয় না, তাকেই নীলীরাগ বলে। শ্যামারাগ নীলীরাগের তুলনায় কিছুটা অধিক প্রকাশশীল।

অন্যদিকে কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠা থেকে উৎপন্ন রাগকে বলা হয় রক্তিমা। যে রাগ চিত্তে শীঘ্রই সঞ্চারিত হয়—তাকে বলা হয় কুসুম্ভরাগ। যে রাগ কিছুতেই নষ্ট হয় না অর্থাৎ নীলীকুসুম্ভের মত ম্লান হয় না, সেই ধরনের রাগকেই বলে মঞ্জিষ্ঠ রাগ।

অনুরাগ—যে রাগ নিত্য নব নবায়মান হয়ে সর্বদা অনুভূত প্রিয়জনকেও অননুভূত-বৎ প্রতীয়মান করায়—প্রতিক্ষণেই নবীনতা দান করে—তাকেই অনুরাগ বলা হয়—

সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্যতে ॥[৫৭]

এই অনুরাগের লক্ষণ চারটি—পরস্পরবশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য, অপ্রাণীতেও জন্মলাভের উৎকট লালসা, এবং বিপ্রলম্ভেও বিস্ফূর্ত্তি।

অনুরাগ নিজের অনুভবাবস্থা প্রাপ্তির পর প্রকাশিত হয়ে যদি সিদ্ধ এবং সাধক ব্যক্তিদেরও ব্যাপ্ত করে, তবে তাকেই বলা হয় ভাব। শ্রীরূপ বলেছেন—

অনুরাগঃ স্বসংবেদ্য দশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥[৫৮]

এই ভাব অত্যন্ত দুর্লভ—

মুকুন্দ মহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতি দুর্লভঃ।
ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবখ্যয়োচ্যতে ॥[৫৯]

অর্থাৎ এই ভাব রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণমহিষীগণেরও অতিদুর্লভ, কেবলমাত্র শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজদেবীগণেরই অনুভবগম্য। একে মহাভাব বলা হয়। এই মহাভাব অপার্থিব অমৃতের স্বরূপসম্পত্তি বিশিষ্ট।

এই মহাভাবকে রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দুভাগে ভাগ করা যায়। স্তম্ভ প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিকভাব-বিকার যেখানে উদ্দীপ্ত হয় অর্থাৎ অতি কষ্টেও গোপন করা যায় না তাকে রূঢ় মহাভাব বলে।

যেখানে অনুভাবগুলি রূঢ় মহাভাবে ব্যক্ত অনুভাবগুলি থেকেও কোন অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়—তাকে অধিরূঢ় মহাভাব বলে। এই অধিরূঢ় আবার দু'ধরনের হয়—মোদন ও মাদন। যে অধিরূঢ় মহাভাবে নায়িকা ও নায়কের স্তম্ভ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব গুলির উদ্দীপ্তির আতিশয্য প্রকাশিত হয় তাকে মোদন বলে। এই মোদন মহাভাব কেবলমাত্র শ্রীরাধাযূথেই বিরাজ করে, সর্বত্র সুলভ নয়। এই মোদনই হ্লাদিনী শক্তির শোভন, শ্রেষ্ঠ অতএব প্রিয় বিলাসস্বরূপ।

আর— মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষ দশায়াং মোহনো ভবেৎ।
যস্মিন্ বিরহবৈবশ্যাৎসুদ্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ ॥[৬০]

মোদনই প্রবাসদ্বয়ের উদ্ভূত বিরহ দশায় মাদন বা মোহন নামে কথিত হয়। এই মোহন মহাভাবে বিরহবিবশতাহেতু সাত্ত্বিকভাবগুলি সুদ্দীপ্ত হয়ে থাকে। পদাবলীকার উদ্ধবদাস শ্রীরাধার মোদন ও মাদনভাব নিয়ে শ্রীরূপের অনুসরণে পদ রচনা করেছেন। মোদনের অনুভাব ছয়টি—(১) মূর্চ্ছাকারিতা। শ্রীরূপ এর উদাহরণ হিসেবে উমাপতি-ধরের 'রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিত জলধৌ' শ্লোকটির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এখানে রুক্মিণী কর্তৃক আলিঙ্গিত কৃষ্ণেরও মূর্চ্ছাকারিতা বর্ণিত হয়েছে। গোবিন্দদাস রাধার 'মোহন' ভাবের বর্ণনা দিয়ে পদরচনা করেছেন। যেমন—

কহিতে কহিতে ধনি মুরছিত ভেল।
ধাইয়ে সহচরি কোর পর লেল ॥[৬১]

২) অসহ্য দুঃখস্বীকারেও প্রিয়তমের সুখকামনা। রসবিলাস বল্লীতে আছে—

অসহ্য আপন দুঃখ করে অঙ্গীকার।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য তথাপি রাধার॥[৬২]

গোবিন্দদাসের এই বিষয় অবলম্বনে রচিত পদে রাধা কৃষ্ণকে বলেছেন—

তুহুঁ যদি লাখ গোপি সঙ্গে বিহরসি
পায়সি বহুত আনন্দ।
সো মুঝে কোটি কোটি সুখসম্পদ
তিল-আধ না ভাবিয়ে মন্দ[৬৩]

(৩) ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিতা—এই অবস্থায় সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিপর্যয়ে সৃষ্টি হলে তাই-ই হয় ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিতা। উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীরূপ এর উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—

নারং চুক্রোশ চক্রং ফণিকুলমভবদ্ব্যাকুলং স্বেদমূহে
বৃন্দং বৃন্দারকাণাং প্রচুরমুদমুচন্নশ্রু বৈকুণ্ঠভাজঃ
রাধায়াশ্চিত্রমীশ ভ্রমতি দিশি দিশি প্রেম নিঃশ্বাসধূমে
পূর্ণানন্দেঽপ্যুষিত্বা বহিরিদমবহিশ্চাতমাসীদজাণ্ডং॥[৬৪]

শ্রীরাধার প্রেমনিঃশ্বাসজাত ধূম দিগ্‌বিদিকে ভ্রমণ করতে করতে এই ব্রহ্মাণ্ড, বৈকুণ্ঠ ও তার মধ্যবর্তী চতুর্দশ ভুবনকেই ক্ষুব্ধ করেছে। এর ফলে নরকুল উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগল, সর্পেরা ব্যাকুল হল, দেবতারা ঘর্মাক্ত হলেন এবং বৈকুণ্ঠবাসী নারায়ণের পার্ষদগণও প্রচুরতর অশ্রুসম্পাত করলেন। ঘনশ্যামদাস এই বিষয় নিয়ে পদ করেছেন—

মাধব কি কহব দুঃখ এক তুণ্ড।
প্রেমনিশাস ধূম জছু পীড়িত
বহিরন্তর অজঅণ্ডে॥[৬৫]

(৪) পশুপক্ষীর রোদনকে শ্রীরূপ চতুর্থ অনুভাব বলেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি পদ্যাবলীর 'যাতে দ্বারবতীপুরং' শীর্ষক শ্লোকটি[৬৬] উদ্ধৃত করেছেন। এখানে দেখা যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা থেকে দ্বরকাপুরীতে চলে গেলে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পরিহিত পীতবস্ত্র উত্তরীয়রূপে ধারণ করে কালিন্দীকূলের নিকুঞ্জের বেতসলতাটিকে অবলম্বন করে উৎকণ্ঠা সহকারে অশ্রুধারার মহাপ্রপাত প্রবাহিত করে বৈস্বর্যযুক্ত উচ্চস্বরে যে সকরুণ বিলাপ করেছিলেন—তাতে মহাসমুদ্রের অগাধজলে সঞ্চরণশীল মৎস্য-মকরও উৎকণ্ঠিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করছিল।

এই অবস্থা বর্ণনা করে গোবিন্দদাস পদ রচনা করেছেন—

কুসুম তেজী অলি ভূতলে লুঠত
তরুগণ মলিন সমান।
সারি শুক পিক মউরি না নাচত
কোকিল না করতহি গান॥[৬৭]

(৫) মৃত্যুর পরও নিজের দেহের রূপ-রস প্রভৃতি পঞ্চভূতে মিলিয়ে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষাকে শ্রীরূপ মোদনের পঞ্চম অনুভাব বলেছেন। এর স্বরূপ

বোঝাতে গিয়ে শ্রীরূপ যান্মাসিকের শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। রাধা বিধাতার কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করছেন—"আমার এই দেহ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হোক, পঞ্চমহাভূতও নিজের নিজের বিভাগে প্রবেশ করুক। তবু আমি বিধাতাকে অবনত মস্তকে প্রণাম করে এই একটিমাত্র বরই প্রকটভাবে প্রার্থনা করছি যে শ্রীকৃষ্ণের অবগাহন-সরোবরে আমার দেহস্থিত জলাংশ, তাঁর দর্পণে জ্যোতিরংশ, তাঁর অঙ্গনের আকাশে আমার আকাশাংশ, তাঁর যাতায়াত পথে মৃত্তিকা এবং তাঁর তালব্যজনে আমার দেহের বায়ুঅংশ প্রবিষ্ট হোক।"[৬৮] গোবিন্দদাস এই বিষয় নিয়ে লিখেছেন—

যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥ ইত্যাদি[৬৯]

একজন অজ্ঞাতনামা পদকারের পদেও এই অবস্থার মর্মস্পর্শী রূপ ফুটে উঠেছে—

হৃদয় ফাটিয়া মোর নিকসে পরানি।
না পাইলু বন্ধুর দেখা রহিল পোড়নী॥
বারাণসী গিয়ে মুঞি সুতলি করিমু।
অরুণ দুলহ কর তবে সে পাইমু॥
হইয়া কুসুম মালা হৃদয়ে থাকিমু।
পীতধটি হৈয়া কটিতটে বেড়াইমু॥[৭০]

মাদন ভাব অনির্বচনীয় দশায় উত্তীর্ণ হলে তখন নানা রকম চিত্তবিভ্রম আসে। শ্রীরূপ একে দিব্যোন্মাদ বলেছেন। এই দশার বর্ণনা শ্রীরূপের নিজস্ব সৃষ্টি। দিব্যোন্মাদের উদ্ঘূর্ণা, চিত্রজল্প প্রভৃতি ভেদও তাঁরই দেখানো। চিত্রজল্প আবার দশপ্রকার—(১) প্রজল্প (২) পরিজল্পিত (৩) বিজল্প (৪) উজ্জল্প (৫) সংজল্প (৬) অবজল্প (৭) অভিজল্প (৮) আজল্প (৯) প্রতিজল্প (১০) সুজল্প।

প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে মনের প্রকৃতভাব গোপন করে গর্ব, অসূয়া, দৈন্য, চপলতা, ঔৎসুক্য প্রভৃতি প্রকাশ করে অবশেষে তীব্র উৎকন্ঠা বিশিষ্ট আলাপকেই চিত্রজল্প বলে। ভাগবতের দশম স্কন্ধে ভ্রমরগীতে এই দশ ধরনের চিত্রজল্প বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

অসূয়া, ঈর্ষা ও মদযুক্ত অবজ্ঞার ভঙ্গিবিশেষে যে প্রিয়তমের অকৌশলোদ্গার তাকে প্রজল্প বলে। জ্ঞানদাস এইভাব অনুসরণ করে পদ লিখেছেন—

অলি হে না পরশ চরণ হামারি
কানু-অনুরূপ বরণ গুণ বৈছণ
ঐছন সবহুঁ তোহারি॥[৭১]

ঘনশ্যামদাসেরও এই বিষয়ক পদ আছে।[৭২]

পরিজল্প—শ্রীকৃষ্ণে নির্দয়তা, শাঠ্য, চাপল্য প্রভৃতি সমর্পণ করে পরোক্ষভাবে নিজের নৈপুণ্যব্যঞ্জনাকেই 'পরিজল্প' বলে।

বিজল্প—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আচ্ছন্ন মানভঙ্গিবিশিষ্ট ও সুস্পষ্ট অসূয়াযুক্ত কটাক্ষোক্তিকে শ্রীরূপ বিজল্প বলেছেন—

ব্যক্তয়াসূয়য়া গূঢ়মানমুদ্রান্তরালয়া।
অঘদ্বিষি কটাক্ষোক্তির্বিজল্পো বিদুষাংমতঃ॥[৭৩]

উজ্জল্প—

হরেঃ কুহকতা খ্যানং গর্বগর্ভিত যের্ষ্যযা।
সাসূয়শ্চ তদাক্ষেপে ধীরৈরুজ্জল্প ঈর্যতে ॥[৭৪]

যাতে গর্বযুক্ত ঈর্ষাদ্বারা শ্রীহরির কপটতার কথা বলা হয় এবং ক্রোধসহ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপও থাকে, তাকেই উজ্জল্প বলে। এই উজ্জল্প বিষয়ে ভাগবতের দৃষ্টান্ত নিয়ে ঘনশ্যামদাস পদ রচনা করছেন—

মধুকর বুঝল তোহারি চতুরাই।
ঐছন বচন কহবি তুহুঁ তা সঞে
যো তুয়া বচনে পাতাই ॥
যাকর কুটিল ভাঙযুগ ভঙ্গিম
কপট মনোহর হাসে।
কো জানি ঐছে রমণী তিনভুবনে
দুর্লভ তাকর পাশে ॥[৭৫]

সংজল্প— সোল্লুণ্ঠয়া গহনয়া কয়াপ্যাক্ষেপমুদ্রয়া।
তস্যা কৃতজ্ঞতাদ্যুক্তিঃ সংজল্পঃ কথিতো বুধৈঃ ॥[৭৬]

উপহাসপূর্ণ, গূঢ় আক্ষেপভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতা, কাঠিন ও শাঠ্য প্রভৃতির উক্তিকে 'সংজল্প' বলে।

সংজল্পের পর অবজল্প—

হরৌ কাঠিন্যকামিত্ব ধৌর্ত্যাদাসক্ত্যযোগ্যতা।
যত্র সের্ষ্যংভিয়েবোক্তা সোঽবজল্পঃ সতাং মতঃ ॥[৭৭]

শ্রীকৃষ্ণের কাঠিন্য, কামিত্ব ও ধৌর্ত্যাদিবশতঃ স্বীয় আসক্তির অযোগ্যতাকে যখন ঈর্ষাযুক্ত ভয়ের সঙ্গে যেন বলা হয়, তখন তাকে 'অবজল্প' বলে। এর উদাহরণও শ্রীরূপ ভ্রমর গীতা থেকে গ্রহণ করেছেন। এর অনুবাদও হয়েছে। কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবের প্রকাশ বলে পরবর্তীকালের পদাবলীকাররা এটিকে গ্রহণ করেন নি।

এরপর চিত্রজল্পের সপ্তম প্রকার হল অভিজল্পিত। শ্রীকৃষ্ণ যখন পাখিদেরও দুঃখের কারণ হন, তখন তাকে ত্যাগ করা উচিত—একথা অনুতাপসহকারে বর্ণিত হলে তাকে অভিজল্প বলে। কিন্তু এটিও পদাবলীকারদের প্রভাবিত করে নি।

এরপর আজল্প—নির্বেদবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের কুটিলতা ও পীড়াদায়কত্ব এবং অন্যের সুখপ্রদত্ব প্রভৃতি বর্ণনা করা হলে তাকে 'আজল্প' বলা হয়। এখানেও শ্রীরূপ ভ্রমরগীতার উদাহরণ গ্রহণ করেছেন এবং ঘনশ্যামদাস এটি নিয়ে পদরচনা করেছেন।

পরবর্তী পর্যায় প্রতিজল্প—দুঃখেও যিনি মিথুনভাব পরিত্যাগ করতে পারেন না—সেই কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য যাওয়া উচিত নয়—এই বাক্যটি দূরের সম্মান দিয়ে যেখানে উক্ত হয়, তাকেই প্রতিজল্প বলে। পরবর্তীকালের সাহিত্যে এর প্রভাব নেই। চিত্রজল্পের শেষ বিভাগের নাম 'সুজল্প'—

যত্রাজ্যরাৎসগাম্ভীর্যং সদৈন্যংসহচাপলম্।
সোৎকণ্ঠংচ হরিঃ প্রেষ্ঠঃ স সুজল্পো নিগদ্যতে ॥[৭৮]

যেখানে সরলতাহেতু গাম্ভীর্য, দৈন্য, চাপল্য এবং উৎকণ্ঠা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে প্রশ্ন হয়, তাকে সুজল্প বলে। এই বিষয় নিয়ে ঘনশ্যামদাস পদরচনা করেছেন—

ছোড়ি নিয়ত পুন আয়লি কাহে।
পুন কি এ কানু পাঠায়ল তোহে ॥
শুন মধুকর চপলক মিত।
কিয়ে অভিলাস কহবি তুয়া চিত ॥[৭৯]

মোদনের পর স্থায়িভাবপ্রকরণের আলোচ্য বিষয় মাদন। মাদনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শ্রীরূপ বলেছেন—

সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোহয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃসদা ॥[৮০]

অধিরূঢ় মোদন পর্যন্ত সমস্ত ধরনের ভাবের চেয়েও অধিক উৎকর্ষ বিশিষ্ট, হ্লাদিনী নামক মহাশক্তি অর্থাৎ কেবল শ্রীরাধাতেই যা সব সময় বিরাজ করে, তাকেই মাদন বলে। এই মাদনের দুটি বৈশিষ্ট্য। প্রথমতঃ ঈর্ষার অযোগ্যের উপরেও ঈর্ষা। দ্বিতীয়ত, সবসময় ভোগকরা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের গন্ধবহনকারী পাত্রকেও প্রশংসা করা। এই দুটি বৈশিষ্ট্যে শ্রীরাধার প্রেমেরই চরমোৎকর্ষ বহন করে। শ্রীরূপ শ্রীমদ্ভাগবত থেকে এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।[৮১] ঘনশ্যামদাস এই ভাব নিয়ে রসোত্তীর্ণ পদরচনা করেছেন—

দয়িতাকুচকুঙ্কুম যো রঞ্জিত।
দয়িত চরণতল সো ভেল দণ্ডিত ॥
সো পুন বিপিন ভ্রমণ যব কেল ॥
পদকুঙ্কুম তৃণমাণ্ডত ভেল ॥
ধনি ধনি সব রমনিগণ ভাগ।
যাকর ঐছে উদয় অনুরাগ ॥
তৃণকুঙ্কুম ধরি কুচযুগ মাহ।
মদন কদন দুখ করু নিরবাহ ॥[৮২]

শ্রীরূপ এই পর্যায় সৃষ্টি করে রাধাপ্রেমকেই চরমোৎকর্ষ দান করেছেন।

শৃঙ্গার ভেদ-প্রকরণ—

স্থায়িভাব বর্ণনা করার পর শ্রীরূপ বলেছেন যে এই স্থায়িভাব ক্রমশঃ প্রগাঢ় হয়ে শৃঙ্গার, মধুর বা উজ্জ্বল রসে পরিণত হয়। এই শৃঙ্গার রসের প্রসঙ্গ ভরতের নাট্যশাস্ত্রে, বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণে এবং পূর্ববর্তী আরও অনেক আলঙ্কারিকের রচনাতেই আছে। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের ক্ষেত্রে এটিকে প্রয়োগ করে শ্রীরূপ এই রসকে ভক্তিরসের অন্যতম উজ্জ্বল বা মধুর রসে পরিণত করেছেন। এটি শ্রীরূপের মৌলিক প্রতিভার পরিচায়ক। অবশ্য উজ্জ্বল নামটি শ্রীরূপ ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে শৃঙ্গার প্রসঙ্গ থেকেই গ্রহণ করেছেন।

ভরত নাট্যশাস্ত্রের শৃঙ্গারকে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ এই দুভাগে ভাগ করেছেন। ধনঞ্জয় অবশ্য তাঁর দশরূপকে শৃঙ্গারের তিন ধরনের ভেদ দেখিয়েছেন—অযোগ, বিপ্রযোগ

এবং সম্ভোগ। কিন্তু অযোগ ও বিপ্রযোগ দুটিরই বৈশিষ্ট্য ভরতের বিপ্রলম্ভের মধ্যে বর্তমান, ধন্যালোকেও শৃঙ্গারকে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ—এই দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। শ্রীরূপও এঁদেরই অনুসরণ করেছেন।

বিপ্রলম্ভের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শ্রীরূপ বলেছেন—

যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনব্যাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ॥[৮৩]

নায়িকা ও নায়কের সংযুক্ত বা বিযুক্ত অবস্থায় পরস্পরের অভীষ্ট আলিঙ্গন ইত্যাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত হয়, তাকেই বিপ্রলম্ভ বলা হয়। এটি সম্ভোগেরই উন্নতিকারক।

বিপ্রলম্ভকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। এক্ষেত্রেও শ্রীরূপ পূর্ববর্তী আলঙ্কারিকদের কাছে ঋণী। রুদ্রট বিপ্রলম্ভকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন—প্রথমানুরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ। মম্মট বিপ্রলম্ভকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এঁদের সবারই সঙ্গে শ্রীরূপের অল্পবিস্তর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে। সিঙ্গভূপাল পূর্বরাগ সম্পর্কে বলেছেন—

যৎ প্রেম সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন শ্রবণোদ্ভবম্।
পূর্বানুরাগঃ স জ্ঞেয়ঃ শ্রবণং তদ্‌গুণ শ্রুতিঃ॥[৮৪]

শ্রীরূপ তাঁর উজ্জ্বলনীলমণিতেও প্রায় একইভাবে পূর্বরাগ লক্ষণ দেখিয়েছেন—

রতির্যাসঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন শ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে॥[৮৫]

নায়ক নায়িকার মিলনের আগে দর্শন ও শ্রবণ থেকে যে রতির আবির্ভাব হয়, তাকে পূর্বরাগ বলে। দর্শন হয় নানাভাবে, যেমন—সাক্ষাৎ দর্শন, স্বপ্নদর্শন, ও চিত্রে দর্শন। এইগুলিকে অবলম্বন করে বহু পদ রচিত হয়েছে।

শ্রবণ হয় দূতীমুখে, সখীমুখে ও সঙ্গীতে। পূর্বরাগের সঞ্চারীভাব হয় দশটি। এর বর্ণনায় শ্রীরূপ লিখেছেন—

অত্র সঞ্চারিণো ব্যাধিঃ শঙ্কাসূয়া শ্রমঃ ক্লমঃ।
নির্বেদোৎসুক্য দৈন্যানি চিন্তা নিদ্রা প্রবোধনং॥
বিষাদো জড়তোন্মাদো মোহমৃত্যাদয়ঃ স্মৃতাঃ।[৮৬]

ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম, নির্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধ, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু - এই দশটি সঞ্চারীভাব।

আবার অন্যদিক দিয়ে শ্রীরূপ পূর্বরাগকে তিনভাগে ভাগ করেছেন—প্রৌঢ়, সমঞ্জস ও সাধারণ। সঙ্গমের আগে সমর্থারতিতে জাত পূর্বরাগই 'প্রৌঢ়' বলে কথিত হয়। প্রৌঢ় পূর্বরাগকেও শ্রীরূপ দশটি দশায় বিভক্ত করেছেন—লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। বিদ্যানাথ তাঁর 'প্রতাপরুদ্র যশোভূষণ' নামক অলঙ্কার গ্রন্থে পূর্বরাগের বারোটি দশার কথা বলেছেন। এগুলি হল চক্ষুপ্রীতি, মানস-আসক্তি, সংকল্প, প্রলাপ, জাগরণ, কৃশতা, আরতি,

লজ্জাত্যাগ, সংজ্বর, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মরণ। শারদাতনয়ের ভাবপ্রকাশেও বারোটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। কক্কোক-এর রতিরহস্যে দশ দশা বর্ণিত হয়েছে— নয়নপ্রীতি, চিত্তাসঙ্গ, সংকল্প, নিদ্রাহীনতা, কৃশতা, বিষয়নিবৃত্তি, ত্রপানাশ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু। দশরূপকেও দশ দশার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শ্রীরূপের দশ দশা বর্ণনায় এঁদের তুলনায় পার্থক্যও আছে। এছাড়া পূর্ববর্তী অলংকার শাস্ত্রবিদরা এগুলিকে লৌকিক নায়ক নায়িকার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। অন্যদিকে শ্রীরূপ প্রয়োগ করেছেন কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার ক্ষেত্রে। এর প্রভাব পদাবলী সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে, পড়েছে। লালসার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শ্রীরূপ বলেছেন—

অভীষ্টলিপ্সয়া গাঢ়গৃধ্নুতা লালসো মতঃ।
অত্রৌৎসুক্যং চপলতা ঘূর্ণা শ্বাসাদয়স্তথা ॥[৮৭]

অভীষ্টজনকে লাভ করার জন্য প্রগাঢ় তৃষ্ণাশীলতাকে লালসা বলে। লালসাতে ঔৎসুক্য, চপলতা, ঘূর্ণা, নিশ্বাস প্রভৃতি থাকে। যেমন, বিদ্যাপতির পদে—

অবনত আনন কএ হম রহলিহু
বারল লোচন-চোর।
পিয়া মুখরুচি পিবএ ধাওল
জনি সে চাঁদ চকোর ॥[৮৮]

এই পদটিতে কৃষ্ণকে দেখার জন্য রাধার ঔৎসুক্য প্রকাশিত। দ্বিতীয় দশা হল উদ্বেগ—

উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিঃশ্বাসচাপলে।
স্তম্ভশ্চিন্তাশ্রু বৈবর্ণ্য স্বেদাদয়উদীরিতাঃ ॥[৮৯]

উদ্বেগ হ'ল মনের চাঞ্চল্য। এর অনুভাব হ'ল দীর্ঘশ্বাস, চিন্তা, অশ্রু, বিবর্ণতা স্বেদ প্রভৃতি। উদাহরণ হিসেবে চণ্ডিদাসের পদ উল্লেখ করা যায়—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায় ॥[৯০]

প্রৌঢ় পূর্বরাগের তৃতীয় দশার নাম জাগর্যা। জাগর্যা হল নিদ্রার অভাব। এতে স্তম্ভ, শোষ ও ব্যাধি আনয়ন করে।

চতুর্থ দশা তানব অর্থাৎ গাত্রকৃশতায় দৌর্বল্য ও ভ্রমণ প্রভৃতি লক্ষণ এতে প্রকাশ পায়। যেমন, বিদ্যাপতির পদে—

মাধব, সুন সুন বচন হামারি
তুয়া গুন সুন্দরি অতি ভেল দুবরি
গুনি গুনি প্রেম তোহারি ॥
ধরনী ধরিয়া ধনি কত বেরি বৈঠই
পুন তহি উঠই না পারা
কাতর দিঠি করি চৌদিস হেরি হেরি
নয়নে গলয়ে জলধারা ॥[৯১]

পঞ্চম দশা জড়িমার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শ্রীরূপ বলেছেন—

ইষ্টানিষ্টা পরিজ্ঞানং যত্র প্রশ্নেষ্বনুত্তরম্ ।
দর্শন শ্রবণাভাবো জড়িমা সোঽভিধীয়তে ॥
অত্রাকাণ্ডেঽপি হুঙ্কার স্তম্ভ শ্বাসভ্রমাদয়ঃ ॥[৯২]

যে অবস্থায় হিত ও অহিত বিষয়ের সম্যক জ্ঞান থাকে না, যে অবস্থায় সখিগণ প্রশ্ন করলেও উত্তর মেলে না এবং দৃষ্ট বস্তু অদৃষ্টবৎ, শ্রুতকথাও অশ্রুতবৎ প্রতীয়মান হয়, তাকে জড়িমা বলে। এতে অকস্মাৎ হুঙ্কার, স্তম্ভ, দীর্ঘশ্বাস ও ভ্রম ইত্যাদি প্রকটিত হয়। ঘনশ্যামদাস রাধার এই অবস্থা অবলম্বনে পদ রচনা করেছেন।

ষষ্ঠ দশার নাম বৈয়গ্র্য—

বৈয়গ্র্যং ভাবগাম্ভীর্যবিক্ষোভাসহতোচ্যতে।
অত্রাবিবেকনির্বেদখেদাসূয়াদয়ো মতাঃ ॥[৯৩]

ভাবগাম্ভীর্যের জন্য বিক্ষোভের অসহিষ্ণুতাকে বৈয়গ্র্য বলে। এতে অবিচার, নির্বেদ, খেদ, অসূয়া প্রভৃতি ভাব প্রকটিত হয়।

পরবর্তী দশা হ'ল ব্যাধি। যে অবস্থায় অভীষ্ট বস্তুর অলাভে শরীরের শ্বেততা ও মহাতাপরূপ চিহ্ন প্রকট হয়, তাকে ব্যাধি বলে। এতে শীত, স্পৃহা, মোহ, দীর্ঘনিঃশ্বাস ও পতন প্রভৃতি অনুভাব প্রকাশ পায়। যেমন, জ্ঞানদাসের পদে—

সোনার বরণ দেহ।
পান্ডুর ভৈ গেল সেহ ॥
গলয়ে সঘনে লোর।
মুরছে সখিক কোর ॥[৯৪]

এর পর উন্মাদ অবস্থা— সর্বাবস্থাসু সর্বত্র তন্মস্কতয়া সদা।
অতস্মিংস্তাদিতিভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কীর্তিতঃ ॥[৯৫]

সকল অবস্থায়, সর্বত্র ও সব সময় তদ্গতচিত্ততা হেতু যে বস্তু যা নয়, তাতে সেইরূপ প্রতীতি হলে সেই ভ্রান্তিকে উন্মাদ বলে। এই দশা নিয়ে বহু পদকারই পদরচনা করেছেন। নরহরি চক্রবর্তীর একটি পদের উল্লেখ করা যায়—

মাধব! ধনী উনমাদিনী ভেলী।
যব ধরি স্বপনে দরশ তুহু দেলি ॥
তোহারি নামগুণ সঘনে আলাপি।
চহুদিশ চাহি চৌকি ঘন কাঁপি ॥[৯৬]

উন্মাদের পরবর্তী দশা মোহ। এই অবস্থায় চেতনা রহিত হয়। এতে নিশ্চলতা ও পতন প্রভৃতি ঘটে থাকে। এই অবস্থা নিয়েও বহু পদকর্তা পদ রচনা করেছেন।

প্রৌঢ় পূর্বরাগের দশমী দশা হল মৃত্যু। শ্রীরূপ এর সংজ্ঞা দিয়েছেন—

তৈস্তৈঃ কৃতৈঃ প্রতীকারৈর্যদি ন স্যাৎ সমাগমঃ।
কন্দর্পবাণ কদনাত্তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ ॥
তত্র স্বপ্রিয়বস্তুণাং বয়স্যাসু সমর্পণং।
ভৃঙ্গ মন্দানিলজ্যোৎস্না—কদম্বানুভবাদয়ঃ ॥[৯৭]

কামলেখ প্রেরণ, সখীদ্বারা নিজের অবস্থা বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রতিবার সমূহের অবলম্বনেও যদি কান্তের সমাগম না হয়, তাহলে কামবাণের পীড়ন হেতু নিদারুণ অবস্থায় মরণের উদ্যম হয়ে থাকে। এই মৃতিতে বয়স্যাগণের নিকট নিজের প্রিয়বস্তুর সমর্পণ এবং ভৃঙ্গ, মন্দপবন, জ্যোৎস্না, কদম্ব, জলধর, বিদ্যুৎ, ময়ূর, কোকিলরব প্রভৃতি বহু উদ্দীপন বিভাব প্রকটিত হয়। ঘনশ্যামদাস এই অবস্থার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—

কত পরকারে যতন কত করতহি
যাকর পিরিতক আশে।
সো যব বিমুখ অবহু নাহি মিলব
পহিলহি করল নিরাশে॥

* * * * *

হীরকহার সোঁপি ললিতা করে
মৃদু মৃদু চলতহি রাই।
অলিকুল মিলিত কদম্বক কানন
তহি পরবেশ নিজাই॥[৯৮]

প্রৌঢ় পূর্বরাগের দশটি দশা বর্ণনা করার পর শ্রীরূপ সমঞ্জস ও সাধারণ পূর্বরাগের বিভিন্ন দশা বর্ণনা করেছেন। সমঞ্জসা রতিতে সঙ্গমের পূর্বে জাত পূর্বরাগ। ওই পূর্বরাগেও অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও স্মৃতি— ওই দশ দশা ক্রমশঃ প্রকট হতে পারে। সাধারণ পূর্বরাগে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ ও বিলাপ—এই ছয়টি দশা অতি কোমলভাবে উত্থিত হয়।

পূর্বরাগের পর বিপ্রলম্ভের দ্বিতীয় বিভাগ হল মান। মানের বিভিন্ন শ্রেণী নির্ধারণ, হেতুবৈচিত্র্য ইত্যাদি বর্ণনায় শ্রীরূপ যথেষ্ট মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীরূপের আগে কেবলমাত্র দশরূপকরচয়িতা ধনঞ্জয় মানের শ্রেণী নির্দেশ করেছেন। তিনি মানের প্রণয় ও ঈর্ষ্যা— এই দুটি বিভাগ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শ্রীরূপ এটি মেনে নিতে পারেন নি। তিনি মানকে সহেতু ও নির্হেতু—এই দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। মানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শ্রীরূপ বলেছেন—

দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ
স্বাভীষ্টাশ্লেষ বীক্ষাদিনিরোধো মান উচ্যতে॥
সঞ্চারিণোঽত্র নির্বেদ শঙ্কামর্ষাঃ সচাপলাঃ
গর্বাসূয়াবহিত্থাশ্চ গ্লানিশ্চিন্তাদয়োঽপ্যামী॥
অস্য প্রণয় এব স্যান্মানস্য পদমুত্তমম্।
সোঽয়ং সহেতুর্নির্হেতুভেদেন দ্বিবিধো মতঃ॥[৯৯]

একস্থানে থাকলেও, অনুরক্ত হলেও নায়ক নায়িকার নিজেদের অভিপ্রেত আলিঙ্গন, দর্শন, চুম্বন, প্রিয়ভাষণ প্রভৃতির প্রতিবন্ধক ভাবকে 'মান' বলে। এই মানের ঐকান্তিক আশ্রয়

প্রণয়। এতে সঞ্চারিভাব হ'ল নির্বেদ, শঙ্কা, অমর্ষ, চাপল, গর্ব, অসূয়া অবহিত্থা, গ্লানি এবং চিন্তা।

সহেতু মান হল নায়ক কর্তৃক বিপক্ষ বা তটস্থ নায়িকার প্রতি কৃত উৎকর্ষ দেখে বা শুনে ঈর্ষ্যা। শ্রীরূপ সহেতু মানের তিন প্রকার কারণ দেখিয়েছেন—শ্রুত, অনুমিত ও দৃষ্ট।

শ্রুত অর্থাৎ প্রিয়সখী ও শুক পক্ষী প্রভৃতির মুখ থেকে শ্রবণ। যেমন উদ্ধব দাসের পদে—

তরুপর রৈয়া শুক ফুকারিয়া
কহয়ে আপন স্বরে।
কানুরে লইয়া চলিল ধাইয়া
পদ্মা সহচরী ঘরে॥
শুকের বচন শুনি বিনোদিনী
অরুণ যুগল আঁখি।
অবনত মুখে মুকুলিত স্বরে
কহে গদগদ ভাখি॥[১০০]

অনুমিতি আবার তিনভাগে বিভক্ত—ভোগাঙ্ক, গোত্রস্খলন ও স্বপ্নে উপলক্ষিত অনুমান। বিপক্ষ বা প্রিয়জনের গাত্রে রতির যে চিহ্ন দেখা যায়, তাকে ভোগাঙ্ক বলে। শ্রীরূপের অনুসরণে এই ভোগাঙ্কের বিষয় নিয়ে বহু পদকর্তা পদ রচনা করেছেন। শ্রীরূপের আগেও জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডিদাসের পদে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

অনুমিতির দ্বিতীয় বিভাগ হল—গোত্রস্খলন। প্রতিপক্ষ নায়িকার নামে আহ্বান কিংবা নামোচ্চারণমাত্রই সকল নায়িকার ঈর্ষাতিরেকের একমাত্র হেতু, কারণ গোত্রস্খলন নায়িকাদের মৃত্যুর চেয়েও বেশী দুঃখপ্রদ।

অনুমিতির তৃতীয় প্রকার হল স্বপ্নদর্শন।

নির্হেতু মানে নায়ক ও নায়িকার মধ্যে কারণের অভাবেও অভিমানের উদ্রেক হয়। এর কারন—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব কুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যুনোর্মান উদঞ্চতি॥[১০১]

প্রেমের গতি সর্পের গতির মতই স্বভাব কুটিল, তাই কারণে অকারণে যুবক যুবতীর মধ্যে মানের উদয় হয়। নির্হেতু মানে অবহিত্থা, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব হয়। নির্হেতু মানে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের নির্হেতু মান বর্ণনা করেছেন। কারণ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণে এতই তদ্গত যে তাঁর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সহেতু মান সম্ভব নয়।

অন্যদিকে শ্রীরূপ তাঁর উদ্ধবসন্দেশ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে শ্রীরাধার নির্হেতু মানের উদাহরণ দিয়েছেন। শ্লোকটিতে সখী রাধাকে বলছেন, রাধা বৃথাই মান করেছেন, শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠাঙ্গনে অবস্থান করার সময় উৎকণ্ঠাবশতঃ বারবার চত্বর সন্নিহিত ভুখণ্ডের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন—আর রাধা কেন গবাক্ষপথে চোখ রেখে নিজের মনকে ক্ষুব্ধ করছেন। গোবিন্দদাস এই বিষয়বস্তু অবলম্বন করে পদ রচনা করেছেন—

তুয়া লাগি যো হরি করত ধেয়ান।
সো সুখে তুহুঁ ধনি ভেলি অগেয়ান ॥
ধরণি বিলম্বিত বিরস বয়ান।
কাহে বাঢ়াহ অকারন মান ॥[১০২]

এরপর শ্রীরূপ রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ের কারণাভাসাঙ্গ মান বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে শ্রীরূপের পরবর্তীকালে বহু পদ রচিত হয়েছে। গোবিন্দদাসও এ বিষয়ে পদ রচনা করেছেন—

রসবতি রাধা রসময় কান।
কো জানে কাহে কয়ল দুহুঁ মান ॥
দুহুঁ অতি রোখে বিমুখ ভই বৈঠ।
দুহুঁ চললী যমুনাজলে পৈঠ ॥[১০৩]

শেখরের 'বড় অপরূপ পেখলু হাম'[১০৪] শীর্ষক পদেও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয়েরই নির্হেতু মান প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে।

নির্হেতু মান স্বয়ং শান্ত হয়, নায়কের গমন পূর্বক আলিঙ্গন ও চুম্বনাদি দান এবং নায়িকার মৃদুহাস্য ও অশ্রুপাত পর্যন্তই এই মানের স্থায়িত্ব।

সহেতু মানের উপশম প্রকারও উজ্জ্বলনীলমণিতে বর্ণিত হয়েছে। সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি, উপেক্ষা এবং রসান্তর ইত্যাদি যথাযোগ্যভাবে অনুষ্ঠিত হলে সহেতু মানও শান্ত হয়। বাষ্পমোক্ষণ, হাস্যাদি এবং সখীদের প্রতি সাদর নিরীক্ষণও মান উপশমের চিহ্ন হিসেবে পরিগণিত হয়।

সহেতু মান উপশমের প্রথম উপায় হল সাম। প্রিয়বাক্য রচনাকেই বলা হয় সাম। শ্রীরূপ এর উদাহরণ হিসেবে যে শ্লোকটি রচনা করেছেন, পদকর্তা ঘনশ্যামদাসও সেই পদটি অনুসরণ করেই পদরচনা করেছেন। সহেতু মানভঙ্গের দ্বিতীয় উপায় হল ভেদ। ভেদ আবার দুধরণের হয়—ভঙ্গিক্রমে স্বয়ং স্বমহাত্ম্য প্রকাশ এবং সখিগণ কর্তৃক উপালম্ভ প্রয়োগ। শ্রীরূপ এর উদাহরণ হিসেবে যে শ্লোকটি ব্যবহার করেছেন—ঘনশ্যামদাস তাকেই অবলম্বন করে পদ লিখেছেন—

যো করু নাশ শঙ্খচূড় জীবন।
যো জন ত্রিভুবনজন ভয় মোচন ॥
সুন্দরি অতয়ে জানবি নিজ দোখ।
অবিচারে তা সোঁ করলি যব রোখ ॥[১০৫]

সহেতু মান দূরীকরণের তৃতীয় উপায় 'দান'। কোনও ছলে ভূষণ প্রভৃতি প্রদান করা হলে তাকেই 'দান' বলে। এরপর 'নতি'। কেবল দৈন্য অবলম্বন পূর্বক চরণে পতিত হলে তাকে বলা হয় 'নতি'! অবশ্য নতির সাহায্যে মানভঞ্জনের দৃষ্টান্ত শ্রীরূপের মৌলিক আবিষ্কার নয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দেও এই চিত্র আছে। এর পরবর্তী মান উপশমের উপায় হল 'উপেক্ষা'। সাম প্রভৃতি উপায় ব্যর্থ হলে যে অবজ্ঞা হয়, তাকে 'উপেক্ষা' বলে। মান উপশমের সর্বশেষ উপায় হল 'রসান্তর'। এই রসান্তরকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়—যাদৃচ্ছিক ও বুদ্ধিপূর্ব। প্রযত্নব্যাতিরেকে

যা অকস্মাৎ উপস্থিত হয়, তাই-ই যাদৃচ্ছিক। যেমন—শ্রীরূপ বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ গুরুতর উপায় দ্বারা ভদ্রার মানভঞ্জন করতে থাকলে এই মান কোনক্রমে ভঙ্গ হল না, কিন্তু হঠাৎ মেঘের গর্জন হওয়াতে তিনি ভীত হয়ে সম্মুখে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ নিজের বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করলেন। রসান্তরের আর একটি ভাগ হ'ল বুদ্ধিপূর্বক। প্রত্যুৎপন্নমতি কান্ত মানোপশমের জন্য যা করেন—তাই-ই বুদ্ধিপূর্বক। যেমন—মানিনী রাধার মানভঞ্জনের জন্য কৃষ্ণ হাতে সর্পদংশনের মিথ্যাভাণ করলেন এবং এর ফলে রাধা ব্যাকুলা হলে তাঁর মানোপশম হল।

এই সমস্ত উপায় ছাড়াও দেশ, কাল বা মুরলীর শব্দেও ব্রজ সুন্দরীদের নির্হেতু মানের উপশম হয়।

শৃঙ্গারভেদ প্রকরণে বিপ্রলম্ভের তৃতীয় বিভাগ হল প্রেমবৈচিত্ত্য। শ্রীরূপ প্রেম-বৈচিত্ত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষ ধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥[১০৬]

প্রেমোৎকর্ষ হেতু প্রিয়তমের নিকটে অবস্থান করেও বিরহভয়জাত যে আর্তি, তাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। মিলনের পরিপূর্ণতার মধ্যেও এই বিরহ অনুভব সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক এবং কাব্যিক প্রবৃত্তি। আধ্যাত্মিক দিক থেকে বলা যায় যে কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান এবং রাধা তাঁর অংশ শক্তি। তাই উভয়ের মিলিত হওয়ার আকূতি সর্বদাই প্রবল। এই পর্যায় নিয়ে বহু পদকারই পদরচনা করেছেন। গোবিন্দদাসের পদে—

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর ॥
জানলুঁ রে সখি প্রেম অগেয়ান।
নাগর কোরে নাগরি নাহি জান ॥[১০৭]

বিপ্রলম্ভ ভাবের অন্তিম পর্যায় হ'ল প্রবাস। প্রবাস সম্পর্কে শ্রীরূপ বলেছেন—

পূর্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎপ্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতির্যতে ॥[১০৮]

পূর্বে মিলিত যুবকযুবতীর দেশান্তরে গমনবশতঃ ব্যবধানকে 'প্রবাস' বলে। প্রবাস দুই প্রকারের—বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বক। "দূরে কার্যানুরোধেন গমঃ স্যাদ্বুদ্ধি পূর্বকঃ"[১০৯]—কার্যানুরোধে দূরে গমনকে বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস বলে। এই প্রবাসও দুরকমের—কিঞ্চিদ্দূরে ও সুদূরে গমন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ গোচারণে গেলে তা হয় কিঞ্চিদ্দূরে প্রবাস। অন্যদিকে সুদূর প্রবাসকে আবার তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—ভাবী, ভবন্ ও ভূত।

ভাবী বিরহ হ'ল অদূর ভবিষ্যতে যে বিরহ ঘটবে। ভবন্ বিরহ হচ্ছে যা ঘটতে চলেছে এবং ভূত বিরহ হল যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়ে গেছে। বলরাম ও কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য অক্রূর ব্রজে এলে ব্রজবাসিগণের প্রতি ঘোষিত প্রাতঃকালে মথুরা গমনের বাণী শুনে এবং অশুভসূচক বামচক্ষুর স্পন্দন অনুভব করে ব্রজগোপিনীরা ভাবী বিরহের আভাস পেয়েছে।

ভবন্ প্রবাসে কৃষ্ণের যাত্রাকালীন অবস্থা বর্ণিত এবং ভূত প্রবাসে কৃষ্ণের মথুরাগমনের পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত। এই বিরহ পর্যায়গুলি নিয়ে বহু পদাবলীকারই পদরচনা করেছেন।

অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাসের সংজ্ঞা শ্রীরূপ এইভাবে দিয়েছেন—

পারতন্ত্র্যাদ্ভবো যস্তু প্রোক্তঃ সোঽবুদ্ধি পূর্বকঃ।
দিব্যা দিব্যাদিজনিতং পারতন্ত্র্যমনেকধা ॥[১১০]

পরতন্ত্র বা পরাধীনতা থেকে যার উদ্ভব, তাকে অবুদ্ধিপূর্বক বলে। শ্রীরূপ এই প্রবাসের উদাহরণ হিসেবে শংখচূড় কর্তৃক শ্রীরাধাহরণকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পদাবলীকাররা এর দ্বারা প্রভাবিত হন নি। কারণ শ্রীরাধাকে সামান্য এক অসুর হরণ করবে—এটি তাঁদের মনঃপূত হয় নি।

এই প্রবাস বিপ্রলম্ভেরও দশটি দশা—

চিন্তাত্রজাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহোমৃত্যুর্দশা দশ ॥[১১১]

চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু।

চিন্তার উদাহরণ হিসেবে শ্রীরূপ কৃষ্ণের মথুরাগমনের পর রাধার বিরহসন্তাপ বর্ণনা করেছেন।

জাগর অর্থ কৃষ্ণবিরহে নিদ্রাহীনভাবে কাটানো। রাধামোহন ঠাকুর এই বিষয় নিয়ে পদরচনা করেছেন—

যদবধি যদুপুর তুহু যাই ভোর।
যুবতী যামিনী কত জাগই জোর ॥[১১২]

পরবর্তী দশা উদ্বেগ, উদ্বেগের পর তানব অর্থাৎ শরীরের কৃশতা। পরবর্তী দশাগুলি পূর্বরাগের দশাগুলির অনুরূপ।

এরপর সম্ভোগ। সম্ভোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শ্রীরূপ বলেছেন—

দর্শনালিঙ্গনাদীনানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে।[১১৩]

দর্শন ও আলিঙ্গনের আনুকূল্যের দ্বারা যে সেবা—তাতে যুবকযুবতীর উল্লাসের উপর ভাব উত্থিত হলে তাকে সম্ভোগ বলে। সম্ভোগ দুই প্রকার—মুখ্য এবং গৌণ। জাগ্রত অবস্থায় মুখ্যসম্ভোগ আবার চাররকম— সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্।

লজ্জা এবং ভয়ের জন্য যে সম্ভোগে যুবকযুবতী অল্পমাত্র ভোগচিহ্ন ব্যবহার করে, তাকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে।

অন্যদিকে যে সম্ভোগে নায়ককৃত বঞ্চনার স্মরণে, কখনও বা রতিচিহ্ন প্রভৃতির দর্শনে শ্রবণে ও সুরতচেষ্টা বিষয়ক উপচারগুলি মিশ্রিত হয়ে একই সঙ্গে তপ্ত ইক্ষুর উষ্ণতা ও মাধুর্য অনুভবের মত আস্বাদ দান করে তাই-ই সংকীর্ণ নামে কথিত হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্য চরিতামৃতে এটিকে ব্যাখ্যা করে লিখেছেন—

এই প্রেম আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।

সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥[১১৪]

সংকীর্ণ সম্ভোগের পরবর্তী আলোচ্য বিষয় সম্পন্ন সম্ভোগ। প্রবাস থেকে সমাগত নায়কের সঙ্গে নায়িকার মিলনকে 'সম্পন্ন সম্ভোগ' বলা হয়। এটিকেও দুভাগে ভাগ করা যায়—আগতি ও প্রাদুর্ভাব। লৌকিক ব্যবহারের দ্বারা আগমণ হলে তাকে বলা হয় আগতি আর অলৌকিক প্রেমে হঠাৎ প্রেমিকের আবির্ভাব ঘটালে তাকে বলা হয় প্রাদুর্ভাব সম্ভোগ। 'আগতি' অবলম্বন করে অনেক কবিও পদরচনা করেছেন। যেমন—একজন অজ্ঞাতনামা পদরচয়িতা লিখেছেন—

রাধিকা চাতকী হাসি শ্যামসনে মিলে আসি
পিয়ে সুধা হরষিত মনে।
দুরে দুঁহু দোঁহে দেখি পালটিতে নারে আঁখি
হানিল কুসুমশরবাণে ॥[১১৫]

সম্পন্ন সম্ভোগের পর সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ। এই সম্ভোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শ্রীরূপ বলেছেন—দুর্লভালোবায়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্ ॥[১১৬]

পরাধীনতার জন্য বিরহবিধুর নায়ক নায়িকার মধ্যে পরস্পরের দর্শন সুদুর্লভ হলে হঠাৎ মিলনে তাঁদের যে আনন্দাতিরেক হয়, তাকেই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ বলে। শ্রীরূপের সমৃদ্ধিমান সম্ভোগকে পরবর্তীকালের বৈষ্ণব মহাজনেরা আবার আটটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন - স্বপ্নসম্ভোগ, কুরুক্ষেত্রে মিলন, বাক্যে বিলাস, ব্রজে আগমন, কৌতুক ভোজন, একত্র নিদ্রা ও স্বাধীন ভর্তৃকা।

এইভাবে উজ্জ্বলনীলমণির বিভিন্ন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রকরণগুলিকে শ্রীরূপ রাধা-কৃষ্ণলীলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে লৌকিক নায়ক নায়িকার আচরণকেই অমর্ত্যদ্যুতি দান করেছেন। পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলী ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলি এই ছকে বাঁধা পথ ধরে চলেছে। মহাপ্রভুর প্রভাবের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পেলে শ্রীরূপের এই অলঙ্কার শাস্ত্রের গতানুগতিক অনুসরণই কৃষ্ণকথাকে নিষ্প্রাণ করে তুলেছে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ঃ শ্রীরূপ গোস্বামীর আর একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হল শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা। এতে রাধাকৃষ্ণকথায় যে বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব সম্পাদিত হয়েছে— তা এককভাবে রূপেরই সৃষ্টি। হালের গাথাসপ্তশতী থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পর্যন্ত আমারা যে রাধাকে দেখি, তিনি সাধারণ গোপকন্যা ও গোপবধূ। তিনি গৃহস্থ সাধারণ বধূদের মতই গৃহকর্ম করেন, নদী থেকে জল আনেন এবং মাথায় দধি দুগ্ধ প্রভৃতির পসরা সাজিয়ে মথুরায় বিক্রয় করতে যান। অন্যদিকে শ্রীরূপের রাধা শুধু বৃষভানুসুতা রাজকন্যা নন, তিনি অভিজাত গৃহের ঐশ্বর্যময়ী বধূ। রাধার মণিমুক্তাখচিত ও পুষ্প খচিত বহু আভরণেরও উল্লেখ তিনি করেছেন। আসলে শ্রীরূপ তাঁর সন্ন্যাসপূর্ব ব্যক্তি-জীবনের ঐশ্বর্যময় রাজপুরুষোচিত আভিজাত্যকেই রাধার চরিত্রসৃজনে প্রতিফলিত করেছেন। শ্রীরূপ প্রভাবিত পদাবলী সাহিত্যেও এই অভিজাতকুলোদ্ভবা রাধার সামাজিক ভিত্তিটি মোটেই ঢাকা পড়ে নি।

কৃষ্ণ সম্পর্কেও রূপ গোস্বামীর নবতর চিন্তার সন্ধান পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। তিনি বলেছেন ব্রজে যারা বাস করে, তারা সবাই কৃষ্ণের পরিবারভুক্ত। তিনি এদের তিনভাগে ভাগ করেছেন—ব্রাহ্মণ, কলাকার ও গোপালক। গোপালকরাও আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—বৈশ্য, আভীর ও গুর্জর। আভীররা শূদ্র এবং তাদের পদবী ঘোষ, গুর্জরেরা আভীরদের তুলনায় নিম্নস্তরের। তারা ছাগল চরায় ও গোচারণ স্থানের নিকটে বাস করে। কৃষ্ণের গাত্রবর্ণের কৃষ্ণত্বও শ্রীরূপকে খুবই চিন্তায় ফেলেছিল বলা যায়। তিনি কৃষ্ণের মতো যশোদাকে শ্যামলাঙ্গী বলেছেন এবং যশোদার পিতা সুমুখকেও জম্বুফলের বর্ণবিশিষ্ট বলে অভিহিত করেছেন। নন্দের ভ্রাতাভগিনীদের নামও তিনি উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও কৃষ্ণ এবং রাধার নানা ধরণের ভৃত্যবর্গের নামও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। অভিজাত সমাজে দাসদাসীরা কত বিচিত্র কার্য সম্পাদন করে প্রভুর অলসমন্থর জীবনকে আরামমসৃণ করে তুলত, তার একটি প্রামাণ্য দলিল এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। চৈতন্য-প্রেরণায় রূপ, জীব ও সনাতনের মত সামন্ত বর্গ কৃষ্ণকথা-কাব্যের দিক্‌দর্শনী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আগে কৃষ্ণকথাসাহিত্য প্রবাহিত হয়েছিল লোকায়ত জীবনের পদাঙ্কে। কিন্তু রাজসভার আভিজাত্য থেকে উঠে এসে রূপ-জীব-সনাতন যেদিন প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণ-কথাকে নিয়ন্ত্রণ শুরু করলেন, তখন থেকেই দেখা গেল রাধাকৃষ্ণের জীবনচর্যার বর্ণনায় সামন্ত জীবনচর্যার প্রক্ষেপ ঘটতে শুরু করেছে। আমীর-ওমরাহের মত যে জীবন তাঁরা একদিন যাপন করতেন, কিংবা যে জীবন পরিবেশে পরিবেষ্টিত থাকতেন, বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর জীবনে তা পরিত্যক্ত হলেও ইষ্টদেবতা রাধাকৃষ্ণকে আদর্শ পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে পূর্বজীবনের সেই পরিবেশকে তাঁরা ঐশী মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

রূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় কৃষ্ণের নানা ধরণের দাসদাসীর বর্ণনা দিয়েছেন।[১১৭] কড়ার, ভারতীবন্ধ এবং গন্ধবেদ প্রভৃতি সেবকদের বলা হয়েছে 'বিট'। ভঙ্গুর, ভৃঙ্গার, সান্ধিক, গান্ধিক, রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুখণ্ড, মধুব্রত, শালিক, তালিক, মালী, মানধর, মালাধর, প্রভৃতি সেবকেরা শ্রীকৃষ্ণের চেট হিসেবে গণ্য। এরা শ্রীকৃষ্ণের বেণু, শৃঙ্গ (শিঙ্গা), মুরলী, যষ্ঠি ও পাশ (গোদোহন রজ্জু) প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য বহন করে থাকে।[১১৮] কৃষ্ণের তাম্বুলিকগণ হল—পল্লব, মঙ্গল, ফুল্ল, কোমল, কপিল সুবিশাল, বিশাল, রসাল, রসশালী ও জম্বুল প্রভৃতি সেবকগণ। এরা তাম্বুলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নির্মাণ পরিপাটিতে বিচক্ষণ। এরা সবাই অল্পবয়স্ক এবং সবসময়েই কৃষ্ণের কাছে কাছে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের এই তাম্বুলিকদের প্রসঙ্গ যে মোটেই অতিরঞ্জন বা কল্পনা নয়, সমকালীন ইতিহাস ও সাহিত্যের সাক্ষ্যে তা প্রমাণিত। কিন্তু এখানেই শ্রীকৃষ্ণের দাস বর্ণনার শেষ নয়। বারিদ, পয়োদ প্রভৃতি দাসগণ শ্রীকৃষ্ণের জল সংস্কার করে থাকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে স্নান ইত্যাদি করিয়ে থাকে। বস্ত্রসেবক বা রজক হিসেবে সরঙ্গ, বকুল প্রভৃতি ভৃত্যেরা শ্রীকৃষ্ণের শুধু বস্ত্র পরিস্কারই করে না, তারা বসনসজ্জাতেও কুশল, অর্থাৎ কৃষ্ণের জামা-কাপড়ও তারা পরিপাটি করে পরিয়ে দেয়।

এর পরেও আছে কৃষ্ণের বেশকারী প্রেমকন্দ, মহাগন্ধ, সৈরিন্ধ্র, মধু, কন্দল এবং মকরন্দ প্রভৃতি ভৃত্য।[১১৯] সুমনা, কুসুম, সোল্লাস, পুষ্পহাস, হর, সুগন্ধ, কর্পূর সুবন্ধ এবং কুসুম প্রভৃতি ভৃত্যেরা শ্রীকৃষ্ণের গন্ধদ্রব্যদান, অঙ্গে কুঙ্কুম, অগুরু প্রভৃতির রঞ্জন

কার্য, মাল্যদান ও পুষ্প ভূষণ দিয়ে কৃষ্ণকে সাজানোর কাজে নিযুক্ত। স্বচ্ছ, সুশীল ও প্রগুণ প্রভৃতি ভৃত্যেরা শ্রীকৃষ্ণের নাপিত অর্থাৎ ক্ষৌরকার। এরা কৃষ্ণের কেশসংস্কার, দেহমর্দন ও দর্পণদান প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত। বিমল, কোমল প্রভৃতি ভৃত্যেরা কৃষ্ণের ভোজনস্থলী ও পীঠ অর্থাৎ পিঁড়ি ইত্যাদি বহন করে। এই সমস্ত কার্যসম্পাদক ভৃত্য ছাড়াও, ধনিষ্ঠা, চন্দনকলা, গুণমালা, রতিপ্রভা, তরুনী ইন্দুপ্রভা, শোভা এবং রম্ভা প্রভৃতি কৃষ্ণের পরিচায়িকা অর্থাৎ দাসী। এরা গৃহমার্জন, গৃহসংস্কার, গৃহলেপন এবং দুগ্ধ আনয়ন প্রভৃতি কাজ করে। পুণ্যপুঞ্জ ও ভাগ্যরাশি নামে দুজন ভৃত্য হাড়ি। এরা শ্রীকৃষ্ণের ঝাড়ুদার, তারা গৃহ ও গৃহপ্রান্তের ময়লা পরিস্কার করে থাকে। রঙ্গন ও টঙ্কন নামে দুজন ভৃত্য শ্রীকৃষ্ণের স্বর্ণকার অর্থাৎ অলঙ্কার নির্মাতা। পবন আর কর্মঠ—দুজন ভৃত্য হল কৃষ্ণের কুম্ভকার। এরা কৃষ্ণের মন্থন পাত্র এবং মাটির অন্যান্য নানা পাত্র তৈরী করে। বর্দ্ধকী ও বর্দ্ধমান নামে দুই ভৃত্য শ্রীকৃষ্ণের খাট ও শকট অর্থাৎ গাড়ী তৈরী করে। সুচিত্র নামক ভৃত্য কৃষ্ণের চিত্রকার্য অর্থাৎ নানা মূর্তি আঁকার কর্ম নির্বাহ করে। কুণ্ড, কণ্ঠোল, করণ্ড এবং কুটুল প্রভৃতি ভৃত্যেরা শ্রীকৃষ্ণের কারু অর্থাৎ শিল্পকাজের সেবক। এরা দাম (রজ্জু), মন্থান (মন্থনদণ্ড-কাইড়), কুঠার, পেটি, শিকা ইত্যাদি তৈরী করে।

শ্রীরাধার দাসীদের প্রসঙ্গও এখানে বর্ণিত। তবে শ্রীকৃষ্ণের মত সে বর্ণনা এত বিস্তৃত নয়। শ্রীরাধার সখীদের কাজ হল নানাভাবে রাধাকৃষ্ণকে আনন্দ দান করা। এও একধরণের দাসত্ব, এরা রাধাকৃষ্ণের নর্মসহচারী। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে এই দাসত্বের ওপর ভক্তির শর্করা প্রলিপ্ত হয়েছে। রাগলেখা, কলাকেলি, মঞ্জুলা, ভূরিদা প্রভৃতি হল রাধার কয়েকজন দাসী।[১২০] এছাড়াও দাসীদের মধ্যে আছে সুগন্ধা ও নলিনী নামে দুজন নাপিতকন্যা এবং মঞ্জিষ্ঠা ও রঙ্গরাগা নামে দুজন রজককন্যা।[১২১] রাধার বেশভূষাকারিনীর নাম পালন্ধ্রী এবং চিত্রকারিণীর নাম চিত্রিনী। দৈব ঘটনা থেকে সতর্ক রাখার জন্য যে দুজন দৈবজ্ঞা আছে তাদের নাম মান্ত্রিকী ও তান্ত্রিকী। ভাগ্যবতী ও পুণ্যপুঞ্জা দুই হাড়ির কন্যা। শ্রীকৃষ্ণের হাড়ি দাসদের মত এরাও রাধার ঝাড়ুদারনী। এছাড়াও রাধার দাসীদের মধ্যে আছে ভৃঙ্গী, মল্লী, মতল্লী প্রভৃতি। এরা পুলিন্দ নামক অসভ্য পার্বত্যজাতির কন্যা।

দেখা যাচ্ছে সমাজের শূদ্রবর্ণের নানা মানুষ এবং আরও অজস্র শিল্পদক্ষ মানুষ নানাভাবে রাধাকৃষ্ণের সেবাকার্যে নিয়োজিত হয়েছে। এরা সবাই ক্রীতদাস নয়, অনেকেই বৃত্তিভোগী, তবে বৃত্তিভোগী দাসরাও দাস-ই।

রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মত এই গ্রন্থের প্রভাবও চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যে অল্পবিস্তর পড়েছে। বিশেষ করে অষ্টকালীয় লীলার পদে রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র নর্মবিলাস এবং সখীদের সেবা তদাতীন্তন অভিজাত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দাসদাসীসেবিত, প্রমোদসর্বস্ব জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়। কবি উদ্ধবদাসের পদে দেখা যায় রাধাকৃষ্ণ দোলায় দুলবেন, সেজন্য, সখীরা সব ব্যবস্থা করে দিয়ে তাঁদের মুখে কর্পূর তাম্বুল ধরিয়ে দেন।[১২২] শর্তাবিধি নিয়ে দাসদাসী পরিবৃত তাম্বুলসেবী যে সামন্ত জীবনচিত্র বিপ্রদাস বা অন্যান্য কবির আলেখ্য রচনায় ধরা পড়েছে, রাধাকৃষ্ণের

এই লীলাচিত্রের সঙ্গে তার মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যে রূপ গোস্বামী যে মঞ্জরীভাবের প্রবর্তন করেছিলেন, পদাবলীকাররা সেভাবেই রাধাকৃষ্ণ উপাসনার চিত্র রচনা করেছেন। কৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে দাসত্বের। গোবিন্দদাসের বহু ভণিতায় মঞ্জরীভাবদ্যোতক দাসরূপে সেবার উল্লেখ আছে। কৃষ্ণ যখন দুগ্ধ দোহনে যান, তখন 'গোবিন্দদাস মুটুকি লইয়া ধায়'।[১২৩] কৃষ্ণ ভোজন করে ওঠার পর গোবিন্দদাস জলের ঝারি নিয়ে তার মুখ ধুয়ে দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন এবং মুখ ধোয়া হয়ে গেলে কবি চামর দোলান।[১২৪] রাধাকৃষ্ণের মিলনের সময়ও 'বীজন করতহি গোবিন্দদাস'[১২৫] অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় কৃষ্ণের বিভিন্ন ভৃত্যের যে ভূমিকা, গোবিন্দদাসও প্রায় সেই ভূমিকাই গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও অষ্টকালীয় লীলায় সহচরীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে গোবিন্দদাসের ওপর রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশদীপিকার প্রভাব পড়েছে। রাধাকৃষ্ণ যখন মিলনোন্মত্ত, তখনও—

সুবাসিত নীর ঝারি ভরি সহচরি
রাখত দুহুজন পাস।[১২৬]

এ যেন কোন সামন্ত প্রভুর মহলের দৃশ্য। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে এ দৃশ্য বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। বৈষ্ণব অবৈষ্ণব নির্বিশেষে সকলেই এই চিত্র ব্যবহার করেছেন। তাই একে ধর্মদর্শন বিশেষের বৈশিষ্ট্য হিসেবে না দেখে যুগগত জীবনের বিকাশ হিসেবে দেখাকেই বেশী তথ্যনিষ্ঠ মনে করি।

এই গ্রন্থগুলি ছাড়াও শ্রীরূপ লিখিত সনাতনের গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার লঘু বৈষ্ণব তোষণী, নাট্যতত্ত্ব, নাটকচন্দ্রিকা ইত্যাদি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

শ্রীরূপকে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের ব্যাসদেব বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর রচনাবলীকে সামনে রেখেই আমরা কৃষ্ণকথা সাহিত্যে তাঁর অবদানের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে সনাক্ত করছি।

ক. চৈতন্যপূর্ববর্তী কৃষ্ণকথায় ঐশ্বর্য ও মাধুর্যে মিশ্রিত যে কৃষ্ণকে আমরা দেখি—শ্রীরূপ তাঁর ঐশ্বর্যকে কিছুমাত্র স্বীকার না করে 'অখিলরসামৃতসিন্ধু' মূর্ত্তিকেই অঙ্কন করেছেন।

খ. ভাগবতে অনুল্লিখিতা, লোককথায় জনপ্রিয় কৃষ্ণ নায়িকা রাধা প্রাক্‌চৈতন্য-যুগের কবি ও সাধকদেরই মনোলোকের সৃষ্টি। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাঁরা রাধাচরিত্রকে সৃষ্টি করেছেন। আর শ্রীরূপও শ্রীচৈতন্যের দিব্যপ্রেমভক্তি রূপায়িত করতে গিয়ে তাঁকে করে তুলেছেন উপাস্যা দেবী। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব তিনি স্থাপিত করেছেন।

গ. শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুরলীলাতেও শ্রীরূপ অজস্র বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। জয়দেবের সম্ভোগে বৈচিত্র্য তেমন নেই। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণলীলা-বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে কোন তত্ত্ব নেই। কিন্তু রূপ রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র লীলা প্রসঙ্গে পৃথক পৃথক আখ্যায়িকা রচনা করেছেন। বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতি নাটকে, এমনকি উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রূপ তত্ত্বব্যাখ্যার জন্যও বিচিত্র রাধাকৃষ্ণমিলনলীলার আখ্যায়িকা সৃষ্টি করেছেন।

ঘ. মধুমঙ্গল, কুন্দলতা, পৌর্ণমাসী প্রভৃতির মত রাধাকৃষ্ণের মিলন সহায়ক ও সহায়িকার জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টিও বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীরূপেরই অসামান্য অবদান।

॥ ৩ ॥

জীব গোস্বামী

এরপর শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বমীর কথা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্র শ্রীরূপের সৃজনীপ্রতিভার পরিচয় বহন করে, অন্যদিকে এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দার্শনিক ভিত্তি সুদৃঢ় করাতে জীবের কৃতিত্বও অনস্বীকার্য। তাঁর দুই পিতৃব্যের ভাবগুলিকেই তিনি কাব্যে, তত্ত্বে ও দর্শনে ব্যাখ্যা করেন।

জীবের পিতা ছিলেন রূপ-সনাতনের কনিষ্ঠ রামোপাসক বল্লভ। জীব ১৫০৮-১৫০৯ খৃষ্টাব্দ বা তার কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তিরত্নাকরের শেষে উদ্ধৃত জীবের চারখানি পত্র থেকে জানা যায় বাংলাদেশের বৈষ্ণবদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। তাঁরা যখন যে সমস্যায় পড়তেন, শ্রীজীব বৃন্দাবন থেকে তার সমাধান করে পাঠাতেন। চৈতন্যধর্মের বর্তমান রূপ প্রধানতঃ রূপ, সনাতন, শ্রীজীব ও কৃষ্ণদাস কবিরাজেরই নির্মিতি। জীবের বহুমুখী প্রতিভা প্রকাশিত হয়েছে কাব্য, দর্শন, অলংকার, ব্যাকরণ ও স্মৃতিবিষয়ক নানা গ্রন্থে। জীব রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল—গোপালচম্পূ, সংকল্পকল্পদ্রুম, মাধবমহোৎসব ও গোপাল বিরুদাবলী।

এগুলির মধ্যে জীবের সুবৃহৎ কাব্য গোপালচম্পূ প্রধানতঃ ভাগবতের দশম স্কন্ধের কৃষ্ণলীলা অবলম্বন করে রচিত। এই কাব্যের পূর্বখণ্ডে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও উত্তরখণ্ডে বর্ণিত হয়েছে মথুরা ও দ্বারকালীলা। পূর্বচম্পূতে এই কাব্যরচনা সম্পর্কে কবির নিজস্ব স্বীকারোক্তি হল, পূর্বে রচিত কৃষ্ণসন্দর্ভের কৃষ্ণতত্ত্বই এখানে কাব্যাকারে পরিবেশন করা হবে।

পূর্বচম্পূতে তেত্রিশটি পূরণ। তাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত—(১) গোলক নিরূপণ (২) গোলোক বিলাস বিকাসন (৩) কৃষ্ণজন্ম (৪) কৃষ্ণজন্মোৎসব (৫) পূতনাবধ (৬) শকটভঞ্জন (৭) তৃণাবর্তবধ ও মৃদ্ভক্ষণ (৮) যশোদা কর্তৃক দামবন্ধন (৯) গোপগণের সহিত কৃষ্ণ ও বলরামের বৃন্দাবনে প্রবেশ (১০) বৎসাসুর বধ (১১) অঘাসুর বধ (১২) সখাদের সহিত গোচারণ (১৩) কালিয়দমন ও দাবানল নির্বাপন (১৪) গর্দভাসুর বধ (১৫) রাধাকৃষ্ণের প্রণয় (১৬) প্রলম্বাসুর বধ (১৭) বংশীশিক্ষাচ্ছলে কৃষ্ণের প্রেয়সীভিক্ষা (১৮ ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গ ও গিরিগোবর্ধন পূজা (১৯ ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব স্তম্ভন (২০) নন্দ মহারাজের বরুণলোকে যাত্রা ও গোলোক দর্শন (২১) গোপীগণের বস্ত্রহরণ (২২) যজ্ঞ পত্নীগণের নিকট কৃষ্ণের অন্নভিক্ষা (২৩ রাসলীলারম্ভ (২৪ রাসলীলা হতে অন্তর্ধান (২৫) গোপীদের বিরহ ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি (২৬ রাসবিলাসের বিস্তার (২৭) জলকেলি, বনভ্রমণ ও শ্রীরাসলীলা সমাপ্তি (২৮ শ্রীকৃষ্ণের অম্বিকা বনে গমন ও বিদ্যাধর শাপ মোচন (২৯) শ্রীকৃষ্ণের নির্জনে কৌতুককেলি বর্ণন (৩০) শঙ্খচূড়বধ এবং শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের হোরিকাক্রীড়ন (বসন্তোৎসব) (৩১) বৃষাসুরবধ, কুণ্ডদ্বয়প্রকাশ ও শ্রীকৃষ্ণের

দশম বর্ষীয় নানা বিচিত্রলীলা (৩২) শ্রীকৃষ্ণের কেশি দৈত্যবধ (৩৩) শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তগণের সর্বমনোরথপূরণ।

উত্তরচম্পূর সাঁইত্রিশটি পূরণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হয়েছে—

(১) ব্রজবাসীদের কৃষ্ণানুরাগবিস্তার (২ অক্রূরের বৃন্দাবনে আগমন ও গোপীদের বিলাপ (৩) কৃষ্ণবলরামের মথুরাগমন (৪) কৃষ্ণবলরামের মথুরাপ্রবেশ (৫) কংসবধ (৬) কৃষ্ণবলরাম কর্তৃক ব্রজে নন্দকে প্রেরণ (৭) নন্দের ব্রজপ্রবেশ ৮) রামকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি বিদ্যাধ্যয়ন সমাপন (৯) রামকৃষ্ণের যমালয় থেকে গুরুপুত্রকে আনয়ন (১০) উদ্ধবের ব্রজে আগমন (১১) ভ্রমরকে কৃষ্ণের দূত ভেবে রাধিকার উক্তি (১২) উদ্ধবের নিকট কৃষ্ণের ব্রজবার্তা শ্রবণ। প্রথম পূরণ থেকে এই দ্বাদশ পূরণ পর্যন্ত অংশ আনন্দবর্ধন নামক প্রথম বিলাস। দ্বিতীয় বিলাসে ত্রয়োদশ পূরণ থেকে একবিংশ পূরণ পর্যন্ত নয়টি পূরণ আছে। ১৩) জরাসন্ধবন্ধন (১৪ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কালযবন ও জরাসন্ধের জয় বিবরণ ১৫) বলরামের বিবাহ (১৬ কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহ ১৭ সত্যভামা প্রভৃতি সপ্তকন্যার বিবাহ (১৮) শ্রীকৃষ্ণের নরকবধ, পারিজাতহরণ ও ষোড়শ সহস্র কন্যাবিবাহ (১৯ কৃষ্ণ কর্তৃক মহাদেবের পরাজয় (২০ বলরামের ব্রজযাত্রা (২১ পৌণ্ড্রকাদির সাথে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধযাত্রা শ্রবণ করে বলদেবের পুনরায় দ্বারকা-আগমন (২২ বলরামের দ্বিবিদ দানববধ (২৩) নন্দসহ ব্রজবাসীদের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা (২৪ শ্রীকৃষ্ণের সাথে মিলনের পর ব্রজবাসীদের আবার ব্রজে প্রত্যাবর্তন (২৫ উদ্ধবের মন্ত্রণা ২৬ জরাসন্ধ কর্তৃক বন্দীরাজাদের মুক্তি ২৭) রাজসূয় যজ্ঞ ও শিশুপালবধ (২৮ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সাম্ববধ (২৯) ভাবীকথার প্রমাণ বিস্তার ৩০ দন্তবক্রবধ ও শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় ব্রজে আগমন (৩১ পৌর্ণমাসী কর্তৃক রাধা প্রভৃতি গোপীবৃন্দের বাধা সমাধান (৩২) বাধাসমাধানের পর বিবাহরম্ভ ৩৩) রাধামাধবের অধিবাস (৩৪) রাধামাধবের নানা অলঙ্কার পরিধান (৩৫ গোষ্ঠে মধ্যে রাধামাধবের শুভবিবাহ (৩৬) দিব্যমঙ্গলানুষ্ঠান ৩৭) শ্রীকৃষ্ণের গোলোক প্রবেশ।

গদ্যে ও পদ্যে রচিত এই বিশাল গ্রন্থটি শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য আখ্যালাভেরও যোগ্য। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচলিত যাবতীয় কৃষ্ণলীলা তাঁর এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এখানে প্রধানত ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলারই বিস্তার ঘটলেও কিছু কিছু ঘটনাকে শ্রীজীব পরিবর্তিত করেছেন এবং কিছু কিছু সংযোজনও ঘটেছে। যেমন পূর্বচম্পূতে তিনি বলেছেন, কৃষ্ণ প্রকৃত পক্ষে যশোদার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন।[২৭] ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। বসুদেব-দেবকী চতুর্ভুজ ভগবানকে তাঁদের সন্তানরূপে চেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন। অন্যদিকে নন্দ ও যশোদা সর্বদাই দ্বিভুজ কৃষ্ণকে তাঁদের বংশধর হিসেবে পেতে চেয়েছেন। যোগমায়া দ্বিভুজ কৃষ্ণকে নন্দ গৃহ থেকে কংসকারাগারে সরিয়ে নেন। তখন চতুর্ভুজ কৃষ্ণ নন্দ যশোদার দ্বিভুজপুত্রের শরীরে মিশে যায়। এরপর যোগমায়া আবার নন্দ যশোদার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং বসুদেব কৃষ্ণকে যশোদার কাছে রেখে দিয়ে তাকেই নিয়ে আসেন। স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে বৃন্দাবনলীলাকে অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব দান করার জন্যই জীব এইভাবে নন্দযশোদার জনক-জননীত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আবার কৃষ্ণের পিতৃকুল আভীর গোষ্ঠীর হলেও যে নীচুজাত নয়, সেটি প্রমাণ করার জন্য জীব এই গোপাল চম্পূতেই পদ্মপুরাণের

সৃষ্টিখণ্ডের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য ব্রহ্মা একজন আভীর কুমারীকে বিবাহ করেন।

বিষ্ণুপুরাণে[১২৮] এবং ভাগবতে[১২৯] আমরা দেখেছি, কৃষ্ণ নন্দকে ইন্দ্রপূজা থেকে বিরত করার জন্য ইন্দ্রপূজার প্রাক্কালে নিজেদের গ্রাম, নগর অথবা জনপদবাসী নয়, পর্বত ও অরণ্যবাসী বলে অভিহিত করেছেন, অর্থাৎ এখানে কৃষ্ণের পিতা নন্দ গোপালকদের নেতা। কিন্তু বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীদের প্রধান রূপ ও সনাতন সন্ন্যাস-পূর্ব রাজসভার ঘনিষ্ঠ জীবন থেকে যে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করে এনেছিলেন তারই প্রভাবে গোপালক-নেতা নন্দ একজন সামন্ত রাজায় পরিণত হয়েছেন এবং জীবের গোপালচম্পূতেও তার প্রভাব পড়েছে। পরবর্তীকালের পদাবলী সাহিত্যেও এঁদেরই প্রভাবে নন্দকে রীতিমত ঐশ্বর্যশালী রাজারূপে চিত্রিত করা হয়েছে। ভাগবতে আছে, জননী যশোদা একটি সাধারণ দড়িতে উৎপাতকারী শিশু কৃষ্ণের হাত দুটি বেঁধে দিয়েছিলেন।[১৩০] জীবের এটা ঠিক পছন্দ হয় নি। তিনি বলেছেন যশোদা তাঁর চুলবাঁধার রেশমী ফিতে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বেঁধেছিলেন। কিন্তু জীবের গোপালচম্পূতে পুরাণাতিরিক্ত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, দ্বারকা থেকে কৃষ্ণের ব্রজে প্রত্যাবর্তন এবং গোপীদের সাথে তাঁর বিবাহ। কৃষ্ণ দশলক্ষ গোপিনীকে বিবাহ করলেও শ্রীরাধার সাথে তাঁর বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনাই শ্রীজীব দিয়েছেন।[১৩১]

ভাগবতে আছে কৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রজগোপীদের কাছে পাঠিয়েছিলেন এই বলে যে, তাঁরা যেন মনকে সংযত করে কৃষ্ণের কথা ভাবেন।[১৩২] গোপীরা কিন্তু এই উক্তিকে কৃষ্ণের উপদেশ না ভেবে প্রেমের বার্ত্তা বলেই ধরে নিয়েছেন। অর্থাৎ ভাগবতীয় কৃষ্ণের ঐশ্বর্য সচেতনতা জীবের গোপীদের মধ্যে আদৌ নেই।

জীব গোস্বামীর পরবর্তী রচনা মাধবমহোৎসব গোপালচম্পূর মত বৃহদায়তন নয়। বিষয়বস্তুও সংকীর্ণ। চৈতন্য-সংস্কৃত নব-বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন আমরা ইতিপূর্বেই শ্রীরূপরচিত সাহিত্যে ও দর্শনে লক্ষ্য করছি। এই কাব্যে রূপের ভ্রাতুষ্পুত্র জীবও শ্রীরাধারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এতে বৃন্দাবনেশ্বরীর অভিষেক বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা ইতিপূর্বেই আমরা রূপ গোস্বামীর দানকেলী কৌমুদীর একটি প্রধান ঘটনারূপে পেয়েছি।

এই গ্রন্থটিতে নয়টি উল্লাস বা অধ্যায় রয়েছে। প্রথম উল্লাসে শ্রীরাধা কৃষ্ণের সাথে মিলনের সঙ্কেত পেয়ে আনন্দিতা হয়েছেন—তাই এর নাম উৎসুকরাধিকা। দ্বিতীয়ে চন্দ্রাবলীর বৃন্দাবনের রাজত্ব প্রাপ্তির সংবাদে এবং বৃক্ষবাটিকার দুরবস্থা দর্শনে রাধার মান হয়েছে—তাই এর নাম উন্মনারাধিকা। তৃতীয় উল্লাসে বৃন্দার চেষ্টায় বিশাখা ও পৌর্ণমাসী শ্রীরাধার মানভঙ্গ করেছেন ও কৃষ্ণের নিগূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করে রাধাকে উৎফুল্ল করে তুলেছেন—তাই এর নাম উৎফুল্লরাধিক। চতুর্থ উল্লাসে শ্রীরাধার অধিবাস ও অভিষেকের পূর্বকৃত্য সম্পাদিত হয়েছে—তাই এর নাম উদ্যোত রাধিক। পঞ্চমে অভিষেকের পূর্ণ আয়োজন করা হয়েছে এবং শ্রীরাধা রাজ্যাভিষেক-মণ্ডপে এসেছেন। এই অধ্যায়ের নাম উদিত রাধিক। ষষ্ঠ উল্লাসে দেবীগণের আগমন এবং রাধাকৃষ্ণের পরস্পরমিলিত অঙ্গসুষমার বর্ণনা—এর নাম উন্নত রাধিক। সপ্তম উল্লাসে অভিষেকের

কার্য্য আরম্ভ হয়েছে, নবনিধি বিরচিত ঘটের জলে শ্রীরাধার অভিষেক হয়েছে—এর নাম উৎসিক্ত রাধিক। অষ্টম উল্লাসে বর্ণিত হয়েছে বেশভূষা দ্বারা শ্রীরাধার উজ্জ্বলতা সম্পাদন। তাই এর নাম উজ্জ্বল রাধিক। নবমে শ্রীরাধার রাজসিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপবেশন এবং শ্রীরাধার ভোগোন্মত্ততা প্রভৃতি বর্ণিত। এর নাম উন্মদরাধিক।

এই কাব্যে শ্রীরাধাকে জীব পরকীয়া নায়িকারূপে দেখিয়েছেন এবং শুধু কৃষ্ণের প্রতি নয়, রাধার প্রতিও যশোদার বাৎসল্য বর্ণিত হয়েছে। রাধার যে দিব্যপ্রেমযুক্ত ভাববিহ্বল অবস্থার বর্ণনা জীব দিয়েছেন—তা শ্রীচৈতন্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সংকল্প কল্পদ্রুমকে গোপালচম্পূর অনুক্রমণিকা বলা যায়। এতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলা, রাধামাধবের নিত্যলীলা, সর্ব্বঋতুলীলা বা ছয় ঋতুতে রাধাগোবিন্দের লীলা এবং অবশেষে ফল নিষ্পত্তি বর্ণিত হয়েছে। জীব বলেছেন যে জন্মাদি লীলা এই কল্পবৃক্ষেরমূল, নিত্যলীলা স্কন্ধ এবং ঋতু বর্ণনা বিষয়ক শ্লোকগুলি এর শাখা ও প্রেমময় স্থিতি এর ফল।

এছাড়া জীব ভাবার্থসূচক চম্পূ, ব্রহ্মসংহিতার টীকা ইত্যাদি গ্রন্থও রচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে সেগুলি আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।

কৃষ্ণকথাকার রূপে জীব শ্রীরূপেরই অনুগামী এবং তাঁর কৃতিত্বও কৃষ্ণকথাকাব্যে প্রকাশিত নয়। তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ষট্সন্দর্ভ রচনা। ষটসন্দর্ভের ছয়টি সন্দর্ভ যথাক্রমে তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ পরমাত্মাসন্দর্ভ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভ দর্শনগ্রন্থ হিসেবে এটি চৈতন্যের নববৈষ্ণবধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলেও কৃষ্ণ কথার বৈশিষ্ট্যানুসরণে এর অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভই আমাদের একমাত্র আলোচ্য। এতে জীব 'এতে চংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোক অনুসরণ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, কৃষ্ণ অবতার নন, তিনি স্বয়ং ভগবান। চতুঃসন, বরাহ, কপিল, দত্তাত্রেয়, মৎস্য, কূর্ম, বামন, পরশুরাম প্রভৃতি বাইশজন অবতারের মধ্যে বলরাম ও কৃষ্ণ অবতার ছাড়া অপর সকলেই অংশ অবতার। এই প্রসঙ্গে জীব গীতার উদ্ধৃতি দিয়ে ও নির্দেশ প্রমাণ করে চতুর্ভুজ বাসুদেবের উপাস্যত্ব প্রতিষ্ঠা না করে নরাকৃতি দ্বিভুজ কৃষ্ণের উপাস্যত্ব স্থাপন করেছেন। দ্বাপর যুগে লীলার কারণে বৃন্দাবনে এই বিগ্রহ নন্দগোপের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর বর্ণ শ্যাম, তিনি চিরকিশোর, বংশীধারী, সবার চিত্ত আকর্ষণকারী এবং মোহনবপু-ধারী। বৈষ্ণব রীতিশাস্ত্রে কৃষ্ণের এই মূর্তিই বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণের ধাম, ব্যূহ, পরিকর প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচয় দান করে জীব গোস্বামী কৃষ্ণ এবং গোপীদের সম্বন্ধ নির্ণয় করার জন্য এখানে বিস্তৃতভাবে স্বকীয়া ও পরকীয়া তত্ত্বের আলোচনা করেছেন। মাধবমহোৎসবে আপাতদৃষ্টিতে রাধাকে পরকীয়া মনে হলেও গোপালচম্পূতে জীব তাঁদের বিবাহ দিয়েছেন। অবশ্য রূপও এইভাবে স্বীকার করে ললিতমাধব নাটকে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার বিবাহ দিয়েছেন। কিন্তু রূপ গোস্বামী পরকীয়া প্রীতি অঙ্গীকার করে নিলেও, জীব পরকীয়া স্বীকার করেন নি। তিনি বৃহৎ অগ্নিপুরাণ থেকে মায়া-সীতার উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, কৃষ্ণ গোপীদের একমাত্র পতি। তিনিই

নিজের মায়াশক্তিবলে গোপদের পাশে মায়া গোপবধূর সৃষ্টি করে পাঠিয়েছিলেন। গোপবধূরা কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি। অতএব নিজ শক্তির সঙ্গে বিহার কখনও দূষণীয় হতে পারে না। শ্রীজীবের মতে গোপীরা কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী। কৃষ্ণের প্রতি ভাবের তারতম্য অনুযায়ী এঁদের মধ্যে নানা শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করা যায়। রাধা মহাভাবের অধিকারিণী বলে কৃষ্ণের প্রিয়তমা। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, পরবর্তীকালের কৃষ্ণকথায় জীবের স্বকীয়াতত্ত্বের বদলে পরকীয়াতত্ত্বই বেশী পরিমাণে আদৃত হয়েছে।

এছাড়াও শ্রীজীব তাঁর এই সন্দর্ভে বলদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, ; বৃন্দাবন ও গোলোকের একত্ব এবং যাদবদের শ্রীকৃষ্ণ পার্ষদত্ব প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালের বাংলা কৃষ্ণকথায় প্রত্যক্ষভাবে শ্রীজীবের আলোচিত এই ধর্মতত্ত্ব এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে আছে যে, এ সম্পর্কে প্রাথমিক পাঠ না থাকলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠ ও উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয় না। সেই কারণেই কৃষ্ণকথার ধারাবাহিকতায় আমাদের এই আলোচনার অনিবার্যতা।

॥ ৪ ॥

গোপাল ভট্ট

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোপালভট্ট সম্পর্কে প্রায় কিছুই লিখে যান নি। এই গোপালভট্ট কে ছিলেন সে সম্পর্কেও সংশয় আছে। আমরা দুজন গোপাল ভট্টের নাম পাচ্ছি। একজন শ্রীসম্প্রদায়ের ত্রিমল্লের পুত্র (চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময় এঁর গৃহে চারমাস অবস্থান করেছিলেন) আর একজন দাক্ষিণাত্যবাসী নৃসিংহ ভট্টের পৌত্র এবং হরিবংশ ভট্টের পুত্র।

'হরিভক্তিবিলাস' রচয়িতা প্রথম গোপাল ভট্টকেই এক্ষেত্রে ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম ধরা হয়। ইনি নিজেকে প্রবোধানন্দের শিষ্য বলেছেন। কারও কারও মতে সনাতন সংক্ষিপ্তভাবে 'হরিভক্তি বিলাস' রচনা করে গোপাল ভট্টকে বিস্তৃত করার নির্দেশ দেন। কিন্তু এটিকে সনাতনের রচিত বলে মনে হয় না। কারণ গ্রন্থটিতে পুরীর রথযাত্রার উল্লেখ নেই, কৃষ্ণ-রুক্মিণীর মূর্তির কথা থাকলেও রাধাকৃষ্ণের মূর্তির কথা উল্লেখ করা হয় নি। শুধু রাধার পূজার কথা বলা হয়েছে।

গোপালভট্টের নামে আরোপিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আলোচ্য প্রসঙ্গে একটি গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থটি India office Catalague-এ (vol ll p. 1470, No-3897—99) নামহীন অবস্থায় পাওয়া গেছে। রচয়িতা হিসেবে গোপাল ভট্টের নাম রয়েছে। এটি গদ্য ও পদ্যে রচিত এবং চারটি অধ্যায়যুক্ত—(১) বসনচৌরকেলি (২) ভারখণ্ড (৩) পারখণ্ড ও (৪) দানখণ্ড। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে 'দানখণ্ড' নামে একটি পুঁথি গোপাল ভট্টে আরোপিত দেখা যায় (পুঁথি নং ৪২৭)। এর নাম দানখণ্ড হলেও এতে বস্ত্রহরণ খণ্ড, নৌকাখণ্ড ও ভারখণ্ড নামে আরও তিনটি খণ্ড আছে।

॥ ৫ ॥

রঘুনাথ দাস গোস্বামী

শ্রীচৈতন্যদেব যে নব ভাবরাজি নিয়ে আবিভূ্র্ত হয়েছিলেন তাতে সমাজের উচ্চ কুলোদ্ভব, অভিজাত অথবা ধনী উচ্চবিত্তের প্রতি পক্ষপাত ছিল না, বরং সমাজে যারা পতিত, অবহেলিত ও অকিঞ্চন তাঁরাই ধন্য হয়েছিলেন তাঁর কৃপলাভে। তিনি কোনও দরিদ্র পতিতকে আরও অন্ধকারে ঠেলে দেন নি। বরং যারা উচ্চবিত্ত ও প্রতাপশালী তারা এসে মস্তক লুণ্ঠিত করেছে তাঁর শ্রীচরণে, ধন্য হয়েছে তাঁর কৃপাকটাক্ষলাভে। রঘুনাথ দাসের মত ধনীর সন্তানও 'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য অপ্সরাসম স্ত্রী,' ত্যাগ করে, তাঁর প্রেমধর্মের শরণ নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সুকঠোর সন্ন্যাসজীবনও যাপন করেছেন।

রঘুনাথ দাসের আবির্ভাব ১৪৯৮ এবং তিরোভাব ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। হুগলী জেলার সপ্তগ্রামের বিখ্যাত ভূস্বামী গোবর্দ্ধন দাস এঁর পিতা। বাল্যকালে রাজোচিত ঐশ্বর্যের মধ্যে তিনি লালিত পালিত হন। কৈশোর থেকেই একমাত্র পুত্রের বৈরাগ্যভাব লক্ষ্য করে পিতা অপ্রাপ্ত যৌবনেই একটি অতিসুন্দরী কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। কৈশোর কালেই চৈতন্যদেব রামকেলি যাওয়ার পথে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে অবস্থান করার সময় রঘুনাথ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে সংসার ত্যাগের বাসনা প্রকাশ করেন। চৈতন্যদেব তাঁকে বলেন, ভিতরে নিরাসক্ত থেকে বাইরে ঐশ্বর্যভোগ করতে। রঘুনাথ স্ত্রীর সংসর্গ ত্যাগ করে নিরাসক্তচিত্তে গৃহকর্ম করতে লাগলেন। এইসময় পানিহাটিতে নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ভেতরে বৈরাগী ও বাইরে বিষয়ভোগী রঘুনাথকে নিত্যানন্দ 'চোরা' সম্বোধন করে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের জন্য চিড়াদধি মহোৎসবের ব্যবস্থা করতে বলেন। বৈষ্ণবসমাজে এই 'দণ্ডমহোৎসব' আজও প্রতিবছর ১৩ই জ্যৈষ্ঠ পাণিহাটিতে পালন করা হয়। এরপর পাছে তিনি সংসার ত্যাগ করে চলে যান—তাই তাঁকে কঠোর প্রহরার মধ্যে রাখা হয়। কিন্তু তারই মধ্য দিয়ে প্রহরীদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তিনি দুর্গম অরণ্যপথে পুরীতে শ্রীচৈতন্যের কাছে উপস্থিত হন। রঘুনাথ জীবনাচরণে আদর্শ বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর কঠোর বৈরাগ্যব্রত সবারই বিস্ময় উৎপাদন করে। পিতা তাঁর কাছে পাচক ব্রাহ্মণ, দাস ও অর্থ পাঠিয়ে দিলে তিনি দাস ও পাচক ব্রাহ্মণকে বিদায় করে দিয়ে অর্থটুকুই গ্রহণ করেন এবং সেই অর্থে চৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। অতঃপর পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বার থেকে তিনি ভিক্ষা চাইতেন। পরিশেষে সব ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র প্রাণ ধারণের জন্য ছাড়া, তিনি যে সুকঠোর তপশ্চর্যা শুরু করলেন—তা অভূতপূর্ব। মন্দিরের ফেলে দেওয়া পচা বাসী ভাত—দুর্গন্ধের জন্য যা গরুরাও খেতে পারত না—তিনি তাকেই ধুয়ে পরিষ্কার করে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতেন। চৈতন্যের তিরোভাবের পর তিনি বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডে গিয়ে একা বাস করতেন এবং চৈতন্য প্রদত্ত গোবর্দ্ধন শিলাতে কৃষ্ণপূজা করতেন। ছয় গোস্বামীর মধ্যে একমাত্র অব্রাহ্মণ (কায়স্থ) হয়েও তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—তাঁর সুকঠোর সন্ন্যাসজীবন যাপনের জন্য।

কিন্তু যতিজীবনের এই কঠোর আদর্শ ছাড়াও রঘুনাথের সৃজনী প্রতিভা বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে মৌলিকত্ব এবং কৃষ্ণকথার অভিনবত্বে দীপ্ত একটি চম্পূকাব্যের নাম 'মুক্তাচরিতম্'।

এই গ্রন্থের বক্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রোত্রী সত্যভামা। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে মুক্তাফলের চাষ করে যে সব অপ্রাকৃত লীলা সম্পাদন করেছিলেন, তাই-ই তিনি দ্বারকায় সত্যভামার কাছে বর্ণনা করেছেন। অষ্ট-মহিষীর অন্যতম লক্ষ্মণাদেবীর প্রিয়সখী শ্রীসমঞ্জসাও সেই সময় মুক্তাচরিত শ্রবণ করে লক্ষ্মণাদেবীর কাছে তা বর্ণনা করেছেন।

বয়ঃসন্ধিসময়ের শ্রীকৃষ্ণের চমৎকার একটি কৌতুকময় কাল্পনিক লীলা এই মুক্তাচরিত্র। দীপাবলী উৎসবের দিনে শ্রীরাধা তাঁর সখীদের নিয়ে মাল্যহরীকুণ্ডের তীরে চতুঃশালায় মুক্তা দিয়ে বেশভূষা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর হংসী ও হরিণী নামক দুটি ধেনুর জন্য কয়েকটি মুক্তা প্রার্থনা করলে, তাঁরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন কৃষ্ণ, জননী-যশোদার কাছ থেকে কয়েকটি মুক্তা এনে ক্ষেত্রে রোপণ করে চারদিকে বেড়া দিয়ে দিলেন। ক্ষেত্রে সেচনের জন্য ঐ গোপীদের কাছ থেকে দুগ্ধ প্রার্থনা করেও তিনি পেলেন না। তখন নিজের গৃহ থেকেই দুগ্ধ এনে তিনি ক্ষেত্রে সেচন করলেন। তাঁর অলৌকিক মায়াপ্রভাবে চতুর্থ দিনে মুক্তালতা অঙ্কুরিত হল। গোপীগণ এই আশ্চর্য ঘটনায় চমৎকৃত হয়ে নিজেদের গৃহে যত মুক্তা ছিল সব রোপণ করে নবনীত প্রভৃতি সেচন করতে লাগলেন। কয়েকদিন পরেই দেখা গেল একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর সবার ক্ষেত্রেই কণ্টকাকীর্ণ মুক্তাবিহীন লতা জন্মেছে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের দেখিয়ে দেখিয়ে নিজ বয়স্যদের, পশুদের, এমনকি বানরদেরও মুক্তামণ্ডিত করলেন। গোপীরা গুরুজনদের তিরস্কারের ভয়ে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে মুক্তা ক্রয় করতে চাইলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সহজে মুক্তা দিতে মোটেই রাজী হলেন না। তখন ললিতা বললেন, রাধা যেহেতু বৃন্দাবনেশ্বরী, সুতরাং কৃষ্ণ তাঁর চাষ করা মুক্তার একাংশ রাধাকে দিতে বাধ্য। প্রত্যুত্তরে মধুমঙ্গল বললেন, বৃন্দাবন প্রকৃত পক্ষে শ্রীকৃষ্ণেরই, কারণ তার আর এক নাম কৃষ্ণবন। কিন্তু ললিতা বললেন কৃষ্ণবন শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ বন, কৃষ্ণের বন নয়, সুতরাং এখানে কৃষ্ণের স্বামিত্ব প্রযোজ্য নয়। এইভাবে বহু বাগ্‌বিতণ্ডার পর নান্দীমুখীর মধ্যস্থতায় সমস্যার সমাধান হল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা মধুমঙ্গল ও সুবলের হাত দিয়ে রাধাকুণ্ডের কুঞ্জে রাধার ও তাঁর সখীদের জন্য প্রচুর মুক্তা পাঠিয়ে দিলেন।

এই কাহিনী শেষ করে শ্রীকৃষ্ণ সেই পূর্বের ব্রজলীলার কথা স্মরণ করে সত্যভামার সম্মুখেই ক্রন্দন করতে থাকেন—

"হায়, যিনি আমার বুকের চাঁপাফুলের মালার মত, যিনি আমার নয়নকমলকে সুধাসিক্ত করেন, যাঁর সর্বাঙ্গের শ্রী আমার একমাত্র বিলাসের স্থান, যিনি আমার অভিলষিত সম্পত্তিস্বরূপা, যিনি আমার প্রাণের আশ্রয়লতা এবং জীবনের ঔষধ স্বরূপ, হায় আমি কতদিনে সেই শ্রীরাধাকে পাবো।" শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রীতিমধুরিমা স্মরণ করে বিলাপ করছেন দেখে সত্যভামা নিজের বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে তাঁকে বীজন করতে লাগলেন এবং গোকুলে কৃষ্ণের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। নির্দিষ্ট শুভদিনে পৌর্ণমাসী, উদ্ধব ও রোহিণীর সঙ্গে তিনি মধুমঙ্গলকে নিয়ে দ্রুতগামী নন্দীঘোষ রথে আরোহণ করে গোকুলের কাছাকাছি

আসার পর গোপবেশ ধারণ করে ব্রজপুরে প্রবেশ করলেন। লক্ষ্মণা, সমঞ্জসার মুখে এই আখ্যান শুনে ব্রজে গিয়ে শ্রীরাধার সখীত্ব করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

আদি রসাত্মক রঙ্গরহস্য ও আবেগ এই চম্পূকাব্যের প্রধান অংশ অধিকার করে আছে। রূপ গোস্বামী সৃষ্ট কৃষ্ণকথার নবতর চরিত্রগুলি এখানেও উপস্থিত। সর্বোপরি গোপীপ্রেমের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্বই অপূর্ব কলানৈপুণ্য ও রসানুভূতির উৎসারে কাব্য রূপ লাভ করেছে।

রঘুনাথের দানকেলি চিন্তামণি শ্রীরূপের দানকেলি কৌমুদীর আদর্শেই রচিত। রাধাকৃষ্ণের দানলীলা বর্ণনা এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। নন্দমহারাজের ভ্রাতা ও মন্ত্রী উপানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুভদ্রের পত্নী কুন্দলতা এই গ্রন্থের কাহিনীটি শ্রবণ করেছেন এবং কাহিনীটি তাঁর কাছে পরিবেশন করেছেন সখী সুমুখী। বসুদেবের যজ্ঞে রাধা এবং অন্যান্য গোপিনীরা ঘৃত নিয়ে চলেছেন। আর কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতে বসে আছেন ঘাটোয়াল সেজে। রাধার গাভীরা বৃন্দাবনের বন নষ্ট করছে বলে তিনি রাধার কাছ থেকে কর দাবী করেন এবং মধুমঙ্গলকে বলেন, রাধা ও তার সখীদের কাছ থেকে কর দাবী করতে। এই কর রাধা ও তাঁর সখীদের যৌবন উপভোগের প্রার্থনা। স্বাভাবিকভাবেই গোপীরা এই ধরনের কর দিতে অস্বীকার করলে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের সখাগণ এবং রাধা ও রাধার সখীগণ প্রবল বাদবিসম্বাদ শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত নান্দীমুখী এসে উভয়ের মধ্যস্থতা করলেন। নিভৃত গিরিগুহায় রাধা ও তাঁর সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণ ও তাঁর সখারা মিলিত হলেন। কৃষ্ণ রাধার সাথে, সুবল বিশাখার সাথে, উজ্জ্বল চিত্রার সাথে, বসন্ত চম্পকলতা ও তুঙ্গবিদ্যার সাথে এবং কোকিল ললিতার সাথে মিলিত হলেন। এই কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ কর্তৃক শ্রীরাধার সখীদের উপভোগ রঘুনাথের নিজস্ব কল্পনা। এখানে শ্রীরূপের তুলনায় তাঁর স্বকীয়ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

সপ্তগ্রামের ধনীভূম্যাধিকারীর একমাত্র পুত্র রঘুনাথের সন্ন্যাসপূর্ব সংসারী জীবনের অভিজ্ঞতা এই কাব্যদুটির কৃষ্ণকথাকে প্রভাবিত করেছে। তখনকার Land Revenue Administration-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। মুক্তাচরিতে জমির মোট উৎপাদনের অর্ধাংশ কর হিসাবে দাবী করা হয়েছে। দানকেলি চিন্তামণিতে গাভীরা কৃষ্ণের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত অরণ্যাঞ্চল নষ্ট করেছে বলে রাধার কাছ থেকে বিশেষ কর দাবী করা হয়েছে। এগুলি সবই রঘুনাথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতিবাহী রূপায়ণ। কঠোর-সন্ন্যাস জীবন যাপনকারী রঘুনাথের কাব্য একাধারে শিল্পসমৃদ্ধ, বাস্তব অভিজ্ঞতাযুক্ত ও রূপ রচিত দর্শনের গাঢ় প্রসাধনে অনুলিপ্ত হয়ে কৃষ্ণকথাকে নবতর তাৎপর্য দান করেছে।

রঘুনাথ দাসের মুক্তাচরিতের জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায় একাধিক অনুবাদে। এর তিনজন অনুবাদকের নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন নারায়ণ দাস, যদুনন্দনদাস ও স্বরূপ ভূপতি।

সংস্কৃতে রচিত রঘুনাথের কিছু স্তোত্র এবং কবিতা বৈষ্ণব সমাজে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এগুলি সঙ্কলিত রয়েছে তাঁর স্তবমালা বা স্তবাবলীতে। এগুলির বিষয় হলো (১) শ্রীশচীসূনষ্টক (২) শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু (৩) মনঃশিক্ষা (৪) প্রার্থনা (৫) শ্রীগোবর্ধনাশ্রয় দশক (৬) শ্রীগোবর্ধন বাস (৭) শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক (৮) শ্রীব্রজবিলাস

স্তব (৯) বিলাপকুসুমাঞ্জলি (১০) প্রেমপুরাভিধস্তোত্র (১১) প্রার্থনা (১২) স্বনিয়মদশকঃ (১৩) শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্র (১৪) শ্রীরাধিকাস্টক (১৫) প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তবরাজ (১৬) স্বসংকল্প-প্রকাশ-স্তোত্রম্ (১৭) শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল কুসুমকেলিঃ (১৮) প্রার্থনামৃতম্ (১৯) নবাষ্টকম্ (২০) গোপালরাজস্তোত্রম্ (২১) শ্রীমদনগোপালস্তোত্রম্ (২২) শ্রীবিশাখানান্দাভিধস্তোত্রম্ প্রভৃতি। এই স্তোত্রগুলিতে রঘুনাথের অকৃত্রিম উচ্ছ্বসিত ভক্তি এবং সেই ভক্তির প্রধান অবলম্বন শ্রীরাধার মহিমা প্রকাশ পেয়েছে।

ষড় গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ ভট্ট কিছু রচনা করে যান নি। ত্যাগপূত জীবনাদর্শ ও সুললিত ভাগবত পাঠের জন্য তিনি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। কিন্তু আমাদের এই প্রসঙ্গে তিনি আলোচনার বিষয় নন।

॥ ৬ ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

ছয় গোস্বামীর নাম যিনি গ্রন্থ প্রারম্ভে সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন—সেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও কিন্তু আমাদের আলোচনায় তুল্য গুরুত্ব লাভই করেন। ষড়্-গোস্বামী বৈষ্ণব ভক্তগণের হৃদয়ে যে আসনে প্রতিষ্ঠিত—কৃষদাসেরও সেই সম্মানই প্রাপ্য। তাঁকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা বললেও ভুল হয় না। তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত সমগ্র বৈষ্ণব দর্শন সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত সুধাসার।

বৈষ্ণব সাহিত্যের যে কোনও দিক আলোচনা করতে গেলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চৈতন্যচরিতামৃতের প্রসঙ্গ বার বার এসে পড়ে। আমাদের আলোচ্য বিষয়েও এই মহাগ্রন্থের নানা প্রসঙ্গ বার বার এসে পড়েছে ও পড়বে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণকথাকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে নি বলে আমরা এই প্রসঙ্গে গ্রন্থটি আলোচনা করছি না। আমাদের এক্ষেত্রে আলোচ্য কৃষ্ণদাসের অপর কাব্য গোবিন্দলীলামৃত নামক অষ্টকালীয় লীলা বিষয়ক গ্রন্থটি।

পুরাণগুলির মধ্যে পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের কৃষ্ণলীলা বর্ণনার মধ্যে আমরা অষ্টকালীয় লীলা বা শ্রীকৃষ্ণের দৈনিক লীলার বর্ণনা পাই।[১৩৩] কৃষ্ণভক্ত নারদ শিবকে অনুরোধ করেছেন, শ্রীকৃষ্ণের দৈনিক লীলা বর্ণনা করার জন্য। এ ব্যাপারে শিব নারদকে রাধাকৃষ্ণ লীলা সহায়িকা বৃন্দার কাছে যেতে উপদেশ দিলেন। অতঃপর নারদ বৃন্দার নিকট গমন করে অষ্টকালীয় লীলা শ্রবণ করেন। এই অষ্টকালীয় লীলার কিছুটা অনুসৃতি আমরা দেখতে পাই সনাতনের বৃহদ্ ভাগবতামৃতের উত্তরখণ্ডে।[১৩৪]

কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই অষ্টকালীয় লীলাকে বৃহৎ কাব্যের পটভূমিতে স্থাপিত করে বহু চরিত্র সহযোগে একটি মহাকাব্যরূপ দিয়েছেন। বৈষ্ণব সাধক কবিদের কাছে কাব্যরচনা সাধনারই অঙ্গস্বরূপ। রাগানুগাভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ বৈষ্ণব সাধকদের শ্রেষ্ঠ সাধনা। কবি ও ভক্ত কৃষ্ণদাসের গোবিন্দলীলামৃত রচনার এটিও অন্যতম কারণ। কাব্য শেষে তিনি মধুর রসেরই জয় ঘোষণা করেছেন। বৈষ্ণব ধর্মে এই মধুর রসের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা শ্রীচৈতন্যের সাধনাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কৃষ্ণলীলাকে দুটি পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়—ব্রজলীলা ও নিত্যলীলা।

ব্রজলীলায় রয়েছে অবতার কৃষ্ণের জন্ম থেকে বৃন্দাবন ত্যাগ পর্যন্ত নানা লীলা। অন্যদিকে নিত্যলীলায় জন্ম ও শৈশব বর্ণনা নেই, অসুরবধ প্রভৃতি ঐশ্বর্য প্রকাশক লীলাও নেই, আছে কেবলমাত্র প্রভাত থেকে রাত্রিকাল পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণের নানা ব্যপদেশে মিলন। এই মিলনের কালকে আটভাগে ভাগ করা হয়েছে বলেই এর নাম অষ্টকালীয় লীলা। কালভাগ হল—(১) নিশান্ত (২) প্রাতঃ (৩) পূর্বাহ্ন (৪) মধ্যাহ্ন (৫) অপরাহ্ন (৬) সায়ম্ (৭) প্রদোষ বা নিশার প্রথম ভাগ (৮) নক্ত বা মধ্যরাত্রি। মধ্যরাত্রির মিলনের পর রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ নিয়ে নিশান্ত বা কুঞ্জভঙ্গ। এই মিলন কার্যে সহায়িকা রাধার সখীরা। রাত্রে রাধাকৃষ্ণের শয়নের পর সখীরা ছুটি পায়। ব্রজলীলা একবারের জন্য দ্বাপর যুগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু নিত্যলীলা গোলোকধামে অহরহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নিত্যলীলার নায়ক কৃষ্ণ চিরকিশোর।

রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা নিয়ে রচিত গোবিন্দলীলামৃত কাব্যটির ২৩টি সর্গ। প্রত্যেকটি সর্গের শেষে কবি শ্রীরূপ, শ্রীজীব, রঘুনাথ দাস ও রঘুনাথ ভট্টের উল্লেখ করে কাব্যরচনায় তাঁদের প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। সংক্ষেপে কাহিনীটি হল—

প্রভাতে বৃন্দার নির্দেশে রাধাকৃষ্ণকে শুকশারী জাগাল। তাঁরা কুঞ্জের বাইরে এলে সুন্দরী ও তাণ্ডবিক নামের ময়ূর ময়ূরী এবং সুরঙ্গ ও রঙ্গিণী ন্যামের ময়ূর ময়ূরী কুঞ্জদ্বারে এলো তাঁদের দেখার জন্য। শয্যাত্যাগ করার সময় রাধা ও কৃষ্ণের বস্ত্র পরিবর্তিত হয়ে গেল। সখীরা উভয়ের লীলার বিভিন্ন দ্রব্যাদি, যথা—দর্পণ, কুঙ্কুমপাত্র, তাম্বুল-পাত্র ইত্যাদি হাতে নিলেন।

প্রাতঃকালে গোভট, ভদ্রসেন, সুবল, স্তোককৃষ্ণ, অর্জুন, শ্রীদাম, উজ্জ্বল, দাম প্রভৃতি সখারা কৃষ্ণের গৃহে এলে মধুমঙ্গল কৃষ্ণকে ডেকে তুললেন। কৃষ্ণবলরামও সখাগণ সহ গোদোহনে গেলেন।

এদিকে মাতামহী মুখরা ও শাশুড়ী জটিলা শয্যাত্যাগ করে রাধাকে সূর্যপূজার আয়োজন করতে বললেন। এরপর দাসীরা রাধার প্রসাধন ও মার্জন সম্পন্ন করল। যশোদা রাধাকে কৃষ্ণের আহার্য রন্ধন করার জন্য ডেকে আনলেন। কারণ দুর্বাসা বর দিয়েছিলেন যে রাধার রন্ধন সুস্বাদু হবে এবং যে এই রন্ধন ভোজন করবে সে দীর্ঘজীবী হবে। কুন্দলতার সাথে রাধা যশোদাগৃহে এসে রোহিণীর সাথে রন্ধন করলেন। ইতিমধ্যে গোদোহন প্রত্যাগত কৃষ্ণকে ভৃত্যেরা স্নান করিয়ে দিলে তিনি বলরাম ও অন্যান্য সখাদের সঙ্গে আহারে বসলেন। আহারের পর কৃষ্ণ তাম্বুল চর্বণ করে সুন্দর শয্যায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন।

এরপর কৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে গো-পাল নিয়ে গোষ্ঠে যাত্রা করলেন, এবং সখাদের সাথে বাল্যক্রীড়া করলেন। রাধা সখী-ললিতাসহ কৃষ্ণের জ্ঞাতি সম্পর্কে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুভদ্রপত্নী কুন্দলতার সঙ্গে বনে গমন করলেন এবং সূর্যপূজার জন্য ফুল তোলা মনস্থ করলেন। এরপর কখনও দোলায় দুলে, কখনও রাধা কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করে ও পরস্পরের গাত্রে চন্দনলিপ্ত করে ক্রীড়া করতে থাকলেন। ক্লান্ত হলে তাঁরা মধুপান করে নিদ্রিত হলেন, তাঁদের সখীরাও নিদ্রিত হলেন। শ্রীরাধার বারম্বার অনুরোধে কৃষ্ণ তাঁর সখীদের সাথেও বিহার করলেন।

চতুর্দ্দশ সর্গে প্রেমতন্ময়া শ্রীরাধা কৃষ্ণ কর্তৃক আলিঙ্গিতা হয়েও নিজের প্রতিবিম্বকেই চন্দ্রাবলী ভেবে অভিমান করেছেন। শ্রীরাধার এই প্রেমবৈচিত্ত্য বর্ণনায় কৃষ্ণদাসের স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি স্ফুরিত হয়েছে। এরপর রাধাকৃষ্ণের পাশা খেলা ও জলবিহার। জলবিহারের পর ফল মূলাদি ভোজন করে রাধাকৃষ্ণ পদ্মমন্দিরে শয়ন করেছেন। নিদ্রোত্থিত রাধাকৃষ্ণ সুখদ নামক হরিৎকুঞ্জে অক্ষক্রীড়ায় বসলে অকস্মাৎ সেখানে জটিলার আগমন ঘটল। কৃষ্ণ গ্রহাচার্য-ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করলেন, এবং গ্রহাচার্য বেশী শ্রীকৃষ্ণ জটিলার অনুরোধে শ্রীরাধার হস্ত মুদ্রাদি পরীক্ষা করলেন। অতঃপর জটিলা রাধাকে নিয়ে গৃহে গমন করল।

এইভাবে মধ্যাহ্নলীলা শেষ হওয়ার পর শ্রীরাধা নিজের গৃহে গিয়ে স্নান ও বেশভূষা করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্য নানা মিষ্ট দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ গৃহে প্রত্যাগমন পথে রাধাকে দেখে তৃপ্ত হলেন। মধুমঙ্গলকে নিয়ে বলরাম ও গোপবালকগণ নানাবিধ কৌতুক করতে লাগলেন। ক্রীড়াবসানে কৃষ্ণ, গো ও গোপবালক-সহ ব্রজে প্রত্যাবর্তন করলেন। নন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন্দনের পত্নী অতুলা ও রোহিনী রন্ধন করলেন।

অতঃপর যশোদা ধনিষ্ঠাকে পাঠিয়ে শ্রীরাধার স্বহস্তনির্মিত মিষ্টান্ন শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের জন্য আনয়ন করলেন। বৃন্দা কর্তৃক প্রেরিতা মালতী সখী শ্রীরাধাকে সংকেত কুঞ্জের কথা বলে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ সখাগণসহ ভোজন করে গোদোহন করলেন। শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তবিশিষ্ট যশোদা শ্রীরাধার কাছে প্রেরণ করলে তিনি সখীগণসহ ভোজন করলেন। এরপর প্রদোষলীলা। ব্রজরাজ সভায় নৃত্যগীতের পর কৃষ্ণ শয়নগৃহে শয়ন করতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি শ্রীরাধার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য কুঞ্জে গমন করলেন।

এদিকে জ্যোৎস্নাভিসারের উপযোগী বেশ ধারণ করে বৃন্দাদেবীর কুঞ্জে শ্রীরাধা ও তাঁর সখীরা আগমন করলেন। সেখানে কৃষ্ণের সাথে রাধা ও সখীদের মিলন হল। অতঃপর নৃত্যগীতসহযোগে রাসলীলার বর্ণনা—

> হরিহরিদয়িতানাং বংশিকাকণ্ঠ গানৈ
> র্মিলিত বলয় কাঞ্চী নূপুরালীস্বনোঘঃ।
> নটনগতি বিরাজৎ পাদতালানুগামী
> নিজবর মধুরিম্না ব্যানশেহসৌজগন্তি ॥[১৩৫]

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি, প্রিয়াবর্গের কণ্ঠধ্বনির সাথে বলয়, কাঞ্চী, ও নূপুরের শব্দ মিশ্রিত হয়ে এবং নৃত্যগতিযুক্ত শোভাশীল পদতলের অনুগামী হয়ে আপনার অত্যুৎকৃষ্ট মাধুর্য নিখিল জগৎকে ব্যাপ্ত করল। রাসলীলা শেষে রাধাকৃষ্ণ ক্লান্ত হয়ে কুঞ্জের মধ্যে শয়ন করলেন। সখীরা কুঞ্জের বাইরে শয়ন করল। এইভাবে রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা শেষ হল।

এই লীলার ইঙ্গিত শ্রীরূপ গোস্বামীর কয়েকটি শ্লোকে আছে, কৃষ্ণদাসের সমকালীন কবি কর্ণপুরের শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদীতে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শ্রীকৃষ্ণভাবনমাৃতে এই অষ্টকালীয় লীলার বর্ণনা থাকলেও গোবিন্দলীলামৃতের

নিত্যলীলার সাথে পদ্মপুরাণ বর্ণিত লীলারই ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। পদ্মপুরাণে কুঞ্জমধ্যে নিদ্রিত রাধাকৃষ্ণের বর্ণনা—

নিদ্রিতৌ তিষ্ঠতস্তল্পে নিবিড়ালিঙ্গিতৌ মিথঃ।[১৩৬]

গোবিন্দলীলামৃতেও এই নিদ্রিত কৃষ্ণরাধার বর্ণনা অনুরূপ। তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের পদে বৈচিত্র্য ও মাধুর্য এইখানে—তাঁর রাধা ও কৃষ্ণ দৃঢ় আলিঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ে উভয়েই নিদ্রার ভাণ করে আছেন—

কৃষ্ণোঽপ্যনিদ্র প্রিয়য়োপগূঢ়ঃ
কান্তাপ্যনিদ্রাপ্যমুনোপগূঢ়া।[১৩৭]

পদ্মপুরাণে যা কৃষ্ণকথার বিবৃতিমাত্র, কৃষ্ণদাস কবিরাজের হাতে তা জীবন্ত কাব্য হয়ে উঠেছে।

পদ্মপুরাণে রাধাকে দুর্বাসা বর দিয়েছেন—

ত্বয়াযৎ পচ্যতে দেবি তদন্নং মদনুগ্রহাৎ।
মিষ্টং স্যাদমৃতস্পর্দ্ধি ভোক্তুরায়ুস্করংতথা।[১৩৮]

গোবিন্দলীলামৃতে আছে—

অমৃত মধুর মাস্তাং সংস্কৃতং যত্ত্বয়ান্নং
ভবতু সত্ চিরায়ুর্যস্তদন্নস্য ভোক্তা।

এই ধরণের সাদৃশ্য উভয়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য কর যায়। এই সাদৃশ্য থেকে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সন্দেহ হয়, পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের অন্তর্গত এই অষ্টকালীয় লীলা ষোড়শ শতাব্দীর কৃষ্ণকথা বৈচিত্র্যের প্রভাবজাতও হতে পারে।

কৃষ্ণলীলাকথায় কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত এই মহাকাব্যটি একটি নবতর পন্থা নির্দেশক এবং পরবর্তী পদাবলীকারদের পদ রচনার অন্যতম প্রধান অবলম্বনও বটে। এই মূল্যায়ন ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ললিতমধুর পদনির্মিতিতেও এই কাব্যে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গোলোকে অবস্থিত ব্রজধামের নিত্যলীলা তাঁর কাব্যে বৃন্দাবনের পশুপাখী, তরুলতা, স্থাবরজঙ্গম সবারই জীবন্ত অস্তিত্বে ও প্রতিক্রিয়ায় মধুর হয়ে উঠেছে।

চৈতন্য প্রভাবিত কৃষ্ণকথার প্রধান রূপকার রূপ গোস্বামীর কাব্যে ও নাটকে রাধাকৃষ্ণের সখী সহচরসহ যে ঐশ্বর্যময় জীবন-যাপন—তা যে তাঁরই পূর্বতন সামন্ত-তান্ত্রিক জীবনযাত্রার ফলশ্রুতি একথা আমরা আগেই বলেছি। অন্যান্য গোস্বামীদের রচনায়ও তার প্রভাব আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজও ব্যতিক্রম নন। তাঁর কাব্যে রাধাকৃষ্ণের স্নান ও প্রসাধন প্রভৃতি বর্ণনায় বিপুল ঐশ্বর্যের সমারোহ। কিন্তু এতো অপ্রাকৃত লীলাবিলাস, এরই মাঝখান থেকে মাঝে মাঝে বাস্তবজীবনের তুচ্ছতাও উঁকি মারে। তা আমরা লক্ষ্য করি কৃষ্ণের গোদোহন বর্ণনায়। আবার যে রাধার স্নান ও প্রসাধনে বহুসংখ্যক দাসীর প্রয়োজন হয়, যাঁর মুখপ্রক্ষালনের জল থাকে সুবর্ণভৃঙ্গারে, তাঁরই শাশুড়ী জটিলাকে গোময় দিয়ে উৎপলিকা (ঘুঁটে) নির্মাণকার্য স্বহস্তে করতে হয়। শ্রীরূপসৃষ্ট মধুমঙ্গল নামক ব্রাহ্মণ বটুকে আমরা আগেই দেখেছি। এই কাব্যেও তার ভোজন লোলুপতা ও রঙ্গরসিকতার জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। কৃষ্ণকথায় এই

সমস্ত উপাদন নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছে। কিন্তু সর্বোপরি গোস্বামীরচিত সমগ্র সাহিত্যই চৈতন্য ভাবনা ও চৈতন্য সাধনার লিখিত রূপ। কেবল চৈতন্যচরিতামৃতই নয়, কৃষ্ণদাসের গোবিন্দলীলামৃতেও আমরা তার সুস্পষ্ট আভাস পাই।

১৬শ সর্গে শুকের মুখ দিয়ে কবি বলিয়াছেন,—'সংমুখ্যাৎ শ্বপচোদ্বিজোহস্তি বিমুখশ্চেদ্ যস্য বিপ্রহন্ত্যজো'। শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগবশতঃ চণ্ডালকেও দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ তুল্য মান্য হয়, আর ব্রাহ্মণও কৃষ্ণবিমুখ হলে চণ্ডালতুল্য হয়ে থাকেন।

প্রচলিত আছে, কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন না। কৃষ্ণকথা নিয়ে কাব্যরচনা করার সময় হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালকে ভক্তিহীন দ্বিজের ওপরে স্থান দিয়ে কবি চৈতন্য-চেতনার সারাৎসারকে যেমন প্রকাশ করেছেন—তেমনি আত্মানুসঙ্গও কোনভাবে কাজ করেছে কিনা কেজানে? পরবর্তীকালীন কৃষ্ণকথাকোবিদ্‌গণ ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, অধিকারী, অনধিকারীর ভেদ ঘুচিয়ে লীলা বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়ে কবিরাজ গোস্বামীর মর্মকথাকেই যেন মূর্ত করে তুলেছিলেন। যেমন, বলরাম দাস (কৃষ্ণলীলামৃত), রামপ্রসাদ রায় (কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু) প্রভৃতি। দ্বিজ হয়েও বংশীদাস তাঁর কাব্যে (শ্রীকৃষ্ণকেলি—চরিতামৃত) শ্লোকটিকে নিম্নলিখিতভাবে গ্রহণ করেছিলেন—

> কৃষ্ণ নাহি ভজে দ্বিজ অবৈষ্ণব হয়।
> চণ্ডাল অধিক সেই জানিহ নিশ্চয়।[১৩৯]

এইভাবে পরবর্তীকালের কৃষ্ণকথা-সাহিত্যসমূহে কৃষ্ণদাস রচিত গোবিন্দ লীলামৃতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিশ্লেষণ মুখে আমরা লক্ষ্য করবো।

॥ উল্লেখ পঞ্জী ॥

১. চৈতন্যচরিতামৃত; ২,১৯,৬-৮

২. তদেব, ৩।৪

৩. India Offiec Catalogue; Vol. VII PP 422-23

৪. বৃহদ্ভাগবতামৃত, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক-১১৪

৫. বৃহদ্ভাগবতামৃত, ১ম খণ্ড, ৭ম অধ্যায়, ২১-২৩ শ্লোক

৬. তদেব, ২য় খণ্ড, ১ম অধ্যায়, ১১৩-১১৪ শ্লোক

৭. বৃহদ্ভাগবতামৃত, ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, ৫১ শ্লোক

৮. বৃহদ্ভাগবতামৃত, ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়ে, শ্লোক ১৭৩-১৭৪

৯. 'শ্রীদাম সুদাম দাম' ইত্যাদি

১০. বৃহদ্ভাগবতামৃত, ১ম খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক ৭৫

১১. ভাগবত, ১০/৮/৪২, ১০/৯/১২

১২. তদেব, ১০ম স্কন্ধ, ১/২৩, ২১/৩, ২৯/১, ২৯/৩৬,৩০/২৮, ৩২/৮,৩৩/১৩, ৩৪/২৫, ৩৬/১০, ৪৭/১, ৪৭/১২।

১৩. তদেব, ১০/৩১/৪

১৪. চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যখণ্ড ১৯/১

১৫. শ্রীমদ্ভাগবত, ১০/৪৬/৩

১৬. উদ্ধবসন্দেশ, পুরীদাস মহাশয় সম্পাদিত, ১ম শ্লোক।

১৭. শ্রীগোবিন্দলীলামৃতং, ১ম সর্গ, শ্লোকসংখ্যা ৩৮

১৮. দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়।

১৯. স্তবমালা; নন্দোৎসবাদিচরিতম্, শ্লোক-৩

২০. তদেব, কালীয়দমনম্, শ্লোক-১১

২১. তদেব; বস্ত্রহরণম্, শ্লোক-২৩; ৬ষ্ঠ পংক্তি

২২. গৃহং সখি করালিকে প্রবিশতিস্ম নীলঃ শিশু
দ্র্টীকুরু কবাটিকাং দধিহবং দধাম্যদ্ধুরম্।
ইতি প্রবটমীরিতে মুখরয়া মহাসঙ্কটং
বিলোক্য তনুকঙ্কটীকৃততমা হরিঃ পাতু বঃ॥

২৩. চৈতন্যচরিতামৃত, ৩/১/৩৪-৭২

২৪. বিদগ্ধমাধব, ১/২৪

২৫. বিশ্বকোষ, ষোড়শ খণ্ড, পৃ. ৬৯১

২৬. গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১১

২৭. বিদগ্ধমাধব, ৩য় অঙ্ক, সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

২৮. উজ্জ্বলনীলমণি, হরিপ্রিয়া প্রকরণ-১৪ ।

২৯. রাধাকৃষ্ণের পাশাখেলা, ক. বি. পুথি সংখ্যা ৬২৩৪। রাইরাজার কাহিনী নিয়ে লেখা বংশীদাসের কাব্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পুথি সংখ্যা-৯৫০

রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা, পুঃ সঃ-১৪৫৬
দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুভাষিত রত্নকোষ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত।

৩১. কাব্যপ্রকাশ ১/৪, সাহিত্যদর্পণ ১/১০, পদাবলী ৬/৬৮

চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ।

উজ্জ্বলনীলমণি; নায়িকাভেদ-প্রকরণ; শ্লোক-১৩/১৪

বিদ্যাপতির পদাবলী; মিত্রমজুমদার সংস্করণ; পদসংখ্যা-৫৯

৩৫. উজ্জ্বলনীলমণি; নায়িকাভেদ-প্রকরণ; শ্লোক-২৩,২৪

বৈষ্ণব পদাবলী; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়; পৃঃ-৬১৫

উজ্জ্বলনীলমণি; নায়িকাভেদ-প্রকরণ; শ্লোক-৪১

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, বিমানবিহারী মজুদার সম্পাদিত; পদ-সংখ্যা-২৯৬

উজ্জ্বলনীলমণি; নায়িকাভেদ প্রকরণ; শ্লোক-৬৯

তদেব; শ্লোক-৭৩

৪১. শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্; ষষ্ঠ সর্গ, গীতসংখ্যা-১২

৪২. উজ্জ্বলনীলমণি; নায়িকাভেদ; শ্লোক-৭৬/৭৭

৪৩. গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ; বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত, পদ-সংখ্যা-৪০৯

৪৪. উজ্জ্বলনীলমণি; নায়িকাভেদ প্রকরণ; শ্লোক-৮৩
৪৫. বৈষ্ণব পদাবলী; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়; পৃ.-৯৮
৪৬. উজ্জ্বলনীলমণি; নায়িকাভেদ প্রকারণ; শ্লোক-৮০
৪৭. বৈষ্ণব পদাবলী; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়; পৃ.-৯৮
৪৮. উজ্জ্বলনীলমণি; নায়িকাভেদ প্রকারণ; শ্লোক-৮০
৪৯. বৈষ্ণব পদাবলী; পৃ.-৬৪১
৫০. উজ্জ্বলনীলমণি; নায়িকাভেদ; শ্লোক-৮৭
৫১. বিদ্যাপতির পদাবলী; মিত্রমজুমদার সংস্করণ; পদসংখ্যা- ৭২৬
৫২. উজ্জ্বলনীলমণি; নায়িকাভেদ-প্রকারণ; শ্লোক সংখ্যা-৯০
বৈষ্ণব পদাবলী; পৃ.-৬৬৯
চৈতন্যচরিতামৃত; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত; মধ্যলীলা; অষ্টম পরিচ্ছেদ; পৃ.-২২১
৫৫. তদেব।
৫৬. স্থায়িভাব-প্রকরণ; শ্লোক-৮৭
৫৭. তদেব; শ্লোক সংখ্যা-১৩৪
৫৮. তদেব; শ্লোক-১৪২
৫৯. তদেব; শ্লোক-১৪৪
৬০. তদেব; শ্লোক-১৬৪
৬১. গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ; বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত; পদসংখ্যা- ৬৪৩
৬২. শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্য; শ্রীশুকদেব সিংহ; পৃ:-২৭০ থেকে পুনরুদ্ধৃত।
৬৩. গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ; বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, পদ সংখ্যা-৫২৭
৬৪. উজ্জ্বলনীলমণি; স্থায়িভাব-প্রকরণ; শ্লোক-১৭০
৬৫. রসবিলাসবল্লী; পৃ.-৪২
৬৬. উজ্জ্বলনীলনণি; স্থায়িভাব-প্রকরণ; শ্লোক-১৭২
গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ; পদসংখ্যা-৬৭৮
৬৮. উজ্জ্বলনীলমণি; স্থায়িভাব-প্রকরণ; শ্লোক-১৭৩
৬৯. গোবিন্দদাসের পদাবলী; পদসংখ্যা-৬৬৯
৭০. শ্রীশ্রী রসকলিকা; হরিদাস দাস; পৃ.-১১৬
৭১. জ্ঞানদাসের পদাবলী; বিমানবিহারী মজুমদাব সম্পাদিত; পদসংখ্যা-৪৪৭
৭২. রসবিলাসবল্লী; পৃ.-৪৫
৭৩. উজ্জ্বলনীলমণি; স্থায়িভাব-প্রকরণ; শ্লোক-১৮৩
৭৪. তদেব, শ্লোক-১৮৮
৭৫. রসবিলাসবল্লী; পৃ.-৪৭
৭৬. উজ্জ্বলনীলমণি; স্থায়িভাব-প্রকরণ শ্লোক-১৯০
৭৭. তদেব; শ্লোক-১৯২
৭৮. তদেব; শ্লোক-২০০
৭৯. রসবিলাসবল্লী; পৃ.-৫০-৫১
৮০. স্থায়িভাব প্রকরণ; শ্লোক-২০২
৮১. শ্রীমদ্ভাগবত; ১০/২১/১৭
৮২. রসবিলাসবল্লী; পৃ:-৫২
৮৩. উজ্জ্বলনীলমণি; শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণ; শ্লোক-১/২
৮৪. রসার্ণবসুধাকর, ২/১৭২
৮৫. উজ্জ্বলনীলমণি; শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণ; শ্লোক-৫
৮৬. তদেব; শ্লোক-১৬/১৭
৮৭. তদেব; শ্লোক-২২
৮৮. বিদ্যাপতি পদাবলী; পদসংখ্যা-৩৪
৮৯. উজ্জ্বলনীলমণি; শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণ; শ্লোক-১৫
৯০. চণ্ডীদাসের পদাবলী; বিমানবিহার মজুমদার সম্পাদিত; পদসংখ্যা-১২৪
৯১. বিদ্যাপতি পদাবলী; পদসংখ্যা-১৭৯।
৯২. উজ্জ্বলনীলমণি; শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণ; শ্লোক ১৫
৯৩. উজ্জ্বলনীলমণি; শৃঙ্গার ভেদ-প্রকরণ।
৯৪. জ্ঞানদাসের পদাবলী; পদসংখ্যা-৪৪৩
৯৫. উজ্জ্বলনীলমণি; শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণ; শ্লোক-৩৮
৯৬. গীত চন্দ্রোদয়; পৃ.-১২১

৯৭. উজ্জ্বলনীলমণি ; শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণ ; শ্লোক ৪২/৪৩
৯৮. রসবিলাসবল্লী ; পৃ.-৬৬/৬৭
৯৯. উজ্জ্বলনীলমণি ; শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণ ; শ্লোক ৬৮-৭০
১০০ পদকল্পতরু ; পদসংখ্যা-৫৬৫
১০১. উজ্জ্বলনীলমণি ; শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ ; শ্লোক-৭৪
১০২. গোবিন্দদাসের পদাবলী ; পদসংখ্যা-৪৭৪
১০৩. তদেব ; পদসংখ্যা-৪৭২
১০৪. পদকল্পতরু ; পদসংখ্যা-৫৯৫
১০৫. রসবিলাসবল্লী ; পৃ.-৭৯
১০৬. উজ্জ্বলনীলমণি ; শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণ ; শ্লোক-১৩৪
১০৭. গোবিন্দদাসের পদাবলী ; পদসংখ্যা-৬০৪
১০৮. উজ্জ্বলনীলমণি ; শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ ; শ্লোক-১৩৯
১০৯. তদেব ; শ্লোক-১৪২
১১০. তদেব ; শ্লোক-১৫১
১১১. তদেব ; শ্লোক-১৫৩
১১২. পদকল্পতরু ; পদসংখ্যা-১৮৮৯
১১৩. উজ্জ্বলনীলমণি ; শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণ সম্ভোগ ; শ্লোক-১
১১৪. চৈতন্যচরিতামৃত ; ২/২
১১৫. পদকল্পতরু ; পদসংখ্যা-২৬৮৫
১১৬. উজ্জ্বলনীলমণি ; শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণ : সম্ভোগ ; শ্লোক-১৭
১১৭. শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা ; শ্রীল শ্রীপাদ রূপগোস্বামিণা বিরচিতা ; দ্বিতীয় সংস্করণ ; পৃ.-৯২
১১৮. ঐ ; পৃ.-৯৩
১১৯. ঐ ; পৃ.-৯৪
১২০. ঐ ; পৃ.-১১২
১২১. ঐ ; পৃ.-১২৪
১২২. বৈষ্ণব পদাবলী ; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ; পৃঃ-৫৩৩
১২৩. গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ ; পৃঃ-৫
১২৪. ঐ ; পৃ.-৩৮
১২৫. ঐ ; পৃ.-২৫
১২৬. ঐ ; পৃ.-১৬৩
১২৭. গোপালচম্পূ, পূর্বচম্পূ, III, ৬৮/৭৬
১২৮. বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চম অংশ, ১০ম অধ্যায়, ২৬-৩৩ সংখ্যক শ্লোক
১২৯. ভাগবত, ১০/২৪/২৪
১৩০. তদেব, ১০/৯/১২-১৪
১৩১. গোপালচম্পূ, উত্তরচম্পূ, দ্বাদশ অধ্যায়, ৩৬-৪০ শ্লোক
১৩২. ভাগবত, দশম স্কন্ধ, ৩৪-৩৫ শ্লোক
১৩৩. পদ্মপুরাণম, পাতালখণ্ডম, দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪১৭
১৩৪. বৃহদ্ভাগবতামৃত, উত্তরখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়,
১৩৫. গোবিন্দলীলামৃত, দ্বাবিংশ সর্গ, ৭৬ শ্লোক।
১৩৬. পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় ; শ্লোক-২০
১৩৭. শ্রী গোবিন্দ লীলামৃতং, ১ম সর্গঃ, শ্লোক-৩৮
১৩৮. পদ্মপুরাণম, পাতালখণ্ড, দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়, ৩২ শ্লোক, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত
১৩৯. সাহিত্য পরিষদ, পুথি সংখ্যা-১২৮৭

পঞ্চম অধ্যায়

ষোড়শ শতাব্দী

॥ ১ ॥

ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলীতে কৃষ্ণকথা

শ্রীচৈতন্যের সহচর কবিবৃন্দ—(১) নরহরি সরকার—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের প্রিয়-পরিকরদের মধ্যে নরহরি সরকার ছিলেন অন্যতম। তিনি চৈতন্যদেবের জন্মের চার-পাঁচ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নরনারায়ণ, মাতা গোয়ী দেবী এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা মুকুন্দ। নরহরি সরকার নবদ্বীপে টোলে পড়ার সময় চৈতন্যদেবের সঙ্গে পরিচিত হন। চৈতন্যের প্রিয় সহচর গদাধরও এঁর বন্ধু ছিলেন। নরহরি যে শ্রীখন্ড সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—এ উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃতে রয়েছে।[১] বৈষ্ণবদের মধ্যে সুপরিচিত এই শ্রীখণ্ড সম্প্রদায় গোপালমন্ত্রের পরিবর্তে গৌরমন্ত্রে শিষ্যদের দীক্ষা দিতেন। চৈতন্যের নাগরভাব-বৈশিষ্ট্যও এঁদেরই সৃষ্টি। নরহরিও গৌরাঙ্গলীলা-বিষয়ক পদরচনাতেই অধিকতর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে রাধাকৃষ্ণলীলা নিয়েও তিনি কিছু পদ রচনা করেছেন বলে অনুমান করা হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৫ সংখ্যক পুঁথিতে নরহরির একটি পদের সন্ধান পাওয়া যায়।[২] পদটি খণ্ডিতা নায়িকা রাধার উক্তি। যারা কৃষ্ণকে ভালবাসে (শ্যামধন যার হিয়ায় জাগে) তাদের সাবধান করে দিয়ে রাধা বলেছেন—কেউ যদি প্রেম করতে চায়, তাহলে সুজন কুজন বুঝে যেন প্রেম করে। কারণ কৃষ্ণের প্রেম, বিষে ভরা সোনার কলস। অথচ তার মুখটি দুগ্ধ পূর্ণ। বিচার না করে যদি কেউ পান করে—তাহলে পরিণামে তাকে দুঃখ পেতে হবে। নরহরির আর একটি পদ, সাহিত্য পরিষদের ৯৬৮ সংখ্যক পুঁথিতে পাওয়া যায়।[৩] পদটি আক্ষেপানুরাগের। এখানে রাধার আক্ষেপ বিধাতার প্রতি উচ্চারিত। বিধাতার এমনই বিধান যে পৃথিবীতে কৃষ্ণকে নিয়ে বসার মত একটু নিভৃত স্থান, একটি নিভৃত রজনীও রাধার ভাগ্যে জোটে না। নরহরির রাধা শেষ পর্যন্ত বিধাতাকে বেরসিক বলে তিরস্কার করেছেন। কারণ—

বিধি যদি রসের রসিক হত্য।
এসব কখন করিতে দিত ॥

পদকল্পতরুতে নরহরির ভণিতায় ৩৬ টি পদ রয়েছে। তার মধ্যে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ ছ'টি। পাঁচটি ঝুলনের ও একটি খণ্ডিতার। সতীশ চন্দ্র রায় এগুলিকে নরহরি চক্রবর্ত্তীর রচনা বলেই মনে করেন। গৌরপদ তরঙ্গিনীতে নরহরির ভনিতায় পাওয়া যায় ৩৮২টি পদ। কিন্তু এগুলির মধ্যে কোন কোনটি যে নরহরি সরকারের রচনা তা নিশ্চিতভাবে নিরূপিত নয়। কারণ পরবর্তী কালের কবি 'ভক্তি রত্নাকর' রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তীর পদের সঙ্গে সরকার ঠাকুর রচিত পদ মিশে গেছে। আমাদের ধারণা, নরহরি সরকার কৃষ্ণ কথা নিয়ে অতি অল্পই পদ লিখেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গকেই তিনি শ্রীকৃষ্ণ মনে করে গৌরনাগরী ভাবের উপাসনা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন। অতএব নিছক কৃষ্ণকথা নিয়ে তাঁর কাব্যরচনার তেমন প্রয়োজন নাও হতে পারে।

পদামৃতসমুদ্রের ৪২৭ পৃষ্ঠায় নরহরির একটি আক্ষেপানুরাগের পদ সংকলিত হয়েছে। এইপদে কৃষ্ণ প্রেমে ব্যাকুলা রাধা কাতরভাবে সখীকে বলেছেন—'নিরবধি প্রাণ মোর কাহ্নু লাগি ঝুরে'। রাধার মতে, প্রেমের এই রস যে জানে না—সে ভালই আছে। কারণ রাধার হৃদয়ে কানুর প্রেম যেন শেলের মত বিঁধে আছে। শ্যাম অনুরাগে রাধার চিত্ত আর কোনমতে ধৈর্য্য মানছে না।

কিন্তু এই পদটিও যে নরহরির কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। কারণ পদামৃত সমুদ্রে কিংবা সাহিত্য পরিষদের ৯৮২ সংখক পুঁথিতে পদটি নরহরির ভণিতায় পাওয়া গেলেও কীর্ত্তনানন্দে পদটির ভণিতা চণ্ডীদাসের। আবার শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পদটিকে কোথাও দেখেছেন বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায়, কোথাও চণ্ডীদাসের ভণিতায়, আবার কোথাও জ্ঞানদাস ঠাকুরের ভণিতায়।

পদকল্পতরুর ৮৩৩ সংখ্যক বাসকসজ্জিকার পদটি নরহরি সরকারের। এই পদে কৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষমানা বসাকসজ্জিকা রাধা নারীর যৌবনকে ধিক্কার দিয়েছেন। কারণ তিনি প্রেম করেছেন শঠ ব্যক্তির সঙ্গে। রাধা এই বলে দুঃখ করেছেন, যার জন্য তাঁর প্রাণ সর্বদাই পীড়িত হয়—সে কিন্তু তাঁর দিকে ফিরেও তাকায় না। নিজেই নিজের প্রেম বাড়িয়ে তিনি পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল, উভয়কুলেই কলঙ্কলেপন করলেন।

নরহরির আর একটি পদ মাথুর পর্যায়ের। বিরহিণী রাধার করুণ অবস্থার কথা শুনে রসিকশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ গদগদভাবে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তিনি নিজের গৃহ ত্যাগ করে রাধার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য চললেন। যেতে যেতে বার বার কৃষ্ণ তাঁর নাসা স্পর্শ করতে লাগলেন, দ্রুতবেগে যাওয়ার জন্য তাঁর নাক দিয়ে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। তিনি চরণের মণিনুপুরের কথা ভুলে গেলেন। তাঁর অলঙ্কার খুলে পড়তে লাগল, মাথার চূড়াও খুলে যেতে লাগল। গভীর রাত্রে রাধার গৃহে চন্দনের গন্ধে দশদিক আমোদিত হল। এবং—

লালস দরশ পরশে দুহুঁ আকুল
চিরদিনে মিলল কুঞ্জে ॥

কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রসাধন ও গৃহকর্ম অসমাপ্ত রেখে ভাগবতের গোপিনীরা পথে বেরিয়েছেন। কিন্তু চৈতন্য সমসাময়িক এই কবির পদে কৃষ্ণই বিপর্যস্ত ব্যাকুলতায় রাধার জন্য পথে নেমেছেন।

(২) মুরারি গুপ্ত

মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং তাঁর সহপাঠী ছিলেন। শ্রীহট্টের বৈদ্যবংশ-সম্ভূত মুরারি ধর্মমতে রামোপাসক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় শ্রীচৈতন্যের জীবনী ইনিই প্রথম রচনা করেন এবং এঁর রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃতম্' মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামেও পরিচিত। এটি চৈতন্যজীবনীর কেবল আদি গ্রন্থ-ই নয়—আকর গ্রন্থও বটে।

এই কবির রচিত অল্প কিছু রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদও পাওয়া যায়। বিশেষতঃ তাঁর আক্ষেপানুরাগের একটি পদ[৪] অবিস্মরণীয়। কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী রাধা ঘরের

বাইরে পা বাড়িয়েছেন কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। সখী এসেছেন তাঁকে ফেরাতে। কিন্তু রাধা তাকে বললেন তিনি আর ঘরে ফিরবেন না। তাঁকে ফিরে যাওয়ার যুক্তি দেওয়া বৃথা। প্রেম করে তিনি যেন সব বিসর্জন দিয়েছেন, এমনকি নিজের অহংবোধকেও পরিত্যাগ করেছেন। কৃষ্ণের মোহনরূপ তাঁর নয়নের পুতুল, তাঁর হৃদয়ের মাঝখানে সযত্নে রাখা প্রাণ। আর রাধা তাঁর প্রেমের আগুনে জাতি, কুল, শীল এবং অভিমান সব পুড়িয়ে ফেলেছেন। যারা মূঢ়, জীবনে যারা প্রেমের আস্বাদ পায় নি, তারা নানা কথা বলে, কিন্তু রাধা তাদের কথা কানেও তোলেন না। 'স্রোত বিথার' প্রেমের নদীতে রাধা তাঁর শরীর ভাসিয়েছেন, সুতরাং 'কি করিবে কুলের কুকুরে ?' কবি মুরারি গুপ্ত পদের শেষে এই অনন্য সাধারণ প্রেম সম্পর্কে জোর দিয়ে বলেছেন—

'পিরিতি এমতি হৈলে
তার গুণ তিনলোকে গায়'।

মুরারি গুপ্তের রাধা চণ্ডীদাসের রাধার মতই 'জাতিকুল শীল অভিমান' বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা যেখানে লোকগঞ্জনার দায় এড়ানোর জন্য মৃত্যুবরণ করতে চান, সেখানে মুরারিগুপ্তের রাধা কুলাচার ও লোকাচারকে দৃপ্তভাবে তুচ্ছ করেছেন। জীবনেই মৃত্যুকে আহ্বান করে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছেন এবং তাঁর প্রেমের অনির্বাণ দীপশিখাকে কালজয়ী করে তুলেছেন।

শ্রীরাধার মান পর্যায়ে রচিত মুরারি গুপ্তের একটি পদে দুর্জয় মানবতী রাধার মানভাঙ্গানোর জন্য কৃষ্ণ নানাভাবে কাকুতিমিনতি করেছেন। কৃষ্ণ বলছেন সূর্যকিরণে অংকুর শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর জলদান করলে তা যেমন ফলপ্রসূ হয় না, তেমনি রাধার বিমুখতার দুঃখে যদি কৃষ্ণের প্রাণই চলে যায়, তাহলে পরে আর রাধাপ্রেমরূপ ঔষধ কার্যকরী হবে না। সুতরাং রাধা যেন মানভঙ্গ করে মৃদু মৃদু সম্ভাষণে কৃষ্ণের প্রাণ বাঁচান। কিন্তু এত অনুরোধের পরও রাধাকে নীরব দেখে অবশেষে কৃষ্ণ বলছেন রাধা যেন নিজগুণে কৃষ্ণের দোষকে ক্ষমা করে হৃদয়ের ক্রোধ সম্বরণ করেন—

নিজগুণ হেরি পরকো দোখ পরিহরি
তেজহ হৃদয়ক রোখ (১৫০) *

মাথুর পর্যায়ে মুরারি গুপ্তের আর একটি পদ পাওয়া যায়। রাধার সখী শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে রাধার অবস্থা বর্ণনা করে তাঁকে তিরস্কার করেছেন। সখী বলেছেন কৃষ্ণ রাধাকে জীবন্মৃত অবস্থায় রেখে এসেছেন, এখন তিনি বাঁচবেন কিনা; সে ব্যাপারেই সংশয় দেখা দিয়েছে। মীন জল ছাড়া বাঁচাতে পারে না। কৃষ্ণপ্রেমও রাধার জীবন দায়ী জল। তারই অভাবে রাধা মৃতপ্রায়। এক বিন্দু ঘৃত দিয়ে সারারাত দীপ জেবলে রাখা যায় না। তার ওপর আবার কৃষ্ণের বিরহ-বাতাসে হয়তো সে প্রদীপ নিভেও যেতে পারে। তাই সখীর অনুরোধ—'ঝাট আসি রাখহ পরাণে।' (১৪৯) ব্রজবুলি ভাষায় রচিত এই দুটি পদেও কবির কৃতিত্বের পরিচয় রয়েছে। মানিনী রাধা ও বিরহিণী রাধা উভয়েই তাঁর পদে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

---

* অতঃপর অন্য কোন উল্লেখ ছাড়া প্রথম বন্ধনীভুক্ত সংখ্যা অর্থে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী'-র (সংশোধিত সংস্করণ—১৯৮০) পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে।

(৩) গোবিন্দ, মাধব ও বাসু ঘোষ

গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, ও বাসু ঘোষ—এই তিন ভ্রাতাই মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী এবং তাঁর কৃপাধন্য। এঁরা তিনজনেই ছিলেন কীর্ত্তনিয়া ও কবি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, মহাপ্রভু এঁদের কীর্ত্তন শুনে নৃত্য করতেন।[৫] তিনজনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ ঘোষের কোন কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

মাধব ঘোষ—পদকল্পতরুতে মাধব ঘোষের রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক তিনটি পদ আছে (পদ সংখ্যা ৬৬০, ১৫৩৯, ১৯২৮)-এই তিনটির মধ্যে একটি হল শ্রীকৃষ্ণের স্নানযাত্রার পদ। গ্রীষ্মের দারুণ উত্তাপও মাতা যশোমতীর আনন্দ বাড়িয়ে তুলেছে। কারণ এখন তিনি মনের আনন্দে শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাতে পারবেন। যশোমতীর জননী-হৃদয়ের স্নেহ, তারই সঙ্গে সম্পন্ন গোপগৃহের সন্তানের জন্য স্নানের আয়োজন যেন একেবারে চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে বলেই মনে হয়। মাধব ঘোষের এই চিত্ররচনার কৃতিত্ব অপর একটি পদেও প্রকাশিত হয়েছে। পদটি রাধাকৃষ্ণের মিলনান্তিক রসালসের। সারারাত্রির মিলনের পর সকালবেলা রাধা এবং কৃষ্ণ যে যার গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে বার বার পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন। সেই দৃষ্টিপাতে তাঁদের অন্তরের প্রেমসমুদ্র উদ্বেল হল। চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। রাধা, কৃষ্ণের কাছে বিদায় চেয়ে আবার মিলনের আশ্বাস দিলেন। কিন্তু দুজনে দুজনকে দর্শন করে প্রেমভরে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ললিতা রাধাকে কোলে নিয়ে 'সুমুখী' সম্বোধন করে চেতনা ফেরানের চেষ্টা করলেন এবং সহচরীও 'কানু' 'কানু' বলে ডাকতে লাগলেন। প্রেমাভিভূত রাধাকৃষ্ণের সূর্য্য উঠে পড়ার ভয়, লোকনিন্দার ভয় কোথায় চলে গেল।

মাথুরের পদে, দূতী মাধবের কাছে গিয়ে দশমী দশায় উপনীতা বিরহাতুরা রাধার করুণ বর্ণনা দিয়েছেন। রাধা এত ক্ষীণ হয়ে গেছেন যে ওঠার চেষ্টা করে উঠতে না পেরে তিনি কাতর হয়ে সখীর মুখের দিকে তাকান। আবার কখনও কৃষ্ণের মুখ মনে করে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেন। রাধা মথুরাগামী পথিকের চরণ ধরে ক্রন্দন করতে থাকেন। এখন কোনমতে রাধার শ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে। তাই দূতী কৃষ্ণকে সকাতরে অনুরোধ করছেন—

এক বেরি বিরহ বেয়াধি নিবারহ
এ দুহু পদ দরশাই ॥ ৪২৭

পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে[৬] 'উলসিত মঝু হিয়া আজু আয়ব পিয়া' পদটি মাধব ঘোষের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পদটি ভাবোল্লাসের। বিরহিনী রাধার চিত্ত উল্লাসে আকুল হয়ে উঠেছে কৃষ্ণের আগমনের কথা ভেবে। তিনি সখীকে সম্বোধন করে বলছেন—

সবহু বিপদ দূরে গেল।
সুখ সম্পদ যত সব ভেল অনুগত
সো পিয়া অনুকূল ভেল

বর্তমানের দুঃসহ দুঃখের পটভূমিকায় ভবিষ্যতের সুখের জন্য রাধার এই আশা বড় করুণভাবে বেজে ওঠে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পুঁথিতে[৭] মাধব ঘোষের ফাগুখেলার একটি পদ রয়েছে। রাধা এবং কৃষ্ণ দোলের দিন সখীদের সঙ্গে রঙ খেলছেন এবং দুজনে একসাথে দোলনায় দুলছেন—এইটুকুই হল এর কথাবস্তু। তবে পদটির ধ্বনি-মাধুর্যে দোললীলার উল্লাস-উতরোল আনন্দময় বর্ণবিভোর পরিবেশটিও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বাসুদেব ঘোষ—বাসুদেব ঘোষ ছিলেন মহাপ্রভুর মুখ্য কীর্তনিয়া বা প্রধান গায়েন। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদকর্তা হিসেবেও তিনি তিন ভ্রাতার মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণলীলা নিয়েও কয়েকটি পদ ইনি রচনা করেছেন। আক্ষেপানুরাগের একটি পদে[৮] তিনি রাধার প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। রাধা বলছেন না জেনে শুনে কৃষ্ণের সাথে প্রেম বাড়িয়ে এখন আষাঢ় শ্রাবণ মাসের মেঘবর্ষণের মত তাঁর চোখ দিয়ে অনর্গল জল পড়ছে। পাকানো পাটের দড়ি আগুনে পুড়ে গেলে তার বাইরের আকার ঠিক থাকে, আর ছুঁয়ে দিলেই ঝরে যায়। আজ মনের আগুনে পুড়ে রাধাও সেই অবস্থাতেই রয়েছেন। এঁদো পুকুরে মাছ নিঃশ্বাস নিতে জায়গা পায় না—তেমনি করে কৃষ্ণহীন বৃন্দাবনও রাধার জীবন ধারণের পক্ষে দুঃসহ। কৃষ্ণের প্রেম যেন ডাকাতের প্রেম। সবলে সমস্ত লুণ্ঠন করে নিয়ে রাধাকে নিঃস্ব রিক্ত করে ফেলে গেছে। পদটি অনুভূতির আন্তরিকতায় উজ্জ্বল। অনুভূতির অকৃত্রিম উত্তাপকে রূপ দিতে গ্রামজীবনের কতগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কবি অলংকার ও চিত্রকল্প নির্মিতিতে কাজে লাগিয়েছেন। পাকানো পাটের দড়ি, এঁদো পুকুরের মাছ আর ডাকাতিয়া পীরিতি কবির বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা সঞ্জাত রূপনির্মিতি।

বর্ষাভিসারিকা রাধার অনুভবে কৃষ্ণ-মিলনের ঔৎসুক্য বর্ণিত হয়েছে এই কবির একটি পদে।[৯] আকাশে নবীন মেঘ দেখে রাধার চিত্ত আনন্দে নেচে উঠেছে। তিনি মেঘকে সম্বোধন করে বলছেন—মেঘ যেন বর্ষণ করে, তাহলে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর মিলন হবে। বৃষ্টি যেন অল্প অল্প অথচ দীর্ঘকালস্থায়ী হয় (বরিষ মন্দ ঝিমানি)। তাহলে রাধা সুখে রাত্রিযাপন করবেন। দাদুরি দুন্দুভি বাজাবে আর ময়ূরীর সুর শোনা যাবে। এই পদটি যেন বিদ্যাপতির বিখ্যাত বিরহের পদের পরিপূরক। সেখানে রাধা প্রকৃতির উতরোল মত্ত আনন্দের মাঝখানে নিজের বিরহবেদনাকে স্থাপিত করেছেন, আর এখানে একই পরিবেশে রাধা ভাবী মিলনের আনন্দে অধীর। পদটির পরিবেশ বিদ্যাপতিরই। কিন্তু 'মন্দ ঝিমানি' বৃষ্টির জন্য রাধার বাসনা তাঁকে যেন বাংলাদেশেরই একটি মেয়ের গূঢ় আকাঙ্খার গভীরে ডুবিয়ে দিয়েছে।

দানলীলা নিয়েও বাসু ঘোষ পদ বা পালা রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করি। কিন্তু অখণ্ড পালাটি পাওয়া যায় নি। পদকল্পতরুতে এর একটিমাত্র ছিন্ন পদ (পদ-সংখ্যা ১৩৬৯) আমরা পাই। এই পদেও বাসু ঘোষ কৃষ্ণকথাকার রূপে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রাধা দাসীদের মাথায় চাপিয়ে মথুরার হাটে দধি দুগ্ধ বিক্রয় করতে চলেছেন। শ্রীরূপ ও রঘুনাথ গোস্বামীর দানকেলিকৌমুদী ও দানকেলিচিন্তামণি নামের দুটি নাটকে এই ধরণের বর্ণনা আমরা দেখেছি। কিন্তু বাসু ঘোষ যে সময়ে কাব্যরচনা করেছিলেন, তখনও বাংলাদেশে বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর পুস্তকাদি এসে পৌঁছায় নি।

বাসু ঘোষের একটি পদে রাধা, কৃষ্ণের কথা বলতে বলতে এবং কৃষ্ণের প্রেমে আকুল হয়েই পথ চলেছেন। আর তখনই সামনে কৃষ্ণকে দেখে অবাক হয়ে বলেন—

কি দেখিয়ে বড়াই কদম্বের তলে।
তড়িতে জড়িত যেন নব জলধরে॥

রাধার এই মুগ্ধতাজড়িত বিস্ময়টুকু পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এই পদগুলি ছাড়াও বাসুদেবের ভণিতায় একটি পুঁথিও পাওয়া গেছে।[১০] পুঁথিটিতে পর পর কয়েকটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম কাহিনী সুবল-সংবাদ। একদিন রাধা গৃহকর্মের শেষে যমুনায় জল আনতে গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন। বধূর ফিরতে বিলম্ব দেখে কুটিলা গেলেন অনুসন্ধানে। গিয়ে দেখলেন শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণের পাশে বসে আছেন। ফিরে এসে কুটিলা জননী জটিলার সংগে যশোদার কাছে গেলেন এবং কৃষ্ণের অপরাধ প্রমাণ করার জন্য তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যমুনার কূলে এলেন। ইতিমধ্যে সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ সুবল ও শ্রীরাধার বেশ পরিবর্তন করে অর্থাৎ সুবলকে রাধা সাজিয়ে নিজের বামে বসালেন। এরপর—

যশোদা বলেন কৃষ্ণ কেমন বেভার।
পরের বধূকে আন ইকি অবিচার॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন মাতা বল না বুঝিয়া।
আমার বামেতে সুবল আছে দাণ্ডাইয়া॥

কিন্তু তবুও কেউ মানতে চায় না। তখন—

সুবলেরে কৃষ্ণ তখন নঅন হানিল।
অঙ্গের বসন সুবল খুলিয়া পেলিল॥
যশোদা দেখিল তবে সুবল রাখালে।
হাসিয়া হাসিয়া রাণী জটিলারে বলে॥

এখানে কবির ভণিতায় রয়েছে—

রাধাকৃষ্ণ পদ ভাবি বাসুদেবে ভজে
রাধাকৃষ্ণ উপাখ্যান শুন সর্বজনে॥

দ্বিতীয় কাহিনী ননীচুরির। এই কাহিনীতে লক্ষণীয় বিষয় হল কৃষ্ণের মুখে যশোদা 'চৌদ্দ ব্রহ্মান্ড' দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলেন। পুত্রভাব ছেড়ে গন্ধমালায় তাঁকে পুজা করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু "কৃষ্ণের মায়ায় রাণী ভুলিয়া গেল। পুত্রভাবে নারায়ণে কোলেতে করিল।"

তৃতীয় কাহিনী ভানু পূজা। শ্রীরাধা সখীদের নিয়ে যমুনার কূলে মালঞ্চে ভানু-পূজায় এলেন। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে তা বুঝতে পারলেন। তিনি রাধা ও তাঁর সখীদের কাছে এসে মালঞ্চে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সখীরা বল্লেন, এটি শ্রীরাধার মালঞ্চ। কিন্তু কৃষ্ণ দাবী করলেন, মালঞ্চ তাঁর। মীমাংসার জন্য মধ্যস্থ মানা হল। মধ্যস্থ রায় দিলেন, মালঞ্চ রাধার। তখন সখীরা বল্লেন—

কেমন লম্পট তুমি এবার শিখাব আমি
গেঁড়ু চুরি নহেত এবার।

রাধার কলঙ্কভার ঘুচাইব এইবার
কাঁচলিতে গেঁড়ু নাহি আর ॥

এখানে আর এক কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এটি গেঁড়ু চুরির কাহিনী। উত্তরকালে শঙ্কর কবিচন্দ্রের কাব্যে এই গেঁড়ু চুরির প্রসঙ্গ আমরা পাই।

ভানুপূজার কাহিনীতেও এখানে একটু স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। কৃষ্ণ হাতছুট হয়ে পালিয়ে গেলেন। গোপীরা তখন পূজা আরম্ভ করল—

ভানুপূজা করে গোপী চৌদিগেতে ঘেরি।
পুষ্পদান করে রাধা বাঁকারূপ হেরি ॥
সূর্য্যের নিকটে গোপী মাগি নিল বর।
কৃষ্ণের সঙ্গেতে থাকি যুগযুগান্তর ॥

চতুর্থ কাহিনীটি মানের। মানিনী রাধার মান কোনমতেই ভাঙ্গল না। তখন কৃষ্ণ যোগী বেশে এসে রাধার মান ভিক্ষে চাইলেন। শ্রীমতী মান ভিক্ষা দিলেন—

খত লেখি কৃষ্ণ দিলেন তখন
কলি যুগে তব ধার করিব শোধন ॥
কাল অঙ্গ গোউর হব তোমার লাগিয়া।
এই ত কহিলাম রাধে বিনয় করিয়া ॥

স্পষ্টতই এখানে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এর ভণিতায় রয়েছে—

বাসুদেব ঘোষে ভণে রাধা কৃষ্ণ শ্রীচরণে
মণি কভু ফণি ছাড়িয়াছে ॥

পঞ্চম কাহিনীটি নৌকালীলার। অবশ্য পুঁথিতে লেখা রয়েছে 'দানখণ্ড'। নৌকা-লীলার কাহিনীটি গতানুগতিক, শেষ কাহিনীটি দূতীসংবাদ। মাঝখানের পৃষ্ঠা নেই। শেষ পৃষ্ঠাটি অবশ্য আছে।

দেখা যাচ্ছে, পদাবলীর মত এখানেও বাসু ঘোষের কৃষ্ণকথায় ভানুপূজা ইত্যাদি প্রসঙ্গে গোস্বামীদের প্রভাব এসে পড়েছে।

(৪) গোবিন্দ আচার্য্য

কবি কর্ণপুর গোবিন্দ আচার্য্যকে রাধাকৃষ্ণলীলার পৌর্ণমাসী বলে অভিহিত করেছেন। পৌর্ণমাসী শ্রীরূপ সৃষ্ট চরিত্র। তিনি কৃষ্ণের গুরু সন্দীপান মুনির জননী ও রাধাকৃষ্ণলীলার সহায়িকা। গোবিন্দ আচার্য্য চৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ।

গোবিন্দদাস ভণিতায় এঁর রচিত অলঙ্কারের আড়ম্বর বর্জিত সহজ সরল ভাবৈশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ কিছু পদ পাওয়া যায়। বিমান বিহারী মজুমদার তাঁর 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' গ্রন্থে এঁর ৩২-টি পদ গোবিন্দদাস কবিরাজ থেকে পৃথক করে দেখিয়েছেন। তার মধ্যে ৬ টি গৌরাঙ্গবিষয়ক ও অপর ২৬ টি রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ। এই কবির রাধা-কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদের সংখ্যা প্রচুর না হলেও বিচিত্র পর্যায়ের রাধাকৃষ্ণলীলা নিয়ে তিনি পদরচনা করেছেন। যমুনার কূলে কদমতলে কৃষ্ণকে দেখে রাধা বলেন—'এত রূপের মানুষ নাহি দেখি,'[১১] অপর একটি পদে রাধার পূর্বরাগ রূপদর্শনে শুধু নয়,

কৃষ্ণের মধুর মনোহর বাঁশীর সুর শ্রবণেও জাগ্রত হয়েছে। কৃষ্ণের বংশী ধ্বনির মাধুর্য আর তারই সাথে রূপের মনোহারিত্ব বোঝানোর জন্য রাধা বলেছেন—

গগন হইতে চাঁদ বাঁশীতে নামিয়াছে
মুখ সুধা লইবার তরে ॥ পদসংখ্যা ৭৪১)

আবার কখনও কৃষ্ণরূপমুগ্ধা রাধা যমুনার ঘাট থেকে ফিরে এসে বলেন, কৃষ্ণের রূপ তাঁর মনে সর্বদাই জাগছে। শুধু তাই নয়, 'তা বিনে সকল শূন্য লাগে'। এখন রাধা ভাবেন জাতিকুল বিদায় দিয়ে তিনি কৃষ্ণের রাঙা পায়ে শরণ নেবেন। কৃষ্ণানুরাগিনী শ্রীরাধিকার এই শরণাগতি আসলে চৈতন্যচরণে ভক্তজনের শরণাগতি। 'শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেন মে'—শ্রীচৈতন্যের এই দিব্য বিরহের স্পর্শেই যেন গোবিন্দ আচার্যের রাধার কণ্ঠে বেজে উঠেছে 'তা বিনে সকল শূন্য লাগে।'

শুধু রাধাই কৃষ্ণের প্রেমে ব্যাকুল নয়, গোবিন্দদাসের কৃষ্ণ রাধার প্রেমে ব্যাকুল হয়ে অসমাপ্ত প্রসাধনে, এমনকি বসন পরিধান করতে করতে রাধার গৃহে গিয়ে উপস্থিত হন। এই পদের অনুরূপ ভাব নরহরি সরকারের একটি পদে ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি।

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা প্রসঙ্গ নিয়ে এই কবির যে পদটি পাওয়া যায়—তাও রাধার অনুভূতিসর্বস্ব। বাৎসল্যরসের উপস্থিতি আদৌ নেই। রাধা আক্ষেপ করেছেন, শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে যাওয়ার সময় গুরুজনেরা থাকার জন্য তিনি তাঁকে আঙ্গিনায় বেরিয়ে দেখতে পেলেন না। সখীর কাছে রাধা তাই কৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রার পথ জানতে চান। অতঃপর সখীকে অনুরোধ করেন—

চল যাই সেই পথে পসরা লইঞা সাথে
যেখানে আছয়ে শ্যামরায়। (৭৪৪)

চৈতন্য পরবর্তী পদাবলীকারেরা গোষ্ঠলীলার পদে বাৎসল্যকেই মুখ্য করেছেন। জননী যশোদার স্নেহশঙ্কিত হৃদয়ের ব্যাকুলতাই সেখানে কবিদের উপজীব্য। কিন্তু এই কবির গোষ্ঠলীলার পদটিও যে মাধুর্যরস নিষিক্ত, শুধু তাই নয়—রাধার অনুভূতি-সর্বস্বতার কারণ হল শ্রীগৌরাঙ্গের প্রত্যক্ষ প্রভাব। রাধাভাবে ভাবিত প্রেমধর্মের সেই মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে সন্তানহারা শচীমাতার বেদনার অনুভূতি নয়, গোবিন্দ আচার্য্যের মত কবিদের মনে কেবল মধুর রসেরই জোয়ার জেগেছিল।

এই কবি রচিত শ্রীরাধার রসোদ্গারের একটি পদও শ্রীগৌরাঙ্গের লোকোত্তর প্রেমভক্তির অসাধারণ মাধুর্যনিষেকে স্নিগ্ধ লাবণ্য লাভ করেছে। কৃষ্ণ রাধার চুল বারবার এলোমেলো করে দিয়ে আবার বেঁধে দেন, নিজের কোলে বসিয়ে রাধার পায়ে নূপুর বেঁধে দিয়ে চরণ স্পর্শ করেন। এবং—

বিদগ্ধ শ্যাম রায় বসনে করেন বায়
আপনে যোগান গুয়া পান।

গীতগোবিন্দেও মিলনের পর রাধা কৃষ্ণকে তাঁর বেশভূষা পুনর্বিন্যস্ত করে দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে কৃষ্ণের মানসিকতা কিছুই প্রকাশ পায় নি। আর অভিসারিকা রাধা কাছে এলে তিনি তাঁর পদসংবাহন করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন।[১২] সে প্রার্থনা প্রেমিকাকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রেমিকের প্রার্থনা। কিন্তু

এই কৃষ্ণ যেন শুধু প্রেমিক নন, তাঁর সেবার মধ্যে একই সাথে প্রেম, দাস্য ও বাৎসল্যের ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছে। দেহ নয়, দেহাতীত ভাবের যে মাধুর্য এখানে সঞ্চারিত, তা চণ্ডীদাস ছাড়া চৈতন্যপূর্ব আর কোনও কবির মধ্যে পাওয়া যায় না।

এই কবির দানলীলার একটি পদ পাওয়া যায়। পদটিতে বড়াই রাজনন্দিনী রাধাকে মথুরায় পসরা নিয়ে যেতে বলেছে। বড়ায়ির কথায় রাধা মথুরায় চলল 'দানছলে ভেটিবারে তথা'। সেখানে যমুনার তীরে কদম্বতলে রাধা কৃষ্ণের মিলন হল। (৭৪০)

অপর একটি পদে (৭৪৫) বৃন্দাবনে রাধার অভিষেক প্রসঙ্গ রয়েছে। কৃষ্ণ রাধাকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর চরণের নূপুর হতে চেয়েছেন। ষড়গোস্বামীদের মধ্যে রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকে এবং জীব গোস্বামীর মাধবমহোৎসবে এই প্রসঙ্গ বর্ণিত।

রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার প্রভাতকালীন নিকুঞ্জ বিলাসের একটি পদে নিদ্রিতা রাধার যে বর্ণনা রয়েছে, তা রাধারই শ্রেষ্ঠত্বসূচক। পদটির আধ্যাত্মিকতার চেয়ে জীবন্ত স্বাভাবিকতাই আমাদের বেশী আকর্ষণ করে। এ রাধা যেন বাংলাদেশের এক বালিকা বধূ, সকাল বেলায় যাকে দেখিয়ে সখী বলে—

নিন্দ যায় ধনি চান্দ বদনি
শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা ॥

নিদ্রিতা রাধা কৃষ্ণের বাহুকেই তাঁর উপাধান করেছেন, বেশভূষা হয়েছে বিপর্যস্ত। নিঃশ্বাসের সাথে সাথে দুলে দুলে উঠছে নাকের নোলক। তৃপ্তির আনন্দে নিদ্রিত মুখটিতে মধুর হাসি ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণ জেগেছেন, কিন্তু নিশ্চিত নির্ভরতায় নিদ্রিতা রাধাকে জাগাতে তাঁর সাহস হচ্ছে না।

গোবিন্দ আচার্য্য কয়েকটি খণ্ডিতার পদ রচনা করেছেন। পদগুলিতে গতানুগতিক-ভাবে পূর্ববর্তী কবিদের খণ্ডিতা রাধারই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। কিন্তু একটি পদে (৭৪৯) গোবিন্দ আচার্য্যের রাধার ক্রোধ এত বেশী আন্তরিক, আর তার বহিঃপ্রকাশ এত অকৃত্রিম যে, রাধার সেই সারল্য আমাদের মনে নির্মল কৌতুকের স্নিগ্ধতা সঞ্চার করে। অন্য নায়িকার সাথে মিলিত হওয়ার পর কৃষ্ণ প্রভাতে রাধার কাছে এলে ক্রুদ্ধা রাধা বলেন —

যাঁহা বসি আছ তাঁহা তুলি ফেলি মাটি।
এখনি উঠিয়া গেলে দিব ছড়া ঝাঁটি ॥

এই রাধা, কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি বটে। কিন্তু তার বাইরের অবয়বটা নিতান্তই গ্রাম বাংলার এক সাধারণ পল্লীবধূর, যাকে সকালবেলা উঠে ছড়া ঝাঁট দিতে হয়।

কিন্তু রাধার এই তিরস্কারে কৃষ্ণ হেঁট মাথায় ফিরে গেলে অনুতপ্তা রাধার 'মানের কপাট' ভেঙে যায়, তিনি সখীদের ডেকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করেন। এই কবির নামে বংশী শিক্ষার যে পদটি রয়েছে তাতে দেখা যায়, কৃষ্ণ রাধাকে বাঁশী বাজানো শিখিয়ে দেওয়ার পর অনুরোধ করলেন—

'খানিক নাচহ তুমি মুরলী বাজাই।'

এরপর দুজনেই নৃত্য করতে লাগলেন। তাঁদের সেই নৃত্যে বৃন্দাবনের ময়ূর ময়ূরী নেচে উঠল। শুকসারি গান গাইতে লাগল, জয় রাধাকৃষ্ণ বলে। শুধু তাই নয়, তরুলতা ফলে ফুলে বিলম্বিত হল রাধাকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করার জন্য। সারা বৃন্দাবনে জাগল আনন্দ হিল্লোল।

গোবিন্দ আচার্য্যের মাথুরের পদগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাবী, ভবন ও ভূত—ত্রিবিধ বিরহই তাঁর মাথুরের অবলম্বন। কৃষ্ণ মথুরায় চলে যাবেন শুনে ব্রজরমণীরা বলতে লাগল—নন্দ, যশোদা আর রোহিণী কৃষ্ণের বিরহে বাঁচবেন না। সবার আগে মারা যাবে রাধা। তাঁরা ভাবেন, এমন কি কেউ আছে যে কানুকে উপদেশ দিয়ে বৃন্দাবনে ধরে রাখতে পারে। অক্রুরের আগমন গোপিনীদের কাছে বিধাতার দেওয়া দুর্দৈবের মত মনে হয়। কৃষ্ণ যখন চলে যাচ্ছেন, তখন ব্যাকুলা রাধা কৃষ্ণকে বলেন—'কোথা যাও পরাণ রাধার' ? (৭৫৯) কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকে ধরে রাখা যায় না। রাধা হাহাকার করে বলেন—"ছাড়িয়া রহিলে আমি পরাণে মরিব"। আবার কখনও দন্তে তৃণ ধারণ করে বলেন, শ্যামকে ছাড়া তিনি প্রাণেই বাঁচবেন না। ললিত মাধব নাটকে শ্রীকৃষ্ণের রথের সামনে এই দন্তে তৃণ ধারণকারিণী রাধাকে দেখতে পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলে—

অনাথ সমান রাই রহিল পড়িয়া।
নিঃশ্বাস ছাড়য়ে ঘন হা কৃষ্ণ বলিয়া ॥
*　　*　　*　　*
কোথা গেলে অহে শ্যাম অনাথ ছাড়িয়া ॥
দেখা দিয়া মোর প্রাণ রাখ একবার।

কৃষ্ণবিরহে এই দীন মলিন ও অশ্রুবিগলিত রাধার মূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যেরই ভাবতন্ময় অবস্থার প্রতিরূপ।

দেখা যাচ্ছে রাধাকৃষ্ণ লীলার প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় নিয়েই গোবিন্দ আচার্য্য পদ রচনা করেছেন। ইনি একাধারে ভক্ত ও কবি। তার সাথে যুক্ত হয়েছিল চৈতন্য জীবনের দিব্যসুষমার অভিজ্ঞতা। এই তিনের সম্মেলনে তাঁর রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা হয়ে উঠেছে, ভক্তিতন্ময় ও কবিত্বসুরভিত।

(৫) পরমানন্দ গুপ্ত

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে সংক্ষেপে 'গৌরাঙ্গ বিজয় গীত' রচয়িতা চৈতন্য সহচর পরমানন্দ গুপ্তের উল্লেখ আছে। এঁর নামে মোট বারোটি পদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে কৃষ্ণকথামূলক পদের সংখ্যা ৬টি। এই পদগুলির মধ্যে একটির ভণিতায় দেখা যায় কবি লিখেছেন—'শ্রীরূপ মঞ্জরি চরণ হৃদয়ে ধরি।'[১৩] ভণিতাটি দেখে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সিদ্ধান্ত করেছেন—'মঞ্জরি ভাবের সাধনা বৃন্দাবনে প্রচারিত হইবার পর ইহা রচিত হইয়াছিল'। তাই একে প্রত্যক্ষদর্শী পরমানন্দের রচনা বলে গ্রহণ না করে অন্য কোন পরমানন্দের রচনা বলেই তিনি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমাদের ধারণা, বারটি পদের একটিকে এইভাবে স্বতন্ত্র ব্যক্তির রচনা বলে চিহ্নিত করার কোন যুক্তি নেই। কারণ

শ্রীচৈতন্যদেবের সমবয়স্ক কোন কবির পক্ষে বৃন্দাবনে মঞ্জরিভাবের সাধনা প্রচারিত হওয়ার পরেও পদ রচনা করা সম্ভব। ইতিপূর্বে যে কবিদের সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি, তাঁরা সকলেই চৈতন্যদেবের সহচর, জ্যেষ্ঠ বা সমবয়স্ক কবি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কারও কারও কৃষ্ণকথায় গোস্বামীদের প্রভাব যে প্রত্যক্ষ করা যায় তাও আলোচিত হয়েছে। আমাদের মনে হয়, ব্রজভূমি থেকে শ্রীনিবাসের গ্রন্থাদি আনয়নের আগেই বাংলার বৈষ্ণবদের কারও কারও ষড়্‌গোস্বামীর চিন্তাধারার সঙ্গে যে পরিচয় ঘটেছিল, তারই দ্বারা এই সমস্ত কবির রচনা প্রভাবিত হয়েছে।

পরমানন্দ শ্রীরাধার পূর্বরাগের যে পদটি রচনা করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবতী রাধা তাঁর প্রেম জানিয়ে কৃষ্ণের কাছে দূতী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ দূতীকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং দূতী রাধাকে বলে—

ঐছে নিঠুর সঙ্গে নেহ নহে সমুচিত
না পূরব তুয়া অভিলাষ ॥

পদটি পড়ে মনে হয়, যেন এই পদের পরিপূরক পূর্ববর্তী একটি পদ ছিল। রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে কৃষ্ণ রাধাকে পরীক্ষা করার জন্য প্রথমে রাধার দূতী সখী ললিতা ও বিশাখাকে এই ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

অন্য একটি পদে, কুঞ্জভঙ্গের পর রাধা এবং কৃষ্ণ কুঞ্জ থেকে অত্যন্ত কাতরভাবে সহচরিগণের সঙ্গে গৃহে চলে গেলেন। তারপর নিজেদের গৃহে গিয়ে পালঙ্কে শয়ন করলেন। সখীরাও নিজেদের গৃহে গিয়ে নিদ্রিত হল। কিছুক্ষণ পরেই প্রভাত হল, গুরুজনেরা জেগে উঠল, আকাশে সূর্যও উদিত হল। এই পদটিতেই শ্রীরূপমঞ্জরীর চরণ কবি হৃদয়ে ধারণ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গোবিন্দ লীলামৃত নামক রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলায় শ্রীরূপমঞ্জরীর বার বার উল্লেখ করেছেন। এছাড়া পরমানন্দ কৃষ্ণের অভিষেকলীলা, রাধা ও কৃষ্ণের আরতি এবং নাম সংকীর্ত্তনের একটি পদ (পৃঃ ২৮০) রচনা করেছেন।

(৬) মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্ত

শ্রীচৈতন্যের মুকুন্দ নামে একাধিক পার্ষদ ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন বাসুদেব দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং মহাপ্রভুর সহপাঠী ছিলেন। বাসুদেব দত্ত-ও মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। এঁরা দুই ভাই শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে পুরীতে কিছুদিন ছিলেন। বাসুদেব দত্তের ভণিতায় ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে একটিমাত্র গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ পাওয়া যায়। মুকুন্দ ভণিতায় সংকীর্তনামৃতে যে একটি পদ পাওয়া যায়, সেই পদটি মুকুন্দ দত্তেরই লেখা বলে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার অনুমান করেছেন। পদটিতে গোষ্ঠলীলায় শ্রীকৃষ্ণের যে মনোহর রূপ বর্ণিত হয়েছে—তাতে ভাগবতের 'বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং, শ্লোকটির প্রভাব রয়েছে মনে হয়।

(৭) শিবানন্দ সেন

বৈদ্যকুলজাত শিবানন্দ একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-চরিতামৃতে বহু বার শিবানন্দের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। কবিকর্ণপুর শিবানন্দ

সেনেরই কনিষ্ঠপুত্র। পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়ের মতে 'শিবাই' নামের কবি আসলে পৃথক কেউ নন, শিবানন্দেরই সংক্ষিপ্ত নাম শিবাই।[১৪]

পদকল্পতরুতে শিবানন্দ সেনের একটি মাথুর বিরহের পদ আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ সংখ্যক পুঁথিতে শ্রীরাধার বংশী শিক্ষার একটি চমৎকার পদ আছে। রাধা কৃষ্ণেরই অনুকরণে ত্রিভঙ্গ হয়ে বাঁশি বাজাচ্ছেন। অনভিজ্ঞা রাধার হাতে বাঁশী কখনও বাজে, আবার কখনও বাজে না। কৃষ্ণই রাধার অধরে বাঁশিটি ধরে রয়েছেন। কৃষ্ণকর্তৃক রাধাকে বংশী শিক্ষাদান রাধাকৃষ্ণপ্রেমেরই কৌতুকতরল একটি দিক। এছাড়াও এই কবি রচিত রাধার আক্ষেপানুরাগ (পৃঃ ২৪৫) এবং বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলনের একটি পদ পৃঃ ২৪৫ পাওয়া যায়। কৃষ্ণপ্রেমে সমর্পিত রাধার লোকনিন্দার জন্য বেদনা এবং বৃন্দাবনে মিলনের ব্যাকুল আনন্দ এই পদ দুটিতে ফুটে উঠেছে। শিবানন্দের সঙ্গে শিবাইকে যদি অভিন্ন ধরা হয়, তাহলে আরও কিছু কৃষ্ণলীলার পদ এই কবির রচিত বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার তিনটি পদ এই কবির রচনা হিসেবে পাওয়া যায়। একটি পদে নন্দের জননীর উল্লেখ আছে—'নন্দের জননী নাচে বুড়িয়ারে' (পৃঃ ২৪৬)। অন্য একটি পদে পৌর্ণমাসীর প্রসঙ্গ শ্রীরূপ গোস্বামীরচিত সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত। গোষ্ঠলীলার পদগুলি গতানুগতিক।

(৮) রামানন্দ বসু

শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচয়িতা মালাধর বসু পদাবলীকার রামানন্দের পিতামহ, মতান্তরে পিতা। শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে থাকাকালীন রামানন্দ বসু সহচর হন। রামানন্দের রচিত পদের বিষয়বস্তু কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গলীলা উভয়ই। রামানন্দ বসুর ভণিতায় পদকল্পতরুতে যে সাতটি পদ পাওয়া যায় তার মধ্যে চারটি রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক। এই পদগুলি যথাক্রমে পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, কুঞ্জভঙ্গ ও যুগলমিলনের।

রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা নিয়েও পদরচনা করেছেন। একটি পদে সকালবেলা বিছানা থেকেই কৃষ্ণ পালিয়েছেন যমুনার তীরে কদম্বতলে। এদিকে মা যশোদা রোহিণীর কাছে কেঁদে কেঁদে পুত্রের সন্ধান করছেন। কৃষ্ণ তাঁর—"পরাণপুতলি ধন দুটি আঁখির তাঁরা"। যশোদার স্নেহমধুর শঙ্কাতুর জননী হৃদয়টি এই পদে চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে (পৃঃ ১৯৯)। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার অপর একটি পদেও স্নেহ বিহ্বলা জননী যশোদার মধুর মূর্তি অঙ্কিত।[১৫] কৃষ্ণ গরু চরাতে যাবেন। তাই মা যশোদা বড় যত্নে তাঁর কপালে পরিয়ে দেন চন্দন তিলক, চোখে দেন কাজল, চুলে চূড়া বেঁধে তাতে নব গুঞ্জা পরিয়ে দেন ধড়ায় দিয়ে দেন 'বিবিধ মিঠাই'।

সখ্যরসের পদরচনায়ও রামানন্দ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রামানন্দের একটি সখ্যরসের পদে শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি সখারা সবাই মিলে কৃষ্ণের সেবা করছে, ফলে পদটির মধ্যে কিছুটা দাস্যভাব এসে পড়েছে।[১৬]

রামানন্দ রচিত শ্রীরাধার পূর্বরাগের একটি পদে রাধা স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের দেখা পেয়েছেন। শ্রাবণ রজনীর বর্ষণসজল মোহময় অন্ধকারের পটভূমিতে বিস্রস্তবাসা শ্রীরাধার কাছে স্বপ্নে এসেছেন এক শ্যামল পুরুষ। রাধার অবচেতন মনে কৃষ্ণের

সঙ্গ পাওয়ার বাসনা এইভাবেই স্বপ্নে মূর্ত হয়ে উঠেছে। পদটিতে রাধার মধুর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গে হতাশা-জড়িত বেদনা বড় চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শ্যামল পুরুষ স্বপ্নে রাধাকে চুম্বন করে প্রেমধন ভিক্ষা করেন। জেগে উঠে রাধা কাঁপতে কাঁপতে দেখেন তাঁর স্বপ্ন স্বপ্নই, সত্য নয়। তখন—

আকুল পরাণ মোর দুনয়নে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি ॥

স্বপ্নের মধ্যেই রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম নিবেদনে বিশেষত্ব রয়েছে—

আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
বলে কিন যাচিয়া বিকাই।

রাধার স্বপ্নে দেখা এই শ্রীকৃষ্ণ রামানন্দের চোখে দেখা শ্রীচৈতন্য, যিনি প্রেমধন মেগে বেড়ান সবার কাছে, আর তার বিনিময়ে নিজেকে সেধে সেধে বেচে দেন।

স্বপ্নে নায়কের দেখা পাওয়ার দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে অল্প কিছু পাওয়া যায়। কবি বসুকল্প রচিত একটি শ্লোকে নায়কের প্রতি নায়িকার অনুরাগ বর্ণনা করতে গিয়ে দূতী বলেছে, স্বপ্নে তাঁকে দেখতে পেলে হরিণ নয়না নায়িকার শরীর ঘন রোমাঞ্চে কণ্টকিত হয়ে ওঠে আর প্রচুর ঘর্মজল যেন তাকে স্নান করিয়ে দেয়। (নায়ককে), জোরে টানতে গিয়ে স্খলিত বলয়ের ঝঙ্কারে ঘুম ভেঙে যায়, তারপর অনবরত চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে।[১৭]

এরও আগে কালিদাসের কুমারসম্ভবে শিবকে পাওয়ার জন্য তপস্যারতা উমা, স্বপ্নে শিবের দেখা পেয়েছেন। ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে শিব উমার তপোবনে প্রবেশ করলে উমার সখী শিবের প্রতি তাঁর অনুরাগ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

ত্রিভাগ শেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং
নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
ক্ব নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাগ্
অসত্যকণ্ঠার্পিত বাহু বন্ধনা ॥[১৮]

রাত্রির তিন প্রহর কেটে গেলে (পার্বতী) একবার চোখ বন্ধ করে হঠাৎ জেগে ওঠেন। 'নীলকণ্ঠ কোথায় যাও' এই কথা অস্ফুটভাবে বলে, যে নেই, যেন তার গলা জড়িয়ে ধরেন।

তবে লক্ষণীয় বিষয়, সংস্কৃত সাহিত্যের এই দুটি স্বপ্ন প্রসঙ্গ সখী ও দূতীর মুখ দিয়ে ব্যক্ত, আর রামানন্দের পদে রাধা স্বয়ং সখীর কাছে নিজের স্বপ্ন-মিলনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। এদিক দিয়ে বিচার করে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সংগেই পদটির কবির যেন অনেক বেশী নৈকট্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের 'রাধাবিরহে' রাধা বড়াইর কাছে নিজের স্বপ্নমিলনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। অপূর্ব রচনা কৌশলে এবং মিত ভাষিতায় পদটি উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালের বহু বৈষ্ণব কবি এবং সমকালের বংশীবদন এই প্রসঙ্গ নিয়ে পদরচনা করেছেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণিতে স্বপ্ন দর্শনে পূর্বরাগ প্রসঙ্গ রয়েছে। কিন্তু রামানন্দের এই পদটি সম্ভবতঃ তার আগেই লেখা। কখনও সন্ধ্যাবেলায় জলের ঘাটে রাধার সংগে কৃষ্ণের দেখা হয়। রাধা কৃষ্ণের

দিকে না তাকালেও কৃষ্ণের বাঁশীর সুরে তাঁর মন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে (পৃঃ ১৯৮)। এরপর রাধা কৃষ্ণকে চাক্ষুষ দেখে সেই রূপের মাধুর্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কৃষ্ণের সেই মোহন রূপ যেন শেলের মত রাধার প্রাণে বিঁধে থাকে। সেই শেল--

বাহির হৈয়া নাহি যায় টানিলে না বাহিরায়
অন্তরে জ্বলয়ে ধিকে ধিকে ॥ (পৃঃ ১৯৯)

প্রেমের তীব্র সুখবিজড়িত এই নিরুপায় বেদনাবহনের বর্ণনায় রামানন্দের রাধার মধ্যে রক্তমাংসের মানবীর হৃদয় স্পন্দিত হয়েছে। রামানন্দের কৃষ্ণও রাধার বিরহে দশমী দশার পূর্ববর্তী অবস্থা প্রাপ্ত হন। তিনি রাধার নাম জপ করেন এবং রাধার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করার সঙ্কল্পও গ্রহণ করেন (পৃঃ ১৯৯)। রাধার প্রতি কৃষ্ণের এই নিবিড় প্রেম তথা রাধার শ্রেস্ঠত্বের মর্যাদা শ্রীচৈতন্যেরই অবদান।

মানের পর্যায়ে গতানুগতিকভাবে কৃষ্ণ অন্য নায়িকা সমাগমের পর প্রভাতে ক্রুদ্ধা রাধার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তবে কাহিনীতে একটু নূতনত্বও আছে। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ সারারাত্রি জেগে শিবপূজার কথা বলেছেন। কিন্তু রামানন্দের কৃষ্ণ সম্ভবতঃ এত চতুর নন। তিনি বলেন, বলরামের সঙ্গে মধুপান করে ফেরার পথে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে কখন যে তিনি চন্দ্রাবলীর বাড়ীতে গিয়ে পেঁাচেছিলেন তা টের পান নি। এখন রাধাকে দেখতে পেয়েই তাঁর মনের ধাঁধাঁ কেটে গেছে (পৃঃ ২০০)। কুঞ্জভঙ্গের পদে বিপর্যস্ত প্রসাধনা রাধা বাড়ী ফিরতে গিয়ে কৃষ্ণকে অনুরোধ করেছেন কৃষ্ণের বেশেই তাঁকে সাজিয়ে দিতে এবং পরামর্শ দিয়েছেন—কেউ পরিচয় জানতে চাইলে কৃষ্ণ যেন সখা বলেই অভিহিত করেন। রামানন্দ রচিত মাথুরের পদটি গতানুগতিক। বিরহিনী রাধা সখীর কাছে অলঙ্কার শাস্ত্র বর্ণিত পন্থায় বিরহ বর্ণনা করেছেন (পৃঃ ২০১)। সব মিলিয়ে আমরা বলতে পারি চৈতন্য সমসাময়িক ভক্ত-কবি হিসেবে রামানন্দ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। সংখ্যায় খুব বেশী না হলেও তাঁর পদাবলীতে কৃষ্ণকথা গতানুগতিকতার মধ্যেও কিছুটা বৈচিত্র্য লাভ করেছে।

(৯) বংশীবদন

বংশীবদন জন্মগ্রহণ করেছিলেন নবদ্বীপের নিকটবর্তী কুলিয়াপাহাড় গ্রামে। ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দের চৈত্র মাসে বাসন্তী পূর্ণিমার দিনে কবির জন্ম হয়। নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তি-রত্নাকরে উল্লেখ আছে, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি কিছুদিন শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষক রূপে তাঁর বাড়ীতে থাকতেন। গৌরলীলা এবং কৃষ্ণলীলা উভয় বিষয়ক পদই ইনি রচনা করেছেন। এঁর গৌরাঙ্গলীলার বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়, প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতাকে কবি তাঁর পদগুলিতে রূপ দিতে পেরেছেন। অন্যদিকে রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদগুলিতেও কখনও কখনও কবি মৌলিকত্ব দেখাতে পেরেছেন এবং কথা অংশেও বৈচিত্র্য এনেছেন। সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর, এই তিন প্রকারের পদই ইনি সমকৃতিত্বের সঙ্গে রচনা করেছেন।

এই কবির পদাবলীকে সাজিয়ে দেখলে কৃষ্ণকথার একটি ক্রমবিন্যস্ত ধারা পাওয়া যায়। বাল গোপালের নৃত্য দিয়ে পর্যায় শুরু। বালক কৃষ্ণের মধুর নৃত্য দর্শনে

বাৎসল্যাভিভূতা ব্রজরমণীদের বসন স্তনদুগ্ধের ধারায় সিক্ত হয়েছে।[১৯] অপর একটি পদে যশোদার দেওয়া নবনী, গোপাল না খেয়ে ফেলে দেওয়ায়, বড়ই দুঃখ পেয়ে জননী যশোদা ক্রন্দন করছেন।[২০]

গোষ্ঠলীলার পদগুলিতে বৃন্দাবনের অরণ্যে গোচারণে গিয়ে কৃষ্ণ ও তার সখাদের বাল্যক্রীড়ার বর্ণনাও বংশীবদনের পদগুলিতে জীবন্ত। সখারা কেউ হাতী-ঘোড়া সাজে, কেউ নাচে আবার কেউ বা গান করে। এদের সবার রাজা হয় কিন্তু বালক কৃষ্ণ আর বলরাম হন অমাত্য।[২১] অন্য একটি পদেও গোষ্ঠ-গোপালের বড় জীবন্ত মনোরম বর্ণনা রয়েছে। কৃষ্ণ কালিন্দীর তীরে বেণু বাজিয়ে ধেনু চরান, আবার কখনও বা ধবলী শ্যামলী বলে ডাকেন। তাঁর পীতবসন লুণ্ঠিত হয় চরণে, শ্যামল শরীরখানি গোরজঃ-নিঃসৃত ধূলায় ধূসর, মুখ দিয়ে ঘাম ঝরে পড়ে। বাঁ হাত দিয়ে কৃষ্ণ সেই ঘাম মুছে নেন। মাঝে মাঝে গাছের ছায়ায় বসে তিনি বিশ্রাম নেন। এমনকি, ধেনুরাও পর্যন্ত ঘর্মাপ্লুত কৃষ্ণকে দেখে 'চাহত ছল ছল দীঠে'। অথচ অন্যদিকে আবার কৃষ্ণকে দেখার আনন্দে তারা পিঠের ওপর পুচ্ছ নাচায়। পশু ও মানবের সমপ্রাণতার এই জীবন্ত চিত্রটি পদাবলী সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান দাবী করতে পারে।

রাধার পূর্বরাগ বর্ণনায়ও বংশীবদন প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সহচরীগণের সঙ্গে যমুনায় যেতে ঘোমটা খুলে একবার মাত্র রাধা কৃষ্ণকে দেখে নিয়েছিলেন। এরপর তাঁর মন আর স্থির হয় না। রাধা বার বার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যান, জ্ঞান ফিরে পেলেই তাঁর প্রাণ কাঁদতে থাকে (পৃঃ ২৭১)। রাধা সখীকে বলেন—

তেমাথা পথের ঘাট সেখানে ভুলিলুঁ ঘাট
কালা মেঘে ঝাপা দিল মোরে। (পৃঃ ২৭০)

কৃষ্ণের কালো রূপে রাধার অস্তিত্ব আচ্ছন্ন হয়ে গেল বোঝাতে 'কাল মেঘে ঝাপা দিল মোরে'—দ্যুতিময় কাব্যবাণীর উচ্চারণ। বড়াইর কাছে প্রথম দর্শনমুগ্ধা রাধার কোমল প্রেমানুভূতি প্রকাশও বড় মধুর। যমুনার তীরে ঘর্মাপ্লুত ক্ষুধার্ত ধূলি-ধূসরিত কৃষ্ণকে দেখে রাধা বলেন—

মোর মনে হেনলয়, যদি নহে লোকভয়
আঁচর ঝাঁপিয়া করোঁ ছায়া ॥

একদিকে কৃষ্ণের ঘর্ম্মজলসিক্ত কাতর মুখ আর অন্যদিকে লোকনিন্দার ভয়, উভয়ের মাঝখানে দ্বিধান্দোলিত প্রেমিকা রাধার যন্ত্রণাকে কবি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বড়াই এর জন্য রাধাকে তিরস্কার করেছেন। কারণ তিনি প্রথম থেকেই রাধাকে যমুনায় যেতে বারণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি এমনই যে, একজনের সাথে কথা বলতে বলতে আর একজনের দিকে তিনি যদি আপাঙ্গেও তাকান, তাহলে সেই নারী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে।

রামানন্দ বসুর মত বংশীবদনেরও স্বপ্নমিলনের একটি পদ আছে। কিন্তু সেই বর্ষণব্যাকুল মোহমদির আলো আঁধারিতে রহস্যময় পরিবেশ কবি এখানে সৃষ্টি করতে পারেন নি। তবে রাধাকৃষ্ণকথা নিয়ে বিচিত্র পর্যায়ের পদ রচনায় বংশীবদন রামানন্দ বসুর তুলনায় অধিকতর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দানলীলা এবং নৌকাবিলাস কৃষ্ণকথার

এই দুটি সম্পূর্ণ লৌকিক প্রসঙ্গ ষড়্‌গোস্বামীদের রচনায় ও পরবর্তী কালের পদাবলী সাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে। বংশীবদন এই দুটি পর্যায় নিয়েও পদ রচনা করেছেন। পদকল্পতরুতে এর বারোটি পদ আছে। পদামৃতমাধুরীতে আছে অতিরিক্ত চারটি পদ। পদগুলিকে সাজিয়ে নিলে একটি ধারাবাহিক কথা অংশ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ দানের ভাণ করে পথের মধ্যে বসেছিলেন। বড়াই-এর সংগে রাধাকে দেখে তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। পরোক্ষে রাধার রূপেরও প্রশংসা করলেন। প্রত্যুত্তরে বড়াই কৃষ্ণকে তিরস্কার করে বললেন—

পরবধূ প্রশংসিয়া তোমার কি কাজ।
ঘনায়্যা আসিছ কাছে নাহি বাস লাজ॥ (পৃঃ ২৭৪)

পিতা নন্দরায়ের ভদ্র ব্যবহারের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বড়ায়ি কৃষ্ণকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন। আবার কখনও বা কংস রাজার ভয় দেখালেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ রাধাকে ভয় দেখিয়ে বললেন, রাধার এত রূপ মথুরার রাজার চোখে পড়লে বিপদ হতে পারে। তারপরই তিনি ক্লান্ত রাধার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে রাধার রূপের প্রশংসা করতে লাগলেন এবং রাধাকে তরুমূলে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন (পৃঃ ২৭৫)। প্রত্যুত্তরে রাধা কৃষ্ণের দানের ব্যাপারটি পুরো ধাপ্পাবাজি বলে সুবলের নাম ধরে তিরস্কার করলে, কৃষ্ণ সুবলকে রাধার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে বললেন। কারণ 'এই যে মায়্যাটি' কৃষ্ণের ভাষায় 'দেখিতে দেখিতে মোর তনুমন সব কৈল চুরি।' তাই কৃষ্ণ সুবলকে বললেন, কোন বাটপাড়াই সম্ভবত নারীর বেশ ধারণ করেছে। এই বলে কৃষ্ণ নিজেই নানা ছলে রাধার গায়ে হাত দিয়ে বার বার চুম্বন করতে চাইলেন। আরও বললেন, দান না দিলে সব অলংকার দিয়ে যেতে হবে। ললিতা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

আপন নগর ঘরে
যদি লাগি পাই তোরে
তবে সে জানিয়ে ভালে ভাল॥

কৃষ্ণের কাছ থেকে চুরির অভিযোগে ক্রুদ্ধা রাধাও কৃষ্ণের গায়ের রঙ ও প্রসাধনের তীব্র নিন্দা করতে লাগলেন। কিন্তু কৃষ্ণ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে রাধার রূপ-যৌবন দান চাইলেন। বংশীবদন নিজেও কৃষ্ণের পক্ষ নিয়ে রাধাকে বললেন—

উচিত কহিতে মনে মন্দ ভাব
আঁচলে ঝাঁপিলা কি॥

পরবর্তীকালে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিরা কিন্তু এভাবে কখনও কৃষ্ণের পক্ষ নিয়ে কথা বলেন নি। তাঁদের মধ্যে রাধার, প্রতি আনুগত্যই লক্ষ্য করা যায়। দান-লীলার এই পদগুলিতে রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই, ললিতা প্রভৃতি চরিত্র উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। এছাড়া লোকজীবনের নিবিড় উত্তাপও যেন পদগুলির মধ্যে পাওয়া যায়।

বংশীবদনের দানলীলার একটি পদ আসঙ্গলুব্ধ নয়, প্রেমমুগ্ধ রোমান্টিক নায়ক কৃষ্ণকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে (পৃঃ ২৭৫)।

কৃষ্ণ রাধাকে অনুরোধ করেন, এই তপ্ত দ্বিপ্রহরে রাধা যেন আর না যান, রাধার পসরা

কৃষ্ণই সব কিনে নেবেন। কৃষ্ণের চোখ দিয়ে দেখা মধ্যাহ্নের খরসূর্যতাপে ঘর্মাক্ত রাধার চিত্রটি অঙ্কন বংশীবদনের প্রতিভার পরিচায়ক—

রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুখ
শ্রমভারে আউলাইল কবরী ॥

মনে হয় শ্রমক্লান্ত রাধা আর ব্যথিত কৃষ্ণের মমতাকাতর চোখের দৃষ্টি যেন একেবারেই জীবন্ত। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'পসারিণী' কবিতায় এর প্রভাব পড়েছে। পসারিণীকে সম্বোধন করে কবিও কৃষ্ণের মতই বলেন—

এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি
কোমল করুণ ক্লান্ত কায়।

বংশীবদনের কৃষ্ণ রাধাকে বলেন—

মথুরা অনেক পথ তেজ অন্য মনোরথ
মোর কাছে বৈস বিনোদিনি।

আর রবীন্দ্রনাথ পসারিণীকে বলেন—

কোথা কোন রাজপুরে যাবে আরো কত দূরে
কিসের দুরুহ দুরাশায়।

বংশীবদনের কৃষ্ণ রাধাকে বলেন—

এভর দুপুর বেলা তাতিল পথের ধূলা
কমল জিনিয়া পদ তোরি।

রবীন্দ্রনাথ বলেন—

মধ্য দিনে রুদ্ধ ঘরে সবাই বিশ্রাম করে
দগ্ধ পথে উড়ে তপ্ত বালি।

বংশীবদনের কৃষ্ণ রাধাকে বলেন—

শীতল কদম্বতলে বৈসহ আমার কোলে
সকলি কিনিয়া লব আমি।

কৃষ্ণের করুণরঙীন, কোমলমধুর প্রেম এইভাবে আধুনিক যুগের কবির কাব্যকেও স্পর্শ করেছে।

এরপর সখীরা দূরে চলে গেলে 'মোহন বিজন বনে' কৃষ্ণ, রাধার কাছে প্রেম নিবেদন করলেন।[২২] প্রেমিক কৃষ্ণ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন, রাধার জন্যই তিনি বনে বনে ধেনু রাখার ছলে ঘুরে বেড়ান।[২৩] কৃষ্ণের এই ব্যাকুল প্রেমনিবেদনে শ্রীরাধাও ভাবাতিশয্যে বলে ওঠেন—

কিছু বৈল না হে কৈয় না হে
কথা শুনি ফাটে মোর বুক।

কারণ শ্রীরাধা যে দধি বিক্রয় করার জন্য পথে বেরিয়ে পড়েন, তার মূলেও সেই কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করার একটু অবকাশ সৃষ্টি করা। কৃষ্ণ যদি জল হন, তবে রাধা যেন মাছের

মত। রাধা যেন সরলা সারিকা, কৃষ্ণের প্রেমের খাঁচায় তিনি বন্দী। নিজের প্রেমের গাঢ়তা প্রমাণ করার জন্য রাধা কৃষ্ণকে দেখান—

হের দেখ ওহে শ্যাম
দুই বাহুতে তোমার নাম
দাগিয়া রাখ্যাছি নিজ প্রাণ ॥

বংশীবদনের দানলীলার আর কোনও পদ পাওয়া যায় নি। কিন্তু এই ক'টি পদেই রূপমুগ্ধ প্রণয়ী কৃষ্ণের আকূতি ও কৌতুকমিশ্রিত চাতুর্য, সন্ত্রস্তা রাধার আপাতভীতভাব এবং অবশেষে ব্যাকুল আত্মসমর্পণ বড় মধুর। বংশীবদনের রাধা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধার মত সত্যই অনিচ্ছুক নন, এবং কৃষ্ণও কামসর্বস্ব নারীধর্ষক নন, তিনি প্রকৃত প্রণয়ী।

বংশীবদনের নৌকাবিলাসেরও কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। এছাড়াও শ্রীরাধার আক্ষেপানুরাগ, শ্রীরাধার অভিসার, রাধিকার মান ও মানভঞ্জনের জন্য কৃষ্ণ কর্তৃক নারীবেশ ধারণ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক পদ বংশীবদনের নামে পাওয়া যায়। এর মধ্যে রাধার মান ভঞ্জনের জন্য কৃষ্ণের নারীবেশ ধারণ কৃষ্ণকথায় বৈচিত্র্য আনয়ন করলেও অভিনব নয়। বিদ্যাপতির পদের মধ্যে আমরা এর সাক্ষাৎ আগেই পেয়েছি।

চৈতন্যপরবর্তী কবিবৃন্দ

(১) বলরামদাস

বৈষ্ণব পদাবলীতে চৈতন্যপরবর্তী কবি হিসেবে বলরামদাস তাঁর নিজস্বতায় দীপ্ত কবিসত্তা। কিন্তু এঁকে নিয়েও কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে, সেই মহাকাব্যের যুগ থেকেই দেখা যায়, ব্যাস-বাল্মীকির ছত্রছায়ায় বহু অজ্ঞাতনামা স্রষ্টা তাঁদের সাহিত্যকীর্ত্তির স্থায়িত্বের ব্যবস্থা করে গেছেন। অনুরূপ মন্তব্য করা যায় কালিদাসের ক্ষেত্রেও। আর বাংলা সাহিত্যে কৃত্তিবাস, কাশীরামের রামায়ণ মহাভারতের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এবং আমাদের আলোচ্য বলরামদাসের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাপারই ঘটেছে। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে একাধিক বলরাম ও বলরামদাসের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এঁরা সবাই আলাদা লোক ছিলেন বলে মনে হয় না। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব বন্দনায়—নিত্যানন্দ প্রভুর গণ, একজন বলরামদাস সম্পর্কে বলা হয়েছে—

সঙ্গীতকারকবন্দো বলরামদাস।
নিত্যানন্দ চন্দ্রে যাঁর অধিক বিশ্বাস ॥[২৪]

নিত্যানন্দ-শাখা বর্ণনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলেছেন—

বলরামদাস কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী
নিত্যানন্দ-নামে হয় অধিক উন্মাদী।[২৫]

কাটোয়া এবং খেতুরির উৎসবে সম্মানিত অতিথিদের তালিকায় একজন বলরামদাসের উল্লেখ আছে। মনে হয় ইনিই সেই ব্যক্তি। এই বলরামদাস নিত্যানন্দের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিজের বাসস্থান কৃষ্ণনগরের নিকটস্থ দোগাছিয়া গ্রামে গোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ অথবা বৈদ্য—এ নিয়েও সংশয় আছে। এঁর বংশধর শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দোগাছিয়া গ্রাম থেকে বলরামের দুএকটি উৎকৃষ্ট বাৎসল্যরসের পদ আবিষ্কার করেছিলেন। এই পদগুলি সর্বপ্রথম পদরত্নাবলীতে প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায়। বলরামদাসের গোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠা থেকে মনে হয়, তিনি বাৎসল্যরসের মাধ্যমেই কৃষ্ণ উপাসনা করতেন, বাৎসল্য রসই তাঁর পদাবলীরও মুখ্য উপজীব্য ছিল।

নিত্যানন্দ একবার নৃত্যকীর্তন ও প্রচারের জন্য দোগাছিয়া গ্রামে এসেছিলেন এবং কবি বলরামদাসকে তাঁর নিজের পাগড়ীটি উপহার দিয়েছিলেন। সেই পাগড়ী আজও তাঁর বংশধরেরা সযত্নে রক্ষা করছেন। নিত্যানন্দ বলরামকে বিবাহ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর পাঁচটি পুত্রসন্তানও জন্ম গ্রহণ করেছিল। তাঁর বংশধর হরিদাস গোস্বমী কর্তৃক প্রকাশিত "দ্বিজ বলরামঠাকুরের জীবনী ও পদাবলী' গ্রন্থটিতে এই বলরামের বহু পদ সংগৃহীত হয়েছে। ইনি বৃন্দাবনে গিয়ে বলরামের বহু পদ যোগাড় করেছিলেন। তাঁদের বাড়ীতে পাওয়া বলরামের বহু পদও এখানে সংগৃহীত। এছাড়া 'পদকল্পতরু, ও 'গৌরপদতরঙ্গিণীতে' বলরামের ভণিতাযুক্ত যে সমস্ত পদ পাওয়া যায়, তার বেশীর ভাগ পদই এঁর লেখা বলে মনে হয়। দোগাছিয়া গ্রামে বলরামদাসের কোনো কোনো বংশধর এখনো বাস করেন এবং অগ্রহায়ণ মাসে সেখানে তাঁর তিরোভাব উপলক্ষে উৎসব হয়।

এছাড়াও বলরাম বসু নামে আর এক পুরোনো পদকর্তা ছিলেন। 'আরে মোর নিত্যানন্দ রায়' শীর্ষক পদটিতে এই বলরামের ভণিতা আছে। এতে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের নামোল্লেখ আছে।

নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা দেবীর একজন শিষ্যের নামও বলারামদাস। ইনি শ্রীখন্ড নিবাসী এবং এঁর পিতার নাম আত্মারামদাস। ইনি খেজুরীর মহোৎসবে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু এঁকে পদকর্তা বলরামদাসের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা যায় না। জাহ্নবা দেবী এঁর নাম দিয়েছিলেন নিত্যানন্দ দাস এবং ইনি সব সময়েই গুরুদত্ত নামই ব্যবহার করেছেন।

রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য আর একজন বলরামদাসের সংবাদও পাওয়া যায়। এঁর বাড়ী বুধরী। শাখা-বর্ণন গ্রন্থগুলিতে গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজের সঙ্গে এঁকেও বলরাম কবিরাজ বলা হয়েছে। বলরামদাস ভণিতায় যে ব্রজবুলি পদগুলি পাওয়া যায়—সেগুলি এঁরই রচনা বলে মনে হয়। এই ধরণের একটি ব্রজবুলির ভনিতায় কনকমঞ্জরীর উল্লেখ আছে—

> কনকমঞ্জরী রতি মঞ্জরী রোয়ত
> রোয়ব কব বলরাম।[২৬]

রামচন্দ্র কবিরাজেরই সিদ্ধ সখীরূপের নাম হল কনকমঞ্জরী। অতএব বলা যায়, এই পদটির রচয়িতা রামচন্দ্রের শিষ্য বলরামদাস।

দীন বলরামদাস নামে আর একজন কবি 'কৃষ্ণলীলামৃত' কাব্যরচনা করেছিলেন। ইনিও অল্প কিছু পদরচনা করেছেন। মনে হয় এই কবি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে বলরামের ভণিতায় একটি পদে জীবগোস্বামীর নাম পাওয়া যায়। এই গৌরপদতরঙ্গিনীর সম্পাদক জগদ্বন্ধু ভদ্র মোট ১১ জন বলরামদাসের কথা বলেছেন। বলরামদাস নামাঙ্কিত আরও কিছু কিছু রচনা পাওয়া যায়। যেমন—সারাবলী, গুরুতত্ত্বসার, হরপার্বতীসংবাদ, গুরুভক্তি কলাচন্দ্রিকা, চৈতন্য গণোদ্দেশদীপিকা, বৈষ্ণব-বিধান, হাটপত্তন'ও পাষণ্ড দলন। এই বলরামের রচনায় সহজিয়া বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

ডঃ সুকুমার সেনের মতে পদাবলীকার হিসেবে দুজন বলরামের অস্তিত্বই স্বীকার করা যায়। একজন বলরামদাস বাংলায় পদ লিখেছেন এবং তিনি প্রাচীনতর। আর একজন ব্রজবুলিতে পদ লিখে গেছেন এবং তিনি গোবিন্দদাসের পরবর্তী সময়ের কবি। তাঁর মতে প্রথম বলরামদাস চৈতন্য-নিত্যানন্দ-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তাঁর নিত্যানন্দ লীলা বিষয়ক পদে চৈতন্যজীবনীর দুষ্প্রাপ্য অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই তথ্যগুলি থেকে বোঝা যায়, তিনি এইসব লীলার প্রত্যক্ষদর্শী। দানলীলার কিছু কিছু পদও ইনি রচনা করেছেন। এই পদগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের সমস্পর্দ্ধী।

কবি বলরামদাস গৌরাঙ্গলীলাবিষয়ক পদরচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে বাৎসল্যযুক্ত পদরচনায়। শ্রীরূপ তাঁর 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু'তে শ্রীকৃষ্ণের বয়সকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত কৌমার, দশবছর বয়স পর্যন্ত পৌগণ্ড এবং পনের বছর বয়স পর্যন্ত কৈশোর। বলরামদাস কৃষ্ণের কৌমার বয়স থেকে কৈশোর বয়সের বিভিন্ন লীলার বর্ণনা করেছেন। এই কৃষ্ণলীলার অবলম্বন সখ্য ও বাৎসল্য রস। সখ্যরসের বর্ণনায় শ্রীরূপ বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করলেও পদাবলী সাহিত্যে এর প্রভাব খুব একটা পড়ে নি। তার কারণ শ্রীরূপ নিজে এর উদ্ভাবয়িতা হলেও মধুর রসকেই শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছেন। এই কারণেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদকর্তারাও সখ্যরসকে গৌণ করে ফেলেছেন। তবুও যে, সখ্যরস নিয়ে কিছু রসোত্তীর্ণ পদ রচিত হয়েছে, তার মূলে নিত্যানন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাব। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিত্যানন্দ নদীয়ায় অনেক সময়েই গোষ্ঠলীলার অনুষ্ঠান করেছেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায়, তাঁর শিষ্য পদকর্তারা সখ্যরসের পদরচনায় অগ্রসর হয়েছেন। পুরুষোত্তম, সুন্দরদাস ও বলরামদাস এর দৃষ্টান্ত।

কৃষ্ণের জন্মসময় অর্থাৎ কৌমারকাল থেকেই বলরামদাস বাল্যলীলার পদ রচনা করেছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে কৃষ্ণের জন্মোৎসব বর্ণিত হয়েছে। চৈতন্য পরবর্তী কবিরা এটিকে অনুসরণ করে নন্দোৎসব বর্ণনা করেছেন। বলরামদাসও তাই করেছেন। মাতা যশোমতীর পুত্রজন্মের আনন্দকে কবি প্রকাশ করেছেন নন্দের প্রতি তাঁর উক্তিতে—

নীল বরণ শশী উদয় করিল আসি
দেখি কর সফল জীবন।[২৭]

সূতিকা গৃহের বাইরে এসে নন্দরাণী সবাইকে ডেকে ডেকে তাঁর পুত্র কৃষ্ণকে দেখাচ্ছেন। এই ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর জননীহৃদয়ের বাৎসল্য ও গৌরব বোধ। আনন্দিত

গোপদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় অবশ্য কবি ভাগবতকেই অনুসরণ করেছেন। ভাগবতে আছে—

গোপাঃ পরস্পরং হৃষ্টা দধিক্ষীরঘৃতাম্বুভিঃ।
আসিঞ্চন্তো বিলিম্পন্তো নবনীতৈশ্চ চিক্ষিপুঃ ॥[২৮]

পুলকিত গোপগণ দধি, ক্ষীর, ঘৃত ও জল দ্বারা পরস্পর সেচন করতে লাগলেন এবং পরস্পরের অঙ্গে নবনীত লেপন করতে লাগলেন।

আর বলরামদাসের পদে আছে—

কোন গোপ ধেয়া গিয়া দধি দুগ্ধ ঘৃত লয়্যা
উভারয়ে নন্দের ভবনে।
দুজনে দুজন মেলি বাহুযুদ্ধ পেলাপেলি
কোন গোপ করয়ে নর্ত্তনে ॥[২৯]

তবে সম্পূর্ণ পদটিই যে ভাগবত থেকে প্রেরণা পেয়েছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং এইভাবে ভাগবতের বিষয় অবলম্বন করে পদরচনাও চৈতন্য প্রভাবেই ঘটেছে।

নিজ গ্রামে বালগোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠাতা গোপাল পূজারী বলরামদাস, তাঁর পদাবলী চর্চায়ও বাৎসল্যের নিপুণ রূপকার। বালক কৃষ্ণ ও জননী যশোদার স্নেহে, আবেগে, অভিমানে, কৃষ্ণের বাল্যকালীন নানা মধুর চাপল্যে তাঁর পদগুলি অমৃতরস সিঞ্চিত। বলরামের বাৎসল্যের পদগুলিতে কৃষ্ণ অথবা যশোদার মধ্যে ঐশ্বর্যভাবের প্রকাশ বিন্দুমাত্র নেই। বৃন্দাবনের নয়, যেন বাংলা দেশেরই পারিবারিক পরিবেশের আবেষ্টনীতে মাতা ও সন্তানের চিরকালীন মমত্ববিজড়িত সম্পর্কের সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য কবির কাব্যপটে উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ তুলিতে আঁকা।

বালক কৃষ্ণকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে মা যান গৃহকাজ করতে। ঘুম ভাঙার পর ক্ষুধাতুর কৃষ্ণ মায়ের কাছে আহার প্রার্থনা করে, আর একটু দেরী হলেই বলে মন্থন দণ্ড ভেঙে ফেলবে। দুরন্ত দামাল ক্ষুৎকাতর শিশু এবং সেই সঙ্গে এক গৃহকর্মবিব্রতা জননীর ছবিই এখানে ফুটে উঠেছে।[৩০] 'দধি-মন্থ-ধ্বনি / শুনইতে নীলমণি / আওল সঙ্গে বলরাম' শীর্ষক পদটিতে দেখা যায় দধি-মন্থনের ধ্বনি শুনেই বালক কৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে মায়ের কাছে চলে আসে। মা যশোদা শিশুকে বলেন, তিনি গোপালকে ক্ষীর ননী দেবেন, কিন্তু আগে তাকে মায়ের সামনে নাচতে হবে। মায়ের কথা শুনে—

নবনী লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে ॥[৩১]

এই শিশু কৃষ্ণের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা অথবা ঐশ্বর্যভাব আরোপের কোন চেষ্টাই কবি করেন নি। রাণী পুত্রের দুহাতে নবনী ভরে দিলেন, সে খেয়ে নাচতে লাগল। সেই নৃত্য দর্শনে মায়ের মনেও আনন্দের সঞ্চার হল। তিনি মন্থনদণ্ড ছেড়ে সঘনে করতালি দিতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, রোহিণীকে ডেকে তাঁর পুত্রের নাচ দেখাতে লাগলেন। এমন অকৃত্রিম বাৎসল্যের চিত্র সমগ্র পদাবলী সাহিত্যেই দুর্লভ।

আবার কখনও ননী চুরি করে খাওয়ার জন্য জননী গোপালকে শাস্তি দিলে, অভিমানী বালক নন্দরাজের সামনে গিয়ে কেঁদে কেঁদে বলে—

না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননী চোরা ॥[৩২]

ধেগোপ্যাল এই দুঃখের মধ্যেও নিজের দোষ স্খালনে তৎপর। বলরামই ননী খেয়েছে। অথচ মা তারই নামে দোষ দিচ্ছেন। রাণী ভালোমন্দ কিছুই বিচার করলেন না। অন্য মায়ের ছেলেরাও কত ননী খায়, কিন্তু অন্য কোনো মা-ই ছেলেকে এভাবে বেঁধে রাখে না। বালক কৃষ্ণের আত্ম-সম্মানবোধও বড় তীব্র। রাণী তাঁকে ছাঁদন দড়িতে বেঁধে রেখেছেন। আর তাই দেখে—

আহীরী রমণী হাসে দাঁড়াইয়া চারিপাশে[৩৩]

এই দুঃখ কৃষ্ণ সহ্য করতে পারবেন না, তিনি তাই তাঁর অঙ্গের সব অলংকার খুলে নিতে বলছেন। এই দুঃখে তিনি যমুনা নদী পার হয়ে চলে যাবেন। মা যশোদা পরের সন্তান পেয়েই তাঁর ওপর এত অত্যাচার করছেন। বালক কৃষ্ণের এই অশ্রুসজল অভিমানস্ফুরিত বাক্য বড় মধুর ও চিত্তাকর্ষক। শিশু মানসের এমন বাস্তব রূপায়ণ বলরামের গভীর অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণের সত্যতাকেই প্রমাণ করে। কিন্তু 'পরের ছাওয়াল পাইয়া' কথাটিতে এই সত্যই প্রকাশ পেয়েছে যেন শিশু কৃষ্ণ তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানেন। এটুকু না থাকলে পদটির কাব্যসৌন্দর্য আরও গভীর হতো।

বলরামের গোষ্ঠলীলার পদেও বালক কৃষ্ণ ও জননী যশোদার পারস্পরিক মাধুর্যময় মমতার ছবি। কৃষ্ণ গোপবালক, বংশানুক্রমিক বৃত্তির প্রয়োজনেই তাঁকে অন্যান্য গোপবালকদের সঙ্গে গোষ্ঠে যেতে হবে। কিন্তু পুত্রকে গোষ্ঠে পাঠাতে জননী যশোদার মন চায় না। নানা বিপদের আশংকা আর পুত্রের ভাবী বিরহ—দুই-ই জননীর মনকে ব্যাকুল করে তোলে। তাই একজনের ওপর দায়িত্ব দিয়ে মায়ের মন নিশ্চিন্ত থাকতে চায়। বলরাম কৃষ্ণের মতই শিশু। তবু সেই বালকের হাতেই কৃষ্ণের ভার দিয়ে জননী যশোদা যেন নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চান। কৃষ্ণকে নিয়ে মায়ের আশংকার শেষ নেই। তাই মা বলেন—

কত জন্মভাগ্য করি আরাধিয়া হরগৌরী
পাইলাম এ দুখ পাসরা।
কেমনে ধৈরজ ধরে মায়ে কি বলিতে পারে
বনে যাও এ দুগ্ধ কোঙরা ॥[৩৪]

যে বালক মায়ের আঁচল ধরে ঘুরে বেড়ায়, দণ্ডে দণ্ডে দশবার করে খায়, তাকে বনে পাঠিয়ে মা কেমন করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন? কিন্তু বালক কৃষ্ণ নিজেই মায়ের কাছে গোষ্ঠে যাওয়ার বায়না ধরে। মায়ের মমতায়, মায়ের স্নেহে যেমন তার আকর্ষণ, তেমনি তার নবীন উৎসুক মনে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে বাইরের বিস্তীর্ণ পৃথিবীর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। মাতৃস্নেহ যত প্রবল, যতই গভীর হোক না কেন, তার চেয়ে বাইরের অজানা পৃথিবীর আকর্ষণ অনেক মোহময়। তাই বালক কৃষ্ণ সদ্যোজাগ্রত কিশোর মনের ঔৎসুক্য নিয়ে বলে—"গোঠে আমি যাবো মাগো, গোঠে

আমি যাব"।[৩৫] সে শ্রীদাম সুদামের সঙ্গে বাছুর চরাতে চায়। তাই মায়ের কাছে তার আবদার—মা যেন তার মাথায় চূড়া বেঁধে দিয়ে হাতে বাঁশী ধরিয়ে দেন, সঙ্গী শ্রীদাম তার জন্য রাজপথে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। কৃষ্ণের কথা শুনে মা যশোদা গোপালকে সাজাতে লাগলেন বিভিন্ন বেশে। তার গায়ে পরালেন রত্ন অলংকার; কটিতে কিঙ্কিনী আর পরিধানে পীতবসন, মাথার চুলে দিলেন গুঞ্জাফুল, শিখি পুচ্ছ; পায়ে নূপুর আর গলায় রত্নহার; কপালে পরিয়ে দিলেন তিলক। কিন্তু গোপালকে সাজিয়ে দিয়ে মা কাতর প্রাণে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কারণ এর পরই তো গোপাল গোচারণে চলে যাবে।[৩৬]

বলরামদাসের বাৎসল্যরসের পদে প্রধান চরিত্র দুটি—স্নেহ-বিমুগ্ধা জননী যশোদা আর মাতৃস্নেহ সিঞ্চিত বালক কৃষ্ণ। পটভূমিতে বলরাম জননী রোহিণী, বলরাম, শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি চরিত্র। বলরামদাসের পদগুলিতে গভীরতা সবসময় প্রত্যাশিত নয়, কিন্তু তা আমাদের মনকে এক স্নিগ্ধ অনুভূতিতে ভরে দেয়। মা আর সন্তানের যে সম্পর্ক শাক্ত পদাবলীতে চিত্রিত, তার বিপরীতে আছে নিষ্ঠুর সমাজের বিধিবিধান; সমাজ তার বিধি-বিধানে জননীহৃদয় থেকে সেখানে রক্ত ঝরায়। তাই শাক্ত পদাবলীর মাতৃহৃদয়ের বেদনা একটা জায়গায় আর পারিবারিক গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে না, দেশকাল নির্বিশেষে নানা বিচিত্র বিধিবিধানের যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত অসংখ্য মানুষের আর্তনাদের সঙ্গে মিশে যায়। আর অন্যদিকে বৈষ্ণব পদাবলীর জননীর বাৎসল্য দেশকাল নির্বিশেষ হলেও বিশেষ করে বাঙ্গালী পরিবারের মাতা ও সন্তানের সহজ স্বাভাবিক প্রাত্যহিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এর মাধুর্য, এর স্নিগ্ধতাকে আমরা দেখেও দেখি না। চৈতন্য পরবর্তী পদাবলীকারগণ অভ্যাসের তুচ্ছতায় আকীর্ণ এই বাৎসল্যকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরছেন মমতার স্নিগ্ধ তুলি বুলিয়ে, যেমন করে বহু পরবর্তীকালের বিভূতিভূষণ আর জীবনানন্দ রূপসী বাংলার অবহেলিত অজস্র রূপসম্পদকে এক স্নিগ্ধ সুষমায় অভিষিক্ত করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। বলরামদাসের পদে এই বাৎসল্য বর্ণনায় যেন অনায়াস মাধুর্য নির্গলিত। সেই মাধুর্যের প্রকাশ জননী যশোদার উদ্বেগে, চঞ্চল বালকের অজস্র অসঙ্গত আচরণ সত্ত্বেও তার প্রতি সশঙ্ক স্নেহে।

কৃষ্ণ গোষ্ঠ থেকে ফিরে এলে মা যশোদা প্রথমেই অনুযোগ করে বলেন—

নন্দ দুলাল বাছা যশোদা দুলাল।
এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল ॥[৩৭]

সন্তানকে বাইরে পাঠিয়ে সারাদিন যে তীব্র উদ্বেগে মায়ের কেটেছে, সেই উদ্বেগ আর উদ্বেগমুক্তির আনন্দ—দুটিই যেন এই অনুযোগে প্রকাশ পেয়েছে। সেইসঙ্গে জননী যশোদার আহত মাতৃত্বের অভিমানও পরোক্ষভাবে ফুটে উঠেছে। যে ছেলে মায়ের 'বসন ধরিয়া হাতে' মায়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, সেই ছেলে এতক্ষণ মাঠে কাটিয়ে এল কি করে? যশোদার এই অনতিস্ফুট অভিমান এক মর্ত্যমানবীর স্নেহ-গৌরব সচেতনতাকেই প্রকাশ করেছে।

কিন্তু এই অভিমানকে ছাপিয়ে যায় মায়ের স্নেহসাগরের উত্তাল তরঙ্গ। এতক্ষণের উৎকণ্ঠা আর আশঙ্কার পর গোপাল নিরাপদে ফিরে এসেছে মায়ের কাছে। তাই 'রাণী

ভাসে আনন্দ সাগরে'।[৩৮] একদিকে বলরাম আর একদিকে কৃষ্ণকে বসিয়ে তিনি তাদের মুখে সযত্নে ননী ছানা সর তুলে দেন, কিন্তু আগে দেন বলরামের মুখে। এখানেও কবি মনস্তত্ত্বজ্ঞানের চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন। বলরাম রোহিণীর পুত্র, সে কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ। তাই যশোদা নিজেরে ছেলেকে ফেলে আগে পরের ছেলেকে খাইয়ে যৌথ পরিবারের সৌহার্দ্যের সূত্রটিকে অক্ষুন্ন রাখেন। আবার বলরামের হাতেই তো তিনি তাঁর গোপালের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বলরাম গোপালকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছে—হয়তো এই কারণেও তার প্রতি রাণীর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

কখনও একা বলরামকে নয়—সব সখাদের কাছেই মিনতি করে রাণী বলেন—'গোপাল লৈয়া না যাহ দূরে।'[৩৯] নিজের সন্তানের প্রতি একান্ত মমতায় অন্যেরাও যে বালক—সেই বাস্তব সত্যটিই তিনি ভূলে যান। যশোদার এই স্বার্থপরতাটুকুও মধুর। তিনি বলেন, সখারা সবাই যেন আগে পিছে থেকে গোপালকে মাঝখানে রেখে ধীরে ধীরে গমন করেন। নইলে নব তৃণাঙ্কুর বিদ্ধ হয়ে হয়তো গোপালের রাঙা পায়ে আঘাত লাগবে। তাঁর আরও অনুরোধ—গোপাল ও তার বন্ধুরা যেন কাছাকাছি থাকে, যাতে গোপাল শিঙ্গায় 'মা' বলে ডাকলে তিনি বাড়ীতে থেকেও সে শব্দ শুনতে পান। বিধাতা গোপজাতি করে পাঠিয়েছে, তাই গোপালকে কৌলিক বৃত্তি অনুযায়ী গোধন চরাতে যেতে দিতে হয়, কিন্তু মাতৃহৃদয় তাতে সায় দেয় না। কবি বলরাম ভণিতায় নন্দরাণীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, তিনি গোপালের চরণের বাধা গ্রহণ করবেন।

বাঙালী কবি বলরামদাসের আঁকা এই জননী যশোমতী একান্তভাবেই এক বাঙালী মা। স্বামী'-সন্তান, স্বজন পরিজনে ঘেরা তাঁর একান্ত মমতায় গড়া সংসারের সীমাতেই তাঁর প্রাত্যহিক দিনযাপন ; তিনি সীমা স্বর্গের ইন্দ্রাণী। এর বাইরে কোন বড় আদর্শ, কোনো মহৎ ভাব, সন্তানের কোনো মহৎ কীর্তির ঔজ্জ্বল্য তাঁকে স্পর্শ করে না। তাই সন্তানকে বাইরে যেতে না দিয়ে উপায় নেই জেনেও তিনি তাকে স্নেহাঞ্চলচ্ছায়ায় ঘিরে রাখতে চান। অথচ মহাকাব্যকার বাল্মীকির আঁকা জননী সুমিত্রা, সপত্নী পুত্র রামের সঙ্গে বনবাসে যেতে ইচ্ছুক একমাত্র পুত্র লক্ষ্মণকে বাধা তো দেনই নি, বরং বলেছিলেন—

এষ লোকে সতাং ধর্মো যজ্জ্যেষ্ঠবশগো ভবেৎ ।[৪০]

এখানেই শেষ নয়, তারপরও—"সুমিত্রা গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃ পুনরুবাচ তাম।"[৪১] সুমিত্রা বারবার লক্ষ্মণকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে বনে যেতে বললেন। অন্যদিকে মহাভারতের অনুশাসন পর্বেও আমরা অলর্কজননী মদালসাকে দেখেছি, যিনি পুত্রকে ধর্মমার্গ গ্রহণ করে সংসারত্যাগী যোগী হওয়ার উপদেশ দেন। মহাকাব্যের এই মহীয়সী জননীরা তাঁদের চরিত্রের মহান আদর্শে উজ্জ্বল—কিন্তু আমাদের দূরবর্তিনী। অন্যদিকে জননী যশোদা আমাদের পরিচিত গৃহাঙ্গনের একান্ত আপন এক মাতৃমূর্তি।

কৃষ্ণ দূর বনে চলে গেলেও মা যশোদার আশংকা আর উদ্বেগের অন্ত থাকে না। তিনি অনুযোগ করে বলেন—'কোন বনে গিয়াছিলে ওরে রাম কানু।[৪২] কৃষ্ণ বলরাম দূরে চলে গিয়েছিলেন বলেই আজ মা তাঁদের চাঁদমুখের বেণুধ্বনি শুনতে পান নি। সারা-দিনের রৌদ্রতাপে দগ্ধ বালকের মলিন মুখ দেখেও মায়ের দুঃখের শেষ নেই, মা আঁচলে

বেঁধে দিয়েছিলেন ক্ষীর সর ননী। কিন্তু ছেলেরা তাও খায় নি। তাদের পায়ে নব তৃণাঙ্কুরের অগ্রভাগ বিদ্ধ হয়েছে কিনা তাও রাণী একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখেন। এখানেও সেই একই ছবি। এক স্নেহশঙ্কাতুরা জননীর অতিরঞ্জিত উৎকণ্ঠা আর সন্তানকে নিজের অঞ্চলচ্ছায়ায় ঘিরে রাখতে না পারায় তার শুভাশুভ সম্পর্কে উদ্বেগের প্রকাশই ঘটেছে এখানে।

কিন্তু বলরামদাস শুধু কৃষ্ণের অদর্শনে, মায়ের উৎকণ্ঠাই বর্ণনা করেন নি, সেই সঙ্গে তাঁর কৃষ্ণও গোচারণ ক্ষেত্রে মায়ের জন্য ব্যাকুলতা বোধ করেছে। একদিকে বাইরের পৃথিবীর আহ্বান আর অন্যদিকে মায়ের স্নেহ, এই উভয় আকর্ষণে সমানভাবে দোদুল্যমান এই বালক কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান, তা আমাদের মনেই হয় না। তিনি বাঙালী পরিবারেরই এক মাতৃবৎসল শিশু। তাই সারাদিনের খেলাধুলোর পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে, মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে গোপাল শ্রীদামকে বলে—

পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায়।
সঘনে বিষম খাই নাম করে মায় ॥[৪৩]

এবং মাকে না দেখে গোপালের 'প্রাণ কেমন জানি করে'।

বাৎসল্যরসের মত সখ্যরসের পদরচনায়ও বলরামদাস কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গোষ্ঠে গিয়ে কৃষ্ণ বলরাম দুজনে দুটি দল তৈরি করে খেলা করেন। যে দল জিতবে, সে অপর দলের ঘাড়ে চাপবে—এই হল পণ। খেলায় বলরাম জিতলেন। কৃষ্ণ এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা বলাইএর দলকে বয়ে নিয়ে চললেন বংশীবটের তলে। কৃষ্ণ সুদামকে, আর সুবল বলাইকে কাঁধে নিলেন। স্বাস্থ্যবান বলাইকে কাঁধে বইতে খুবই কষ্ট হল সুবলের। সে ক্রুদ্ধ হয়ে বলল "আর না খেলিব কানুর সঙ্গে"।[৪৪] কারণ কানাই জিতেও হেরে যায়, আর বলরাম হেরেও জেতে। আবার কখনও বা যমুনার তীরে কৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলেন। কিন্তু রৌদ্রতাপে কৃষ্ণের মুখখানি মলিন হলে সখারা বলে—"দেখিয়া বিদরে হিয়া আমাদের সভাকার"।[৪৫] কেবল জননী যশোদা নয়, কৃষ্ণের প্রতি সখাদের মনেও আছে নিবিড় ভালবাসা, সেই ভালবাসার পরিচয়ই এখানে ফুটে উঠেছে।

'নটবর নব কিশোর রায়'[৪৬] পদটিতে কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার সঙ্গে মধুর রসের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। ছন্দেও অভিনবত্ব আছে। বলরামদাসের বাল্যলীলা বর্ণনায় একটি কালীয়দমনের পদও আছে। পদটিতে[৪৭] দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ কালীয়দমনের জন্য জলে ডুব দিয়েছেন। তাই ব্রজবাসী সমস্ত মানুষ ও পশুপাখী কৃষ্ণের মৃত্যু আশঙ্কা করে হাহাকার করছে। কবি বলরাম, ভণিতায় সবাইকে প্রবোধ দিয়ে স্থির থাকতে বললেন। চৈতন্য পূর্ববর্তী পদাবলী সাহিত্যে, বাৎসল্যলীলার পদ যেমন ছিল না, তেমনি কৃষ্ণের ঐশ্বর্য প্রকাশক এই সমস্ত লীলার আভাস থাকলেও এগুলিকে নিয়ে পদ রচিত হয় নি। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী যুগে ঐশ্বর্যে-মাধুর্যে বিমিশ্র কিছু কিছু পদ দেখা যায়।

রাধাকৃষ্ণলীলাকথা নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে বলরামদাস যে পদগুলি রচনা করেছেন, তাতে পরিকল্পনার মৌলিকতা খুব একটা নেই। কিন্তু নিতান্ত সহজ ভাষায়, নিরাভরণ ভঙ্গীতে তিনি তাঁর পদগুলির মধ্যে মাধুর্যের সঞ্চার করতে পেরেছেন। সারল্যস্নিগ্ধ

এই পদগুলিতে কবির হৃদয়াবেগ সঞ্চারিত হয়ে এগুলিকে আধুনিক পাঠকেরও মনোধর্মের নিকটবর্তী করে তুলেছে।

বলরামদাসের পদে কৃষ্ণ সখীর কাছে রাধার রূপ বর্ণনা করেছে। এটিকে সম্পাদক 'শ্রীরাধার রূপ' পর্যায়ে রাখলেও এটিকে আসলে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদ বলেই অভিহিত করা যায়। কৃষ্ণ গোচারণ থেকে ফেরার সময় দেখতে পেয়েছেন রাধা কালিন্দীর বন থেকে ফুল তুলে ফিরছেন, তাঁর সঙ্গে আছেন সখীরা। সেই সখীপরিবৃতা রাধাকে দেখে কৃষ্ণের মনে হল যেন চাঁদ নেমে এসেছে, আর তাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করে আছে তারাগণ। রাধার দেহবর্ণ চম্পকের মত, বেণীতে ঝলমল করছে মণি, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। রাধা ঈষৎ হেসে কৃষ্ণের দিকে কটাক্ষপাত করলেন।[৪৮] এইভাবে কৃষ্ণের মুখ দিয়ে নিতান্ত সহজ সরল ভাষায়, গতানুগতিক আলঙ্কারিক প্রথা অনুসরণ করে কবি বলরামদাস রাধার রূপ ও সেই রূপের প্রতি কৃষ্ণের আকর্ষণ বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে রাধার মুখ দিয়ে কৃষ্ণের রূপও কবি অনুরূপভাবেই বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণের কপালে চন্দন চাঁদ যেন নাগরীদের ভোলানোর জন্য ফাঁদ, মাথায় বিনোদ ময়ূরের চূড়া। কৃষ্ণের এই রূপ দেখে রাধা জাতিকুল বিসর্জন দিলেন।[৪৯] দুটি পদকেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার রূপানুরাগ পর্যায়ে ফেলা যায়।

'পূর্বরাগ ও অনুরাগ' পর্যায়েও বলরামদাসের রাধা বিমুগ্ধভাবে কৃষ্ণের রূপ ও সেই কৃষ্ণরূপদর্শনে তাঁর নিজের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেন। 'কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম'[৫০] শীর্ষক পদটিতে শুধু কৃষ্ণের রূপ নয়, 'বৈদগধি ঠাম' শব্দ দুটির সাহায্যে প্রেমকলানিপুণ কৃষ্ণের কথাই বলা হয়েছে। মরকতের মত কৃষ্ণের শ্যামল অঙ্গ। তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি অভিনব কামদেব। কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গই কোন্ বিধাতা কি অপূর্ব সৌন্দর্য দিয়ে নির্মাণ করেছেন—দেখতে দেখতে রাধার মনে হয় কৃষ্ণের এই রূপ যেন অমৃত বর্ষণ করছে। রাধা স্বপ্নেও কৃষ্ণের রূপ দেখেন। খেতে শুতে সব সময়েই তাঁর মনে কৃষ্ণের রূপ লেগে থাকে। কৃষ্ণের রক্ত বর্ণ অধরে মৃদু মধুর হাসি, তাঁর চঞ্চল নয়নের দৃষ্টি রাধার জাতিকুল হরণ করে, কৃষ্ণের ভ্রূভঙ্গীতে রাধার বক্ষ যেন অনুরাগের আবেগে বিদীর্ণ হয়। কৃষ্ণ মন্থর পদে আধো আধো চলেন। কৃষ্ণের সেই মন্দমধুর চলন-ভঙ্গিমায় রাধার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। রাধার মনে হয়, কৃষ্ণের অঙ্গের স্পর্শে পাষাণও যেন মিলিয়ে যায়। পাষাণের কঠিন অবয়বকেও যে অঙ্গস্পর্শ দ্রবীভূত করতে পারে, সেই অঙ্গস্পর্শে রাধার প্রতিক্রিয়া সহজেই বোঝা যায়। পদটিতে কবি কৃষ্ণরূপবিমুগ্ধা রাধার আনন্দ-আবেগ-ব্যাকুলতাময় প্রেমানুভূতিকেই রূপ দিয়েছেন।

পূর্বরাগ পর্যায়ে রাধা কৃষ্ণপ্রেমে এতই নিমগ্না যে, তাঁকে এক কথা বললে তিনি আর এক কথা শোনেন, এক বোঝালে আর বোঝেন।[৫১] কিছু প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারেন না, চোখ জলে ভরে ওঠে। রাধা হাস্য পরিহাস সব কিছুই ত্যাগ করে যেন পাগলের মত হয়ে গেছেন। তিনি কাতর চোখে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করছেন, কাতরভাবে কথা বলছেন আর মাঝে মাঝেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন। দারুণ বেদনায় তাঁর দুচোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ছে, অধর কম্পিত হচ্ছে। পূর্বরাগের বেদনায় অধীরা এই রাধা একান্ত-ভাবেই চণ্ডীদাসের রাধার অনুকরণে গড়া। 'মুখ দেখিতে বুক বিদরে'[৫২] শীর্ষক পদটিতে রাধা যমুনায় যাওয়ার সময় কৃষ্ণকে দেখে কুলে তিলাঞ্জলি দিয়েছেন। কৃষ্ণের

বাঁকা চোখের চাহনি রাধা একতিলের জন্যও ভুলতে পারেন না। 'অঙ্গে অঙ্গে মণি'[৫৩] শীর্ষক পদটিতে রাধা বলেন—

চন্দন তিলক আধ ঝাঁপিয়া
বিনোদ চূড়াটি বান্ধে।
হিয়ার ভিতরে লোটায়্যা লোটায়্যা
কাতরে পরাণ কান্দে ॥

পদটিতে কৃষ্ণের বর্ণনা গতানুগতিক। কিন্তু সেই রূপ দেখে রাধার প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় বলরামদাস তাঁর রোম্যাণ্টিক কবি সত্তার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটিয়েছেন। রাধার হৃদয়ের ভিতরে লুকোনো যে প্রাণ, সেই প্রাণ কৃষ্ণের রূপতৃষ্ণায়, তাঁর প্রেমের বেদনায় লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদে। বাইরের জগতে অজস্র প্রতিকূলতা। তাই রাধার তীব্র অন্তর্বেদনা আকুল অস্থিরতায় হৃদয়ের গহনতম কোণেই লুটিয়ে পড়ে। জীবনের সবচেয়ে গভীরতম সত্যকে, সবচেয়ে অকৃত্রিম অনুভবকে অপ্রকাশ রাখতে বাধ্য হওয়ার যন্ত্রণায় দীর্ণ-নারী চিত্তের নিঃশব্দ হাহাকারকে মরমিয়া কবি চণ্ডীদাসও এমনভাবে চিত্ররূপ দিতে পারেন নি। হাহাকারকে এমনভাবে ছবিতে ফুটিয়ে তোলার সামর্থ্য বড় সহজসাধ্যও নয়। 'নষ্টনীড়ে'র শিল্পী হয়তো চারুর এই গহন চিত্তের গভীরতাকে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু এমন আঁকা ছবির শিল্পরূপ আমাদের উপহার দিতে পারেন নি।

অন্যদিকে বলরামদাসের কৃষ্ণ দূতীর মাধ্যমে রাধার প্রতি তাঁর প্রেম নিবেদন করেছেন। কৃষ্ণের রাধাপ্রেমেও কামনার উত্তাপের পরিবর্তে বাৎসল্যের স্নিগ্ধ মাধুরীই বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। তিলেকের জন্যও রাধার স্পর্শ না পেলে কৃষ্ণ বাঁচতে পারেন না। রাধার অঙ্গের স্পর্শ পেলে কৃষ্ণ যে সুখ পান, তাতে তাঁর মনে হয় বুকের ভেতর তিনি রাধাকে বেঁধে রাখবেন। রাধাকে ছেড়ে দিতে তাঁর প্রাণ ফেটে যায়। কৃষ্ণ বলছেন, বিধাতা নিদারুণ বলেই রাধার সঙ্গে তাঁর দেহ পৃথক করে গড়েছেন। রাধার মুখ দেখলেই তাঁর মন আনন্দিত হয়ে ওঠে। তিনি মনে করেন, যেন তিনি সর্ব-সিদ্ধিলাভ করেছেন। আবার কখনও কৃষ্ণের মনে হয়, রাধাকে বুকে নিয়ে তিনি লোকালয়ের বাইরে নির্জন অরণ্যে চলে যাবেন। কবি বলরাম ভণিতায় বলছেন সেখানে কৃষ্ণ মনের সুখে রাত্রিদিন রাধার মুখ দেখবেন। এখানে কামনার তীব্র উন্মাদনা কোথায়? কোথায় ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা পানের উদ্দাম আগ্রহ? কৃষ্ণের কাছে রাধা এক পরম সম্পদ। তাঁর অন্তরের নিভৃতে সেই সম্পদকে তিনি সংগুপ্ত রাখতে চান, তাকে অনুভব করতে চান একান্ত মমতায়।

শেষ পর্যন্ত তাই এই মধুর মূরতিধারী, রাধাপ্রেমে একান্তভাবে সমর্পিতচিত্ত কৃষ্ণের প্রেমে রাধা জাতিকুল সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে বলেছেন—

জাতিকুল জীবন এ রূপ যৌবন
নিছিয়া পেলিলু তার পায় ॥[৫৪]

কিন্তু যতই মুখে বলুন, তবু কুলবধূ রাধার মন প্রেম আর লোকভয়—উভয়ের মাঝখানে দ্বিধান্দোলিত। রাধার ননদিনী বিষের মতো, আর শাশুড়ি যেন জ্বলন্ত আগুন। দুর্জন স্বামী শানানো ক্ষুরের মতই ধারালো। কিন্তু তবুও রাধার বক্তব্য

—"যে বলু সে বলু লোকে তুমি সে পরাণ'।[৫৫] কৃষ্ণানুরাগিণী রাধা কখনও আবার কৃষ্ণকেই সম্বোধন করে বলেন—'দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা'।[৫৬] কারও কাছে মুখ ফুটে তিনি মনের কথা বলতে পারেন না। ননদীর জ্বালায় কেঁদে মনের দুঃখভার লাঘব করবেন—সে উপায়ও তাঁর নেই। শাশুড়ি রাধাকে 'কালা' নাম উচ্চারণ করতে দেন না, কালো হার আর কালো পাটের শাড়ী রাধাকে পরতে দেন না, জোর করে কেড়ে নেন। এই সমস্ত দুঃখের চেয়েও রাধার কাছে বেশী দুঃখের হল তিনি গৃহে অবরুদ্ধ। কৃষ্ণের মুখ তিনি দেখতে পান না। তাই তিনি করুণভাবে বলেন—'দেখা দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে' রাধার এই অনুযোগ মিশ্রিত অনুরোধ থেকে বোঝা যায়, তাঁর প্রেমে অহং-এর লেশ মাত্র নেই। সেই সঙ্গে কামনার মাদকতাও নেই, প্রেমাস্পদকে একবার মাত্র দেখতে পেলেই তাঁর অপমানিত জীবনের জ্বালা দূর হবে। রাধা বলেন, কৃষ্ণের এত উপেক্ষায়ও তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রাধার প্রাণ চলে যায় না। তীব্র অভিমানে স্ফুরিতাধরা এই রাধার উক্তি একেবারেই শাশুড়ি-ননদী তর্জিতা চণ্ডীদাসের রাধারই অনুরূপ। বলরামদাসের আক্ষেপানুরাগের রাধাও তাই মধ্যযুগের পল্লীবাংলার এক ভীরু কুলবধূ। আবার কখনও কৃষ্ণ-কলঙ্কজর্জরিতা রাধা কাতরভাবে বলেন—'সভে বলে সুজন পিরিতি যেন হেম'।[৫৭] কিন্তু তাঁর কাছে কালিয়ার প্রেম বড়ই বিষম মনে হয়। গৃহবাস যেন শেলের মতই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। কৃষ্ণের প্রেমের কথা মনে করে তাঁর প্রাণ অনর্গল অশ্রু- ধারায় সিক্ত হয়। কৃষ্ণের প্রেমের স্মৃতি রাধার হৃদয়ে অক্ষরে অক্ষরে লেখা হয়ে আছে। কৃষ্ণের হাসিমাখা কথা যেন রাধার পাঁজর কেটে বসেছে। আর তা স্মরণ করে তাঁর মনে যেন আগুনের খনির মতই জ্বালা। এই প্রেমকে রাধা ভুলতে পারেন না, তাই এ যেন শেলের মত বিঁধে থাকে অন্তরে।

আবার কখনও রাধা বলেন—"আন্ধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরী।"[৫৮] বিধাতা তাঁকে কুলনারী করে সৃষ্টি করেছেন। তাই দুঃখের কথা বলার মত কেউ নেই, চন্দ্র সূর্যের মুখও তিনি দেখতে পান না। কিন্তু কৃষ্ণের প্রেম তাঁর মনে আঙ্গিনা দেখার সাধ জাগিয়েছে। কৃষ্ণের রূপ দেখার পর রাধার প্রাণ রাত্রি-দিনই কাঁদে। গুরুজনের সামনে তিনি অন্য কথা বলতে চান, কিন্তু ভুলক্রমে তাঁর মুখে এসে যায় শ্যামের নাম। আর শ্যাম নাম মুখে এলেই তাঁর তনু হয় ভাববিভোর, কণ্ঠস্বর হয় গদগদ, তিনি চোখের জল ধরে রাখতে পারেন না। আক্ষেপানুরাগের এই রাধাও একান্তভাবে চণ্ডীদাসেরই রাধার প্রতিচ্ছবি। তাঁর কাছেও 'ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ'। এই অবরোধের অন্ধকার তাঁর বাঞ্ছনীয় নয়, তাই তিনি চন্দ্র-সূর্যের মুখ দেখতে না পাওয়ার দুঃখ প্রকাশ করেন। কৃষ্ণের প্রেমই তাঁর মনে এই অবরুদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির বাসনা জাগিয়েছে। কৃষ্ণপ্রেম তাই রাধার বন্ধ জীবনে মুক্তির ইশারা। এক আলোক পিপাসিনী নারীর অন্তঃপুরের অবরোধ ছিন্ন করার অক্ষম চেষ্টাও রাধার এই কান্নার মধ্যে বেজে উঠেছে।

আবার কখনও কৃষ্ণপ্রেম পাগলিনী রাধা সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে, ভীরুতার বাধা অতিক্রম করে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন—

ছাড়ে ছাড়ুক পতি কি ঘর বসতি
কিবা করিবে বাপমায়।

জাতি জীবন ধন এরূপ যৌবন
নিছনি ফেলিব শ্যাম পায় ॥[৫৯]

স্বামী রাধাকে পরিত্যাগ করলেও, গৃহের পরিবেশ থেকে বিচ্যুত হলেও অথবা পিতা-মাতা দোষারোপ করলেও কিছু এসে যায় না। কৃষ্ণের জন্য রাধা এখন শুধু তাঁর পারিবারিক পরিবেশ নয়, পিতামাতার স্নেহকেও ত্যাগ করতে প্রস্তুত। রাধা এখন প্রেমের দশমী দশায় এসে পেঁৗছেছেন, কৃষ্ণকে ছাড়া তিনি প্রাণধারণ করতে পারবেন না। তাই তাঁর কুলধর্ম আর লোকলজ্জা দুই-ই একসঙ্গে দূরে গেল। এখন তিনি কৃষ্ণকে সামনে রেখে সব সময়েই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবেন, কৃষ্ণকে হার করে তিনি গলায় গেঁথে রাখবেন, নানাভাবে তাঁকে সাজাবেন, কৃষ্ণের চাঁদমুখে তিনি তাম্বুল ধরে দেবেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় রাধার এই বাসনা নিতান্তই সামান্য। কিন্তু কৃষ্ণ পরপুরুষ, তাই অন্যের কুলবধু রাধার পক্ষে এই বাসনা অত্যন্ত অসম্ভব। যেখানে কৃষ্ণের দেখা পাওয়া, তাঁর সঙ্গে কথা বলাই রাধার পক্ষে সহজ নয়, সেখানে রাধার এই আকাঙ্ক্ষা যে কত দূরবর্তী আকাঙ্ক্ষা তা সহজেই বোঝা যায়। রাধার এই অসম্ভব বাসনাটুকুই তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের গভীরতা, কৃষ্ণসান্নিধ্যের জন্য ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করছে।

বলরামদাসের 'অভিসার' পর্যায়ের পদে কাব্যসৌন্দর্য অথবা ভাবগভীরতা কোনটাই লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর রাধা মণিময় আভরণ ও বিচিত্র বসন পরে অভিসারে যান গজেন্দ্রগমনে। বৃন্দাবনে গিয়ে রাধা এদিক ওদিক তাকিয়ে মাধবিলতার নীচে কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন। এবং—বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে।
নিজ অঙ্গবাসে মুছে বদন কমলে ॥[৬০]

হেঁটে আসতে রাধার পায়ে না জানি কত ব্যথা লেগেছে, কৃষ্ণের বাঁশীই রাধাকে এত দুঃখ দিল ভেবে কৃষ্ণ ব্যথিত হয়েছেন। অভিসারিকা রাধা ও মিলনব্যাকুল কৃষ্ণের এই বর্ণনায়ও নায়কনায়িকার মিলনের উন্মাদনাময় উত্তাপ নেই, আছে বাৎসল্যের উদ্বেগ, আশঙ্কাময় স্নিগ্ধতা।

এই কবির রসোদ্গারের পদগুলি, রাধার প্রেমতৃপ্ত পুলকিত হৃদয়ের দুকূল প্লাবী আনন্দ ধারায় অভিষিক্ত। 'রাতি দিন চোখে চোখে'[৬১] শীর্ষক পদটিতে দেখা যায় কৃষ্ণ যেন সর্বদাই রাধাকে চোখে চোখে রাখতে পারলে আনন্দ পান। তিনি রাধার মুখের প্রসাধন রচনা করে দেন এবং বারবার রাধাকে দেখেও স্বস্তি পান না। রভসরজনীর কামকলা সর্বস্বতা নয়, এই প্রেম হৃদয়ের গভীরতর আকূতির স্পর্শে দীপ্তিমান। তাই তো বারবার চিবুকটি তুলে রাধার মুখের দিকে অতৃপ্ত নয়নে কৃষ্ণ তাকিয়ে থাকেন। রাধা নিঃশ্বাস ফেললেই কৃষ্ণ—'গুণে পরমাদে কাতর হইয়া পুছে'।[৬২] রাধার সামনে দাঁড়িয়ে জোড়-হাতে তিনি প্রেমভিক্ষা করেন। দেহকামনা নয়, কৃষ্ণের প্রেম এক অনির্বচনীয় মমত্বে স্নিগ্ধ। যাকে জগতে সবাই বিদগ্ধ বলে জানে—সেই কৃষ্ণ যেন রাধার সামনে এসে অবোধ হয়ে যান। রাধার জন্য উদ্বেগে সারারাত উজ্জ্বল বাতি জেলে কৃষ্ণ বসে থাকেন। মুখে ঘন ঘন চুম্বন করেও যেন কৃষ্ণের তৃপ্তি হয় না। কখনও বুকে, কখনও পিঠে—কোথায় রাধাকে রাখবেন, কৃষ্ণ যেন ভেবেই পান না। তাই এত বর্ণনার পর রাধার উক্তি—

দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায় ॥[৬৩]

রাধার প্রতি কৃষ্ণের এই ব্যাকুল সশংক প্রেমবৈচিত্ত্য চিত্রণে বলরাম দাসের নিজস্ব কবি স্বভাবের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবও কাজ করেছে মনে হয়। দরিদ্রের ধন যেমন তার নিষ্কিঞ্চন জীবনের একমাত্র সম্বল, তার অস্তিত্বের স্থিরতার প্রতিশ্রুতি, রাধাও কৃষ্ণের পক্ষে তাই-ই। সেবকের মত কৃষ্ণ রাধার পায়ে আলতা পরিয়ে তাতে নিজের নাম লিখে দেন। কৃষ্ণের ভালবাসা আত্মসমর্পণে মধুর, সেবায় নম্র, প্রেম-নিবেদনের অজস্র বৈচিত্র্যে বর্ণোজ্জ্বল। কৃষ্ণ রাধাকে শাড়ী পরিয়ে তাঁর চলা দেখেন। দেখে মুগ্ধ হয়ে দুবাহ বাড়িয়ে ছুটে ধরতে যান। রাধার গায়ে চন্দন মাখিয়ে কৃষ্ণ নিজে বসনে বীজন করেন, মুখে তুলে দেন তাম্বুল। এত অনুরাগ যার—সখীর কাছে তার কথা বলতে গিয়ে রাধার মনে হয়—

না জানি কেমনে আছয়ে এখনে
মোরে কাছে না দেখিয়া [৬৪]

শুধু কৃষ্ণই নয়, রাধা নিজেও এই অতলস্পর্শ প্রেমের জন্য প্রতিক্ষণেই আতুর। তাই সখীর সাথে কথা বলার যে অদর্শন টুকু, তাতেও রাধার 'সোয়াস্ত ন পাঙ হিয়'। যে প্রেমিক—

ও বুক চিরিয়া হিয়া মাঝারে
আমারে রাখিতে চায়॥[৬৫]

তার পীরিতি ফাঁদে ধরা না দিয়ে রাধার উপায় কি? শুধু তাই নয়, অন্ধকারে দীপ হাতে তুলে রাধার মুখখানি দেখে কৃষ্ণের চোখ জলে ভেসে যায়, বেণীবন্ধন আলুলায়িত করে আবার তিনি রাধার কবরী রচনা করে দেন। বলরামের এই রসোদ্গারের পদগুলি পড়তে পড়তে এর অমর্ত্যদ্যুতি নিষ্প্রভ হয়ে যায় আমাদের কাছে। ধূলিধূসরিতা শ্যামা পৃথিবীর সীমিত আয়ুর গণ্ডীতে ঘেরা শঙ্কিত ভালবাসার আনন্দবেদনার উদ্বেল অনুভূতি আমাদের মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। প্রেমিকের এই অতৃপ্ত প্রেমের আরতিকে 'নন্দন নিকুঞ্জের রঞ্জনার ধারা' নয়, মনে হয় যেন মর্ত্য কুটিরের দেহলীতে বয়ে যাওয়া অশ্রুছলোছল চূর্ণী নদীর করুণ স্রোত। কৃষ্ণের এই প্রেমে জ্বালাময় উন্মাদনা নেই, বাৎসল্যের স্নিগ্ধতার স্পর্শে এই প্রেম সুন্দর কমনীয় হয়ে উঠেছে। গতানুগতিকভাবে ভোগচঞ্চল কৃষ্ণকে অংকন না করে বলরামদাস তাঁর প্রেমিক কৃষ্ণের মধ্যে সস্নেহ বেদনা ও মমতা সঞ্চার করেছেন।

বলরামদাসের পদের রসোদ্গারেও তাই বাৎসল্যের উপস্থিতি। তাঁর কৃষ্ণ রাধাকে সেবা আর স্নেহ দিয়েই ভরিয়ে দিতে চান, কামনার উত্তাপ তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

বলরামের বাসকসজ্জার পদে কবির নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু কৃষ্ণকথার বৈচিত্র্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। রাধা যখন কৃষ্ণ বিরহে নিতান্ত মলিনভাবে সময় কাটাচ্ছেন, সেই সময় দূতী এসে বলল —'চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শ্যাম শুন চন্দ্রমুখী।'[৬৬] রাধা একথা শুনে বলরামের বেশে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাওয়া স্থির করলেন।[৬৭] সখীরা রাধাকে বলরামের বেশে সাজিয়ে দিলেন। রাধার গলায় ললিতা কদম ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। এরপর বলরামবেশিনী রাধা চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে প্রবেশ করলে চন্দ্রাবলী

তাঁকে বলরাম ভেবে লুকিয়ে গেল।[৬৮] ছদ্মবেশিনী রাধা কৃষ্ণের হাত ধরে বাইরে আনলেন। তারপর নব অনুরাগে কুঞ্জে দুজনের মিলন হল।

রাধা কৃষ্ণের দানলীলা ও নৌকালীলার কয়েকটি পদও বলরাম দাস রচনা করেছেন। দাসীর মাথায় ঘৃত, দধি, দুগ্ধের পসরা সাজিয়ে রাধা বড়ায়ির সাথে চলেছেন মথুরার দিকে। যেতে যেতে কানুর প্রসঙ্গ উঠল, আর অমনি রাধা প্রেমভরে যেন চলতে পারলেন না। অতঃপর যথারীতি কৃষ্ণ এবং রাধা—উভয়ের ছদ্মকলহ শুরু হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ বলেন, রাধার প্রেমের জন্যই তিনি দানী সেজেছেন। কারণ কৃষ্ণের মতে—

দিবানিশি হেন বাসি অমৃত সাগরে ভাসি
চিন্ময় শুদ্ধ তোহারি পিরীতে ॥[৬৯]

শ্রীকৃষ্ণের এই অকুণ্ঠ অথচ পবিত্র প্রেম নিবেদন রাধার অন্তরেও সাড়া জাগায়। রাধাও অকপটে বলেন, কৃষ্ণ যখন আঙ্গিনার কাছ দিয়ে বাঁশী বাজিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে দেখার জন্য রাধা অট্টালিকার ওপরে সবে উঠেছিলেন ; কিন্তু কৃষ্ণ রাধার দিকে ফিরেও তাকালেন না, বলরামের সঙ্গে নাচতে নাচতে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরই কৃষ্ণ অদর্শন হলে রাধা কাঁদতে কাঁদতে ললিতার কাছে গেলেন। চতুরা ললিতা দানের ছলে দুজনকে মেলানোর ব্যবস্থা করলেন। সেই জন্যই রাধা কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পেলেন।[৭০]

নৌকাবিলাসের পদে রাধা এবং তাঁর সখীরা নদী পার হওয়ার জন্য এলে কাণ্ডারী কৃষ্ণ তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, এবং তাঁদের চরণ নৌকায় পড়বে বলে তিনি কৃতার্থতাও জানিয়ে দিলেন। অতঃপর কৃষ্ণ জানালেন, তাঁর নৌকায় একটু গোলমাল দেখা দিয়েছে, আগে সারিয়ে তারপর কূলে আনতে হবে।[৭১] প্রত্যুত্তরে রাধা ও তাঁর সখীরা বললেন যে, এ কাণ্ডারীর আসলে খেয়া পারাপারের অভিজ্ঞতা নেই। নৌকা ভাড়া নিয়ে এসেছে। তাঁরা পয়সা দিয়ে নৌকা চড়বেন, সুতরাং ভাঙা নৌকো চলবে না, নতুন নৌকো গড়িয়ে আনতে হবে। এই কথোপকথনের মধ্যেই রাধা-কৃষ্ণের চোখে চোখ মিলল। দুজনেই দুজনের নয়নবাণে জরজর। তাঁদের হৃদয়ে প্রেমের সিন্ধু উথলে উঠল।[৭২]

বলরাম দাসের রাসলীলার একটি পদও রয়েছে।[৭৩] কিন্তু পদটি আমাদের আলোচ্য বলরামদাসের লেখা নয় বলেই মনে হয়। কারণ এটি ব্রজবুলিতে লেখা। বলরামদাসের নামে রসালসের যে পদগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি ব্রজবুলিতে লেখা, সুতরাং পরবর্তীকালের বলরামদাসের রচনা বলেই ঐগুলিকে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

'খণ্ডিতা পর্যায়ের 'দেখ সখি হোর কিয়ে নাগররাজ'-ও [৭৪] পরবর্তী বলরামদাসেরই লেখা। পদটিতে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ বিপরীত বেশ ধারণ করে সকালবেলা রাধার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন।' রাত্রি জাগরণে তাঁর চোখ দুটি স্থল-পদ্মের মত রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। কৃষ্ণের মুখচন্দ্র যেন সূর্যকিরণের ভয়েই মলিন হয়েছে। কৃষ্ণের শ্যাম অঙ্গে পীতবসনের পরিবর্তে নীলবসন। মনে হচ্ছে যেন মেঘে মেঘে মিলে গেল। তাই দূর থেকে কৃষ্ণকে দিগ্বসন মনে হচ্ছে। তাঁর টলমল দুটি পায়ে বাজছে মণিময় নূপুর।

আমাদের আলোচ্য চৈতন্য অনুচর বলরামের একটি পদে[৭৫] রাত্রির অবসান হয়েছে

দেখে, রাধা নিশ্বাস ত্যাগ করে সখীদের বারবার বলছেন, তাঁকে নিরাশ করে কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়ে রাত্রিযাপন করেছেন। তিনি সখীদের শিখিয়ে দিলেন, কেউ যেন শ্যামের দিকে না তাকায়; সবাই যেন শিবের চরণে চিত্ত স্থির রাখে। বৃন্দাবনের বাস তুলে দিয়ে রাধা তাই কৈলাসে যেতে চান। সম্ভবত এর কারণ হল শিবের সঙ্গে দুর্গার তো কোন সময়েই বিচ্ছেদ হয় না, তিনি পত্নীকে অর্ধাঙ্গেই ধারণ করে রাখেন। এরপর সখীরাও খণ্ডিতা রাধার মান দূর করার চেষ্টা করেছে।

বলরামদাসের বিরহ পর্যায়ের পদে বিদ্যাপতির মতো বিরহের উচ্ছ্বসিত সোচ্চার প্রকাশ নেই। সরলা রাধা নিতান্ত সহজ ভাষাতেই তাঁর অন্তরের বেদনাকে প্রকাশ করেছেন। "কে মোরে মিলাঞা দিবে সো চাঁদ বয়ান"।[৭৬] শীর্ষক পদটিতে রাধা কাতরভাবে বলেন, সেই চাঁদমুখ কৃষ্ণকে আবার কে তাঁর কাছে এনে দেবে। সেই মুখ দেখে তাঁর চোখ দুটি তৃপ্ত হবে। কৃষ্ণ-বিরহে রাধার রাত্রি যেন ক্রমাগত দীর্ঘ হয়ে ওঠে। সারারাত্রি বিনিদ্রভাবে ওঠা বসা করে তাঁর রাত্রি প্রভাত হয়। রাধার কাছে আজ কৃষ্ণকে ছাড়া ধনজন যৌবন, বন্ধুজন সবই নিরর্থক মনে হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাধা আশা ছাড়েন নি। তাই শেষ মুহূর্তে রাধা মথুরাপুরীতে দূত পাঠানোর জন্য লোক খোঁজেন।

বিরহী কৃষ্ণের বারমাস্যার যে পদটি বলরামদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়, সেটিও ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। সুতরাং চৈতন্য পরবর্তী বলরামদাসের পদ বলেই মনে হয়।[৭৭] তবে যে বলরামের পদই হোক না কেন, শ্রীকৃষ্ণের এই বারমাস্যার পদটি অভিনব সন্দেহ নেই। কারণ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নানা প্রসঙ্গে নারীদেরই বারমাস্যার বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন—ফুল্লরার বারমাস্যা, সুশীলার বারমাস্যা, সতী ময়নার বারমাস্যা ইত্যাদি।

বলরাম দাসের মিলন পর্যায়ের পদে বিদ্যাপতির মত অলংকৃত আদিরসের উদ্দাম-উতরোল বর্ণনা নেই। আবার চণ্ডীদাসের মত 'মিলন' পর্যায়কে কবি একেবারে বাদও দেন নি। তাঁর রাধাকৃষ্ণ স্নিগ্ধ মনোরম সান্নিধ্যের পারস্পরিক আনন্দেই তৃপ্ত। নব বসন্তের মনোরম পরিবেশে সজল জলদের মত কৃষ্ণ, আর কাঞ্চন বরনী রাধা-দুজনে শুধু দুজনের মুখ দেখেই আনন্দ পান আর কেলি-কল্পতরুর মূলে সুখে সময় যাপন করেন।[৭৮] 'যোই নিকুঞ্জে আছয়ে ধনি রাই'[৭৯] শীর্ষক পদটিতে নিকুঞ্জে অপেক্ষমানা শ্রীরাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন বর্ণিত হয়েছে। এখানেও আদিরসের অনাবৃত বর্ণনা নেই। শুধু পরস্পরের ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে রাধাকৃষ্ণের নিবিড় গভীর আনন্দের প্রকাশটুকু ঘটেছে। এখানেও বাৎসল্যরসের স্নিগ্ধ কবি বলরামের পক্ষে নরনারীর মিলনের উদ্দামতা রূপায়িত করা সম্ভব হয় নি। কখনও মিলনের আনন্দে বিভোর কৃষ্ণ রাধাকে বলেন—

> তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি
> না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি ॥[৮০]

কৃষ্ণের এই উক্তি চিরকালের প্রেমিকের প্রেম রহস্যের অনুভব। নিজের ভালবাসার রঙে রাঙানো এই রাধার রূপের মধ্যে যে অনির্বচনীয়ত্ব, তাকে অনুভব করেই কৃষ্ণ বিমুগ্ধ বিস্ময়ে শুধু এটুকু উচ্চারণ করেন—"না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি"।

এই চিরচেনার মধ্যেও অচেনার রহস্যই রোম্যাণ্টিকতার প্রাণ। রাত্রিদিন অনিমেষ নয়নে চেয়ে থেকে কোটি কল্প ধ'রে যদি কৃষ্ণ রাধার রূপ দেখেন, তবুও তাঁর চোখ দুটি তৃপ্ত হয় না। তাই কৃষ্ণের এই অনিমেষ রাধা দর্শন তাঁর রূপতৃষ্ণা নয়, নিজের সীমাহীন প্রেমকেই যেন দুচোখ ভরে দেখা। যে বাস্তব নারী কৃষ্ণের চোখের সামনে, যাকে ধরা যায়, স্পর্শ করা যায়, তাকেই এক রহস্যালোকের স্বপ্নমাধুরী দিয়ে রচনা করেন প্রেমিক কৃষ্ণ। এই অনির্বচনীয়ত্ব, এই চিরপরিচিতের মধ্যে অপার অতলান্ত রহস্যের অনুভবই তো রোমাণ্টিক প্রেমচেতনার বৈশিষ্ট্য। তাই বলরামদাসের কৃষ্ণ এখানে রোমাণ্টিক নায়ক। আর রোমাণ্টিক বলেই দর্পণে রাধার যে রূপ প্রতিবিম্বিত হয়, তা তাঁর কাছে রাধার সত্যরূপ নয়। তাই তিনি বলেন—"নীরস দরপণ দূরে পরিহারি।" পার্থিব কোন কিছুর সঙ্গেই কৃষ্ণ রাধার তুলনা করতে পারেন না। রাধা তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, তাই হৃদয়ের মাঝখানে তাকে রেখেও কৃষ্ণের স্বস্তি নেই। সব সময়েই তাঁর মনে রাধাকে হারানোর ভয়। রাধা আর কৃষ্ণ এতই একাত্ম যে কৃষ্ণের মনে হয় যেন তাঁর হৃদয় থেকেই কেউ রাধাকে বাইরে এনেছে। তাই বিচ্ছেদ আর ঘোচে না, মিলন আর সম্পূর্ণ হয় না। বলরামদাসের অন্য সমস্ত পদের কথা মনে না রেখে এই একটি পদের নিরিখে বিচার করেই তাঁকে পদাবলী সাহিত্যের শক্তিমান কবির মর্যাদা দেওয়া যায়। পদটিকে সম্পাদক 'মিলন' পর্যায়ে স্থান দিলেও আমাদের মনে হয় এটিকে কৃষ্ণের রসোদ্গারের পদ বলাই ভালো।

বলরামদাসের রাধাও বলেন, লোকে যা-ই বলুক না কেন, যত কলংকই আরোপ করুক না কেন, কৃষ্ণই রাধার প্রাণ। "শুনইতে রাই বচন অধরামৃত" শীর্ষক পদটিতে কৃষ্ণের মুখ দিয়ে বলরামদাস গৌর অবতারের কারণ বর্ণনা করেছেন। পদটিকে "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা" শ্লোকটির ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে। কৃষ্ণ রাধাকে বলেছেন—

কৈছন তুয়া প্রেমা কৈছন মধুরিমা
কৈছন সুখে তুহু ভোর।[৮১]

ব্রজমণ্ডলে এই তিনটি আকাঙ্ক্ষা তাঁর পূর্ণ হয় নি। তিনি ভেবে দেখলেন রাধার স্বরূপ ছাড়া তাঁর পক্ষে এই সুখ আস্বাদন সম্ভব নয়। সেই কারণেই কৃষ্ণের সংকল্প হল—

তুয়া ভাব কান্তিধরি তুয়া প্রেম গুরু করি
নদীয়াতে করব উদয়[৮২]

রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথায় এই গৌর-পারম্যবাদ একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের একেবারেই নিজস্ব সংযোজন।

বলরামদাস প্রার্থনার কিছু পদও রচনা করেছেন। কিন্তু পদগুলিতে বিদ্যাপতির প্রার্থনা পদের মত ঘাতপ্রতিঘাতময় বর্ণবিচ্ছুরিত জীবনের অস্ত-রঙীন আত্মোপলব্ধি নেই। কবি বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে রাধাকৃষ্ণ চরিত না শোনার জন্য এবং বৃন্দাবনের লীলাস্থলীগুলি দর্শন না করার জন্য আক্ষেপ করেছেন।[৮৩] আবার কখনও চারকাল অতিক্রান্ত হলেও হরিভক্তি লাভ হল না, তাই হরির কাছে ভক্তিপ্রার্থনা করেছেন। বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদ এক ভোগক্লিন্ন, অস্তিত্বের মূল্য সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিত্বের হাহাকার; আর বলরামের পদ এক দীক্ষিত বৈষ্ণবের আধ্যাত্মিক আত্মসমর্পণ। বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদ এক তীক্ষ্ণ

অনুভূতিময় জীবনরসিকের আত্মবিশ্লেষণ, তাঁর ব্যক্তিসত্তার তীব্র স্পর্শে তপ্ত। অন্যদিকে বলরামের প্রার্থনার পদ এক বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর নিরুত্তাপ আধ্যাত্মিক উপদেশ মাত্র। তিনি নিতাই-চৈতন্যের গুণ গেয়ে ভবসিন্ধু তরণের স্বপ্ন দেখেন এবং অন্যকেও সেই উপদেশ দেন। কিন্তু প্রার্থনার পদে বলরামের কবিসত্তার পরিচয় নেই, তাঁর ভক্তপরিচয়ই কেবলমাত্র নিহিত। তবুও পূর্ববর্তী পর্যায়গুলির সাক্ষ্যে বলা যায় বলরামদাস কৃষ্ণকথার এক উল্লেখযোগ্য কবি। তাঁর মধ্যে বিদ্যাপতির তীব্র তীক্ষ্ম ভোগোল্লাস আর রাজকীয় উদাত্ততা নেই, নেই চণ্ডীদাসের গভীর ছায়াময় বিষণ্ণতা; আছে বাৎসল্যের, স্নিগ্ধ শুভ্রতা।

যদুনাথ দাস

যদুনাথ দাসও শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িককালে পদকর্তা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাস এঁর পরিচয় দিয়েছেন। এঁর পিতা নিমাই-এর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের গ্রামেই বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল রত্নগর্ভ আচার্য। এঁরা তিন ভ্রাতা ছিলেন। বৃন্দাবন দাস এবং কৃষ্ণদাস উভয়েই এঁকে 'কবিচন্দ্র' বলে অভিহিত করেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক পদ ছাড়াও রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক কিছু পদ ইনি রচনা করেছেন।

বলরামদাসের সহজ আন্তরিকতা ও প্রসাদগুণের মাধুর্য এঁর পদে পাওয়া যায় না। তবে এঁর পদগুলির ধারাবাহিকতায় কৃষ্ণকথার একটি নিটোল রূপ ফুটে উঠেছে।

ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসব নিয়ে অর্থাৎ কৃষ্ণলীলার আদিকথা অবলম্বনে এই কবি পদরচনা করেছেন। আনন্দোচ্ছ্বসিত গোপপুরীর একটি সামগ্রিক চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে (২১২)।

কৃষ্ণের বাল্যলীলা চিত্রিত করেও এই কবি কিছু পদ রচনা করেছেন যাতে কৃষ্ণের কৌমার বয়সের বিচিত্র দৌরাত্ম্য রূপলাভ করেছে। শূন্য ঘরে ঢুকে কৃষ্ণ সমস্ত ননী চুরি করে খেয়ে নিয়ে দ্বারে হাত মুছেছেন। আঙ্গুলের চিহ্ন মোছার জন্য জল ঢেলে দিয়েছেন তাতে। সতর্ক জননী ক্ষীর সর ননী ছানা শিকায় হাঁড়িতে তুলে রাখলেও কৃষ্ণ মন্থনদণ্ড এনে হাঁড়ি ভেঙে ফেলেন এবং ননী প্রভৃতি খাওয়ার জন্য নীচে মুখ পেতে দেন। ব্যতিব্যস্ত জননী যশোদা ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন যে কৃষ্ণকে হাতের কাছে পেলে তিনি মেরেই ফেলবেন। রোহিনী ইঙ্গিতে যশোদাকে কৃষ্ণের লুকিয়ে থাকার জায়গা দেখিয়ে দেন (২১৩)। আর একদিন যশোদার কাছে গোপরমণীরা কানুর নাচন দেখবার জন্য মিনতি করলে, যশোদা তাঁদের বললেন, খির সর ননী দুহাত ভরে দিলে কৃষ্ণ নিজেই নাচবে। তারপর রাণী নিজের গৃহকর্ম ত্যাগ করে গোপালকে নাচাতে লাগলেন।(২১৩)

শ্রীরাধার পূর্বরাগ পর্যায়ে এই কবির একটি পদে রাধা চিত্রপট দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন (২১৪)। কৃষ্ণরূপমুগ্ধা রাধাকে সখীরা অভিসারে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে অভিসারোচিত বেশে সজ্জিতও করে দিয়েছেন। এই অভিসারের বর্ণনায় শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যজীবনের প্রভাব সুস্পষ্টভাবেই পড়েছে। কারণ রাধার অভিসার কালে নানা যন্ত্রে প্রেমমন্ত্র ধ্বনিত হওয়া গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনেই সম্ভব নয়।

রাধাকৃষ্ণের মিলনের পর সখীরা পরিহাস করে রাধাকে বলেন—

ভাল না দেখিয়ে আজি
কালা মাণিকের বাতাসে এ বুঝি
মজিল গোকুল রাজি ॥

তখন রাধা সখীকে কানুর প্রেমের কথা বলেন। একদা সখীদের সাথে রাধা পথে আসছিলেন, কৃষ্ণ সেই সময় তাঁর পথ আগলে দাঁড়ান। এর ফলে রাধার গোপন প্রেম ব্যক্ত হয়ে যায়। পাড়ার লোকেরা এ নিয়ে বলাবলি করে। এটিও রাধার পক্ষে লজ্জাজনক। অথচ রাধার পক্ষেও কৃষ্ণের প্রেম অপরিহার্য, জলচর যেমন জল ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচে না, চকোর যেমন চাঁদের সুধা ছাড়া আর কিছুই পান করে না, রাধাও তেমনি শ্যামের প্রেম ছাড়া বাঁচতে পারেন না।

তাই শেষ পর্যন্ত রাধাও কৃষ্ণপ্রেমে অসম সাহসিকা। স্বামী তাঁকে পরিত্যাগ করলে অথবা প্রতিবেশী তাঁর নিন্দা করলেও তিনি ঘোষণা করেন—

কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে ॥
কানু অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥(২১৬)

কৃষ্ণের সামান্য অবহেলাও অভিমানিনী রাধার সহ্য হয় না। তাই তিনি বলেন, যে কৃষ্ণ প্রথম দিকে রাধাকে একতিল না দেখলেই প্রাণত্যাগ করতেন, এখন তিনি রাধাকে দেখলে ফিরেও তাকান না। (২১৭) আবার কখনও কৃষ্ণের প্রতি অভিমানে রাধা সখীকে কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তির সাথে প্রেম করতে নিষেধ করেন। কিন্তু কৃষ্ণের বাঁশীর ধ্বনি শুনলে সেই শ্রীরাধাই আবার ব্যাকুলভাবে সাজসজ্জা করে পথে বেরিয়ে পড়তে চান। সখী পরামর্শ দেন বড়াইকে সঙ্গে নিয়ে মথুরার দিকে যেতে। কৃষ্ণের কাছে অভিসারে যাওয়ার জন্য রাধা কানাড়া ছাঁদে কবরী বাঁধেন, তাতে দোলে চাঁপাফুল। গায়ে দেন রঙীন ওড়না। এদিকে সখী গিয়ে বড়াইকে ডেকে আনে। দাসীর মাথার সোনার হাঁড়িতে করে রাধা খির নবনী দধি সাজিয়ে বিক্রয় করতে চলেন। পথে কৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে রাধা বড়াইকে সেই রূপবান, নানা আভরণ যুক্ত পুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। রাধার আরও একটি প্রশ্ন—

এত আভরণ যার কিসের অভাব তার
সে কেনে ঘাটের ঘাটোয়াল ॥

এরপর গতানুগতিকভাবে রাধাকৃষ্ণের ছদ্মকলহ। তবে যদুনাথদাসের কৃষ্ণ খুবই সপ্রতিভ। রাধা গরু চরানোর খোঁটা দিলে তিনি উত্তর দেন, পুরুষের শুধু গরু-চরানো কেন, সবই শোভা পায়। আর রাধা তাঁকে গরুচরানোর গঞ্জনা দিচ্ছেন, তাহলে তিনি নিজে কেন রাজার মেয়ে হয়ে মাথায় পসরা নিয়ে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই সুযোগে কৃষ্ণ রাধার স্বামীকেও খোঁটা দেন। এমন রূপসীকে হাটে পাঠিয়ে সে কেমন করে স্থির হয়ে আছে। কৃষ্ণের ভাগ্যে যদি এমন রূপসী জুটত, তাহলে তাকে তিনি সোনার খাটে বসিয়ে রাখতেন। কিন্তু সব পুরুষের কপালে তো স্ত্রীধন জোটে

না। চতুর কৃষ্ণ এইভাবে রাধার রূপের প্রশংসা করে রাধার স্বামীর নিন্দা করলেন এবং নিজের অনুরাগও ব্যক্ত করলেন(২১৯)।

যদুনাথদাস সুবল মিলনের কতগুলি পদ রচনা করেছেন। পদগুলির শিল্পমূল্য যাই-ই হোক না কেন, রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার একটি সুন্দর সম্পূর্ণ কাহিনী বিবৃত করে। রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের পঞ্চম অঙ্কে, সুবলের শ্রীরাধা-বেশ ধারণ এবং শ্রীরাধার সুবলের বেশ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আগমনের প্রসঙ্গ আছে। তবে সেখানে ঘটনা অনেক সংক্ষিপ্ত। কিন্তু যদুনাথ দাস রূপগোস্বামীর পরিকল্পনাটুকু নিয়ে শ্রীরাধার সাজসজ্জা প্রভৃতি স্বাধীনভাবেই বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয়, বিদগ্ধমাধবের ঘটনা এবং যদুনাথ দাসে বর্ণিত সুবল মিলনের ঘটনাও এক নয়। সখাদের নিয়ে হৈ-হৈ করতে করতে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন। এরপর সুবলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রাধা-কুণ্ডে গেলেন। কিন্তু রাধাকুণ্ডে এসেই রাধার বিরহে কৃষ্ণ অস্থির হয়ে পড়লেন। এই সময় বৃন্দাবেদী চম্পক মালা হাতে নিয়ে প্রবেশ করলেন। সেই মালা তিনি সুবলকে দিলে সুবল আবার তা কৃষ্ণের গলায় পরিয়ে দিলেন। এই ঘটনাগুলি যদুনাথ দাসের স্বাধীন কল্পনা। এই চম্পকমালা পরে শ্রীরাধার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আর্ত্তি আরও বেড়ে গেল। তিনি সুবলকে বললেন, রাধাকে না পেলে তাঁর প্রাণ বেরিয়ে যাবে। এই বলে কৃষ্ণ মাটিতে পড়ে গেলে সুবল তাঁকে নিজের কোলে বসিয়ে নিজের বস্ত্র দিয়ে তাঁর অঙ্গ মুছে দিলেন। সুবলের এই আন্তরিকতাপূর্ণ মমতার ভাব যদুনাথের নিজস্ব। এরপর সুবলের আক্ষেপ হয় এই ভেবে যে, চাঁপার মালা কৃষ্ণের গলায় পরিয়ে দেওয়ার জন্যই চম্পকবরণী রাধার বিরহ কৃষ্ণের মনে বেশী করে জেগেছে। অতঃপর কৃষ্ণের অবস্থা দেখে সুবল কৃষ্ণকে রাধাকুণ্ডে শুকসারী ও মাধবীলতার জিম্মায় রেখে 'রাধা', 'রাধা, বলতে বলতে রাধার মন্দিরে গিয়ে পৌঁছিলেন। রাধা তখন রাগ করে কদলীবনে বসে আছেন। ললিতাও সুবলকে যথেষ্ট তিরস্কার করে বললেন, কৃষ্ণের ধবলী রাধার কানন নষ্ট করে দিয়েছে। কংস রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করে তিনি কৃষ্ণের গরুবাছুর সব বিক্রী করিয়ে তার গর্ব চূর্ণ করবেন। এ সমস্ত কথা শুনে সুবল ভয় পেয়ে দূরে পালিয়ে গেলেন। রাধা সুবলকে ডেকে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সুবল কৃষ্ণের অবস্থা রাধাকে জানালেন। রাধা তখন সুবলকে দিনের বেলায় অভিসারে যাওয়ার উপায় বার করতে বললে, সুবল রাধাকে পরামর্শ দিলেন—

তোমার বেশ আমায় দাও আমি রহি ঘরে।
আমার বেশে যাও তুমি কানু ভেটিবারে ॥

কিন্তু তাতেও অসুবিধে হল। রাধার পয়োধর ঢাকা গেল না। সুবল রাধাকে কোলে একটা বাছুর নিয়ে নিতে বললেন। এটিও যদুনাথের নিজস্ব কল্পনা। ছদ্মবেশী রাধাকে দেখে কৃষ্ণ সুবল ভেবে ব্যাকুলভাবে রাধার কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। সুবলবেশিনী শ্রীরাধা মুখ ফিরিয়ে থাকলে কৃষ্ণ 'হা রাধা' বলে মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন রাধা মৃদু হেসে কৃষ্ণকে কোলে নিলেন। মিলনের পর আবার সুবল বেশে রাধা নিজের রন্ধনশালায় এসে ঢুকলেন। সুবল আবার নিজের বসনভূষণ পরে নিয়ে কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হলে, রাধার সঙ্গে মিলন ঘটানোর জন্য কৃষ্ণ সুবলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। এই খানেই কাহিনীর শেষ (২১৯-২১)।

যদুনাথের মাথুর পর্যায়ের পদে হেমন্ত ও শীতকালে শ্রীরাধার বিরহবেদনার কথা দূতী গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে বলেছে। রাধার এই অবস্থার কথা শুনে চোখের জলে কৃষ্ণের শীতবসন ভিজে গেল। ঘনঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন তিনি। কথা বলতে পারলেন না। বারবার 'রাধা-রাধা' বলতে বলতে কৃষ্ণ যেন উন্মাদ হয়ে গেলেন। রাধাবিরহের বেদনায় অভিভূত এই অশ্রুপ্লুত কৃষ্ণ যেন কৃষ্ণ ভাবে ভাবিত চৈতন্যরই প্রতিচ্ছবি।

পুরুষোত্তম দাস

পুরুষোত্তম দাসের পিতার নাম সদাশিব কবিরাজ। ইনি জাতিতে বৈদ্য এবং কুমার হট্ট বা হালিশহর নিবাসী ছিলেন। নিত্যানন্দের সামনে সংকীর্তনকারী হিসেবে এঁর অভিষেক হয়েছিল। ইনি বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষাতে পদ রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদরচনায় এঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তবে এক্ষেত্রে বৈষ্ণব গোস্বামীদের, বিশেষতঃ শ্রীরূপের রচনার দ্বারা তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত। বিরহের পদ রচনায় চৈতন্য-সমকালীন কবিদের মধ্যে পুরুষোত্তম দাসের কৃতিত্ব সর্বাধিক। শুধু রাধা নয়, কৃষ্ণবিরহে মাতা যশোমতী, পিতা নন্দ, সখাবৃন্দ, এমনকি বৃন্দাবনের প্রকৃতিরও বেদনাময় প্রতিক্রিয়া তাঁর পদে ব্যক্ত হয়েছে। অবশ্য এর প্রেরণাও গোস্বামী রচিত সাহিত্য। শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীরূপ ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিতার উদাহরণ দিতে গিয়ে শ্রীরাধার বিরহ বেদনায় নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের তথা নর, সর্প, দেবতা, এমনকি স্বয়ং লক্ষ্মীরও বিচলন বর্ণনা করেছেন। সম্ভবতঃ এরই প্রভাবে পদকর্তা পুরুষোত্তম দাস কৃষ্ণবিরহে বৃন্দাবনের প্রকৃতির বেদনা বর্ণনা করেছেন। শ্রীরূপের তুলনায় তাঁর পদ অনেক বেশী হৃদয়স্পর্শী, কবিত্বগুণ-সমৃদ্ধ ও আন্তরিকতায় উজ্জ্বল। দূতী গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, কৃষ্ণবিরহে বিরহিণী শ্রীরাধার দুঃখে সারা ব্রজমণ্ডলেই বিরহবেদনা সঞ্চারিত। শুধু জীবকুল নয়, জড় প্রকৃতিও সেই বেদনায় অভিভূত—

স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম

বিরহদহনে দহি যাহ ॥

তরুরা কুসুমপ্রসব ত্যাগ করেছে, এমন কি পর্বত পর্যন্ত দ্রবীভূত হয়ে গেছে। শুক, পিক প্রভৃতি পাখী গাছের ডালে বসে রোদন করছে, কাননে রোদন করছে হরিণীরা। শুধু তাই নয়, শৃগাল ও সর্পেরাও ক্রন্দন করছে। এদের সবার অশ্রুধারায় পৃথিবী পঙ্কিল হল এবং ''রাইক বিরহে বিরহি ব্রজমণ্ডল দাবদহন সমতুল''। শ্রীরাধার বিরহে পশু, উদ্ভিদ ও জড়জগতের এই ক্রন্দন পুরুষোত্তমের নিজস্ব সৃষ্টি।

শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পুত্রবিয়োগকাতরা যশোমতীর উন্মাদ দশা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে শ্রীরূপ এইভাবে যশোমতীর অবস্থা বর্ণনা করেছেন—

ক্ক মে পুত্রো নীপাঃ। কথয়ত কুরঙ্গাঃ কিমিহ বঃ।
স বভ্রামাভ্যর্ণে ভণত তদুদন্তং মধুকরাঃ।
ইতি ভ্রামং ভ্রামং ভ্রমভর বিদূনা যদুপতে।
ভবন্তং পৃচ্ছন্তী দিশি দিশি যশোদা বিচরিত ॥[৮৪]

আমার পুত্র কোথায়? কদম্ববৃক্ষগুলি তোমরা বল, হরিণেরা, আমার পুত্র কি তোমাদের

কাছ দিয়ে গিয়েছে ? ভ্রমরেরা তোমরাও তাঁর খবর বল। হে যদুপতি, তোমার জননী যশোদা (এইভাবে) ভ্রমভরে অতিশয় কাতর হয়ে চতুর্দিকে তোমার অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছেন।

পুরুষোত্তমের একটি পদে দেখা যায়, মথুরা প্রবাসী কৃষ্ণের কাছে একজন তাঁর মায়ের কথা বলছেন—আলুলায়িত কুন্তলা যশোমতী পাগলিনীর মত সমস্ত গোকুলে ঘুরে বেড়ান। তিনি "আমার প্রাণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গেল" এই কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন, এবং—"তুয়া বিরহানলে উমতি পাগলি জনু কাহারে কি পুছয়ে বাণী।", পদের এই অংশ পর্যন্ত কবি রূপ গোস্বামীর অনুসরণ করে পরবর্তী অংশে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। যশোদা বলেছেন গোপাল কোন বনে গেল? তার বংশীধ্বনি আর শোনা যায় না কেন? বোধ হয় আজ বলরাম সংগে যায় নি বলে তার কোন বিপদ হয়েছে। এই অংশে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবানুষংগকে পুরুষোত্তম আরও গভীর ভাবে অঙ্গীকার করে জননী যশোমতীর বেদনাকে প্রকাশ করেছেন।

অপর একটি পদেও (৮৫০) মাতা যশোমতীর বেদনাবর্ণনায় কবির আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রভাত হলে মা যশোমতী, আগেকার অভ্যাসমত হাতে ননী নিয়ে কানাই বলাইকে ডাকেন। কিন্তু তখনই মনে পড়ে যায়, তারা মধুপুরে। তখনি মা যশোদা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। শ্রীদাম সুবল এসে আবার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণের নাম করলে রাণী জ্ঞান ফিরে পান। পুরুষোত্তমের আর একটি মৌলিক সৃষ্টি হল, পুত্রহারা পিতা নন্দের অবস্থা বর্ণনা। শুধু মাতা যশোমতীই নয়, পিতা নন্দরাজও কৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল। তাঁর পিতৃ হৃদয়ের রিক্ততার বেদনাকে কবি যেন নিজে অনুভব করে রূপ দিয়েছেন। কৃষ্ণ মথুরায় চলে যাওয়ার পর নন্দ আর গোষ্ঠে যান না, সারাদিন শুধু বসে থাকেন। প্রতিদিন তাঁর শরীর তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। তিনি কারও সাথে কথা না বলে দিনরাত মাথা নিচু করে বসে থাকেন। ব্রজবালকেরা গিয়ে মাঝে মাঝে তাঁকে সান্ত্বনা দেয়। নন্দ তখন ব্যাকুলভাবে কেঁদে ওঠেন—

কহ কহ রে ব্রজবালা।
কাঁহা মঝু প্রাণগোপাল ॥

নন্দের দুঃখে ব্রজবালকেরা কেঁদে ওঠে। আবার কখনও বা নন্দ শ্রীদামকে কৃষ্ণ ভেবে তাঁকে কোলে নিয়ে কাঁদতে থাকেন।

এতো গেল কৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধা, যশোমতী ও নন্দরাজের অবস্থা। যে সখাদের সঙ্গে কৃষ্ণ এতদিন বৃন্দাবনের অরণ্যে গোচারণে দিন কাটিয়েছেন, তাদের অবস্থাও শোচনীয়। কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনে শ্রীদাম ও সুবল, যশোদাকে নন্দভবনে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে আসে। কিন্তু আসার সময় নিজেরা গোশালা দেখে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যায়। কৃষ্ণের প্রিয় কদম্বের মূলে বসে রাখালেরা পূর্বের কথা স্মরণ করে। দু'জন দু'জনের গলা ধরে কাঁদে। তারা আর চূড়া বাঁধে না, নটবর ছাঁদে বসনও পরে না। শেষ পর্যন্ত তারা ভোজনও ছেড়ে দেয়। কৃষ্ণের বিরহে গাভীরাও আর যমুনার জল পান করে না। সখারা কেঁদে কেঁদে বাধ্য হয়ে তাদের নিয়ে বাড়ী ফিরে যায়।

এদিকে কৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধার দশমী দশা উপস্থিত। তিনি কালিন্দীর তীরে প্রাণ পরিত্যাগ করার সংকল্প নিলেন। শ্রীরাধার বিরহবর্ণনায় কবি পুরুষোত্তম লক্ষণীয় মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে চন্দ্রাবলী ও রাধা এক এবং অভিন্ন। সেখানে শ্রীরাধারই এক নাম চন্দ্রাবলী। শ্রীরূপই শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীকে পৃথকরূপে কল্পনা করেছেন। 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে চন্দ্রাবলী শ্রীরাধার প্রতিনায়িকা। শ্রীরূপের ললিত মাধব, শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থেও পৃথক নায়িকা রূপে রাধা ও চন্দ্রাবলীর বর্ণনা রয়েছে। কবি পুরুষোত্তম শ্রীরূপের পরিকল্পিত এই প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রদুটিকে নিয়ে একটি মধুর চিত্র অংকন করে তাঁর মৌলিক কল্পনা, রসবোধ ও চরিত্রচিত্রণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

বিরহিণী শ্রীরাধার মৃত্যুদশা উপস্থিত হয়েছে শুনে চন্দ্রাবলী আগেকার সব বিরোধ ভুলে গিয়ে, শ্রীরাধার দুঃখে মাটিতে চুল ছড়িয়ে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। হয়তো বা রাধার প্রেমে কৃষ্ণ আবার ফিরে আসবেন, এই ছিল তাঁর মনে আশা। কিন্তু চন্দ্রাবলীর সে আশাও পূর্ণ হল না—এই বলে চন্দ্রাবলী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল সখী পদ্মা তাঁকে কোলে নিলেন। এরপর চন্দ্রাবলী চেতনা ফিরে পেয়ে রাধার নিকট গেলেন। তিনি ললিতাকে বললেন, রাধারই আকর্ষণে কৃষ্ণ আবার ফিরে আসবেন, এইটিই তাঁর ধারণা। সুতরাং রাধাকে যে কোন প্রকারে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই বলে চন্দ্রাবলী রাধার কপালে হাত দিয়ে দেখলেন, তাঁর কপাল ঠাণ্ডা। পুনরায় তিনি রাধার পায়ে হাত দিয়ে দেখলেন। রাধার অবস্থা দেখে কথা বলতে না পেরে, চন্দ্রাবলীও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। এই পদ দুটিতে রাধার প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলীর গভীর কৃষ্ণপ্রেম ও প্রতিদ্বন্দ্বিনীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণ প্রেমে রাধাই যে গরীয়সী, প্রকারান্তরে এ কথা স্বীকার করে নেওয়ায় তাঁর মহত্ত্ব এবং যথার্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনানুকূল মূল্যবোধও প্রকাশিত হয়েছে।

মধুমঙ্গল শ্রীরূপসৃষ্ট একটি চরিত্র। ইনি কৃষ্ণের বয়স্য এবং সন্দীপনি মুণির পুত্র। শ্রীরূপের তিনটি নাটকেই এঁর উপস্থিতি রয়েছে। এঁর ভূমিকা কিছুটা সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের মত। পুরুষোত্তম রাধার বিরহে সেই মধুমঙ্গলকেও বেদনার্ত করে তুলেছেন। কিন্তু এই দুকূলপ্লাবী মর্মক্ষরিত বিরহ বেদনার অন্তে কবি মিলনের আশ্বাস দিতে চেয়েছেন। তাই তাঁর বিরহিণী রাধা স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের আগমন দেখেছেন। অবশেষে কৃষ্ণ আবার বৃন্দাবনে ফিরে এলে মাতা যশোমতী—

নিজ ঘরে যাইয়া ক্ষীর সর লইয়া
ভোজন করাইয়া বোলে।
ঘরের বাহির আর না করিব
সদাই রাখিব কোলে॥

কৃষ্ণ এসেছেন শুনে সখারা সবাই ছুটে এল। মনে হল যেন, মৃত শরীরে তারা প্রাণ ফিরে পেল। ব্রজবাসীরাও কৃষ্ণকে দূরদেশে আর না পাঠানোর অনুরোধ করলেন। এইভাবে বিরহে নয়, চৈতন্য সমসাময়িক পুরুষোত্তম আবার কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে ফিরিয়ে এনে মিলনেই তাঁর কৃষ্ণকথা সমাপ্ত করেছেন। চৈতন্যের নবদ্বীপ ত্যাগের মর্মন্তুদ স্মৃতি তাঁদের ভক্ত-

হৃদয়ের গভীরে যে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছিল, যেন তারই প্রতিক্রিয়ায় কৃষ্ণের বৃন্দাবনে পুনরাগমনের সান্ত্বনা-প্রলেপ দিয়েছেন এই কবি।

কানাই খুটিয়া

এই কবির একটি মাত্র পদ পাওয়া গেছে। মহাপ্রভু পুরীতে নন্দোৎসব অনুষ্ঠান করলে, কানাই খুঁটিয়া নৃত্য করেছিলেন। তিনি তদানিন্তন উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত মেদিনীপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পদটি অক্ষেপানুরাগের। কবির এই একটিমাত্র পদেই কৃষ্ণের বাঁশীর মধুর সুরলহরীর সর্বস্পর্শী প্রভাব, রাধার নিবিড় বেদনা, নিরুপায় কুলবতীর কাতর প্রার্থনা বড় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। রাধা বাঁশীকে সম্বোধন করে বলেছেন—

আমার বচন রাখ নীরব হইয়া থাক
না বধিও অবলার প্রাণে ॥ (১০৮০)

দেবকীনন্দন

অনুরাগবল্লীতে দেবকীনন্দনের প্রসঙ্গ রয়েছে। এঁর রচিত ৫টি মাত্র পদ পাওয়া যায়, যার মধ্যে একটি কৃষ্ণলীলার বাকী চারটি গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ লীলা বিষয়ক। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদটি প্রকারান্তর সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের। কালিন্দীতীরের মনোহর নিকুঞ্জে মিলনের অবসানে ঘর্মসিক্ত বস্ত্রে রাধা বসে আছেন। সহচরীরা চামর বীজন করছে, আবার কেউ বা জল এনে দিচ্ছে। বৃন্দাদেবীও সময় বুঝে অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণকে ক্লান্ত দেখে তাঁদের নানাপ্রকার সেবা করতে লাগলেন (৯৬১)।

কানুরাম দাস

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে পুরুষোত্তম দাসের পুত্র এবং সদাশিব কবিরাজের পৌত্র কানুরাম দাসের উল্লেখ আছে। এঁর গৌরাঙ্গলীলা ও রাধাকৃষ্ণলীলা উভয় বিষয়ক পদই রয়েছে। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদরচনায় এঁর ওপরে জয়দেব ও রূপ গোস্বামীর প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে শ্রীরাধা সূর্যপূজার নাম করে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য অভিসারে বেরিয়েছেন। কানুরামদাস এইভাব নিয়ে সূর্যপূজাস্থলে শ্রীরাধার অভিসার বর্ণনা করেছেন। সহচরীগণের সঙ্গে বনে গিয়ে তিনি কুসুম চয়ন করে হার তৈরি করলেন। মাধবীকুঞ্জের মাঝখানে রাধা বসলেন, আর প্রিয়সখী কৃষ্ণের কাছে গিয়ে রাধার আগমনের সংবাদ জানালেন (৪৭০)।

বাসকসজ্জিকার একটি পদে কবি প্রথমাংশে জয়দেবকে অনুসরণ করেছেন। তাঁর রাধা—

পবনক পরশহি বিচলিত পল্লব
শবদহি সজল নয়ান। (৪৭০)

এর সঙ্গে গীতগোবিন্দের নিম্নলিখিত শ্লোকটি তুলনীয়—

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।

শেষ পর্যন্ত প্রিয় মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিতা রাধার ব্যগ্রতা বর্ণনায় কবি সুনিপুণ মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রাধা কখনও ভাবছেন কৃষ্ণ তমাল তরুর আড়ালে লুকিয়ে আছেন। সেই কৃষ্ণকে সম্বোধন করে রাধা বলেন—

তমালক কোরে আপন তনু ছাপসি
আর কৈছে রহবি ছাপাই ॥ (ঐ)

আবার কখনও বা রাধার আশঙ্কা হচ্ছে, হয়ত বা তিনি বনের মাঝখানে পথ হারিয়ে ফেলেছেন, সেই জন্যই কৃষ্ণের দেখা পাচ্ছেন না। নানা আভরণে ও বস্ত্রে নিজেকে সজ্জিত করে রাধা কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় বসে থাকেন। কিন্তু তাতেও কৃষ্ণ দেখা দেন না। শীতের রাত্রিতেও কৃষ্ণবিরহিণী রাধা জেগে বসে থাকেন। রাধার সম্পর্কে তাঁর সখীরা বলেছেন—

ধনি সহজে রাজার ঝি।
ঘরের বাহির কখন না হয়
আমরা দেখিয়াছি ॥ (৪৭১)

অথচ সেই রাধাই বসন্তকালের রাত্রিতে বনের মাঝখানে পদ্মপুষ্পে শয্যারচনা করে কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় বিনিদ্র রজনী যাপন করেন। এরপর সখী যখন রাধার কাছে কৃষ্ণের অন্য রমণীসঙ্গের কথা বলেছেন, তখন রাধা হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের ভাগ্যকেই দোষ দিয়েছেন। এই সময়ই আবার সখী রাধার কাছে কৃষ্ণের আগমনের সংবাদ দিয়েছেন। সেই সংবাদে বিপ্রলব্ধা রাধার অভিমানক্ষুব্ধ বেদনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

মানিনী রাধার এই অভিমানপূর্ণ কথা শোনার পর কৃষ্ণ তাকে দোষ ক্ষমা করতে অনুরোধ করলেন। মানান্তে রাধাকৃষ্ণের মিলন হল। এই মিলনের উল্লাসকে কবি তার পদের ছন্দোঝঙ্কারে এবং একই ধ্বনির বারংবার আবর্তনে মূর্ত করে তুলেছেন—

ধনী রঙ্গিণী রাই ধনী রঙ্গিণী রাই।
হরি বিলসই কত রস অবগাই ॥ (৪৭২)

অনন্ত দাস

এই কবি অদ্বৈত শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক এবং রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কয়েকটি পদ ইনি রচনা করেছেন। এঁর রচিত দুটি গোষ্ঠলীলার পদ রয়েছে। একটিতে গোষ্ঠবেশে সজ্জিত কৃষ্ণের জীবন্ত বর্ণনা রয়েছে। অন্যটিতে কৃষ্ণ এবং তার সখাগণের নানাবিধ ক্রীড়ার যে বর্ণনা রয়েছে, তা ভাগবতের বর্ণনার অনুরূপ।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ ও শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় কবির দক্ষতা অনস্বীকার্য। শ্রীরাধা অপরিচিত কৃষ্ণকে প্রথম দিন দেখেই বলেন—

কি হেরিনু কদম্বতলাতে
বিনি পরিচয়ে মোর পরাণ কেমন করে
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে। (২৫৮)

শ্রীরাধার পূর্বরাগ বর্ণনায় কবিকল্পনা বৈচিত্র্যলাভ করেছে। যখন রাধা বলেছেন—'হাসির হিল্লোলে মোর পরাণপুতলী দোলে'। কৃষ্ণের মধুর হাসি যেন তরল হয়ে রাধার অস্তিত্বের চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। আর সেই হাসির তরঙ্গ দোলায় নব অনুরাগিণী

রাধার হৃদয় দুলে দুলে উঠে। কৃষ্ণের রূপবর্ণনায় প্রথাসিদ্ধতার মাঝখানেই কবি একসময় বলে ওঠেন—

নীরে নিরখি রূপ সুখের নাহি ওর।
আপনার রূপে নাগর আপনি বিভোর ॥ (২৫৯)

তখন নিজ রূপের মাধুর্যে বিভোর এই কৃষ্ণের সাথে ললিত মাধব নাটকের কৃষ্ণের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই কবির রাধারূপ বর্ণনা এত জীবন্ত নয়। এর কারণ হয়ত রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গের প্রতি কবির অধিকতর আকর্ষণ।

এই কবির অভিসারের পদগুলির মধ্য দিয়ে অনুরাগিনী প্রেমবতী নায়িকার আর্তি ও ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে নি। কবি রাধার রূপ ও চলনভঙ্গিমার বর্ণনাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অন্ধকার বর্ষণমুখর রাত্রিতে, বহু কষ্ট স্বীকার করে রাধা যখন দেখেন কৃষ্ণ নেই, তখন বিপ্রলব্ধা নায়িকার বেদনা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তিনি সমগ্র পুরুষ জাতিকেই নিষ্ঠুর বলে অভিহিত করেন (২৬১)। এরপর কৃষ্ণ এসে রাধার কাছে মিনতি করলে খণ্ডিতা রাধা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে তিরস্কার করলেন। এখানে রাধার মান সহেতু। প্রিয়জনের গাত্রে রতিচিহ্ন দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। স্পষ্টই বোঝা যায় কবি শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণিকে অনুসরণ করেছেন। মিলনের পদে এই কবি প্রেমের মোহন ভাবের বর্ণনা করেছেন।[৮৫] কবি মহারাস, রাসান্তে জলবিহার ও বসন্তরাস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বসন্তরাসে জয়দেবের প্রভাব পড়ে নি। কবি একটি পদে মিলনান্তে রাধাকৃষ্ণের নৃত্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা ভাবোন্মত্ত সপার্ষদ গৌরাঙ্গের কীর্তনলীলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় (পৃ. ২৬৪)। এই কবির শীতকালীন মাথুরে রাধার বিরহবেদনা তুহিন পবনের সাথে মিশে রাধার হৃদয়কে কাঁপিয়ে তুলেছে (ঐ)। ভাবোল্লাসের পদে রাধার ভাবী মিলনের চিত্রকল্পনা বড় করুণ। তারপর সখী যখন আবার রাধাকে মিলনানন্দের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন রাধার আনন্দ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নির্ভরতাময় ঐকান্তিক ভালবাসা প্রকাশিত হয় প্রকৃতি জগৎ থেকে সংগ্রহ করা একটি উপমায়—

দারুণ শিশিরে পদ্মিনী জনু
জীবনে মরিয়াছিল।
প্রবল রবির কিরণ পাইয়া
জনু বিকশিত ভেল ॥ (২৬৫)

বৃন্দাবনদাস

বৃন্দাবনদাস ও লোচনদাস চৈতন্যজীবনী রচয়িতা। এই দুই কবি বেশীর ভাগই গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। তবে এঁদের কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কয়েকটি পদও পাওয়া যায়। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদরচয়িতা বৃন্দাবনদাসও চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন-দাস এক ব্যক্তি কিনা এ ব্যাপারে পণ্ডিতদের মনে সংশয় আছে। কোন স্থির সিদ্ধান্ত নেই বলে, বর্তমান প্রসঙ্গেই আমরা জীবনীকার বৃন্দাবনদাসের পদগুলি ও আলোচনা করব।

বৃন্দাবনদাস খণ্ডিতা রাধাকে নিয়ে পদরচনা করেছেন (৪৯৭)। গলায় পীতবসন দিয়ে কৃষ্ণ রাধার চরণে মিনতি করে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। কিন্তু এতেও রাধার রাগ পড়ছে না। তিনি প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণকে তাঁর কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন, কারণ অবলা রাধার কাছে কৃষ্ণের চাতুরী দেখিয়ে কাজ নেই—

নবীন রসের রসিক হয়েছ
চন্দ্রাবলী যার নাম।
তাহার নিকট করহ চাতুরী
মোর কাছে কিবা কাম ॥ (৪৯৮)

এরপর ক্রুদ্ধা রাধা সখীদের বলেন, কৃষ্ণের হাত ধরে কুঞ্জ থেকে বার করে দিতে। প্রতিনায়িকার প্রতি ঈর্ষান্বিতা মানিনী রাধার চিত্র বহু পূর্বকাল থেকেই আমরা পেয়েছি। কিন্তু রাধা কৃষ্ণকে কুঞ্জ থেকে বার করে দেওয়ার জন্য সখীদের অনুরোধ করেছেন, এ চিত্র আমরা দেখিনি।

অপর একটি পদে মানিনী রাধা মান করে প্রতিজ্ঞা করলেন, যে দেশে কৃষ্ণ নেই, সেই দেশেই তিনি যাবেন! একথা শুনে কৃষ্ণ গণকের ছদ্মবেশ ধরে রাধাকে বললেন, কৃষ্ণ নেই এমন কোন স্থান 'ভুবনে হেন নাহি হোয়ই (৪৯৮)।' একথা শুনে ক্রুদ্ধা রাধা ছদ্মবেশী গণকের পাঁজী ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। পাঁজি নিতে গিয়ে গণকের অঙ্গবসন সরে যাওয়ায় রাধা গণকের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারলেন। নাগরী ছদ্মবেশে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলনের প্রসঙ্গ থাকলেও গ্রহাচার্য বেশে মিলন অভিনব।

অন্য কতকগুলি পদে রাধা বলরামের বেশ ধারণ করে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জবিহারী কৃষ্ণকে হাতে নাতে ধরতে গেছেন। কৃষ্ণকথার বৈচিত্র্য সম্পাদনে এটিও অভিনব। এর আগে আমরা সুবলবেশধারিণী রাধাকে পেয়েছি। বলরামের বেশে নিখুঁতভাবে সজ্জিত হওয়ার জন্য রাধা শিঙ্গা বেণু চাইলেন। সখীরা শিঙ্গা কোথায় পাবেন তা স্থির করতে না পারায়, পৌর্ণমাসী নিজের গৃহ থেকে শিঙ্গা এনে রাধার হাতে দিলেন। রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথায় পৌর্ণমাসী চরিত্রটি আনয়ন, বৃন্দাবনদাসের উপর শ্রীরূপের প্রত্যক্ষ প্রভাবই প্রমাণ করে। বলরামবেশী রাধাকে দেখে, চন্দ্রাবলী সত্যিই বলরাম ভেবে লুকিয়ে গেল। রাধার স্পর্শেই কৃষ্ণ রাধাকে চিনতে পারলেন। রাধা কৃষ্ণকে কুঞ্জে নিয়ে এসে প্রচুর তিরস্কার করলে 'ফাঁপড়ে পড়িল শ্যাম উত্তর না সরে' (৫০০)।

এছাড়াও বৃন্দাবনদাসের দানলীলার পদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদিনী রাধা আর গৃহে ফিরতে চান না, কারণ কৃষ্ণই তাঁর প্রাণ। তিনি সখীদের বলেন, আভরণে তাঁর প্রয়োজন নেই; আভরণ খুলে ফেলে তিনি কৃষ্ণের দাসী হলেন এবং তরুমূলেই তিনি থাকবেন। সখীরা যেন বাড়ী গিয়ে এই কথাই বলেন—

দানঘাটে রাই বিকাইল
যার রাধা হইল তাহার।

তাঁরা যেন রাধার নামে তিলাঞ্জলি দেন। কারণ রাধা আজ সমাজ সংসারের কাছে নিজেকে মৃত বলে মনে করেন। পদটিতে রাধার সম্পূর্ণভাবে লোকলজ্জাভয় বিসর্জন, কৃষ্ণপ্রেমের প্রগাঢ়তা ও দৃঢ়সংকল্প সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

লোচনদাস

চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচনদাস শুধু চৈতন্যজীবনীকার রূপে নয়, গৌরনাগরী ভাবের প্রবর্তক গীতিকাররূপেও খ্যাত। এই কবির পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতা সদানন্দী। তাঁর জন্মস্থান বর্ধমান জেলার মঙ্গল কোটের কাছে কোগ্রাম। লোচনদাস নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন। তিনি চৈতন্যলীলা, রাধাকৃষ্ণলীলা—উভয় বিষয়ক পদই রচনা করেছেন। তাঁর গৌরনাগরীভাবের পদগুলিতে আন্তরিক অনুভূতির পরিচয় রয়েছে। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদের খ্যাতি, তাঁর রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদগুলিকে নেপথ্যে সরিয়ে দিলেও, এই কবির কৃষ্ণকথাবিষয়ক পদে গ্রামীণ জীবনের কিঞ্চিৎ অমার্জিত অথচ অকৃত্রিম আধারে রাধাকৃষ্ণপ্রেমকথাকে উপস্থিত করা হয়েছে।

শ্রীরাধার পূর্বরাগের পদে কৃষ্ণরূপদর্শনে, কৃষ্ণনাম অথবা বংশীধ্বনি শ্রবণে প্রেম-তন্ময়তার যে মধুর জাগরণ ঘটে, লোচনের পদগুলিতে তার অভাব রয়েছে। পদগুলি গতানুগতিক। কিন্তু এই কবিই কৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনায়, রূপমুগ্ধ যুবকের প্রথম প্রেমের বিস্ময় পুলকিত অপূর্ব অনুভূতি এবং হৃদয় নিংড়ানো বেদনামাধুরীকে সার্থক কাব্যরূপ দান করেন। রাধাকে দেখে, বিস্মিত কৃষ্ণ সখাকে প্রশ্ন করেন—

সখা হে সে ধনী কে কহবটে।
গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে ॥ (৪৮১)

স্নানান্তে সেই সুন্দরীর নিতম্বতটিতে উন্মুক্ত কেশরাশি এসে পড়েছে। মনে, হয় যেন অন্ধকার কনকচাঁদের শরণ নিয়েছে। তাঁর নীলবসন ঘেরা শরীরের সৌন্দর্য দেখে কৃষ্ণ বলে ওঠেন—

চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিতে মোর। (ঐ)

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতি শ্রীরাধার কাছে এসে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের পরামর্শ দেয়। শ্রীরাধা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অভিসার করেন। গোস্বামী বর্ণিত শ্রীরাধার সখী ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা প্রভৃতি তাঁর অভিসার সহায়িকা। কবির অলঙ্কার ব্যবহারে রাধার রূপের দ্যুতি যেন ঝলসে ওঠে—'কনকের লতা যেন দুলিছে বাতাসে (ঐ)।' জীবন্ত স্বর্ণলতা রাধার এই অভিসার বর্ণনায় লোচনদাস যেভাবে অলঙ্কার শাস্ত্র ব্যবহার করেছেন, তার পাশাপাশি তাঁর কিছু কিছু পদের গ্রামীণতা কবির বিপরীত প্রবণতার পরিচায়ক। এরপর কবি ভাগবত অনুযায়ী শারদরাসের বর্ণনা করেছেন (ঐ) ॥ আক্ষেপানুরাগের পদে (৪৮২) রাধা সখীকে সম্বোধন করে বলেন, এত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সেই কৃষ্ণের জন্যই তাঁর প্রাণ কাতর। বিরহ বেদনায় অধীর হয়ে তিনি দিনের বেলাতেই শুয়ে থাকেন। স্বপ্নে কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বললে ননদী তা শুনে ফেলে। লোচনের রাধা বৃন্দাবনদাসের রাধার মত অকুতোভয় নন। তিনি লোকলজ্জা আর তার চেয়েও বেশী ননদীর ভয়ে ভীতা, আর শ্রীকৃষ্ণও বড় নির্লজ্জ। রাধা জল আনতে গেলে কৃষ্ণ তাঁর আঁচল ধরে টানেন, রাধা আঁচল মাথায় দিলে কৃষ্ণ সব সখীর মাঝখানে তাঁর হাত ধরে ফেলেন (৪৮৩)। আবার রাধা একা জল আনতে গেলে, কৃষ্ণ কদমতলায় দাঁড়িয়ে

রাধাকে কাছে ডেকে হেসে হেসে কথা বলেন। এমন সময়ে সেখানে উপস্থিত হন রাধার ননদিনী। তাঁকে দেখে রাধার এত ভয় হয়, তিনি কি করে বাড়ী ফিরবেন ভেবেই পান না। আর একদিন রাধার স্বামী গোষ্ঠে, রাধা বাড়িতে একা। এমন সময় নূপুরের শব্দ শুনে রাধা নাছদুয়ারে এসে কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন। কৃষ্ণ রাধার হাত ধরে ঘরে কেউ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে। এখানে লোচনদাস প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণলীলা সহায়ক। তিনি কৃষ্ণকে বলছেন নির্ভয় হতে। যদি কেউ এসে যায়, তাহলে তিনি সাড়া দেবেন। কিন্তু লোচনদাসের কৃষ্ণ ও রাধার ননদিনীকে বড় ভয় করেন। তাই ঘরের ভেতর ইঁদুর চলাফেরা করলেও কৃষ্ণ—

ধড়ফড়িয়া উঠি বোলে
পালাইয়া যাই ॥ (৪৮৪)

ননদীর ভয়ে এতখানি ভীত কৃষ্ণকে আমরা এই প্রথম আর শেষ দেখলাম। অন্ধকার ঘরে ননদী বাঁশী লুকিয়ে রেখেছিল, রাধা খুঁজে এনে কৃষ্ণের হাতে দিলেন। এখানে কৃষ্ণ রাধা এবং তাঁর ননদী—এই তিনটি চরিত্রই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। লোচনাদাসের সঞ্চারিণী কনকলতা রাধা কখনও কখনও এক গ্রাম্য কলহপ্রিয় রমণীর ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হয়েছেন। ননদিনী রাধাকে কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলার জন্য খোঁটা দিলে, তিনি কোমর বেঁধে কলহ করেন। এই কলহ মাঝে মাঝে শ্লীলতার সীমাও লঙ্ঘন করে যায়—

নন্দের পোয়ের সনে কথা কৈতেছিলাম যদি।
তখন কেনে ধরিস নাই লো থুবরা গরবাখাগী ॥
আপনি যেমন পরকে তেমন শতেকভাতারী।
হাতে নোথে ধরি আর সিন্ধ মুখে চুরি ॥ (ঐ)

আবার কখনও রাধা রেগে গিয়ে বলেন, কে কত সতী তা তিনি জানেন। কিন্তু তারাই বলে রাধা শ্যামসোহাগিণী। রাধা নিজের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন, আসলে তিনি এবং কৃষ্ণ একই নগরে বাস করতেন। তাঁরা খেলার সাথী, সেইজন্যই কৃষ্ণ প্রত্যহ তাঁর কাছে আসেন। তা ছাড়া প্রতিবেশিনীরা সবাই কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলে—তবে একা রাধারই দুর্ণাম হয় কেন? এটি অবশ্য বহু কবিরই সৃষ্ট রাধা চরিত্রের প্রশ্ন (ঐ)।

কিন্তু রাধার ননদী যা করে তা বাস্তবিকই অসহনীয়। রাধা বিকেলবেলায় কলসী নিয়ে জল আনতে বেরোলে, ননদী কলসী কেড়ে নিয়ে ঘরে রেখে দেয় (৪৮৫)। বড় ভয় পেয়ে, মনমরা হয়ে রাধা একপাশে বসে থাকেন। চারদণ্ড বেলা থাকতে রাধার স্বামী এসে রাধাকে কত কথা যে বলে তার ইয়ত্তা নেই। একদিকে রাধার কলহপরায়ণতা এবং অন্য দিকে ননদিনী ও স্বামীর অত্যাচারে সন্ত্রস্ততা তাঁকে সম্পূর্ণভাবে পল্লীবাংলার একটি সাধারণ গ্রাম্য-বধূর বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। আর একদিন রাধা হাতে নাতে ধরা পড়েছেন। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে কেউ নেই দেখে কৃষ্ণ হেসে হেসে ঘরের ভেতর ঢুকলেন। ননদিনীর ভয়ে রাধা কাঁপতে লাগলেন। এমন সময় অকস্মাৎ রাধার স্বামী ঘরে এলে কৃষ্ণ তাঁর অঙ্গজ্যোতিতেই ধরা পড়ে গেলেন (ঐ)। রাধার ননদ আবার তার সখীর কাছে আর একদিনের কথা বর্ণনা করছে। বাড়ীতে তার দাদা অর্থাৎ রাধার স্বামী নেই বলে ননদিনী রাধার কাছে রাত্রে ঘুমাতে গিয়ে দেখে, রাধার বুকের ভেতর বসন ঢাকা

দিয়ে কেউ শুয়ে আছে। প্রশ্ন করতেই রাধা বলল তার স্বামী ফিরে এসেছে। কিন্তু বসন খুলে দেখা গেল 'নন্দের ঘরের কানু' (৪৮৬)। রাধার ননদী তাকে ধরতে যেতেই সে দৌড়ে পালাল। কিন্তু বাঁশীটি কুটিলা কেড়ে রেখে দিল। এদিকে শ্রীরাধার মনে দুঃখের সীমা নেই। শ্যাম বন্ধুকে না দেখে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যায়। কৃষ্ণ হেসে হেসে নাচ দুয়ারে এসে দাঁড়াতেন। কিন্তু ননদী বাঁশীটি কেড়ে নেওয়ার পর থেকে আর তিনি রাধার বাড়ী আসেনই না, অথচ পাড়া পড়শীর বাড়ী এসে ফিরে যান। পথে ঘাটে দেখা হলেও কৃষ্ণ রাধার সংগে কথা বলেন না। সম্ভবতঃ রাধার ধারণা, এটি কৃষ্ণের অবহেলাজনিত। অন্যদিকে সুবল কৃষ্ণের হাতে বাঁশী না দেখে বিস্মিত হয়ে তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। (ঐ) উত্তরে কৃষ্ণ বলেন, সেদিন আয়ান বাড়ীতে নেই জেনে তিনি নির্ভয়ে রাধার কোলে কাপড় মুড়ি দিয়ে আনন্দিত মনে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ রাধার ননদ কোথা থেকে এসে কাপড় তুলে ফেলায় কৃষ্ণ বাঁশীটি ফেলে দিয়ে ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছেন। লোকলজ্জাভীতা, শাশুড়ী ননদীর সতর্ক প্রহরা ও কঠোর শাসনসন্ত্রস্তা এই রাধা পদাবলীতে অংকিত রাধাচরিত্রেরই সাধারণ রূপ। কিন্তু রাধার ননদীর ভয়ে এতখানি ভীত কৃষ্ণকে এই প্রথম দেখা গেল। সব মিলিয়ে বলা যায়, লোচনদাস-রচিত পদাবলীর কৃষ্ণকথায় এবং তাঁর সৃষ্ট রাধাকৃষ্ণ চরিত্রের গায়ে বাংলা দেশের কাঁচা মাটির প্রলেপ খুব গাঢ়ভাবেই লেগে রয়েছে।

জ্ঞানদাস

চৈতন্য পরিমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে পদকর্তা জ্ঞানদাস অন্যতম। ইনি বর্ধমান জেলার কাটোয়ার দশমাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৫৩০ খৃীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দশাখায় জ্ঞানদাসের নাম পাওয়া যায় জ্ঞানদাস যেভাবে নিত্যানন্দের লীলা বর্ণনা করেছেন, তাতে মনে হয় কবি নিত্যানন্দলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। কিন্তু এঁকে নিত্যানন্দের গণ বলে মনে করা হলেও ইনি আসলে ছিলেন জাহ্নবী দেবীর অনুচর। নিত্যানন্দের দেহত্যাগের বেশ কিছু সময় পর জাহ্নবীদেবী ব্রজধামে গেলে, তাঁর সংগীদের মধ্যে একজন ছিলেন জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাস ভণিতায় প্রাপ্ত পদের সংখ্যা বহু। কিন্তু একাধিক জ্ঞানদাসের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং জ্ঞানদাসের নামে যত পদ পাওয়া গেছে সব একজনের বলেই মেনে নিতে হয়। জ্ঞানদাস বাংলা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছিলেন। গৌরাংগ-নিত্যানন্দলীলা এবং রাধাকৃষ্ণলীলা উভয় বিষয়ক পদই তিনি রচনা করেছিলেন।

জ্ঞানদাসের সমস্ত পদগুলি পড়লে বোঝা যায়, প্রথম দিকে তাঁর কবি প্রতিভা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও বসু রামানন্দের অনুকরণে নিজের যথার্থ প্রবণতার সন্ধান করতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত কবি জ্ঞানদাস বিদ্যাপতির পদের আলংকারিক রীতি বাদ দিয়ে চণ্ডীদাস ও নরহরি সরকারের সহজ সরল রীতিকেই গ্রহণীয় মনে করেছেন। চণ্ডীদাসের মধ্যে শরীর-অতিক্রমী অনুভূতিরই প্রাবল্য। অন্যদিকে জ্ঞানদাস কিন্তু শরীরকে অস্বীকার করেন নি, শরীরের সঙ্গে মনের যে নিবিড় সংযোগ, তা জ্ঞানদাসের পদগুলি ছাড়া বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের অন্যত্র দুর্লভ।

কৃষ্ণকথা নিয়ে জ্ঞানদাস যে আখ্যায়িকা মূলক পদ রচনা করেছিলেন, সেগুলির

মধ্যে কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যগুলি পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকাশলাভ করে নি। সেজন্য এগুলিকে তাঁর প্রথম দিকের রচনা বলে অনুমান করা যায়। জ্ঞানদাসের কৃষ্ণকথা কৃষ্ণজন্ম থেকেই শুরু হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় কবি সম্পূর্ণতঃ ভাগবত অনুসারী নন। ভাগবতে ভগবানের আজ্ঞায় বসুদেব, কৃষ্ণকে যশোদাগৃহে নিয়ে চললেন। আর জ্ঞানদাস বলেছেন, দৈববাণী শুনে বসুদেব পুত্রকে নন্দগৃহে নিয়ে চললেন। এখানে ভাগবত অনুসারে বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণস্তব অনুপস্থিত। বসুদেব, দেবকীর কাছ থেকে পুত্র প্রার্থনা করলে—

দেবকী বলয়ে আমি আগে প্রাণ ছাড়ি।
যাউক প্রাণ তবু পুত্র দিতে আমি নারি।
*   *   *   *   *
দশমাস দশ দিন ধরিয়া জঠরে।
এমত সোনার পুত্র দিব কোথাকারে॥[৮৩]

মাতৃহৃদয়ের এই ব্যাকুল বেদনার চিত্র কোন পুরাণেই আমরা পাইনা। এটি জ্ঞানদাসের নিজস্ব সৃষ্টি। প্রতিভার উন্মেষলগ্নই তার পরিণত রূপের পূর্বাভাস যেন এখানে পাওয়া যায়। বসুদেবের নন্দ গৃহে গমন, যমুনা পার হওয়ার বর্ণনায় কবি অন্যান্য বাঙ্গালী কৃষ্ণকথাকার কবিদের মত ভবিষ্য পুরাণের বশিষ্ঠ-দিলীপ সংবাদে জন্মাষ্টমী ব্রতকথার কাহিনীকে অনুসরণ করেছেন। ভাদ্রমাসের তরঙ্গসঙ্কুল ভরা যমুনা দেখে বসুদেব ভয় পেলে, মহামায়া শৃগালরূপ ধারণ করে আগে আগে পার হলেন। যমুনা পার হওয়ার সময় কৃষ্ণ স্নানের ছলে কোল থেকে পড়ে গেলেন। বসুদেব জল থেকে আবার কৃষ্ণকে খুঁজে নিয়ে কোলে তুলে নিলেন। এই বর্ণনা অন্য কোনো পুরাণে নেই। ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত নন্দোৎসব অনুযায়ী জ্ঞানদাসও কৃষ্ণের জন্মের পর নন্দের গৃহে উৎসবের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা করেছেন।

কৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোরকে অবলম্বন করে প্রচুর পদ থাকলেও শ্রীরাধার শৈশব-কৈশোর বর্ণনা বিষয়ক পদ বিরল। এই বিরল পর্যায়ে জ্ঞানদাসের পদচারণা মৌলিকতারই পরিচায়ক। শিশু কন্যাটিকে দেখে প্রতিবেশিনী রাধার জননীকে বলেন—

এ তোর বালিকা চাঁদের কলিকা
দেখিয়া জুড়াবে আঁখি।
হেন মনে লয় এ হেন রূপক
পদুকা করিয়া রাখি।

আর একটি পদে রাধার কন্যাবৎসলা জননীর মাতৃহৃদয়ের আশঙ্কা ও মমত্ব বড় চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সকাল থেকে বালিকা রাধা খেলা করতে বেরিয়ে গেছেন, তাঁকে খুঁজে না পেয়ে মা বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তাই কন্যা গৃহে ফিরে এলে তিনি ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করেন—

প্রাণনন্দিনী, রাধা বিনোদিনি,
কোথা গিয়াছিলা তুমি।

এ গোপ নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি ॥

মা তাঁর বালিকা কন্যাকে প্রশ্ন করেন, তার আঁচলে এত খাবার কে বেঁধে দিল ? অগুরুচন্দন, কস্তুরী-কুঙ্কুম, মাথায় বিনোদ বেণী আর নব মল্লিকার মালা দিয়েই বা কে রাধাকে সাজাল ? উত্তরে সরলা বালিকা বলে, খেলতে যাওয়ার সময় পথ থেকে এক গোয়ালিনী তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে সাজিয়ে দিয়েছেন। তার পুত্রের রূপের ছটায় বালিকার প্রাণ মোহিত। গোয়ালিনী রাধাকে সেই পুত্রের বামে বসিয়ে দুজনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন এবং রাধার গৌরবর্ণ শরীরকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে দিলেন। মেয়ের কথা শুনে রাধার মা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। পদ দুটিতে রাধার জননীর অকৃত্রিম বাৎসল্যের সঙ্গে সঙ্গে মধুর রসেরও সূক্ষ্ম কোমল প্রলেপ পড়েছে।

জ্ঞানদাসের প্রথম দিকের রচনা বলে গৃহীত কৃষ্ণের নাপিতানী বেশে রাধার সঙ্গে মিলন আখ্যায়িকাধর্মী পদ। এই পদগুলির মধ্যে একটিতে জাবটের নাম উল্লেখ, ব্রজমণ্ডল সম্বন্ধে জ্ঞানদাসের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চিহ্ন বহন করে। কৃষ্ণ সুবলের কাছে সংকল্প প্রকাশ করলেন যে, তিনি জাবটে গিয়ে রাধার পায়ে আলতা পরিয়ে নিজের নাম লিখে দেবেন। অতঃপর নাপিতানী বেশে কৃষ্ণ জাবটের রাজপথে গিয়ে উপস্থিত হলে রাধার এক সখী তাঁকে দেখতে পেয়ে রাধার পায়ে আলতা পরানোর জন্য ডেকে নিয়ে গেলেন। নাপিতানী বেশধারী কৃষ্ণকে রাধা বললেন, তাঁর কাছেই থেকে যেতে। উত্তরে নাপিতানী বলে—

বৃদ্ধ পতি আছে মোর মথুরা নগরে।
তিল আধ আমা ছাড়া রহিবারে নারে ॥

একথা শুনে হেসে হেসে রাধা রত্ন সিংহাসনে বসে পা দুটি বাড়িয়ে দিলে কৃষ্ণ সযত্নে রাধার পায়ে আলতা পরিয়ে নিজের নাম লিখে দিলেন। স্বীয় অঙ্গে কৃষ্ণের স্পর্শ পেয়েই রাধা বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। এখন পায়ে কৃষ্ণের নাম লেখা দেখে, রাধা রসের আবেশে নাপিতানী বেশধারী কৃষ্ণের কাঁধেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। চণ্ডীদাসের অনুরূপ পদেও আমরা রাধার রসাবেশ লক্ষ্য করি। কবি জ্ঞানদাস এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন মনে করা হয়ে থাকে। অতঃপর রাধা কৃষ্ণকে বললেন, সূর্যপূজার ছলে তিনি রাধাকুণ্ডতীরে গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবেন। পরবর্তী প্রসঙ্গটি কবি রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধ মাধব নাটক থেকে গ্রহণ করেছেন। নাপিতানীবেশী কৃষ্ণ রাধার গৃহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে জটিলার সঙ্গে দেখা হলে, জটিলা তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। কৃষ্ণ বললেন, তাঁর বাড়ী মথুরা নগরে। তিনি কামাতে এসেছিলেন। ঘরে বৃদ্ধপতি রয়েছে, তাই তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। এরপর রাধা কুন্দলতার সাথে সূর্যপূজার ছল করে রাধাকুণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে রাধাকৃষ্ণ উভয়ের মিলন হল। কৃষ্ণ রাধার চরণ স্পর্শ করেছিলেন, তাই রাধা খুবই লজ্জিত হলেন। কিন্তু এর উত্তর কৃষ্ণ যা দিলেন, তা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে রাধার অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। শ্রীচৈতন্যের অলোকসামান্য প্রেমের পূর্ব-দৃষ্টান্ত ছাড়া এই পংক্তি লেখা হয়ত জ্ঞানদাসের পক্ষে সম্ভবই হত না—

তুমার চরণ, বিনে মোর মন, তিল আধ নাহি রয়।
যে কর, সে কর, চরণে রাখিহ, জ্ঞানদাস ইহা কয়॥

জ্ঞানদাসের প্রথম পর্যায়ের রচনা বলে চিহ্নিত এই পদগুলি ছাড়াও অন্যান্য পদে কবি তাঁর নিজস্ব প্রবণতায় মুক্তিলাভের পথ খুঁজে পাওয়ার আগে, দুই বিশিষ্ট পূর্বসূরী—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনারীতির এবং ভাবের অনুকরণ করেছেন। জ্ঞানদাস রচিত রাধাকৃষ্ণ লীলাকথার বিভিন্ন পর্যায় আলোচনার সময় আমরা প্রাসঙ্গিকভাবে বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের প্রভাব আলোচনা করব।

ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্যে বলরামদাস বাৎসল্যের ও সখ্যরসের সুনিপুণ রূপকার। জননী যশোদার স্নেহ শঙ্কাতুর মাতৃ হৃদয়ের উদ্বেগ, কৃষ্ণের প্রতি সখাদের সেবানির্ভরতাময় গভীর ভালবাসার চিত্র অঙ্কনে বলরামের লেখনী অজস্র রসবর্ষণ করেছে। কিন্তু এই পর্যায়ের পদরচনায় জ্ঞানদাসের কৃতিত্বও কম নয়। সখ্যরসের পদবর্ণনায় কবিত্ব ছাড়াও কথা অংশে জ্ঞানদাস কিছু কিছু অভিনবত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু'তে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের বার জন প্রিয়সখার নাম করেছেন। এঁরা হলেন শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কণী, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক। প্রিয়নর্ম্মসখা শ্রীরূপের বর্ণনায় পাঁচজন—সুবল, অর্জুন, গন্ধর্ব, বসন্ত ও উজ্জ্বল। এই সতেরজনের মধ্যে জ্ঞানদাসের বর্ণনায় শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, কিঙ্কণী, স্তোককৃষ্ণ, অংশুমান, সুবল, অর্জুনও উজ্জ্বল-এই নয়জনের মাত্র নাম রয়েছে। তবে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নেই—এমন সাত জনের নাম জ্ঞানদাসের পদে পাওয়া যায়। এই নামগুলি হল—দেবদত্ত, সুনন্দ, নন্দক, বিষয়া, সুবাহু, বরূথপ এবং বিশালা। শেষের দুজন সখার নাম অবশ্য ভাগবতে পাওয়া যায়।[৮১] এক্ষেত্রে জ্ঞানদাসের কল্পনা শ্রীরূপকে অতিক্রম করে মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছে।

কৃষ্ণসখা গোপবালকদের রূপ বর্ণনা করে জ্ঞানদাস কিছু পদ রচনা করেছেন। এখানেও কবি জ্ঞানদাসের কল্পনা, শ্রীরূপের বর্ণনার শাসন মেনে চলে নি। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে কৃষ্ণসখা শ্রীদামের গাত্রবর্ণ শ্যাম, পরিধেয় বসন পীত, মাথায় তাম্রবর্ণের উষ্ণীষ। আর জ্ঞানদাসের বর্ণনায় শ্রীদামের আরক্ত সুন্দর কান্তি। তাঁর কুন্তল বনফুলের মালা দিয়ে বাঁধা। তাঁর পরিধানে পীতবসন নয়, অরুণবরণ ধটি। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উজ্জ্বলকে কৃষ্ণের মতই নীল গাত্রবর্ণ বিশিষ্ট এবং অরুণ বর্ণের বসন পরিহিত বলা হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানদাসের বর্ণনা এর বিপরীত। সেখানে উজ্জ্বলের গাত্রবর্ণই লোহিত আর বসনের রং নীল। এইভাবে জ্ঞানদাস মোট ষোলজন সখার রূপগুণ বর্ণনা করেছেন। এই ষোলজন সখা হলেন শ্রীদাম, সুদাম, স্তোককৃষ্ণ, সুবল, অংশুমান, বসুদাম, কিঙ্কনী, অর্জুন, দেবদত্ত, সুনন্দ, বরূথপ, নন্দক, বিশালা, বিষয়া, উজ্জ্বল ও সুবাহু। জ্ঞানদাস বর্ণিত ষোলজন সখার মধ্যে সুনন্দ নন্দক, বিষয়া এবং সুবাহু—এই চারজনের কথা কোনো গোস্বামী বলেন নি এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও পদ্মপুরাণেও এদের নাম পাওয়া যায় না। এরা জ্ঞানদাসের নিজস্ব সৃষ্টি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও জ্ঞানদাসের পদের বর্ণনার এই ভিন্নতা থেকে

অবশ্য মনে হয় জ্ঞানদাস ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পড়ার আগেই এই পদগুলি রচনা করেছিলেন।

সখ্য ও বাৎসল্যরসযুক্ত গোষ্ঠলীলার পদ বর্ণনায় কবি হিসেবে জ্ঞানদাসের অপর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, তিনি নিজেও সক্রিয়ভাবে যেন গোষ্ঠলীলায় অংশ গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ নিজেকে তিনি এক গোপবালকরূপে কল্পনা করেছেন। গোষ্ঠলীলার প্রতি কবির এই আকর্ষণের কারণ হিসেবে বলা যায়, সম্ভবতঃ নদীয়ায় নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর গোষ্ঠলীলা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কারণ জ্ঞানদাসের নিত্যানন্দলীলা-বিষয়ক পদগুলি কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ বলরামদাস, পুরুষোত্তমদাস প্রভৃতির মত নিত্যানন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাবের পরিধিভুক্ত হয়ে জ্ঞানদাস গোষ্ঠলীলার পদ রচনা করেছিলেন।

জ্ঞানদাসের গোষ্ঠলীলার পদগুলিতে কৃষ্ণসখা গোপবালক ও কৃষ্ণজননী যশোদার নিবিড় কৃষ্ণপ্রীতি ও বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পদাবলীর মধ্যে চরিত্রচিত্রণের অবকাশ কম, তবু জ্ঞানদাসের এই পদগুলিতে সে চেষ্টা আছে। সকালে অনেক বেলা হয়ে যাওয়ায় সখারা কৃষ্ণকে ডাকতে এসেছে। কৃষ্ণ দেরী করার জন্য তাদের অভিমান হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণের ভালবাসার, আর কৃষ্ণ সান্নিধ্যের এমনই আকর্ষণ যে, তাঁকে ছেড়েও তারা যেতে পারে না। তাদের ডাকে মাথায় 'বিঁদন দড়ি' আর 'হাতেতে কনক-দড়ি' কৃষ্ণ গোপবালকদের নিয়ে যমুনার তীরে উপনীত হলেন। এদের মধ্যে কবিও একজন গোপবালক।

জ্ঞানদাসের গোষ্ঠলীলার পদে অঙ্কিত জননী যশোদা বড় বেশি শঙ্কাতুরা। তাই শ্রীদামের অনুরোধেও তিনি কৃষ্ণকে মাঝে মাঝে গোষ্ঠে যেতে দেন না, কম বয়সের অজুহাত দেখান। আবার কৃষ্ণ যখন গোচারণে যান, তখন তাঁর সুন্দর রূপ দেখে যমুনার তরঙ্গও যেন আনন্দে বেড়ে যায়। নীল বসন পরিহিত বলরামের রূপ এবং গোষ্ঠ লীলা বর্ণনায়ও কবির কৃতিত্ব প্রশংসনীয় (১০৮)। ১০৯ সংখ্যক পদে বলরামের রূপ এবং তারই সঙ্গে যে বিবিধ সাত্ত্বিক বিকার দেখা যায়, তার বর্ণনা পড়ে মনে হয়, বলরামের ভাবে ভাবিত নিত্যানন্দের লীলাদর্শন করেই কবি এই ধরনের পংক্তি রচনা করেছিলেন—

> অরুণ নয়ন করি অধর কাঁপায়।
> ভয় মানি কেহ তার নিকটে না যায়॥
> আপনার ছায়া দেখি তারে কহে কথা।
> আপনে কহে বাত আপনে নাড়ে মাথা॥
> ক্ষেণে হাসে ক্ষেণে কাঁদে বিবিধ বিকার।
> বালকের সঙ্গে ক্ষণে করেন বিহার॥

জ্ঞানদাস শ্রীরূপের অনুসরণে সখ্যরসের সঙ্গে মধুর রসের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। গোষ্ঠলীলার একটি পদে এর চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ থেকে চলে গিয়ে রাধাকুণ্ডে রাধার সঙ্গে মিলিত হন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি

পুনরায় সখাদের কাছে এলে, সরল গোপবালকেরা শ্রীকৃষ্ণের শরীরের সম্ভোগ চিহ্নকে কাঁটার আঁচড় বলে ভাবেন—

হিয়ায় কণ্টক দাগ বয়নে বন্দন রাগ
মলিন হইয়াছে মুখশশী।
আগা সভা তেয়াগিয়া কোন বনে ছিলে গিয়া
তোমা ভিন্ন সব শূন্যবাসি॥

গোপবালকদের সারল্য এবং কৃষ্ণের প্রতি একান্ত নিবিড় ভালবাসা, উভয়ই এই পদের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণের মলিন মুখ দেখে সখাদের প্রাণ ফেটে যায়। জ্ঞানদাস নিজেই এখানে এক গোপবালক হয়ে কৃষ্ণকে বলছেন—

শুন ভাই নীলমণি
একোন চরিত তোর বল।
আমাদের ফেলে বনে যাও তুমি অন্য স্থানে
তুমি মোদের এক যে সম্বল॥

বাৎসল্য ও সখ্যরসের শ্রেষ্ঠ রূপকার বলরামদাসও এত আন্তরিকভাবে কৃষ্ণের কাছে সখাদের অভিযোগ রাখতে পারেন নি। জ্ঞানদাস রচিত উত্তর-গোষ্ঠের পদেও মধুর রসের প্রগাঢ় মিশ্রণ ঘটেছে। বাঁশী বাজিয়ে কৃষ্ণ ঘরে ফিরেছেন। সেই বাঁশীর শব্দ শুনে ব্রজবধূরা শয্যা ত্যাগ করে বনে ছুটে গেছেন।

কিন্তু জ্ঞানদাসের প্রতিভার স্ফূর্তি ঘটেছে পূর্বরাগ, অনুরাগ, রূপানুরাগ ও রসোদ্গারের পদে। এ ছাড়াও আক্ষেপানুরাগ, দান ও নৌকাবিলাসের পদেও জ্ঞানদাস তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। স্নিগ্ধ মাধুর্যের অবিরল উৎসারণ জ্ঞানদাস রচিত পদের বৈশিষ্ট্য। এই মাধুর্যস্নিগ্ধতা শুধু পূর্বরাগ, অনুরাগে নয়; খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা ও প্রেমবৈচিত্ত্য পর্যায়েও উৎসারিত। প্রথম দিকে অবশ্য জ্ঞানদাস— বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস উভয়কেই অনুসরণ করেছিলেন। শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি, নবোঢ়া মিলন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে রচিত পদের মধ্যে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যাপতির প্রভাব দেখা যায়। এমনকি ঘটনাক্রমও বিদ্যাপতির অনুকরণে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিদ্যাপতির পদে যেখানে শুধুমাত্র রাধার রূপের বর্ণনাই প্রাধান্য পেয়েছে, জ্ঞানদাস সেখানে সুকৌশলে নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলনের চিত্রটিকেও মনস্তত্ত্বসম্মতভাবে উপস্থিত করেছেন—

পরখে পুছলুঁ হাম তাকর নাম।

বিদ্যাপতির সদ্যকৈশোরোত্তীর্ণা রাধাকে দেখে—'কো কহে বালা কো কহে তরুণী'। জ্ঞানদাসের কৃষ্ণ সদ্যতরুণী রাধাকে দেখে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলেন—

এ সখি। এ সখি। বুঝই না পারি।
কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী॥

তরুণী রাধার রূপ বর্ণনায় বিদ্যাপতি যে আলঙ্কারিক উপমা প্রয়োগের রীতি গ্রহণ করেছিলেন—জ্ঞানদাসও প্রথম দিকে সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। প্রথম মিলনের

সময় বিদ্যাপতির পদে সখী যেভাবে কৃষ্ণকে সাবধান করে দেন ও পরামর্শ দেন, জ্ঞানদাসের সখীও তাই করেন। বিদ্যাপতির সখী বলেন—

বদর সরিস কুচ পরসব লহু।
কত সুখ পাওব করিত উহু উহু॥

আর জ্ঞানদাসের সখী বলেন—

উরজ উঠল জনু বদরি।
করে জানি ঝাপই সগরি॥
পরবোধে পরসিহ থোর।

কিন্তু জ্ঞানদাসের প্রতিভা যখন আত্মপ্রকাশের নিজস্ব পথ খুঁজে পেয়েছে, তখন তাঁর পূর্বরাগ অনুরাগের পদে সঞ্চারিত হয়েছে অনাড়ম্বর ভাষায় সেই মার্জিত লাবণ্য, যে লাবণ্য-কিরণসম্পাতে কাব্যে ফুটে ওঠে বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা, প্রকাশিত হয় অপূর্ব বিস্ময়, শব্দব্যবহারের বিশিষ্টতায় ফুঠে উঠে ধ্বনি ও ভাবের অপূর্ব অভিব্যক্তি।

পূর্বরাগ পর্যায়ে রাধাকে দেখে সখীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—প্রত্যহ যমুনায় স্নান করতে যাওয়া রাধা আর আজকের রাধার মধ্যে যেন বিস্তর প্রভেদ। রাধাকে ডাকলে সাড়া দেয় না, মাঝে মাঝে চমকে ওঠে। দেহে এত বেশী উত্তাপ যে দেহ স্পর্শ করা যায় না। কালো বরণ দেখতেই রাধা ভালবাসে। সখীরা ভাবেন, হয়ত বা কোন দেবদানবের ভর হয়েছে রাধার ওপর। এখানে জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসকেই অনুসরণ করেছেন। রাধার এই পূর্বরাগ জাগরণের উপায় রূপে জ্ঞানদাস বর্ণনা করেছেন সখীমুখে কৃষ্ণের নাম শ্রবণ, মুরলীধ্বনি শ্রবণ, গুণিজনের মুখে তাঁর গুণ গান এবং স্বপ্নে ও চিত্রে কৃষ্ণকে দর্শন। এই উপায়গুলি সবই শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণির শৃঙ্গারভেদ প্রকরণে পূর্বরাগ বিচারে উল্লিখিত। কিন্তু সীমাবদ্ধ প্রথানুগত্যের মধ্যেও এই পর্যায়ে জ্ঞানদাসের প্রতিভার বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণের নাম শুনেই রাধা সখীকে বলেন—

অপরূপ শ্যাম নাম দুই আখর
তিলে তিলে আরতি বাঢ়ায়॥ (১১৬)

ধেনুকবধের দিন কৃষ্ণ যখন সুবল সখার সঙ্গে অবস্থান করছিলেন, তখন রাধা তাঁর দৃষ্টিতে পড়েছেন এবং কৃষ্ণকে দেখে তিনিও লজ্জাভয় পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন। এখানে মধুর রসের সঙ্গে জ্ঞানদাস ঐশ্বর্যভাবের মেলবন্ধ রচনার একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন বলা চলে।

প্রেমের তন্ময়তায় রাধা তাঁর চিন্তার সর্বত্র ব্যাপ্ত কৃষ্ণকে কখনও কখনও দেখতে পান স্বপ্নে। এর আগে চৈতন্যসহচর রামানন্দ বসু এই স্বপ্ন মিলন নিয়ে একটি সার্থক পদ রচনা করেছেন। কিন্তু সেখানে অনুভূতির এমন অতলস্পর্শী গভীরতা, প্রেমমগ্নতার এমন মোহময় আবেশ সৃষ্টি হয় নি। একটি পদে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মধ্যরাত্রির মিলনকে, রাধা স্বপ্ন বলে ননদীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছেন। কিন্তু রাধার বলার ভঙ্গীটিই কি অপূর্ব—

হেনই সময়ে সে বনদেবতা
মোরে গরাসিল আসি (১২৬)

এই পদটিতে রাধার সন্দিগ্ধা ননদীর একটি চমৎকার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। রাধার স্বপ্ন মিলনের বর্ণনা সে বিশ্বাস করে নি। তাই—"এ বোল শুনিয়া ননদী ঠমকী বেড়ায় আইখের ঠারে।" অপর পদটিতে শ্রাবণঘন গহনমোহে রিমিঝিমি বর্ষণের শব্দে উতরোল প্রকৃতির বুকে নিদ্রিতা রাধার কাছে স্বপ্নে এসেছেন এক শ্যামল পুরুষ। রাধা তাঁর নাম না বললেও তিনি যে কৃষ্ণ, তা বুঝে নিতে আমাদের কষ্ট হয় না। স্বপ্নে নয়, সেই পুরুষ যেন রাধার মর্মে নিজের আসন পাতলেন, হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে গেল তাঁর স্নেহ, আর শ্রবণ পরিপূর্ণ হয়ে গেল তাঁর মধুর বাণীতে। স্পষ্টই বোঝা যায়, এখনও রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন হয় নি। তিনি শুধু রূপ দেখেই ভুলেছেন। তাই জাগরণের চিন্তায় যিনি সদাব্যাপ্ত, স্বপ্নে তাঁকেই দেখেছেন রাধা। রামানন্দের স্বপ্ন-মিলনের পদে প্রকৃতির বর্ষণ ও গর্জনের সঙ্গে পক্ষী ও কীট পতঙ্গের বিচিত্র ধ্বনির সম্মেলন ঘটে নি! এখানে যেন সারা বিশ্বপ্রকৃতি রাধার স্বপ্ন দর্শনের পটভূমিটি রচনা করে দিয়েছে।

পূর্বরাগ পর্যায়ে রাধার হৃদয়বেদনার দোসর তাঁর সখীরা। একদিন যমুনার তীরে কৃষ্ণকে দেখে ফিরে এসে রাধা ঘরে বসে কাঁদলেন। সখী ললিতা এসে স্নেহময়ী জননীর মত তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে সযত্নে নিজের আঁচল দিয়ে রাধার মুখ মুছিয়ে দিয়ে তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সখীরা সব সময়েই রাধাকৃষ্ণলীলা সহায়িকা ও সেবা-কাঙ্ক্ষণী। এ ব্যাপারে সখীদের মধ্যে ললিতার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কিন্তু জ্ঞানদাস এই পদে ললিতার মধ্যে যে মমত্ববোধ ও প্রগাঢ় প্রীতির সঞ্চার ঘটিয়েছেন—তা নিঃসন্দেহে তাঁর চরিত্রচিত্রণ দক্ষতার পরিচায়ক। অবশ্য এখানে "বামকরপর ধরিয়ে কপোল, মহাযোগিনীর পারা" রাধার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা চণ্ডীদাসের "বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে, যেমত যোগিনী পারা" রাধার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কৃষ্ণ-প্রেমের নিবিড় গভীর আবেশে কখনও রাধা সখীদের আহ্বান করে বলেন—

চল সভে মেলি, শ্যাম শ্যাম বলি
রহিতে না পারি ঘরে ॥

কৃষ্ণ নাম করতে করতে সবাইকে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ার এই অভীপ্সা আমাদের কি সংকীর্তনে ইচ্ছুক চৈতন্য অথবা নিত্যানন্দের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না?

রাধার এই ভাব দেখে কখনও আবার তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষিণী সখীরা শঙ্কিতা হয়। রাজপথে যেতে যেতে হঠাৎ কৃষ্ণকে দেখে আবেশে বিভোর হলেন রাধা। কৃষ্ণ চলে গেলেন। কিন্তু রাধা সব ভুলে সেই রাজপথে একা একা দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। এই আত্মবিস্মৃতা রাধা একান্তভাবে জ্ঞানদাসেরই কবি প্রতিভার নিজস্ব নির্মিতি।

প্রেমমুগ্ধা রাধার প্রতি মমত্ব ও প্রীতি কেবল ললিতার নয়, সব সখীই রাধার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। কিন্তু জ্ঞানদাসের পদে সখীদের সম্পর্কে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হয় না। তারা যেন মায়ের স্নেহ আর শাসন দিয়ে, পরিচর্যা আর সতর্ক প্রহরা—এমন কি প্রয়োজন হলে সস্নেহ তিরস্কার দিয়ে রাধাকে ঘিরে রাখে।

রাতা উতপল নয়ানযুগল
কেন্দে কেন্দে আঁখি ফুলালি ॥

* * * * *

এই রাজ পথে কেহ নাই সাথে
কলঙ্কিনী নাম ধরালি। (১২১)

এমনি করে কখনও রোদন বিধুরা রাধাকে কোলে তুলে নেওয়ার, কখনও বা আত্ম-বিস্মৃতা রাধাকে তিরস্কার করে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব একমাত্র জ্ঞানদাসের সখীরাই নিতে পারেন।

পূর্বরাগের কিছু কিছু পদ জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাসের অনুসরণে রচনা করেছেন—একথা আগেই বলা হয়েছে। সেই পদগুলিতে প্রেমের নিবিড় গভীর আর্তি এবং কৃষ্ণ প্রেমে সর্বস্ব সমর্পণের দ্বিধাহীন আনন্দ বেজে উঠেছে—

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলী
নিমিখে নিমিখে হারা ॥

শুধু তাই নয়, রাধা নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করেন—

তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিলু শ্যাম বন্ধু বিনু
আর কেহো মোর নয় ॥ (৬৩)

স্বামীর প্রেম রাধার কাছে বিষের মত মনে হয়। ননদী নির্জনে ডেকে নিয়ে রাধাকে অনেক বোঝান। কিন্তু একমাত্র কানুর প্রেম ছাড়া রাধার মনে অন্য কিছুই জাগে না।[৬৪] কৃষ্ণপ্রেমের অপযশ রাধার 'চন্দন চুয়া', কারণ রাধা বলেন—

শ্যামের রাঙগা পায়, এ তনু সঁপেছি,
তিল তুলসীদল দিয়া ॥

এই নির্ভয় আত্মসমর্পণ আর নিঃসঙ্কোচ ঘোষণাই জ্ঞানদাসের রাধাকে মহাভাবময়ী করে তুলেছে।

রাধার অবস্থা দেখে দূতী কৃষ্ণের কাছে গিয়ে রাধার প্রেম নিবেদন করলে, কৃষ্ণ ছদ্ম-বিরূপতায় তা প্রত্যাখ্যান করলেন। রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধ মাধব নাটকে এবং রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটকে কৃষ্ণের এই প্রত্যাখ্যানের প্রসঙ্গ আছে। জ্ঞানদাসের একটি পদে আমরা দেখি, কৃষ্ণের এই বিরূপতায় ব্যথিতা রাধার দূতী চোখের জলে পথ দেখতে পেলো না। এইভাবে দূতীর চরিত্র চিত্রণেও জ্ঞানদাস যথেষ্ট আন্তরিকতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনায় জ্ঞানদাসে গতানুগতিকই বলা যায়। দূতীকে প্রথমে প্রত্যাখ্যান করলেও পরে তার মুখ থেকে রাধার অনুরাগের কথা শুনে কৃষ্ণ বললেন—

সো তনু পরশয়ে তাপ সব মেটায়ে
তব হাম জীবন পাই।

দূতীর কাছ থেকে কৃষ্ণের অনুরাগের কথা শুনে রাধা বাইরে ঔদাসীন্য দেখিয়ে নানা চিহ্ন দ্বারা তাঁর কৃষ্ণানুরাগ ব্যক্ত করলে দূতী সেই সংবাদই কৃষ্ণকে দিলেন (১৩৪)। তারপর একদিন স্নানসমাপনের পর সখীদের সংগে সুন্দরী রাধা যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন পথে এক নির্জন স্থানে কৃষ্ণ সুবলকে সংগে নিয়ে উপস্থিত হলেন। এইভাবে জ্ঞানদাসের রাধা ও কৃষ্ণ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে প্রথম এলেন। এতে গতানুগতিকতার মধ্যেও কথাবস্তুতে একটু অভিনবত্বের সঞ্চার হয়েছে।

রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ ও রসোদ্গার পর্যায়ে কৃষ্ণরূপমুগ্ধা রাধার উচ্ছ্বলিত আনন্দ ও গভীর প্রেমানুভূতির প্রকাশে, সেই নিবিড় গভীর অথচ কোমল মধুর প্রেমের অলংকার বিরল ভাবতন্ময় বর্ণনায় জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভা যেন মত্ত ময়ূরের মত শতবরণের ভাব উচ্ছ্বাসে কলাপ বিকাশ করেছে। বিদ্যাপতির অলংকারবৈচিত্র্য ও চণ্ডীদাসের ভাবোচ্ছ্বাসকে অতিক্রম করে ভাবের সংহত রূপকে ভাষায় আয়ত্ত করার বৈশিষ্ট্য এখন জ্ঞানদাসের পদে প্রকাশ পেয়েছে। এই পর্যায়ের পদগুলি জ্ঞানদাসের কবি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বিদ্যাপতি নায়কের রূপানুরাগ নিয়ে বেশী পদ রচনা করেছেন। অন্যদিকে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পদে নায়িকার রূপানুরাগই বেশী। এর কারণ বিদ্যাপতির প্রেমে কাম ও লালসা মিশ্রিত। তাই পুরুষের কামনা দিয়ে দেখা নারীরূপ বর্ণনাই তাঁর পদে বেশী, আর অন্যদিকে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের উপজীব্য প্রেম। তাই অনুভূতি প্রধান নারীর তথা রাধার প্রেমের আবেগই তাঁদের বর্ণনীয় বিষয়। বিদ্যাপতির অনুরাগ দেহকামনাসর্বস্ব, অন্যদিকে চণ্ডীদাস অনুভূতিসর্বস্ব। দেহ এবং মন, উভয়ের নিবিড় সম্পর্ক রূপলাভ করেছে জ্ঞানদাসের পদে। রূপ এবং গুণ উভয়ই জ্ঞানদাসের রাধার অনুরাগকে বাড়িয়ে তোলে। দেহমনের এই নিবিড় গভীর সম্পর্কে প্রেমের যে পূর্ণাবয়ব সুচারু রূপ জ্ঞানদাসের কাব্যে গড়ে উঠেছে, তা অন্য কোন বৈষ্ণব কবির মধ্যে দেখা যায় না।

জ্ঞানদাসের রাধা প্রেমের অঞ্জন চোখে লাগিয়ে অতৃপ্ত ভাবে কৃষ্ণের রূপ দেখেন, যতই দেখেন তৃষ্ণা আরও বেড়ে যায় (১৩৬)। কৃষ্ণের মধুর বচনে রাধার হৃদয় তো বটেই— পাষাণ পর্যন্ত যেন গলে যায়। তাঁর মধুর ভ্রূভংগী, হাসিমাখা কথা রাধার হৃদয়কে বিবশ করে দেয় (১৩৯)। গৃহ তাঁর কাছে মনে হয় অরণ্যের মত (১৪১)। কৃষ্ণের ললিত মধুর রূপ আর রাধার প্রেমবিগলিত আনন্দকে কবি তাঁর নিজস্ব বিশিষ্ট শব্দ সৃজন কুশলতায় প্রকাশ করেন—

সই বড় বিনোদিয়া সে
অধর মিলানিয়া মন্দ হাসিখানি
মরমে লাগিয়াছে ॥

কৃষ্ণের রূপের অতুলন মোহিনী শক্তির স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে রাধা সখীকে বলেন—"তিমিরে গরাস্যা ছিল মোরে"। কৃষ্ণের কালো রূপের তিমিরে রাধার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু অনুরাগের এই সর্বগ্রাসী মুহূর্তেও রাধা ননদিনীর ভয়ে শঙ্কিতা। এদিক দিয়ে তিনি চণ্ডীদাসের রাধার সগোত্রীয়া। কখনও প্রেমের গাঢ়তায় কৃষ্ণের রূপকে রাধা শুধু চোখ দিয়ে নয়, যেন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেন। কৃষ্ণকে দেখলেই তিনি তাঁর স্পর্শসুখ লাভ করেন। তাঁর মনে হয়—

অপরশে দেই   পরশ সুখ সম্পদ
শ্যামর সহজ স্বভাবে ॥

শেষ পর্যন্ত রাধা আর কৃষ্ণের রূপকে কোন বর্ণনায় চিহ্নিত করতে পারেন না। কৃষ্ণরূপের অতল বিস্তারী সমুদ্রে রাধার চোখ ডুবে যায়, রূপ দেখার আর প্রশ্ন থাকে না। কৃষ্ণের যৌবন যেন শ্যামল অরণ্য, সেখানে রাধার মন হারিয়ে যায়। যমুনার ঘাট থেকে ঘরে যাওয়ার পথটুকু আর শেষ হয় না (১৫৮)। কখনও কৃষ্ণকে দেখার অপরিমিত উল্লাসে ব্যাকুলা রাধা সখীকে বলেন—'এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে'। দেহের সীমানা ছাড়িয়ে, ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে রাধার এই উল্লাস তখন স্পর্শ করে রূপাতীত অনুভূতিকে। কৃষ্ণরূপমুগ্ধা রাধার মুগ্ধতার অভিব্যক্তিতে সেই রূপ বর্ণনাও মাধুর্যরসনিষ্ণাত হয়ে ওঠে—

চিকণ কালিয়া রূপ   মরমে লাগিয়াছে
ধরণে না যায় মোর হিয়া
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া   মুখখানি মাজিয়াছে,
না জানি তায় কত সুধা দিয়া ॥
অধরের দুটি কূল   জিনিয়া বান্ধুলি ফুল
হাসিখানি মুখেতে মিশায়।
নবীন মেঘের কোরে,   বিজুরী প্রকাশ করে,
জাতিকুল মজাইলাম তায়।

প্রেমিকা নারীর রূপ দর্শনে বিমুগ্ধ প্রেমিক পুরুষের কামনাময় রূপবর্ণনার অজস্র দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এবং পরবর্তীকালের কবিদের কাব্যে রয়েছে। কিন্তু পুরুষের রূপদর্শনে নারীচিত্তের এমন আকূতি ও উল্লাস, প্রেমের বেদনা মাধুরীর এত অপূর্ব রূপায়ণ ভারতীয় সাহিত্যে কেন, বিশ্ব সাহিত্যেও দুর্লভ। চণ্ডীদাসের পদে শ্যামরূপের প্রতি রাধার আকর্ষণের কথা আছে, কিন্তু সেখানে রূপকে এভাবে বর্ণনা করা হয় নি। দেহকে অস্বীকার করে নয়, দেহের দেহলীতে দাঁড়িয়ে রাধার মর্ত্যচারিণী প্রেম ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতিকে কতখানি উৎকর্ষ দান করেছে, কত মহিমময় করে তুলেছে, তারই অকুণ্ঠ উচ্চারণ এই পংক্তি দুটি—

দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥

অন্যদিকে রাধার প্রতি কৃষ্ণের ভালবাসাও কবি সমভাবে রূপ দিয়েছেন। রসোদ্গারের পদে কৃষ্ণের সেই ঐকান্তিক রাধাপ্রেমের পরিচয় রাধার মুখ দিয়ে কত সুন্দরভাবেই না ব্যক্ত হয়েছে—

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম

কৃষ্ণের ব্যাকুল ভালবাসা দেখে রাধা সখীর কাছে বলেন—

পিরিতি আরতি দেখি হেন মনে লয় সখি
আমি তারে চাহিলে সে জিয়ে ॥

কৃষ্ণ কোন সময়েই রাধার সঙ্গ ছাড়েন না,

হিয়ার উপর হৈতে শেজে না ছোঁয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনি গোঙায় ॥
নিদের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে ॥

শুধু তাই নয়, শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে তাঁর 'জপতপ ধ্যান, মন্ত্রতন্ত্র' বলেছেন। সুবলের কাছে কৃষ্ণ বলেছেন যে রাধার মহিমা কেউ বলতে পারে না, তাঁর নাম বেদ বিধিরও অগোচর। বলরামদাসের পদেও অবশ্য রাধার প্রতি কৃষ্ণের এই প্রগাঢ় প্রেমের অনুভূতিকে বাৎসল্যে স্নিগ্ধ করে প্রকাশ করা হয়েছে (২৫৬)। কৃষ্ণ গোষ্ঠে গিয়ে যমুনার তীরে ফুটে থাকা চাঁপাফুলে রাধার অঙ্গবর্ণের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। অভিসারিকা রাধা কৃষ্ণের কাছে এলে, "নিজ পীতবাসে শ্যাম চরণধূলি ঝাড়ে"। একদিকে রাধার প্রতি কৃষ্ণের এই সেবাস্নিগ্ধ প্রেম, অন্যদিকে রাধার আধ্যাত্মিক মহিমার স্বীকৃতি চৈতন্যদেবের দিব্য প্রভাবেরই ফল।

অনুরাগ ও আক্ষেপানুরাগের পদে রাধার প্রেম কৃষ্ণরূপ দর্শনে উচ্ছ্বাস ও আবেগকে অতিক্রম করেছে। রাধার এখন নির্বিচার আত্মসমর্পণের পালা। তিনি ব্যাকুলভাবে কৃষ্ণকে মিনতি করেন—"ও রাঙ্গা দুখানি পায় আমারে রাখিহ"। কৃষ্ণকে ছাড়া রাধার জীবন যৌবন বোঝা বলেই মনে হয়। মিলনের পর বিচ্ছেদের বেদনায় ব্যাকুল রাধা কৃষ্ণকে বলেন—

বন্ধু, আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ
সেখানে বান্ধিয়া থুব ॥

জ্ঞানদাসের রাধা চণ্ডীদাসের রাধার মতই গ্রাম্য। তাই কৃষ্ণকে কাছে রাখার গভীর আকূতিতে তিনি যখন বলেন, সন দাঁড়ি দিয়ে তাঁর চরণারবিন্দ দুটি বেঁধে রাখবেন, তখন প্রেমিককে দূরে যেতে না দেওয়ার ব্যাকুলতা অনুভব করা গেলেও হাস্যসম্বরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে (২৫৩)। প্রেমমুগ্ধা রাধার কৃষ্ণ-সর্বস্বতা অপর একটি পদে চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করেছে। প্রেমিক কৃষ্ণকে রাধা কি ধন দান করবেন, তা ভেবেই পাচ্ছেন

না। কারণ কৃষ্ণই রাধার সর্বশ্রেষ্ঠ ধন (২৬৪)। বসু রামানন্দের সাদৃশ্যে জ্ঞানদাস একটি পদ রচনা করেছেন। যমুনায় জল আনতে গিয়ে, জলে কৃষ্ণের ছায়া দেখে হাত বাড়িয়ে রাধা ধরতে যান। ঢেউয়ে কৃষ্ণের ছায়া মিলিয়ে যায়। রাধা কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে আসেন (২৬৭)। প্রেমতন্ময়তায় রাধা কখনও কখনও আয়ানকেই কৃষ্ণ ভেবে ভুল করে বসেন। কৃষ্ণ ভেবে আয়ানকে সম্ভাষণ করলে—

হাসিয়া হাসিয়া আয়ান বলে
মুঞি তোমার বন্ধুয়া নই ॥

এইখানে জ্ঞানদাস কবি হিসেবে যে সহানুভূতি ও চরিত্র চিত্রণদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। সন্দেহপরায়ণ, ক্রূর এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমে বাধা সৃষ্টিকারী আয়ানকে যখন রাধার সম্ভাষণে মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে দেখি, তখন মনে হয় সেই হাসির আড়ালে তার বঞ্চিত হৃদয়ের বেদনাকে যেন কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। রাধার প্রেমের প্রতি আক্রমণ নয়, সহানুভূতি পোষণে জ্ঞানদাসের আয়ান যে ঔদার্যের পরিচয় দেয়—তাও গতানুগতিক নয়।

শব্দের ও ছন্দের ললিত বিস্তারে রাধার অতৃপ্ত প্রেম যেন নিজেকে প্রকাশ করার ব্যাকুলতায় ঘুরে মরে। রাধা বলেন—

মণি নও মাণিক নও গলায় বাঁধিয়া থোব
ফুল নও চূড়ার করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতুঁ দেশ দেশ ॥ (২৭৭)

জ্ঞানদাসের রাধার প্রেম-গভীরতায় কোনও সংশয় নেই, তাঁর আত্মসমর্পণে কোথাও এক তিল বঞ্চনা নেই। কিন্তু যে প্রাখর্য নিয়ে তিনি সমাজ সংসারের বিরুদ্ধে সতেজে রুখে দাঁড়ান, কৃষ্ণপ্রেমের কলঙ্ককে গলার মালা করেন, তারই দীপ্তিতে এ রাধা দীপ্তিময়ী। সব ছাড়লেও কৃষ্ণ প্রেমের গর্বটুকু তিনি কোনমতেই ছাড়তে পারেন না (২৭৮)।

জ্ঞানদাসের নামে অভিসারের ষোলটি পদ পাওয়া যায়। অভিসারের মধ্যে যে গোপনীয়তা এবং উৎকণ্ঠা থাকে, তা এই পদগুলিতে অনুপস্থিত। জ্ঞানদাস বর্ষাভিসার, তিমিরাভিসার, শুক্লাভিসার, ও দিবাভিসারের পদ রচনা করেছেন। মাত্র একটি পদে জ্ঞানদাসের রাধা সখীদের ছেড়ে একা অভিসারে গেছেন (১৮৭)। এ ছাড়া প্রায় সব পদেই রাধা অভিসারে যাওয়ার সময় সখীদের সঙ্গে নিয়েছেন। গোবিন্দদাসের রাধা গোপনে নিঃশব্দে অভিসারে যাওয়ার জন্য চরণের মঞ্জীর ও অঙ্গের অলঙ্কার ত্যাগ করেন, আর অন্যদিকে জ্ঞানদাসের অভিসারিকা রাধার চরণে 'মঞ্জির রঞ্জিত মধুর ধ্বনি' (১৮৮)। আবার কখনও সখীদের সঙ্গে অভিসারে যাওয়ার সময় রাধা—

রবাব খমক বীণা সুমিল করিয়া।
প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া ॥
নূপুরের রুনুঝুনু পড়ি গেল সাড়া ॥
নাগর উঠিয়া বলে আইল রাই পারা ॥

এই বিচিত্র ললিত শব্দঝঙ্কারে ঝংকৃত অভিসার রাধাভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পরিকরদের লীলার কথাই যেন মনে করিয়ে দেয়।

রাধাকৃষ্ণের মিলনের সময় বিদ্যাপতির মত জ্ঞানদাসের পদেও সখী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। প্রথমে রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে পরিপূর্ণ সম্মতি যাতে না দেয়, সখী তাকে সেই শিক্ষাই দিয়েছে (১৯৬)। জয়দেব এবং বিদ্যাপতির মিলনের পদে আদি রসের যে উতরোল উল্লাস লক্ষ্য করা যায়, জ্ঞানদাসে তা নেই। আবার অন্যদিকে চণ্ডীদাসের মত জ্ঞানদাস দেহমিলনকে একেবারে অস্বীকারও করেন নি, অথবা প্রেমের সূক্ষ্ম ধূপ-সৌরভকেই সর্বস্ব করে তোলেন নি। রাধাকৃষ্ণের পরিপূর্ণ মিলনকে রূপ দেওয়ার জন্য কবি একটি পরিচিত চিত্রকে যথাযথভাবে ব্যবহার করেছেন—"কালা মেঘে ঝাঁপল কুমুদ বন্ধুয়া", (২০১) কৃষ্ণরূপ কালো মেঘ যেন চাঁদের মত সুন্দর রাধার রূপকে গ্রাস করে নিল। দেহ মিলনের আবেগ এবং উত্তেজনাকে আশ্চর্য সংযতভাবে অথচ কাব্য-সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে রূপ দিয়েছেন এই কবি। 'রতিরস শ্রমে' রাধার চাঁদ মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। কবি বলছেন—"অনঙ্গ লাবণ্যফুলে পূজল ইন্দু"। স্বয়ং মদন যেন স্বেদবিন্দুর ফুল দিয়ে চন্দ্রকে পূজা করছে। পরিপূর্ণ মিলনের উন্মাদনাময় অস্থিরতাকে রূপ দিতে গিয়ে কবি বলেন—

অপরূপ পবনে সঘন জনু দোলত
গগন সহিত দ্বিজরাজ ॥

একটি পদে জ্ঞানদাস রাধাকৃষ্ণের মিলন লীলায় সখীদের আনন্দ বর্ণনা করেছেন। রাধাকৃষ্ণের অমৃতের মত মধুর বাণী শুনে সখীদের কান জুড়িয়ে যায়। তাঁরা নানা ফুলে যুগলকে সাজিয়ে দেন। গাত্রে সুগন্ধি চন্দন লেপন করেন। বিশাখা তাঁদের মুখে কর্পূর যুক্ত তাম্বুল ধরে দেন। ললিতার ইঙ্গিতে মালিনী এসে বিনা সুতোর ফুলহার গেঁথে দুজনের গলায় পরিয়ে দেয়। লীলা সহচরী সখীদের রাধাকৃষ্ণের মিলন দর্শনে এবং তাঁদের সেবাতেই পরিপূর্ণ আনন্দ। সেই আনন্দেরই প্রকাশ ঘটেছে এই পদে (২০১)।

কখনও আবার মিলন শয্যায় রাধা গভীরভাবে নিদ্রিত হয়ে পড়লে কৃষ্ণ মমত্ববশতঃ তাঁর ঘুম ভাঙান না। সকাল বেলায় বিস্মিত সখীরা প্রশ্ন করেন—

শ্যাম নাগর শৈশব কিয়ে
কঠিন হৃদয় তোর ॥

উত্তরে রাধা মাটির দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকেন। জ্ঞানদাস রাধার হয়ে বলেন—"দৈবে সে না ভেল সঙ্গ" (২১৪)। পদটিতে সখীদের আশঙ্কা, রাধার মধুরলজ্জা ও সর্বোপরি নাগর কৃষ্ণের স্নিগ্ধ মমত্ব বড় সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মিলনের পর সকালবেলায় নিদ্রার আলসে রাধাকৃষ্ণ দুজনেই দুজনের ওপর ঢুলে পড়েন। সখীরা তাঁদের সেবা করতে করতে কোকিলের ডাক শুনে প্রভাত হয়েছে জানতে পেরে চমকিত হন (২১৭)। কৃষ্ণ রাধার বিপর্যস্ত বেশ বহু 'প্রতিআশে' সুবিন্যস্ত করে দেন (২১৮)। রাধা কৃষ্ণকে বলেন, তাঁর পীতবসন পরিয়ে কানে কুণ্ডল আর হাতে মুরলী

দিয়ে সাজিয়ে দিতে (২২০)। বসু রামানন্দের অনুরূপ পদে রাধা আরও একটু বুদ্ধিমতী। তিনি কৃষ্ণকে বলেছেন, পথে কেউ প্রশ্ন করলে কৃষ্ণ যেন নিজের প্রিয়সখা বলে পরিচয় দেন।

আক্ষেপানুরাগের পদে একদিকে কৃষ্ণের প্রেম আর অন্যদিকে সমাজসংসার—এই উভয়ের মাঝখানে দ্বিধান্দোলিতা রাধার ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে। প্রেমগর্বিতা রাধা এখানে অশ্রুসিক্ত বেদনায় ভারাক্রান্তা। একটি পদে দেখি কৃষ্ণ গোষ্ঠে বেরিয়েছেন। রাধার ইচ্ছে পথের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণকে একবার দেখে নেন। কিন্তু গুরুজনের ভয়ে সেদিকে সম্পূর্ণ তাকাতেও পারছেন না। তাই তাঁর একটি চোখ কৃষ্ণের দিকে, আর একটি চোখ গুরুজনের দিকে। কিন্তু এ যেন প্রাণ নিয়ে খেলা। গুরুজনের চোখে পড়লেই তো রাধার লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না (২৮৭)। আবার কখনও রাধা, কৃষ্ণের আপাত ঔদাসীন্যে, সামান্য বিমুখতায়ও ব্যথিতা। রাধার অভিমানে ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ, গর্বের দীপ্তি এককণাও নেই। তাঁর প্রেম—গভীরতার বিপরীতে কৃষ্ণের উপেক্ষায় অন্তরের বেদনা করুণ প্রশ্নে ঝরে পড়ে—

বন্ধু, এমনি হইলে কেন তুমি।
ডাকে না ফিরিয়া চাও মুখানি নামায়া যাও
না জানি কি দোষ কৈলাম আমি ॥

অথচ রাধার কাছে কৃষ্ণের প্রেম ত্রিবেণী ধারার মত কাঙ্ক্ষিত, আর অন্যদিকে স্বামীর প্রেম তাঁর কাছে জ্বলন্ত আগুনের মত জ্বালাময়। আক্ষেপানুরাগে জ্ঞানদাস বহুলাংশে চণ্ডীদাসের কাছে ঋণী। চণ্ডীদাসের রাধা প্রেমের বেদনায় গৃহকাজ করতে করতে চোরের নারীর মত গুমরে মরেন, জোর করে কাঁদার উপায় তাঁর নেই। জ্ঞানদাসের রাধাও অনুরূপভাবে বলেন—

কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই।
নিচয়ে মরিব তোমার চাঁদ মুখ চাই ॥
শাশুড়ী ননদীর কথা সহিতেও পারি।
তোমার নিঠুরপনা সোঙরিয়া মরি ॥
চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়া পড়শীর ডরে ॥

একদিকে কৃষ্ণের রূপের প্রতি আকর্ষণ, অন্যদিকে কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার জন্য দুঃখ, সেই কৃষ্ণের কাছেই আবার নিজের দুঃখ নিবেদন জ্ঞানদাসের রাধা চরিত্রটিকে জটিল করে তুলেছে। প্রেমের গভীরতার জন্যই রাধা, কৃষ্ণের বিরূপতার কল্পনায় আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কৃষ্ণকে ছাড়া রাধার একটি মুহূর্তও কাটতে চায় না—এ কথা রাধা বারবার নানাভাবে কৃষ্ণকে জানিয়ে দেন। রাধার বেদনা এবং অনুযোগ যে গভীর প্রেমের বিকারে কিছুটা অতিরঞ্জিত, তা বোঝা যায় কৃষ্ণের প্রত্যুত্তর থেকে। এই পদটিতে

কৃষ্ণের প্রেমের মাধুর্য প্রতিটি শব্দে এবং ছন্দের হিল্লোলে পরিব্যাপ্ত। পদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিযোগ্য—

সুন্দরী আমারে কহিছ কি।
তোমার পিরিতি ভাবিতে ভাবিতে
বিভোর হইয়াছি ॥
থির নহে মন সদা উচাটন
সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে দশ দিক গণে
তোমারে দেখিতে পাই ॥
তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া
গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
সদাই জাগয়ে মনে ॥
শুন বিনোদিনী প্রেমের কাহিনী
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ দেহ ভিন ভিন
জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা ॥[২৮১]

ক্ষণিক বিরহে প্রেমিক কৃষ্ণ প্রকৃতির সর্বত্র শুধু রাধাকে দেখতে পেয়েছেন। সারা বিশ্বপ্রকৃতিতে ব্যাপ্ত সেই রাধারূপকে অনুভব করার আগ্রহে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন গিরি নদীবনে। রামায়ণের রাম আর মেঘদূতের যক্ষ ছিলেন কামার্ত। প্রকৃতির মধ্যে প্রিয়তমাকে দেখায় সেখানে কাম আর প্রেম দুই-ই মিশে ছিল। কিন্তু কৃষ্ণের হৃদয়াবেগে কামুকতার লেশমাত্র নেই।

দানলীলা ও নৌকাবিলাসের পদগুলি জ্ঞানদাসের উল্লেখযোগ্য রচনা। পূর্বরাগ অনুরাগ, আক্ষেপানুরাগ, মিলন ও রসোদ্গারের পদে যে রাধাকে আমরা দেখতে পাই, তিনি সুদক্ষিণা নায়িকা, কিন্তু দানলীলার রাধা রীতিমত প্রখরা বামা। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দানলীলার যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে, চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর দানলীলা তার তুলনায় উপস্থাপনার দিক দিয়ে কিঞ্চিৎ পৃথক। বংশীবদন, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি কবিদের দানলীলাবিষয়ক প্রসঙ্গ আগেই আলোচিত হয়েছে। কথাবস্তু একই। কিন্তু জ্ঞানদাসের রাধার পূর্বতন অনুরাগের বিপরীতে দানলীলার রাধার প্রাখর্য কৌতুক উদ্রেক করে। রাধা তাঁর এবং কৃষ্ণের সামাজিক ব্যবধান ঘোষণা করে উভয়ের মিলনকে অসম্ভব বলে অভিহিত করেন। কারণ-'রাধা বরকুল কামিনী', অন্যদিকে কৃষ্ণ চঞ্চলমতি 'বনচারী'। কিন্তু কৃষ্ণ কোন কথা শোনার পাত্র নন। রাধার সুন্দর শরীরের অলঙ্কার ও প্রসাধনের বর্ণনা করে তিনি আট লক্ষ দান চেয়ে বসেন। উপরন্তু রাধার সখীদের কাছ থেকেও দান চেয়ে নেন। দানলীলায় জ্ঞানদাস পুরোপুরি রাধার পক্ষে। তিনি কৃষ্ণকে কঠোর ভাবে তিরস্কার করেন। দুঃসাহসী কৃষ্ণ এর পর রাধার কাছে আসতে চাইলে, রাধা ভর্ৎসনা করে বলেন—"কাহাই, পর নারী ছুইতে কর সাধ"। এ ছাড়া কালো কৃষ্ণের এত রসের ভোরাও রাধার সহ্য হয় না। বংশীবদনের পদেও

অনুরূপতাবে 'আন্ধারবরণগা' শ্রীকৃষ্ণকে রাধা খোঁটা দিয়েছেন। প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ রাধার এই গর্বিত ভঙ্গীকে বিদ্রূপ করে যথারীতি রাধার শরীরের ঐশ্বর্যের বদলে কর দাবী করেছেন (৩০৯)। রাখাল হয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে এই আচরণের জন্য ক্রুদ্ধা রাধা কৃষ্ণকে বলেন, গঙ্গাসাগরে গিয়ে কামনা করলে তবে রাধার আঁচল ছোঁয়ার ক্ষমতা হতে পারে। জ্ঞানদাসও কৃষ্ণকে তিরস্কার করেন। এই তিরস্কার বেপরোয়া কৃষ্ণ আরও উঁচু পর্দায় রাধার রূপ বর্ণনা করতে বসে যান (৩২১)। এতে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে রাধা বলেন—

যবে তুমি সুন্দর হইতা।
তবে নাকি কাহারে থুইতা ॥ (৩২২)

জ্ঞানদাসও বলেন কৃষ্ণ যেন নিজেকে রূপে অনুপম না ভাবেন। রাধার বাম্যতা তথা কিলকিঞ্চিতভাবে কৃষ্ণ এবার নরমসুরে রাধার রূপের প্রশংসা করেন। রৌদ্রতপ্তা রাধার ক্লান্তি অপনোদনের জন্য তিনি বসনে মৃদু বাতাস করার প্রস্তাব রাখেন। রাধার রাঙ্গা পায়ে এতখানি পথ হাঁটার কষ্টে দুঃখিত কৃষ্ণ, রাধার গুরুজনদের ও স্বামীকে তিরস্কার করেন (৩২৩)। কিন্তু এত সরস কথাতেও রাধার মন ভিজল না দেখে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, রাধা দান দিয়ে যাক। তিনি দুহাত দিয়ে রাধার যাওয়ার পথ আগলে রাখেন। এবং এই সুযোগে আর একবার রূপের প্রশংসা করে দিলেন। এবার রাধা তীব্র তিরস্কারে কৃষ্ণকে অপমানের ভয় দেখান—

কাড়ি নিব পীতধড়া আউলাইয়া ফেলিব চূড়া
বাঁশীটি ভাসাইয়া দিব জলে।
কুবোল বলিবা যদি মাথায় ঢালিব দধি
বসিতে না দিব তরুতলে ॥

কিন্তু এই ভীতিপ্রদর্শনে কোন কাজ হয় না। ভয়ে ভয়ে রাধা তাঁর অঙ্গের সমস্ত মণি আভরণ দিয়ে দিলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। ঘরের বৈরী ননদিনী, পথের বৈরী কৃষ্ণ আর দেহের বৈরী যৌবনের জ্বালায় রাধা জীবন ত্যাগ করার সংকল্প নেন। কারণ কৃষ্ণ দুহাত বাড়িয়ে রাধার দিকেই এগিয়ে আসছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাধার আর মৃত্যু বরণ করা হয় না। সখীরা ও বড়াই (এই চরিত্রটির উল্লেখ দানলীলায় এই প্রথম পাওয়া গেল) দূরে সরে গিয়ে রাধাকৃষ্ণের নিভৃত মিলনের সুযোগ করে দিলেন। তখন—"দোঁহে দোঁহে হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।" বোঝা গেল এতক্ষণ ধরে যে ঝগড়া-বিবাদ চলছিল, সবই বাহ্যিক ব্যাপার। তবে দানলীলার এই পরিসমাপ্তি অংশে আমাদের মনে হয়, বংশীবদনের বর্ণনা আরও বেশী চিত্তস্পর্শী। সেখানে কৃষ্ণ স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, তিনি রাধার জন্যই মহাদানী সেজেছেন।

জ্ঞানদাসের নৌকাবিলাসের প্রথম পদটির সঙ্গে শ্রীরূপ গোস্বামীর দানকেলিকৌমুদী নাটকের ঘটনার সাদৃশ্য আছে। দানকেলি কৌমুদীতে নন্দ, কৃষ্ণ-বলরামের কল্যাণের জন্য যজ্ঞ করেছেন। আর সেই যজ্ঞে হৈয়ঙ্গবীন (সদ্যপ্রস্তুত ঘৃত) নিয়ে রাধা সখীদের সঙ্গে যজ্ঞস্থানে গিয়েছিলেন। এখানেও যজ্ঞে ঘৃত নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ রয়েছে। কিন্তু

দান কেলিকৌমুদিতে এটি বর্ণিত হয়েছে দানলীলা প্রসঙ্গে, জ্ঞানদাসের পদে রয়েছে নৌকালীলার প্রসঙ্গে। রাধা তাঁর সখীদল ও বড়াইকে সঙ্গে নিয়ে গুরুজনদের আজ্ঞায় পথ চলছেন, আর মনে মনে ভাবছেন কি করে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হবে। তখন বর্ষাকাল। আকাশে মেঘ গর্জন করছে। বাতাস বইছে প্রবল বেগে। এই সময় দূর থেকে রাধা ও তাঁর সখীদের দেখে কৃষ্ণ নৌকা নিয়ে এগিয়ে এলেন। কৃষ্ণের রূপ দেখে রাধা ও তাঁর সখীদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। 'বিনোদবরণ নেয়ে'র রূপের ছটায় মুগ্ধ হলেও রাধা তাঁর সখীদের সাবধান করে দেন—

আমরা কহিও, কংসের যোগানি,
বুকে না হেলিও কেহু। (৩৩১)

মানসগঙ্গার জল বইছে দ্রুতবেগে। রাধার ভয় হয়েছে নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায় নৌকা বাইতে জানেন না, না জানি কি দুর্দশা ঘটে। কিন্তু কৃষ্ণ এরপর সরাসরি রাধার যৌবন উপভোগ করার অনুমতি চাইলে রাধা মহাদুঃখে আক্ষেপ করে সখীদের বলেন—

কলঙ্ক হইল সই কলঙ্ক হইল।
বলে ছলে নায়্যা মোরে কোলে করি নিল॥ (৩৩৪)

রাধার এই আক্ষেপ কতখানি আন্তরিক, সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। কারণ ইতিপূর্বেই রাধা মনে মনে ভেবেছেন—

কৈছনে হেরব নাগর শেখর
কৈছে মনোরথ পূর।

এর পর রাধা, কৃষ্ণের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়ার জন্য বড়াইকে গঞ্জনা দেন। কখনও বা যমুনায় ঝাঁপিয়ে পড়তে চান। আবার কখনও নিজের আভিজাত্যের গর্ব প্রকাশ করেন (৩৩৫)। নৌকাবিলাসে ভিতরে শ্যাম মিলন পিয়াসিনী অথচ বাইরে কখনও শঙ্কিতা, কখনও দর্পিতা, কখনও কৃষ্ণের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গবর্ষণকারিণী রাধার চরিত্রটি কবির চরিত্রাঙ্কন দক্ষতার পরিচায়ক। নৌকাবিলাসের কৃষ্ণচরিত্র চিত্রণেও কবির সৃষ্টি ক্ষমতার নিদর্শন পাওয়া যায়। জ্ঞানদাসের কৃষ্ণ শঙ্কিতা রাধাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, যমুনার জল উথলে উঠেছে। নৌকা তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। যুবতীযৌবন যে এত ভারী, একথা তাঁর জানা ছিল না (৩৩৯)। শুধু তাই নয়, জ্ঞানদাসের কৃষ্ণ, রাধা এবং তাঁর সখীদের ওপর আরও দোষারোপ করে বলেন, সম্ভবতঃ তাঁরা ক্ষীরসরের সাথে অন্য কিছু খাইয়ে কৃষ্ণকে গুণ করেছেন। সেই কারণেই তাঁদের মুখ ছাড়া কৃষ্ণ আর অন্যদিকে তাকাতেও পারছেন না। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, বংশীবদন নৌকাবিলাস বর্ণনায় অধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর পদে কুম্ভীর মকর মীন এবং তরঙ্গ আকুলা যমুনা রাধাকৃষ্ণের লীলার মুগ্ধ দ্রষ্টা। বংশীবদনের নৌকাবিলাসে রাধা নিজেই কটাক্ষ বর্ষণে কৃষ্ণকে উৎসাহিত করেছেন—

শুনি বিনোদিনি রাই নয়ন ইঙ্গিত চাই
কানু মন করিলেন চুরি।

কিন্তু জ্ঞানদাসের রাধা বাইরে কোনভাবেই কৃষ্ণকে উৎসাহিত করেন নি, উপরন্তু বার বার আক্ষেপ করেছেন।

রাসলীলার বর্ণনায় জ্ঞানদাস ভাগবত ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের অনুসরণে শারদরাস বর্ণনা করেছেন। গোবিন্দদাসের পদে শরৎকালের মনোরম রাত্রিতে কৃষ্ণের আহ্বানে অসমাপ্ত-ভূষণা গোপিনীরা ব্যগ্রভাবে কৃষ্ণের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ছুটে এসেছেন। অন্যদিকে জ্ঞানদাস গোপিনীদের হৃদয়ার্তিকে বাইরের প্রসাধনে নয়, অন্তরের আকুতিতে আরও গভীর, আরও নিবিড়ভাবে প্রকাশ করেছেন—

মরণ শরীরে পরাণ পাইল
ঐছন সবহুঁ ভেলি।
বন দাবানলে পুড়িয়া যেমন
অমিয়া সায়রে কেলি॥

দৈনন্দিন সংসারের পরিবেষ্টনে কৃষ্ণ-বিরহিণী গোপিনীরা যেন মৃত শরীরের মত নির্জীব। কৃষ্ণ ব্যতীত দাবানলদগ্ধা হরিণীর মত জ্বালাদগ্ধ তাঁদের জীবন। কৃষ্ণের মধুর বংশী ধ্বনি সেই মৃত শরীরে জীবনানন্দের স্পন্দন আনে আর সংসার অরণ্যের দাবানলদগ্ধ, কৃষ্ণ বিরহজর্জরিত মনের ওপরে বুলিয়ে দেয় অমৃতের স্নিগ্ধতা। রাসের পদে জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের মত প্রকৃতির প্রসন্নউজ্জ্বল সৌন্দর্যকে রূপায়িত করতে পারেন নি একথা সত্য, কিন্তু রাধাকৃষ্ণকে মাঝখানে রেখে গোপিনীদের উল্লাস-উতরোল নৃত্যবর্ণনায় জ্ঞানদাসের লেখনীও যেন পুলকিত হয়ে উঠেছে। রাধার সখীরা আবার কৃষ্ণকে নিয়ে কৌতুকও করেছেন। তাঁরা বলেন, আগে রাধা কংকণে তাল দিয়ে গান করুন, তারই সঙ্গে তাল রেখে নাচতে হবে। এটি যে কৃষ্ণের পক্ষে খুবই পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার, তাও সখীরা ব্যঙ্গ করে বুঝিয়ে দেয়—

পরের রমণী, ঘাটে মাঠে পেয়ে
দান সাধা এ তো নয়।
কংকণের তালে, তাল মিশাইয়ে,
নাচিতে পারিলে হয়॥ (৩৫৫)

রাস উপলক্ষে রাধা-কৃষ্ণের নিকুঞ্জ মিলনের একটি চমৎকার চিত্র কবি অংকন করেছেন। শ্যাম রাধার সংগে কুঞ্জে বিহার করছেন। ললিতার হাতে প্রদীপ জ্বলছে। রাসমণ্ডল থেকে কৃষ্ণ অকস্মাৎ আন্তর্ধান করায় রাধার মান হয়েছিল। কৃষ্ণ মান ভংগ করার জন্য একটি অভিনব উপায় অবলম্বন করেছেন। যমুনার কূলে এসে কৃষ্ণ ফুল তোলার জন্য তরুর দিকে চাইতেই সেই ফুল এসে পড়ল রাধিকার পায়। রাধার মান ভাংগানোর জন্য কৃষ্ণ পথের ওপর সেই ফুল বিছিয়ে দিলেন। সেই ফুলের ওপর দিয়ে যেতে যেতে কৃষ্ণ-সোহাগিনী রাধা কৃষ্ণের গায়ে ঢলে ঢলে পড়েন (৩৫৮)। পদাবলী সাহিত্যের অন্য কোথাও কৃষ্ণসোহাগিনী এই রাধার চিত্র পাওয়া যায় না। একটি পদে জ্ঞানদাস কত শত নব-নাগরী, পরিবেষ্টিত বলরামের রাসলীলা বর্ণনা করেছেন (৩৬১)।

বংশীশিক্ষার পদগুলিতে জ্ঞানদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে নবতর আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। তাঁর রাধা কৃষ্ণের বেশভূষা ধারণ করে কৃষ্ণ সাজতে চান, অন্যদিকে

তেমনি কৃষ্ণও চান রাধা সাজতে। কৃষ্ণ রাধা সেজে তাঁর বাঁশীতে শ্যাম নাম বাজাতে চান। কিন্তু শ্যাম নামের পরিবর্তে কৃষ্ণের বাঁশীতে বার বার বেজে ওঠে রাধার নাম— "নাহি বাজে শ্যাম নাম বাজে রাধা রাধা" (পদ ৩৬৯)। কৃষ্ণের কাছে বাঁশী বাজানো শিখতে গিয়ে রাধা জানতে চান কোন রন্ধ্রে কৃষ্ণ ফুঁ দিলে কদমতরুতে ফুল ফোটে, কি করেই বা যমুনার স্রোত উজানে বয়, কী করেই বা কৃষ্ণের বাঁশীর সুরে প্রকৃতি একসাথেই ছয় ঋতুর সৌন্দর্যে ভরে ওঠে। সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর হ্লাদিনী শক্তি রাধা জানতে চান, সৃষ্টির অজস্র বৈচিত্র্যের আনন্দ উৎস। জ্ঞানদাসের এই কল্পনা একদিকে তাঁর ভক্ত প্রাণের বিমুগ্ধ প্রকাশ আর অন্যদিকে বিপুল সৃষ্টির আনন্দধারা সন্ধানে রোমান্টিক কবি কল্পনায় যে বিস্ময় থাকে, সেই বিস্ময়েরই ভাষা রূপ। কৃষ্ণের কাছ থেকে বাঁশী বাজানোর কৌশল আয়ত্ত করে রাধা বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে বাঁশী বাজান। বংশীশিক্ষার পদে এই বিচিত্র রাগ-রাগিণীর উল্লেখ দেখে মনে হয় পদকর্তা জ্ঞানদাস সংগীত শাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন।

রাধাকৃষ্ণের বসন্ত বিহার ও হোলি লীলার বর্ণনায় জ্ঞানদাস বসন্তকালে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য এবং তরুলতা, পশু পাখীর উন্মাদনার মাঝখানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে স্থাপিত করেছেন। এই দোল বা হোলিখেলার প্রাচীন উল্লেখ মধ্যপ্রদেশের রামগড় গুহালিপিতে (খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী) এবং বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী) পাওয়া গেলেও বাংলা দেশে এর প্রচলন এত প্রাচীন নয়। সনাতনের হরিভক্তিবিলাসে দোলযাত্রার প্রসংগে বাংলা দেশে এই উৎসবের বিশিষ্টতার কথা বলা হয়েছে। কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে জ্ঞানদাসের পদাবলীতেই বোধ হয় প্রথম বিস্তৃতভাবে রাধাকৃষ্ণের দোললীলা বা হোলিখেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময় থেকেই যে এটি জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে তার প্রমাণ আছে প্রায় সমকালের অথবা সামান্য পরবর্তীকালের রচনা ভবানন্দের হরিবংশ কিংবা কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গলে। এই পর্যায়েও কবি আদিরস বর্ণনায় যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। নব বসন্তের কুসুম গন্ধে আমোদিত, চন্দ্র কিরণে উজ্জ্বল, মলয় পবনে স্নিগ্ধ এবং কোকিল ও ভ্রমর ঝঙ্কারে ঝংকৃত রাত্রিতে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য রসবতী রাধা সহচরীর সাথে নিজেকে সজ্জিত করেছেন। রাধাকৃষ্ণের দোললীলা বর্ণনায় বর্ণময় বৃন্দাবন কবির লেখনীতে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে—

রাঙ্গা ময়ুর নাচে কাছে রাঙ্গা কোকিল গায়।
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥
রাঙ্গা বায়ে রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পাণি। (৩৭৬)

হোলিখেলার রঙে আর কৃষ্ণ-রাধার অনুরাগের রঙে বৃন্দাবনের বাতাসও রাঙা— এই অপরূপ কবিকল্পনা মধ্যযুগের কবি জ্ঞানদাসকে যেন আধুনিক গীতিকবির রোমান্টিক বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বহুযুগের ওপার থেকে এই কবি কণ্ঠই যেন আবার অনুরণিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বসন্তগীতে—

রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত আকাশে।
রঙীন পাতায় জাগে রাঙা হিল্লোল।

সঙ্গীতসহযোগে মণ্ডল রচনা করে নৃত্য, হোলি খেলার বিশিষ্ট অঙ্গ। এখানে কবি আবার বিবিধ যন্ত্র সহযোগে বিচিত্র রাগরাগিণীর গানেরও উল্লেখ করেছেন। তারই সঙ্গে রাধাকৃষ্ণকে সখীরা দোলায় বসিয়ে দোল দিয়েছে (৩৭৫)। বাদ্যযন্ত্ররূপে কবি বীণা, রবাব, মুরজ ও কপিনাসের উল্লেখ করেছেন (৩৭৭)। পিচকারিতে ভরে চন্দন, কুঙ্কুম, চুয়া প্রভৃতির সাহায্যে ফাগ খেলার বর্ণনা রয়েছে। জ্ঞানদাসের পদে গোপিনীদের সাথে হোলিখেলায় কৃষ্ণ হেরে গেছেন। কৃষ্ণের পরাজয়ে আনন্দিতা গোপীগণের উচ্ছ্বাস লোক-গীতির অনাবৃত প্রাণ চাঞ্চল্যকে মনে করিয়ে দেয়—

> হেদে রে শ্যাম নাগর হৈয়ে হারিলে হে।
> আহিরী রমণীসঞে হারিলে হে॥ (৩৭৮)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে-এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়—

> যবে রাধা গোয়ালিনী পাতল কৈল দেহে।
> হে হে লেহে লেহে

জ্ঞানদাসের এই পদটিতে ললিতার প্রহেলিকা গানের উল্লেখ আছে। বহু শতাব্দী আগে জৈন ব্যাকরণকার হেমচন্দ্রের ব্যাকরণে উদ্ধৃত একটি শ্লোকে, কৃষ্ণকে কুঞ্জে যাওয়ার জন্য রাধার সঙ্কেতবাক্যে এই প্রহেলিকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। রূপ গোস্বামী কথিত শ্রীরাধার অন্য কয়েকজন প্রধানা সখীর প্রসঙ্গও পদটিতে রয়েছে। এঁরা হলেন বিশাখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী। শ্রীরূপ গোস্বামীর কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীরাধার এই সখীদের রূপ, গুণ, বয়স ও পিতাপতি প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

বাসকসজ্জিকা ও খণ্ডিতা রাধাকে নিয়ে জ্ঞানদাস বেশী পদ রচনা করেন নি। তবে অল্প সংখ্যক পদেরও কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। নিভৃত নিকুঞ্জে সুসজ্জিত শয্যায় রাধা কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করছেন। গীতগোবিন্দে কৃষ্ণ সচকিত নয়নে রাধার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন, আর জ্ঞানদাসের পদে রাধাই কৃষ্ণের জন্য—

> সচকিত নয়নে নেহারই দশদিশ
> কাতরে সখিমুখ চাই॥ (৩৮১ সংখ্যক পদ)

রাধা কৃষ্ণের জন্য কেবল যে নিজে সুসজ্জিতা হয়ে এসেছেন এবং কুঞ্জ সজ্জিত করেছেন— তা নয়। কৃষ্ণের ভোজনের জন্য সর, ক্ষীর, তাম্বুল এবং সুগন্ধি জলও এনেছেন। তাই সখীর কাছে রাধার আক্ষেপ, কৃষ্ণকে ছাড়া—'কি ফল উপচারপুঞ্জ।' দেখা যাচ্ছে জ্ঞানদাসের রাধা নিভৃত নিকুঞ্জ-মিলনেও কৃষ্ণের ভোজনের কথা ঠিকই মনে রেখেছেন (পদ ৩৮২)। চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির রাধার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য নেই। এক্ষেত্রে জ্ঞানদাস গোস্বামীদের দ্বারা প্রভাবিত। সনাতনের বৃহদ্‌ভাগবতামৃতে রাধা নিজে কৃষ্ণের জন্য রন্ধন করেছেন। পরবর্তীকালে কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃতেও বিস্তৃতভাবে কৃষ্ণের ভোজনের জন্যই রন্ধন পটিয়সী রাধার রন্ধনের বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গ আমরা আগেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

মেঘমন্দ্রিত বর্ষণমুখর রাত্রিতেও রাধা কুঞ্জে এসে কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করেন বিদ্যুতের চমক আর মেঘের শব্দ যেন রাধার হৃদয়ের মাঝখানে এসেই আঘাত হানে (পদসংখ্যা ৩৮৩)। এই ভাবে বাসকসজ্জিকা রাধার রাত্রি বৃথাই কেটে গেলে প্রভাতে অন্য নায়িকার সম্ভোগ চিহ্ন সর্বাঙ্গে ধারণ করে কৃষ্ণ এসে উপস্থিত হয়েছেন (পদ ৩৮৪)। কিন্তু জ্ঞানদাসের খণ্ডিতা রাধা জয়দেব অথবা বিদ্যাপতির রাধার মত বক্রবচন-পটিয়সী নন। তিনি সহজ ভাষাতেই কৃষ্ণকে তিরস্কার করেন। প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ গতানুগতিকভাবে রাধার চরণ ধারণ করে নিজের দোষস্খালনের চেষ্টা করেন (পদ ৩৮৫)। কিন্তু কৃষ্ণের চরণ ধারণ অথবা দূতীর অনুরোধে, কোন কিছুতেই রাধার রাগ পড়ে না। কৃষ্ণের মিনতি এবার আত্ম-নিবেদনের চরমতম পর্যায়ে গিয়ে পেঁছায়। তিনি রাধাকে বলেন, রাধাই তাঁর জপতপ, 'করের মোহন বেণু' আর 'দেহ গেহ সার'। লক্ষণীয়, কথাগুলি আগে বিদ্যাপতির রাধা কৃষ্ণ সম্পর্কে প্রয়োগ করেছিলেন—'দেহক সরবস গেহক সার' চৈতন্য-পূর্ব কবির সঙ্গে চৈতন্য-উত্তর কবির কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের এই আপেক্ষিক স্থান পরিবর্তন চৈতন্য প্রভাবিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে আমরা মনে করি। কৃষ্ণ রাধাকে অনুরোধ করেন—

করজ লিখিয়া লেহ যে আমার
দাস করি অভিমান ॥

দাস বিক্রির প্রথা সে যুগের একটি প্রচলিত রীতি ছিল। কৃষ্ণ আইনসম্মত ভাবে রাধার ক্রীতদাস হতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর এই মিনতিতেও ফল হল না। এমনকি প্রাণপণ চেষ্টার পর কৃষ্ণের দূতীও হাল ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলেন—

মাধব, বোধ না মানই রাই।
বুঝইতেবুঝ অবুঝ করি মানই
কতয়ে বুঝায়ব তাই ॥ (৩৯৯)

কৃষ্ণ এবং রাধার মিলনসেতু রচনা করার জন্য দূতীর প্রাণপণ চেষ্টা এবং অবশেষে এই নিরুপায় মন্তব্য কবির চরিত্র নির্ম্মাণ দক্ষতার পরিচায়ক।

কিছুক্ষণ পর ক্রোধ অপনোদিত হলে রাধা সখীকে বলেন, কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর মিলন করিয়ে দিতে। কিন্তু সখী বলেন রাধার বিরূপতায় ব্যথিত কৃষ্ণ রাধাকুণ্ডের জলে প্রাণ বিসর্জন দেবেন বলে চলে গেছেন। একথা শুনে রাধাও বলেন, শ্যাম যদি প্রাণত্যাগ করে আমাকে ছেড়ে যান, তবে—

আমি শ্যামকুণ্ডনীরে শ্যাম নাম হৃদে ধরে
বন্ধু লাগি এ প্রান তেজিব। (৪১৬)

কিন্তু রাধার আর মরা হয় না। কৃষ্ণ নাগরী বেশে এসে রাধার মান ভঞ্জন করেন। কৃষ্ণের এই নাগরী বেশ ধারণ রূপ গোস্বামীর ললিত মাধব নাটকের অনুসৃতি, একথা অন্যান্য কবি প্রসঙ্গেই আমরা উল্লেখ করেছি। কৃষ্ণকে ফিরে পেয়ে রাধা মনের আনন্দে বলে ওঠেন—

কি ছার মানের লাগি আমারে নাশব
বন্ধুরে হারায়েছিলাম।

কৃষ্ণের সান্নিধ্য এখন রাধার হৃদয়কে শীতল করে। তিনি সখীদের বলেন, যমুনার জল এনে কৃষ্ণকে স্নান করিয়ে তাঁর সব অমঙ্গল দূর করতে এবং কৃষ্ণের সখা তথা বিদূষক ভোজনপ্রিয় মধুমঙ্গলকে দধি ওদন ভোজন করাতে। রূপ গোস্বামী সৃষ্ট সন্দীপনি মুনির পুত্র এই মধুমঙ্গলের চরিত্রটির প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। মাথুর পর্যায়ের পদগুলিতে রাধার হৃদয়বেদনা ও বিরহযন্ত্রণা বর্ণনায় কবি একদিকে আলংকারিক-রীতি এবং অন্যদিকে চণ্ডীদাসের সহজ-সরল আন্তরিক রীতি—উভয়ের মিলন ঘটিয়েছেন। কৃষ্ণবিরহে তাঁর রাধার সোনার বরণ দেহ পাণ্ডুর হয়ে যায়। কৃষ্ণের কাছে রাধার দশমী দশার পূর্ববর্তী অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে সখী বলেন, রাধার জীবন যেন কণ্ঠের কাছেই অবস্থান করছে। সখীরা নানাভাবে সেবা শুশ্রূষা করেও রাধাকে সুস্থ করতে পারছে না (৪২৯)। জ্ঞানদাসের বিরহিণী রাধা বার বার একটি সংকল্প উচ্চারণ করেন, কৃষ্ণের বিরহে তিনি যোগিনী হয়ে দেশে দেশে ভ্রমণ করবেন। কিন্তু রাধার এই যোগিনীবেশ ধারণের উদ্দেশ্য প্রেম সম্পর্কে হতাশা নয়। রাধার সঙ্কল্প বিপরীত—

মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হঞা।
যদি কারু ঘরে মিলে গুণনিধি
বান্ধিব বসন দিয়া। (৪২৮)

এর আগেও একবার জ্ঞানদাসের রাধা শণের দড়ি দিয়ে কৃষ্ণকে বাঁধতে চেয়েছিলেন, তখন তা আমাদের হাস্যরসের উদ্রেক করেছিল। কিন্তু এখন আর হাসি আসে না। বিরহিণী রাধার মর্মবেদনা তাঁর এই অন্বেষণের অসম্ভব বাসনার মধ্য দিয়ে আমাদের মনকে স্পর্শ করে। একদা বর্ষণমেদুর শ্রাবণ রজনীতে রাধা কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নমিলনের আনন্দ ব্যক্ত হয়েছিল রাধারই মুখ দিয়ে। আবার বর্ষণ মদির আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র কেটে গেল। কিন্তু আষাঢ়ের ঘন বর্ষণে বিরহিণী রাধার মনে হয়—

মাস আষাঢ় গাঢ় বড় বিরহ,
বরখা কেমনে গোঙাব ॥

শ্রাবণে শিখরে শিখণ্ডিণীর ডাক শুনে রাধার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। বিরহিণী রাধা ভাদ্রমাসে দেখতে পান—

চির পরবাসী, যতহুঁ পরদেশী
সব পুন নিজ ঘরে গেল। (৪৩৫)

এইভাবে বর্ষা, শরৎ, শীত ও বসন্তে (৪৪১, ৪৪২) নিদারুণ কৃষ্ণ-বিরহে কাটিয়ে অবশেষে রাধা কৃষ্ণের কাছে দূতী প্রেরণ করলেন। রাধা দূতীকে বলে দিলেন—

বন্ধুরে কহিও মোর কথা।
অনলে পশিব যদি নাহি আইসে এথা ॥ (৪৩৯)

জ্ঞানদাসের রাধা চণ্ডীদাসের রাধার মত নিরুপায় ক্ষোভে ভেঙ্গে পড়েন না, তাঁর প্রেমগর্বকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এইভাবেই আঁকড়ে রাখেন।

রাধার দূতী মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণের কাছে রাধার অবস্থার কথা শুধু বলেন না—নিষ্ঠুরতার অভিযোগে তিরস্কার ও তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ করেন—

ইহ দুখ শুনি তুয়া চীত না দরবয়ে
কৈছন হৃদয় পাষাণ ॥
পৌর রমণিগণ বহু গুণ জানত
তাহে বুঝি বারল চীত। (৪৪১)

দূতীর এই বিদ্রূপবাণ অপর একটি পদে আরও তীক্ষ্মভাবে বর্ষিত হয়েছে। দূতী বলেছেন মথুরাপুরীর সুখ সম্পদ ত্যাগ করে মাধব কেন ব্রজপুরে যাবেন? মথুরায় কৃষ্ণ মহামতি ভূপতি, বৃন্দাবনে তিনি পশুপতি অর্থাৎ গোপালকমাত্র ছিলেন। মথুরার বিশাল অট্টালিকায় রতন পর্যংক কৃষ্ণ উপবেশন করেন। মোতি ও প্রবালে ভূষিত দাসীরা তাঁর মাথায় চামর ঢুলায়। আর বৃন্দাবনে বন্ধুরা নব পল্লবে বীজন করত। মণিপ্রবাল তারা কোথায় পাবে—বনমালাই তাদের সম্বল। সেখানে কৃষ্ণের প্রেমিকা ছিল "আহিরিণী কুরূপিণী গুণহীনী পরাধীনী", তারা বহু কষ্টে বনের মধ্যে গিয়ে মিলিত হত। অন্যদিকে এখানকার পুরনারীরা স্বাধীন, তা ছাড়াও কুব্জার সান্নিধ্য রয়েছে। সুতরাং বৃন্দাবনের তুলনায় এখানকার প্রেম অনেক বেশী উপভোগ্য—এইটিই গোপীর বক্তব্য (৪৩০)। এই ব্যঙ্গের পাশাপাশি দূতী যখন বিরহিণী রাধার 'কণ্ঠগতাগতি জীবন ভেল' (৪১৯) চিত্রটি তুলে ধরে, তখনই এই তীক্ষ্ম বিদ্রূপের আড়ালে রাধার বেদনার সাথে সাথে রাধার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী দূতীর হৃদয়েরও গোপন রক্তক্ষরণ চোখে পড়ে।

কৃষ্ণবিরহিণী রাধার দিব্যোন্মাদ অবস্থার ভাব নিয়ে জ্ঞানদাস শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে পদ রচনা করেছেন। শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণিতে এই অবস্থাকে বলা হয়েছে প্রজল্প—

অসূয়ের্ষ্যামদযুজা যোহবধীরণমুদ্রয়া।
প্রিয়স্যাকৌসলোদগারঃ প্রজল্পঃ স তু কীর্ত্যতে॥[৮৮]

অসূয়া, ঈর্ষা এবং মদযুক্ত অবজ্ঞার দ্বারা প্রিয় ব্যক্তির যে অকৌশলোদ্গার তাকে প্রজল্প বলে। শ্রীরূপ এর উদাহরণ দেওয়ার জন্য ভাগবতের ভ্রমর গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। জ্ঞানদাসও এই ভ্রমরগীতার প্রথম শ্লোক[৮৯] অনুসরণে রাধার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

অলি হে না পরশ চরণ হামারি।
কানু অনুরূপ বরণ গুণ বৈছন
ঐছন সবহুঁ তোহারি ॥
পুর রঙ্গিণি কুচ কুংকুমরঞ্জিত
কানু কণ্ঠে বনমাল। (৪৪৭)

পদটিতে শ্রীরাধা ভ্রমরকে তাঁর চরণ স্পর্শ করতে নিষেধ করার প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণ ও পুর রমণীদের সাথে বিলাসের বিষয়ে নিন্দা করেছেন। মূল কৃষ্ণার্তি গোপন করে শ্রীরাধা এই যে শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করেছেন, একেই বলা হয় প্রজল্প। এই ভাব নিয়ে

জ্ঞানদাস আরও একটি মৌলিক পদ রচনা করেছেন। সেখানেও বিরহিণী রাধার কৃষ্ণার্তি ছদ্মকোপে ও ঈর্ষায়, অভিমানে ও বেদনায় প্রকাশিত হয়েছে—

মথুরায় কর বাস থাকহ শ্যামের পাশ
চূড়ার ফুলের মধু খাও।
সেথা ছাড়ি এথা কেনে দুখ দিতে মোর প্রাণে
মন্দির ছাড়িয়া ঝাট যাও ॥

অবশেষে জ্ঞানদাসের বিরহিণী রাধা স্বপ্নে দেখেছেন তাঁর প্রাণনাথকে। তিনি যেন রাধার সামনে হাত জোড় করে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গের পর ক্ষণিক মিলনের সেই আনন্দ তীব্র বেদনায় আচ্ছন্ন করেছে রাধাকে (৪৫০, ৪৫১)। জ্ঞানদাসের রাধা একদা স্বপ্নে তাঁর প্রেমিককে পেয়েছিলেন প্রেম জাগরণের প্রথম মুহূর্তে, আজ আবার স্বপ্নে প্রেমিককে পেলেন বিরহের নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও। এইভাবেই জ্ঞানদাসের স্বপ্ন-চারিণী শ্রীমতীর প্রেম স্বপ্নে বিকশিত হয়ে বাস্তবের রূঢ় আঘাতে ভেঙ্গে গেছে।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। রাধা আশা করেছেন, কৃষ্ণ আবার আসবেন, তাঁর সাথে আবার মিলন হবে। বাস্তব লোকে না হোক, বৈষ্ণব কবির কল্পনায় ভাবলোকে কৃষ্ণ এসেছেন রাধার কাছে। আর অন্তরের অন্তস্থলের শাশ্বত প্রেমিককে প্রশ্ন করেছেন শাশ্বতী প্রেমিকা—

তোমায় আমায় একই পরাণ
ভাল সে জানিয়ে আমি
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলা তুমি ॥

এই প্রশ্ন প্রমাণ করে দেয় জ্ঞানদাসের রাধা মধ্যযুগের ধর্মীয় পরিমণ্ডলের গণ্ডী ঘেরা থাকলেও বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্রের ছকে বাঁধা নিয়মে তাঁর প্রেমকে সব সময় ধরে রাখা যায় নি। যুগযুগান্তের ব্যবধান পেরিয়ে আজও কাব্যরসিকের হৃদয়ে ভেসে ওঠে ব্যাকুল মিনতিভরা রাধার অশ্রু-উদ্বেল দুটি চোখের সজল বেদনা, অনুরণিত হয় প্রেমার্তিময় প্রশ্ন—

হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলা তুমি ॥

শ্রীনিবাস আচার্য

শ্রীনিবাসের পদ খুব কমই পাওয়া গেছে। কিন্তু যে কটি পদ পাওয়া গেছে তা কাব্যসৌন্দর্যে অনুপম ও আন্তরিক। ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে তিনি জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন বলে মনে হয়। ভাগীরথী তীরবর্তী চাখন্দী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গঙ্গাধর ও মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের বাংলাদেশে বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যে শ্রীনিবাস সবচেয়ে প্রভাবশালী। বাল্যকালে নরহরি ঠাকুরের সংস্পর্শে

এসে তিনি বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পরে বৃন্দাবনে গোপাল ভট্টের কাছে দীক্ষা নেন। শ্রীনিবাসের কৃতিত্ব তাঁর স্বল্পসংখ্যক পদরচনায় নয়, বাংলাদেশে বিলুপ্ত প্রায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় ও আরও বহু পদরচয়িতা ভক্ত বৈষ্ণব গোষ্ঠী নির্মাণে। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ রচিত বৈষ্ণবধর্মগ্রন্থ সমূহ সঙ্গে নিয়ে শ্রীনিবাস যখন গৌড়ে আসছিলেন, তখন পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর সেই গ্রন্থগুলি লুণ্ঠন করেন। ভক্ত শ্রীনিবাস অপহৃত গ্রন্থগুলির পুনরুদ্ধার তো করেনই—উপরন্তু হাম্বীরের চিত্তপরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। ভক্তিরত্নাকরে আছে বীর হাম্বীর শ্রীনিবাসের ভাগবত পাঠ শুনে মুগ্ধ হন—

ভাগবত শুনে রাজা এ কথা শুনিয়া।
রাজসভা চলে কৃষ্ণবল্লভে লইয়া॥
আচার্যের তেজ দেখি রাজা সাবধানে।
ভূমি পড়ি প্রণমি আপনা ধন্য মানে॥ [১০]

ভাগবতের ভ্রমরগীতার ব্যাখ্যা করেই শ্রীনিবাস রাজা হাম্বীরের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন।

শ্রীনিবাসের স্বল্পসংখ্যক পদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার পদটি। রূপবর্ণনার না বলে পদটিকে রূপমুগ্ধতার বললেই বোধ হয় ঠিক করা হবে। রাধার প্রেমদৃষ্টির আলোক কৃষ্ণের মোহনরূপ, মরমী কবির গভীর আন্তরিকতাকে প্রকাশ করেছে। রাধা বলেন—

মদন ফান্দ ও না   চূড়ার টালনি গো
উহা না শিখিয়া আইল কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুঞি   উহা না দেখিলু গো
এ বড়ি মরমে মোর বেথা॥ (পৃ. ১০৮৪)

শুধু কৃষ্ণের রূপ নয়, তাঁর মধুর ভঙ্গীগুলি পর্যন্তও রাধার কাছে পরম আকর্ষণের বস্তু। কিন্তু কৃষ্ণকে প্রাণভরে দেখার পক্ষে বাধা সমাজসংস্কার ও গুরুজন পরিজন। রাধার রূপতৃষ্ণা ব্যক্ত করতে গিয়ে কখনও কবি রাধার জবানীতে বলেন—

করভের কর জিনি   বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুল মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন বনের পাখী   পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ রস মাগে। (ঐ)

আক্ষেপানুরাগে কৃষ্ণের প্রেমে ব্যাকুলা রাধা ঘরের কোণে বসে বসনে মুখ ঢেকে থাকেন। ঘরের বাহিরকেই তাঁর মনে হয় প্রবাস। তিনি বলেন নিজের বলতে তাঁর পৃথিবীতে কেউ নেই। ঘরে ননদিনী আর গুরুজন সবাই রাধার রিপু। শুধু তাই নয়, রাধার যৌবনও যেন তাঁর বৈরী (কারণ যৌবনের ধর্মই ভালবাসা)। আর সেই ভালবাসা শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকেই আশ্রয় করেছে। তাই যৌবনের ওপরও রাধার বড় রাগ। কৃষ্ণ-প্রেমের জন্য বৃন্দাবনও তাঁর বৈরী। কারণ রাধাকে বৃন্দাবনে চেনে না—এমন তো

কেউ নেই। সুতরাং রাধার যাওয়ার স্থানও কোথাও নেই। তাই রাধাকে ঘরের কোণে বসনে মুখ ঢেকে থাকতে হয়। অনুরাগবল্লীতে পদটির সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি বিশাখার প্রতি রাধার উক্তি (পৃ. ২০৮)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পুঁথিতে[৬৯] রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগের একটি পদ রয়েছে। এখানে রতিরণরঙ্গে কানু রাধার কাছে পরাজিত হয়েছেন।

শ্রীনিবাসের অপর দুটি প্রার্থনার পদে ভক্ত শ্রীনিবাস সখীর অনুগতা মঞ্জরীর সহচরী হয়ে রাধাকৃষ্ণের সেবা করতে চেয়েছেন। তাঁর মিনতিতে যে দীনতাযুক্ত আর্তি, তা শ্রীচৈতন্য কথিত শিক্ষাষ্টকের অনুগ—

উর্ধ্ব অঙ্গুলি করি দশনেত তৃণ ধরি
নিবেদহুঁ বারহি বার। (পৃ. ১০৮৫)

এই দীনতা আদর্শ বৈষ্ণব শ্রীনিবাসেরই উপযুক্ত।

নরোত্তম দাস

ভাগবতের ব্যাখ্যাকাররূপে শ্রীনিবাসের যে প্রসিদ্ধি, সেই প্রসিদ্ধি নরোত্তমের রয়েছে পদাবলী কীর্তনের ক্ষেত্রে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে নরোত্তম বৈষ্ণব ধর্মমতে, কীর্তন গানে ও গীতি কবিতায় নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন। ১৮৫০ খৃস্টাব্দে অথবা তার কাছাকাছি সময়ে রাজসাহী জেলার খেতুরী গ্রামে সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধ কায়স্থ পরিবারে নরোত্তম দাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কৃষ্ণদাস দত্ত, মাতা নারায়ণী। বাল্যকালেই প্রবল ধর্মানুরাগ বশতঃ তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে লোকনাথ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নেন এবং শ্রীজীবের কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এখানেই শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের সাথে তাঁর দেখা হয় এবং এঁদের তিনজনের চেষ্টাতেই বাংলাদেশে ঝিমিয়ে-পড়া বৈষ্ণব ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটে। নরোত্তমের জীবনের একটি মহৎ কীর্তি হল খেতুরীর মহোৎসব। বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নরোত্তম জাতিতে কায়স্থ হলেও অনেক ব্রাহ্মণ এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

সাধন ভজন বিষয়ে বেশ কতগুলি নিবন্ধ রচনা করলেও পদকর্তা রূপে নরোত্তমের খ্যাতি কম ছিল না। বিশেষতঃ প্রার্থনার পদগুলিতে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। প্রার্থনার পদে নরোত্তম দাস মঞ্জরীভাবের উপাসক শ্রীরূপ গোস্বামীর বন্দনা করেছেন এবং রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার নানা পর্যায়ে তাঁদের সেবা করতে চেয়েছেন। কবি শ্রীরাধার কুটিল কুন্তলে বিচিত্র কবরী রচনা করে দিতে চান, অঙ্গে লেপন করতে চান মৃগমদ, এবং কবির আরও প্রার্থনা—

কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল ভরি
জোগাইব দোঁহার বদনে। (পৃ. ৫৬২)

কবি কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বনে রাধাকৃষ্ণের লীলার সময়ও তাঁদের সেবা করতে চান (পৃ. ৫৬৪)। প্রার্থনার পদগুলি ছাড়াও রাধাকৃষ্ণলীলার কিছু কিছু প্রসঙ্গ নিয়ে নরোত্তম পদ রচনা করেছেন। আক্ষেপানুরাগের পদে রাধার প্রেমের অভিব্যক্তি এবং পরিবারে রাধার অবস্থা বর্ণনায় নরোত্তমের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। রাধার—

শাশুড়ি খুরের ধার ননদিনী আগি।
নয়ান মুদিলে বলে কান্দে শ্যাম লাগি ॥

কিন্তু নরোত্তমের রাধা পরিবারের লোকেদের জন্য ভীত নন। তাঁর ভয় নিজেকে। তিনি বলেন হয়ত বা কুল মর্যাদার ভ্রমে তিনি কৃষ্ণকে হারাবেন (পৃ. ৫৭১)। এখানে নরোত্তমের রাধা নিজস্ব স্বতন্ত্র মহিমায় দীপ্ত হয়ে উঠেছেন। অনুরাগিনী রাধা কৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলেন, কৃষ্ণ শ্রীদামের সঙ্গে গোষ্ঠে যাওয়ার সময় রাধা আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর বাসনা হয় কৃষ্ণের সাথে তিনিও চলে যান, কিন্তু গুরুজনের ভয়ে তিনি যেতে পারেন না। তাঁর চোখ দুটি তাকিয়ে থাকে কৃষ্ণের ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। এই পদের পরবর্তী অংশে প্রকাশিত হয়েছে রাধার কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দ বেদনা ও আকাঙ্ক্ষার আবেগ। কৃষ্ণের কথা মনে পড়লে রাধা বৃন্দাবনের পানে চেয়ে থাকেন, কালো কৃষ্ণের কালো রূপের সাদৃশ্যে রাধা আলুলায়িত কুন্তল আর বাঁধেন না। রান্নাঘরে গিয়ে কৃষ্ণের গুণ স্মরণ করে রাধা কাঁদতে থাকেন। কেউ প্রশ্ন করলে বলেন, চোখে ধোঁয়া লেগেছে। কৃষ্ণের সাথে ক্ষণিকের বিচ্ছেদও রাধার অসহ্য। তাই রাধা বলেন—

নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশ ॥
অগোর চন্দন হৈতাম শ্যামাঙ্গ লেপিয়া রৈতাম
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙ্গা পায়। (ঐ)

রাধার এই বাসনার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ প্রেমের মাধুর্য এবং স্নিগ্ধতাও যেন চন্দন সৌরভের মতই বিকীর্ণ হয়েছে। বিপ্রলব্ধা বিরহিণী নায়িকার বর্ণনায় নরোত্তমের পদগুলিতে কবির নিজস্ব প্রবণতাও যুক্ত হয়েছে। রাধা বলেন—

কর তাম্বুল গুয়া খপুর পুরিল সই
পিয়া বিনে কার মুখে দিব।
এ নব মালতীমালা বৃথাই গাঁথিলু গো
কেমনে রজনি গোঙাইব ॥

আক্ষেপানুরাগের পদে যে রাধা চন্দন হয়ে কৃষ্ণের সর্বাঙ্গ লিপ্ত করে থাকতে চেয়েছিলেন, তাঁকেই যেন আবার আমরা পেয়ে যাই (পৃ. ৫৬৬)।

নরোত্তমের মানভঞ্জনের পদে কৃষ্ণের আচরণ পৃথক ধরনের। অস্থির চরণে যেন রাধাপ্রেমের আর্তি বিস্তীর্ণ করে তিনি কুঞ্জে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু রাধার মানভঞ্জনের জন্য তাঁকে পদ ধারণ অথবা ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি কিছুই করতে হয় নি। কুঞ্জে উপস্থিত হয়ে বিরহে অচেতন রাধার অধর, কপোল, চোখ এবং দুই ভুরুর মাঝখানে বারবার কৃষ্ণ চুম্বন করেছেন। সচেতন হয়ে কৃষ্ণকে দেখে রাধার—

মদন জনিত দুখ সব দূরে গেল।

মিলন পর্যায়ে জ্ঞানদাসের মত নরোত্তমের পদেও আদিরসের উতরোল উল্লাস নেই। কৃষ্ণের সেবায়, রাধার তৃপ্তিতে আর ললিতা বিশাখার আনন্দে পদগুলি মধুর।

এখানে কৃষ্ণের সেবার ভাবটিও জ্ঞানদাস এবং বলরামদাসের কথা মনে করিয়ে দেয়। রাধার স্বেদাপ্লুত মুখ দেখে কৃষ্ণ আকুল হয়ে বসনাঞ্চলে ঘাম মুছিয়ে দেন। দাসী-দের হাত থেকে চামর নিয়ে নিজেই রাধাকে মৃদু মৃদু বীজন করেন (পৃ. ৫৬৮)।

অষ্টকালীয় নিত্যলীলা, শরৎকালীন মহারাস, নিত্যরাস ও বসন্ত রাস বর্ণনায় নরোত্তম, গোস্বামী প্রবর্তিত রীতিই অনুসরণ করেছেন।

ভাবী এবং ভূত বিরহ নিয়েও নরোত্তম কতগুলি পদরচনা করেছেন। ভাবী বিরহের পদে রাধা কৃষ্ণকে বলেন 'নিধনিয়ার ধন'। কৃষ্ণের মথুরা যাওয়ার সংবাদ শুনে রাধা বলেন—কৃষ্ণের নাম গলায় গেঁথে তিনি যমুনায় প্রবেশ করবেন (পৃ. ৫৭২)। নরোত্তমের একটি পদে বিরহের ষষ্ঠ দশা প্রলাপের ভাব পাওয়া যায়। পদটিতে কৃষ্ণবিরহিণী রাধার গভীর বেদনা রূপ পেয়েছে (ঐ)। অপর একটি পদে বিরহের দশমী দশার বর্ণনা রয়েছে। শ্রীরূপ-নির্দিষ্ট এই মৃত্যুর স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রীজীব গোস্বামী লিখেছেন 'মৃতিদশা ইব দশা' অর্থাৎ মৃত্যু দশার মত দশা। নরোত্তম দাসের রাধা সেই দশাতেই উপনীত হয়েছেন—

সর্বাবস্থাসু সর্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা।
অতস্মিংস্তদিতি ভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কীর্তিতঃ ॥[২২]

সকল অবস্থায়, সর্বত্র ও সর্বদা তদ্গতচিত্ততা হেতু যে বস্তু যা নয়, তাতে সেরূপ ভ্রান্তি জন্মালে (অবস্থাটি) উন্মাদ বলে কীর্তিত হয়। নরোত্তমের পদেও দেখি উন্মাদ দশাগ্রস্তা রাধা—

দূরেতে তমালতরু করি দরশন।
উনমতি হৈয়া ধায় চাহে আলিঙ্গন ॥ (পৃ. ৫৭৩)

রাধার এই উন্মাদ দশা দেখে পশু পাখীও পর্যন্ত বিষাদাচ্ছন্ন। এটি শ্রীরূপের নাটকের প্রভাবজাত। অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যে এর দৃষ্টান্ত আমরা আগেই পেয়েছি। এই পদগুলির আলোচনা থেকেই প্রমাণ হয় কেবলমাত্র সাধনগ্রন্থ রচনা ছাড়াও নরোত্তম পদরচনায়ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পদগুলির মধ্যে গোস্বামিগণ প্রবর্তিত বৈষ্ণবতত্ত্বের প্রতিফলনের সঙ্গে রয়েছে অকৃত্রিম মরমিয়া অনুভূতির উৎসারণ।

শ্যামানন্দ দাস

শ্যামানন্দের জন্ম সময় জানা যায় নি ; তবে মৃত্যু আনুমানিক ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে। শ্যামানন্দ দাস মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দাবাহাদুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা কৃষ্ণ মণ্ডল এবং মায়ের নাম দুরিকা। নিত্যানন্দ পণ্ডিতের অনুচর, গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়ানন্দ বা হৃদয়চৈতন্য এঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ তিনজনে একসঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে গোস্বামী গ্রন্থে পাঠ গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক হিসাবে শ্যামানন্দ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরই চেষ্টায় উৎকলের অসংখ্য নরনারী বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গোপীবল্লভ দাসের রসিকমঙ্গলে, নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকরে ও কৃষ্ণচরণ দাসের শ্যামানন্দপ্রকাশে এঁর কাহিনী পাওয়া যায়। ইনি প্রধানতঃ সাধনানিবন্ধ রচনা করলেও এঁর নামে কয়েকটি পদও পাওয়া যায়।

শ্যামানন্দের পদগুলি নানা ভণিতায় পাওয়া যায়। কখনও দুঃখী কৃষ্ণদাস, কখনও দীন কৃষ্ণদাস, শুধু দুঃখী ও দুঃখিনী ভণিতাতেও কয়েকটি পদ ও স্তব পাওয়া গেছে। এগুলি সবই এক শ্যামানন্দের রচনা বলে মনে হয়। কারণ শ্যামানন্দের বাল্যকালের নাম ছিল দুখিয়া—

গ্রামবাসী স্ত্রীগণ কহয়ে বার বার।
এখন দুঃখিয়া নাম রহুক ইহার ॥
মাতা পিতা দুঃখসহ পালন করিল।
এই হেতু দুঃখী নাম প্রথমে হৈল ॥[৯৩]

পরে দীক্ষা নেওয়ার সময় গুরু 'কৃষ্ণদাস নাম থুইল' এবং সেই দিন থেকে দুঃখী কৃষ্ণদাস নাম হৈল বিদিত।[৯৪] পরবর্তীকালে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পর তাঁর নাম হয় শ্যামনন্দ। সম্ভবত দুঃখী দীন কৃষ্ণদাস ও দুঃখি কৃষ্ণদাস ভণিতায় লেখা পদগুলি সিদ্ধিলাভের আগে রচিত। শুধু দুখি ও দুখিনী ভণিতায়ও একটি পুথিতে তাঁর পদ পাওয়া গেছে। পদগুলি যে শ্যামানন্দেরই, তার প্রমাণ গ্রন্থের পুষ্পিকায় রয়েছে—"ইতি শ্যামানন্দ দাস বিরচিত সাধকে সিদ্ধরূপস্য দর্শনং প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ" [৯৫] ড. সুকুমার সেন দুঃখী ও দুখিনী ভণিতায় রচিত দুটি পদের দৃষ্টান্ত তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে দিয়েছেন। একটি পদে সেকালের বাই-নাচের ভঙ্গিতে রাধা ও তাঁর প্রিয় সখীদের নৃত্য বর্ণিত হয়েছে। এটিতে ভণিতা রয়েছে 'দুঃখী', অপর পদটিতে 'দুঃখী ও 'দুঃখিনী এই দুটি ভণিতাই পাওয়া যায়। অন্য একটি পদ রাধাকৃষ্ণের মিলনের পদ। এতে রতিমঞ্জরী ও কস্তুরীমঞ্জরী দুই সখীর নাম আছে।[৯৬]

দুঃখী দীন কৃষ্ণদাসের ভণিতায় যে পদগুলি শ্যামানন্দ রচনা করেছেন, সেই পদগুলিতে কৃষ্ণের বাল্যলীলার কিছু পদ আছে। কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণের প্রসঙ্গ কবির অন্যতম বিষয়। গোষ্ঠলীলার পদে কবি কথা অংশে একটু অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। গোপ-বালকেরা সবাই যমুনায় জলপান করতে গিয়ে স্বচ্ছ যমুনার জলে দেখতে চায় কার মা কেমন সাজিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সবাই একমত হল যে 'কানায়ের মুখের বালাই যাই।' এই কবির পদে সখারা যেন কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্যযুক্ত। কৃষ্ণ তাদের ছোট ভাই, তাই তাকে রৌদ্রের মধ্যে সখারা ঘুরতে দিতে চায় না। তার চোখ বেঁধে তাকে বংশীবটের নীচে বসিয়ে রাখে। যে এসে আগে কানাইকে ছুঁয়ে দিতে পারবে—তারই খেলায় জিত হবে (পৃ. ৫৫৬)। কানাই-এর চোখ বাঁধায় বলাই দাদা খুব খুশী। স্খলিতবাক্ মত্ত বলরামের যে চিত্র আমরা হরিবংশ থেকে আরম্ভ করে পদাবলী-সাহিত্যেও ব্যাপকভাবে পেয়েছি, সেই বলরামও এই কবির পদে উপস্থিত। এরপর বলাই-এর চোখ বেঁধে দেওয়া হলে সে সবাইকে খুঁজতে গিয়ে সামনে পেলো শ্রীদামকে। শ্রীদামকে সামনে পেয়েই বলরাম তার কাঁধে চেপে বসল। বাধ্য হয়ে শ্রীদাম বলাইকে বহন করে বংশীবটের দিকে আসতে থাকলো। পরিশ্রমে শ্রীদামের শরীর থেকে মুক্তা-বিন্দুর মত ঘাম ঝরতে লাগল (পৃ. ৫৫৬)। অপর একটি পদে বলাই-দাদার কাছে শিশু-কৃষ্ণের আবদার এবং কৃষ্ণের প্রতি বলাই-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাসুলভ স্নেহ বড় সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে (ঐ)। এই ভণিতায় আরও তিনটি রাধাকৃষ্ণের যুগল

মিলনের পদ রয়েছে। রাধা এবং কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় এখানে একটু বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়—

সুরঙ্গ পাগ শিরে টেড়ি শোভে
বাঁকে নয়ন বিশাল।
তা পরে ময়ূর চন্দ্রিকা বিরাজে
রতন কি পেচ রসাল ॥

রাধার বর্ণনাও উল্লেখযোগ্য—

ঘুঙ্গুরওয়ালি অলকে ঝলকে
উরে মোতিয়নকি মাল।

এর ভাষা এবং বর্ণনা দুটিই ইসলামী বেশভূষার সংস্পর্শজাত এমন মনে হওয়া অসম্ভব নয়। এই ধরনের বেশভূষা সমন্বিত কৃষ্ণকথামূলক চিত্রকলা থেকেও এমন অনুমান সহজেই করতে পারি।[৯৭]

শ্যামানন্দ ভণিতার পদ একটি বাল্যলীলার এবং অপরটি অভিসারের। বাল্যলীলার পদটি শ্রীকৃষ্ণের কৌমার অর্থাৎ পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ববর্তী সময়ের। নন্দদুলাল কৃষ্ণ মায়ের সামনে নাচছেন। শত শত গোপি আর বালকেরা নৃত্যের সাথে সাথে গান করছে। শিশু কৃষ্ণের মধুর হাসি, মৃদু মৃদু কথা আর ঈষৎ উন্মুক্ত দন্তপংক্তির বর্ণনা বেশ জীবন্ত (পৃ. ৫৭৯)। অভিসারের পদটি নিতান্ত দুর্বল। অভিসারে দুর্জয় আবেগ, উৎকণ্ঠা ও সাধনা কিছুই এর মধ্যে নেই। অভিসারিকা রাধার রূপের গতানুগতিক বর্ণনাই পদটির বিষয়বস্তু। অভিসার পর্যায়ের শক্তিমান কবি বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসের পদে অভিসারিকা রাধা বেশভূষা করার সময় পান নি অথবা বেশভূষা করলেও তা অভিসারের উপযোগী। কিন্তু এই রাধা সিন্দুরে চন্দনে রতনে ভূষণে এবং চাঁচর কেশের বিচিত্র বেণীতে যে ভাবে নিজেকে সজ্জিত করেছেন তাতে শ্রীরাধিকার রূপের ঐশ্বর্য যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি ঢাকা পড়েছে কবিত্বশক্তির দীপ্তি ॥ শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের ভক্তদের মধ্যে অনেকেই পদকর্তা ছিলেন। কিন্তু সব পদকর্তার পদরচনা বিশিষ্টতার দাবী করতে পারে না। তাই এঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট পদকর্তার পদই আমরা আলোচনা করে দেখতে পারি।

গোবিন্দদাস চক্রবর্তী

গোবিন্দ চক্রবর্তী বোরাকুল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং শ্রীনিবাস আচার্যের এক অনুগত শিষ্য ছিলেন। শুধু পদকর্তাই নয়, ইনি একজন ভক্তিমান গায়কও ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়া নাগরী ভাব নিয়ে ইনি বেশ কয়েকটি পদ রচনা করেছেন। এ ছাড়াও এঁর রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কিছু পদ রয়েছে। পদগুলিতে গোবিন্দ দাস কবিরাজের অনুকরণের চেষ্টা আছে। কখনও কখনও কবি ভাগবতও অনুসরণ করেছেন।

এই কবির গোষ্ঠলীলার পদে মধুর রসের মিশ্রণ ঘটেছে। শুধু তাই নয়। গোষ্ঠলীলার ব্যাপারটি চাপা পড়ে গিয়ে মধুর রসই প্রধান হয়ে উঠেছে (পৃ. ৬৮৯)। শ্রীরাধার পূর্বরাগের পদগুলিতে হৃদয়াকূতির চেয়ে কবির অলংকার ব্যবহারের নৈপুণ্যই

যেন বেশী প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণের রূপ ও আকর্ষণী শক্তি বোঝাতে গিয়ে রাধার একটি উক্তি, বলার ভঙ্গীতে নতুন হয়ে উঠেছে।

সজনি! কো কহে কাম অনঙ্গ।
কেলি কদম্বতলে সো রতিনায়ক
পেখলুঁ নটবররঙ্গ। (পৃ. ৬৭৮)

কিছু কিছু পংক্তি প্রত্যক্ষভাবে গোবিন্দদাস কবিরাজের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এই কবিরচিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদেও কৃষ্ণ রাধার কানড় ছাঁদে বাঁধা কবরী থেকে আরম্ভ করে সর্বাঙ্গের সৌন্দর্য অলঙ্কারশাস্ত্র সম্মত উপায়ে বর্ণনা করে যান। রাধার প্রতি নিজের আকর্ষণের কথা বলতে বলতে কৃষ্ণ কেঁদে ফেলেন। সেই সময়েই বিশাখা এসে কৃষ্ণকে কাঁদতে দেখে তাঁর মনের কথা জানতে চাইলে (৬৭৯) সুবল রাধাপ্রেমে কৃষ্ণের ব্যাকুলতা ও বেদনাকে তুলে ধরেন। পূর্বরাগে কৃষ্ণের এই অবস্থা আপ্ত দূতী রাধার কাছে বর্ণনা করেছে। কৃষ্ণ চম্পকদাম দেখেও রাধার কথা ভেবে কম্পিত হচ্ছেন। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণ রাধা ছাড়া অন্য কোন নারীকে মনে স্থান দেন না—

লাখ লাখ ধনি বোলয়ে মধুর বাণি
সপনে না পাতয়ে কান॥ (পৃ. ৬৮০)

প্রেমিক কৃষ্ণের প্রেমতন্ময় রূপ নির্মাণে কবি এখানে যেন চণ্ডীদাসের রাধাকেই বিপরীত-ভাবে রূপ দিয়েছেন। কৃষ্ণ শয়নে স্বপনে মনে সবসময়েই রাধার নাম জপ করেন। ভাবভরে তিনি সম্পূর্ণ রাধা নামও উচ্চারণ করতে পারেন না। তাঁর চোখ থেকে অনর্গল অশ্রু ঝরে পড়ে। ব্যাকুল আর্তিতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এই কৃষ্ণ যে শ্রীচৈতন্যের প্রতিরূপ তাতে কোন সংশয় নেই। কৃষ্ণের এই অবস্থায় রাধার প্রতি দূতীর অনুরোধ—"রাধা হে, তেজহ কপট ছন্দ।" পূর্বরাগবতী রাধাকে দশ দশার বিভিন্ন অবস্থায় যেভাবে জয়দেবের গীতগোবিন্দে, বিদ্যাপতির পদাবলীতে এবং অন্যান্য পদাবলীকারদের পদে দেখা যায়, এই কবির পদে কৃষ্ণেরই সেই অবস্থা (৬৮১)। অবশ্য বিরহিণী রাধার অবস্থাও কৃষ্ণের সমতুল্য। তার নয়নে বচনে, বসনে ভূষণে সর্বত্রই কৃষ্ণ। কৃষ্ণের কথা ভেবে অনর্গল চোখের জলে তাঁর কাজল ঝরে যায়।

অভিসারের বর্ণনায় এই কবি গতানুগতিক। রাসে উন্মত্তাভিসারের বর্ণনায় তিনি ভাগবতের কথাবস্তুরই প্রায় অনুবাদ করেছেন। কৃষ্ণের সুধাময় মুরলীরব শ্রবণ করে—

না সম্বরে অম্বর ধায় গোপী সব॥
করে তুলি পরে কেহ পদ আভরণ।
কেহ পরে নিজ আধ নয়নে অঞ্জন॥ (পৃ. ৬৮১)

কেউ আবার শিশুকে স্তন্যপান করাতে করাতে বংশীধ্বনি শুনে কৃষ্ণের দিকে ছুটে গেল। একজন গোপীকে তার স্বামী যেতে না দেওয়ায় 'শ্যাম অনুরাগে সেহ তনু তেয়াগিল'। অনুরূপ বর্ণনা ভাগবতে রয়েছে—

পরিবেষয়ন্ত্যস্‌ধিতা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্‌ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্‌ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্‌ ॥
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজ্যন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥

*　　*　　*　　*　　*

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্‌ গোপ্যোঽলব্ধ বিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিত লোচনাঃ ॥[১৮]

ভাগবতের শ্লোকে, বিশেষতঃ দশম শ্লোকটিতে কৃষ্ণভক্তির যে দীপ্তিময় গভীর স্তর উন্মোচিত হয়েছে গোবিন্দ চক্রবর্তীর —পদে তা অনুপস্থিত। কিন্তু কথাবস্তু ভাগবতের কাছে সম্পূর্ণতঃ ঋণী।

এই কবিরচিত রাধাকৃষ্ণের মিলন, সম্ভোগ, জলকেলি ও রসোল্লাসের পদে, বিশেষত ব্রজবুলির শব্দঝঙ্কারে ও ছন্দঝঙ্কারে, গ্রথিত কথাবস্তুতে কোন বিশেষত্ব নেই।

গোবিন্দ চক্রবর্তীর খণ্ডিতা রাধা বক্রবচনপটিয়সী। তিনি অন্য নায়িকা-সম্ভোগকারী কৃষ্ণকে তিরস্কার করে বলেন—

সোই চণ্ডি তুহুঁ শঙ্কর দেব।
তনু আধ দেই তাহে যাই সেব ॥ (পৃ. ৬৮৩)

এই রাধার ক্রোধও একটু বেশী। মানিনী রাধাকে সখীরা নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেও কিছু হয় না। ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের গৃহেই ফিরে যান। ক্রোধের বশে পথ-বিপথ কিছুই তিনি বুঝতে পারেন না (পৃ. ৬৮৫)। কিন্তু তারপর আবার এই রাধা কলহান্তরিতা অবস্থায় কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করেন এবং শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের বিরহে কালিদহে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা করেন। (ঐ) রাধার সখী রাধার হিতৈষিণী, রাধার প্রতি তাঁর ভালবাসারও অন্ত নেই। তাই রাধার এই অনুচিত সংকল্পে ব্যথিতা ও আশঙ্কাগ্রস্তা সখী ভয় পেয়ে যান। রাধাকে নিবৃত্ত করার জন্য তিনি বলেন, এ সংবাদ শুনলে কৃষ্ণও তো জীবনের কোনও মূল্য খুঁজে পাবেন না। প্রচ্ছন্ন তিরস্কার ও অনুযোগের সুরে রাধাকে তিনি বলেন—

তাহে তুহু বিদগ্ধ নারী।
অনুচিত মানে　　দেহ যদি তেজবি
মরমহি বিরহ বিথারি। (পৃ ৬৮৬)

সখীর এই বোঝানোর ভঙ্গীটুকু বড় সুন্দর। এরপর কৃষ্ণের পক্ষ নিয়ে সখী বলেন যে কৃষ্ণের মনের কথাও তিনি জানেন। রাধা যদি তাঁকে লক্ষবার গালিগালাজ করেন, তবুও তিনি রাধার পথ চেয়ে বসে থাকেন। সুতরাং রাধা যেন আর কখনও এমন অশুভ কথা না বলেন। দেখা যাচ্ছে, এই সখী কেবলমাত্র রাধারাই হিতৈষিণী নন, তিনি কৃষ্ণেরও সুদৃঢ় সমর্থক। সাধারণতঃ সখীরা কলহান্তরিতা রাধার বেদনা ও

ক্ষোভ প্রকাশে কৃষ্ণের সাথে প্রেম করার জন্য রাধাকে তিরস্কার করেন। কিন্তু এই সখী তা না করে কৃষ্ণেরই পক্ষ অবলম্বন করেছেন (ঐ)। এরপর রাধা সখীকে কাতর-ভাবে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন কৃষ্ণকে এনে দেন। সখী গিয়ে কৃষ্ণের কাছে বিরহিণী রাধার অবস্থা বিবৃত করলে কৃষ্ণ মানিনী রাধার কাছে এসে মানভঞ্জনের জন্য যথারীতি পদ ধারণ করেন। তাতেও রাধার অভিমান দূর হয় না কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত বলেন –

তুয়া বিনু জীবন কোন কাজে রাখব
তেজব আপন পরাণ ॥ (ঐ)

কিন্তু কোনমতেই রাধার মান দূর হল না। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। মানিনী রাধার সাথে কৃষ্ণের নাগরীও যোগীবেশে মিলনের পদ দুটি, কথা-বৈচিত্র্যে ও কৌতুকরস স্নিগ্ধতায় উজ্জ্বল। মানিনী রাধা মুখ নীচু করে বসে আছেন, এমন সময় সখীর সঙ্গে কৃষ্ণ নারীরূপ ধারণ করে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে রাধা সেই শ্যামা রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সখী উত্তর দিলেন—

তুয়া সখি হোত যতনে চলি আওল
কোরে করহ ইহ শ্যামা ॥ (পৃ. ৬৮৭)

যথারীতি রাধা কোলে নিয়েই বুঝতে পারলেন নারীটি কে। কৃষ্ণের ছদ্মবেশ ধারণের এই কথাবস্তু বিদ্যাপতির সময় থেকেই অনুসৃত। কৃষ্ণের যোগীবেশ ধারণের মধ্যে কথাবস্তুর বৈচিত্র্য রয়েছে। গৃহে এক যোগী উপস্থিত হলে জটিলা ভিক্ষা নিয়ে এলেন। যোগী মাথা নেড়ে বললেন পতিব্রতার কাছ থেকে ভিক্ষা না নিলে তাঁর যোগী ব্রত নষ্ট হবে, সুতরাং তিনি জটিলার বধূ অর্থাৎ রাধার হাত থেকে ভিক্ষা নেবেন। জটিলা খুব আনন্দিত হয়ে বধূর কাছে এলেন। যোগীর কথা শুনে রাধাও যোগীর কাছে যাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলে জটিলা বধূকে থালায় গোধূমচূর্ণ এবং সোনার পাত্রে ঘৃত নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। কিন্তু রাধার নিয়ে যাওয়া এইসব সামগ্রীর দিকে না তাকিয়ে যোগী বললেন, তিনি ভিক্ষা চান না, রাধার মুখের কথা চান। নন্দনন্দন কৃষ্ণের ওপর রাধা যেন অভিমান ত্যাগ করেন। শুনে রাধার হাসি ফুটে উঠলো। তিনি বসনাঞ্চলে মুখ ঢাকলেন (পৃ. ৬৮০)। এদিকে বধূর দেরী দেখে জটিলা শাশুড়ী ব্যস্ত হয়ে পড়লে সখী ললিতা বলল, যোগীর কাছ থেকে স্বামীর অমঙ্গলের কথা শুনে রাধার চিন্তা হয়েছে। জটিলা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে ছদ্মবেশী যোগীশ্বরকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন সব অমঙ্গল দূর করেন। উত্তরে যোগীশ্বর বললেন যে পূজক মন্ত্র তো বহু আছে, কিন্তু বধূ তো তার কিছুই জানেন না। জটিলার নির্দেশে যোগী নিভৃত ঘরের মধ্যে রাধাকে মন্ত্রদান করার জন্য প্রবেশ করলেন। দুজনের বাসনা পূর্ণ হল। ঘর থেকে বেরিয়ে যোগী বললেন এখন বিধবা জনকে গৃহে রেখে বধূকে গৌরী পূজায় যেতে হবে (পৃ ৬৮৮)। এই গৌরীপূজার প্রসঙ্গ শ্রীরূপের 'বিদগ্ধমাধব' নাটকেও পাওয়া যায়।

দানলীলার জনপ্রিয় প্রসঙ্গ নিয়েও এই কবি কিছু পদ রচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রেও কবির ওপর গোবিন্দদাসের প্রভাব লক্ষণীয়। অলংকৃত পদ ও ধ্বনিঝঙ্কার পদগুলির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কুঞ্জভঙ্গের পদে শ্রীরূপ সৃজিত বৃন্দাদেবীর দেখা পাওয়া যায়।

রাধিকাগোষ্ঠে কবি রাধিকার বংশীবাদন বর্ণনা করেছেন। রাধার হাতে বাঁশী দিয়ে কৃষ্ণ তাতে ফুঁ দিতে বললেন। কিন্তু বাঁশী বাজল না। রেগে গিয়ে রাধা পায়ে চেপে বাঁশীটি ভেঙ্গে দিতে চাইলেন। রাধার চরণের স্পর্শে বাঁশী আনন্দে বেজে উঠল (পৃ ৬৯৬ ।

রাধকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলাবর্ণনা করতে গিয়ে প্রভাতকালীন বর্ণনা য়কবি বৃন্দাবনের পরিবেশকে যেন প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরেছেন—

নিশি অবশেষে কোকিল ঘন কুহরত
জাগল রসবতি রাই।
বানরি নাদে চমকি উঠি বৈঠল
তুরিতহি শ্যাম জাগাই॥ (পৃ. ৬৯৩)

নিদ্রাভঙ্গের পর রাধার প্রসাধন করতে গিয়েও কৃষ্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে দেরী করেছেন বলে রাধা অনুযোগ করেন—

লিখইতে তিলক বদন ঘন মার্জাস
চিকুর পরশি হসি মন্দ।
অঞ্জইতে নয়ন যুগল ঘন চুম্বনে
ঝামর ভেল মুখচন্দ॥ (ঐ)

মধ্যাহ্নলীলার পদে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে জরতীর সামনে উপস্থিত হয়ে বলেছেন যে তাঁর নাম বিশ্বকর্মা। জরতী ছদ্মবেশী কৃষ্ণের কথা শুনে বলেছে তিনি যেন প্রত্যহ এসে সুরদেবের পূজা করে যান এবং দেবতার কাছে গোধন, রতন ও বধূর সতীত্ব প্রার্থনা করেন। উত্তরে কৃষ্ণ বললেন, সবই হবে যদি বধূ দিবারাত্র পশুপতি সুরের (শিব পক্ষান্তরে কৃষ্ণ) অর্চনা করেন। শুনে জরতী ছদ্মবেশী কৃষ্ণকেই ব্রহ্মচারীজ্ঞানে পূজা করতে বলল। এ-কথায় ব্রজনারীরা মৃদু হাসল। কৃষ্ণের ছদ্মবেশ ধারণের প্রসঙ্গ পদাবলী সাহিত্যে বহু পরিচিত হলেও মধ্যাহ্নলীলায় কৃষ্ণের পূজারী ব্রাহ্মণবেশ ধারণের দৃষ্টান্ত নেই। অষ্টকালীয় লীলার অন্তর্ভুক্ত দিনান্তর মিলনের ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলিও গতানুগতিক। সব মিলিয়ে বলা যায় কৃষ্ণকথা-সাহিত্যে গোবিন্দদাস প্রচলিত কথাবস্তুকেই শুধুমাত্র অবলম্বন করেন নি, কিছু নতুন সৃষ্টিও করেছেন।

বীর হাম্বির

আনুমানিক ১৫৮৭—১৬১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইনি বন বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন। এঁর দস্যুবাহিনী ধনসম্পদ লুঠ করে আনত। একবার বৃন্দাবনের গোস্বামীরা বহু

বৈষ্ণবগ্রন্থ একটি পেটিকায় ভরে গৌড়ে পাঠিয়েছিলেন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃতও ছিল। গ্রন্থগুলি আনছিলেন শ্রীনিবাস। কিন্তু ঐ গ্রন্থগুলি দর্শনেই হাম্বিরের চিত্তশুদ্ধি ঘটল—

গ্রন্থ দৃষ্টিমাত্রেতে হইল শুদ্ধ মন।
পুনঃ পুনঃ গ্রন্থরত্ন করে সন্দর্শন॥[৬৫]

পরে শ্রীনিবাস তাঁর সভায় উপস্থিত হয়ে গ্রন্থগুলি উদ্ধার করলেন ও হাম্বিরকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করলেন। বীর হাম্বির কতগুলি পদও রচনা করেন। তাঁর রচিত আপেক্ষপানুরাগের পদে সখীর কাছে রাধা নিজের নিদারুণ বিরহযন্ত্রণার বর্ণনা করেছেন। রাধার পারিবারিক অবস্থাও বড় করুণ—

শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায় (প, ১০৮৫)

পদরচনায় হাম্বিরের কৃতিত্ব এমন কিছু নয়। কিন্তু এক দস্যু দলপতির এই ভক্তি-রসাপ্লুতিই বৈষ্ণবধর্মের সর্বায়িত বিস্তারের প্রমাণ।

বসন্ত রায়

শ্রীনিবাসের মত নরোত্তমের শিষ্যদের মধ্যেও বেশ কয়েকজন পদকর্তা ছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য বসন্ত রায়। ব্রাহ্মণ বসন্ত রায়ের সঙ্গে গোবিন্দদাস কবিরাজের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল. গোবিন্দ দাসের রচিত পদ বাংলা থেকে বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর কাছে বসন্ত রায়ই পৌঁছে দিতেন।[১০০] গোবিন্দ দাসের তিনটি পদে বসন্ত রায়ের নাম আছে। কবি হিসাবে বসন্ত রায়ের স্বাতন্ত্র্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি 'সাধনা' পত্রিকায় বসন্ত রায় সম্বন্ধে দু-তিনটি ছোট ছোট প্রবন্ধে এঁর রচনার অপূর্ব ব্যঞ্জনা প্রদর্শন করেন এবং বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিদের তুলনায় এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর কবি বলে নির্দেশ করেন। বসন্তরায়, গোবিন্দদাস, বল্লভ ও রায়শেখর ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দু'দশকেও পদরচনা করেন। তাই এঁদের ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিসময়ের কবি বলা যায়।

বসন্ত রায়ের পদে রাধা এবং কৃষ্ণের প্রেম এক সূক্ষ্ম সৌরভময় মাধুর্যে মণ্ডিত। উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীরূপের প্রদত্ত পূর্বরাগের সংজ্ঞা অনুযায়ী এখানেও শ্রীরাধার পূর্বরাগ কৃষ্ণদর্শন ও কৃষ্ণের বাক্যশ্রবণজাত। কিন্তু কৃষ্ণের বাক্যশ্রবণের চেয়েও রূপদর্শনজনিত বিস্ময়যুক্ত মুগ্ধতাই রাধার বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে। বসন্ত রায়ের পদে চরিত্র তিনটি—রাধা, কৃষ্ণ এবং সখী। রাধা তাঁর পূর্বরাগের উল্লাস, উচ্ছ্বাস ও আনন্দকে সখীর কাছেই ব্যক্ত করেছেন। কৃষ্ণের রূপ রাধার বর্ণনায় দলিত অঞ্জন, মরকতমণি এবং যমুনার জলের মত তরল লাবণ্যময়। কৃষ্ণ যে কিসের মত সুন্দর তাও যেন রাধা ভেবে ঠিক করতে পারেন না। কখনও মনে হয় কৃষ্ণ নীলপদ্মের মত, কখনও বা তমালের মত, আবার কখনও মেঘের মত। অবশেষে কিছু ঠিক করতে না পেরে প্রথম প্রেমের মুগ্ধ বিস্ময়ে রাধা বলে ওঠেন—

কমনিয় কিশোর কুসুম অতি কোমল
কেবল রস নিরমাণ ॥ (পৃ. ৬৯৮)

রাধার পূর্বরাগের পরবর্তী স্তরে কৃষ্ণের রূপ ও বাক্যের সঙ্গে তাঁর মধুর হাসি ও বংশীধ্বনি যুক্ত হয়েছে। রূপমুগ্ধতা শুধু নয়, প্রেমের উল্লাস শুধু নয়, এবার প্রেমের বেদনা স্পর্শ করেছে রাধাকে। তাই কৃষ্ণের রূপ—

না দেখিলে প্রাণ কান্দে দেখিলে না হিয়া বান্ধে
অনুখণ মদন তরঙ্গ। (ঐ)

যমুনার তীরে কদম্বতলে কৃষ্ণ বাঁশী বাজান। সেই বাঁশীর সুরে পাষাণ গলে যায়, যমুনা উজানে বয়। শুধু রাধা নয়, বিগলিত দুকুলা গোপীরাও রাধার কাছে এসে বলে 'জর জর ভৈ গেল গাত।' এই গোপীরা ভাগবতের গোপীর অনুরূপ। এদের রায়-বসন্ত পদের মাঝখানে সখী বললেও চৈতন্য পরবর্তী সখীর বৈশিষ্ট্য এঁদের নেই। কারণ চৈতন্য পরবর্তী সখীরা, কৃষ্ণের সাথে নিজের সম্ভোগ চান না। যুগলের লীলা-সহিয়িকা হতে চান (পৃ. ৬৯৯)। কবি একটি পদে রাধার পূর্বরাগের 'তানব' নামক চতুর্থ দশার চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। শ্রীরূপ বলেছেন—'তানবং কৃশতা গাত্রে দৌর্বল্যভ্রমণাদিকৃৎ'—[১০১] অর্থাৎ শরীরের কৃশতা তানব। এর বর্ণনা দিতে গিয়ে রায় বসন্ত বলেছেন—

পিয়া পরসঙ্গ রঙ্গ রূপ কহইতে
অতি আকুল ধনি ভেলা।
জনু কুহু পক্ষ পরশে কলানিধি
মলিন খীণ ভই গেলা ॥ (পৃ. ৬৯৯)

এই পদটির উপমা স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যাপতির 'তনু ভেল কুহু শশি ক্ষীণা'র কথা মনে করিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে কবি বিদ্যাপতির দ্বারা প্রভাবিত। 'তানব' দশার স্থানে অনেক 'বিলাপ' পাঠ করেন। সেই বিলাপের বর্ণনাও পদটিতে রয়েছে—

ভাব হার উর কম্পিত কলেবর
লোচনে লোর তরঙ্গে ॥

তানবের উদাহরণ দিতে গিয়ে শ্রীরূপ বলেছেন—

চ্যুতে বলয়সঞ্চয়ে প্রবলরিক্ততাদূষণ

রায়বসন্ত বলেছেন রাধার—,

শিথিল বলয়া কর তরলিত কঙ্কন
বসন না সম্বরে অঙ্গে।

গোস্বামী প্রভাবিত কৃষ্ণকথার একটি চমৎকার নিদর্শন এই পদটি।

রাধার এই অবস্থা দেখে সখী রাধাকে সান্ত্বনা দিয়ে চিত্ত স্থির করার অনুরোধ করলেন এবং কৃষ্ণের সাথে রাধার মিলন ঘটিয়ে দেওয়ারও আশ্বাস দিলেন। সখী কর্তৃক সুসজ্জিতা রাধা অভিসারে চললেন। এই নিখুঁত সাজসজ্জা কিন্তু অভিসারিকা রাধার সুতীব্র আর্তিকে প্রকাশ করে না।

কবির মিলনের পদগুলিও বিশেষত্ববর্জিত। 'নাগর বিলসই গোপীসমাজ'—পদটি স্পষ্টভাবেই জয়দেবের—'হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে' প্রমুখ প্রথম সর্গের গীতটির অনুকরণ। নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের শব্দ ও অলংকার সহযোগে উতরোল উচ্ছ্বসিত রাসনৃত্যের বর্ণনাও কবি দিয়েছেন। এখানে মৃদঙ্গ, ডম্ফ, রবাব, বীণা মুরলী, উপাঙ্গ প্রভৃতির সাথে বলয়, নূপুর, কিঙ্কিণী ও ঘুঙুরের ঐকতান শব্দসঙ্গীত রচনা করেছে। কৃষ্ণকে কবি বলেছেন 'রসিক কলাগুরু'। কৃষ্ণের এই বিশেষণ দেখে মনে হয় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বাদ দিলেও এখানে রাসনৃত্য কেবলমাত্র আদিরসের আবেগ-প্রকাশ নয়, পরিশীলিত কলা চর্চাও বটে। যুগলমিলনের পদে রাধাকৃষ্ণের সেবানিরতা সখীদের বর্ণনা রয়েছে। রতন সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণ এসে বসলে, কেউ বীজন করতে লাগলেন, কেউ জল দিলেন, আবার কেউ বা জল দিয়ে পা ধুয়ে দিলেন, কেউ রাধাকৃষ্ণের মৃদু অঙ্গমর্দন করে শ্রম অপনোদিত করলেন। কৃষ্ণ পানভোজন করার পর সখীদের সঙ্গে রাধা কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করলেন। এরপর তাম্বুল নিয়ে রাধাকৃষ্ণ শয্যায় বসলেন। অষ্টকালীয় লীলার এটি একটি চমৎকার অংশ (পৃ. ৭০৩)। প্রাতঃকালে কুঞ্জভঙ্গের পর রাধাকৃষ্ণের বিদায়কালীন দৃশ্য বর্ণনায় কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমগভীরতাকে চমৎকার ভাষারূপ দিয়েছেন। বিদায় নেওয়ার আগে রাধা কৃষ্ণের হাসিমুখ দেখে যেতে চান। আর কৃষ্ণ রাধাকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন আর বিদায়ের প্রসঙ্গ না তোলেন। বিচ্ছেদের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ শিবের অর্ধনারীশ্বরমূর্তি ধারণের তাৎপর্য অনুধাবন করেন। কারণ—

তুহুঁ (রাধা) হাম তনু ভীন শ্রবণে জীবন খীন
কেমনে ধরিব আমি বুক। (পৃ. ৭০৪)

পলকপাতের যে অদর্শন, তাতেই কৃষ্ণের রাধাকে দেখার তৃষ্ণা আরও বেড়ে যায়। তিনি বলেন—

পরাণ কেমন করে মরম কহিলুঁ তোরে
জীবন নিছনিতুয়া পাশ ॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণের এই আর্তিময় গভীর প্রেম চৈতন্য পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, কৃষ্ণের এই আর্তিতে রাধাও তাঁর উদ্বেলিত হৃদয়াবেগকে দমন করতে পারেন না। তিনিও ব্যাকুল ভাবে বলে ওঠেন—

যাউক জঞ্জাল মরি তোমার বালাই লইয়া
মনে সাধ আর নাহি ভায় ॥ (ঐ)

এই কবির পদেও সখীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদায় নেওয়ার সময় প্রেমের প্রাবল্যে রাধাকৃষ্ণ যখন বাস্তব জগতের কথা ভুলে যান, তখন সখীরা এগিয়ে এসে বলে—

দারুণ নগরের লোক কিনা জান তুমি
ক্ষেণেক ধৈরজ ধর এ লালস ক্ষেমি ॥ (ঐ)

কিন্তু বিদায় নিতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেম নিবেদনের ব্যাকুলতা আরও বেড়ে যায়। রাধা বলেন—

তোমা বিনে মন করে উচাটন
কে জানে কেমন তুমি ॥

এই ব্যাকুল আত্মনিবেদন, বিদায় নিতে গিয়েও আবার ফিরে ফিরে তাকানো, রভস-নিবিড় সান্নিধ্যের শেষেও প্রেম রহস্যের অতলান্ত থেকে রাধার হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা মরমী প্রশ্ন 'কে জানে কেমন তুমি' বিদ্যাপতির রাধার সেই ব্যাকুল প্রশ্নকেই মনে করিয়ে দেয় 'তুহুঁ কৈছে মাধব, কহ তুহুঁ মোয়।' ঈশ্বরের অপার অনির্দেশ্য রহস্য অথবা প্রেমিকের সীমাহীন আকর্ষণ, যে ভাবেই ব্যাখ্যা করি না কেন, এই ব্যাকুল প্রশ্ন অন্তরের অকৃত্রিম ভাবপ্রবাহের উৎস থেকে নির্গত। আর কৃষ্ণ বলেন—

তোমার মিলন মোর পুণ্যপুঞ্জরাশি।
না দেখিলে নিমিখে শতেক যুগ বাসি ॥
* * * * * *
আনন্দমন্দির তুমি জ্ঞান শকতি।
বাঞ্ছাকল্পলতা মোর কামনামুরতি ॥ (পৃ. ৭০৫)

প্রেম প্রকাশের এই ভাষা শুধু গভীরই নয়, যেন ধূপপুষ্পসুবাসিত পবিত্র পূজা নিবেদন। সারা বৈষ্ণবসাহিত্যমন্থন করলেও এই পদরত্নের তুলনা কমই পাওয়া যাবে। কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশে এই পদটিই আমাদের দেখিয়ে দেয়, হ্লাদিনী শক্তির সারবিগ্রহ রাধা-প্রেমের চরম সমুন্নতি। প্রমাণ করে দেয় আধ্যাত্মিকতাকে, একটি বিশিষ্ট ধর্ম দর্শনকে পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করেও জীবন রহস্যের গভীরে অবগাহন করা যায়। রবীন্দ্রকাব্যের সেই পংক্তি—'আমার মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা'য় যা প্রকাশিত, বৈষ্ণব কবির 'কামনামুরতি' যেন তারই সংহততর প্রকাশ। কৃষ্ণের এই প্রেমনিবেদনের পর শেষ পর্যন্ত সমস্ত সংস্কার ও বাধাকে ঠেলে রাধা স্বজনসংসার পরিত্যাগ করে বলে ওঠেন—

না যাইব ঘরে বন্ধু রহিব কাননে।

এই সোচ্চার সংকল্পের বাণী চৈতন্য পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যের রাধারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

রায়শেখর

রায়শেখর শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন। যদুনাথ দাসের লেখা 'সংগ্রহ তোষণী' গ্রন্থে রায়শেখরের উল্লেখ আছে। কবি হিসেব এঁর প্রতিভা উচ্চস্তরের ছিল। ব্রজবুলি ভাষায় কতগুলি বিখ্যাত পদ কখনও শেখরের ভণিতায়, আবার কখনও বা বিদ্যাপতির ভণিতায় চলে। রায়শেখরের কবিত্ব শক্তির এটিও একটি প্রমাণ। তবে তাঁর সব পদগুলি একই ধরনের উৎকর্ষ দাবী করতে পারে না।

রায়শেখরের পদে শ্রীরাধার প্রথম অনুরাগ জন্মেছে চিত্রপটদর্শনে। চিত্রপটে কৃষ্ণের রূপ দেখে রাধা বলেছেন—

রহ রহ সখি ভালো করে দেখি
আঁখি না পিছলে মোর ॥ (পৃ. ৩১৯)

এখানে রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রভাব পড়েছে। প্রথম অঙ্কের একেবারে শেষের দিকে সখী বিশাখা কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে ব্যাকুলা রাধাকে আশ্বস্ত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট প্রসঙ্গ এনেছেন। চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখে রাধা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে ললিতা রাধাকে কোলে ধরেন। রাধা এতখানি ব্যাকুল হয়ে পড়েন যে, তিনি ললিতার পায়ে ধরে শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন। কৃষ্ণকে সাক্ষাতে দেখে রাধার ব্যাকুলতা আরও বেড়ে যায়। রায়শেখরের পদে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ সঞ্চারের পরিবেশটি বড় সুন্দর এবং অভিনব। প্রভাতে সুগন্ধি তেল আর হলুদ নিয়ে সখীজন পরিবৃতা রাধা স্নানে চলেছেন। কৃষ্ণ সেই সময়েই প্রভাতকালীন গোষ্ঠ যাত্রায় বেরিয়েছেন গাভীদল নিয়ে। রাধাকে দেখে তিনি এতই বিভোর হয়ে পড়লেন যে, দোহনের ছাঁদন দড়ি হাত থেকে পড়ে গেল। প্রথম প্রেম জাগরণের এই পটভূমিটি শুধু অভিনবই নয়, বাস্তব সম্মতও বটে (পৃ. ৩২০)।

সখী-শিক্ষার পদগুলি গতানুগতিক। শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাও বিশেষত্ব বর্জিত। রায়শেখর বর্ষাভিসার, হিমাভিসার, জোৎস্নাভিসার ও দিবাভিসারের পদ রচনা করেছেন। দিবাভিসারের পদে রাধা দেবপূজার ছলে অভিসার করেছেন। এটিও শ্রীরূপের বিদগ্ধ-মাধব নাটকের অনুসৃতি। শ্রীরাধিকার স্বপ্নদর্শনের পদ ইতিপূর্বে আমরা বসু রামানন্দ ও জ্ঞানদাসের আলোচনায় পেয়েছি। রায়শেখরের এই পর্যায়ের পদে সেই মোহমদির পরিবেশ এবং রাধার আবেশ সার্থকভাবে ফুটে ওঠে নি। তবে রায়শেখরের রাধার স্বপ্ন সম্ভবতঃ স্বপ্ন নয়, কারণ রাধা বলেছেন—

ভাল রীতে তার না দেখিলুঁ আর
ননদী হইল কাল ॥ (পৃ. ৩২৩)

অন্য একটি পদেও রাধা বলেছেন, কৃষ্ণ অলক্ষ্যে এসে অলক্ষ্যেই চলে গেলেন। রাধার মনোরথ পূর্ণ হল না। সকাল বেলায় গুরুজনেরা জেগে উঠলেন। অঙ্গনে কৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন, গুরুজনের ভয়ে রাধা তা মুছে দিতে চান, কিন্তু প্রেমবশে পারেন না। বরং—

যে পথে রাতি চলল রতিচোর।
সে পথে মনোরথ গেলহি মোর ॥ (পৃ. ৩২৩)

শ্রীরাধার রসোদ্গারের পদে কৃষ্ণের প্রেম আধুনিক রোমান্টিকতাকেও হার মানিয়েছে। কৃষ্ণের ভালবাসায় বিমুগ্ধ রাধা স্বীকার করতে বাধ্য হন—'সেই পিরিতি পিয়া সে জানে'। রাধা যে ঘাটে স্নান করেন, তার পাশের ঘাটে কৃষ্ণ আসেন রাধার অঙ্গজলের স্পর্শ পাওয়ার আশায়। শুধু তাই নয়—

বসনে বসন লাগিবে বলিয়া
একই রজকে দেয়। (পৃ. ৩২৪)

গোটা পদটিতে প্রেমের যে সূক্ষ্ম মাধুর্য ছড়িয়ে আছে, তা রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের 'এক গাঁয়ে' কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়।

রায়শেখর শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গার নিয়ে পদরচনা করেছেন। বিষয়টি পদাবলীতে খুব একটা বেশী দেখা যায় না। কথাবস্তুতেও একটু বৈচিত্র্য রয়েছে। প্রাতঃকালে গাভী দোহনের পর কৃষ্ণ সুবলের সঙ্গে নিভৃত স্থানে গেলে কৌতূহলী সুবল গতরাত্রির মিলনের সুখময় অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ বলেন, তাঁরই জন্য রাধা বেশ-ভূষা করেন, অথচ তাঁকে দেখে শরীর ঢেকে ফেলেন, শৃঙ্গারোৎসুকা হয়েও স্পর্শ মাত্রেই কেঁপে ওঠেন। রাধা শত্রুর মত কৃষ্ণকে গঞ্জনা দেন, আবার পর মুহূর্তেই মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন। অন্তরে প্রাণের অধিক ভালবাসলেও, বাইরে খুব উদাসভাব দেখান। রাধার এই বিপরীত প্রবণতায় হতবুদ্ধি কৃষ্ণ সখার কাছে শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করেন—

সকল কাজ হাম বুঝলুঁ বুঝায়লুঁ
না বুঝলুঁ অন্তর নারী ॥ (পৃ ৩২৪)

চিরন্তনকালের নারী সম্পর্কে পুরুষের সাধারণ অভিজ্ঞতারই ভাষারূপ এটি। পদাবলী সাহিত্যে রাধার এই বিপরীত প্রবণতার পরিচয় পাওয়া গেলেও কৃষ্ণের মুখ দিয়ে তা এমন করে বলানো হয় নি।

রায়শেখর যথারীতি উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা ও খণ্ডিতা নায়িকার বর্ণনা দিয়েছেন। খণ্ডিতা নায়িকার মানভঞ্জনের জন্য কৃষ্ণ শিবপূজার কথা বলেছেন। কিন্তু তাতেও রাধার অভিমান অটল। রাধার এই অবস্থা দেখে সকালবেলায় বৃন্দাঠাকুরাণী ললিতার গৃহে এসে সব কথা বললেন। সজল চোখে মলিন মুখে রাধা যেখানে বসেছিলেন, ললিতা সেখানে গিয়ে তাঁকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে অঞ্চলে চোখের জল মুছে দেন। মায়ের মত স্নেহময়ী সমব্যথিনী এই সখীকে আমরা এর আগে জ্ঞানদাসের পদে দেখেছি। এরপর ললিতা বহুবল্লভ কৃষ্ণের দোষ ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করেছেন (পৃ. ৩২৬)। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং এসে শ্রীরাধার মানভঞ্জনের জন্য পদধারণ করলেও রাধার মানভঙ্গ হয় না। কৃষ্ণ সাপে কাটার ভাণ করে মাটিতে কপট ভাবে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। রাধা তাড়াতাড়ি গিয়ে কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলেন। কৃষ্ণ উঠে বসে রাধার মুখ মুছে দিয়ে চুম্বন করলেন। এইভাবে রাধার মানভঙ্গ হল (ঐ)। শ্রীকৃষ্ণের এই বুদ্ধিপূর্বক মান-ভঞ্জন উজ্জ্বলনীলমণির প্রভাবজাত। নায়িকার সহেতুক মানোপশমের পাঁচটি উপায়ের মধ্যে সর্বশেষ উপায় রসান্তর। রসান্তর দুভাগে বিভক্ত—(১) যাদৃচ্ছিক (২) বুদ্ধিপূর্বক। শ্রীরূপ বুদ্ধিপূর্বক সম্বন্ধে বলেছেন—'বুদ্ধি পূর্বন্তু কান্তেন প্রত্যুৎপন্নধিয়া কৃতং'। প্রত্যুৎপন্নমতি কান্তের দ্বারা যা করা হয় তাই-ই বুদ্ধিপূর্বক। শ্রীরূপ এর উদাহরণ দিতে গিয়ে কৃষ্ণের হাতে কীটদংশনের ছল করার কথা বলেছেন। এরই প্রভাবে রায়শেখরের উপরোক্ত পদটি রচিত। আর একটি পদে মানিনী রাধা অবনত মুখে, বিগলিত চিকুরে বসে মুক্তার মালা গাঁথছিলেন। কৃষ্ণ নূপুর ত্যাগ করে ধীরে ধীরে রাধার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সখীদের তিনি মাথার দিব্যি দিয়ে রেখেছেন, যেন তাঁরা কোন কথা না বলেন। তারপর যেই রাধা মৃগমদ ও চন্দনের গন্ধ পেয়ে মুখ ফিরিয়েছেন, অমনি কৃষ্ণ তাঁর মুখে চুম্বন করেছেন (পৃ. ৩৩১)। কথাবস্তুর দিক দিয়ে মানভঞ্জনের

এই পদটিরও অভিনবত্ব রয়েছে। এই কবি শ্রীকৃষ্ণের অহেতুক মানের একটি পদও রচনা করেছেন। এটিও কৃষ্ণকথায় অভিনব। নারী বেশ ধারণ করে রাধার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের গমন ও রাধার সংগে মিলনের বিষয়বস্তু নিয়ে এই কবিও পদ রচনা করেছেন।

. আক্ষেপানুরাগের পদে রাধা বড়ই লোকনিন্দাকাতরা। একদিন রাধা স্নান করতে যাওয়ার সময় কৃষ্ণ তাঁর আঁচল ধরেছিলেন। সঙ্গে যে দুচারজন সখী ছিল, তারা তো হেসেই আকুল। গুপ্ত প্রেম ব্যক্ত হওয়ার এই লজ্জায় রাধা কি করে মুখ দেখাবেন, তাই-ই ভেবে পান না (পৃ. ৩৩১)।

কৃষ্ণকে গোষ্ঠে যেতে দেখে রাধা প্রেমভরে কাঁপতে থাকেন। রাধার অবস্থা দেখে বিশাখা এসে তাঁকে কোলে করেন, আর জটিলাও ছুটে আসে। বিশাখা বলেন, হলধরের ছোটভাই এই রোগ সারাবার মন্ত্র জানে। জটিলা কৃষ্ণের পায়ে ধরে নিয়ে আসে। কৃষ্ণ এসে অঙ্গ স্পর্শ করতেই রাধার বিরহজ্বর ঘুচে যায়। কৃষ্ণ যাওয়ার সময় জটিলাকে বলে যান—

যখন তোমার বধূরে এমতি হইব।
তখনি বলিহ মোরে ভাল করি যাব ॥ (পৃ. ৩৩৩)

এই সমাপ্তিটুকু উপভোগ্যভাবে কৌতুকরস স্নিগ্ধ। কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার বেশীর ভাগ পদই গোষ্ঠলীলাকে পটভূমিতে রেখে মধুর রসেরই উৎসারণ। গোষ্ঠে গিয়ে কৃষ্ণ বাঁশী বাজান। সেই বংশীধ্বনিতে কুলকামিনীরা তো বটেই, পঞ্চানন, চতুরানন, নারদ ও ইন্দ্র মোহিত হন। এটিও রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের প্রথম অংক থেকে গৃহীত। সেখানেও কৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনি শুনে আকাশে ব্রহ্মা, নারদ, শিব ও ইন্দ্র এসে ভীড় করেছেন। উত্তরগোষ্ঠের পদে রাধার কৃষ্ণ প্রেমের মধ্যে কামনার ব্যাকুলতা নয়, মমতাসিক্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণ আসবেন বলে সূর্যাস্তের সময় যমুনায় জল আনতে গিয়ে রাধা পথে দাঁড়িয়ে থাকেন। সবার পেছনে, সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত কৃষ্ণকে দেখে রাধা বলেন—

হের আইস মুছাই মুখ
ঘুচুক হে মনের দুখ
যাকু জাতি তোমার বালাই লৈয়া ॥ (পৃ. ৩৩৫)

রাধার এই উক্তিতে প্রেমের স্নিগ্ধোজ্জল দীপ্তিটুকুই বিচ্ছুরিত, কামনার উত্তাপ নয়।

কৃষ্ণকথায় গোপীগোষ্ঠ সম্ভবতঃ রায়শেখরের নিজস্ব সৃষ্টি। রাধা, কৃষ্ণের বংশী ধ্বনি শ্রবণে বিরহ জ্বালায় অস্থির হয়ে ওঠেন। তাঁর সেই অবস্থা দেখে ললিতা ও বিশাখা, নিজেরাই রাখালবেশ ধারণ করে গোষ্ঠে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। কেউ দাম কেউ শ্রীদাম, আবার কেউ বা সুদাম সাজেন। ললিতাকে সাজানো হয় বলাই। বিশাখা সুবল সাজেন এবং ইন্দুমুখী রাধাকেই কৃষ্ণ সাজাতে বলেন।

রায়শেখরের দানলীলার পদগুলির কথাবস্তুতে কবির কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নি। পূর্ববর্তী কবিদের রাধার মত ইনিও কৃষ্ণের কালো রূপকে গঞ্জনা দিয়েছেন। কৃষ্ণও রাধার সৌন্দর্যের প্রশংসা করে তাঁর স্বামীর নিন্দা করেছেন। এতে রাধা আত্মহত্যা করতে চান। অবশেষে উভয়ের মিলন হয়।

নৌকাবিলাসের পদও গতানুগতিক। তবে এখানে গোপিনীরা ভীত অথবা অনিচ্ছুক নন। নৌকা বাওয়ার কাজও কৃষ্ণকে করতে হয়। তিনি ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় রাধার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আর নবীনা গোপিনীরা হাতে কেরোয়াল নিয়ে তরণী বাইতে থাকে (পৃ. ৩৩৫)।

ভাবী, ভবন্ ও ভূত বিরহ বর্ণনায় কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কৃষ্ণ রাধাকে ছেড়ে মথুরায় চলে যাবেন, তাই রাধা কাছে এলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে তিনি রাধার দিকে তাকিয়ে থাকেন। রাধাকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য কৃষ্ণের এই নীরব বেদনাও রায়-শেখরের বিশেষত্ব (পৃ. ৩৩৭)। কৃষ্ণের যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ। নবচূতপল্লবে আর ঘট-বারিতে মাঙ্গলিক করা হয়েছে। সেই সময়ে 'মুখ হেরি পিয়া মোর মাগয়ে মেলানি'। রাধার এই উক্তিতে বিরহের তীব্রতা যেন স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। ভূত বিরহে কদম্বফুল দেখে রাধার মনে পড়ে যায় কৃষ্ণের কথা। তিনি মথুরাপুরীতে যাওয়ার জন্য লোক খোঁজেন, যে কৃষ্ণের কাছে তাঁর সংবাদ নিয়ে যাবে (ঐ)। অবশেষে বিরহের দশমী দশায় উপনীতা রাধা সখীকে বলেন, তাঁর মৃত্যুর পর কৃষ্ণ যেন ব্রজপুরে আসেন, রাধার মিনতি ও অনুরোধ বড় করুণ ও মর্মস্পর্শী। তিনি সখীকে নির্দেশ দেন, নিকুঞ্জে রাধার হার থাকল, এই হার যেন কৃষ্ণ একবার গলায় পরেন। তাঁর পোষা রঙ্গিণী হরিণীটিকে যেন কৃষ্ণ রাধার কথা জিজ্ঞাসা করেন (পৃ. ৩৩৮)। রাধার দূতী মথুরায় গিয়ে কুব্জাসঙ্গসুখে বাসকারী কৃষ্ণকে তীব্র ব্যঙ্গ করে রাধার অবস্থার কথা জানালেন। তারই সঙ্গে কৃষ্ণের বিরহে সারা বৃন্দাবনের অবস্থাও বর্ণনা করলেন। বিশাখা বিষ পান করে মাটিতে লুটাচ্ছেন, ললিতা গিয়ে তাঁকে ধরেছেন। পিতা নন্দ আজ নিরানন্দ। মা যশোদা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মাথায় করাঘাত করছেন। ব্রজ বালকেরা, শ্রীদাম ও মধুমঙ্গল, সবাই ক্রন্দনরত। সবৎসা গাভীদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, তারাও অন্নজল ত্যাগ করেছে। এমন কি বৃন্দাবনের তরুলতাও শোকস্তব্ধ। তাই নবীন কিশলয় আর জন্মাচ্ছে না। গোকুলের এই দুঃখ বর্ণনা কৃষ্ণের চিত্তকেও ব্যথিত করে তুলল। বৃন্দাবনের সুখস্মৃতিতে, আর রাধার প্রেমের কথা স্মরণ করে কৃষ্ণের চোখ দিয়ে অনর্গল জল ঝরে পড়তে লাগল (পৃ. ৩৩৯)।

অষ্টকালীয় লীলা, রায়শেখরের পদাবলীর বৃহৎ অংশ অধিকার করে আছে। এই লীলাবর্ণনায় কবি গোবিন্দ লীলামৃতকে প্রায় বিশ্বস্ত ভাবেই অনুসরণ করেছেন। পৌর্ণমাসী, জরতী, রঙ্গলতা, কুন্দলতা প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণ লীলা সহায়ক চরিত্রও এখানে সবাই উপস্থিত। রাধার প্রতি যশোদার অকৃত্রিম স্নেহ এবং রাধাকে বধূরূপে না পাওয়ার জন্য যশোদার ক্ষোভ, বড় আন্তরিকভাবেই ব্যক্ত হয়েছে—

তোমা হেন গুণনিধি আমারে না দিল বিধি
হৃদয়ে রহিয়া গেল সাধা ॥
ধাতার মাথায় বাজ যেন হেন করে কাজ
আমাতে ভাঙিল কোন দোষে (পৃ. ৩৫০)।

রায়শেখরের নিত্যলীলার পদে রাধার শুধু শাশুড়ী এবং ননদই নয়, দেবরও রয়েছে।

এদের সবার বিরুদ্ধতায় রাধার পারিবারিক জীবন কণ্টকিত। শুধু তাই নয়, রাধা পতিপ্রেমবঞ্চিতাও বটে—

সোয়ামি সোহাগে কভু না ডাকিল মোরে।
নিশ্বাস ছাড়িতে নারি দেওরের ডরে ॥ (পৃ. ৩৫৩)

স্বামীসোহাগবঞ্চিতা এই রাধাকে আমরা এর আগে দেখি নি। জ্ঞানদাসের রাধার মধ্যে বরং এর বিপরীত প্রবণতাই রয়েছে। সেখানে রাধাই স্বামীর আন্তরিক প্রেমকে উপেক্ষা করেন, একমাত্র কৃষ্ণের প্রেমের প্রতি তাঁর আকর্ষণ। সব মিলিয়ে বলা যায়, রায়শেখরের পদে বৈষ্ণবধর্মতত্ত্ব ও গোস্বামীদের রচনার প্রভাব থাকলেও বাস্তব জগতের মানবিক প্রেমের বিচিত্র ও সূক্ষ্ম তরঙ্গভঙ্গ তার সুস্বাদ নিয়ে ধরা দেয়।

বল্লভ দাস

নরোত্তমের আর এক কবি-শিষ্য বল্লভ দাস। ইনি শ্রীনিবাস, নরোত্তম, রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাস কবিরাজের তিরোধানের পরও বেঁচেছিলেন বলে একটি পদে খেদ প্রকাশ করেছেন।

বল্লভদাসের পদে শ্রীরাধার নয়, রাধাবিরহে শ্রীকৃষ্ণেরই নবমী দশা বর্ণিত হয়েছে (পৃ. ৭১৯)। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয়—রাধা কেবলমাত্র কৃষ্ণের জন্য অভিসারে যান নি, এঁর পদে কৃষ্ণও রাধার জন্য অভিসারে গেছেন। অভিসারে যাওয়ার ব্যগ্রতা বশতঃ তিনিও বিপরীত বেশভূষায় নিজেকে সজ্জিত করেছেন (ঐ)। এঁর ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদে স্পষ্টতঃই গোবিন্দদাস কবিরাজের প্রভাব পড়েছে।

বল্লভের একটি পদে শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণির একটি সুন্দর প্রসঙ্গের প্রভাব পড়েছে। শ্রীরূপ নির্হেতু মানের উপশমের উপায় বলতে গিয়ে বলেছেন—

দেশকালবলেনৈব মুরলী শ্রবণেন চ।
বিনাপ্যুপায়ং কব্রপ্যেষ লীয়তে ব্রজ সুভ্রুবাং ॥ (১০২)

অর্থাৎ দেশ, কাল বা মুরলীর শব্দেও ব্রজসুন্দরীদের নির্হেতু মানের উপশম ঘটে। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণের একটু আভাস বল্লভের একটি পদে রয়েছে। কৃষ্ণের দূতী রাধাকে মধুর কালের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে—

কিসের লাগিয়া রাই হইলা মানিনী।
ভাগ্যে মিলয়ে হেন মধুর যামিনী ॥ (পৃ. ৭২১)

শেষ পর্যন্ত এই উপায়েই রাধার মানের উপশম ঘটেছে। শ্রীরাধার প্রেমবৈচিত্ত্য বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে কবি কৃষ্ণেরও প্রেমবৈচিত্ত্য বর্ণনা করেছেন—

রাইক কোরে চমকি হরি বোলত
কব হব তাকর সঙ্গ ॥ (ঐ)

এ ছাড়াও সমকালের সামান্য আগে-পরে শ্রীনিবাস নরোত্তমের আরও কয়েকজন কবি-শিষ্যকে পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে অন্যতম গোবিন্দদাস কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহ।

মাথুরের পদে কবি রাধার তীব্র বেদনাকে মর্মস্পর্শী ভাষায় রূপ দিয়েছেন—'শুকাইল আঁখি মোর হিয়ার অনলে'। শ্রীনিবাসের পুত্র গতিগোবিন্দ মাথুরের পদে বিরহের চতুর্থ দশা তানব অর্থাৎ কৃশতাকে অবলম্বন করে পদরচনা করেছেন। রামচন্দ্র কবিরাজ-রচিত কৃষ্ণের বাল্যলীলার পদ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির অনুসরণে তিনি সখীশিক্ষার পদও রচনা করেছেন ॥

॥ ২ ॥

ষোড়শ শতাব্দীর ভাবগত-অনুসারী কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য

ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য আলোচনা করার পর আমরা এই কালপরিধির কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাহিনী কাব্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করব। চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে আমরা রাধা-কৃষ্ণলীলাকথা নিয়ে অবাংলা ভাষায় রচিত অথচ বাংলা ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্য পেয়েছি জয়দেবের গীতগোবিন্দ। পৌরাণিক দেব-মহিমাকে স্বীকৃতি জানিয়েও সেখানে প্রবল হয়ে উঠেছে সর্বজনানুগ কাব্যরচনার প্রবণতা। তাই হরিবংশ ও ভাগবত-বহির্ভূতা রাধাই সেখানে কাব্যনায়িকা। পঞ্চদশ শতাব্দীর বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও সেই একই ঘটনা ঘটেছে। পৌরাণিক কৃষ্ণের মহিমা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অনুপস্থিত নয়, কিন্তু বড় হয়ে উঠেছে লোকরুচির অনুগামিতা। তবে দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেবের অন্যতম লক্ষ্য ছিল সর্বভারতীয় সমাজে বিষ্ণু-কৃষ্ণ-আশ্রিত ভক্তিধর্মের পুনরায় উদ্বোধন ঘটানো। তাই লোক সমাজে প্রচলিত টুকরো রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা, যা কেবল অশ্লীল আদিরসই পরিবেশন করত, তা তাঁর হাতে ভক্তিরসনিষ্ণাত হয়ে উঠেছে। সেই কেলিকথার নায়ককে তিনি নিজে প্রণাম করেছেন। অন্য সবাইকে দিয়েও প্রণাম করিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকার সেই রাধাকৃষ্ণপ্রেম-কথাকে নিয়ে কাব্যরচনা করলেও, অন্যকে দিয়ে প্রণাম করানো তো দূরের কথা, নিজেও এই দেবতার চরণে প্রণিপাত করেন নি। এরই পাশাপাশি মালাধর বসুর ভাগবত অনুবাদে আর একটি পৃথক ধারা লক্ষ্য করা যায়। তিনি লোকায়ত রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা নয়, ভাগবতীয় ভক্তিধর্মকে বাঙালী পাঠক সমাজে বিস্তৃত করার জন্য ভাগবতের অনুবাদ করেছেন। এইকাল এবং ষোড়শ শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গলকারদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। রাধাকৃষ্ণপ্রেম আধ্যাত্মিক অনুভূতির কোন্ সমুচ্চস্তর স্পর্শ করতে পারে—তা তিনি নিজের দিব্য জীবন দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন। ফলে পদাবলী সাহিত্যই শুধু চৈতন্যদেবের প্রভাবে প্রভাবিত হল না, তারই সঙ্গে একদিকে ভাগবতের অনুবাদ হতে থাকল, আর লৌকিক রাধাকৃষ্ণপ্রেমকথা নিয়ে রচিত হতে লাগল কৃষ্ণলীলার কাব্য। চৈতন্যদেব নিজেই গদাধর, বক্রেশ্বর, দেবানন্দ পণ্ডিত প্রমুখকে ভাগবত অনুশীলনে প্রত্যক্ষ প্রেরণা দিয়েছিলেন। তারই ধারাস্রোত পরবর্তীকালে ভাগবত অনুবাদে বিস্তৃত হল এবং চৈতন্যের প্রভাবে এখানে রাধার প্রসঙ্গও প্রবল হয়ে উঠল। আর কৃষ্ণলীলা কাব্যগুলি একদিকে লৌকিক আখ্যান আর অন্যদিকে ভাগবত ও ষড়্-গোস্বামী রচিত কাব্য নাটক দর্শন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে একটি প্রবাহিত ধারায়

রূপ নিল। চলার পথে সে যতই পরিণামমুখী হয়েছে ততই তীরবর্তী লোকালয়ের ছায়া তার ওপর গাঢ় হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গগুলির আলোচনাতে সেই ছায়ার গাঢ়তাই আমরা কখনও কখনও লক্ষ্য করবো।

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য

প্রাক্‌চৈতন্য যুগে মালাধর বসু একমাত্র ভাগবত অনুবাদক। আর চৈতন্যের কালে ভাগবত অনুবাদকদের মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' রচয়িতা রঘুনাথ ভাগবতাচার্য অগ্রগণ্য।

গ্রন্থের মধ্যে রঘুনাথ আত্মপরিচয় বিশেষভাবে কোথাও দেন নি। ভণিতায় বেশীর ভাগ সময়েই ব্যবহার করেছেন ভাগবতাচার্য উপাধি। মাঝে মাঝে দু এক জায়গায় নিজের রঘুপণ্ডিত নামটি ব্যবহার করেছেন।

চৈতন্যভাগবত থেকে জানা যায়, চৈতন্যদেব গৌড় থেকে পুরীধামে ফেরার সময় বরাহনগরে রঘুনাথ নামে এক বৈষ্ণব বিপ্রের ঘরে কিছু সময় ছিলেন। তাঁর মুখের ভাগবত পাঠ শুনে মহাপ্রভু নিজেই তাঁকে ভাগবতাচার্য উপাধি দেন। রঘুনাথ গদাধরের শিষ্য ছিলেন। সম্ভবতঃ চৈতন্যের দেখা পাওয়ার পরই তিনি ভাগবত অনুবাদের কাজ শুরু করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী সম্পর্কে বৈষ্ণব মহাজনদের সশ্রদ্ধ উক্তি রয়েছে। কবি কর্ণপুর তাঁর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় বলেছেন—

নির্মিত পুস্তিকা যেন কৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী।
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্ত বল্লভঃ [১০৩]

যদুনন্দন দাসের 'শাখানির্ণয়ামৃত' গ্রন্থে রয়েছে—

বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গপ্রিয় পাত্রকম্‌।
যেনাকারি মহাগ্রন্থো নাম্না প্রেমতরঙ্গিণী॥[১০৪]

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী অন্যান্য ভাগবত অনুবাদের মতই পয়ার ত্রিপদীতে লেখা কাব্য। বিষয়সূচী বিন্যাসে ও অনুবাদকর্মের পারিপাট্যে এই গ্রন্থে কবি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বারোটি স্কন্ধে তিনশো বত্রিশটি অধ্যায়ে আঠারো হাজার শ্লোক নিবদ্ধ ভাগবতের যথাযথ আক্ষরিক অনুবাদ সাধারণ মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা যে বেশ কঠিন হবে, তা বুঝেই রঘুনাথ ভাগবতকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করার সুপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তাই ভাগবতের প্রথম নয়টি স্কন্ধকে সংক্ষেপিত করে তিনি শুধু মর্মানুবাদই

করেছেন। ভাগবতের প্রথম নয়টি স্কন্ধকে তিনি কতটা সংক্ষেপিত করেছেন, তার তালিকা নীচে দেওয় যেতে পারে—

		ভাগবত	শ্রীকৃষ্ণপ্রেমেতরঙ্গিণী
প্রথম	স্কন্ধ	১৯ টি অধ্যায়	৫ টি অধ্যায়
দ্বিতীয়	স্কন্ধ	১০ টি অধ্যায়	২টি অধ্যায়
তৃতীয়	স্কন্ধ	৩৩ টি অধ্যায়	৯৹টি অধ্যায়
চতুর্থ	স্কন্ধ	৩১ টি অধ্যায়	৮ টি অধ্যায়
পঞ্চম	স্কন্ধ	২৬ টি অধ্যায়	৮ টি অধ্যায়
ষষ্ঠ	স্কন্ধ	১৯ টি অধ্যায়	৩ টি অধ্যায়
সপ্তম	স্কন্ধ	১৫ টি অধ্যায়	৫ টি অধ্যায়
অষ্টম	স্কন্ধ	২৪ টি অধ্যায়	৭ টি অধ্যায়
নবম	স্কন্ধ	২৪ টি অধ্যায়	৯ টি অধ্যায়

কিন্তু দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধের প্রতেকটি অধ্যায়েরই অনুবাদ কবি করেছেন। এই তিনটি স্কন্ধ অনুবাদে তিনি কঠোর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। পয়ার অনুবাদের পাশাপাশি ধারাবাহিক ভাবে মূল শ্লোকের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য প্রথম নয়টি স্কন্ধ কেবল মর্মানুবাদ হলেও এতে ভাগবতের মূল বক্তব্য অর্থাৎ জীবের ঐকান্তিক শ্রেয়, ভগবানের অবতার হওয়ার কারণ, বিভিন্ন ভক্ত, যেমন—ধ্রুব, মলয়ধ্বজ, ভারত ও অজামিল প্রভৃতির কাহিনী; ভক্তি ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব; সাধুসঙ্গের মহিমা এবং ভগবানের নামকীর্তনমহিমা, সবই যুক্ত হয়েছে। রঘুনাথ অনুবাদ করতে গিয়ে ভাগবতের মূল কাহিনীর কোন পরিবর্তন ঘটান নি। মালাধর ভাগবত ছাড়া বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ এবং অন্যান্য নানা স্থান থেকে উপাদনসংগ্রহ করে কৃষ্ণচরিত কাব্য প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু রঘুনাথ ভাগবত ছাড়া অন্য কোন আকর থেকে উপাদান সংগ্রহ করেন নি। এমনকি রাধাভাবদ্যুতিসুবলিততনু চৈতন্যের দৃষ্টান্ত সামনে থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কাব্যে রাসলীলা প্রসঙ্গে একবারই মাত্র রাধার নাম উচ্চারণ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধে রাসক্রীড়ায় গোপীদের অহংকার অভিমান দূর করার জন্য একজন প্রধানা গোপীকে নিয়ে কৃষ্ণ রাসমণ্ডল থেকে চলে গেছেন। ভাগবতে এই গোপীর নাম নেই। কেবলমাত্র গোপিনীরা বলেছে—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

এই 'আরাধিত' শব্দটিকে গ্রহণ করেই কবি 'রাধা' শব্দটি একবার মাত্র ব্যবহার করেছেন। 'মহাভাগবতে না কহিব অন্য কথা' এই প্রতিজ্ঞাটি তিনি এইভাবেই যথার্থতঃ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা দেখবো, এই শতাব্দীতেই ভাগবতের অন্যান্য অনুবাদকেরা দানলীলা ও নৌকালীলার লৌকিক প্রসঙ্গ এনেছেন, রাধা ও গোপীলীলা প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ভাগবতাচার্য তা করেন নি। ভাগবতের বারোটি স্কন্ধের মধ্যে গোপীপ্রসঙ্গ রয়েছে দশম স্কন্দের ২১, ২২, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৪৬, ও ৪৭ অধ্যায়ে। রঘুনাথ এই সমস্ত অধ্যায়ের যথাযথ অনুবাদই করেছেন।

ভাগবতের এই কাহিনী অনুবাদের বিশ্বস্ততার মাঝখানেই চৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যখন দেখি ষষ্ঠ স্কন্ধের অজামিল-উপাখ্যানের উপক্রমণিকারূপে মঙ্গলাচরণে কবি পদ্যাবলীর নামমাহাত্ম্যমূলক ২০ সংখ্যাক শ্লোক উদ্ধৃত করছেন। এটি চৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তিধর্মেরই নিদর্শন। এ ছাড়া চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ভাগবতের দশম স্কন্ধের অসামান্য গুরুত্ব বোঝানোর জন্য কবি এই স্কন্ধের প্রারম্ভে নতুনভাবে মঙ্গলাচরণ করেছেন।

এবার ভাগবতীয় কৃষ্ণকথার অনুবাদক হিসেবে রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কৃতিত্ব আলোচনা করা যেতে পারে। দশম স্কন্ধের কৃষ্ণ জন্মপ্রসঙ্গই ধরা যাক। ভাগবতের কবি কৃষ্ণের জন্মলগ্ন বর্ণনায় শান্ত সুন্দর স্নিগ্ধতার সঞ্চার করেছেন—

নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ।
দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকা বনরাজয়ঃ ॥
ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ।
অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত ॥
* * * * *
মুমুচুর্মুনয়ো দেবাঃ সুমনাংসি মুদান্বিতাঃ ॥
মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জুরনুসাগরম্ ॥
নিশীথে তম উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দনে।
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥[১০৫]

রঘুনাথের অনুবাদ—

নদনদী সরোবর বিমলিত জল
বিকসিত উতপল কুমুদ কমল ॥
খগ-ভৃঙ্গ নিনাদিত স্তবকিত বল।
সুললিত পুণ্যগন্ধ সুমন্দ পবন
শান্ত হৈয়া জ্বলিল দ্বিজের হুতাশন ॥
* * * *
সুরমুনিগণে করে পুষ্পবরিষণ
* * * *
মন্দ মন্দ জলধর ঘন গরজিত ॥
ভরা নিশি রজনী তিমির ঘোরতর।
হেনকালে জনম লভিলা গদাধর ॥
অন্তর্যামী ভগবান অচিন্ত্য প্রভাব।
দৈবকী উদরে আসি কৈলা আবির্ভাব ॥

মূলানুগত্য সত্ত্বেও মাঝে মাঝে ভাষাকে কবি নিজের মত করে ব্যবহার করেছেন। যেমন 'প্রসন্নসলিলা' তাঁর অনুবাদে 'বিমলিত জল' হয়ে বাংলা ভাষার প্রবহমানতাকে রক্ষা করেছে। আবার 'জলরুহশ্রিয়ঃ' শব্দকে বিস্তৃত করে তিনি করেছেন 'বিকসিত উতপল কুমুদ কমল'।

আবার কখনও কখনও ভাগবতের কাব্যসৌন্দর্য সুরভিত পদ থেকে কবি কেবলমাত্র ভক্তিরস আর কাহিনীটুকু ছেঁকে নিয়ে অনুবাদের যাথার্থ্যকে বজায় রাখতে চেয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে ভাগবতের দশম স্কন্ধে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীযুগল গীতের একাংশের তুলনা করা যেতে পারে—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্প ফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাং
প্রেমহৃষ্ট তনবো ববৃষুঃ স্ম ॥
দর্শনীয় তিলকো বনমালা
দিব্যগন্ধ তুলসী মধুমত্তৈঃ।
অলিকুলৈরলঘুগীতমভীষ্ট
মাদ্রিয়ন্ যর্হি সন্ধিতবেণুঃ ॥

এর অনুবাদ— সর্বভুতে বৈসে হরি প্রভু দয়াময়।
লতাবলী প্রকট করিল অতিশয় ॥
প্রেমভাবে পুলকিত মধুধারা বহে।
ভকতলক্ষণ ধরি তরুলতা রহে ॥
দিব্যগন্ধতুলসী, ললিত বনমালে।
অলিকুলে বেণুরব করে অনুকারে ॥

মূলের কাব্যসৌন্দর্য ও ধ্বনিমাধুর্য অনুবাদে কিছুই সঞ্চারিত হয় নি। কিন্তু কথা অংশ অবিকৃতভাবে পরিবেশিত হয়েছে। আবার কখনও কখনও তাঁর অনুবাদ কাহিনীকে অবিকৃত রেখেও মূল কাব্যের সৌন্দর্যের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে। ভাগবতে আছে—

চূতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাব্জ
মালানুপৃক্ত পরিধান বিচিত্রবেশৌ।
মধ্যে বিরেজতুরলং পশুপালগোষ্ঠ্যাং
রঙ্গে যথা নটবরৌ ক্ব চ গায়মানৌ ॥

রঘুনাথের অনুবাদ—

নবচূত পল্লব ময়ূরচন্দ্রিকা নব
উতপল কমলে রচিত।
আজানু কুসুম মালে মাঝে মাঝে শোভা করে
পরিধান বিচিত্র ভূষিত ॥
বলদেব দামোদর, দিব্য-বেশ মনোহর,
শোভে ব্রজবালকের মাঝে।
ভুবন মোহন লীলা খেলে নৃত্য গীত খেলা
রামকৃষ্ণ নটবর রাজে ॥

মালাধরের কাব্যের ভাষাভঙ্গী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কাছ ঘেঁষে গেছে, অন্যদিকে রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের অনুবাদে পাই বৈষ্ণব পদাবলীর সুরমূর্ছনা।

দেখা যাচ্ছে ভাগবতের কাহিনীর বিশ্বস্ত অনুবাদক হয়েও ভাগবতাচার্য এই কাব্যে তাঁর মৌলিক কবিপ্রতিভার পরিচয়ও রেখেছেন। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য কৃষ্ণকথার বিকাশ। সেই লক্ষ্যে এসে আমরা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনীর এই বিশ্বস্ততার বৈশিষ্ট্যটুকু লক্ষ্য করব। বিরল, আরও পরিষ্কারভাবে বললে একক এই অনুবাদটি কৃষ্ণকথার ধারায় একটি ব্যতিক্রম এইজন্য যে, তখন চতুর্দিকে পৌরাণিক কৃষ্ণকথার সঙ্গে লোকায়ত কৃষ্ণ কথার মিশ্রণ বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। স্বয়ং চৈতন্যদেব দানলীলা, নৌকালীলার গভীর অন্তরঙ্গ জীবনরসকে আধ্যাত্মিক মহিমায় মণ্ডিত করে গ্রহণ করেছেন। তার প্রমাণ চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদ্‌গণ কর্তৃক এর অভিনয়। কিন্তু এরই মাঝখানে রঘুনাথ চেষ্টা করেছেন বিশুদ্ধ ভাগবতীয় কৃষ্ণকথা প্রচারের এবং তারও উদ্দেশ্য লোকসাধারণের 'অশেষ দুরিত' হরণ। অর্থাৎ এর থেকে আমরা স্পষ্টতঃই এই সিদ্ধান্ত করতে পারি, লৌকিক কৃষ্ণকথার মধ্যে অনাবৃত গ্রাম্যতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার যে প্রবণতা, তাকে সব বৈষ্ণব মনেপ্রাণে সে দিনও গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু ধর্মই বলি, আর সাহিত্যই বলি, অথবা উভয়ের মিশ্রণে ধর্মীয় সাহিত্যই বলি, সবই তো মানুষের প্রয়োজনে। তাই বৈষ্ণব ধর্মের সর্বস্তরস্পর্শিতার সেই যুগে, ধর্মের সঙ্গে জীবনানুরক্তির অনিবার্য সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে বিমিশ্র কৃষ্ণকথা। তাকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন স্বয়ং মহাপ্রভু, তাকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন কৃষ্ণলীলাকাব্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ কবি। আর রঘুনাথ বিশ্বস্ত ভক্ত, সার্থক কবি এবং পরম পণ্ডিত হয়েও জনপ্রিয়তায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তাঁর অনুবাদকাব্য উত্তরপুরুষের অনুসরণে সার্থক হতে পারে নি। তাঁর কাব্য একটি বিচ্ছিন্ন নির্জন হ্রদ, যার পাশ দিয়ে বয়ে চলে গেছে পুরাণ ও লৌকিক কৃষ্ণকথার অবিরল স্রোতোধারা ; এবং আমরা সন্ধান পেয়ে যাই কৃষ্ণকথা ক্রমবিকাশের মূল সূত্রটি ॥

মাধবাচার্য

মাধবাচার্যের কিংবা অপরাপর অনুবাদকের ভাগবত-অনুবাদ রঘুনাথ আচার্যের সমধর্মী নয়, একথা আগেই বলেছি। মাধবাচার্যের কাব্যগ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল[১০৬]

বহুল জনপ্রিয়তায় এই গ্রন্থটি যে আদৃত হয়েছিল. তার প্রমাণ অন্যান্য বৈষ্ণব মনীষীর সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কবি দেবকীনন্দন মাধবাচার্যের বন্দনা করে বলেছেন—

মাধব আচার্য্য বন্দো কবিত্ব শীতল।
যাঁহার চরিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥ [১০৭]

চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

তবে ত বন্দনা কৈল মাধব আচার্য্য।
কৃষ্ণগুণবর্ণন সদাই যাঁর কার্য্য ॥
যে কৃষ্ণমঙ্গল কৈল ভাগবতামৃতে
যে গীত বিদিত হৈল সকল জগতে। [১০৮]

কিছু কিছু বৈষ্ণব গ্রন্থের সাক্ষ্যে এই মাধবাচার্যকে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতা বলা হয়েছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে অন্য গ্রন্থের সাক্ষ্য থেকেই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা মাধবাচার্য্যকে পৃথক্ ব্যক্তি বলে ধরে নিতে হয়।[১০৯] আবার এই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা দ্বিজমাধব ও চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা মাধব একই ব্যক্তি কিনা তা নিয়েও নানা বিতর্ক আছে। এ ব্যাপারে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতটি আমাদের কাছে গ্রহণ যোগ্য মনে হয়েছে[১১০] তাঁর মতে দ্বিজ মাধবের নামে প্রচলিত চণ্ডীমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল একই ব্যক্তির লেখা। আমরা দেখেছি শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলের বিভিন্ন মুদ্রিত সংস্করণ [১১১] ও পুথিতে এই দুটি ছত্র পাওয়া যায়—

পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার।
মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৭৭ সংখ্যক পুথিতেও এই দুটি ছত্র রয়েছে। সাহিত্য পরিষদকে প্রদত্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুথিতেও (পুথি সংখ্যা ১৯৫৯, লিপিকাল ১২০৪) পরাশরের প্রসঙ্গ আছে—

পরাসর নামেতে আছিল দ্বিজবর।
নানা গুণে পরিপূর্ণ তার কলেবর।
কবিবল্লভ বলি খ্যাতী হইল তাহার।
তাঁর দুই চরণে হইলুঁ নমস্কার। (পৃ. ২)

আর চণ্ডীমঙ্গলের সমস্ত পুথির উপক্রমে পাওয়া যায়—

পরাশর সুত হয় মাধব তার নাম।
কলিযুগে ব্যাসতুল্য গুণে অনুপাম ॥

গঙ্গামঙ্গলের সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের ভণিতার মিল খুব বেশী। গঙ্গামঙ্গলে আছে—

চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণকমল।
দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

সুতরাং এইগুলি থেকেই অনুমিত হয়, তিনটি কাব্য এক ব্যক্তিরই লেখা। দ্বিজমাধব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল দিয়েছেন—

ইন্দু বিন্দু বাণধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় সারদাচরিত ॥

অর্থাৎ ১৫০১ শকাব্দ বা ১৫৭৯-৮০ খ্রীস্টাব্দ। অন্যদিকে দৈবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায় মাধবাচার্যের উল্লেখ আছে। দৈবকীনন্দন নিত্যানন্দের প্রিয় পাত্র পুরুষোত্তমের শিষ্য। তাই তাঁর বৈষ্ণব বন্দনার রচনাকাল ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তী নয়। সুতরাং দ্বিজমাধব অনেক আগেই কাব্য রচনা করেছিলেন ধরে নিতে হয়। তাহলে উপরোক্ত তারিখটির সঙ্গে তার বিরোধ থাকে না। অতএব এই তারিখটিকেই আমরা মাধবাচার্যের কাল বলে গ্রহণ করছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধই কবির প্রধান অবলম্বন। কিন্তু তাহলেও ভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধ থেকে এবং ভাগবত ছাড়াও অন্যান্য কিছু কিছু পুরাণ থেকে যে কবি উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তা তাঁর নিজেরই স্বীকৃতি থেকে জানা যায়—

(১) রাজ রাজ অভিষেক নাহিভাগবতে।
বিস্তারি কহিব তাহা হরিবংশ মতে ॥

(২) পারিজাতহরণ ঈষৎ ভাগবতে
বিস্তারি কহিব বিষ্ণু পুরাণের মতে ॥

এ ছাড়াও, আলোচনার মুখে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডের মত বিষয়বস্তুও আমরা এর মধ্যে দেখতে পাব। দ্বিজমাধবের কাব্য কেবল পয়ার-ত্রিপদীতে রচিত একটি কাব্য নয়, রঘুনাথের মত এঁর কাব্যেও মাঝে মাঝে পদ রয়েছে। কবি সেই পদগুলিতে রাগ-রাগিণীরও উল্লেখ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের প্রথম অংশের গণেশ বন্দনায় কবি গণেশকে পরম বৈষ্ণব বলে অভিহিত করেছেন এবং চৈতন্যদেবের বন্দনা করেছেন। চৈতন্যপরবর্তী কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের বিশিষ্ট প্রবণতাই এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কাব্যরচনার উদ্দেশ্যও সর্বসাধারণের মধ্যে ভাগবতের প্রচার—

ভাগবত সংস্কৃত না বুঝে সর্ব্বজনে।
লোকভাষা রূপেতে কহিব পরমাণে।

মঙ্গলাচরণে কবি দ্বাবিংশতি অবতারের বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন গৌরাঙ্গ অবতার।

কংসের অত্যাচারে পীড়িতা পৃথিবীর দেব-সন্নিধানে কাতর আবেদন থেকে অর্থাৎ দশম স্কন্ধের একেবারে গোড়া থেকে কাহিনীর শুরু। ভাগবতের মধ্যে শিশু কৃষ্ণ-

বলরামের চাপল্যময় বাল্যলীলার নানা বর্ণনার সঙ্গে কখনও কখনও মাধবাচার্য বাঙালী মায়ের বাৎসল্য সঞ্চার করতে পেরেছেন। এগুলি তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। যেমন, মাতা যশোদার কৃষ্ণ-বলরামকে স্নান করনো, ঘুম পাড়ানোর দৃশ্যটি এত পরিচিত ও জীবন্ত যে, একেবারে আমাদের চোখের সামনেই ভেসে ওঠে মনে হয়—

দুলি দুলি পাতিয়ায় হাথ চাপড়ি।
ঘন গীত গায় নিদাইতে বনমালী।
না কান্দ না কান্দ পুত্র শুন যদুনাথ।
খেলিতে আনিয়া দিব আকাশের চান্দ॥
*　　*　　*　　*
না কান্দ না কান্দ পুত্র আবাল গোবিন্দ।
প্রাণ কানাঞা পুত্রের আসুক নিন্দ॥
*　　*　　*　　*
সুখে শুয়্যা থাক পাট সাড়ীর আঁচলে।
নিঝ্‌ঝুমে ঘুম যাহ জননীর কোলে॥

দ্বিজমাধবের অনুবাদ যেখানে সম্পূর্ণ মূলানুগ, সেখানেও কাহিনীর যাথার্থ বজায় রেখে তা স্বচ্ছন্দ এবং স্পষ্টার্থক। যেমন ভাগবতের এই শ্লোকটি—

শৃঙ্গ্যগ্নিদ্রংষ্ট্র্যসিজকণ্টকেভ্যঃ
ক্রীড়াপরাবতিচলৌ স্বসুতৌ নিষেদ্ধুম্।
গৃহ্যাণি কর্ত্তুমপি যত্র ন তজ্জননৌ
শেকাত আপতুরলং মনসোহনবস্থাম্।[১১২]

দ্বিজমাধব অনুবাদ করেছেন—

না মানে আগুন পানী নাহি পশুভয়।
কাঁটা খোঁচা না মানে পরমানন্দময়॥
নিবারিতে না পারিয়া যশোদা রোহিণী।
চিন্তায় আকুল ঘরে নাহি কামদানি॥

দুষ্ট বালকদের দুরন্তপনার জন্যই জননীরা এই সব জিনিস থেকে উদ্বেগ বোধ করতেন। এটি দ্বিজ মাধবের অনুবাদে ভাগবতের তুলনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের কালীয়দমনলীলা প্রসঙ্গে কবি ভাগবতানুসারী হয়েও কৃষ্ণের জন্য জননী যশোদা, নন্দরাজ ও গোপীদের বিলাপ বর্ণনায় স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। ভাগবতে প্রথম গোপীদের অবস্থা এবং তারপর যশোদার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্যে প্রথমেই যশোদার ক্রন্দন। এর কারণও কবি দেখিয়েছেন—

স্বভাবে অধিক স্নেহ ধরয়ে জননী
প্রথমে ক্রন্দন করে লইয়া রোহিণী॥

কবি এখানে স্বভাবকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, শাস্ত্রকে নয়। এর ফলে এটি সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। কালীয়দমন অংশে কৃষ্ণের ঐশী মহিমাই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে। ভাগবতে যশোদা পুত্রশোকে কালিদহে প্রবেশ করতে চাইলে তাঁর সখী গোপীরা তাঁকে ধরে রেখে কৃষ্ণের পূর্বকীর্তি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মাধবের কাব্যে পুত্রহারা জননী যশোদার দীর্ঘ ক্রন্দনে, জননী হৃদয়ের গভীর বেদনা সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে—

ভালই অপুত্রী হয়্যা আছিল মন্দির সেয়্যা
নিশ্চিন্ত শরীরে এতকাল।
এবে তুমি শত্রু হয়্যা, পুত্রভাবে জনমিয়া,
হৃদয়ে বিন্ধিয়া বহুশাল।

ভাগবতের কবি ঐশ্বর্যময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিপুল বিভূতি প্রদর্শন করেছেন, আর কবিদ্বিজ মাধব সেই ঐশ্বর্যময় কৃষ্ণকথাকে বাঙালী সাধারণের ভক্তিভাবুকতা জাগানোর জন্য তুলে ধরতে গিয়ে বাঙলার সজল মৃত্তিকার রঙ তাঁর ওপর বুলিয়েছেন। এইভাবে ভাগবতের মত বিশুদ্ধ ধর্মীয় পুরাণ-বর্ণিত কৃষ্ণকথা ধীরে ধীরে বাঙালীর প্রাণের কথা হয়ে উঠেছে। তবে এই কবি তাঁর কাব্যের প্রথমে রাধাকৃষ্ণের বন্দনা করলেও কালীয়-দমনলীলায় শোকার্ত গোপীগণের মধ্যে রাধার নাম করেন নি, অথচ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এই প্রসঙ্গে রাধার নাম রয়েছে। ভাগবতের বস্ত্রহরণ লীলা প্রসঙ্গেও কবি রাধার নাম করেন নি। কিন্তু এই পর্যন্ত এসে, বস্ত্রহরণ লীলার পর কবি সুকৌশলে তাঁর কাব্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত দানলীলার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ডের সঙ্গে এই কাহিনীর হুবহু মিল নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বড়াই রাধার শাশুড়ীকে বলেছেন রাধাকে দিয়ে দধি-দুগ্ধবিক্রয় করানোর কথা। কিন্তু এখানে গোপিনীরা নিজেরাই শাশুড়ী ও স্বামীর কাছে যাওয়ায় প্রসঙ্গ তুলেছে এবং এদের মধ্যে রাধাও রয়েছেন। এ ছাড়াও কবি তাঁর কাব্যে রাধাকে প্রধানা গোপী বলে অভিহিত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে চন্দ্রাবলী রাধারই আর এক নাম। কিন্তু দ্বিজমাধবের কাব্যে চন্দ্রাবলী রাধার একজন সখী। এখানেও বড়াই চরিত্রটি উপস্থিত। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত তাঁর ভূমিকা এখানে সক্রিয় নয়। বরং যেটুকু ভূমিকা রয়েছে, তাও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিপরীত। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার ও গোপীদের মিলনের সময় বড়াই বাধা দিয়েছে। কোন প্রকার সহায়তা করে নি। দানলীলার সঙ্গে নৌকালীলাও এই কবির কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। নৌকা-লীলার কাহিনীতে এখানে একটু নূতনত্ব আছে। ঝড়ের সময় গোপিনীরা নৌকার ভার হাল্কা করার জন্য কৃষ্ণের পরামর্শে বস্ত্রঅলঙ্কার জলে ফেলে দিলেন। কিন্তু তারপর গোপিনীরা কৃষ্ণের কাছে বস্ত্র অলঙ্কার ফেরৎ চাইলে তিনি যমুনাকে সমস্ত বস্ত্র অলঙ্কার ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ করলেন। কৃষ্ণের আদেশে যমুনা সমস্ত বস্ত্র অলঙ্কার ফিরিয়ে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নৌকাখণ্ডে এই প্রসঙ্গ নেই। নৌকালীলা বর্ণনার পর কবি আবার ফিরে গেছেন ভাগবতীয় কৃষ্ণলীলা বর্ণনায়।

ভাগবতকার রাসলীলার তীব্র আদিরসকে সমুচ্চআধ্যাত্মিক মহিমায় মণ্ডিত করেছেন। এবং এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বের্যেরও চরম প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু দ্বিজ মাধব তাঁর কাব্যে নিজেই বিবৃতিকার। তাই রাসলীলা যে লৌকিক দৃষ্টিতে বিচার করা চলবে না, তা তিনি নিজেই বলেছেন। শুকদেবের মুখ দিয়ে বিবৃত করেন নি।

ভাগবতের দশম স্কন্ধের একোনপঞ্চাশ অধ্যায়ে, শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অক্রূর হস্তিনাপুরীতে গেছেন। সেখানে কয়েকমাস অবস্থান করে পাণ্ডবদের প্রতি অন্যায় আচরণকারী ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি তিরস্কার করেছেন। কুন্তীও তাঁর কাছে নিজের পিতৃহীন পুত্রদের অসহায় অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। পরে দশম স্কন্ধের উত্তরার্ধে, পঞ্চাশতম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে জরাসন্ধ প্রসঙ্গ। কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্যে 'জরাসন্ধের মথুরা আক্রমণ' অংশের সম্পূর্ণ অধ্যায়টি মাত্র চারটি পংক্তিতে বিবৃত হয়েছে—

এথায় হস্তিনাপুর আসিয়া অক্রুর।
দেখিল পাণ্ডবগণে হরিস প্রচুর ॥
একে একে বৃত্তান্ত লইয়া চরাচর।
আসিয়া কৃষ্ণের ঠাঞি কহিল সত্বর ॥

দেখা যাচ্ছে ভাগবতের অনুবাদ করতে বসে কবি কেবল কৃষ্ণ কথাটুকুই গ্রহণ করেছেন। এর মাঝখানে যা কৃষ্ণকথার অন্তর্ভুক্ত নয়, যেমন—মহাভারতীয় কাহিনীর প্রক্ষেপ, তা তিনি সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন।

আবার কৃষ্ণকথার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলরামের বিবাহপ্রসঙ্গ ভাগবতের দশম স্কন্ধে একটিমাত্র শ্লোকে উল্লিখিত হলেও, দ্বিজ মাধব তা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। মাঝে মাঝে কাহিনী সর্বস্ব নয়, অনুভূতির গভীরতাযুক্ত পদও দ্বিজ মাধবের কাব্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যেমন, রুক্মিণীর স্বয়ংম্বরু বর্ণনার সময় কৃতকৌষিকের আনন্দ। এই পদগুলি নিঃসন্দেহে কৃষ্ণকথার আবেদন বাড়িয়েছে।

কৃষ্ণের কাছে রুক্মিণীর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রেরণ ও কৃষ্ণের রুক্মিণী হরণের বিবরণে দ্বিজমাধব বিশ্বস্তভাবে ভাগবতকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ভাগবতের দশম স্কন্ধে চতুঃপঞ্চাশতম অধ্যায়ের শেষ দিকে কৃষ্ণ-রুক্মিণী বিবাহপ্রসংগ অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। অথচ দ্বিজমাধবের কাব্যে এর সুবিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। বাঙালী হিন্দু-বিবাহের একটি চমৎকার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এই উপলক্ষে কবি দিয়ে ফেলেছেন। ভাগবতানুসারী কৃষ্ণকথা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি তারই মাঝখানে বাঙালী পরিবারের একটি অপরিহার্য বিষয়কে অবলম্বন করে গার্হস্থ্যরস পরিবেশন করেছেন। তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তার মূলে এটি নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী উপাদান। সদ্যোবিবাহিত দম্পতির উতরোল অনঙ্গ-উল্লাস বর্ণনাও দ্বিজমাধবের নিজস্ব সংযোজন। এখানে স্পষ্টতঃই কৃষ্ণ-রুক্মিণীর মিলনলীলা বর্ণনায় কবি পদাবলী সাহিত্যের অন্তর্গত রাধা-কৃষ্ণের মিলন প্রসঙ্গের কথাই মনে রেখেছেন। এইভাবে কৃষ্ণলীলার দ্বারকাপর্বেও বৃন্দাবনীয় লীলার অভাগবতীয় প্রসঙ্গের পরোক্ষ অনুপ্রবেশই কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির বিশেষ প্রবণতাকে বুঝিয়ে দেয়।

বাৎসল্যরস সৃষ্টিতে, বিশেষতঃ পুত্রহারা জননীর বেদনা বর্ণনায় কবি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কালীয়দমন অংশে যশোদার ক্রন্দন বর্ণনায় কবি আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আবার এখানে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ সামন্তক মণি উদ্ধার করতে গিয়ে দ্বাদশ দিন পর্যন্তও ফিরে না এলে, দ্বারকাবাসীরা তাঁকে নিহত বলেই ধরে নিয়েছেন। এবং—

নিশম্য দেবকী দেবী রুক্মিণ্যানকদুন্দুভিঃ।
সুহৃদো জ্ঞাতয়োঽশোচন্ বিলাৎ কৃষ্ণমনির্গতম ॥[১১৩]

দেবকী, বসুদেব, রুক্মিণী এবং অন্যান্য সুহৃদ ও জ্ঞাতিগণ যখন তাদের মুখে শুনলেন যে, কৃষ্ণ আর পর্বতগুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হন নি, তখন তাঁরা নিতান্ত কাতর-ভাবে বিলাপ করতে লাগলেন।

এই একটিমাত্র শ্লোকেই ভাগবতকার জননী দেবকী, পিতা বসুদেব, পত্নী রুক্মিণী ও অন্যান্য সকলের শোক বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দ্বিজ মাধব, জননী দেবকীর কাতর মর্মভেদী ক্রন্দন বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে ভাগবতের কৃষ্ণকথার বিবৃতিধর্মিতাকে অনেক বেশী গীতিরসোচ্ছল ও আবেদনসম্পন্ন করে তুলেছেন—

পুত্র পুত্র বলি ঘন বুকে মারে ঘা।
নয়নে সলিল ধারা তিতে সর্ব গা ॥

দেবকীর আর্ত বেদনাময় উচ্চারণ —

আমার প্রাণ যাদবানন্দ রে
কোথা গেলে পাব দরশনে ॥

এই উচ্চারণই জননী চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছে।

পারিজাতহরণের কাহিনীটি কবি যে বিষ্ণুপুরাণ থেকে গ্রহণ করেছেন, তা তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন। ভাগবতে এই কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ভাগবতে জরাসন্ধ ও ভীমসেনের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে।[১১৪] এই যুদ্ধ বর্ণনায় দ্বিজ মাধব মূলানুগ থেকেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ভাগবতে আছে, ভীম ও জরাসন্ধের ২৭ দিন ধরে যুদ্ধ হয়েছিল এবং দিনের বেলা যুদ্ধ করলেও রাত্রিকালে তাঁরা পরম বন্ধুভাবে সময় কাটাতেন।[১১৫] কিন্তু এই প্রসঙ্গটি দ্বিজমাধব বাদ দিয়েছেন।

ভাগবতে বলরামের বল্বলাসুর বধ প্রসঙ্গ রয়েছে।[১১৬] এই বল্বলাসুর দ্বিজমাধবের কাব্যে হয়েছে কল্লোল দৈত্য।

ভাগবতের অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে শিবভক্তদের ঐশ্বর্যযুক্ত ও বিষ্ণুভক্তদের দরিদ্র হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন। এবং সেই প্রসঙ্গে শুকদেব বৃকাসুরের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে এর উল্লেখ নেই। একেবারে প্রথম থেকেই বৃকাসুরের প্রসঙ্গ শুরু হয়ে গেছে। ভগবানের ভৃগু পদচিহ্ন বক্ষে ধারণের প্রসঙ্গটি দ্বিজ মাধব যথাযথভাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এর পরবর্তী ঘটনা মহাকালপুরে অর্জুনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গমন ও ব্রাহ্মণের মৃত পুত্র উদ্ধারের কাহিনী তাঁর কাব্যের এই অংশে বর্জিত হয়েছে। এটি তিনি বজ্রনাভবধ ও পারিজাত-হরণের পর বর্ণনা করেছেন। তবে বজ্রনাভ দৈত্যের কন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে প্রদ্যুম্নের বিবাহ প্রসঙ্গ ও প্রদ্যুম্ন কর্তৃক বজ্রনাভ বধের কাহিনী কবি হরিবংশ থেকে গ্রহণ

করেছেন। হরিবংশের বিষ্ণুপর্বের একনবতিতম অধ্যায় থেকে সপ্তনবতিতম পর্যন্ত অধ্যায়ে বজ্রনাভের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হরিবংশ অবলম্বনে এই আখ্যায়িকা রচনা করলেও দ্বিজ মাধব এখানে নিজস্বতারও পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, প্রদ্যুম্ন ও অন্যান্য যদুবংশীয় বীরগণ কর্তৃক বজ্রনাভপুরীতে রামায়ণ অভিনয়ের প্রসঙ্গ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে চারটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিজমাধব তাঁর কাব্যে এই অভিনয় প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ রামায়ণ কথাকেই সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। বজ্রনাভের মৃত্যুর পর দ্বিজমাধব বজ্রনাভ পত্নীদের কাতর ক্রন্দন বর্ণনা করেছেন—

পুন তার মুখ চাই হৃদয় ব্যাকুল হই,
কান্দে রাণী করুণা করিয়া।
স্বামী দেখি বলে ধনি, কোথায় চলিলে তুমি,
আমা সভে নির্দয় হইয়া॥

কিন্তু এই বর্ণনা হরিবংশে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। করুণ রসসৃজনে কবির এই দক্ষতার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। সাধারণ বাঙালী সমাজে কাব্যকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যই সম্ভবতঃ তিনি এই কবি-কৌশল গ্রহণ করেছেন।

কবির কাব্যে বর্ণিত পারিজাতহরণ প্রসঙ্গও ভাগবতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কবি বিষ্ণুপুরাণ থেকেও এর উপাদন সংগ্রহ করেছেন।

এরপর কবি কাহিনীর সঙ্গে যোগসূত্র না রেখে নারায়ণ নামের মহিমা ও অজামিল-কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটিও ভাগবতের দশম স্কন্ধের কাহিনী নয়, ষষ্ঠ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে অজামিল-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

যদুবংশের প্রতি ঋষিদের অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে। ঐ একাদশ স্কন্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদ দ্বিজমাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু মাঝখানের অধ্যায়গুলি তিনি বাদ দিয়ে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণের উদ্ধবকে উপদেশ দানের মধ্যে বহুলাংশে ভক্তের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। এরপর বলরাম-কৃষ্ণের তনুত্যাগের প্রসঙ্গ, অর্জুনের গাণ্ডীবাস্ত্রে যাদবরমণীগণ রক্ষায় ব্যর্থতা ও যুধিষ্ঠির সহ অন্যান্য পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান বর্ণিত হয়েছে। এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য দিয়ে গ্রন্থ শেষ হয়েছে। দ্বিজ মাধব ভাগবতের অধ্যায় অনুসারে অনুবাদ করেন নি। অধ্যায়গুলির নামকরণ তিনি নিজে করেছেন।

এই কবির ভণিতায় চৈতন্যদেবের উল্লেখ বহুবার রয়েছে। যেমন—

(১) কলিযুগে শ্রীচৈতন্য প্রেমরসে করিলে ধন্য,
দ্বিজমাধব কহে সার॥

(২) চৈতন্য চরণ ধন শিরে করি আভরণ
ভূদেব মাধব ভসে।

(৩) চৈতন্য-চরণে মাধব গান

(৪) অবতার শেষ, চৈতন্য প্রকাশ
মাধব কহে সঙ্গীতি॥

(৫) শেষ অবতার কৃষ্ণচৈতন্য শ্রীপাদে

অনন্ত মুরতি গোসাঞি হয় যুগভেদে ॥
যাহার প্রসাদে নৃত্য কীর্ত্তন প্রচার।
কহে দ্বিজমাধব সেই জগন্নিস্তার ॥

(৬) কলিযুগে চৈতন্যে সেই অবতার।
দ্বিজমাধব কহে কিঙ্কর তাহার ॥

এর আগে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে ভাগবতের অবিকল বিশুদ্ধি রক্ষার চেষ্টা আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু দ্বিজ মাধবের ভাগবত অনুসরণে বিশুদ্ধিরক্ষার সেই প্রয়াস নেই। আরও পাঁচটা পুরাণ থেকে এক্ষেত্রে তিনি যেমন কাহিনী সংগ্রহ করেছেন, তেমনি লৌকিক উপাদান থেকেও তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু আহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কবি কৃষ্ণকথাকে সর্বতোভাবে লোক সাধারণের উপযোগী করে তোলার সচেতন চেষ্টা করেছেন ॥

দুঃখী শ্যামদাস

দুঃখী শ্যামদাসের কাব্যের নাম গোবিন্দমঙ্গল। এই কাব্যটি আলোচনার জন্য আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে শ্রী ঈশানচন্দ্র বসু কর্তৃক সম্পাদিত বঙ্গবাসীর দ্বিতীয় সংস্করণটি (১৩১৭) ব্যবহার করেছি।

এটিও ভাগবতেরই অনুবাদ। মাধবাচার্যের মত ইনিও প্রধানত: ভাগবতের দশম স্কন্ধকে অবলম্বন করেছেন এবং প্রথম দুটি স্কন্ধ ও শেষের স্কন্ধ থেকেও দরকার মত কথাবস্তু নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। মাধবাচার্য যেমন স্বল্প হলেও তাঁর কাব্যে হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের কথা-অংশ গ্রহণ করেছেন, তেমনি দুঃখী শ্যামদাসও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ থেকে কোন কোন কাহিনী গ্রহণ করে তাঁর কাব্যের কৃষ্ণকথায় বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছেন।

সম্পাদক কয়েকটি হস্তলিখিত পুঁথি অবলম্বন করে পাঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই পাঠগ্রহণে বর্ণশুদ্ধি ও বর্ণবৈক্লব্য দোষ নিরাকরণ ছাড়া অন্য কোন প্রকার হস্তক্ষেপ তিনি করেন নি। কেবল কোন কোন পুঁথিতে চৈতন্যবন্দনা, গুরুবন্দনা ও শ্রীরামবন্দনা আছে। সম্পাদক প্রক্ষেপ বিবেচনায় এগুলিকে গ্রহণ করেন নি। অধিকন্তু চৈতন্য, গুরু ও শ্রীরামবন্দনায় বহু ভুল ছিল, তাই সম্পাদক এই গুলিকে প্রক্ষেপ বলে মনে করেছেন। যাই হোক, সম্পাদকের সম্পাদন সচেতনতা স্বীকার করে এটিকেই আলোচনার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করছি

কবি শ্যামদাস জন্মগ্রহণ করেন মেদিনীপুর জেলার কেদারকুণ্ড পরগণার হরিপুর গ্রামে। কবি কাশীরাম দাসের মত তিনি দে উপাধিধারী কায়স্থবংশীয়। অবশ্য কাব্যের মধ্যে তিনি সব জায়গাতেই 'দাস' উপাধি ব্যবহার করেছেন। সম্পাদক ঈশানচন্দ্র বসু ভূমিকায় বলেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেও কবির বাস্তুতে তাঁর একাদশ অধস্তন পুরুষ সীতানাথ অধিকারী বাস করতেন। স্বাভাবিক ভাবে প্রতি তিন-পুরুষে একশো বছর ধরা হলে, কবির আবির্ভাবকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হয়। ড. সুকুমার সেনের মতে, কবির পিতা শ্রীমুখ, কাশীরাম দাসের খুল্লপ্রপিতামহ। তিন পুরুষে একশো বছরের হিসেব ধরে ড. সেন কবিকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি

নিয়ে যেতে চেয়েছেন। সুতরাং একথা বলা যায় যে, কবি শ্যামদাস ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি কিংবা শেষের দিকে তাঁর কাব্যরচনা করেন। কিন্তু কেউ কেউ কবির এই আবির্ভাবকালকে অনিশ্চিত বলে মনে করেছেন। তাঁদের মতে, কাশীরামদাসের এক খুল্লপিতামহের নাম ছিল শ্রীমুখ। এর থেকেই ড. সুকুমার সেন স্থির করেছেন, দুঃখী শ্যামদাস কাশীরামদাসের খুল্লপিতামহের পুত্র ছিলেন। কিন্তু একটি নামের মিল থেকেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। সম্পাদক ঈশানচন্দ্র বসু বলেছেন, দুঃখী শ্যামদাসের বাড়ী মেদিনীপুর জেলার হরিহরপুরে এবং তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় দে বংশীয় কায়স্থ ছিলেন। কিন্তু কাশীরামদাসের খুল্লপিতামহ বর্ধমান জেলার ইন্দ্রানী পরগণায় থাকতেন এবং কাশীরামের ছোট ভাই গদাধর দাস লিখেছেন, তাঁরা শাণ্ডিল্যগোত্রীয় কায়স্থ। ভরদ্বাজ গোত্রীয় নন। সুতরাং ড. সেনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাচ্ছে না। যাই হোক, এই আলোচনায় আমরা কবিকে ষোড়শ শতাব্দীর কবি বলেই গ্রহণ করছি। কবির পিতার নাম শ্রীমুখ ও মাতা ভবানী, গ্রন্থে এই পরিচয়ই পাওয়া যায়। কবির কাব্য মোটামুটি জনপ্রিয়ও হয়েছিল মনে হয়। কারণ সম্পাদক ভূমিকায় বলেছেন, দুঃখী শ্যামদাস নিজে তাঁর রচিত গোবিন্দমঙ্গল কখনও গেয়ে, কখন পাঠ করে দেশে দেশে লোককে শোনাতেন। এর ফলে দেশের লোকের তাঁর ওপর শ্রদ্ধাভক্তি বৃদ্ধি হয়েছিল এবং অনেকে তাঁকে গুরু বলে মেনে নিয়ে তাঁর শিষ্যত্বও গ্রহণ করত।

কাব্যের প্রথম দিকে কবি ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ থেকে পরীক্ষিতের কাহিনী চয়ন করেছেন। পরে ভাগবতের মত শুকদেবের মুখ দিয়ে কৃষ্ণকথা বলানো হয়েছে পরীক্ষিতের শোনার জন্য। এইখানে দ্বিজ মাধবের সঙ্গে দুখী শ্যামদাসের পার্থক্য। দ্বিজ মাধব তাঁর বক্তব্য শুকদেবের মুখ দিয়ে বর্ণনা না করে সরাসরি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি ভাগবতকে অনুসরণ করলেও কৃষ্ণকথাই যে তাঁর একমাত্র উদ্দিষ্ট, তা এইভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে দুঃখী শ্যামদাস ভাগবতের আবহটিকেও তাঁর কাব্যের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। তবে ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণে যে সব অংশ তাঁর গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, সেগুলির আক্ষরিক অনুবাদ তিনি করেন নি। নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী সংক্ষেপিত, বিস্তৃত অথবা পরিবর্তিত করেছেন। যেমন, কলি ও ধর্মের সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ ও কলিদমন ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায় থেকে গৃহীত। ভাগবতে আছে, কলির হাতে নিগৃহীত একপদধারী বৃষরূপী ধর্মকে পরীক্ষিৎ তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, ধর্ম প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় না দিয়ে রাজাকে বুঝে নিতে বলেছেন। কিন্তু দুঃখী শ্যামদাসের কাব্যে ধর্ম নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

শুন রাজা বিবরণ আমি ধর্ম্ম নিরঞ্জন
কলিভয়ে পাইল তাড়না ॥[১১৭]

ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে খট্বাঙ্গ রাজার প্রসঙ্গ মাত্রই উল্লেখ আছে। নবম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে খট্বাঙ্গের বিবরণ সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখী শ্যামদাস এই কাহিনী বেশ বিস্তৃত ভাবেই বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণের জন্মের পর নন্দোৎসবের বর্ণনা ভাগবতে রয়েছে। দুঃখী শ্যামদাসের কাব্যে নন্দোৎসবের বর্ণনায় অতিরিক্ত যুক্ত হয়েছে রাধাপ্রসঙ্গ—

রাধা আদি রসবতী মঙ্গল কলস পাতি
খেলে রঙ্গধামালি করিয়া ।।

এখানে যে শুধু রাধাপ্রসঙ্গ যুক্ত হয়েছে এমন নয়, রাধাকে কৃষ্ণের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ করেও দেখানো হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কিন্তু রাধা কৃষ্ণের চেয়ে বয়সে ছোট।

পুতনা বধ প্রসঙ্গে কবি ভাগবতকে হুবহু অনুসরণ করেন নি। নিজস্ব কল্পনা প্রয়োগ করে কাহিনীটিকে বাস্তব করে তুলেছেন। ভাগবতে আছে, পুতনাকে দেখে জননী যশোদা ও রোহিণী এতই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে, সে কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলে তাঁরা নিবারণ করতে পারলেন না।[১১৮] কিন্তু শ্যামদাসের কাহিনীতে আছে, পুতনা—

যশোদার কাছে কহে সকরুণ হেয়া ।।
আমার দুঃখের কথা না যায় কথন
পুত্রশোকে তেয়াগিনু আপন ভবন ।।
* * * *
শুন গো সুন্দরী তব আছয়ে কুমার।
স্তন পান দিয়া থাকি যদি দেহ ভার ।।

পুতনার এই কথা শুনে যশোদা রোহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন—

যাদুয়ার ধাত্রী করি রাখিব ইহারে।

এই কাহিনী অনেক বেশি মানবিক ও বাস্তবসম্মত। নিঃসন্দেহে এই কবিরও বৈশিষ্ট্য বাঙালী প্রবণতারই পরিচায়ক। ভাগবতের অনুসারী কৃষ্ণমঙ্গলগুলির অবলম্বিত কৃষ্ণকথা ধীরে ধীরে কেমন বাঙালীর নিজস্ব প্রবণতায় অনুরঞ্জিত হয়ে উঠছে, উদাহরণটি তারই সাক্ষ্য দেয়।

কৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রসঙ্গে কবি রাধার প্রতি বালক কৃষ্ণের আদিরসাত্মক আচরণের ভাগবত বহির্ভূত চিত্র অঙ্কন করেছেন—

কবরী খসায় কৃষ্ণ পাইয়া কৌতুকে।
কাঁচলি চিরিয়া নখে কুচযুগ দেখে ।।
রাধা বলে না জানিয়া কোলে কৈনু কেনে।
শিশু মূর্ত্তি দেখিতে এমন কেবা জানে ।।

বরুণালয় থেকে নন্দের উদ্ধার প্রসঙ্গের পর কবি রাধাকৃষ্ণ মিলন প্রসঙ্গ এনেছেন। রাধা এবং কৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাতের চিত্রটি মনোরম—

রাধা কানু আঁখি আঁখি হৈল দরশন।
মুখে মৃদু হাসি রাধা ঝাঁপিল বসন ।।

কবির এই কাব্যে বড়াই, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বড়াইর মত রাধা কৃষ্ণের প্রেমে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং তার বর্ণনাও প্রায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেরই অনুরূপ। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত এখানেও বড়াই কৃষ্ণের দূতী হয়ে রাধার কাছে গমন করেছে। রাধা বড়াইকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বটে, তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধার মত অপমান করে তাড়িয়ে দেন নি, এবং অবশেষে বড়াইর প্ররোচনাতেই তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে রাজী হয়েছেন।

কবি রাধাকৃষ্ণলীলাকথার এই লোকরঞ্জক অংশকে সুকৌশলে যেন ভাগবতের মধ্যেও টেনে এনেছেন। তাঁর কাব্যের এই অংশটিরও শ্রোতা পরীক্ষিৎ এবং বক্তা শুকদেব।

দুঃখী শ্যামদাস তাঁর কাব্যে রাধাকৃষ্ণের মামী ও ভাগিনেয় সম্পর্কটি বজায় রেখেছেন। তবে এই রাধা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার মত সাগর গোয়ালার কন্যা নন, ইনি "বৃষভানু রাজার নন্দিনী।"

নৌকালীলার বর্ণনায়ও কবি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুসারী। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নৌকাখণ্ডে গোপিনীরা কৃষ্ণানুরক্তা ছিলেন না। কিন্তু এখানে কৃষ্ণ রাধা সহ জলে ডুবে গেলে, গোপিনীরা এই বলে আক্ষেপ করেছেন—

কামনা করিয়া পূর্ব্বে গোপিকা হয়েছি এবে
সাধ আছে ভজিব মুরারি।
আমা সবা ভাগ্যে নাই সৌভাগ্যে সুন্দরী রাই
সেই সে নিদানে পাইল হরি ॥

ভাগবতে আছে, কৃষ্ণ কোন এক গোপীকে নিয়ে রাসমণ্ডল থেকে অন্তর্ধান করেছিলেন। ভাগবতে এই গোপীর কোন নাম দেওয়া নেই। দুঃখী শ্যামদাসও রাসলীলাকালে রাধার নাম করেন নি। তবে পরবর্তীকালে কৃষ্ণ সব গোপীদের ছেড়ে চলে গেলে গোপীরা বিলাপ করতে করতে কৃষ্ণ-সঙ্গপ্রাপ্তা সৌভাগ্যসম্পন্না গোপীনীরূপে রাধার নামই করেছে। রাধাকৃষ্ণলীলা ভাগবতের নানা অনুবাদেই রয়েছে। ইতিপূর্বে দ্বিজ মাধবের কাব্যেও আমরা তা লক্ষ্য করেছি। তবে তুলনায় দুঃখী শ্যামদাসের অনুবাদে রাধার প্রাধান্য রয়েছে। যেমন রাসলীলা প্রসঙ্গেই দুঃখী শ্যামদাস রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের রাসলীলার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এই লীলা বর্ণনা পদাবলীর স্নিগ্ধতা, গীতিরস ও অনুভূতির গভীরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—

নাগরী রতনা মধুর বদনা
মধুর সঙ্গীতসভা।
নীল মেঘ কোরে বিজুরী সঞ্চরে
দুহুঁ দুহুঁ মনোলোভা ॥

রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি পদ্মপুরাণের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে আমরা ষোল জন কৃষ্ণবল্লভার নাম পাচ্ছি। এঁদের নাম হল রাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, শ্যামলা, ধন্যা, হরিপ্রিয়া, বিশাখা, শৈব্যা, পদ্মা, ভদ্রা, চন্দ্রাবতী, চিত্ররেখা, চন্দ্রা, মদনসুন্দরী, মধুমতী ও চন্দ্ররেখা। যোগপীঠের বর্ণনা উপলক্ষ্যে এঁদের নাম দেওয়া হয়েছে। দুঃখী শ্যামদাসও যোগপীঠের বর্ণনা উপলক্ষ্যে শ্রীরাধার ষোলজন সখীর নাম করেছেন। কিন্তু এর সবগুলি নাম পূর্বোক্ত ষোলজন কৃষ্ণবল্লভার সঙ্গে মেলে না। কবির উল্লিখিত নামগুলি হল—ললিতা, শ্যামলা, শ্রীমতী, বিশাখা, পদ্মা, ভদ্রা, চন্দ্রাবতী, চন্দ্রাবলী, চিত্ররেখা, চন্দ্রার্দ্ধমদনা, শ্রী, শ্রীমধুমতী, শশিরেখা, কৃষ্ণপ্রিয়া, সুন্দরী, শ্রীহরিপ্রিয়া নামগুলি সব না মিললেও, এই যোগপীঠ বর্ণনা কবি যে পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের অনুকরণেই করেছেন, সে ব্যাপারে আমার নিঃসংশয়। কারণ শ্রীরূপ অষ্টসখী সম্বলিত যোগপীঠের কথা বলেছেন।

দ্বিজমাধবের ভণিতায় বারবার চৈতন্যপ্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু দুঃখী শ্যামদাসের পদে তা না থাকলেও, আখ্যান বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে পদরচনা-বৈশিষ্ট্যই চৈতন্য পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যের প্রভাব বিষয়ে আমাদের নিঃসংশয় করে। ভাগবতের কৃষ্ণকথা আপামর বাঙালী জনসাধারণকে পরিবেশন করতে গিয়ে এঁরা ভাগবতের সরল বঙ্গানুবাদের সঙ্গে মিশিয়েছেন লোকসমাজ প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ প্রেমকাহিনী, আর তারই সাথে যুক্ত করেছেন পদাবলীর গীতরস ও ভাবগভীরতা। এইভাবে কেবলমাত্র বিবৃতিধর্মিতা পরিহার করে কৃষ্ণকথা হয়ে উঠেছে সর্বসাধারণের আস্বাদনীয়॥

দুর্লভনন্দন পরমানন্দ

জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলের প্রারম্ভে পূর্ববর্তী যে সমস্ত কবির পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে পরমানন্দ গুপ্ত অন্যতম—'সংক্ষিপ্তে কহিলেন পরমানন্দ গুপ্ত'। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়ও পরমানন্দগুপ্তের উল্লেখ পাই—'পরমানন্দ গুপ্তো যৎ কৃতো কৃষ্ণস্তাবলী'। উভয়ত্র উল্লিখিত পরমানন্দ গুপ্ত এক ব্যক্তি হতে পারেন, কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পুথিশালায় রক্ষিত ১০২৪ সংখ্যক পুথিটি যে অভিন্ন ব্যক্তির রচনা, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। পদকল্পতরুতে সংকলিত 'পরশমণির সাথে কি দিব তুলনা রে' প্রভৃতি পদটি যদি পরমানন্দ গুপ্তের রচনা বলে কোনো অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়, তবেই এই পুথির কবিকে আমরা পরমানন্দ গুপ্তের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করতে পারব। কারণ পদটি পুথিতে পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিটি বেশ প্রাচীন। লিপিকাল ১০৮৫ সাল (১৬৭৮ খ্রী.)[১১১] পুথিটি সম্পূর্ণ নয়, নবম খণ্ডের কিয়দংশ অবধি আছে। এতে ভাগবতের স্কন্ধ ক্রমিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। ভণিতা থেকেই জানা যায়, কবির পিতার নাম দুর্লভ।

(১) দুর্লভনন্দন বলে বারেক কর দয়া॥
(২) শুকদেব বন্দি গায় দুর্লভনন্দন॥

ভণিতায় কবি পরমানন্দ নামেরও উল্লেখ আছে—

তবে জে ডুবিয়া মরে কেবা উদ্ধারিব তারে
পরমানন্দের পরিহার।

বন্দনাদির পর কবি অবতার কাহিনী বর্ণনা করেছেন ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায় অনুসরণে। পরের কাহিনী ব্যাস কর্তৃক কৃষ্ণকথা রচনার ভূমিকা। নানা পুরাণ, শাস্ত্র ও সংহিতা রচনার পরে একদিন দুঃখিত মনে ব্যাসদেব বসে আছেন, এমন সময় নারদ এসে উপস্থিত হলেন। ব্যাসদেব নিজের মনোবেদনার হেতু নারদকে জিজ্ঞাসা করলে, নারদ বল্লেন—

তন্ত্রমন্ত্র জপতপ আগম বিচার।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ কর্মকাণ্ডতার॥
হোমহোতা দান দাতা শ্রুতিস্মৃতিগাথা।
না কহিলে করুণা সাগর কৃষ্ণকথা॥

প্রসঙ্গ ক্রমে নারদ বর্ণনা করলেন দাসীপুত্র হয়েও সাধুসঙ্গে, কৃষ্ণ-ভক্তির গুণে নিজ জীবনের উত্তরণ। পূর্বজন্মে নারদ এক ব্রাহ্মণের গৃহের দাসীপুত্র ছিলেন। একদিন—

ব্রাহ্মণ বসিয়া আছে তার কাছে আমি।
হেন কালে আচম্বিতে জয় কৃষ্ণধ্বনি ॥
জয় কৃষ্ণধ্বনি শুনি ব্রাহ্মণ বিস্মৃত।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী চারিজন উপনীত ॥

এরা চারজন বর্ষার চারমাস সেই ব্রাহ্মণের গৃহে কাটানোর সময় নারদের সেবায়, সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর কর্ণে মন্ত্রদান করেন। তাঁরা বলেন, মাতৃবিয়োগের পর বনে গমন করে উপাসনা করলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করবে। কিছুদিন পর সর্পদংশনে মাতার মৃত্যু হলে, তিনি বনে গমন করে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেন, এবং তারই ফলে পরবর্তী জন্মে নারদরূপে জন্মগ্রহণ করেন। নারদের মুখে বর্ণিত কৃষ্ণমহিমা ব্যাসদেবেরও প্রেরণার বিষয় হল। তিনি রচনা করলেন ভাগবত। এই কাহিনীটি ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে কবি প্রথম থেকেই ভাগবতকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এই কাহিনীকে ভাগবতের মর্মানুবাদের মধ্যে আনাই অভিনব ব্যাপার। কৃষ্ণকথার চেয়ে কৃষ্ণভক্তিই এখানে বড় হয়ে উঠেছে। এবং এই ভক্তিপ্রবণতা যে চৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবসঞ্জাত তাও বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। আদর্শের সাথে তুলনা করলে এই অনুবাদ বেশ কিছুটা মূলের অনুরূপ হয়েছে বোঝা যায়। পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপের কাহিনীটি ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এটিও অনুরূপভাবে মূলের প্রায় বিশ্বস্ত অনুবাদ। এইভাবে কবি ভাগবতের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে উপাখ্যান গ্রহণ করে এই কাব্যটি রচনা করেছেন। তিনি মালাধর বসুর মত কেবলমাত্র দশম, একাদশ স্কন্ধেরই অনুবাদ করেন নি। দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণকথা ছাড়াও ভাগবতীয় ভক্তি-ধর্ম সাধারণের মনে সঞ্চারিত করার বাসনাও এই কবির ছিল। এ সম্পর্কে আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ, পুথিতে এই কবির গৌরাঙ্গবিষয়ক পদের অনুপ্রবেশ। কিন্তু, প্রাপ্ত একটিমাত্র পুথি কাব্যটির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আমাদের সংশয় জাগায়।

॥ ৩ ॥

ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী ও কৃষ্ণমঙ্গল সাহিত্য আলোচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, আলোচ্য যুগ সর্বতোভাবে চৈতন্যদেবের দ্বারাই প্রভাবিত। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যে এই একক পুরুষের প্রভাব কি অসামান্য প্রেরণার সঞ্চার করেছিল, সমকালের পদাবলী ও কৃষ্ণমঙ্গলের আলোচনায় তা স্পষ্টতা লাভ করেছে। চৈতন্যদেবেরই প্রভাবে এ যুগের রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদগুলি ও কৃষ্ণমঙ্গলের কাহিনী বিভিন্ন ভাবতরঙ্গে প্রাণতন্ময় হয়ে উঠেছে। একই ভাব, একই বিষয়বস্তুও, কবি ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যে ও আন্তরিকতায় উজ্জ্বলতা লাভ করেছে।

পূর্ববর্তী শতাব্দীর তুলনায় এই শতাব্দীর একটি বিশেষ পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববর্তী শতাব্দীর চণ্ডীদাস ছিলেন একান্তভাবেই গ্রামীণ জীবনের কবি,

আর বিদ্যাপতি তেমনিই একান্তভাবে সমকালীন নগরজীবনের প্রেক্ষাপটে রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনার কবি। ষোড়শ শতাব্দীর সমস্ত কবিই গ্রামীণ। অথচ এঁদের কাব্যে কৃষ্ণকথার পরিবেশ ও পটভূমি সবসময় গ্রামীণ নয়। এর মূলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের রচয়িতা রূপসনাতন ও জীব গোস্বামীর প্রভাব আমার অনুমান করি। তিন জনেরই সন্ন্যাস-পূর্ব জীবন, সামন্ততান্ত্রিক নাগরিক পরিবেশে গড়ে ওঠা। এঁদের মধ্যে রূপের প্রভাবই কৃষ্ণকথায় সর্বাধিক পরিমাণে পড়েছে। রূপের কাব্য-নাটকে রাধাকৃষ্ণলীলার পটভূমি সামন্ততান্ত্রিক নাগরিক সমাজের। তাঁরই প্রভাবে চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্য অনেকখানি নতুন রূপ গ্রহণ করেছে। হালের গাথাসপ্তশতী থেকে শুরু করে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনার সময় পর্যন্ত, শ্রীরাধা যেন এক গ্রামীণ গোপবধূ। তাঁকে গৃহকর্ম করতে হয়, যমুনা থেকে তিনি কলসীতে করে জল আনেন, আবার মাথায় করে দধিদুগ্ধ বিক্রয় করতেও যান। এই সাধারণ গ্রাম্য গোপবধূকে শ্রীরূপ সম্পন্ন ও অভিজাত পরিবারের বধূতে পরিণত করলেন। তাঁর 'শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা'য় তিনি শ্রীরাধার রাগলেখা, কলাকেলি ও ভূরিদা প্রভৃতি দাসীর উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া রাধার পায়ে আলতা পরানোর জন্য ও নখ কাটার জন্য সুগন্ধা ও নলিনী নামে দুজন নাপিত কন্যা ও কাপড় কাচার জন্য মঞ্জিষ্ঠা ও রঙ্গরাগা নামে দুজন রজককন্যা আছে। গন্ধদ্রব্য লেপনের জন্য আছে পালিন্দ্রী নামে এক দাসী। এমনকি তিনি রাধার চিত্রকারিণী, ভবিষ্যৎ গণনাকারিণী, মেথরাণী সহ অন্যান্য বহু দাসীর নামও করেছেন।

'শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীরূপ শ্রীরাধার বহুমূল্য অলংকারের নামও করেছেন এবং নানা ধরনের পুষ্পসজ্জার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। উজ্জ্বলনীলমণিতেও শ্রীরাধার দূতী, চেটী, সখী, নর্ম্মসখী প্রভৃতির বর্ণনা রয়েছে। সেকথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। এইভাবে অভিজাত সামন্তবংশের সন্তান এবং হোসেন শাহের ঐশ্বর্যময় সভা পরিবেশে কর্মরত শ্রীরূপের বর্ণনায় রাধাও অভিজাত গৃহবধূতে পরিণত হয়েছেন।

শ্রীরূপের সৃষ্ট চরিত্রগুলি, যেমন পৌর্ণমাসী মধুমঙ্গল, কুন্দলতা প্রভৃতি পরবর্তী বাংলা কৃষ্ণকথায় গৃহীত হয়েছে। সেই কারণে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকথাকে যেমন তাঁদের নিজস্ব আবেষ্টনীর মধ্যে ফেলে ব্যাখ্যা করা যায়, এঁদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। এটিও মহাপ্রভুর পরোক্ষ প্রভাবের ফল। কারণ গৌড়েশ্বরের প্রধান অমাত্যদের কৃষ্ণপ্রেমের আকর্ষণে তিনিই সন্ন্যাসী করে তুলেছিলেন।

আবার অন্যদিকে এযুগের কৃষ্ণমঙ্গলগুলি ভাগবতের অনুবাদ হয়েও বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া লৌকিক কৃষ্ণকথায় ভরে উঠেছে। এটিও চৈতন্যদেবেরই প্রভাবের ফল। কারণ একদিকে তিনি ভাগবতের ভক্তিধর্মকে নিজের জীবনে মূর্ত করে তুলেছিলেন এবং অন্যদিকে দানলীলা ও নৌকালীলার মত লৌকিক কথাবস্তুকে অভিনয় করে আধ্যাত্মিকতার সমুচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ করেছিলেন।

এ ছাড়াও চৈতন্যের প্রভাবে কৃষ্ণকথার মূল বৈশিষ্ট্যগুলির পরিবর্তনও এই ষোড়শ শতাব্দীতেই সূচিত হয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দে কৃষ্ণলীলার গান ভক্তিরসমিশ্রিত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে আদিরসের গাঢ় রঙ ফিকে হয়ে যায় নি। চণ্ডীদাসকে

বাদ দিয়ে বিদ্যাপতি সম্পর্কেও আমরা অনুরূপ মন্তব্য করতে পারি। চৈতন্যদেবের প্রভাবেই এই রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার আদিরস সবটুকুই ভক্তিরসে পরিণত হল। ভগবানকে পাওয়ার জন্য, তাঁর দিব্য প্রেমকে উপলব্ধি করার জন্য শ্রীচৈতন্যের তীব্র ব্যাকুলতা ও আর্তি যেন মানবশরীরে রাধার আর্তি ও ব্যাকুলতাকে মূর্তিমান করে তুলল। নবদ্বীপ-লীলায় মহাপ্রভু কখনও কৃষ্ণভাবে, কখনও রাধাভাবে ভাবিত হলেও নীলাচল লীলায় তিনি সারাক্ষণই রাধাভাবে ভাবিত হয়ে থাকতেন। এর ফলে ভক্ত ভাবুকের মনেও কৃষ্ণ হয়ে উঠলেন সুদূর সাধনার ধন, আর রাধা হয়ে উঠলেন ভক্ত। তাই কৃষ্ণের পরিবর্তে রাধার প্রেমব্যাকুলতাই এবার পদাবলীর কৃষ্ণকথার প্রধান অবলম্বন হল। এর ফলে বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা প্রধান পাত্রে পরিণত হলেন এবং কৃষ্ণ স্থানচ্যুত হলেন।

শুধু তাই নয়, শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদ অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শী কবিরা, যেমন মুরারিগুপ্ত, নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, গোবিন্দ আচার্য প্রমুখ কেউই বিদ্যাপতির আলঙ্কারিত রীতি গ্রহণ করেন নি। তাঁরাও চণ্ডীদাসের মত সহজ সরল অথচ মর্মস্পর্শী ভাষায় ভাব প্রকাশ করেছেন। প্রেমধর্মের মূর্ত বিগ্রহ চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসার জন্যই তাঁদের কাব্যে কৃত্রিমতার অনুপ্রবেশ ঘটে নি।

ষোড়শ শতাব্দীর আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল—রাধা, কৃষ্ণ ও গোপীদের প্রেমলীলা ছাড়া এই সময় আরও কিছু কিছু বিষয় পদাবলীর কৃষ্ণকথার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জননী যশোদার বাৎসল্য, কৃষ্ণের গোচারণ ও সখাগণের সঙ্গে বাল্যক্রীড়া প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। প্রেমবিষয়ক পদের তুলনায় এগুলির সংখ্যা অনেক কম হলেও, বিষয়গুলি নিয়ে রচিত পদ বলরামদাস প্রমুখ কবির আন্তরিকতায় ও শিল্পনৈপুণ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই বাৎসল্য ও সখ্যরসের উৎসারণ ষোড়শ শতাব্দীর ভাগবত অনুবাদের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে ঘটেছে। কারণ ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনায় এই প্রসঙ্গগুলি রয়েছে। মহাপ্রভুর দিব্য প্রেমের আলোকে ভাগবতের কৃষ্ণকথা ভক্তমানসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং এর ফলে তাঁরা ভাগবতের এই সমস্ত বিষয়কে নিজেদের কাব্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সব মিলিয়ে বলা যায় ষোড়শ শতাব্দীর কৃষ্ণকথা সাহিত্যের উত্তরণ চৈতন্যদেবেরই বিশিষ্ট ধর্মান্দোলনের বাতায়নে বিকশিত।

উল্লেখপঞ্জী

১. চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য খণ্ড, ত্রয়োদশ অধ্যায়

২. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, বিমানবিহারী মজুমদার, পৃ. ৯

৩. তদেব

৪. বৈষ্ণব পদাবলী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ. ১৪৯

পরবর্তী আলোচনায় যেখানে বন্ধনীর মধ্যে শুধু সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে বৈষ্ণব পদাবলীর পৃষ্ঠা সংকেত বুঝতে হবে।

৫. চৈতন্য চরিতামৃত, ১।১০।১৫

৬. রসমঞ্জরী, পৃ. ৬৩; পীতাম্বর দাস (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ)

৭. পুথি সংখ্যা ৬২০৪, পৃ. ১৩৭

৮. বৈষ্ণব পদাবলী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৭৫

৯. নটবর দাসের রসকলিকা, ক. বি. পুথি-সংখ্যা ১১২৩

১০. পুথিসংখ্যা ২৬২২, সাহিত্য পরিষদ, লিপিকাল ১২৫৮

১১. গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পদ সংখ্যা ৭৪০, বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত (এই কবির সমস্ত পদ উপরোক্ত গ্রন্থটি থেকে উদ্ধৃত।

১২. শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, দ্বাদশ সর্গ, তৃতীয় শ্লোক

১৩. পদকল্পতরু, পদ সংখ্যা ২৯০৬

১৪. পদকল্পতরু, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২১৩

১৫. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, বিমানবিহারী মজুমদার, পদ সংখ্যা ২২

১৬. তদেব, পদ সংখ্যা ৩১

১৭. রবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়, (সুভাষিতরত্ন কোষ) দূতীবচন ব্রজ্যা, ৮

১৮. কুমারসম্ভবম্, পঞ্চম সর্গ, শ্লোক সংখ্যা ৫৭, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত।

১৯. পদকল্পতরু, পদ সংখ্যা ১১৫৪

২০. তদেব, পদ সংখ্যা ১১৫৫

২১. তদেব, পদ সংখ্যা ১১৯৪

২২. পদকল্পতরু, পদ সংখ্যা ১৩০৪

২৩. পদামৃত মাধুরী, ৩।৪৭; খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও নবদ্বীপ ব্রজবাসী

২৪. বলরাম দাসের পদাবলী; বৈষ্ণব পদাবলীও

২৫. তদেব

২৬. তদেব, পৃ. ১৭

২৭. বলরাম দাসের পদাবলী পৃ. ৩৩

২৮. ভাগবত; দশম স্কন্ধ; পঞ্চম অধ্যায়; শ্লোক ১৮

২৯. বলরাম দাসের পদাবলী; পৃ. ৩৩

৩০. তদেব, পৃ. ৩৪

৩১. তদেব, পৃ. ৩৫

৩২. তদেব, পৃ. ৩৬

৩৩. তদেব, পৃ. ৩৭

৩৪. তদেব, পৃ. ৩৯

৩৫. তদেব, পৃ. ৩৮

৩৬. তদেব

৩৭. তদেব

৩৮. তদেব, পৃ. ৩৭

৩৯. তদেব, পৃ. ৪২

৪০. বাল্মীকি রামায়ণ; অযোধ্যাকাণ্ড; চত্বারিংশ সর্গ; ষষ্ঠ শ্লোক।

৪১. তদেব, অষ্টম শ্লোক

৪২. বলরাম দাসের পদাবলী; পৃ. ৪৭

৪৩. তদেব, পৃ. ৪২

৪৪. তদেব, পৃ. ৪৬

৪৫. তদেব, পৃ. ৪৩

৪৬. তদেব, পৃ. ৪৪

৪৭. তদেব, পৃ. ৪৮

৪৮. তদেব, পৃ. ৫০

৪৯. তদেব, পৃ. ৫৭

৫০. তদেব, পৃ. ৫৮

৫১. তদেব, পৃ. ৬৩

৫২. তদেব, পৃ. ৬১

৫৩. তদেব, পৃ. ৭৮

৫৪. তদেব, পৃ. ৬৭

৫৫. তদেব, পৃ. ৭১

৫৬. তদেব, পৃ. ৬৯

৫৭. তদেব, পৃ. ৭০

৫৮. তদেব, পৃ. ৭৩

৫৯. তদেব, পৃ. ৭৯

৬০. তদেব, পৃ. ৮৩

৬১. তদেব, পৃ. ৯০
৬২. তদেব, পৃ. ৯১
৬৩. তদেব, পৃ. ৯০
৬৪. তদেব, পৃ. ৮৮
৬৫. তদেব, পৃ. ৯১
৬৬. তদেব, পৃ. ১২৮
৬৭. তদেব, পৃ. ১২৯
৬৮. তদেব, পৃ. ১৩০
৬৯. তদেব, পৃ. ১২৫
৭০. তদেব, পৃ. ১২৩
৭১. তদেব, পৃ. ১১৭
৭২. তদেব, পৃ. ১১৮
৭৩. তদেব, পৃ. ১১৪
৭৪. তদেব, পৃ. ১৩১
৭৫. তদেব, পৃ. ১৩৩
৭৬. তদেব, পৃ. ১৩৮
৭৭. তদেব, পৃ. ১৪২
৭৮. তদেব, পৃ. ১৪৯
৭৯. তদেব, পৃ. ১৪৯
৮০. তদেব, পৃ. ১৫০
৮১. তদেব, পৃ. ১৫১
৮২. তদেব, পৃ. ১৫১
৮৩. তদেব, পৃ. ১৫৩
৮৪. ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, পৃ. ৮০৬-৮০৭ (বহরমপুর সংস্করণ)
৮৫. অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, পদ সংখ্যা ৯১৩; সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত
৮৬. জ্ঞানদাসের আলোচনায় এই উদ্ধৃতিসহ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'জ্ঞান দাসের পদাবলী' (কলকাতা ১৯৬৫) থেকে আহরণ করা হয়েছে। ক্ষেত্র-বিশেষ বন্ধনীর মধ্যে যে সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে তা পদসংখ্যা সূচক।
৮৭. ভাগবত, ১০।২২।৩১-৩২
৮৮. উজ্জ্বলনীলমণি (বহরমপুর সংস্করণ) পৃ. ৭৯৯
৮৯. মধুপকিতবর্বন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিত মালা কুঙ্কুম শ্মশ্রুভির্নঃ
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্তমীদৃক্ ।।
(ভাগবত, ১০।৪৭।১০)
৯০. ভক্তিরত্নাকর, ৭।১৩৬-১৩৭ (নন্দলাল বিদ্যাসাগর সম্পাদিত; দ্বিতীয় সং)
৯১. পুথি সংখ্যা ৬২০৪
৯২. উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদ প্রঃ, ৪০
৯৩. ভক্তিরত্নাকর, প্রথমতরঙ্গ, পদ ৩৫৮, ২৫৯ পৃ. ১৩
৯৪. তদেব, পদ ৩৭৬, ৩৭৮, পৃ. ১৭
৯৫. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৪৬১
৯৬. তদেব, পৃ. ৪৬২
৯৭. P IV Published in Lalitakala Series-Port Folio No.-9 dated-1680—1700 A.D.
শ্রীমদ্ভাগবতম্, একোনত্রিংশ অধ্যায়, শ্লোক ৬-১০
৯৯. ভক্তিরত্নাকর, ৭ম তরঙ্গ, ৮৪ শ্লোক।
১০০. শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্রচন্দন গিরেশ্চঞ্চদ্দসত্যা-
নিলেনানীতঃ কবিতাবলী পরিমলঃ
কৃষ্ণেন্দু সম্বন্ধ ভাক্
শ্রীমজ্জীব সুরাঙ্ঘ্রি পাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্
সমুন্মাদয়ন্ সর্বস্যাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে
চক্রে কিমন্যৎ পরম্ ।।
ভক্তিরত্নাকর, প্রথম তরঙ্গ, পৃ. ২০
উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদ প্রকরণম্, ৩০ সংখ্যক শ্লোক
১০২. উজ্জ্বলনীলম'ণ, শৃঙ্গারভেদ-প্রঃ ১৩৭।
১০৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, (ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) থেকে পুনরুদ্ধৃত। পৃ. ৭২৩
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর মুখবন্ধ, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী, শ্রীস ভক্তি বিলাসতীর্থ মহারাজ সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ। পরবর্তী আলোচনার এই সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতি সমূহ গৃহীত হয়েছে।
১০৫. ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়।
১০৬. এই আলোচনায় শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ভক্ত পণ্ডিত শ্রীমাধবাচার্য বিরচিত (বঙ্গবাসী, ২য় সংস্করণ, ১৩৩৩) গ্রন্থটি ব্যবহৃত হয়েছে।
১০৭. বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী, বসুমতি সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত, পৃ. ৩৮১।
১০৮. শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-এর ভূমিকা, পৃ.-১ হ'তে পুনরুদ্ধৃত।
১০৯. বাঙ্গালা সাহিত্য (২য় খণ্ড), মণীন্দ্র-মোহন বসু, পৃঃ ১৮১

১১০. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৪৭-১৪৯
১১১. শ্রীমদ্ভাগবত সার, মাধবাচার্য্য, ২য় সং. মাখনলাল ঘোষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত ১৩০৩, পৃ. ২
১১২. ভাগবত ; ১০/৮/২৫
১১৩. ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়, শ্লোক ৩৪
১১৪. ভাগবত, ১০।৭২
১১৫. তদেব, ৪০ সংখ্যক শ্লোক
১১৬. তদেব, ১০।৭৯
১১৭. গোবিন্দমঙ্গল, ঈশানচন্দ্র বসু সম্পাদিত বঙ্গবাসী দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৭ ; পরবর্তী উদ্ধৃতসমূহ এই সংস্করণ থেকে সঙ্কলিত
১১৮. ভাগবত, ১০।৬।৯ম শ্লোক।
১১৯. পুথির এই লিপিকাটি নিজে পড়তে পারি নি, পুথির ওপর পূর্ববর্তী পাঠকের লেখা লিপিকাল থেকে এটি জানা গেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তদশ শতাব্দী

পদাবলীর কৃষ্ণকথা

সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব স্তিমিত হয়েছে। তবে পদাবলী রচনার ধারাটি আগের শতাব্দীর ক্রম-পরম্পরাতেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে এবং এই শতাব্দীতেও কয়েকজন শক্তিশালী কবি বেশ কিছু ভাল পদ রচনা করেছেন। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রাধান নিঃসন্দেহে গোবিন্দদাস কবিরাজ।

গোবিন্দদাস কবিরাজ

গোবিন্দদাস ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করলেও সপ্তদশ শতাব্দীর দুই দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ দর্শনও তিনি লাভ করেন নি। তাই তাঁকে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি বলেই ধরা হয়েছে। কিন্তু বিশেষ সাল তারিখের গণ্ডী না মেনেও বলা যায়, গোবিন্দাদাস মধ্যযুগের এক বিরল ভাস্বর প্রতিভা। রাধাকৃষ্ণলীলা নিয়ে রচিত তাঁর পদাবলীর বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী কবিদের ধারানুবর্তী। কিন্তু অলংকার ব্যবহারে, মণ্ডন কলানৈপুণ্যে, অপূর্ব ছন্দঝংকারে এবং শব্দ ব্যবহারের সুমিত কুশলতায় গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির সার্থক উত্তরসূরী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে সুপরিপক্ক জ্ঞান এবং গভীর ভক্তির মার্জিত দ্যুতিতে তাঁর পদাবলীর মধ্যে এক ধরনের কঠিন সুসংবদ্ধ ক্লাসিক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। আমাদের অন্বিষ্ট কৃষ্ণকথার ক্ষেত্রেও কবির কিছু অবদান রয়েছে। গতানুগতিক রাধাকৃষ্ণলীলা কাহিনীকে নিয়ে পদরচনা করলেও, সেই কাহিনীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের চরিত্রচিত্রণে এবং কথাবস্তুর কিছু কিছু অভিনবত্বে কবির স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কৃষ্ণকথার সেই নিজস্বতাটুকুই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই আলোচনায় অমরা বিমানবিহারী মজুমদারের 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' গ্রন্থটিতে সংকলিত পদসমূহ আলোচনার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করছি।

নানা বৈষ্ণবজীবনী থেকে গোবিন্দদাসের জীবন সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়। ভক্তমাল, প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, সারাবলী, মুক্তাচরিত, অনুরাগবল্লী, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর জীবন কাহিনী পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরই প্রামাণ্য। 'সঙ্গীত দামোদর' রচয়িতা দামোদর সেন ছিলেন গোবিন্দদাসের মাতামহ। তিনি শাক্ত ছিলেন। কিন্তু গোবিন্দদাসের পিতা চিরঞ্জীব সেন চৈতন্যভক্ত পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং অন্যদিকে ছিলেন হুসেন শাহ অথবা তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহের অমাত্য। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় তাঁকে 'গৌরাঙ্গৈকবান্ত শরৈঃ' বলা হয়েছে। গোবিন্দদাসের বাল্যকালে তাঁর পিতা লোকান্তর গমন করলে তিনি মাতামহের কাছে লালিত পালিত হতে থাকেন। গোবিন্দদাস চিকিৎসাশাস্ত্র এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। শ্রীনিবাসের কাছে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

নানা ঐতিহাসিক প্রমাণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গোবিন্দদাস ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জন্মেছিলেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বর্তমান

ছিলেন। তিনি তাঁর মাতামহের প্রভাবে প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন। কিন্তু পরে শ্রীনিবাসের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের আগে গোবিন্দদাস কিছু কিছু হরগৌরী বিষয়ক পদ রচনা করেন। বৈষ্ণব পদসমূহ তাঁর প্রৌঢ় বয়সের রচনা। কারণ তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন চল্লিশ বছর বয়সে। প্রথমে তিনি শ্রীনিবাসের কাছে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনার জন্য অনুমতি চাইলে শ্রীনিবাস তাঁকে বাসু ঘোষের গৌরলীলা বিষয়ক পদগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করতে নির্দেশ দেন এবং সেই সঙ্গে রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি পাঠ করার পরামর্শ দেন। সংস্কৃত সাহিত্যে বিদগ্ধ গোবিন্দদাস বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ে পর্যাপ্ত পাঠ গ্রহণ করে বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় অবতীর্ণ হন। শ্রীনিবাস তাঁর অসামান্য কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'কবিরাজ' উপাধি দিয়েছিলেন। শ্রীজীবগোস্বামীও গোবিন্দদাসের নিকট লিখিত পত্রে তাঁর পদাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। খেতুরীর বৈষ্ণব সম্মেলনোৎসবে নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রও কবির প্রশংসা করেছেন। এ ছাড়াও গোবিন্দদাসের সমসাময়িক এবং পরবর্তী বল্লভদাস, নরহরি চক্রবর্তী, বৈষ্ণবদাস ও রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি পদকর্তারা তাঁর প্রশংসা করে পদ রচনা করেছেন। উত্তরকালে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদাবলীর ধারা গোবিন্দদাসের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদকর্তারা এই কারণেই তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন।

'সঙ্গীতমাধব' নামে যে সংস্কৃত নাটকটি গোবিন্দদাস রচনা করেছিলেন, তা পাওয়া যায় নি। কেবলমাত্র ভক্তিরত্নাকরে এর কিছু অংশের উল্লেখ আছে। তবে নিজের রাধা কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদগুলির একটি সঙ্কলনও সম্ভবতঃ তিনি করেছিলেন। বিদ্যাপতির কিছু কিছু অসম্পূর্ণ পদও গোবিন্দদাস সার্থকভাবেই পূরণ করেছিলেন।

বৈষ্ণব পদকারেরা রাধাকৃষ্ণলীলার বিভিন্ন অংশগুলি সব সময় পর্যায়ক্রমে রচনা না করলেও তাঁদের রচিত রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদগুলিকে সাজিয়ে ফেললে ধারাবাহিক কাহিনী পাওয়া যায়। গোবিন্দদাসও তার ব্যতিক্রম নন। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে বাসুদেব ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, রামানন্দ বসু, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতি কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজকে সর্বোত্তম বলা যায়।

শ্রীনিবাস তাঁকে গৌরলীলা বিষয়ক পদরচনা থেকে নিবৃত্ত করলেও গোবিন্দদাস অপূর্ব কাব্য সৌন্দর্যময়, ভক্তিরসগত ও ভাব সমৃদ্ধ গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদও কিছু কিছু রচনা করেছেন। কিন্তু সেগুলি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এর আগেই রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা তথা অষ্টকালীয় লীলার উল্লেখ করা হয়েছে। পদ্মপুরাণ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত এর প্রাথমিক উৎস। গোবিন্দদাস এই অষ্টকালীয় লীলাকে উপজীব্য করে রচনা করেছেন 'অষ্টকালীয়লীলা' বর্ণন। একেবারে রাত্রির শেষ যাম থেকে আবার সন্ধ্যা পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণের দৈনন্দিন লীলা এখানে বর্ণিত।

নন্দগৃহে রাত্রিশেষে বৃন্দাদেবী ও অন্যান্য সখীরা জেগে উঠলে বৃন্দার নির্দেশে সখীরা 'জটিলা আসছে' এই কথা বলে রাধাকে জাগিয়ে দিল। বৃন্দার নির্দেশে

পাখীরা মধুর সুরে গান গাইতে লাগল। গোবিন্দদাস মন্দিরের কাছে ঝারি হাতে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন (পদ-৪৯)। ধীরে ধীরে আকাশে আলো ফুটতে থাকল। কমল বিকশিত হল। কিন্তু তখনও—

কিশলয় শয়নে নিচল তনু শ্যামর—
মরকত কাঞ্চন গোরি। (পদ-৫০)

রাধার চলে যাওয়ার সময় হয়েছে জেনে সখীরা বিদায় নিতে এসেও রাধাকৃষ্ণের সুমধুর মিলন দৃশ্য দেখতে লাগলেন। এই সময় বানরী ককখটী ডেকে উঠে প্রভাতের সংকেত করল, কোকিল ডাকতে লাগল। রাধা জেগে উঠে কৃষ্ণকে শীঘ্র তাঁর বেষভূষা করে দিতে বললেন। কারণ গুরুজন, পরিজন এবং ননদী—সবাই দুর্জন। কিন্তু কৃষ্ণ রাধাকে শীঘ্র ছাড়তে চান না বলে, রাধাকে সাজাতে তাঁর বিলম্ব হতে লাগল। এজন্য রাধা কৃষ্ণকে তিরস্কার করলেন। এরপর কৃষ্ণ নিজের আঁচল দিয়ে রাধার মুখ মুছিয়ে দিয়ে কুংকুমে সুন্দর শরীর প্রসাধিত করলেন। কবরী রচনা করে, কপালে অলকা তিলকা দিয়ে, সীঁথিতে সিঁদুর দিলেন। প্রসাধন সমাপ্ত করে তিনি রাধার মুখে কপূর্র তাম্বুল দিলেন। গোবিন্দদাস রাধার পায়ে আলতা পরাতে বসলেন। বেশভূষা সমাপ্ত হওয়ার পর রাধাকে বিদায় দিতে গিয়ে কৃষ্ণ বেদনার্ত হয়ে পড়লেন। রাধা কৃষ্ণকে সান্ত্বনা দিয়ে নিজের গৃহে গিয়ে রত্নশয্যার ওপর বসলেন (পদ ৫২, ৫৬, ৫৭)।

প্রভাত হল, ধীরে ধীরে গৃহে কর্মচাঞ্চল্য জাগল। কোন সখী দধিমন্থন করতে লাগলেন, কেউ গুরুজনদের সেবা করতে লাগলেন, কেউ কনক কুম্ভ কাঁখে নিয়ে চলে গেলেন, আবার কেউ বা পুষ্পচয়ন করে মালা গাঁথতে লাগলেন (পদ ৫৯)। জননী যশোদা কৃষ্ণকে জাগাতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর পরিধানে নীল বস্ত্র। এটিকে তিনি বলরামের নীলবস্ত্র ভেবে ভুল করলেন। সারা রাত্রির বিলাসে ক্লান্ত কৃষ্ণের ম্লান দেহ জননীর মনে আশংকা জাগিয়ে তুলল। তিনি পুত্রকে মঙ্গলস্নান করিয়ে দই ভাত খাওয়াবার কথা চিন্তা করলেন। মায়ের এই আশংকায় কৃষ্ণ কাপড়ে মুখ ঢেকে হাসলেন (পদ ৬০, ৬১)। এদিকে সুসজ্জিতা রাধাও সহচরীর সঙ্গে সুবাসিত তৈল ও হলুদ নিয়ে নদীতে স্নান করতে চললেন।

এরপর পূর্বাহ্নলীলার বর্ণনা। কৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে ভোজনে বসেছেন। রোহিণী পরিবেশন করছেন, আর রাধা যোগাচ্ছেন। সোনার থালায় বিবিধ মিঠাই, নবনী, দধি, চিনি এবং সুমধুর অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ করে কৃষ্ণ পালংকে শয়ন করলেন। তাঁর ভুক্তাবশিষ্ট রাধা ভোজন করলেন।

কৃষ্ণ তাঁর সখাদের সঙ্গে পথে বেরোলে, রাধা অট্টালিকার ওপর থেকে তাঁকে দেখলেন। দুজনের চোখে চোখে মিলন হল। এরপর শ্রীকৃষ্ণের সখা মধুমঙ্গল পথে দেখা দিলে, তাকে দেখে সখারা করতালি দিতে লাগল। তার পা তিন জায়গায় বাঁকা, কপালে যমুনার পাঁক, কথা বলার সময় মুখে বিচিত্র ভঙ্গী। সকালে উঠেই তিনি সবার সংগে বিবাদ বাধিয়ে দেন। এবং—

মধুগুড় লোভিত বাউল চীত।
বন্ধক দেওই যজ্ঞোপবীত॥ (পদ-৬৬)

শ্রীরূপ গোস্বামী-সৃষ্ট কৃষ্ণের এই বয়স্য চরিত্রটিকে গোবিন্দদাস আরও জীবন্ত ও বাস্তব করে তুলেছেন। মধু আর গুড়ের লোভে সে যজ্ঞোপবীতও বাঁধা দিতে প্রস্তুত।

এই সমস্ত সখাদের সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়ে, কৃষ্ণ অন্য ছলে সুবলের হাত ধরে বনের মধ্যে গেলেন। সেখানে ফুলগাছ থেকে ফুল তুলে তিনি যত্নে হার গাঁথলেন। এরপর রাধাকুণ্ডের তীরে বসে কৃষ্ণ রাধার আগমনের অপেক্ষায় পথের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কুংকুমের রঙ দেখে রাধার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। এই সময় রাধা সখীকে নিয়ে কুণ্ডে প্রবেশ করলেন। তিনি এসে পট্টবস্ত্রে কৃষ্ণের মুখ মুছিয়ে দিয়ে বসনে বীজন করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও কৃষ্ণের তন্গতভাব কাটল না। অতঃপর রাধা তাঁর মুখে কর্পূর তাম্বুল পুরে দেওয়ায়, কৃষ্ণ সচকিত হয়ে উঠলেন। মিলনের শেষে রাধা সখীর সঙ্গে চলে গেলেন।

পরে মধ্যাহ্নলীলা বর্ণন। সখীদের সঙ্গে 'বররঙ্গিনি' রাধা সূর্যপূজার জন্য চললেন। গুরুজনদের কাছ থেকে কর্পূর, তাম্বুল ও সুগন্ধি চন্দন প্রভৃতি বহু উপহার সঙ্গে নিলেন। এ ছাড়াও চিনি, কলা ও সর সখীদের হাতে দিলেন। 'জয় জয়' শব্দ করতে করতে হুলু ধ্বনি দিয়ে তাঁরা রাধাকুণ্ডে গমন করলেন। সেখানে রাধাকৃষ্ণ উভয়ের হাতে হাতে, চোখে চোখে মিলন এবং তাতে বিবিধ সাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল। কৃষ্ণ গোষ্ঠে যাবেন, তাঁর ক্ষুধা পাবে, তাই রাধা সবার অলক্ষ্যে কৃষ্ণের কাছে এসে তাঁর আঁচল ভরে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন দিয়ে আবার সবার অগোচরেই চলে গেলেন। নগরের লোক কেউই তাঁকে দেখতে পেল না। বেশভূষা করে কৃষ্ণ বলরাম গোধন নিয়ে যমুনার তীরে চললেন, তাঁর সঙ্গে গোপ ও গোপ বালকেরাও চলল। বেণু ও বিষাণের ঘোর ঘন শব্দ উঠল। কৃষ্ণ সুবল সখার সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন (পদ-২৪)। এদিকে কৃষ্ণ গোষ্ঠে চলে এলে তাঁর বিরহে ব্রজের অধিবাসী ও কুলবতী নারীরা সবাই গোষ্ঠে চলে এলেন। কৃষ্ণ তাঁদের সকলকেই বহু কষ্টে বুঝিয়ে আবার গৃহে পাঠালেন। তাঁরা কাতরভাবে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। এদিকে বিরহিণী রাধাও নিজ গৃহে প্রিয় সখীকে কৃষ্ণ অন্বেষণে যাওয়ার অনুরোধ জানালেন। রাধা সখীর হাত নিজের মাথায় দিয়ে কাতর সুরে বংশীবট, কদম্বতট, ধীর সমীর, সংকেত স্থান, কেলিকদম্ব, নিকুঞ্জবন ও গোবর্ধন কানন প্রভৃতি স্থানে কৃষ্ণকে খুঁজতে অনুরোধ করলেন (পদ-৭৩)। সখী বনে বনে ঘুরে কৃষ্ণের দর্শন পেয়ে রাধার কাছে সত্বর ফিরে গেলেন। তখন রাধা ও তাঁর সহচরীরা কৃষ্ণের কাছে যাওয়ার জন্য বেশভূষা সম্পন্ন করলেন। এরপর রাধাকৃষ্ণের মিলন হল। রত্নমন্দিরে রাধাকৃষ্ণ সখীদের মাঝখানে বসলেন। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে বৃন্দাদেবী সীধুর তুলনায়ও উৎকৃষ্ট সুবাসিত মধু এনে দিল। মধুপান করে নেশার ঘোরে অবলারা ঘুমে ঢুলে পড়তে লাগলেন ও অবশেষে নিজেদের কুঞ্জ শয্যায় শয়ন করলেন। এরপর দুজনে মিলে বিপিনে জলক্রীড়া করতে লাগলেন। জলক্রীড়ার পর কূলে উঠে দুজনে সাজসজ্জা করে কুঞ্জে প্রবেশ করলেন ও বিবিধ মিঠাই ভক্ষণ করলেন। রাধা যত্ন করে শ্যামকে খাওয়ালেন। তিনি নিজে সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণের ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করলেন। দুজনেই দুজনের মুখ মুছিয়ে, বদনে তাম্বুল দিলেন। দুজনের মিলনলীলা দেখে মনে হল—

কতহি যতন করি বিধি নিরমায়ল
দুহুঁ তনু একই পরাণ। (পদ-৮১)

দুজনের রসক্রীড়ার পর কৃষ্ণ ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই সুযোগে রাধা ও তাঁর সখীরা মিলে কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করলেন। এই মুরলী চুরির লীলা বিদগ্ধমাধবের চতুর্থ অঙ্কে ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী হারিয়ে ব্যাকুলভাবে সখীদের জিজ্ঞাসা করলে—

মধুর মধুর কহে বিনোদিনী রাই।
কাঁহা পুন ছোড়লি কাঁহা পুন চাই। (পদ-৮৩)

কাতরভাবে কৃষ্ণ কুঞ্জগৃহের মাঝখানে সখীদের হাত ধরে মুরলী প্রার্থনা করলেন। এরপর রাধা সখীদের সঙ্গে নিয়ে কুণ্ডে স্নান করলেন। কৃষ্ণ তাঁর বেশভূষা সম্পন্ন করলেন। বেশ প্রসাধন সমাপ্ত হওয়ার পর রাধা সোনার থালায় চিনি কলা ও সর নিয়ে কৃষ্ণকে খেতে দিলেন। সখীরা সুবাসিত জল ও কর্পূর দেওয়া পান যোগাল, শ্যামের অঙ্গে অগুরু চন্দন লেপন করে ফুল দিয়ে বাতাস করল। কৃষ্ণ সখীদের সঙ্গে বিহার করলেন (পদ-৮৬)। এই সময় শুক পক্ষী এসে জটিলার আগমনের সংবাদ জানিয়ে দিলে, কৃষ্ণ বিপ্রবেশ ধারণ করলেন। রাধা এবং তাঁর সখীরা ষোড়শোপচার সাজিয়ে সূর্যমন্দিরে চললেন। জটিলার সামনে এসে বিপ্রবেশী কৃষ্ণ বললেন, তাঁর নাম বিশু-শর্মা। জটিলা তাঁকে সূর্য মন্দিরের পূজারীরূপে নিযুক্ত করে বলল, তিনি যেন প্রতিদিন এসে পূজা করে যান আর শুভ বর দিয়ে যান, যাতে তাঁর পুত্র গোধন ও রত্ন লাভ করে এবং বধূ সতী হয়। কৃষ্ণ বললেন, তাই-ই হবে। তিনি দিনরাত্রি জটিলার কল্যাণের জন্য পূজা করবেন। উত্তরে জটিলা বললেন, তুমি যা করবে, তাই-ই সফল হবে। কারণ তুমি তেজিয়ান ব্রহ্মচারী। জটিলার এই কথা শুনে ব্রজনারীরা কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসলেন (পদ-৮৭)। এরপর সখীরা ঘন ঘন উলু দিয়ে, জয়শঙ্খ বাজিয়ে সুবাসিত কুঙ্কুম সুগন্ধি চন্দন ও কর্পূর দিয়ে দেবতার পূজা করল। কৃষ্ণ হলেন পূজারী। পূজা শেষ হলে, রাধা তাঁর গৃহে গমন করলেন। কৃষ্ণ বনে গোচারণ স্থানে চলে গেলেন।

অপরাহ্নকালে বেলা অবসান দেখে কৃষ্ণ বাঁশী বাজালেন। তাঁর বাঁশীর সুরে গহন-গিরি গুহার যেখানে যেখানে ধেনুরা ছিল, সবাই জড়ো হল যমুনার তীরে। ব্রজবাসীরা গৃহদ্বারের দু'পাশে হেমকলস রেখে, ধূপ দীপ জ্বালিয়ে শ্যাম দর্শনের জন্য মঙ্গল গান করতে লাগলেন। অতঃপর গোষ্ঠে গো-পালকে রেখে সখারা নিজ নিজ গৃহে গেল (পদ-৯০,৯১)। রাধাও নিজের গৃহে প্রবেশ করলে গুরুজনেরা তাঁকে দেখে আনন্দ পেলেন। শিরীষ ফুলের মত কোমল দেহ আর ঢলঢল চাঁদের মত সুন্দরমুখী রাধা এইভাবে প্রতিদিন কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে লাগলেন।

নন্দের গৃহে কৃষ্ণকে ফিরতে দেখে যশোমতী আনন্দে বিভোর হলেন। সুবাসিত তেল ও শীতল জল দিয়ে পুত্রের শরীর মার্জনা করলেন, চুল খুলে আবার বেঁধে দিয়ে চূড়ায় ময়ূর পাখা দিলেন। পা ধুয়ে সর্বাঙ্গ মুছে দিলেন এবং স্নেহ ভরে ভোজন করালেন (পদ-৯৪)।

সন্ধ্যাবেলায় যশোমতী থালার ওপর দীপ জেবলে আরতি করলেন। ব্রজরমণীরা ঘন্টা, ঝাঁঝরি, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাজিয়ে কুসুম বর্ষণ করলেন। এরপর রাধাকে আনার জন্য যশোমতী সখীদের পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন—

হামারি সন্দেশ কহবি সব গরুজনে
আনবি রসবতি রাই। (পদ-৯৭)

যশোমতীর কথায় বহুবিধ দ্রব্যে পূর্ণ থালা সযত্নে মাথায় ধরে সখী রাধার বাড়ীতে গেলেন। সেখানে যশোমতীর বার্তা জানালে, গুরুজনেরা রাধাকে যশোদার গৃহে আসার অনুমতি দিলেন। রাধা সখীর সঙ্গে যশোমতীর গৃহে এলেন। তাঁর দেহ রক্ত পট্টাম্বরে ঢাকা, চোখ দুটি কাজলে উজ্জ্বল, দন্তজ্যোতি মুক্তাকেও হার মানায়, বর্ণ কাঞ্চনের চেয়েও উজ্জ্বল, বচন কোকিলের রবের মত সুমধুর, হস্ত ও পদতল কমলদলের মত রক্তিম। এই অপরূপা সৌন্দর্যময়ী রাধার চন্দ্রবদন দেখে কৃষ্ণের নয়নচকোর মুগ্ধ হল। ধবলীকে বাঁধতে ভুলে গিয়ে, তার বৎসকে আটকে রেখে তিনি শূন্যে গোদোহন করতে লাগলেন। তাঁর এই বৃথা অঙ্গুলিচালনা দেখে ব্রজনারীরা হাসতে থাকলে লজ্জিত কৃষ্ণ ধবলী ভ্রমে ধবলের পায়ে ছান্দনডোর বাঁধলেন (পদ-৯১)। অবশেষে রাধা-দর্শনে আত্মবিস্মৃত কৃষ্ণ প্রেমাবেশে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন (পদ-১০০)। তাঁর দুটি চোখে অশ্রু দেখা দিল, দেহ পুলকে ভরে গেল। রাধা নন্দের মহলে প্রবেশ করলেন। যশোদা রাধাকে দেখে আনন্দিত হলেন। রাধা কৃষ্ণের জন্য সুবাসিত অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করলেন। প্রত্যহই তিনি এইভাবে যাতায়াত করেন, কিন্তু কেউ জানতে পারে না (পদ-১০১)।

প্রদোষকালে কিশোর মোহন কৃষ্ণ নন্দের পুরীর বাইরে বিচিত্র সিংহাসনে বসলেন। তাঁকে ঘিরে কেউ গাইতে লাগল, কেউ বাজাতে লাগল, আবার কেউ বা নাচতে লাগল, কেউ কেউ চামর নিয়ে বীজন করতে লাগল।

অতঃপর নৈশলীলা। কৃষ্ণ নিজগৃহে শয়ন করলেন। সারা নগরীর লোক নিঃশব্দ হয়ে গেল (পদ-১০৪)। নিভৃত নিকুঞ্জে গিয়ে কিশলয় শয্যা পেতে রাধার জন্য কৃষ্ণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাধা কুঞ্জে উপনীত হলে দুজনের মিলন ঘটল। স্বাধীন ভর্তৃকা রাধা কৃষ্ণকে তাঁর বেশ বিন্যস্ত করে দেওয়ার আদেশ করলেন। সযত্নে রাধার বেশ ও প্রসাধন ঠিক করে দিয়ে কৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন—'কহ পুন কি করব অনুচর কান।' এরপর রতিরসে অবশ রাধা মাধবের কোলে নিভৃত নিকুঞ্জে নিদ্রা গেলেন (পদ—১১২)।

এইভাবে গোবিন্দদাস প্রভাতকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত, রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করেছেন। অষ্টকালীয় লীলার এই দৈনন্দিন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায়ও গোবিন্দদাসের রাধা, কৃষ্ণ, সেবাময়ী লীলাসহচরী সখী ও স্নেহস্নিগ্ধা যশোদার চিত্র উজ্জ্বল। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রাধারও পারিবারিক পরিমণ্ডলটুকু রয়েছে। কিন্তু সেই রাধা স্বরূপতঃ গোবিন্দদাসের রাধার তুলনায় এতই পৃথক যে, তুলনার প্রশ্নই ওঠে না। জয়দেবের রাধা কেবলই প্রেমিকা, তাঁর কোন পারিবারিক প্রতিবেশ নেই। বিদ্যাপতিতেও প্রায় তাই। চণ্ডীদাসের রাধার প্রেমের অজস্র বিঘ্ন উৎপাদনই তাঁর পারিপার্শ্বিকতার একমাত্র

কাজ। পদাবলী সাহিত্যেও সেই পারিবারিক প্রতিবেশ রয়েছে। কিন্তু অষ্টকালীয় লীলার মূল্য পৃথক্। এখানে দিনরাত্রির বিচিত্র কর্মব্যপদেশে রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটেছে। রাধা এখানে সেবাময়ী সুনিপুণা গৃহিণী। তিনি কৃষ্ণের জন্য রন্ধন করেন, তাঁকে যত্ন করে ভোজন করান, আবার আদর্শ পতিব্রতা নারীর মত তাঁর ভুক্তাবিশিষ্টটুকুও গ্রহণ করেন। পরকীয়া প্রেমের তীব্র উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তা এর ফলে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। কারণ রন্ধন করার জন্য যশোমতী নিজেই রাধাকে তাঁর গৃহে ডেকে আনেন। গোবিন্দলীলামৃতে দুর্বাসা রাধাকে রন্ধন পটীয়সী হওয়ার বর দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, রাধার রন্ধন ভোজন করলে লোকে দীর্ঘজীবী হবে, এ বরও দিয়েছিলেন। সেই কারণেই যশোমতী তাঁকে ডেকে এনে কৃষ্ণের জন্য রন্ধন করাতেন। কিন্তু গোবিন্দদাসের পদে তার কোন উল্লেখ নেই।

রাধার রূপদর্শনে কৃষ্ণের আত্মবিস্মৃতি, শূন্যে গোদোহন, রাত্রিতে রাধার সঙ্গে মিলিত বিলাসক্লান্ত কৃষ্ণকে দেখে প্রভাতে জননী যশোদার অমঙ্গল আশঙ্কা প্রভৃতি চিত্রনির্মাণে কবির নিবিড় জীবন অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য, কথা-বস্তু হিসেবে এগুলি খুব একটা মৌলিক নয়।

গোবিন্দদাসকে আমরা প্রধানতঃ অভিসার, উৎকণ্ঠা ও ভাবোল্লাসের কবি বলেই জানি। বিশেষতঃ অভিসার বিষয়ক পদরচনায় গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবিদের কৃতিত্বকেও ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা নিয়েও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদ তিনি রচনা করেছেন। বাল্যলীলার পদে যশোমতীর ক্রোড়ে শিশু কৃষ্ণের বর্ণনা করতে গিয়ে কবি ঐশ্বর্যভাব একটু বেশী পরিমাণে এনে ফেলেছেন। তবে যশোমতীর বাৎসল্য এতে অকৃত্রিমভাবেই ফুটে উঠেছে। পুত্রকে কোলে নিয়ে পরিধানবসনে রাণী তাঁর মুখ মুছে দেন। সমবয়সী বালকদের সঙ্গে সমবেশভূষায় সজ্জিত হয়ে কৃষ্ণ গোষ্ঠে চলেন (পদ—১৪৯)। তারপর সন্ধ্যাবেলায় 'গোধূলিধূসর অঙ্গ' কৃষ্ণ বাড়ী ফিরে এলে অনিন্দিতা যশোমতী থালায় প্রদীপ জেবলে আরতি করেন। সমস্ত ব্রজরমণীরা কৃষ্ণকে ঘিরে ঘণ্টা, তাল, মৃদঙ্গ বাজাতে থাকেন। আনন্দিত দেবতারা কুসুম বর্ষণ করেন। গোষ্ঠলীলা ও বাৎসল্যের মধ্যে কৃষ্ণের প্রতি যে ঐশ্বর্যভাব বিস্মৃত স্নেহ ও মানবিক আবেদন প্রকাশ পায়, গোবিন্দদাসের পদে তা অনুপস্থিত। একদিকে ঐশ্বর্যভাবের প্রাবল্য, অন্যদিকে মধুর রসের প্রত্যক্ষ ও প্রচুর উপস্থিতিও বাৎসল্য রসকে ব্যাহত করেছে। বাৎসল্য রসের মধ্যে এই মধুর রসের উপস্থিতি শ্রীরূপের মৌলিক পরিকল্পনা। গীতাবলীর ২৮ সংখ্যক গীতে এর উদাহরণ রয়েছে। শ্রীরূপের এই পরিকল্পনা গোবিন্দদাসকেও প্রভাবিত করে থাকবে—

বল সঙ্গে গিরিবর ধর আওয়ে
জলদ হেরি জনু হরষিত চাতকী
ব্রজ রমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে ॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় গোবিন্দদাস তাঁর প্রতিভার বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। চৈতন্য পূর্ববর্তীযুগে কৃষ্ণের চোখ দিয়ে রাধার রূপই বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ সেখানে

কৃষ্ণ রাধার রূপ মুগ্ধ প্রণয়ী। অন্যদিকে চৈতন্য পরবর্তীযুগে রাধা, কৃষ্ণের প্রেমে আত্মহারা। চৈতন্যের মধ্যে মূর্ত হয়েছিল রাধার ভাবতন্ময়তা, তাই এযুগে কৃষ্ণের রূপ বর্ণনার প্রতি কবিদের সমধিক আগ্রহ। গোবিন্দদাসের কৃষ্ণও মূর্তিমান মদন। রাধা কৃষ্ণকে দেখে মুগ্ধ হয়ে সখীর কাছে সেই অনুপম রূপ বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণের দেহবর্ণ 'অঞ্জন গঞ্জন জগজন রঞ্জন' (পদ-১৫৮), তাঁর 'মণিমঞ্জির রঞ্জিত চরণ', তাঁর ভ্রূরূপ নাগপাশে কুলবতীর মন বাঁধা পড়ে যায়। এই কৃষ্ণ যেন রাধারই 'আপন মনের মাধুরী' মেশানো রচনা। গোবিন্দদাস তাঁর অসামান্য শব্দালংকার ঝঙ্কৃত ভাষায় কৃষ্ণের যে অনুপম রূপ বর্ণনা করেছেন, তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে সেই রূপের তীব্র আকর্ষণী শক্তির বর্ণনায়। তাঁর রূপের আকর্ষণ বোঝাতে গিয়ে গোবিন্দদাসের লেখনীও যেন উল্লসিত। গোবিন্দদাসের কৃষ্ণের 'অংগহি অংগ অনংগ তরঙ্গিম' (পদ-১৬৪), তিনি 'কামিনি—মনহি মুরতিময় মনসিজ' (পদ-১৫৯) 'রাধা রমণ রমণি মন মোহণ', 'নাগরি—নারি—হৃদয়—ঘন-চন্দন' (পদ-১৬৮), ব্রজকুল—গোকুল আনন্দ কন্দ', (১৭১), তাঁর দুটি চোখ 'কুলবতি—বরত—বিমোচন' (পদ-১৭২)। শুধু রূপ নয়, কৃষ্ণের বাণীও 'কলুষ মোচন, শ্রবণরোচন'। কৃষ্ণের এই রূপ দেখে রাধা আর গৃহে ফিরতে পারলেন না। তাঁর প্রাণ আকুল হয়ে উঠল।

শ্রীরাধার রূপ বর্ণনায় কবি প্রধানতঃ অলংকার শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁর বর্ণ স্বর্ণদীপ, মণি ও বিদ্যুতের উজ্জ্বলতাকে পরাজিত করে। তিনি যেন মূর্তিমতী শৃংগার রস। এই সুন্দরী রাধা কানড় ছাঁদে কবরী বেঁধে তার ওপর মালতীর মালা দোলান। রাধার এই রূপ দেখে কবির অথবা কৃষ্ণের প্রশ্ন—

ধনি ধনি কো বিহি বৈদগধি সাধে।
মদন সুধারসে যো নিরমাওল
তুয়া মুখ মণ্ডল রাধে।। (পদ-১৮১)

এই বিস্ময়ের সঙ্গে কবির ভক্তিতন্ময় রূপ প্রশস্তি যুক্ত হয়ে, রাধার রূপ বর্ণনাকে গতানুগতিকতা মুক্ত করে তুলেছে। কবি দেখেছেন, রাধার গৌর রূপের উজ্জ্বল কিরণে নিধুবন গৌররূপ ধারণ করেছে। তাল, তমাল, বেলও শ্যামবর্ণ পরিত্যাগ করে গৌরবরণ লাভ করছে। রাধার সখীরা, এমনকি স্বয়ং কৃষ্ণও রাধার গৌররূপের আভায় গৌরবর্ণ ধারণ করেলা (পদ ১৭৬)। গৌরী রাধার রূপ-কিরণে সর্বস্নাত বৃন্দাবনের এই উজ্জ্বল চিত্র আসলে শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যভাবদ্যুতিতে উজ্জ্বল বৃন্দাবন-মহিমার বর্ণনা। কবি গোবিন্দদাসের পদে, এখানে রাধা ও গৌরাঙ্গ অভিন্ন।

গোবিন্দদাসের রাধা প্রথম দর্শনেই কৃষ্ণের রূপে আত্মবিস্মৃত। কৃষ্ণের নীল জলদের মত সুন্দর দেহ, ভুরু মদনের ধনু আর চোখ যেন মদনের ফুলবাণ। রূপ দর্শনের সেই মুগ্ধ আনন্দ রাধা সখীর কাছে ব্যক্ত করেন। কেলিকদম্বের তলে শুধু কৃষ্ণের রূপ দেখেই রাধা মুগ্ধ নন, কৃষ্ণ ঈষৎ হেসে তাঁর মনের আকুতিও রাধার কাছে প্রকাশ করেছেন। রাধা তাঁর কথা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু মদনবাণে তাঁর মন ব্যাকুল হয়েছে। তাই তিনি সখীকে বলছেন—'এ সখী কাহে ভেটলুঁ' নন্দ-নন্দনা' (পদ-১৮৮)। এখন গৃহ তাঁর কাছে অরণ্যের মত, চন্দন অগ্নিতুল্য, দক্ষিণ

পবনে আর শীতলতা নেই। চাঁদের নাম পর্যন্ত রাধার সহ্য হয় না। রাধার চোখ আর মন দুই-ই কৃষ্ণে সংলগ্ন, ধৈর্য আর লজ্জা কোনটিই তাঁর অবশিষ্ট নেই। এখন রাধা কৃষ্ণকে ছাড়া একাকী আর বাঁচতেও চান না। পদ্যাবলীতে কবি জয়ন্তের যে পদটি রয়েছে, তার সঙ্গে এর ভাবসাদৃশ্য আছে—

অকস্মাদেকস্মিন্ পথি সখি ময়া যামুনতটীং
ব্রজন্ত্যা দৃষ্টোঽয়ং নবজলধর শ্যামলতনুঃ।
স দৃগ্ভঙ্গ্যা কিংবাহকুরুত নহি জানে তত ইদং
মনো মে ব্যালোলং ক্বচন গৃহকৃত্যে ন লগতে [১]

সখী কৃষ্ণের কাছে গিয়ে রাধার এই অবস্থা জানিয়ে বলেন, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে গৌরী আরাধনা করেছিলেন। তাই রাধা তাঁর প্রতি এত অনুরক্ত। তিনি গৃহস্বামীর গলা শুনে চমকে ওঠেন, অথচ কৃষ্ণের নূপুরের শব্দে উন্মত্ত হয়ে সেদিকে ছুটে যান। স্বামী কৃষ্ণবর্ণ না গৌরবর্ণ তাও রাধা তাকিয়ে দেখেন না। স্বামীর শয়ন-মন্দিরেও তিনি প্রবেশ করেন না। এমন কি, স্বামীর করস্পর্শকেও তিনি জঞ্জাল বলে মনে করেন। কৃষ্ণ ভেবে, বিজনে তিনি তরুণ তমালকে জড়িয়ে ধরেন। শুধু তাই নয়, রাধা সম্পূর্ণরূপে শ্যামময় হয়ে গেছেন। তাঁর চোখে শ্যাম কজ্জল, মুখে শ্যাম নাম, অঙ্গে 'শ্যামর চারু নিচোল' (পদ—১১০), শ্যাম তাঁর বক্ষের হার, 'হৃদয়ের মণি'। শ্যামবর্ণা সখীকে তিনি আলিঙ্গন করেন। শ্যামরূপ রাধার মর্মে লেগেছে। কিন্তু তাঁর পরিজনেরা নিষ্ঠুর। তাঁদের গঞ্জনায় রাধার মুখ ম্লান হয়ে গেছে। অবিরল অশ্রুধারায় তাঁর চোখের কাজলও ধুয়ে যাচ্ছে। সারারাত কৃষ্ণের কথা ভেবে রাধা বিনিদ্র রজনী যাপন করেন। সখী রাধার ভাবভঙ্গী দেখে বলেন, রাধা গোপন করতে চাইলেও তিনি বুঝতে পেরেছেন যে শ্যামের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। কারণ রাধার 'মরমক বেদন বদন সব কহই' (পদ-১৯১)। রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগের সেই প্রচলিত কথাবস্তুকেই গোবিন্দদাস রাধার অজস্র সূক্ষ্ম ভাববৈচিত্র্যে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। পুরাতন কৃষ্ণকথা এইভাবে নবতর আস্বাদনলাভ করেছে। গোবিন্দদাসের পূর্বরাগের পদেও অন্যান্য পদকারদের মত সখীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সখী রাধার হিতাকাঙ্খিনী অভিভাবিকার মত। তাই তিনি কৃষ্ণের কাছে অনুযোগ করেন, কৃষ্ণেরই কটাক্ষে বালিকা মদন অনভিজ্ঞা রাধা, যিনি সঙ্গে খেলা করে বেড়ান, তিনি আজ শ্যাম প্রেমে কাঞ্চনবর্ণ পরিত্যাগ করে শ্যামবর্ণ ধারণ করেছেন। আবার কখনও সখী বলেন, শ্রীরাধা মণি-মন্দিরের উপর সখীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকার সময় কৃষ্ণকে দেখেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন।

একটি পদে কৃষ্ণ প্রেমতন্ময়তায় বিহ্বলা রাধার প্রেমযন্ত্রণা বড় সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সখীকে বলছেন, কুলবতী হয়ে তিনি একই সঙ্গে তিনজন পুরুষের প্রেমে পড়েছেন। প্রথমে 'শ্যাম' এই দুটি অক্ষর তার মন চুরি করে নিল, তারপর অন্যজনের মুরলীধ্বনি তাঁর শ্রবণকে মুগ্ধ করল। আবার সখী চিত্রপটে এক নবজলধরকান্তি পুরুষকে দেখালে সেই পুরুষ রাধার মনকে মুগ্ধ করল। রাধার এই বিপদে কবি গোবিন্দদাস সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এই তিনজন পুরুষ

আসলে একজনই। এই পদটি রচনা করতে গিয়ে গোবিন্দদাস প্রত্যক্ষভাবে শ্রীরূপের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের একটি শ্লোকে শ্রীরূপের রাধা বলেছেন—'সখি, একজনের 'কৃষ্ণ এই নামাক্ষর শুনেই আমার জ্ঞান লোপ পেয়েছে, অন্যজনের বংশী ধ্বনি আমাকে উন্মাদ করে তুলেছে, চিত্রে দর্শনহেতু এই স্নিগ্ধ ঘনদ্যুতি পুরুষ আমার মনে বিরাজ করছে। ধিক, কি কষ্ট, তিনজন পুরুষে একসঙ্গে অনুরাগ, এর চেয়ে মরণও শ্রেয়।' একটি পদে সাধারণ গোপীপ্রেমের তুলনায় রাধাপ্রেমের চরমোৎকর্ষ ব্যক্ত হয়েছে (পদ-২০৪)। রাধা বলেছেন, অর্ধেকেরও অর্ধেক দৃষ্টিতে কৃষ্ণকে দেখেই তাঁর প্রাণ জরজর, যারা দুনয়ন ভরে কৃষ্ণকে দেখে তাদের পায়ে তিনি প্রণাম করেন। সুনয়নী বলেন কানু ঘন শ্যাম। কিন্তু রাধার কাছে তিনি বিদ্যুতের মত জ্বালাময়, আর প্রেমবতী প্রেমের জন্য জীবন ত্যাগ করেন, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমকে অনুভব করার জন্য রাধা চপল জীবনকেই কাঙ্ক্ষণীয় বলে মনে করেন। সাধারণ নারীর প্রেমের তুলনায় এই বৈপরীত্যই রাধাপ্রেমের বিশিষ্টতা সূচিত করেছে। অপর একটি পদে সখী চিত্রপটে কৃষ্ণের মোহন মূর্তি অঙ্কন করে রাধার সামনে এনে ধরেছেন। এই পদটি রচনায়ও কবি, শ্রীরূপ গোস্বামীর দ্বারা প্রভাবিত। শ্রীরূপের 'বিদগ্ধমাব' নাটকে বিশাখার রচিত চিত্রপট দর্শনে, রাধার মনে পূর্বরাগের উন্মেষ হয়েছে।

জ্ঞানদাসকে মধ্যযুগের একমাত্র রোমান্টিক কবি বলা হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে রূপদক্ষ গোবিন্দদাসের লেখনীতেও সেই অধরা অনির্বচনীয়ের সুর বেজে ওঠে। তাঁর পূর্বরাগবতী রাধা বলেন—

অপরশ দেই পরশ সুখ সম্পদ
শ্যামরু সহজে সভাবে।

গোবিন্দদাস শুধু শ্রীরাধার পূর্বরাগ নয়, শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগও বর্ণনা করেছেন। যে কৃষ্ণ একদিন গোবর্ধন পর্বতকেও দীর্ঘকাল হাতে ধরে রেখেছিলেন, তিনি আজ রাধার বিরহে, ফুলের স্পর্শেও ভেঙ্গে পড়েন। গোবিন্দদাসের কৃষ্ণ আবার একমাত্র রাধার প্রতিই অনুরক্ত। তাই রাধার সখী রাধার কাছে এসে বলেন, গোকুলনগরে বহু কলাবতী এবং কৃষ্ণপ্রেমাকাঙ্ক্ষিনী থাকলেও কৃষ্ণ একমাত্র রাধা ছাড়া অন্য কাউকেই কামনা করেন না। তিনি চম্পক দেখে কম্পিত হন, তাঁর দু চোখ দিয়ে অনুরাগের অশ্রু ঝরে পড়ে। লক্ষ লক্ষ সুন্দরী রমণী তাঁকে মধুর বাণীতে তুষ্ট করার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি কান পাতেন না। কৃষ্ণ 'রা' শব্দ উচ্চারণ করে আর 'ধা' শব্দ বলতে পারেন না, চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে, পুরুষরত্ন শ্রীকৃষ্ণ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। রাধার প্রতি কৃষ্ণের এই অশ্রুতন্ময় প্রেমব্যাকুলতার চিত্র অঙ্কনে মহাপ্রভুর ভাবতন্ময় মূর্তিই কবিকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আবার কখনও কৃষ্ণ মুদ্রিত চোখে, হৃদয় বাহুতে চেপে শুয়ে থাকেন। শুধু কোন প্রসঙ্গে রাধার নাম উচ্চারিত হলে চোখ তুলে তাকান। কৃষ্ণের যে নয়নভঙ্গী কামদেবেরও মন ভোলায়, সেই চোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রু ঝরে পড়ে, কৃষ্ণের মুখের মধুর হাসিও রাধার বিরহে ম্লান। কালিন্দীর পথে সহচারী-দের সঙ্গে স্নান করতে যাওয়ার সময় রাধা উত্তপ্ত বালুকার ওপর দিয়ে কোমল পায়ে হেঁটে যান। কৃষ্ণ বলেন—'হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজ দুহুঁ পাদুক করি

লেল' (পদ-২৩২)। কৃষ্ণের এই উক্তিই তাঁর প্রেমিক হৃদয়ের একান্ত আর্তিকে বুঝিয়ে দেয়। এরপর কৃষ্ণ দূতীকে অনুরোধ করেন, রাধাকে এনে দেওয়ার জন্য। দূতী রাধার কাছে গিয়ে কৃষ্ণের গভীর অনুরাগ ব্যক্ত করেন—

সুন্দরি তো বিনু আকুল কান।
বিরহে ক্ষীণতনু অনুখন জর জর
জিবইতে বিহি ভেল বাম। (পদ-২৩৭)

কৃষ্ণের এই দশমী দশার কথা শুনে রাধা অচেতন হয়ে পড়লেন। সহচরী অত্যন্ত বিপদে পড়ে মনে মনে ভাবলেন, সেখানে শ্যাম অবশ হয়ে পড়ে আছেন, আবার এখানে রাধা মূর্চ্ছা গেলেন, এখন কি করা যায়। তিনি রাধার দেহে চন্দন লেপন করে মুখে জল দিলেন। রাধা জ্ঞান ফিরে পেলে, সখী তাঁকে শ্যাম সম্ভাষণে নিয়ে চললেন। রাধার আগমনের সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণের—

চলইতে পদযুগ থরথর কাঁপ।
হেরই লোর নয়ন যুগ ঝাঁপ॥ (পদ-২৬৩)

সেই একই রাধাকৃষ্ণকথা এখানে প্রেমের নিবিড় গভীর আর্তিতে কেমন বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। অনুরাগ পর্যায়েও রাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক প্রেম-গভীরতা প্রকাশিত। কৃষ্ণের রূপে রাধার নয়ন পূর্ণ, কৃষ্ণের স্পর্শজনিত আনন্দের স্মৃতি রাধাকে ছাড়ে না, কৃষ্ণের মোহন মুরলীনাদে রাধার শ্রুতি পর্যন্ত আচ্ছন্ন, সেখানে অন্য শব্দ প্রবেশই করে না। এখন স্বামী আর গুরুজনের তর্জন-গর্জনে রাধা ভয় পান না, তাঁর হাসি পায়। অন্যদিকে কৃষ্ণ বলেন, রাধা তাঁর 'মন-দুখ-মোচনি নয়নের তারা'। জ্ঞানদাসের কৃষ্ণের মত তিনিও রাধার নাম করে বাঁশী বাজান, রাধানাম বীজমন্ত্র করে জপ করেন, রাধারই পুণ্য ফলে কৃষ্ণ জগতের হরি। রাধা যখন একা যমুনার ঘাটে যান, তখন প্রেমিক কৃষ্ণ রাধার প্রতি পদচিহ্ন চুম্বন করতে থাকেন।

কৃষ্ণের এই সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলীকারদের পদেও আমরা পেয়েছি। এইভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথায় কৃষ্ণের তুলনায় রাধার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাধার অনুরাগের অনুভূতিও অভিনব। কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য রাধার চিত্ত ব্যাকুল, কিন্তু দর্শনের সময় নয়ন অশ্রু পূর্ণ হয়ে যায় বলে, তিনি দেখতেও পারেন না। স্পর্শ সুখও তিনি লাভ করতে পারেন না। কারণ কৃষ্ণের স্পর্শে তিনি জ্ঞান হারান। রাধার এই অপূর্ব প্রেমানুভূতি সম্পূর্ণভাবে মহাপ্রভুরই অবদান।

কিন্তু যে রাধা কৃষ্ণের জন্য এতখানি ব্যাকুল, তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম মিলনের সময় ভীত সন্ত্রস্ত। গোবিন্দদাসের এই পর্যায়ের পদগুলিতে প্রথম মিলনভীতা রাধার চিত্র বিদ্যাপতির প্রভাবের কথাই মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণনায় কবি অনাবৃত আদিরসকে সুচারু অলঙ্কারে ঢাকা দিয়েছেন, তাঁর মিলনের পদে শেষ পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণের রতিযুদ্ধে 'নিজ মদে মদন পরাভব পাওল'। গোবিন্দদাসের কৃষ্ণ কেবল রতিরণকুশল নন, তিনি সেবাপরায়ণ প্রেমিকও। রাধা উপস্থিত হলে তিনি নিজের পীতবসনে তাঁর পা দুটি মুছে দেন। কৃষ্ণের এই আচরণে নিজের সৌভাগ্যসুখে

গরবিণী রাধা সখীকে ডেকে বলেন, যাঁকে দর্শন করলেই সব দুঃখ ঘুচে যায়, তিনি নিজেই রাধার সেবা করছেন। দু' আঙ্গুলে রাধার চিবুক তুলে ধরে তাঁর মুখে তাম্বুল দিয়ে কৃষ্ণ পথের দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করেন। আর নলিনীদলে মৃদুমৃদু বীজন করে মধুর সম্ভাষণ করেন। অন্যান্য পদকারদের মত গোবিন্দদাসের পদেও রাধাকৃষ্ণের প্রেমসহায়িকা সখীরা মিলন পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণিতে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের যে বিভিন্ন রস পর্যায় রয়েছে, গোবিন্দদাস তদনুসারেই পদ রচনা করেছেন। এই ধরনের একটি পর্যায় স্বয়ং দৌত্য। কৃষ্ণের বাঁশীর সুরে ব্যাকুলা রাধা নিজেই কৃষ্ণের কাছে এসেছেন। কৃষ্ণের কাছে স্বয়ং ছুটে আসার মধুর নির্লজ্জতাকে চাপা দেওয়ার জন্য রাধার চেষ্টা বড়ই মনোরম। যেন কৃষ্ণপ্রেমের আকর্ষণে নয়, কৃষ্ণের বাঁশীর বিভিন্ন রাগরাগিণীর আকর্ষণেই তিনি এসেছেন। বাঁশী ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণ যেন তাঁর সঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে গান করা অভ্যাস করেন। রাধার আরও অনুরোধ, সে গান যেন তৃতীয় ব্যক্তি না শুনতে পায়। নিজের প্রকৃত মনোভাব এইভাবে সুকৌশলে জানানোর চেষ্টায় রাধার চরিত্রটি বড় মধুর ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে কৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্যে কৃষ্ণ রাধাকে বলেন, তাঁর মনরূপ মৎস্য যেন মদনের বাহন মকরের ভয়ে কাঁপছিল। আর রাধার বুকের হার যেন নদীতীর। সেই নদীতীরের কুচরূপ কুম্ভে কৃষ্ণের মন-মৎস্য নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য ঝাঁপ দিল, অতএব রাধা যেন সেই মাছকে ধরার জন্য কটাক্ষরূপ বঁড়শী সম্বরণ করেন (পদ-৩২২)। কৃষ্ণের এই উক্তির মধ্যে তাঁর প্রেমিক হৃদয়ের আন্তরিক ব্যাকুলতার চেয়ে কবির আলঙ্কারিক চাতুর্যই বেশী পরিমাণে ফুটে উঠেছে। আবার একদিন রাধা যখন উদ্যানে পুষ্পচয়ন করছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেন: রাধার ফুল তোলার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ তাঁর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই ফুলের। তাঁর মুখটি সোনার কমলের মত, চোখ দুটি নীলোৎপল। নাসিকা তিলফুলের মত সুন্দর। অধর বান্ধুলী ফুল, হাসি যেন মুকুলিত কুন্দ ও কুমুদ, তাঁর অঙ্গের গৌরবর্ণ ফুটন্ত চাঁপার মত, আর করতল যেন উজ্জ্বল স্থলপদ্ম। রাধার সুন্দর অঙ্গকান্তির সঙ্গে বিবিধ পুষ্পের এই উপমা জয়দেবের গীতগোবিন্দ ছাড়াও অন্যান্য কাব্যে রয়েছে। এখানে নতুনত্ব হল, কবির কৃষ্ণ রাধাকে বলেছে সেই ফুল দিয়ে পশুপতিকে (যার অর্থ—শিব এবং পালক কৃষ্ণ দুই-ই হতে পারে) পুজো করতে। পদটির অনুপ্রেরণা মৌলিক নয়, কিন্তু রূপোদ্ভাসিতা মূর্তিমতী সৌন্দর্যস্বরূপিণী রাধার এ যেন বহু রঙে আঁকা একখানি ছবি। এই চিত্রাঙ্কন প্রতিভা গোবিন্দদাসের কাব্যের সর্বত্র লক্ষণীয়।

আবার কখনও রাধার গৃহে স্বামীর উপস্থিতিতে কৃষ্ণ অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হন। চতুরা রাধা একটি কালো ভ্রমরকে সম্বোধন করে বলেন, শ্যাম ভ্রমর যেন তাঁর মুখপদ্মের মধুপান করতে না আসে। স্বামী কাছে থাকা সত্ত্বেও সে যেন কলরব না করে। যদি তৃষ্ণা পায়, তবে যেন সে মাধবীকুঞ্জে যায় অর্থাৎ এই ভাবে রাধা সঙ্কেতে কৃষ্ণকে জানিয়ে দিলেন, মাধবীকুঞ্জে তাঁদের মিলন হবে। কিন্তু রাধার স্বামী 'গোপ—গোঙার', তাই সে ভ্রমরকেই খুঁজতে লাগল (পদ-৩২৬)। বুদ্ধিমতী রাধার হাস্যোজ্জ্বল মুখ, আশ্বাসদীপ্ত কৃষ্ণের চকিত অপসারণ, আর রাধার নির্বোধ স্বামীর

বৃথা ভ্রমর অন্বেষণ—সবই এখানে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। তবে পদটি শ্রীরূপ গোস্বামীর উদ্ধব সন্দেশের একটি শ্লোকের ভাব নিয়ে লেখা—

মন্দবক্তাম্ভোরুহ পরিমলোন্মত্ত সেবানুবন্ধে
পত্যুঃ কৃষ্ণভ্রমর কুরুষে কিন্তরামমন্তরায়ম্।
তৃষ্ণাভিস্ত্বং যদি কলরুত বাগ্রচিত্তস্তদাগ্রে
পুষ্পৈঃ পান্তুচ্ছবিমবিরলৈর্যাহি পুন্নগকুঞ্জম্ ॥
(উদ্ধবসন্দেশ ; পৃ. ৩২৬)

কখনও রাধা নিতান্ত সরলা বালিকার মত কৃষ্ণকে প্রশ্ন করেন, চকোর কেন চাঁদের জন্য ছুটে বেড়ায়, ভ্রমরই বা কমলিনীর জন্য ছোটে কেন? আর লোকে যে কুসুমশরজ্বালা বলে, তা জুড়াবার উপায় কি? কখনও রাধার সখী কৃষ্ণকে বলেন, কৃষ্ণ-কালিয় দমন করেছেন। কিন্তু রাধার শরীরে বহু নাগের বাস। তাই কৃষ্ণের নাগদমন খ্যাতি শুনে রাধা তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এসেছেন। রাধার ত্রিবলীতে আছে লোমরূপ সর্পিণী, তাঁর দুটি ভ্রূ যেন দুটি সাপ, আর একটি সাপ রাধার বেণী। সে বহুদিন ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত। সখীর এই কথা শুনে কৃষ্ণ বলেন, তাঁর নাম নাগ-দমন, তাঁর কাছে গরুড় আছে, সে সব সাপ ভক্ষণ করবে। আর যদি সর্প দংশন করে, তবে রাধার রসনা রূপ ধন্বন্তরীর সুধায় সে বিষ নষ্ট হবে। বিদ্যাপতির মত তাঁর ভাবশিষ্য গোবিন্দদাসের এই সমস্ত পদেও অনুভূতির প্রাবল্যকে আলঙ্কারিক চাতুর্য অনেকখানি খর্ব করেছে। তবে এরই আলোকে, তাঁর কৃষ্ণকথায় রাধা, কৃষ্ণ ও সখীর বুদ্ধিদীপ্ত নাগরিক চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

অভিসার পর্যায়ে গোবিন্দদাস অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ কবি। অভিসারের মধ্যে যে বিপুল গতির আবেগ, অতন্দ্র নিষ্ঠা ও দুরূহকে, দুর্গমকে উত্তীর্ণ হওয়ায় অভীপ্সা সাধারণভাবে রয়েছে, গোবিন্দদাসের অভিসার বিষয়ক পদে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ। শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জলনীলমণিতে অভিসারের যে বিভিন্ন প্রকার ও প্রকরণ রয়েছে, গোবিন্দদাস তা বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ভক্ত এবং কবি হিসেবে তাঁর সব থেকে বড় কৃতিত্ব সম্ভবতঃ এইখানেই যে, অভিসারের কোন দিনক্ষণ নেই, প্রাণের আবেগ অসময়কেও সময় করে তোলে, এই সাধারণ সত্যটিকে তিনি পাঠকের মনে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর রাধা প্রথম যখন অভিসারের পথে নামেন, তখন তিনি রূপে রসে প্রসাধনে অনুপমা। তিনি 'কুঞ্চিত কেশিনী', 'নিরুপম-বেশিনি', 'রস-আবেশিনি', অন্য দিকে ব্রজ রমণীগণের মুকুট-মণি, 'কুঞ্জরগামিনী' এই নারীর রূপের জ্যোতিতে যেন বিজলী চমকায়। । তিনি শ্যামের 'হৃদয় বিহারিণী' আবার অখিল সোহাগিনীও বটে। এই রাধা, যিনি সৌন্দর্যে ও গুণে সর্বশ্রেষ্ঠা, প্রতিকূল পরিবেশে তাঁরই দুর্গম পথাতিক্রমণের বর্ণনায় কবি গোবিন্দদাস শুধু চিত্র আর ধ্বনি নয়; নাটকীয়তারও সৃষ্টি করেছেন। পৌষের রাত্রিতে উত্তুরে হাওয়ায় যখন প্রবল শীত, গৃহে শীতার্ত সবাই শয্যায় নিদ্রিত, তখন ব্রজরমণীদের মুকুটমণি রাধাকে অভিসারে বেরোতে দেখে সখীও আশ্চর্য হয়ে আর একজন সখীকে ডেকে দেখান। উষ্ণ আরামপ্রদ শয্যা ত্যাগ করে শ্বেতবস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত করে রাধা কুঞ্জে চলেছেন।

তাঁর কোমল পায়ে তুষার দলিত হয় না, কাঁটা বিছানো পথে পা-ও-টলে না। শুধু প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা নয়, তারই সঙ্গে রয়েছে গুরুজনদের সতর্ক চোখ। কণ্টকাকীর্ণ পথের মত তাকেও রাধা অতিক্রম করেছেন। এই প্রেমবতীকে লাভ করে মাধবও ধন্য (৩৪৪, ৩৪৫)। আবার গ্রীষ্মকালে মাথার ওপর সূর্য আগুন ছড়ায়। পথের বালুকা উত্তপ্ত হয়ে যায়। তখনও প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণে নবনীত কোমলা রাধা দুটি পদ্মের মত কোমল পা সেই বালির ওপর ফেলে ফেলে কৃষ্ণের পানে ছুটে যান। শুধু তো শীতে অথবা গ্রীষ্মে নয়, রাধাকে বর্ষা রজনীতেও অভিসারে যেতে হয়। কুলকামিনী রাধা সেই পথে চলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। তিনি কাপড়ে নূপুর বেঁধে, কলসের জল ঢেলে প্রাঙ্গণ পিছল করে, আঙ্গুল টিপে টিপে চলা অভ্যাস করেন। দুস্তর অন্ধকার পথ অতিক্রম করার জন্য রাধা হাত দিয়ে চোখ আবৃত করে চলার অভ্যাস করেন। পথে সর্পভয়, তাই রাধা নিজের কঙ্কণ মূল্য হিসেবে দিয়ে, সাপের মুখ বাঁধার কৌশল শিক্ষা করেন। গুরুজনদের কথা তিনি কানে শুনতেই পান না, আর পরিজনদের কথা শুনে বোকার মত হাসেন (৩৬৬)। রাধার এই দুশ্চর তপস্যা আমাদের কুমারসম্ভবের তাপসী উমার কথা স্মরণে আনে। কিন্তু উমার তপস্যা যত দুশ্চরই হোক না কেন, তপস্যার শেষে স্বয়ং চন্দ্রশেখরই তাঁর কাছে এসেছিলেন। আর রাধাকে দুর্গম পথ অতিক্রম করে যেতে হবে দয়িতের কাছে। গোবিন্দদাসের এই পদটি (পদ-৫১৯) কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের একটি শ্লোক অবলম্বন করে লেখা—

মার্গে পঙ্কিনি তোয়দান্ধতমসে নিঃশব্দসঞ্চারকং।
গন্তব্যা দয়িতস্য মেহদ্য বসতিমুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম্ ॥
আজানুদ্ধৃতনূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশং।
কৃচ্ছ্রাল্লব্ধা পদস্থিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যস্যতি ।।[২]

পঙ্কিল পথে মেঘান্ধতমসার ভিতর দিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আজ আমাকে প্রিয়ের বাসভবনে যেতে হবে—এই ভেবে এক মুগ্ধা রমণী নূপুরকে জানু পর্যন্ত তুলে, নয়ন দুটিকে করতলে আবৃত করে, অতিকষ্টে পদস্থিতি লাভ করে নিজের ঘরেই পথ চলার অভ্যাস করছে।

গোবিন্দদাস এই শ্লোকটির অনুসরণে পূর্বোক্ত পদ রচনা করলেও কিছুটা স্বাতন্ত্র্য গ্রহণ করেছেন। কারণ কণ্টকাকীর্ণ সর্পময় পথে চলার এমন পূর্বপ্রস্তুতির বর্ণনা মূল শ্লোকে নেই। সর্বোপরি ছন্দে ও শব্দব্যবহারে অভিসারিকার তপস্যার চিত্রটি পদে যেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, শ্লোকে তা হয় নি।

এইভাবে অভ্যাসের পর যখন—

ঝর ঝর বরিখে জলদ অনিবার।
কর ঠেলন নহে ঘন আন্ধিয়ার ॥ (পদ ৩৬৮)

তখন রাধা অভিসারে বেরিয়ে পড়েন। পথ চলতে গিয়ে ঘন বিদ্যুতের ঝলকানিতে রাধা চোখ বন্ধ করে ফেলেন, ঘন কাদায় তাঁর পা পিছলে যায়, উজ্জ্বল মণিযুক্ত সাপকে স্বর্ণদণ্ড ভেবে তিনি উঠতে যান। রাধার এই সুগভীর প্রেমজনিত বিস্মৃতি দেখে

সখী মাধবকে বলেন, এই অনুরাগবতীর প্রেমলাভ করা মাধবেরই পুণ্যফল। অভিসারের বর্ষণমুখর পটভূমি রচনায় গোবিন্দদাসের সমতুল্য আর কেউ নেই। বর্ষণমুখর দিনে "মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট", অস্থির বাতাসে যেন দোলা লাগে পৃথিবীতে, দিনের বেলায়ও মেঘের ছায়ায় এত অন্ধকার যে, কাছের লোককেও দেখা যায় না। কিন্তু এই দুর্যোগেও রাধা কৃষ্ণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। কখনও বর্ষণ মুখর বজ্রবিদ্যুৎ ঝলসিত অন্ধকার রাত্রিতে সখী রাধাকে পথে বেরোতে নিষেধ করেন। কারণ—

ভ্রমই ভুজঙ্গম নিশি আন্ধিয়ারা।
তহি বরিখত অবিরত জলধারা ।। (পদ ৩৫৯)

রাধা যেন প্রেমের জন্য দেহকেও উপেক্ষা করতে চাইছেন। (ঐ) অন্য দিকে কৃষ্ণ এক কুঞ্জে এসে বসে থাকেন। বাইরের দুর্যোগ দেখে তিনি ভাবেন—

পাঁতর মা ভেল আঁতর বারি।
কৈছে পঙারব সো সুকুমারি ।। (ঐ)

মাঠের মাঝখানে জল জমেছে, সুকুমারী রাধা কেমন করে পার হবেন? এই উদ্বেগে ও দুশ্চিন্তায়—

গুনি গুনি আকুল চলল মুরারি।
মীলল আধ পথে সো বর নারি। (ঐ)

পদটি যেন একটি নাটকের চিত্তাকর্ষক নাটকীয় দৃশ্য। সখীর বারণ সত্ত্বেও রাধা পথে বেরিয়ে পড়েছেন, অন্য দিকে দুর্যোগের মাঝখানে রাধা কিভাবে আসবেন ভেবে কৃষ্ণ এগিয়ে গেছেন। অর্ধপথেই দেখা হল দুজনের। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বিশিষ্ঠাদ্বৈতবাদী আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে বাদ দিয়েও বর্ষণ ব্যাকুল পৃথিবীর কোনও এক পিচ্ছিল পথে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের অপূর্ব চিত্ররূপেই এই পদটি প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। তত্ত্বসচেতন, গোবিন্দদাসের এই পদে তত্ত্বকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে রাধা কৃষ্ণকে মানব-মানবী রূপেই কল্পনা করা যায়।

অমাবস্যার ঘন অন্ধকারে যখন রাধা অভিসারে বেরিয়ে পড়েন, তখন তিনি নিজেকেও পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে সজ্জিত করেন। নীল মৃগমদে তাঁর সর্বাঙ্গ লিপ্ত। নীল অন্ধকারে কুহু যামিনীর ভয়কে উপেক্ষা করে তিনি চলেছেন—

নীল নলিনী জনু শ্যামর সায়রে
লখই না পারই কোই। (পদ সংখ্যা ৩৫৭)

রাধা যেন অন্ধকারের সরোবরে ফুটে ওঠা নীল কমল। চিত্ররূপময় সৌন্দর্য সৃষ্টির এই ক্ষমতাই বুঝিয়ে দেয়, গোবিন্দদাসের ভক্তিপ্রাণতাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে তাঁর সৃষ্টি প্রতিভা, যে প্রতিভা তাঁকে পদকর্তা হিসেবে অমর করে তুলেছে।

আবার শুক্লাভিসারে জ্যোৎস্না রাত্রিতে রাধা যখন অভিসারে যান, তাঁর সর্বাঙ্গে লিপ্ত থাকে শ্বেতচন্দন, তাঁর কুচযুগে শোভা পায় মুক্তোর মালা (পদ ৩৭৯)। জ্যোৎস্নার সাদা রঙের সঙ্গে তাঁর বেশ প্রসাধন সমস্তই মিশে যায় (পদ ৩৮০)। শ্রীরূপের গীতাবলীর ২৫ সংখ্যক গীতে জ্যোৎস্নাভিসারিকা রাধার অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

কখনও আবার কৃষ্ণ নিজেই রমণীর বেশ ধরে দূতীর সঙ্গে রাধার কাছে অভিসারে আসেন। অন্য কেউ না বুঝলেও রাধার সখীর চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। তিনি আর এক সখীকে ডেকে বলেন—

সজনি ! আজ কত অপরূপ রঙ্গ।
রমনিক বেশ ধরি রসিক নাগর বর
যায়ত দূতীক সঙ্গ। (পদ ৩৭৬)

কৃষ্ণের নিখুঁত নারীবেশ ধারণ দেখে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হন—

এমন চতুর বর দেখি নাহি নাগর
এ মহিমণ্ডল মাঝে ।। (পদ ৩৭৬)

কিন্তু যিনি বলেছেন, তিনি কৃষ্ণের ছদ্মবেশ বুঝে ফেলেছেন। কারণ—

পদতলে অরুণ মুই দেখিলুঁ
তেঁ করল অনুমান ।। (পদ-৩৭৬)

কৃষ্ণকথার বিষয়বস্তু তো সেই একই রাধা-কৃষ্ণপ্রেম। কিন্তু এইভাবে কবিরা তার মধ্যে অজস্র বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। পদের শেষে কবি বলেছেন "চতুর শিরোমণি রাধা মন্দিরে কয়ল পয়ান।" পদটিতে কবি এমন রুদ্ধশ্বাস নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন, যা আমাদের আশঙ্কাগ্রস্ত করে তোলে। মনে থাকে না এ প্রেম অলৌকিক, শঙ্কিত উদ্বেগে মনে হয়, যদি কৃষ্ণ ধরা পড়ে যান। এখানে সখীর চরিত্রটিও লক্ষণীয়। তিনি জ্ঞানদাসের সখীর মত এত মমতাময়ী না হলেও অসাধারণ বুদ্ধিমতী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সব সময় এইভাবে মিলন নির্বিঘ্ন হয় না। আর একদিনও এক সখী আর একজনকে ডেকে বলেন, রাত্রে কৃষ্ণ অঙ্গনের বদরী বৃক্ষের নীচে সারারাত জেগে কাটালেন। তিনি চাতকের শব্দে সঙ্কেত করলে রাধার দ্বার খোলার সময় কঙ্কন ঝঙ্কারে গুরুজনেরা জেগে উঠলেন। জরতী বলে উঠল 'কে বাইরে যায় ?' রাধা ভীত হয়ে পুতুলের মত নিস্পন্দ হলেন। চোখের জলে তাঁর পীন পয়োধরের মৃগমদ ও কুঙ্কুম ধুয়ে গেল। মনোরথ ব্যর্থ দেখে কৃষ্ণ পরের দিনের জন্য সঙ্কেত রেখে চলে গেলেন (পদ-৩৭৭)। এই পদটিও পদ্যাবলীর ২০৫ সংখ্যক শ্লোকের ভাব অবলম্বনে লিখিত। কিন্তু এর মধ্যেও কবি মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন। রাধার চোখের জলে বুক ভিজে যাওয়ার প্রসঙ্গ শ্লোকে নেই। অথচ অন্যদিকে পদটিতে শ্রীরাধার এই বেদনাটুকু এর আবেদনকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। আবার কোন সময় রাধাই আগে কুঞ্জে গিয়ে কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। বাতাসে পাতা কেঁপে উঠলে তিনি ভাবেন—এই বুঝি কৃষ্ণ এলেন, বিলম্ব দেখে মনে করেন কৃষ্ণ লুকিয়ে আছেন। কিন্তু বহুক্ষণ অতীত হলেও কৃষ্ণ না এলে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন, তখনই আবার নূপুরের ধ্বনিতে তাঁর মন উল্লসিত হয়ে ওঠে। আবার কখনও কৃষ্ণ অপেক্ষা করে থাকেন এবং রাধা এসে পৌঁছালে—

করে ধরি লয়্যা রাই বসাইলা বামে।
নিজ পীতবাসে মুছে রাই মুখ-ঘামে ।। (পদ ৩৮৫)

রাধার প্রতি কৃষ্ণের এই সস্নেহ সেবার মূল্য রাধাকেও তো কম দিতে হয় না। তিনি তাঁর দুর্গম পথাতিক্রমণের বিবরণটুকুও কৃষ্ণের কাছে দিতে ভোলেন না। পথের দুর্গমতার কথা একমুখে কেন, লক্ষ মুখে বললেও শেষ হয় না। একে গভীর রাত্রির অন্ধকার দেখে রাধা ভীত, তার ওপর পায়ে সাপ জড়িয়ে ধরল। তারও পর প্রবল বর্ষণ, দুটি পা শুধু পঙ্কে নয়, কণ্টকেও ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু এত যন্ত্রণাও রাধার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়, যখন তিনি কৃষ্ণের দেখা পান—

তুয়া মুখ দরশন সবসুখ পায়লুঁ
চিরদুখ সব দূরে গেলা ॥ (পদ ৩৭৪)

এই খানেই রাধার প্রেমের আনন্দ আর গৌরব, আর অভিসারিকার দুরূহ সাধনার পরিপূর্ণ সিদ্ধি।

গোবিন্দদাসের বাসকসজ্জিকা রাধা সঙ্কেত কাননে সেজ বিছিয়ে কৃষ্ণের আশায় বসে থাকেন। কৃষ্ণের বিলম্বে তাঁর ব্যাকুলতার সীমা নেই। তিনি অঙ্গে ঘন ঘন অলঙ্কার পরিধান করেন, আবার খুলে রাখেন। আবার কখনও সখীকে কাতরভাবে কৃষ্ণের বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করেন (পদ ৪০৩)। কিন্তু পরক্ষণেই যেন নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য উল্লসিত হয়ে সখীকে ডেকে বলেন—

সখি হে কহই না যায়ে আনন্দ।
ঋতুপতি রাতি অবহুঁ নব নাগর
মিলবহুঁ শ্যামর চন্দ্র ॥ (পদ ৪০৪)

উজ্জ্বল চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে সুবাসিত বারি ও পানীয় জল নিয়ে নব কিশলয়ে শয্যা প্রস্তুত করে রাধা কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। সখী তাঁকে অলঙ্কারে ও প্রসাধনে সজ্জিত করতে চাইলে রাধা বলেন—

শুন সহচরি—
কি ফল বেশ বনানি
কানু পরশমণি পরশরস বাধত
অভরণ সৌতিনী মানি ॥

কৃষ্ণের স্পর্শের আনন্দ যেন পরশমণির মতই বহুমূল্যবান। আর সেই মূল্যবান স্পর্শলাভে আভরণও রাধার কাছে সপত্নী বলে মনে হয়। এর আগে বিদ্যাপতির রাধাও মিলনের পথে বাধা হবে ভেবে 'চীরচন্দন' আর হার পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তিনিও গোবিন্দদাসের রাধার মত আভরণকে সপত্নী বলতে পারেন নি।

অর্ধেক রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পরও কৃষ্ণ না আসায় রাধা ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তিনি ভাবেন, হয়ত কোন কলাবতী রমণী কৃষ্ণকে নিজের ভ্রূরূপ ভুজঙ্গিনী পাশে আবদ্ধ করে রেখেছে। যতই কৃষ্ণের বিলম্ব হয়, ততই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। শেষ রাত্রেও যখন কৃষ্ণ এলেন না, তখন রাধার এতক্ষণের অস্থিরতা ও অধীরতা গভীর বেদনার অশ্রুতে আপ্লুত হয়। তিনি সখীকে সম্বোধন করে বলেন—

সজনি পুন জনি সম্বাদহ কান।
কালিন্দি কূলে অবহুঁ বিরহানলে,
তেজব দগধ পরাণ ॥ (পদ ৪১০)

বাসক সজ্জিকা রাধার ব্যাকুলতা, আর্তি এবং অবশেষে মৃত্যুবরণের এই করুণ সংকল্প গোবিন্দদাসের পদে সার্থক রসোত্তীর্ণতা লাভ করেছে। শেষ পর্যন্ত বিপ্রলব্ধা নায়িকার প্রতিনিধি হয়ে রাধার প্রিয়সখী কৃষ্ণের কাছে গেলে, বহুবল্লভ কৃষ্ণ তাঁরই সঙ্গম প্রার্থনা করেন। কিন্তু

সখীর স্বভাব এক অকথ্যকথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন।

(চৈ. চ. মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ)

তাই সখী বলেন, রাধা প্রিয়সখী ভেবেই তাঁকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং কৃষ্ণ যেন 'মনমথরঙ্গে তরঙ্গিত লোচনে' তাঁকে না দেখেন। তিনি বরং তাঁর জীবন কৃষ্ণের পায়ে নিবেদন করেতে পারেন, কিন্তু শরীর নয়। কারণ রাধা তাঁকে বিশ্বাস করে পাঠিয়েছেন (পদ ৪২৩)। এই পদও কবির মৌলিক সৃষ্টি নয়। উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে—

দৌত্যোনাদ্য সুহৃজ্জনস্য রহসি প্রাপ্তাস্মি তে সন্নিধিং
কিং কন্দর্প ধনুর্ভয়ংকর মমুং ভ্রূগুচ্ছমুদ্‌যচ্ছসি।
প্রাণান পর্যয়িতাস্মি সম্প্রতি বরং বৃন্দাটবী চন্দ্র তে
ন ত্বেতামসমাপিতপ্রিয়সখী কৃত্যানুবন্ধাং তনুম॥[৩]

আজ আমি সুহৃজ্জনের দৌত্যকার্যে তোমার কাছে এসেছি, তুমি কেন আমার প্রতি কন্দর্পের ধনুকের মতন ভয়ংকর তোমার ভ্রূগুচ্ছ নিক্ষেপ করছ। হে বৃন্দাবনচন্দ্র! এখন বরং তোমাতে প্রাণ সমর্পণ করতে পারি; কিন্তু দেহদান করতে পারি না। কেননা, এই দেহের দ্বারা প্রিয় সখীর কোন কৃত্যই সম্পন্ন করা হয়ে ওঠেনি। সখী চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যও চৈতন্য পরবর্তী যুগেরই অবদান। এর আগে বিদ্যাপতির পদে দূতী কৃষ্ণের সম্ভোগে বাধা দেয় নি। অবশ্য গোবিন্দদাসের পদে দূতীর অনিচ্ছাতেই কৃষ্ণ তাঁকে জোর করে সম্ভোগ করেছেন (পদ ৪২৪)। চৈতন্য পরবর্তী কেবল রাধা-প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের মহিমা এতে অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কৃষ্ণ না আসায় রাধা প্রথমে পুরুষ জাতিকে নিষ্ঠুর বলে অভিহিত করে শেষে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ললিতা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তিনি আর এক সখীকে পাঠিয়ে কৃষ্ণকে আনাবেন। রাধা স্বয়ং ললিতাকেই যেতে অনুরোধ করেন। জ্ঞানদাসের মত গোবিন্দদাসের পদেও ললিতার ভূমিকা স্নেহময়ী সেবাময়ী সান্ত্বনাদাত্রীর।

গোবিন্দদাসের বিপ্রলব্ধা রাধা চণ্ডীদাস অথবা জ্ঞানদাসের রাধার মত শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েন না। তীব্র ব্যঙ্গযুক্ত শ্লেষে তিনি কৃষ্ণকে ভৎর্সনা করেন।

মান পর্যায়ে প্রথমে রাধার সখী, রাধাকে মান করতে শিখিয়ে দেন। মানেই প্রেমিক কৃষ্ণের কাছে রাধার দুর্লভত্ব বজায় থাকবে। কিন্তু জয়দেবের সখী প্রথম থেকেই মানিনী রাধাকে বলেছেন—'মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে'।[৪]

কৃষ্ণের নারীবেশ ও যোগীবেশ ধারণ করে মানভঞ্জনের প্রসঙ্গ বিদ্যাপতির পদে ইতিপূর্বেই আমরা পেয়েছি।[৫] শ্রীরূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের সপ্তম অঙ্কেও এই প্রসঙ্গে রয়েছে। সেখানে রাধার মানভঞ্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিকুঞ্জবিদ্যা

নামে এক নারীর ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। জ্ঞানদাসের কৃষ্ণও নাপিতানীবেশ ও যোগীবেশ ধারণ করেছেন। গোবিন্দদাসের পদেও আমরা এর অনুসৃতি দেখি (পদ—৪৬২, ৪৮৪)। তবে মান পর্যায়ে গোবিন্দদাস রাধার প্রিয় অষ্টসখীর যে ভূমিকা দেখিয়েছেন, জয়দেব-বিদ্যাপতির পদে তার উপস্থিতি সম্ভব নয়। এমন কি, রূপ গোস্বামীর মধ্যেও বিরল লক্ষ্য। অষ্টসখীর এই ভূমিকায় একদিকে তাঁদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি কৃষ্ণকথায়ও বৈচিত্র্য এবং অভিনবত্ব সৃষ্টি হয়েছে। কৃষ্ণ আবার রাধার পায়ে ধরেছেন, কিন্তু তাতেও রাধা সদয় নন, তখন তিনি কাতরভাবে সখীদের মুখের দিকে তাকান। কৃষ্ণের অবস্থা দেখে সখীদের দয়া হল। ললিতা ললিত নম্র স্বভাবের, তিনি কৃষ্ণকে উপেক্ষা করার জন্য রাধাকে মৃদু তিরস্কার করেন। কিন্তু বিশাখা অধিকতর স্পষ্টবাদিনী প্রখরা। তিনি বলেন কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত হয় নি, কারণ কৃষ্ণ বহুবল্লভ। একবার ফিরে গেলে আর খোঁজ পাওয়া যায় না। তাঁকে খুঁজতে গিয়ে বিশাখারই প্রাণ দগ্ধ হয়। বিশাখার এই বিরক্তিটুকু পরম উপভোগ্য। তুঙ্গবিদ্যা বলেন, "আমি তোমাদের কোন কাজে নেই। যদি হিতকথা বললে অহিত হয়, তাহলে বাড়ীতেই বসে থাক।" চতুরা চিত্রা রাধাকে গঞ্জনা করে বলেন, তিনি তো মান নিয়ে থাকলেন, আর এদিকে তোমার নাথ—

চরণে পড়ি কান্দই
হেরইতে বিদরয়ে ছাতি ॥ (পদ-৪৭৯)

সুদেবী সামনে এসে বলেন—"আমরা তোমার দাসী। রাধা, তোমার পায়ে ধরে সাধছি—তুমি এই দারুণ মান ত্যাগ কর," এবার সব সখীরা জোড়হাত করে রাধার পায়ে ধরে সাধতে লাগলেন। কিন্তু রাধার মানভঙ্গ হল না। এই পদটির মধ্য দিয়ে ললিতা ও সুদেবীর নম্র মৃদু স্বভাব, বিশাখার অপেক্ষাকৃত প্রাখর্য আর তুঙ্গবিদ্যার ছদ্মক্রোধের পরিচয় বড় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এ ছাড়াও চম্পকলতা এবং ইন্দুরেখাও রাধার মান ভাঙ্গাতে চাইলেন। (পদ-৪৮৮, ৪৯২) তুঙ্গবিদ্যা রাধাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন—

আপন গুণাগুন কছু নাহি জানসি
বোলসি নাগর ঢিঠ ॥

কিন্তু এতেও যখন রাধার মানভঙ্গ হল না, তখন—'নীরব সখিগণ বাক্‌রোধ ভেল নাগর গনল নৈরাশ' (পদ-৪৯২)। শেষ পর্যন্ত রাধার প্রত্যাখ্যানে কৃষ্ণ স্থির করলেন, তিনি প্রাণ রাখবেন না। তখন সমস্ত সখীরা ছুটে এসে কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করে বললেন, এবার তাঁরা যে-কোনভাবেই হোক, কৃষ্ণের আশা পূরণ করবেন। সেই সঙ্গে তাঁরা কৃষ্ণকেও তাঁর বহুবল্লভত্বের জন্য কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন।

তুহুঁ লম্পটপন কবহুঁ ন ছোড়বি
দগধবে রমনি সমাজ ॥

কারণ কৃষ্ণের পায়ে ধরে তাঁরা কতবার চন্দ্রবলীর সঙ্গ ছাড়ার অনুরোধ করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁদের অনুরোধ রাখেন নি। চৈতন্য পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে রাধার প্রিয়সখীদের ভূমিকা রাধাকৃষ্ণলীলায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাঁদের এত সজীব,

প্রত্যক্ষ ও বাস্তব চরিত্র রূপে উপস্থিত করা গোবিন্দদাসেরই কৃতিত্ব। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ যে উপায়ে রাধার মান ভাঙিয়েছেন, তার দু-একটি উপায়ও গোবিন্দদাসের নিজস্ব সৃষ্টি। রাধা প্রগাঢ় মান করেছেন। দূরে বসে অবনতমস্তক কৃষ্ণ দূতীকে সম্বোধন করে বললেন—'মঝু পরমায়ু আছে দিন দুই চারি'। একথা শুনে রাধা বললেন—

কি কথা কহিলে ওহে শ্যাম গুনমনি ॥
যে কথা কহিলে বন্ধু না কহিও আর।
মঝু পরমায়ু আধ তুঝে দিনু দান ॥ (পদ-৪৯৪)

এইভাবেই মানবতী রাধার মানের পরিসমাপ্তি ঘটল। অহেতুক মানের কিছু পদও গোবিন্দদাস রচনা করেছেন। মানের পদে কৃষ্ণের চরিত্রও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাধার প্রত্যাখানে কৃষ্ণ চলে এসে ভাবেন—

রাই আপন বিপদ নাহি মানি।
হামারি অদর্শনে রাই কৈছে জীয়ব
ধনী জনি তেজয়ে পরাণী ॥ (পদ-৪৮২)

কৃষ্ণ আরও চিন্তা করেন, রাধা তাঁরই জন্য স্বামী এবং গুরুজন পরিজনদের গঞ্জনা সহ্য করেছেন। সুতরাং তিনি রাধার জন্য তাঁর পাপজীবন পরিত্যাগ করবেন। নিজের দুঃখের কথা না ভেবে রাধার জন্য কৃষ্ণের এই চিন্তা, চরিত্রটিকে গতানুগতিকতামুক্ত করে তুলেছে।

গোবিন্দদাসের কলহান্তরিতা রাধাকেও সখীরা কঠোর ভাবে তিরস্কার করেন। রাধার মত পরিবর্তনে সখী কৃষ্ণকে ডাকার জন্য ছুটে যান, দূর থেকে সখীকে দেখেই কৃষ্ণ চলে আসেন। সখী এবার কৃষ্ণকেও তিরস্কার করেন—

সো যদি মান ভরমে তোহে রোখল
তুহুঁ কাহে আওলি ছারি ॥

সে যদি মানবশে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করল, তুমি কেন তাকে ছেড়ে এলে? দেখা যাচ্ছে, গোবিন্দদাসের পদে সখীদের তিরস্কার প্রবণতা প্রবল। তাঁরা যেন রাধাকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ অভিভাবিকা। কিন্তু এরপর সখীর মুখে কবি যে উক্তি দিয়েছেন, ত রাধাকৃষ্ণের প্রতি সখীর অনুরাগ-গভীরতার চরম নিদর্শন—

হাম তুয়া লাগি আগি যদি বৈঠব
তবহু নহব অবহীতে।
হৃদয় বিদারি তোহে দরশায়ব
তবহু নহব পরতীতে ॥ (পদ-৫২১)

কখনও সখী আবার প্রকৃতি জগৎ থেকে উপমা আহরণ করে বলেন—

তসরিয়া কীট আপন গ্রহ পাতিয়ে
যৈছনে মরতহি সোই।
যৈছনে মান তুহারি ভেল সুন্দরি
সুধিবোধি সব খোই ॥ (পদ-৫২৩)

রাধার মানের পরিণাম এত তীক্ষ্ম ভাবে আর কোন বৈষ্ণব কবি উপস্থাপিত করতে পারেন নি। এই পর্যায়েও সখীর অবিসংবাদী প্রাধান্য। মনে হয়, যেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সখীরই নিয়ন্ত্রণাধীন। কারণ তিনি রাধা এবং কৃষ্ণ, উভয়কেই তিরস্কার করেন। আবার রোষবতী রাধার মানভঞ্জন করার উপায়ও কৃষ্ণকে বলে দেন—

তুয়া দেখি সুন্দরি যদি করে রোষ।
অপরাধ মানবি মানবি দোষ ॥

সুবলের কাছে ক্রন্দনরত কৃষ্ণকে দেখে বিশাখা বলেন, তাঁর কাছে বললে তিনিও কৃষ্ণের দুঃখের ভাগ নেবেন। একথা শুনে কৃষ্ণ উৎসাহিত হলে—

কানু প্রবোধ করি চতুর সহচরি
ঠমকি ঠমকি চলি যায়।
মণিময় আভরণ রতন ভূষণ
সঘনে বাহু ফিরায় ॥ (পদ-৫২২)

রাধাকৃষ্ণের আসন্ন মিলন সম্ভাবনায় আনন্দিত, নিজের বুদ্ধির সাফল্যে পরিতুষ্ট সহচরীর এই লীলায়িত লাবণ্যবিস্তার উদ্ধৃতিটি ছাড়া অনুভব করা অসম্ভব। তারপর সখীর সঙ্গে কৃষ্ণ যখন রাধার কাছে এলেন, তখন দুজনেই প্রসাধনশূন্য আভরণহীন। মিলনের পরম মুহূর্তে রাধার শূন্য পদের শোভাই লক্ষ মণির মত অন্ধকারকে গ্রাস করে। এ অন্ধকার বিরহের, বিচ্ছিন্নতার অন্ধকার। দুটি অনুতাপদগ্ধ-হৃদয়ের অশ্রুধৌত অমল প্রেমের আলোকে তার নিরসন।

এই পর্যায়ে রাধা চরিত্রের বিকাশও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রাধা, কৃষ্ণের কাছে মান করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। শুধু তাই নয়, রাধা আরও বলেন—

তুহুঁ যদি লাখ গোপী সঞে বিহরসি
পায়সি বহুত আনন্দ।
সে মুঝে কোটি কোটি সুখ-সম্পদ
তিল-আধ না ভাবিয়ে মন্দ ॥ (পদ-৫২৭)

শেষ পর্যন্ত এই ঈর্ষা থেকে উত্তরণের প্রয়াস কিন্তু রাধার নিজেরই হৃদয়কে রক্তাক্ত ক'রে, সেই রক্তবিন্দু দিয়ে উচ্চারণ। রাধার এই উক্তিটি উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাব প্রকরণের অধিরূঢ় মহাভাবের একটি বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করেছে। অধিরূঢ় মহাভাবের দুটি ভাগ—মোদন ও মাদন। মোদনের প্রগাঢ় অবস্থাই মোহন। রাধার এই উক্তি সেই মোহন ভাবেরই প্রকাশ। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এত সূক্ষ্ম প্রকরণ বিভাগের ছকে না ফেলেও, রাধার এই ঈর্ষা জয় করার একান্ত চেষ্টাকে চিরকালের প্রেমিকার বৈশিষ্ট্যই বলা যেতে পারে। আলঙ্কারিকদের আদর্শ তো বাস্তব থেকেই উদ্ভাবিত। তাই শতাব্দীর ব্যবধান পেরিয়ে এক রোমাণ্টিক কবির রোমাণ্টিক নায়িকা অথবা নায়কের কণ্ঠে অনুরূপভাবেই উচ্চারিত হয়—

যদি আর কারে ভালোবাস, যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও * * *

গোবিন্দদাসের রাধাও বুঝেছেন, বহুবল্লভ কৃষ্ণকে ছাড়া তাঁর অস্তিত্ব কতখানি

অনর্থক, তাঁর মানকে তিনি হৃদয়ের ব্যাকুলতায় নিজেই মূল্যহীন করে দিয়েছেন। সেইজন্যই রাধা কাতরভাবে প্রশ্ন করেন—

অকপটে এক বাত মুঝে কহবি তু
না করবি চীতক ভীত।
চন্দ্রাবলি তুহে কতহু সমাদরে
কৈছন প্রেম পিরীত ॥ (পদ-৫২৭)

এমন মর্মভেদী আর্তপ্রশ্ন বোধ হয় সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নেই। 'না করবি চীতক ভীত' অর্থাৎ মনে ভয় কোরো না, এই কথাটুকু রাধার পরাজয়বোধের গোপন গ্লানি মাখানো। কিন্তু আমরা বলব, রাধা তাঁর এই নিরুপায় পরাজয় স্বীকারের মধ্য দিয়েই বরণ করতে পারেন কৃষ্ণকে। বলতে পারেন 'হার মানা হার পরাব তোমার গলে।' গাথাসপ্তশতীর কাল থেকে শুরু করে গোবিন্দদাস পর্যন্ত বহু শতাব্দীর সোপান অতিক্রম করে এখানেই প্রেমিকা রাধার চরম উত্তরণ।

গোবিন্দদাসের দানলীলার পদে রাধা গতানুগতিকভাবে গরবিণী রাজনন্দিনী। তিনি কৃষ্ণকে বলেন—

ছুঁইয়ো না ছুঁইয়ো না নিলজ কানাই
আমরা পরের নারী।
পর পুরুষের পবন পরশে
সচেলে সিনান করি।

তিনি বলেন, তাঁকে পেতে হলে তীর্থে তপস্যা করতে হবে। কৃষ্ণ বলেন, রাধার শরীরই সেই তীর্থ। এইভাবে উভয়ের তীক্ষ্ণ বাক্য বিনিময়ের পর মিলন ঘটে। গোবিন্দদাসের দানলীলায় রাধাকৃষ্ণের কথোপকথনে বিদগ্ধ নায়ক-নায়িকার বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকলীলার বর্ণনা রয়েছে। গ্রাম্য গোপগোপীর নির্লজ্জ উক্তি-প্রত্যুক্তির স্থান এখানে নেই। মিলনের সময় আগেকার সেই প্রগল্ভ পরিহাস চতুর ধৃষ্ট নায়ক কৃষ্ণ—

দুটি আঁখি ছল ছল রাইয়ের চরণতল
কানু আসি পড়িল লোটাই। (পদ-৫৩৮)

তিনি বলেন, জন্মান্তরে তিনি রাধার দাস। নিজের উত্তরীয় বসন পেতে তিনি রাধাকে বসান, বীজন করেন। যমুনা থেকে জল এনে রাধার পা ধুইয়ে পীতধড়ায় মুছে দেন। নিজের মাথার চূড়া থেকে ফুল নিয়ে রাধার পায়ে দিয়ে বেদমন্ত্রে আরতি করেন। কৃষ্ণ চরিত্রের এই রূপান্তর অবশ্য ইতিপূর্বে আমরা বংশীবদন, জ্ঞানদাস ও বলরামদাসের পদেও লক্ষ্য করেছি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের হাতে এইভাবে কৃষ্ণ চরিত্রের বিবর্তন ঘটেছে। জয়দেবের রাধা কৃষ্ণের প্রিয়তমা হলেও কৃষ্ণ অন্যরমণীদের সঙ্গে কেলি বিলাসে রত থাকেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ অন্য নারীর সঙ্গে বিলাস করলেও তিনি কেবলমাত্র রাধারই প্রেমে আত্মহারা। গোবিন্দদাসের পদেও এর আগে আমরা তার উদাহরণ পেয়েছি।

নৌকাখণ্ডের একটি পদে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত কৃষ্ণের নৌকা তৈরির প্রসঙ্গ রয়েছে—

সুজিল তরণীখানি প্রবাল মুকুতা আনি
মাঝে মাঝে হিরার গাঁথনি।

শিখিপুচ্ছ গুঞ্জা ছড়া রজত কাঞ্চনে মোড়া
কেরোয়ালে রজত কিঙ্কিণী ॥ (পদ-৫৪০)

নৌকার এই ঐশ্বর্যময় বর্ণনা রূপ গোস্বামীরই প্রভাবজাত। রূপ নিজস্ব সামন্ত-তান্ত্রিক জীবনাভিজ্ঞতার যে পরিবেশে রাধাকৃষ্ণকে স্থাপিত করেছিলেন, পরবর্তীকালে তারই প্রভাব কবিদের ওপর পড়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ কিন্তু কাঠ দিয়ে ব্যবহারযোগ্য বাস্তব নৌকা তৈরি করেছিলেন, আর গোবিন্দদাসের নৌকা যেন রূপ-কথার ঐশ্বর্য দিয়ে তৈরি।

নৌকাখণ্ডের একটি পদে রাধা কৃষ্ণকে বলেছেন, "তোমার কথায় আমি নৌকা হালকা করার জন্য যমুনায় দুধ ঢেলে দিলাম, কাঁচুলি ও হার দূরে ফেললাম। দুহাত দিয়ে জল সেচছি, তবু এখনও তীর এল না। আমি নিরাশ হয়ে পড়ছি, আর তুমি হেসেই কুটি কুটি" (পদ-৫৪১)। এই পদটি পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত ২৭৪ সংখ্যক শ্লোকের ভাব নিয়ে লেখা—

বাচা তবৈব যদুনন্দন গব্যভারো
হারোঽপি বারিণি ময়া সহসা বিকীর্ণঃ।
কূলং দূরীকৃতঃ কুচয়োরনয়োর্দুকূলং
কালিন্দ দুহিতুর্ন তথাপ্য দূরম্ ॥

শ্লোকটি রাধা প্রেমামৃত কাব্যেরও অন্তর্ভুক্ত। গোবিন্দদাসের দোল ও ঝুলনের পদে শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গীতাবলীর ৪০ সংখ্যক গীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের হোরিখেলা বর্ণিত হয়েছে। এর প্রভাবে গোবিন্দদাস হোরিখেলার পদ রচনা করেছেন—

খেলত ফাগু বৃন্দাবন চান্দ।
ঋতুপতি মনমথ মনমথ ছান্দ ॥
সুন্দরীগণ করি মণ্ডলী মাঝ

* * * * *

আগে ফাগু দেয়ল সুন্দরী নয়নে।
অবসরে মাধব চুম্বয়ে বয়নে ॥ (পদ-৫৪৫)

ভাগবত অনুযায়ী গোবিন্দদাস শারদরাস বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনিতে শুকনো কাঠে নব পল্লব হয়, যমুনা উজানে বয়, পাহাড়ের পাথর গলে যায়। মাছ জল ছেড়ে উঠে আসে, বৎসরা দুগ্ধপান ত্যাগ করে, আর মৃগীরা অরণ্য ত্যাগ করে ছুটে যায় (পদ-৫৫১)। কৃষ্ণের বংশীধ্বনির আকর্ষণে গোপিনীরা সমস্ত গৃহকর্ম ও প্রসাধন ত্যাগ করে ছুটে যায় (পদ ৫৫৩)। ব্রজরমণীরা কৃষ্ণেরকাছে এলে চতুর চূড়ামণি কৃষ্ণ তাদের প্রতি নির্লিপ্তভাব দেখিয়ে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এটিও ভাগবতের অনুরূপ। ভাগবতের কৃষ্ণ বলেছেন—

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমনকারণম্ ॥ ৬

গোবিন্দদাসের কৃষ্ণ—

পুছত সবক গমন খেম
কহত কীয়ে করব প্রেম
ব্রজক সবহু কুশল বাত
কাহে কুটিল চাহনি ॥

এই 'কাহে কুটিল চাহনি' গোবিন্দদাসের মৌলিক সৃষ্টি। শ্রীকৃষ্ণের এই নিরাসক্ত প্রশ্নে গোপীরা ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের ক্রোধ ও ছলনাময় কৃষ্ণের কপট ভালমানুষী এই একটি পংক্তির মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি গোপীদের উক্তি ভাগবতের অনুরূপ নয়। ভাগবতে গোপীরা কৃষ্ণকে 'আত্মন্', 'নিত্য' প্রভৃতি বলে প্রেম নিবেদন করেছেন। অন্যদিকে গোবিন্দদাসের গোপীরা সরাসরি কৃষ্ণকে তিরস্কার করেই বলেছেন—

শুন শুন সুকপট শ্যামর চন্দ।
কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ ॥
ভাঙ্গলি কুল-শিল মুরলিক সানে।
কিঙ্করিগণ জনু কেশ ধরি আনে ॥ (পদ-১৫৭)

ভাগবতের গোপীরা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও ভগবৎসত্তা সম্পর্কে পরিপূর্ণ মাত্রায় সচেতন, কিন্তু গোবিন্দদাসের গোপিরা প্রেমগৌরবে তাঁদের অতিক্রম করতে পেরেছেন বলেই অনায়াসে কৃষ্ণকে তিরস্কার করতে পারেন। এটি একান্তভাবেই চৈতন্য পরবর্তী যুগের পদাবলী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

কবি গোবিন্দদাস রাসলীলা বর্ণনায় শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীরূপগোস্বামীকে অনুসরণ করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, শত শত গোপনারীর মাঝখানে এক কৃষ্ণকে বহু তনু ধারণ করে নৃত্য করতে দেখে—

কৃষ্ণ বিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুঃ খেচরস্ত্রিয়ঃ।
কামার্দ্দিতা শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ ॥[৭]

গোবিন্দদাসের পদে—

পরম মোহিত চন্দ্র দেখিয়া নয়নে।
বিস্ময় হৃদয় হৈয়া রহিলা গগনে ॥ (পদ-৫৬৮)

তবে ভাগবতের রাসলীলায় রাধার স্থান নেই। কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামীর গীতাবলীতে গোপযুবতীদের মধ্যে রাধা স্থান লাভ করেছেন। পরবর্তীকালে গোবিন্দদাসও শ্রীরূপের পদাঙ্ক অনুসরণ করে লিখেছেন—

রাধা শ্যাম নাচে ধনু অঙ্কে পাতিয়া।
জলধর শ্যাম এক অনুপাম
থির বিজুরি বামে রাখিয়া ॥ (পদ-৫৫৯)

তবে রাসলীলা নৃত্যের কিছু কিছু পরিকল্পনা গোবিন্দদাসের মৌলিক সৃষ্টি এবং শ্রীরূপ অপেক্ষা অধিকতর রসাল। রাসমণ্ডলে যুগল কিশোর নাচছেন। আর সেই নৃত্য দেখে—

ভাবভরে তরু সব লম্বিত হইয়া।
দোঁহার চরণতলে পড়ে লোটাইয়া ॥

তা দেখি ময়ূর সব নাচে ফিরি ফিরি।
জয় রাধাশ্যাম বলি নাচে দুই শারী ॥ (পদ-৫৭২)

রাধাশ্যামের নৃত্যে প্রকৃতির এই স্বতঃস্ফূর্ত নর্তনশীলতা রাসক্রীড়ার পটভূমিকে যেন সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। ভাগবতের কবি বলেছেন, 'রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরী ভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ব বিভ্রমঃ' ॥[৮] ভাগবতের রাসক্রীড়া কৃষ্ণপ্রেমমোহিত গোপীগণকে সন্তুষ্ট করার জন্য শ্রীভগবানের ছলনা। তাই বালক যেমন ছায়ার সঙ্গে ক্রীড়া করে, তিনি ঠিক তেমনি ব্রজসুন্দরীদের সঙ্গে ক্রীড়া করেছেন। অন্য দিকে পদকারদের রাসক্রীড়া প্রাণময়, রাধাসঙ্গে প্রেমগৌরবে গরীয়ান। গোবিন্দদাসের পদগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়।

রাধাকৃষ্ণের রসালস ও কুঞ্জভঙ্গের পদে সখীরা কৃষ্ণকে নিদ্রিত দেখে তার বাঁশী চুরি করে নেওয়ার পরামর্শ করেন। কিন্তু কৃষ্ণ মিথ্যা ঘুমের ভাণ করে পড়েছিলেন, তিনি সখীদের পরামর্শ শুনে রাধাকে কোলে ভাল করে আগলে ধরলেন। ফলে সখীরা আর চুরি করতে পারল না (পদ-৫৭৭)। দেখা যাচ্ছে, রাধার সখীরা শুধু মমতাময়ী পরামর্শদাত্রী লীলা-সহায়িকা নন, তাঁরা চপলা কৌতুকপ্রিয়াও বটে। বৃন্দাদেবীর আদেশে পাখীরা রাধাকৃষ্ণকে জাগানোর জন্য গান ধরল। রাধা, শ্যামের কোলে জেগে বসলেন। কিন্তু তখনও তাঁর ঘুমের আবেশ কাটে নি (পদ-৫৮১)। এরপর স্বাধীনভর্তৃকা রাধা কৃষ্ণকে বেশ বানিয়ে দিতে বলেন (পদ-৫৮২)। কৃষ্ণ রাধার চরণে মণিমঞ্জীর ও বুকে হার পরিয়ে দেন, তাম্বুল সেজে রাধার অধরে দিয়ে দেন। তারপর রাধার মুখ দেখতে দেখতে বার বার তার পায়ে পড়েন। তাঁর দুচোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তখন রাধা তাঁকে কোলে নিয়ে স্থির করেন। পরে, বসনে মণিমঞ্জীর ঢেকে গৃহে ফিরে যান (পদ-৫৮২)।

রসোদ্গারের পদে গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব অবিসংবাদী। তাঁর রাধা চকিত নয়নে চতুর্দিকে তাকিয়ে গৃহে ফেরেন। রাধার হাবভাব সখীর মনে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। তিনি রাধাকে প্রশ্ন করেন, মন্মথের রাজা শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে জয় করেছেন কি না? উত্তরে রাধা বলেন, শ্রীকৃষ্ণকে দেখেলেই তাঁর চোখ আনন্দাশ্রুতে ঝাপসা হয়ে যায়, তাঁর নাম করলেই রাধার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে যায়। সুতরাং 'কোজানে কৈছে রভসরসকেলি' (পদ-৫৮৫)। রাধার মতে যে নারী কৃষ্ণের প্রেম অনুভব করে বলতে পারে, সে নিশ্চয়ই সুরত অধিদেবী। এই পদটিও রাধাপ্রেমের অসাধারণত্বের নিদর্শন। তবে সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোকের [৯] সঙ্গে এর ভাবসাদৃশ্য আছে। শ্লোকটির ভাবার্থ হল, 'আনন্দের আতিশয্যে চোখ জলে ভরে ওঠায় দেখতে পাচ্ছি না। কম্পান্বিত বাহুদ্বয় ক্লিষ্ট হওয়ায় কণ্ঠালিঙ্গন করতে পারছি না। সম্ভ্রমবশতঃ কথা হয়ে যাচ্ছে গদগদ; আর মন ক্ষোভযুক্ত বলে অতিশয় চঞ্চল হয়েছে। বহু দিনের পর বল্লভের সঙ্গে মিলন ঘটলেও তা বিয়োগের মতোই মনে হচ্ছে'। লৌকিক প্রেমের এই রসোত্তীর্ণ পদটি গোবিন্দদাসের হাতে রাধার কৃষ্ণসান্নিধ্যের নিবিড় অনুভূতি সহযোগে ও বুদ্ধিদীপ্ত বক্রোক্তির আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে গোবিন্দদাসের পদ আবার আন্তরিকতার পরিবর্তে কৃত্রিম বাক্‌চাতুর্যে

পরিপূর্ণ। যেমন একটি পদে রাধার সখী রাধাকে বলছেন—তিনি হরিণনয়না অর্থাৎ হরিণী হয়ে হরি অর্থাৎ কৃষ্ণ বা সিংহকে তাঁর হৃদয়পিঞ্জরে ভরে রেখেছেন (পদ-৫৯০)। গোটা পদটি এইভাবে শ্লেষ অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। অপর একটি পদে রাধা কৃষ্ণকে কৃষ্ণসর্পের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি 'বাঁশী নিশাসে' 'মধুর বিষ' উদ্গীরণ করেন। তাঁর গতি কুটিল ও সুধীর (পদ-৫৯১)।

আবার কখনও মিলনের নিবিড় গভীর আনন্দে উদ্বেল, আত্মহারা রাধা সখীকে ডেকে বলেন—

সজনি, কি কহব রজনি-আনন্দ।
স্বপন বিলোকন কিয়ে ভেল দরশন
মঝু মন লাগল ধন্দ ॥ (পদ-৫৯২)

শুধু মিলনের অপরিসীম আনন্দের উন্মাদনাই নয়, রাধার কৃষ্ণ-প্রেমের সম্পদ আরও রয়েছে। তাই সখী যখন প্রেমিকের ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, তখন রাধা বলেন, সেই প্রেমিক—

হাত দিয়া দিয়া মুখানি মোছাঞা
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
কতেক যতনে পাইয়া রতনে
থুইতে ঠাঞি না পায় ॥ (পদ-৫৯৭)

এই সেবাময়, মমতাময় এবং বাৎসল্যে স্নিগ্ধ কৃষ্ণ একান্ত ভাবেই চৈতন্য পরবর্তীযুগের। ষোড়শ শতাব্দীর অন্যান্য কবির, বিশেষতঃ বলরামদাসের পদে আমরা এঁর পরিচয় পেয়েছি। রসোদ্গারের পদে রাধার সর্বশেষ উপলব্ধি হল—

হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম-প্রহরি রহু জাগি। (পদ-৫৯৬)

পবিত্র মন্ত্রধ্বনির মত রাধাপ্রেমের এই ধ্যানস্তিমিত তদ্গত উচ্চারণেই তাঁর প্রেমের চরম পরিপূর্ণতা। রাধাকৃষ্ণ প্রেমসমুদ্রের অজস্র ঊর্মিল-স্রোত এখানে শান্ত গভীর। যাঁর জন্য অভিসারের অজস্র ক্লেশ, গুরুজনের রক্তচক্ষু তর্জন, স্বামীর গঞ্জনা আর নিজের দ্বিধার সঙ্গে সংগ্রাম, রাধা আজ তাঁকে হৃদয়ের মাঝখানে পেয়েছেন। তাঁর প্রেম আজ সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করেছে বলেই হৃদয়মন্দিরের আরাধ্য দেবতার সে চিরপ্রহরী।

প্রেমবৈচিত্ত্যের পদগুলিতে রাধা এবং কৃষ্ণ পরস্পরের নিবিড় সান্নিধ্যে থেকেও পরস্পরের বিচ্ছেদে হাহাকার করেছেন। এখানে ক্ষমতাবান গোবিন্দদাসের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটলেও কাহিনীর দিক থেকে কিছু বৈচিত্র্য নেই।

ভাবী বিরহ পর্যায়ে, বিদায়ের আগের দিন কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলনের সময় রাধা কৃষ্ণের পাশে গেলে তিনি কোন কথা না বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে কৃষ্ণ 'শিরে হানল নিজ হাত'। বার বার জিজ্ঞাসা করতেও কৃষ্ণ কোন উত্তর না দিয়ে শুধু সজল চোখে রাধার দিকে চেয়ে রইলেন। এই চরম বেদনার সময়ও গোবিন্দদাসের রাধা শান্তভাবে নিজের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিতে চেষ্টা করেছেন। একদা

বহুবল্লভ কৃষ্ণের বহুবল্লভত্বকে তিনি যেমন শান্তভাবে মেনে নিয়েছিলেন, আজও তেমনি বলেন—

গমন সময়ে বিরোধ জনি কোয়।
পিয়াক অমঙ্গল জনি পাছে হোয় ॥
সময় সমাপন কী ফল আর।
প্রেমক সমুচিত অবহুঁ বিচার ॥ (পদ-৬১৫)

চরম বেদনাকে এই আপাত নির্লিপ্তিতে মেনে নেওয়া গোবিন্দদাসেরই রাধা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অক্রূরের আগমনের সংবাদ শুনেই রাধার সেই ধৈর্যের বাঁধ টুটে যায়। তিনি কাতরভাবে সখীকে বলেন—

রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর
মন্দিরে রহু বনমালী ॥ (পদ-৬১৬)

আবার কখনও সখীকে সম্বোধন করে বলেন "যার জন্য গুরুজনের গঞ্জনাকেই মনোরঞ্জনের উপায় বলে ভেবে নিয়েছিলাম, দুর্জনের কুৎসা শুনেও কুলবতীর ব্রত ত্যাগ করে লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়েছিলাম, আজ সেই হরি ব্রজপুরে চলে যাবেন জেনেও আমার কঠিন প্রাণ বার হচ্ছে না" (পদ-৬১৭)। ভাগবতের গোপীরা কৃষ্ণের প্রতি প্রায় অনুরূপ অভিযোগ করেছেন—

ন নন্দসূনুঃ ক্ষণভঙ্গ সৌহৃদঃ
সমীক্ষতে নঃ স্বকৃতাতুরা বত।
বিহায় গেহান্ স্বজনান্ সুতান্ পতীং
স্তদাস্যমদ্ধোপগতা নবপ্রিয়ঃ ॥[১০]

বিদ্যাপতির বিরহভীতা রাধা শুধু বারবার নিজের বিফল যৌবন জ্বালাকেই তুলে ধরেছেন। তাঁর বিরহ বেদনা প্রধানতঃ দেহমিলন-কেন্দ্রিক। কিন্তু গোবিন্দদাসের রাধার বেদনা কৃষ্ণকে ভুলতে না পারার, তাঁর স্মৃতির বিষামৃতময় জ্বালাকে বহন করার বেদনা—

ও মুখ-চান্দ হাস মধুরাধর
ও দিঠি বঙ্ক নেহারি।
ও মৃদুবচন সুধা রসে পূরিত
কৈছনে বিছুরব নারি ॥ (পদ-৬১৯)

বিদ্যাপতির রাধার কামনা সর্বস্বতা নয়, নয় চণ্ডীদাসের বিদেহী বেদনা—এ যেন এক আধুনিক কবির কণ্ঠ নিঃসৃত হাহাকার —

মূরতি-পাগল মনের মমতা তাই ধায় তোমা পানে।

ভবন্ বিরহের পদে রাধা ও গোপীদের অবস্থা বর্ণনায় কবি ভাগবতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কৃষ্ণের রথ চলতে শুরু করেছে। কিন্তু কেউই বাধা দিচ্ছে না দেখে গোবিন্দদাসের গোপীরা আক্ষেপ করছেন। ভাগবতেও ঠিক অনুরূপ ভাবের শ্লোক রয়েছে—

আনাদ্র্ধীরেষ সমাস্থিতো রথং
তমনুমী চ ত্বরয়ন্তি দুর্মদাঃ
গোপাঃ অনোভিঃ স্থবিরৈরুপোক্ষিতং
দৈবঞ্চ নো দ্য প্রতিকূলমীহতে ॥[১১]

অনার্দ্র ও ধীর এই কৃষ্ণ রথে আরোহণ করেছেন, তবুও লোকে এঁকে দয়াময় বলে, যুবা ও বৃদ্ধ গোপেরা কেউই কিছু বলছেন না। আজ দৈবই আমাদের প্রতিকূল। ভাগবতের কৃষ্ণের বিশেষণরূপে এই 'অনার্দ্র' কথাটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। ভাগবতের কৃষ্ণ ঐশ্বর্যময় ভগবান, তাই বৃন্দাবন ত্যাগের বেদনা তাঁকে স্পর্শ করে না। কিন্তু গোবিন্দদাসের কৃষ্ণ রাগানুগা ভক্তির আকর্ষণে ধরা দেন, তাই বৃন্দাবন থেকে বিদায় নিতে গিয়ে তিনি বিচলিত হন। গোবিন্দদাসের রাধা সখীকে বলেন, সখী যেন গলায় আঁচল দিয়ে কৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনেন, কখনও বা বলেন, 'চল' আমরা অক্রূরের পায়ে ধরে কৃষ্ণের চলে যাওয়া ঠেকিয়ে রাখি' (পদ-৬২৪, ৬২৫)। গুরুজন পরিজন যে যাই বলুক, কিছু যায় আসে না। এই ভাবের পদও ভাগবতে আছে—

নিবারয়ামঃ সমুপেত্য মাধবং
কিং নোহকরিষ্যন্ কুলবৃদ্ধ বান্ধবাঃ।
মকুন্দ সঙ্গীনিমিষার্ধ দুস্ত্যজাদ্
দৈবেন বিধ্বংসিত দীন-চেতসাম্ ॥[১২]

"আমরা মুকুন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে নিবারণ করব। কুলবৃদ্ধ ও বান্ধবগণ আমাদের কি করবেন? মুকুন্দের সঙ্গ আমরা এক নিমিষার্ধকালও পরিত্যাগ করতে অসমর্থ। সেই মুকুন্দসঙ্গ থেকে দৈব আমাদের বিয়োজিত করছে।"

কৃষ্ণ চলে যাওয়ার পর, কৃষ্ণের রথের দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে রাধা শূন্য মন্দিরে চলে এলেন। তারপর তিনি বললেন—

সো কুসুমিত বন কুঞ্জ কুটীর।
সো যমুনা জল মলয় সমীর ॥
সো হিমকর হেরি লাগ এ চঙ্ক।
কাহু বিনু জীবন কেবল কলঙ্ক ॥ (পদ-৬২৫)

কিন্তু বিদগ্ধমাধব নাটকে শ্রীরূপ গোস্বামীর রাধা ভবন্ বিরহে কৃষ্ণের রথের চাকার সামনে লুটিয়ে পড়েছিলেন। গোবিন্দদাসের রাধা সে তুলনায় অনেক বেশী আত্মস্থ।

ভূত বিরহের পদে রাধার হিতৈষিণী সখীদের চরিত্র পরিস্ফুটনে কবি যথেস্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রাধার কাতর অনুরোধে চারজন সখী মথুরাপুরীতে গেলেন (পদ-৬৩০)। সেখানে এক মধুপুর-রমণীকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, কৃষ্ণ রাজপুরীর সপ্তম মহলে থাকেন, তুমি গোকুলের গ্রাম্য গোপনারী; কেমন করে তাঁর কাছে যাবে? ব্রজপুর-দূতী উত্তরে বললেন, তিনি তো ভক্তের-ভগবান, ব্রজপুরের নাম শুনলে রাজশয্যাও ত্যাগ করে আসবেন। এই বলে দূতী কৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন। দূতীর ডাক শুনে কৃষ্ণ দ্রুতগতিতে তাঁর কাছে উপস্থিত

হলেন (পদ-৬৩১)। কৃষ্ণ দূতীকে ব্রজের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। নন্দ-যশোদা, গোপ-গোপী, এমন কি ব্রজের তৃণতরুলতা, পশুপক্ষীর কুশলও জিজ্ঞাসা করে বললেন, "কৈছনে আছয়ে কিশোরী হমারি।" কৃষ্ণের প্রশ্নে সবার প্রতি যে মমতার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, তা এর আগে আমরা রূপ গোস্বামীর উদ্ধব সন্দেশেও লক্ষ্য করেছি। কৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কখনও বা তীব্র শ্লেষ বাক্যে দূতীর মর্মজ্বালা ফুটে বেরোয়। তিনি কৃষ্ণকে বলেন –

পুর-নাগরি সঞে রসিক-শিরোমণি
পুরহ মনমথ-কেলি।
বনচরি-নারি তোহারি গুণ গাওব
পুতনিকা সঞে মেলি। (পদ-৬৩৬)

এ ছাড়া দূতী কৃষ্ণ বিরহে শুধু নন্দ যশোদা ও গোপ-গোপীদের অবস্থাই নয়, বৃন্দাবনের প্রকৃতিরও কৃষ্ণবিরহে যে শোচনীয় অবস্থা, তা বর্ণনা করেন—

কুসুম ত্যজি অলি ভূমিতলে লুঠই
তরুগণ মলিন সমান।
সারীসুক পিক ময়ূরী ন নাচত
কোকিল না করুঁহি গান॥ (পদ-৬৪০)

উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে পশুপক্ষীর এই শোককে শ্রীরূপ মোহনের চতুর্থ অনুভাব বলে অভিহিত করেছেন। ভূত বিরহের পদে রাধার শোচনীয় অবস্থা বর্ণনায় কবির কাব্যে নতুনত্ব কিছু নেই। একটি পদে দশমী দশায় উপনীতা রাধা বলেছেন, যদি কৃষ্ণ বিরহে তাঁর মৃত্যু হয়, তবে তাঁর শরীর পঞ্চভূতে মিশে যাবে। যেখানে কৃষ্ণ তাঁর দুটি অরুণ চরণ ফেলবেন, সেখানেই যেন তাঁর শরীর মাটি হয়, যে সরোবরে প্রভু স্নান করবেন, সেই সরোবরে তাঁর শরীর যেন জল হয় (পদ-৬৬৯)। মরণ বরণ করেও নিজের দেহের রূপরস পঞ্চভূতে মিলিয়ে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করার এই আকাঙ্ক্ষাকে শ্রীরূপ মোহনের পঞ্চম অনুভাব বলে বর্ণনা করেছেন। এর উদাহরণ হিসেবে শ্রীরূপ যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন, গোবিন্দদাসের পদটি তারই ভাব নিয়ে লেখা—

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তি স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয় মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গনে
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয় বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ।[১৩]

"এই দেহ পঞ্চত্বলাভ করিয়া স্পষ্টরূপে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতে প্রবিষ্ট হয়। আমি প্রণাম করিয়া মাথা নোয়াইয়া বিধাতার কাছে এই একটি মাত্র বর চাহিতেছি যে শ্রীকৃষ্ণ যে দীঘিতে স্নান করেন, সেই দীঘিতে আমার দেহের জল, তাঁহার দর্পণে ইহার অনল, তাঁহার প্রাঙ্গণ-আকাশে ইহার আকাশ, তাহার গমনাগমন পথে ইহার পৃথিবী এবং তদীয় তালবৃন্তে ইহার বায়ু প্রবেশ করুক।"

রাধার এই মরণ বরণের সংকল্পে তাঁর প্রিয় সখীরা ভীত হন। তাঁরা নানা ভাবে রাধাকে বোঝাতে থাকেন যে রাধা যদি বিরহ অনলে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন, তাহলে

তিনি একাই নন, তাঁর সহচরীরাও কেউ বাঁচবে না। আবার মাধব গৃহে ফিরে এসে যখন রাধার মৃত্যুর সংবাদ পাবেন, তখন তিনিও তাঁর দেহ আর রাখবেন না। নিজে মৃত্যুবরণ করে এতজনের মৃত্যুর কারণ হলে জগতে রাধার কলঙ্ক থাকবে (পদ-৬৭০)। এই উক্তির আলোকে আর একবার আমরা রাধাকৃষ্ণলীলা সহায়িকা সখীর চরিত্রটি জ্যোতির্ময় হয়ে উঠতে দেখি। মনে হয় প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমে তো প্রাপ্তির আনন্দ আছে, কিন্তু এই স্বার্থশূন্য ফলাকাঙ্ক্ষাহীন অহেতুক প্রেম অতুলনীয়।

আবার কখনওবা কৃষ্ণবিরহিণী রাধা আট প্রহরে অষ্ট নায়িকার বেশ ধারণ করেন, সকালবেলা নীল আকাশে উদয়-সূর্য দেখে রাধা ভাবেন, কৃষ্ণের দেহে অন্য নায়িকার সিন্দুর চিহ্ন। তিনি তখন নিজেকে খণ্ডিতা নায়িকা ভাবেন। এইভাবে কখনও তিনি নিজেকে বাসকসজ্জিকা ভাবেন। আবার কখনও—

নীল নিচোল সঘনে মাগয়ে
নিবিড় তিমির হেরি। (পদ-৬৭১)

এই ভাবে তিনি দিনের বিভিন্ন সময়ে খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, বাসকসজ্জিকা, অভিসারিকা, স্বাধীন ভর্তৃকা, প্রোষিতভর্তৃকার ভাব প্রাপ্ত হন।

কৃষ্ণ মথুরা থেকে আর বৃন্দাবনে ফিরে আসেন নি, কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা রাধা প্রেমে পাগল কৃষ্ণকে আবার বৃন্দাবনে ফিরিয়ে এনেছেন। কবি গোবিন্দদাসও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর পদে শ্রীরাধার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য কৃষ্ণ মথুরা থেকে গোপনেই বৃন্দাবনের কুঞ্জে চলে এসেছেন। কৃষ্ণকে দেখে সারা বৃন্দাবনের প্রকৃতিতে আবার আনন্দ জাগল। বিরহে অচেতন ব্রজনারীরা যেন আবার জীবন ফিরে পেল (পদ-৬৮২)। গোবিন্দদাসের ভাবোল্লাসের পদে ভাবী মিলনের আনন্দকে প্রকাশ করার জন্য রাধা যে আয়োজন করেছেন, তা এক অভিজাত সম্পন্ন গৃহস্থবধূর গৃহের আয়োজন। বিদ্যাপতির রাধার মত নিজের উদ্বেল হৃদয়াবেগকে তিনি অনাবৃতভাবে প্রকাশ না করে, এই আয়োজন বাহুল্যের মধ্য দিয়েই প্রকাশ করেছেন।

গোবিন্দদাসের বিভিন্ন পর্যায়ের অন্য কতগুলি পদও ডক্টর মজুমদার তাঁর সংকলনে সংকলিত করেছেন। এর মধ্যে একটি পদে রাধাকৃষ্ণের পাশা খেলার বর্ণনা রয়েছে— (পদ-৭০৫)। এই পাশা খেলার প্রসঙ্গও ইতিপূর্বে আমরা রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলায় পেয়েছি। গোবিন্দলীলামৃতে এর বর্ণনা রয়েছে। অপর একটি পদে কৃষ্ণের রাধা-অনুরাগের বর্ণনা রয়েছে। সুবলকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ রাধাকুণ্ডের তীরে বসে কুসুম কাননের অনুপম শোভা দেখছিলেন। ইতিমধ্যে বৃন্দাদেবী হাতে চম্পক কুসুম এনে সুবলকে দিলেন। সুবলের কাছ থেকে নিয়ে কৃষ্ণ সেই ফুল কানে গুঁজতেই—

উদ্দীপন রাধার মাধুরি।
প্রেমে চতুর্দিকে ধায় অরুণ লোচনে তায়
পুলকে পূরল প্রতি অঙ্গ।
ধরি সুবলের করে কহে গদগদ স্বরে
মিলাইয়া দেহ তার সঙ্গ। (পদ-৭১৭)

গোবিন্দদাসের পদের কৃষ্ণকথায় লক্ষণীয়ভাবে অভিনবত্ব কিছু নেই, থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবের রাগানুরাগা ভক্তি-ধর্মে দীক্ষিত মন ও তার সাথে সংস্কৃত সাহিত্যের বৈদগ্ধ্য যুক্ত হয়ে তাঁর পদাবলীকে প্রাণময় করে তুলেছে। রূপ গোস্বামীর দর্শন ও সাহিত্য এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ঋণ গ্রহণ করেও তিনি তাঁর নিজস্ব সৃজনী ক্ষমতার সাহায্যে তাকে নবরূপ দান করেছেন। বিশেষতঃ রাধা, কৃষ্ণ ও সখী এই তিনটি চরিত্রে তিনি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। তাঁর অলংকৃত বাণীবিন্যাস, ছন্দের ঝংকৃত উল্লাস ও ভাবের গাঢ় গভীর অকৃত্রিমতা তাঁর পদগুলিকে যেন স্বর্ণময় জীবন্ত লাবণ্যমূর্তি করে তুলেছেন।

গোবিন্দদাসের পদের ভণিতাগুলিতে কবি মঞ্জরীভাবে রাধাকৃষ্ণলীলার দর্শক ও তাঁদের সেবকরূপে নিজেকে কল্পনা করেছেন। এই মঞ্জরীভাবের সাধনা প্রসঙ্গ শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের রচনায় রয়েছে। চাটু পুষ্পাঞ্জলিতে [১৪] শ্রীরূপ বলেছেন—

ত্বাং সাধু মাধবীপুষ্পৈ র্মাধবেন কলাবিদা।
প্রসাধ্যমানা্যা স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যামহং কদা॥

কলাবিদ মাধব কর্তৃক মাধবী ফুলের দ্বারা তুমি অলংকৃত হচ্ছ এবং তোমার কলেবর তাঁর স্পর্শের জন্য সাত্ত্বিকভাবের উদয়ে ঘর্মাক্ত হচ্ছে, এমন অবস্থায় তোমাকে আমি কবে বীজন করব। নামযুগাষ্টকে তিনি লিখেছেন—

তাং প্রচ্ছদেন মুদিরচ্ছবিনা পিধায়
মঞ্জীরমুক্তচরণাঞ্চ বিধায় দেবি।
কুঞ্জে ব্রজেন্দ্রতনয়েন বিরাজমানাং
নক্তং কদা প্রমুদিতামভিসারয়িষ্যে॥[১৫]

নীলাম্বরে তোমাকে ঢেকে, তোমার চরণ হতে নূপুর খুলে নিয়ে কবে তোমাকে কুঞ্জে ব্রজেন্দ্রতনয়ের সঙ্গে রাত্রিতে অভিসার করাবো।

মঞ্জরীরা সখী নন, সখীরও অনুগা। সখীরা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সিদ্ধ পরিকর, তাঁর স্বরূপ শক্তি বা অন্তরঙ্গ শক্তির প্রকাশ। আর জীব ভগবানের তটস্থা শক্তির প্রকাশ। সখী স্বরূপ শক্তি বলে তাঁর সাথে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসও সম্ভব। উজ্জ্বলনীলমণির সখী-প্রকরণে কৃষ্ণ কর্তৃক সখীকে উপভোগের কথা আছে। গোবিন্দদাসের পদেও তা রয়েছে (পদ-৪৫০)।

শ্রীনিবাস আচার্য তাঁর গুরু গোপাল ভট্ট তথা গুণমঞ্জরীর কাছে প্রার্থনা করেছেন—

হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয়।
কিশোর কিশোরীপদ সেবন সম্পদ
তুয়া সনে মীলব মোয়॥[১৬]

নরোত্তম ঠাকুরও অনুরূপ প্রার্থনা জানিয়েছেন—

ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল পূরি
যোগাইব অধরযুগলে॥[১৭]

গোবিন্দদাসও তাঁর পদের ভণিতাগুলিতে অনুরূপভাবে রাধাকৃষ্ণলীলার মাঝখানে সখীর অনুগা হয়ে সেবা করতে চেয়েছেন ও করেছেন। শুধু তাই নয়, রাধাকৃষ্ণলীলার নানা ঘটনায় একেবারে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই মঞ্জরীভাবের সাধনায় অপ্রাকৃত লীলাবিলাস যেন বাস্তব জীবনের নিকটবর্তী হয়েছে বলে কাব্যরসপিপাসু অদীক্ষিত পাঠকের মনে হয়। রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনার পদে তিনি ব্রজধামের এক অন্তরঙ্গ সেবিকা রূপেই ভণিতা দিয়েছেন। রাগানুগা ভক্তি নিয়ে তিনি রাধামাধবের সেবায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। রাধাকৃষ্ণের শয্যাত্যাগ করার সময়, ভোজন করার সময় ও কেলি-বিলাসের ক্লান্তির পর গোবিন্দদাস জলের ঝারি যোগান। আবার কৃষ্ণ যখন সকাল-বেলা এক একটি পাত্রে দুগ্ধ দোহন করে রাখেন, তখন গোবিন্দদাস সেগুলি বয়ে অন্যত্র নিয়ে যান। আবার কখনও মিলনব্যাকুলা উৎকণ্ঠিতা রাধাকে গোবিন্দদাস আশ্বাস দেন। কিন্তু আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ আসেন না। তখন কবি প্রতিজ্ঞা করেন—'আজুক রজনী দুহু জনে মিলায়ব'…(পদ-২৪০)। রাধাকৃষ্ণলীলায় মঞ্জরীভাবের সাধক হলেও তাঁদের মান-অভিমান, বিরহমিলনের খেলায় কবি এখানে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন।

বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রিতে রাধা যখন অভিসারে বেরিয়ে পড়েন, তখন গোবিন্দদাস বলেন—

তিমির পন্থ যব হোত সন্দেহ।
গোবিন্দদাসক সঙ্গে করি লেহ॥ (পদ-৩৪৮)

আবার রাধা বর্ষণমুখর রাত্রিতে কুঞ্জে প্রতীক্ষা করে আছেন, অথচ কৃষ্ণ আসেন নি। ঝড়ঝঞ্ঝার মাঝখানেই গোবিন্দদাস কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হন। রাধার কাছে শীঘ্র যেতে বলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ঝগড়া করেন (পদ-১২৭)। বেশীর ভাগ সময়েই গোবিন্দদাস রাধার পক্ষে, তবে কখনও কখনও তিনি কৃষ্ণকেও সাহায্য করেন। কৃষ্ণ যখন অনেক সাধ্যসাধনা করেও রাধার মান ভাঙাতে পারেন না, তখন কবি রাধাকে বলেন—

কানু বড় আতুর
ধনি তহু করি অভিসার॥ (পদ-৫০২)

মাথুর পর্যায়ে কৃষ্ণ যখন সখীকে বৃন্দাবনের ও শ্রীরাধার খবর জিজ্ঞাসা করেন, তখন গোবিন্দদাস শ্রীরাধার বিরহ-গভীরতার কথা স্মরণ করে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। (পদ-৬৩০)। কখনও বিরহিণী রাধার দশমী দশা উপস্থিত হয়েছে দেখে 'শ্যাম বুঝাইতে চলু গোবিন্দদাস' (পদ-৬৪৩)। আবার কখনও কখনও কৃষ্ণের বিরহিণী গোপীদের দেখে 'গরল গরাসনে গোবিন্দ গেল' (পদ-৬৪৭)। গোবিন্দদাস নিজেই বিষ খেতে যান। রাধাকৃষ্ণের সুখদুঃখের সঙ্গে কবি এখানে নিজেকে সম্পূর্ণ একাত্ম করে নিয়েছেন। মঞ্জরী ভাবের সেবিকা হয়েও এখানে তিনি সমপ্রাণ সখার ভূমিকায় অবতীর্ণ। এই ভূমিকাও তাঁর কৃষ্ণকথাকে অভিনবত্ব দান করছে॥

কুমুদানন্দ

শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যদের মধ্যে কুমুদানন্দ অন্যতম। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে জীবিত ছিলেন। বৈষ্ণবদাস রচিত বৈষ্ণব বন্দনায় এঁর উল্লেখ আছে—

জয় জয় রামকৃষ্ণ কুমুদানন্দ
দ্বিজকুল-তিলক দয়াল।[18]

এঁর রচিত একটিমাত্র শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার পদ পাওয়া যায়। পদটিতে বালক কৃষ্ণের পৌগণ্ড অবস্থার লীলা বর্ণিত।[19]

নৃসিংহ কবিরাজ

শ্রীনিবাসের যে সমস্ত শিষ্যেরা খেতুরীর মহোৎসবে যোগদান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নৃসিংহ কবিরাজ অন্যতম। ভক্তিরত্নাকরে এঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে—

শ্রী নৃসিংহ কবিরাজ মহাকবি যেঁহো।
যাঁর ভ্রাতা নারায়ণ কবিশ্রেষ্ঠ তেঁহো॥[20]

পদকল্পতরুতে নরসিংহদেব ভণিতায় একটি বাংলা পদ পাওয়া যায়। (পদ সংখ্যা-১৫৮৪)। 'দেব' উপাধি থেকে নামসাদৃশ্যযুক্ত এই দুই কবিকে একই পদকর্তা বলে ধরে নেওয়াই সঙ্গত। পদটি শ্রীকৃষ্ণের অভিষেকের পদ। জন্মতিথি উপলক্ষে কৃষ্ণচন্দ্রের অভিষেক। গোটা পদটিতে 'অখিল ব্রহ্মাণ্ড-নাথ-নন্দের-নন্দন' কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবকেই তুলে ধরা হয়েছে।[21] নৃসিংহদেব ভণিতায় অন্য যে দুটি পদ পাওয়া যায়, তার একটি পদে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণিত হয়েছে। নব-নীরদের মত কৃষ্ণের নীল সুঠাম তনু, মুখটি চাঁদের মত সুন্দর, মাথায় 'কুঞ্চিত কুন্তল বন্ধ ঝুটা', উজ্জ্বল অধর ও গলায় শোভিত মতির হার। তাঁর পায়ে নূপুর শোভা পাচ্ছে, ভ্রমর স্থল-কমল ভেবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্রজবালকেরা মাখন হাতে নিয়ে সবাই নিজেরা খাচ্ছে এবং শ্যামের হাতেও দিচ্ছে। পদটির এই শেষ অংশে কৃষ্ণের প্রতি ব্রজবালকদের সখ্যভাবের চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে (পদ কল্পতরু ; পদ সংখ্যা-১১৫৯)। অপর পদটিও শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনারই পদ। এতে কৃষ্ণের রূপের সঙ্গে তাঁর নৃত্য ও বংশীবাদনের বর্ণনা রয়েছে। কৃষ্ণের নৃত্য ও বেণুবাদনের প্রভাবও পদটিতে চমৎকার ভাবে বর্ণিত। (তরু ; ১৩২৪)। কৃষ্ণের বংশীধ্বনির এই অমোঘ প্রভাব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগ থেকেই কৃষ্ণকথাকারদের রচনায় স্থানলাভ করেছে।

কীর্তন-গীতরত্নাবলীতে নরসিংহদাস ভণিতায় একটি পদ পাওয়া যায়। এই পদটি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার পদ। জননী যশোদার সঙ্গে কৃষ্ণের মধুর দৌরাত্ম্যের একটি সুন্দর ছবি পদটির বিষয়। জননী যশোদা জল নিয়ে গৃহে ফেরার পথে গোপাল তাঁর কোলে ওঠার জন্য বায়না করেছেন। মা বলেছেন "বসন ছেড়ে দাও, কলসী নামিয়ে আমি তোমায় কোলে নেবো, তুমি আমার আগে ছুটে চল, পায়ের নূপুর কেমন বাজে শুনি।" কিন্তু কৃষ্ণ নাছোড়বান্দা, মা যশোদা প্রলোভন দেখিয়ে বললেন, বাড়ী গেলে তিনি কৃষ্ণের হাতে রাঙা লাঠি দেবেন। সেই লাঠি নিয়ে সে শ্রীদামের সঙ্গে খেলবে। আর মা তাকে ক্ষীর ননী দেবেন। গৃহকর্মে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে দেখে মা বিরক্ত হয়ে বলেন—

মুঞি রহিনু তোমা লয়্যা গৃহকর্ম গেল বয়্যা
মোরে ইবে কেমন উপায়।
কলসী লাগিল কাঁখে ছাড়রে অভাগী মাকে
হের দেখ ধবলী পিয়ায় (কীর্তন গীতরত্নাবলী ; পদ-৪৬৮)।

মায়ের কথা শুনে কৃষ্ণ মায়ের বসন ছেড়ে আগে আগে চলতে লাগলেন। তাঁর কিঙ্কিণীর মধুর ধ্বনি শুনতে শুনতে জননী বলেন "সোনার বাছা যায়"। রাধাকৃষ্ণলীলা কথার মাঝখানে নানা ছোট ছোট নতুন ঘটনার সৃষ্টি করে বৈষ্ণব পদাবলীকারেরা বৈচিত্র্য এনেছিলেন। এই পদটি তারই এক দৃষ্টান্ত। অবশ্য এই পদটিও রূপগোস্বামীর প্রভাব জাত। ডক্টর বিমান- বিহারী মজুমদার তাঁর 'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী'তে এই পদটিকে শ্রীনিবাসের শিষ্য নরসিংহ কবিরাজের রচনা হিসেবে গ্রহণকরেছেন। যদিও ভণিতায় কবি 'দেব' নন, 'দাস'।

প্রসাদ দাস

প্রসাদ দাস শ্রীনিবাসের শিষ্যদের অন্যতম। পিতা করুণাময় দাস ও অগ্রজের নাম জানকীরাম দাস। কবির উপাধি ছিল কবিপতি। শ্রীনিবাস আচার্যের সমস্ত লিপিকার্য সম্পাদনার ভার এঁদের দুই ভ্রাতার উপর ছিল। পদকল্পতরুতে এঁর ছটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি পদ গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ বিষয়ক। আর একটি নিত্যলীলার গোষ্ঠবিহারের পদ (পদকল্পতরু ; পদ-২৫২৭) আমাদের আলোচ্য কৃষ্ণকথা। সুতরাং এই একটি পদকেই আমরা আলোচনার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করছি। পদটিতে গতানুগতিকভাবে কৃষ্ণের বর্ণনা রয়েছে। একটা বিশেষত্ব হল এই যে, এখানে গোপীরা কৃষ্ণের বাঁশীর শব্দ শুনে মুচ্ছির্ত হয়ে পড়েছেন এবং জ্ঞান ফিরে পেয়ে সবাই মিলে রাধার কাছে গেছেন।

প্রসাদ দাসের নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত ১০১০ সংখ্যক পুথিটির বিষয়বস্তু 'কৃষ্ণের জন্মকথা'। কবির বর্ণনাভঙ্গী খুবই সংক্ষিপ্ত ; কোন কোন ক্ষেত্রে কবি ভাগবতের পরিবর্তে হরিবংশ থেকে কাহিনীর উপাদান আহরণ করেছেন। যেমন, কংসের জন্ম ব্যাপারে—

কংসাসুর জন্মকথা নাই ভাগবতে।
শ্রীহরিবংসেতে আছে শুন তার মতে ॥

হরিবংশ অনুসারে কংস মথুরারাজ উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। এক সময় উগ্রসেনের ঋতু- স্নাতা স্ত্রীকে দেখে দৈত্য দ্রুমিল অত্যন্ত কামার্ত হয়ে পড়ে এবং স্ত্রীর পরিচয় পেয়ে উগ্রসেনের মূর্তি ধারণ করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গত হয়। ফলে কংসের জন্ম হয়। কবি হরিবংশের এই কাহিনীটি [২১] গ্রহণ করেছেন দেখা যায়। উগ্রসেনের রাণী—

দৈবযোগে ঋতুস্নান কৈল সেই দিনে।

দ্রিমীল নামেতে দৈত্য বৈসে গোবর্ধনে।
রাণী রূপ নিরখী মোহিত হইলা মনে ॥
উগ্রসেন রূপ ধরি গেলা দৈত্যরাজ।
সিঙ্গার ভুঞ্জিল সেই পুষ্প বাটী মাজ ॥
কংসাসুর নাম হইল দৈত্যের নন্দন।
কহিল কংসের জন্ম শুন সর্ব্বজন ॥

এ ছাড়া এই কাব্যে নন্দোৎসব ও পুতানবধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে

কবি ভাগবতেরই কাহিনী অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। কাব্যের এক স্থলে কবি বলেছেন—

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা কহে প্রসাদ দাস ॥

এ ছাড়া আত্মপরিচয়ের অন্য সূত্র কবি পুঁথিতে দিয়ে যান নি।

রাধাবল্লভ দাস

শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যদের মধ্যে তিনজন রাধাবল্লভ ছিলেন। এঁদের মধ্যে যিনি রাধাবল্লভ চক্রবর্তী, তিনিই পদকর্তা। কারণ রামগোপাল দাস তাঁর রসকল্পবল্লীতে 'শ্রীরাধাবল্লভ চক্রবর্তী ঠাকুর' বলে পদ উদ্ধৃত করেছেন। ইনি ধারাবাহিকভাবে কৃষ্ণলীলা পদাবলী রচনা করেছিলেন। এঁর একটি পুঁথিতে রাসলীলার কিছু পদ পাওয়া গেছে।[২৩] পদগুলিতে ভাগবতের কাহিনীর অনুসরণ দেখা যায়। রাধাবল্লভ কয়েকটি শোচক অর্থাৎ শোক প্রকাশক পদ লিখেছিলেন। রঘুনাথ দাসের বিলাপকুসুমাঞ্জলির বাংলা অনুবাদও ইনি করেন। লোচনদাসের অনুকরণে ইনিও গৌরনাগরীভাবের পদরচনা করেছেন। তবে আমাদের আলোচ্য কৃষ্ণকথা। তাই আমরা কেবল কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদগুলিই আলোচনার জন্য গ্রহণ করছি।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ পর্যায়ে এঁর একটি পদ পাওয়া গেছে (পদকল্পতরু; পদ সংখ্যা-১৯৬)। কৃষ্ণ সখীর কাছে রাধার সৌন্দর্যের কথা বলছেন। কিন্তু শুধু সৌন্দর্য নয়, রাধার অনুকুল মনোভাব এবং ইঙ্গিতও কৃষ্ণকে ব্যাকুল করেছে।

তারপর থেকে কৃষ্ণ স্বপ্নেও রাধাকে দেখেন। অতঃপর সখীকে কৃষ্ণ বলেন—

মরমক বেদন তোহে পরকাশল
তুহুঁ অতি চতুরি সুজান।

অর্থাৎ কৃষ্ণ দূতীকে অনুরোধ করছেন, তাঁর প্রেমে সহায়তা করার জন্য।

অন্য একটি পদ মিলনের (পদ কল্পতরু; পদ সংখ্যা-২২০)। কৃষ্ণের শেষ দশা উপস্থিত হয়েছে শুনে রাধা কাতর হয়ে সখীর মুখের দিকে চাইলেন। রাধার মনোভাব দেখে সখী তাঁর বেশ বানিয়ে দিলেন। রাধা এসেছেন শুনে কৃষ্ণ চমকিত হয়ে এগিয়ে এলেন। আর একটি পদ কৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্ত্যের (পদ কল্পতরু; পদ সংখ্যা-৭৭৪), এছাড়াও কবি শ্রীরাধার মানের (তরু; পদ-২০৩৭) দিব্যোন্মাদ অবস্থার (তরু; পদ-১৬৬১) এবং মাথুর পর্যায়ের একটি পদ (তরু; পদ-১৭২৫) রচনা করেছেন। পদগুলির মধ্যে কৃষ্ণকথার কোন বিশেষত্ব নেই।

এই কবি রচিত 'শ্রীকৃষ্ণলীলা' ও 'অক্রুরাগমনের' একটি পুঁথি পাওয়া গেছে[২৪]। পুতনা বধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্তবধ, নামকরণ, ননীচুরি, দধিমন্থন, জমল-অর্জুনভঙ্গ প্রভৃতি কাহিনী অবলম্বন করে 'শ্রীকৃষ্ণলীলা' নামক কাব্যটি রচিত হয়েছে। এটি কাহিনীর দিক থেকে যেমন অভিনবত্বহীন, তেমনি রচনাগুণেও তাৎপর্য-হীন। অক্রুরাগমনের পুঁথিতেও কাহিনী প্রচলিত পটে বাঁধা হয়েছে। তবে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রায় গোপীদের করুণ বিলাপ হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে—

জাতি কুল দিআ জারে শরণ লইলাঙ গো
সে কেনে ছাড়িআ যাবে মোরে।
দুখিনি কপালে মোর আগুনি লাগিল গো
আর কিবা দোষ দিব কারে।

'শ্রীকৃষ্ণজন্মকথা' নামে কবির আরও একটি এক পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুথি পাওয়া গেছে।[২৫] কাহিনী ভাগবত-অনুসারী। তবে ব্যতিক্রমও আছে। বসুদেব যখন কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে নন্দালয়ে যাচ্ছেন, তখন—

আগে যোগমায়া শৃগালি রূপে।
পথ দেখাইয়া চলিল ভূপে ॥

শিবারূপে যোগমায়া হয়ে গেল পার।
বসুদেব বলে জল নহেত সাঁতার ॥
হরসিতে পার হইতে শিশু করি কোলে।
খসিয়্যা পড়িল সিশু জমুনার জলে ॥

এটি ভবিষ্যপুরাণের কাহিনী। ইতিপূর্বেও বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে এই আখ্যায়িকার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে।

দিব্য সিংহ

দিব্য সিংহ গোবিন্দদাস কবিরাজের পুত্র ও শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। এঁর একটি পদ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংকলিত সংকীর্তনামৃতে পাওয়া যায়। পদটি শ্রীরাধার পূর্বরাগের। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংকলিত বৈষ্ণব পদাবলীতে উপরোক্ত পদটি ছাড়াও মাথুরের একটি পদ পাওয়া যায়।[২৬] দুটি পদেই গোবিন্দদাসের প্রভাব সুস্পষ্ট।

ঘনশ্যামদাস কবিরাজ

ঘনশ্যামদাস গোবিন্দদাসের পৌত্র ও দিব্য সিংহের পুত্র। শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতি গোবিন্দের কাছে ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' নামে সংস্কৃত ভাষায় একটি বৈষ্ণব রসালংকার বিষয়ক পদ্যাত্মক নিবন্ধ রচনা করেন।

ঘনশ্যামদাস সংস্কৃত শ্লোক এবং ব্রজবুলি পদ, দুয়েরই রচনায় বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। পিতামহ গোবিন্দদাসের কবিপ্রতিভার উত্তরাধিকার তিনি কিয়দংশে লাভ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে মৌলিকতা বিশেষ কিছু দেখা যায় না; তবুও সপ্তদশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট পদকর্তা হিসেবে তাঁর খ্যাতি আছে। পদকল্পতরুতে ঘনশ্যাম ভণিতায় ৪২টি পদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে গৌর ও নিত্যানন্দ বিষয়ক পদগুলি আমাদের আলোচ্য নয়।

ঘনশ্যামদাসের প্রায় সমস্ত পদই ব্রজবুলিতে রচিত। দু একটি বাংলা পদও আছে। যেমন—একটি পদ কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব প্রকাশক বাল্যলীলা। মা যশোদার কোলে গোপাল হাঁ করলে, রাণী পুত্রের মুখের ভেতর বিশ্বসংসার দেখতে পেলেন। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় 'থুতুনুতু দেয় রাণী বসনের দশি।' এই প্রসঙ্গটি ভাগবতে একটু অন্য

ভাবে আছে। বলরাম এসে যশোদার কাছে নালিশ করলেন যে কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। কৃষ্ণ হাঁ করে মাকে দেখালেন যে তিনি মাটি খান নি। আর তখনই যশোদা তাঁর মুখের ভেতর বিশ্বসংসার দেখতে পেলেন।[২৭]

ঘনশ্যাম রাধার জন্মোৎসব নিয়ে একটি পদ রচনা করেছেন। এটি একান্তভাবেই কৃষ্ণকথায় চৈতন্য পরবর্তী সংযোজন। ইতিপূর্বে জ্ঞানদাস প্রমুখ কবির এই বিষয়ক পদ আমরা পেয়েছি। ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথিতে বিশাখা নক্ষত্রে রাধা জন্মগ্রহণ করলেন—

কন্যার শ্রীমুখ দেখি রাজা হৈলা মহাসুখী
দান দেই ব্রাহ্মণ সকলে ॥
নানা দ্রব্য হস্তে করি নগরের যত নারী
আইলা সভে কীর্ত্তিদা-মন্দিরে। (তরু : পদ-১১৩৮)

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ নিয়ে কবি যে পদরচনা করেছেন, তাতে গোবিন্দদাসের প্রভাব স্পষ্ট। তবে চাঁদের দিকে রাধার হাত বাড়ানোর ব্যাপারটি অভিনব। চিত্রপট দর্শনে পূর্ব-রাগও রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার বহু ব্যবহৃত উপাদান। ঘনশ্যাম দাস এই বিষয় অবলম্বনেও পদ রচনা করেছেন (পদকল্পতরু ; পদসংখ্যা-৩৬)। সখী কৃষ্ণের চিত্রপট রাধার কাছে এনেছেন। সেই চিত্রপটটি দেখে রাধা বলছেন, যাঁকে তিনি যমুনার ঘাটে দেখেছিলেন, তাঁকেই চিত্রপটে দেখছেন। বিশাখা এঁরই কথা বলেছেন, ভাট এঁরই গুণগান করেন। দূতীর মুখে এঁরই কথা তিনি শোনেন। ইনিই রাধার প্রাণ হরণ করেছেন। এই কথা বলে রাধা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে সখীরা তাঁকে ধরে তোলেন। রূপ গোস্বামী উজ্জ্বল-নীলমণিতে পূর্বরাগের যে সমস্ত উপায়ের কথা বলেছেন, সেইগুলিকে পদকার এখানে একত্র করেছেন। অপর একটি পদে পীতবসন পরিহিত বনমালাধারী, কপালে চন্দনবিন্দু কৃষ্ণকে নীপকুঞ্জে ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাধা মুগ্ধ হন। শুধু রূপই তো নয় ; কৃষ্ণ—

মুরলী আলাপি ঝাঁপি গগনাবধি
গায়ত কতহুঁ সুতান। (তরু ; পদ-২৪২১)

আবার কখনও রাধা শ্রীকৃষ্ণের যৌবন-তরঙ্গিত শ্যামকান্তিকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি সখীকে সম্বোধন করে বলেন, সেই সমুদ্রে তিনি নিজের চিত্তকে নিক্ষেপ করেছেন (বৈষ্ণব পদাবলী ; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ; দ্বিতীয় সংস্করণ ; পৃ. ৮০৬)। শ্যামরূপকে এইভাবে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা ঘনশ্যামের মৌলিকত্ব। অবশ্য এর পেছনে চৈতন্যদেবের সমুদ্রকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবার প্রসঙ্গটি কাজ করে থাকতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ পর্যায়ের একটি পদে ঘনশ্যামদাস পুরাতন কথাবস্তুতে একটু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। রাধার প্রতি সদ্য অনুরক্ত বিষণ্ণ কৃষ্ণকে দেখে তাঁর সখা বলছেন, কৃষ্ণ যেন এখন সব সময়েই অন্যমনস্ক। তিনি আর বাঁশীও বাজান না। সখা বলছেন, হে প্রাণের বন্ধু, তুমি কেন তোমার মনের দুঃখের কথা বলছ না? তোমার মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আর—

হেরইতে নীরময় লোচন তোর।
কো জানে কৈছে করত হিয়া মোর ॥

সখার এই আন্তরিক মমত্বময় কথা শুনে কৃষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাত নাড়লেন। (পদকল্পতরু ; পদ সংখ্যা ৫৫) পদটিতে শ্রীকৃষ্ণের সদ্যোদ্ভিন্ন অনুরাগ আর কৃষ্ণের প্রতি সখার অকৃত্রিম ভালবাসা উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। এরপর শ্রীকৃষ্ণের দূতী রাধার কাছে গিয়ে কৃষ্ণের যে চিত্রটি অঙ্কন করেন, তা তাঁর রাধাপ্রেমতন্ময় মূর্তিটিকে তুলে ধরেছে—

মাধবি লতা তলে বসি।
চিবুকে ঠেকনা দিয়া বাঁশি ॥
তোহারি চরিত অনুমানে।
যোগী যেন বসিলা-ধেয়ানে ॥ (তরু ; পদ-২১৬)

অন্যদিকে শ্রীরাধার আপ্তদূতীও কৃষ্ণের কাছে রাধার অবস্থার কথা জানান (পদকল্পতরু ; পদসংখ্যা-২৫৫)। এই কবি রচিত শ্রীরাধার অভিসারের পদটি তিমিরাভিসারের। পদটির ভাষাভঙ্গী ও ভাব সম্পূর্ণভাবেই গোবিন্দদাসের দ্বারা প্রভাবিত (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ৮০৮)।

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের একটি পদে রাধার সখী, কৃষ্ণ এবং রাধা—দুজনের চোখকে ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কৃষ্ণের দুটি আঁখিরূপ ভ্রমর তার চঞ্চলতা ত্যাগ করে রাধার মুখেই স্থিরনিবদ্ধ রেখেছে। কিন্তু রাধার দুটি ভ্রমর চোখ যেন এখনও চঞ্চল। সেই ভ্রমর কখনও রাধার পায়ের ওপর বসে অর্থাৎ কৃষ্ণের সামনে এসে রাধা নিজের পায়ের দিকে তাকান, কখনও বা নিজের শরীরের দিকে তাকান। আবার কখনও চক্ষুরূপী ভ্রমর দুটি—

ক্ষণে ক্ষণে কানুক বদন সররুহে
অলখিত আওত যাত ॥ (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ৮০৮)

পদটি সখীর বক্রোক্তিদীপ্ত কৌতুকে উজ্জ্বল। তিনি কৃষ্ণের বহুবল্লভত্বের দিকে নিগূঢ় কটাক্ষ করে বলেছেন, বহুবল্লভ-কৃষ্ণের চোখের দৃষ্টি 'বিছুরল চপল চরিত'। তেমনি আবার রাধার প্রতি কৃষ্ণের বর্তমানের সুগভীর প্রেমকেও ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে আবার কৃষ্ণের সামনে ব্রীড়াবনতা, প্রথম-সমাগম-শঙ্কিতা রাধার প্রেমের চকিত চাহনিও সখীর বর্ণনায় চমৎকার ফুটে উঠেছে।

রাধাকে যমুনার পথে একা পেয়ে কৃষ্ণ বারবার চতুর্দিকে তাকিয়ে রাধার হাত ধরে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার অনুরোধ জানালেন। রাধা সখীকে বলছেন, আমি ভাবলাম নির্জন পথে তার সঙ্গে হঠকারিতা করে কাজ নেই, তাই "লোচন ইঙ্গিতে অনুমতি কেলি"। কিন্তু অনুমতি দেওয়ার পর রাধার এখন ভয় হচ্ছে। তাই তিনি সখীকে প্রশ্ন করছেন—

এ সখি অব কিয়ে করব বিধান।
আজু পুন মন্দিরে আওব কান ॥ (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ৮০৯)

বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা ও বিপ্রলব্ধা রাধাকে নিয়েও ঘনশ্যাম পদ রচনা করেছেন (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ.-৮০৯)। তাঁর খণ্ডিতা রাধার কাছে অন্য নায়িকা উপভোগের পর সকালবেলা কৃষ্ণ উপস্থিত হলে তিনি বলেন, আকাশে একটাই চাঁদ, আর তার

কোনো দোসর নেই এবং তারও গায়ে আবার কলঙ্ক চিহ্ন আছে। শুধু তাই নয়, দিনের বেলায় অরুণ কিরণে সেই চাঁদ লজ্জায় নিজেকে ব্যক্ত করে না। কিন্তু কৃষ্ণের বক্ষরূপ আকাশে অজস্র চাঁদ অর্থাৎ অন্য নায়িকার নখক্ষত দিনের বেলাতেই প্রকাশিত হয়েছে। বিধাতার শক্তিকেও পরাজিত করে দিনের বেলাতেই কোন কলাবতী কৃষ্ণের শরীরে অরুণ প্রকাশ করেছে। তার সেবা না করে কৃষ্ণের এখানে চলে আসা শোভা পায় না (পদ কল্পতরু; পদসংখ্যা-৩৮৪)। খণ্ডিতা নায়িকার এই বুদ্ধিদীপ্ত শ্লেষোক্তি কৃষ্ণকথায় অভিনব নয়। কিন্তু তাহলেও রাধার এই উক্তিটি অভিনব। আবার কখনও কৃষ্ণকে দেখেই রাধা তাঁকে ব্যঙ্গ করার জন্য প্রশ্ন করেন—

আজুক গমন কোন ধনী সেবি।

উত্তরে কৃষ্ণ জানান-'তুয়া বিনু তান নাহি অধিদেবী'। এইভাবে রাধা যতই কৃষ্ণকে আঘাত করার চেষ্টা করেন, কৃষ্ণ সুকৌশলে তার বিপরীত উত্তর দিয়ে রাধাকে নিবৃত্ত করেন। শেষ পর্যন্ত রাধা কৃষ্ণের কাছে হার মানলেন (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ৮১০)। অনুরূপ আর একটি পদ ঘনশ্যামের রয়েছে, সেখানে কৃষ্ণই রাধার কাছে জব্দ হয়েছেন। এটি একটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ (পদকল্পতরু; পদসংখ্যা-৩৫০)। শ্লোকটি হল—

কোহয়ং হুঙ্কুরুতে হরির্গিরিগুহাং হিত্বাত্র হর্ম্যে কুতঃ
কান্তেহহং মধুসূদনস্তদিহ কিং পদ্মালয়ং গচ্ছতু।
কৃষ্ণোহস্মীতি গুণো তনুর্বদতি কিং ন শ্যামমূর্ত্তিঃ প্রিয়ে
সোমাভা পরিখেদিতঃ কিমিতি সুস্মেরো হরিঃ পাতু বঃ ॥

(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ১৯৭৫, পৃ. ১০৬ হতে পুনরুদ্ধৃত)
রাধার মন্দিরে কৃষ্ণ বারবার রাধাকে ডাকছেন, রাধা বলছেন,—'কো ইহ পুন পুন করত হুঙ্কার'। কৃষ্ণ বললেন 'হরিহাম'। রাধা বলেন—

পরিহরি সো গিরিকন্দর মাঝ.
মন্দিরে কাহে আওব মৃগরাজ।

কৃষ্ণ বলেন—আমি সে হরি নই, আমার নাম মধুসূদন। প্রত্যুত্তরে রাধা বলেন, 'তাহলে কমলালয়ে মধুকরীর কাছে যাও'। বিব্রত কৃষ্ণ বলেন—'এ ধনি, সো নহ হাম ঘনশ্যাম'; রাধা, বলেন 'তনু বিনু গুণ কিয়ে কহে নিজ নাম'। শেষ পর্যন্ত—

পরিচয়-পদ যত সব ভেল আন
তবহি পরাভব মানল কান।

রাধাকৃষ্ণকে আশ্রয় করে এই ধরনের চাতুর্যময় কিছু কিছু সংস্কৃত শ্লোক এক সময় রচিত হয়েছিল, পরবর্তীকালের পদাবলীকারেরা এর অনুবাদ করেছেন। এরপর মান পর্যায়ে মানিনী রাধার মানভঞ্জনের জন্য কৃষ্ণ যথারীতি রাধার পদ ধারণ করে বলেন—

ঐছন দোষ হাম কবহুঁ না করব
প্রেমে না করব ধনি বাদ ॥

কিন্তু রাধার মান সুদুর্জয়, তাই কৃষ্ণের এমন কাতর অনুরোধও—

তবহুঁ সুধামুখি এতহুঁ নাহি শুনি
চহণ হেলি চলি যায় (পদকল্পতরু ; পদ-৪২৬)।

কলহান্তরিতা রাধা আক্ষেপ করলে, সখী তাঁকে তাঁর মানের জন্য তিরস্কার করেন। (পদকল্পতরু ; পৃ. ৪২৭) দূতী রাধার কাছে গিয়ে রাধাবিরহী কৃষ্ণের শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করেন (তরু ; পদ-৪৯১)।

অন্য দিকে রাধার সখী আরও তীব্রভাবে রাধাকে তিরস্কার করতে থাকেন। 'যুবতী-বৃন্দের মাঝখানে যার বাস এবং নব নব রমণীতে যার অভিলাষ, সেই কৃষ্ণ যখন পায়ে হাত দিয়ে অনুনয় করল, তখনও তোমার মান ভঙ্গ হল না' (পদ কল্পতরু ; পদ-সংখ্যা-৭৯১)। এদিকে কৃষ্ণের দূতী রাধাকে বলেন, এখনই তোমার অনুচর কানু তোমার কাছে আসবে। সে তোমার চরণে ধরে ক্ষমা চাইলে আমার দিব্যি রইল, তাকে আর কিছু বলবে না। যখন কানু 'গদগদ হয়ে তোমাকে সাধবে আর সজল চোখে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, তখন তার সঙ্গে সরস কথা বলবে, স্পর্শ করতে এলে হাত সরিয়ে নেবে না' (পদ কল্পতরু ; পদসংখ্যা-২০৫৪)। সখী এত কথা বলার পর, রাধা কৃষ্ণকে আসার অনুমতি দিলেন। রাধার সামনে কৃষ্ণ হাত জোড় করে নিরুত্তর থাকলেন ও ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। কিন্তু তবুও রাধা কৃষ্ণের মুখ দেখলেন না (পদকল্পতরু ; পদসংখ্যা-২০৫৫)। তখন চতুর কৃষ্ণ রাধার পায়ে ধরলেন। রাধা বললেন 'তুমি যদি আমার ভালবাসা চাও, তাহলে মদন সাক্ষী করে খত লিখে দাও যে আমাকে ছাড়া আর কাউকে তুমি চোখে দেখবে না, এমন কি আমার কথায় জলপান করবে (পদ কল্পতরু ; পদসংখ্যা-২০৫৬)।' কৃষ্ণ তাতেই রাজী হলেন (পদ-কল্পতরু ; পদসংখ্যা-৫২২)। অতঃপর উভয়ের মিলন ঘটল। এই কথাবস্তু চিত্তা-কর্ষক হলেও ঘনশ্যামদাসের নিজস্ব সৃষ্টি নয়। কারণ ইতিপূর্বেই আমরা এই ধরনের পদ পেয়েছি।

ঘনশ্যামদাস একটি পদে শ্রীকৃষ্ণের অভিসার বিষয়ে পদ রচনা করেছেন। আকাশে মেঘ গর্জন করছে, অন্ধকার রাত্রি, কৃষ্ণ বিদ্যুতের আলোয় পথ চিনে চিনে সংকেত-কুঞ্জে গিয়ে উপস্থিত হলেন। রাধা বুঝতে পারলেন যে কৃষ্ণ এসেছেন, কিন্তু কৌতুক করার জন্য তিনি কুঞ্জদ্বার রুদ্ধ করে দিলেন। কৃষ্ণ রুদ্ধদ্বার দেখে ভাবলেন, 'আজু দুরদিনে ধনি না ভেল বাহির।' কৃষ্ণের মনে খুব দুঃখ হল। কাঁদতে কাঁদতে কুঞ্জদ্বারে হাত দিয়ে রুদ্ধ কপাট দেখে তিনি বললেন 'কো ইহ মুন্দল কুঞ্জক বাট।' কৃষ্ণের ক্রন্দন শুনে রাধার দয়া হল। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কোন দ্বার মাহা রোয়।' এই পদটির কথাবস্তু ঘনশ্যামের নিজস্ব কল্পনা। মিলনের অন্য পদগুলি খুবই গতানুগতিক। ঘনশ্যাম রাসনৃত্যের একটি পদ রচনা করেছেন (বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ. ৮১৫)। ভাগবতের বর্ণনায় এবং পূর্ববর্তী গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিদের রচনায় রাসনৃত্যের যে সমুন্নত মহিমা রূপ পেয়েছে, এখানে তা অনুপস্থিত। ঘনশ্যাম দাসের ভাবী বিরহের দুটি পদ একেবারেই গোবিন্দদাসের অনুরূপ (পদকল্পতরু ; পদ-সংখ্যা-১৬০৭ ; বৈ. প. পৃ. ৮১৬)।

ঘনশ্যামের ভবন্ বিরহের পদে কথাবস্তুর কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য আছে। রাধা সখীকে বলছেন, কৃষ্ণের গুণরূপ দড়িতে প্রেমের গিঁঠ দিয়ে তিনি নিজেই জাল বানিয়ে তার ভেতর প্রবেশ করেছিলেন, আজকে তিনি তার উচিত ফল পাচ্ছেন (বৈষ্ণব

পদাবলী ; পৃ. ৮১৬) অপর একটি পদে মথুরাপুরীতে এক রমণী কৃষ্ণকে বলেছে, বিদুর নগরে তার বাড়ী। যখন কৃষ্ণ মথুরায় চলে এলেন, তখন সে গোকুলেই ছিল। কৃষ্ণের রথ চলে আসার পর গোপনারীদের সে ক্রন্দন করতে দেখল, চোখের জলে তাদের বসন ভিজে গেল। তাদের মধ্যে এক নারী সুন্দরী ও যুবতী, চিত্রিত পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর কৃষ্ণের রথ দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার পর সেই রমণী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলে সখীরা কাঁদিতে কাঁদিতে তাকে 'কি হল, কি হ'ল বলে ঘিরে ধরল।' ক্রন্দনের আবেগে কারও কুন্তল আলুলায়িত হল, কারও বসন ছিন্ন হল, কেউ কপালে কঙ্কণের আঘাত করতে লাগল, আবার কেউ বা মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এখানে পদকার গোপীদের এবং রাধার শোককেই রূপ দিয়েছেন। কিন্তু অন্য এক অপরিচিতা রমণীর জবানীতে ব্যক্ত হওয়ায় সেই পুরাতন কথাবস্তুই নাটকীয় বৈচিত্র্য লাভ করেছে (পদকল্পতরু ; পদসংখ্যা-১৬৩৩)। অপর একটি পদে কেবলমাত্র বিরহিণী রাধিকার অবস্থা সখীর জবানীতে বলা হয়েছে (পদ কল্পতরু ; পদসংখ্যা-১৯২৭)।

ঘনশ্যামের মাথুর পর্যায়ের অপর একটি পদে দূতী মথুরায় গিয়ে রাধাকে ছেড়ে চলে আসার জন্য কৃষ্ণকে তিরস্কার করেছে (তরু-পদ-১৬৯৫)। আবার মথুরা থেকে ফিরে এসেও দূতী যথারীতি রাধার কাছে কৃষ্ণের কথা বলেছে। তবে ঘনশ্যামদাসের কৃষ্ণ প্রগল্‌ভ মুখর নন, তিনি নিজের বেদনাকে নিজের মধ্যে সংহত রাখতে জানেন। তাই তাঁর সম্পর্কে দূতী বলে—

হিয়া বিরহানলে জ্বলত নিরন্তর
লখই না পারই কোই।
জনু বড়বানল জলনিধি অন্তরে
বাহিরে বেকত না হোই ॥
সুন্দরি কো কহ কানু স্বতন্ত্র
তুয়া গুণ নাম গুপত অবলম্বন
সোই সতত জপমন্ত্র ॥ (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ৮১৮)

একটি পদে রায়শেখরের অনুকরণে তিনি বর্ষাকালের পরিবেশে বিরহিণীর চিত্র এঁকেছেন (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ.-৮১৮)। এ ছাড়া ঘনশ্যাম শ্রীরাধার দ্বাদশ মাসিক বিরহও বর্ণনা করেছেন (পদকল্পতরু ; পদ-১৮১৫-২৬)। এতে ছন্দের বৈচিত্র্য থাকলেও কথাবস্তুতে বৈচিত্র্য নেই। তবে ঘনশ্যামের অপর একটি পদের কথাবস্তুতে বৈচিত্র্য রয়েছে (পদকল্পতরু ; পদ-১৯৭১)। তাঁর বিরহিণী রাধা স্বপ্নে এক মুনিবরকে দেখেছেন। সেই মুনি রাধাকে বলেছেন, "অচিরে তুয়া মঙ্গল পূরব মানসকাম"। এতে রাধা ধরে নিয়েছেন যে সম্ভবত কৃষ্ণই ব্রজে আসবেন, তাই তিনি এই স্বপ্ন দেখেছেন। গোবিন্দদাসের কৃষ্ণের মত ঘনশ্যামের কৃষ্ণও আবার ব্রজে এসেছেন। তাঁর সম্পর্কে রাধার সখী রাধাকে বলছেন—

সুরত রতনখনি শত শত সুরমণী
মণিময় মন্দির ছোড়ি।

তোমারি মিলন যাঁহা সোই নিকুঞ্জ মাহা
পন্থ নেহারত তোরি। (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ৮২০)

এই পদটি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের উমাপতিধরের সেই বিখ্যাত শ্লোকটির কথা মনে করিয়ে দেয়—'রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিত জলধৌ মন্দিরে স্বারাকায়াম্' ইত্যাদি। মথুরা ও স্বারকারমণীদের তুলনায় রাধাপ্রেম কৃষ্ণের কাছে কত কাঙ্ক্ষণীয় ; চৈতন্যযুগের বহু পূর্ববর্তীকাল থেকে গোস্বামিগণ ও পরবর্তী কবিদের সরণী বেয়ে সেই একই তথ্য ঘনশ্যামদাসের কাব্যেও স্থানলাভ করেছে। রাধা এবং কৃষ্ণের মিলন নিয়ে কবি যে পদটি রচনা করেছেন, তা গতানুগতিক হলেও আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ। অন্যদিকে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের পদটি আলংকারিক কৃত্রিমতায় ভারাক্রান্ত (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ২০১০)।' তবে স্বাধীনভর্তৃকার পদে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য আছে! মিলনের পর রাধা কৃষ্ণকে বলেছেন তাঁর প্রসাধন সম্পন্ন করতে। কৃষ্ণ রাধার পায়ে আলতা পরাতে পরাতে চকিত নয়নে রাধার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। কৃষ্ণের কাণ্ড দেখে এক সখী আর একজনকে ডেকে বলছেন, সম্ভবতঃ কৃষ্ণ রাধার পা আর ঠোঁটের মধ্যে কোনটির প্রসাধন অধিকতর উজ্জ্বল তা দেখে নিচ্ছেন। কৃষ্ণ রাধার প্রতিটি অঙ্গ বারবার দেখে রাধার বেশ বানাচ্ছেন। রাধার চরণ বিভূষণ প্রতিটি মণিতে কৃষ্ণের প্রতিচ্ছায়া পড়েছে। মনে হচ্ছে যেন রাধার রূপকে লক্ষ নয়নে নিরীক্ষণ করার জন্য কৃষ্ণ বহু রূপ ধারণ করেছেন (পদকল্পতরু ; পদসংখ্যা-২৭৩৯)। নিঃসন্দেহে পদটি রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথাব পুরাতন বিষয়ের মধ্যে বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে।

ঘনশ্যামের পদ আলোচনার পর আমরা বলতে পারি যে, পদ রচনার ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তী পদকারদের, বিশেষতঃ তাঁর পিতামহকেই অনুসরণ করলেও কথাবস্তুতে কিছুটা বৈচিত্র্য এনেছেন।

বলরাম কবিরাজ

গোবিন্দদাস কবিরাজের ভাগিনেয় বলরাম কবিরাজ ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছিলেন। এঁর সম্পর্কে পদকল্পতরুর সংকলয়িতা বৈষ্ণবদাস লিখেছেন—

কবি নৃপ বংশজ ভুবন বিদিত যশ
ঘনশ্যাম বলরাম।
ঐছন দুহুঁজন নিরুপম গুণ গান
গৌর প্রেমময় ধাম॥

এঁর পদের সঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত বলরামদাসের পদকে পৃথক করা যায় না। তবে রচনাভঙ্গী দেখে ড. বিমানবিহারী মজুমদার দুটি পদকে গোবিন্দদাস পরবর্তী বলরামের বলে স্থির করেছেন। এর মধ্যে একটি পদ সখীর জবানীতে রাধার পূর্বরাগের।[২৮] অপর পদটিতে খণ্ডিতা রাধার মুখ দিয়ে অন্য নায়িকাসম্ভোগকারী কৃষ্ণের বিপর্যস্ত বেশ বর্ণিত হয়েছে। পদটি কবির রচনা নৈপুণ্যের পরিচায়ক—

শ্যামর অঙ্গে নীল অম্বর কিয়ে
জলদে জলদ মিলি গেল।

দুরহি দীগ বসন জনু হেরিয়ে
ঐছন মরমহি ভেল ॥[২৯]

যদুনন্দন দাস

যদুনন্দন দাস সপ্তদশ শতকের অনুবাদাশ্রয়ী কবিদের মধ্যে প্রধান। ১৫৩৭ খ্রীস্টাব্দে মালিহাটির বৈদ্য পরিবারে এঁর জন্ম হয়। শ্রীনিবাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর কাছে দীক্ষা নিলেও শ্রীনিবাসকেই ইনি গুরু বলে মনে করতেন। যদুনন্দন রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের, 'দানকেলিকৌমুদী' নামক ভাণিকার, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত' মহাকাব্যের এবং বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' কাব্যের অনুবাদ করেন। এগুলির নাম তাঁর অনুবাদে যথাক্রমে রসকদম্ব, দানলীলা চন্দ্রামৃত, গোবিন্দ বিলাস ও কৃষ্ণকর্ণামৃত। এ ছাড়াও তিনি 'কর্ণামৃত' নামে একটি বিখ্যাত জীবনীজাতীয় কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তবে অনুবাদক হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও যদুনন্দন কিছু কিছু মৌলিক পদও রচনা করেছিলেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলীতে সংকলিত পদসমূহকেই আমরা এক্ষেত্রে আলোচনার জন্য গ্রহণ করছি।

যদুনন্দন রচিত শ্রীরাধার পূর্বরাগের পদে ললিতা রাধার বিষণ্ণমুখ, ম্লান শরীর ও অন্যমনস্কতা দেখে জিজ্ঞাসা করেন—

এমন হইলা কি লাগিয়া।
না কহিলে ফাটি যায় হিয়া ॥

বৈষ্ণব সাহিত্যে সখীদের যে ভূমিকা, এখানে তারই প্রকাশ ঘটেছে। সখীরা নিছক সাহায্যকারিণী নয়। রাধার প্রতি সখীর ভালবাসাও সুগভীর ও আন্তরিক। ললিতার প্রশ্নের উত্তরে রাধা কদম্ববন থেকে আসা মধুর শব্দের কথা বললে, ললিতা বললেন যে এটি মোহন বাঁশীর শব্দ। এতে এত বিমোহিত হওয়ার কারণ কি? উত্তরে রাধা বংশীধ্বনির প্রতিক্রিয়ার যে বর্ণনা দেন, তা কবির গভীরতম অনুভূতি ও উচ্চতর কাব্যপ্রতিভার পরিচায়ক—

রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি তনু শীতল করিয়া ॥
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায় আমার মতি
বিচারিতে না পাইয়ে ওর ॥
(বৈষ্ণব পদাবলী; পৃ. ২২৪)

বংশীধ্বনি শ্রবণে পূর্বরাগ একটি পুরাতন বিষয়। এটিকে অবলম্বন করে বহু শক্তিশালী কবি পদ রচনা করেছেন। কিন্তু তীক্ষ্ন শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে রাধার মানসিক

অনুভূতির সমন্ব ও রাধার বিভ্রান্ত ব্যাকুলতার বর্ণনায় কবি মৌলিক। এইভাবে বৈষ্ণব কবিরা অনেকেই প্রথানুগত প্রকরণের গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়েও কৃষ্ণকথায় নানাভাবে বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছেন।

এ ছাড়াও যদুনন্দন কৃষ্ণের নাম শ্রবণে ও চিত্রপট দর্শনে শ্রীরাধার পূর্বরাগের কথা বর্ণনা করেছেন (বৈষ্ণব পদাবলী; পৃ. ২২৫)। কৃষ্ণের রূপ বর্ণনার একটি পদে রূপ গোস্বামী সঙ্কলিত পদ্যাবলীর একটি শ্লোকের ভাব বিস্তৃত হয়েছে। শ্লোকটি হ'ল—

ইন্দীবরোদর সহোদর মেদুর শ্রীর্
বাসো দ্রবৎ কনকবৃন্দনিভং দধানঃ।
আমুক্তমৌক্তিক মনোহর হার বক্ষাঃ
কোহয়ং যুবা জগদনঙ্গময়ং করোতি ॥[৩০]

"নীলকমল গর্ভের মত স্নিগ্ধকান্তি, গলিত কাঞ্চনবর্ণ বাস পরিধানকারী, পরিহিত মুক্তামালায় যার বক্ষ মনোহর—এমন কে এই যুবা জগৎকে প্রেমাপ্লুত করছে?"

যদুনন্দন অনুবাদ করেছেন—

ইন্দীবর বর-উদর সহোদর-মেদুর মদহরদেহ
জম্বুনদমদ বৃন্দবিমোহিত অম্বরবর পরিধেয়।
(বৈষ্ণব পদাবলী; পৃ.-২২৫)

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের পদে সখী কৃষ্ণের কাছে গিয়ে রাধার অবস্থা বর্ণনা করেন। কৃষ্ণনুরাগিনী রাধা কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, আবার কখনও কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। কখনও সহচরীকে জড়িয়ে ধরে 'হরি, হরি' বলেন (বৈষ্ণব পদবলী; পৃ. ২২৬)। রাধার এই অবস্থা কিছুটা গীতগোবিন্দের ষষ্ঠ সর্গের বিরহিণী রাধার অনুরূপ। বিশেষতঃ 'দিশি দিশি হেরই তোয়'; 'পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্'-এরই অনুবাদ। যদুনন্দনের রাধা, কৃষ্ণ তাঁকে উপেক্ষা করেছেন শুনে নিজে মৃত্যুবরণের প্রতিজ্ঞা করলেন—

কালিন্দী গম্ভীর জলের ভিতর
প্রবেশ করিব আমি।
তবে সে পিরিতি রহয়ে কিরিতি
নিচয়ে জানিহ তুমি ॥ (বৈষ্ণব পদাবলী; পৃ.-২২৭)

শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে এই ঘটনার প্রসঙ্গ আছে। কৃষ্ণ কপটভাবে রাধা কর্তৃক প্রদত্ত পত্র প্রত্যাখ্যান করলে দুঃখিতা রাধা নিজের মনে বলেছেন—

"এবং গুণেণ ইমিণা উবেক্খিদং বি ণং হদসরীরং কধং অজ্জবি ণীলজ্জাহং ধারেমি? তা কালিঅহদ পবেসোবাঅং অণুসরিস্সং" ॥[৩১]

"আমি কি নির্লজ্জা যে, এইরূপ গুণশালী কর্তৃক উপেক্ষিতা হইয়াও এই হত শরীর অদ্যাপি ধারণ করিতেছি, অতএব কালিয় হ্রদ প্রবেশের উপায় অনুসরণ করি।"

অন্যত্র রাধা বলেছেন—'সহি সহি। গহীর নীরা সরণং বহিণী কিদংতস্স ॥[৩২]

"সখি! এখন গভীর নীরা কৃতান্ত ভগিনী যমুনাই আমার একমাত্র আশ্রয়।"

এই কবির পদে রাধা যেমন কৃষ্ণের নামটুকুই শুনে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবেই কৃষ্ণও রাধার নাম শুনেই তাঁর প্রতি অনুরক্ত (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ.-২২৮)। প্রেমের আর এক স্তর উত্তীর্ণ হয়ে কৃষ্ণ তাঁর সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, সারা পৃথিবীতে, এমনকি আকাশেও সর্বত্রই কেবল রাধামূর্তি প্রত্যক্ষ করেছেন। কৃষ্ণের রাধাপ্রেম চৈতন্য সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। কিন্তু কৃষ্ণের এই সর্বত্র রাধাকে দেখতে পাওয়া যদুনন্দনের মৌলিক সৃষ্টি। যদুনন্দনের পদে রাধার প্রতিপক্ষ নায়িকা চন্দ্রাবলীর উল্লেখ আছে। উৎকণ্ঠিতা, মলিনমুখী রাধা বসে বসে কৃষ্ণবিরহে চোখের জল ফেলছেন। সেখানে গিয়ে দূতী বললেন, যার নাম রাধা সহ্য করতে পারেন না, সেই চন্দ্রাবলীর সঙ্গে কৃষ্ণ বিহার করছেন (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ২৩১)। শ্রীরাধার মান ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তার মানভঞ্জন এই কবির পদে গতানুগতিক। গোষ্ঠলীলার একটি পদে কবির যমুনা বর্ণনা বড় মনোরম ও গতানুগতিকতামুক্ত—

ভাগ্যবতী যমুনা মাঈ।
যার এ কূলে ও কূলে ধাওয়া ধাই ॥
শ্বেত শাঙল দোন ভাই।
যার জলে দেখে আপন ছাই ॥ (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ২৩১)

যদুনন্দন দানকেলিকৌমুদীর কিছু বিষয় নিয়েও পদরচনা করেছেন (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ২৩৩, ২৩৪)। রাধার মুরলী শিক্ষার একটি পদে রাধা বাঁশীতে শ্যামের নাম বাজিয়েছেন, অন্যদিকে কৃষ্ণও রাধার নাম বাজিয়েছেন (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ.-২৩৪)। শ্রীরূপ গোস্বামীসৃষ্ট পৌর্ণমাসী চরিত্রকে নিয়ে যদুনন্দন একটি পদ রচনা করেছেন (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ ২৩৪)। পদটিতে বর্ষীয়সী স্নেহময়ী দেবী পৌর্ণমাসীর চরিত্রটি বড় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বড়াইর ছায়ানুসরণে চরিত্রটি সৃষ্ট হলেও, স্বরূপতঃ কতখানি পৃথক তা যদুনন্দনের পদ থেকে বোঝা যায়। পৌর্ণমাসী যশোদার গৃহে গেলে নন্দরাণী ছুটে এসে তাঁর পায়ে পড়লেন। পৌর্ণমাসী—

তারে কোলে লৈয়া শির পরশিয়া
আশিস বচন বোলে ॥
সতী শিরোমণি অখিল জননী
পরাণ বাছনি মোর।
পতিপুত্রসহ ধেনু বৎস সব
কুশলে থাকুক তোর ॥ (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ৩২৬)

অপর একটি পদে প্রভাতকালে রাধার অঙ্গে কৃষ্ণের নীল বসন দেখে মুখরা বিশাখাকে ডেকে বলে—

সন্ধ্যাকালে কালি উরে বনমালী
দেখিয়াছি এই বাস
সতীকুল হৈয়া সেরূপে ভুলিয়া
ধরম করিলা নাশ ॥
(বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ২৩৭)

কিন্তু বিশাখা বললেন যে, আসলে রাধার অঙ্গে প্রভাতকালীন সূর্যের রঙ লেগেই তার বসনের বর্ণ এমন হয়েছে। অষ্টকালীয় লীলার অন্তর্ভুক্ত এই পদটির কথাবস্তু 'গোবিন্দলীলামৃত' থেকে আহৃত।

অপর একটি পদে দেখি, জটিলার গৃহে পূজা হবে, জটিলা পুরোহিত আনতে বললেন। কৃষ্ণের জ্ঞাতিভ্রাতা সুভদ্রের স্ত্রী কুন্দলতা ছদ্মবেশী কৃষ্ণকে পুরোহিত সাজিয়ে আনলেন। কৃষ্ণ পূজা করার পর জটিলা দক্ষিণা দিতে চাইলেন। কিন্তু কৃষ্ণ—

তেঁহো কহে কার্য্য নাই
তোমা সভার প্রীতি চাই
এই মোর দক্ষিণা হইল ॥ (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ২৪১)

এই কাহিনীতেও অভিনবত্ব কিছু নেই। এটিও রূপ গোস্বামীর নাটকে ও গোবিন্দ-লীলামৃতে রয়েছে। যদুনন্দনের একটি পদে রাধাকৃষ্ণের বসন্তলীলা বর্ণিত। এছাড়া রাধা কৃষ্ণের ঝুলনলীলা নিয়েও কবি পদ রচনা করেছেন (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ২৪২)। মাথুর পর্যায়ের পদগুলিতে অভিনবত্ব কিছু নেই। তবে একটি পদে রয়েছে, কৃষ্ণ প্রিয়তম দাম, শ্রীদাম আর হলধরের সঙ্গে মথুরা যাবেন। সম্ভবত রূপ গোস্বামীর নাটক ও গোবিন্দলীলামৃত অনুবাদ করার জন্য তাঁর পদাবলীতেও এগুলির প্রভাব বেশী পরিমাণে পড়েছে।

গৌরদাস

গৌরদাস নামক একজন পদকর্তা সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, ইনি যদু-নন্দনের শিষ্য। পদকল্পতরুতে এঁর তিনটি পদ আছে। একটি পদে রাধা সখীকে মাধবের কাছে দূতী করে পাঠিয়েছেন, যাতে হরি তাঁর কাছে অভিসারে আসেন—এই অনুরোধ জানিয়ে (পদ কল্পতরু ; পৃ. ১০২৫)। অন্য দুটি পদের মধ্যে একটি কলহান্তরিতার (পদকল্পতরু ; পৃ. ৪৪২) ও অপরটি ফুলদোলের পদ (পদ কল্পতরু ; পৃ. ১৫২৭)। পদগুলি বিশেষত্বহীন।

রামগোপাল চৌধুরী (গোপাল দাস)

রামগোপাল চৌধুরী সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বর্তমান ছিলেন। তিনি রস-কল্পবল্লী রচনা করেন। এই গ্রন্থে কবি যথাসম্ভব নিজের পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন। ইনি শ্রীখণ্ড নিবাসী বৈদ্য ছিলেন। এঁর গুরু শ্রীখণ্ডেরই রঘুনন্দনের বংশধর রতিকান্ত ঠাকুর। পুত্র পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে কবির রচিত কিছু পদ রয়েছে। এঁর পদ আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বৈষ্ণব পদাবলীতে সঙ্কলিত পদগুলিই গ্রহণ করছি।

এই পদকার শ্রীরাধার পূর্বরাগ পর্যায়ে দশমী দশায় উপনীতা শ্রীমতীকে নিয়ে পদ রচনা করেছেন (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ৭৮৮)। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ পর্যায়ে কবি শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে রাধার রূপ ও অঙ্গভঙ্গীর কবিত্বময় অথচ বাস্তবসম্মত বর্ণনা দিয়েছেন। রাধাকে দেখে কৃষ্ণের মুগ্ধ উচ্চারণ—'থির বিজুরি বরণ গোরী পেখলুঁ ঘাটের কূলে'—একটি বিখ্যাত পংক্তি।

বালিকা রাধাকে কৃষ্ণের কাছে এনে দিয়ে প্রথম মিলনের সময় দূতী বলে—"রাধা ননীর পুতলি, সে যেন কোমল শিরীষের মালার মত। সে ঘুমিয়ে পড়লে তাকে জাগিয়ে তোলা যায় না। নিজের স্বামীর ছায়ার দিকেও তাকায় না। সুতরাং প্রথম মিলন সময়ে দূতীর কাতর অনুরোধ 'অলপে দেয়বি সমাধান' (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ৭৮৮)। এই ভাবের পদ আগে আমরা বিদ্যাপতির মধ্যে পেয়েছি।

অপর একটি পদ রাধার স্বয়ংদৌত্যের। রাধা কৃষ্ণকে বলেছেন--'চন্দ্রগ্রহণের দিন গুরুজনেরা সবাই বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন। আমি একা কি করে এই ঘোর রাত্রি জেগে কাটাই। মাধব, তুমি অকাজ কোরো না, তোমার চঞ্চল চরিত্রের কথা জানি, তুমি বাড়ীর মাঝখানেই বসে থাকবে। এখন আমার প্রথম যৌবন, স্বামীও বিদেশে। আমার রূপ দেখে মদনও মূর্চ্ছা যায়। সেই কারণেই তোমাকে বার বার নিষেধ করছি—তুমি অন্য জায়গায় চলে যাও।' নায়ককে নিষেধের ছলে এইভাবে মিলনের জন্য ইঙ্গিত পূর্ববর্তী সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রকীর্ণ প্রেমকবিতা থেকে শুরু করে বিদ্যাপতি ও পরবর্তীকালীন অন্যান্য পদকারদের পদেও বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হয়েছে। গোপাল দাস শরৎ পূর্ণিমার রাত্রে রাধার অভিসার বর্ণনা করেছেন। (বৈ. প. ; পৃ. ৭৯০) কিন্তু কৃষ্ণ আসেন নি। তাই 'শ্যাম-অনুরাগে' বিনিদ্র রজনী যাপন-কারিণী রাধা পথ চেয়ে ঘর বাহির করেন এবং অবশেষে যমুনার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্কল্প করেন (বৈ. প. পৃ. ৭৯০)। ইনি ধীরা, মধ্যা ও খণ্ডিতা নায়িকাকে নিয়েও পদ রচনা করেছেন। এ ছাড়া কবি ভাগবতের অনুসরণে শরৎকালীন মহারাস বর্ণনা করেছেন। এঁর পদে রাধাকৃষ্ণের হোলি প্রসঙ্গে প্রহেলিকা গানেরও নিদর্শনও আছে। (বৈ. প. পৃ. ৭৯৩)। কবির রচিত একটি স্বাধীনভর্তৃকার পদও রয়েছে (পৃ. ৭৯৩)। ভাবী বিরহের পদে এই কবির উচ্চস্তরের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রাধা বলছেন—

নগর বাজারে কেনে কানাকানি শুনি গো
ঘরে ঘরে শুনি উতরোল।
কাহারে পুছিলে কেহ উতর না দেয় গো
কেহ নাহি কহে সাঁচা বোল ॥ (পৃ. ৭৯৩)

ভবন্ বিরহের পদটি গতানুগতিক। ভূতবিরহের পদে রাধা মথুরা-যাত্রী পথিককে কাতরভাবে বলেন—'মাধবে মিনতি জানায়বি মোয়।' তবে এই কথাবস্তুও কবির নিজস্ব নয়। ইঁ পূর্বে শ্রীরূপের পদে আমরা এই কথাবস্তু পেয়েছি। মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণের কাছে দূতী কৃষ্ণবিরহে রাধার দশ দশার বর্ণনা করেছেন (বৈ. প.-পৃ. ৭৯৪)। এছাড়া কবি স্বপ্নসম্মেলনের একটি পদরচনা করেছেন (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ৭৯৪)। ভাবোল্লাসের পদটি রাধার জবানীতে লেখা। প্রিয় মিলনের আশায় রাধার আনন্দ-উদ্বেল হৃদয়ের ছবিটি এখানে চমৎকার ফুটেছে (বৈ. প. ; পৃ. ৭৯৫)—

চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে
পুলক যৌবনভার।

বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
নাচিছে হিয়ার হার ॥

মনোহর দাস

মনোহর দাস শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য, কৃষ্ণদাস চট্টরাজের পুত্র। শ্রীনিবাসের আর এক শিষ্য রামশরণ চক্রবর্তীর কাছে ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রথমে ইনি কাটোয়ার কাছাকাছি বেগুনকোলা গ্রামে বাস করতেন। পরে গুরুর আদেশে ব্রজধামে গিয়ে বাস করেন। ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে ইনি 'অনুরাগ-বল্লী'-রচনা করেন। এ ছাড়া ইনি কয়েকটি পদও রচনা করেছিলেন।

মনোহরদাস রাধার অভিসার বিষয়ক একটি চমৎকার পদ রচনা করেছেন। বিঘ্ন-বিজয়িনী রাধার কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য আনন্দময় অভিসার যেন ছন্দহিল্লোলেই মূর্ত হয়ে উঠেছে—

চলিতে অহিকুল চরণে বেঢ়ল
আন্ধপিছলিত পন্থ রে।
গিরত শত বেরি উঠিয়া ধাওত
ভেটিতে গোকুল চন্দরে ॥ (পৃ. ৯১২)

এ ছাড়াও কবি বাসকসজ্জার একটি পদ রচনা করেছেন (পৃ. ৯১৩)। কৃষ্ণের বাঁশীকে তিরস্কার করে গোপীদের আক্ষেপের একটি পদও রয়েছে। দানলীলার একটি পদও কবি রচনা করেছেন। কবির অপর একটি পদে শ্রীরাধার আরতি বর্ণিত। প্রিয় সহচরী রাধার বেশ বানিয়ে দিয়েছেন। রত্নসিংহাসনে সুসজ্জিতা রাধা উপবিষ্টা। সখী ললিতা তাঁর আরতি করেছেন, সহচরীরা চতুর্দিকে মঙ্গল গান করেছেন (পৃ. ৯১৩)। শ্রীরাধার আরতি বর্ণনার পদ খুব কমই পাওয়া যায়।

সব মিলিয়ে বলা যায় সপ্তদশ শতাব্দীর পদাবলীতে কবিরা কাব্যের ভঙ্গিমা, মূল বিষয়বস্তু এবং ভাবে গতানুগতিক। ষোড়শ শতাব্দীর সেই আবেগ তরঙ্গও অনেক পরিমাণে স্তিমিত। তবু কথাবস্তুতে অতি লক্ষণীয় না হলেও সূক্ষ্ম কিছু বৈচিত্র্য যে দেখা যায় তার প্রমাণও আমরা পেয়েছি।

সপ্তদশ শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যসমূহ

সপ্তদশ শতাব্দীতে ভাগবতের অনুসরণে বেশ কিছু কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য রচিত হয়েছে। এই সমস্ত কাব্যের কিছু কিছু আবার শুধু ভাগবতেরই অনুবাদ। তবে ভাগবতকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করলেও এই সমস্ত কবিরা ভাগবতের তত্ত্বকথা ও দার্শনিকতা অধিকাংশ জায়গাতেই বাদ দিয়ে গেছেন। কেউ কেউ অন্যান্য পুরাণ বা উপপুরাণ থেকে কিছু কিছু কাহিনী গ্রহণ করেছেন। এরই সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে দানলীলা, নৌকালীলা, বড়াই বুড়ির চরিত্র প্রভৃতি লৌকিক প্রসঙ্গ। কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলিতে এই বিমিশ্রভাব আমরা ইতিপূর্বে ষোড়শ শতাব্দীতেই লক্ষ্য করেছি। কৃষ্ণমঙ্গলকারদের এই প্রবণতা বুঝিয়ে দেয় যে, ভাগবতের তত্ত্বকথার চেয়ে

সাধারণের মধ্যে ভাগবতের কাহিনীর প্রচারই তাঁদের কাম্য ছিল। ভাগবতের কাহিনীকে লোকপ্রিয় করার কারণেই তাঁরা অন্যান্য পুরাণের অধিকতর প্রচলিত কাহিনী এবং অন্যদিকে জনপ্রিয় লৌকিক কাহিনীকে তাঁদের কাব্যে স্থান দিয়েছেন।

এই শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যকে আবার বিষয়বস্তুর প্রবণতা অনুযায়ী তিনভাগে ভাগ করা যায়। এক ধরনের রচনা প্রধানতঃ আখ্যানধর্মী, পাঠের জন্যই এগুলি লেখা। এতে গানের সংখ্যা খুব কম। এর আখ্যানও প্রধানতঃ ভাগবতের। গোস্বামিগণ প্রবর্তিত রাগানুগা ভক্তির পরিবর্তে দাস্যভক্তির সুরই এর মধ্যে স্পষ্ট। দ্বিতীয় ধরনের রচনাগুলি গোস্বামিদের দ্বারা প্রভাবিত এবং গীতিবহুল। তৃতীয় ধরনের কৃষ্ণলীলাকাব্যে লৌকিক কাহিনীর অধিকতর অনুসৃতি ও তারই সঙ্গে মূলভাব ভক্তিমিশ্রিত কৌতুকরসের। অবশ্য এই ধরনের কাব্যের সংখ্যা খুবই কম। এবার আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলি ও তাঁদের রচয়িতাদের সম্পর্কে আলোচনা করছি।

সনাতন বিদ্যাবাগীশ

সনাতন বিদ্যাবাগীশ কটক থেকে 'ভাষাভাগবত' নাম দিয়ে ভাগবতের প্রথম নয় স্কন্ধের আক্ষরিক অনুবাদ করেন। প্রত্যেক স্কন্ধ আলাদা আলাদা ভাবে বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছিল (প্রথম থেকে নবম স্কন্ধের পুথি বিশ্বভারতী ৯০১-৯০৯, ৯১১)। গ্রন্থের নবম স্কন্ধের শেষে কবির পরিচয় পাওয়া যায়—

কলিকাতা ঘোষাল বংশে কৃষ্ণানন্দ
তাঁর পুত্র ভুবনবিদিত রামচন্দ্র।
তাঁহার মধ্যম পুত্র করি শিশুলীলা
ভাষাভাগবত বিদ্যাবাগীশ রচিলা।

তাঁর বিভিন্ন স্কন্ধের যে রচনাকাল দেওয়া আছে, তাতে মনে হয় গোটা কাব্যটি রচনা করতে তাঁর কুড়ি বছরের মত সময় লেগেছিল। সম্প্রতি কাব্যটি মুদ্রিত হয়েছে।

কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণমঙ্গল

সপ্তদশ শতাব্দীর কৃষ্ণলীলার কবি হিসেবে একাধিক কৃষ্ণদাসের নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে একজন কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।[৩৩] গ্রন্থমধ্যে তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন। কবির মাতা পতিব্রতা পদ্মাবতী, পিতা যাদবানন্দ, এবং—

জাহ্নবী পশ্চিমকূলে বসতি আমার।
বর্ণিতে কৃষ্ণের তত্ত্ব নহে অধিকার॥
আচার্য্য গোসাঞির স্থানে করি ভৃত্যকার্য্য।
দেখিয়া করিল দয়া মাধব আচার্য্য॥ (পৃ. ৩৮৫)

মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে এই 'আচার্য-গোসাঞ' শ্রীনিবাস। কারণ গ্রন্থমধ্যে কবি লিখেছেন—

আমার প্রভু শ্রীমতী ঈশ্বরী।
দীক্ষামন্ত্র দিলো প্রভু মোর কর্ণ ধরি॥ (পৃ. ৩৮৪)

এখন শ্রীনিবাসের দ্বিতীয়া স্ত্রী দ্রৌপদীর নাম পরবর্তীকালে 'ঈশ্বরী' হয়েছিল। সুতরাং কবি এঁর কাছেই মন্ত্র নিয়েছিলেন স্থির করে মণীন্দ্রমোহন বসু এই কবির কাব্যরচনার কাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ বলে স্থির করেছেন।[৩৪] আবার খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মতে, যেহেতু কৃষ্ণদাসের কাব্যে চৈতন্যচরিতামৃতের প্রভাব আছে, সেইহেতু তাঁর কাব্যরচনার কাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেও হতে পারে।[৩৫] কবি কৃষ্ণদাস তাঁর গ্রন্থমধ্যে কৃষ্ণমঙ্গল সম্বন্ধে বলেছেন—

পূর্ব্বে গ্রন্থ লিখিয়াছে আচার্য্য গোসাঞি।
মনে অনুমানি সেই অনুসারে জাই॥
লিখিতে না পাই মন সদাই তরাস।
না জানি আচার্য্য মোর করে সর্ব্বনাশ॥
আচার্য্য দেখিয়া গ্রন্থ করিল বাখান।
রস পাইয়া গান শুনি অমৃত সমান॥
দক্ষিণে তোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার।
এথাতে গাইতে গ্রন্থ রহিল আমার॥ (পৃ. ৬)

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এই কৃষ্ণমঙ্গলটি মাধবাচার্যের কৃষ্ণমঙ্গল রচনার পরে, তাঁরই আদর্শে রচিত হয়েছিল।

কবি প্রধানতঃ ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বন করে এই কাব্যখানি রচনা করেছিলেন। তবে এটি ভাবানুবাদ, অবিকল অনুবাদ নয়। ভাগবত ছাড়া আরও কিছু কিছু লৌকিক কাহিনীও কবি বেশ বিস্তৃতভাবে বলেছেন, যেমন—দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের বাঁশীচুরি, কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার ভার বহন প্রভৃতি। এইসব লৌকিক কাহিনীর উৎসরূপে তিনি হরিবংশকে নির্দেশ করেছেন (পৃ.-২৩৭)। অথচ হরিবংশে এই লৌকিক কাহিনিগুলির কোন উল্লেখই নেই। সম্ভবতঃ লোকরুচির অনুগামী দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতিকে ভদ্র সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই কবিরা এই উপায় গ্রহণ করতেন। কারণ,আরও দু'একজন কবির কাব্যে এই একই ব্যাপরের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

কবির কাব্যে বন্দনা অংশ আরম্ভ হয়েছে 'গণপতি' বন্দনা দিয়ে। এরপর যথাক্রমে হরগৌরী, দেবী সরস্বতী, সর্বদেবদেবী, দয়ার ঠাকুর হরি, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণলীলার সঙ্গী ও অনুষঙ্গ সকলকেই বন্দনা করেছেন কবি। এ ছাড়াও নিতাই, চৈতন্য থেকে শুরু করে অদ্বৈত, স্বরূপ, রায় রামানন্দ, রূপসনাতন প্রভৃতির বন্দনাও কবি করেছেন। কবি কীর্তনের মাহাত্ম্য যেভাবে করেছেন তা থেকেই তাঁর ওপর চৈতন্যের প্রভাব বোঝা যায়।

এর পরবর্তী দুটি পংক্তি কিছু অধিক পরিমাণে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে—

তুচ্ছ তুচ্ছ জাতি করে কৃষ্ণ গুণ গান
গঙ্গা জলে তীর্থস্থানে হইঞা অধিষ্ঠান॥

এই কবি লক্ষ্য করেছেন, সমাজের উচ্চ বর্ণের মানুষদের চেয়ে তুচ্ছ তুচ্ছ জাতির মানুষরাই কৃষ্ণকথাকে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করেছে। সমকালের এই তথ্য আমাদের কাছে খুবই তাৎপর্যবহ।

কথারম্ভ হয়েছে ভাগবতের পরীক্ষিৎ বৃত্তান্ত দিয়ে। শাপগ্রস্ত পরীক্ষিতের কাছে ব্যাসপুত্র শুকদেব উপস্থিত হলে, পরীক্ষিৎ নিজের মুক্তির উপায় জানতে চাইলেন। মুনি কৃষ্ণকথা বলে তাঁকে উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি দিলেন—

কৃষ্ণের চরিত্রগান শুন কোনরূপে।
কি করিতে পারে তার কোটি ব্রহ্মশাপে॥ (পৃ. ১০)

এখানে ভাগবতের দশম স্কন্ধের সম্পূর্ণ বৃত্তান্তই মুনি পরীক্ষিতের কাছে বলেছেন। প্রারম্ভ ভাগবতের অনুরূপ। কিন্তু ভাগবতে দ্রোণকে 'বসূনাং প্রবরঃ' [৩৬] বলা হয়েছে। কবি তাঁকে গন্ধর্ব বলেছেন।

পরবর্তী ঘটনাও ভাগবতের অনুরূপ। তবে কৃষ্ণজন্ম প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—

শুদ্ধরূপে বসুদেব আনন্দিত মতি।
ধরিল দৈবকীমাতা ধবল শকতি॥

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত এবং ভাগবতের মতে নারায়ণের শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ দুগাছি কেশ রোহিণী ও দেবকীতে সমাবিষ্ট হয়। তার মধ্যে ধবল কেশ অবলম্বন করে বলদেব ও কৃষ্ণকেশ অবলম্বন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। দৈবকী ধবল শক্তিধারণ করলেন, এই কথার সঙ্গে এই উপাখ্যানের সামঞ্জস্য হচ্ছে না।

গর্ভস্থ কৃষ্ণকে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের স্তব প্রসঙ্গ ভাগবতে আছে।[৩৭] কবি এই স্তবের আক্ষরিক অনুবাদ না করে ভাবানুবাদ করেছেন।

সদ্যোজাত শ্রীকৃষ্ণ দেবকীকে বলেছেন—

দেওত্তি বলিঞা নাম আছিল জখন।
কপিল নামেতে আমি তোমার নন্দন॥ (পৃ. ২৬)

কিন্তু ভাগবতে [৩৮] শ্রীকৃষ্ণ দেবকীকে পূর্ববর্তী 'জন্মদ্বয়ে পুত্র ছিলেন বলে পরিচয় দিলেও 'কপিল' নামে নয়। ঐ দুই জন্মে যথাক্রমে তিনি পৃশ্নিপুত্র ও উপেন্দ্র নাম নেন। দেবহূতির গর্ভে ভগবানের কপিল নামে জন্ম গ্রহণের কাহিনীও ভাগবতে আছে।[৩৯] পুতনার কাহিনীতে এখানে একটু বৈচিত্র্য আছে। ভাগবতে রয়েছে যে কৃষ্ণের দুজন জননী যশোদা ও রোহিণী পুতনার সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিছু বলার মত সাহস পেলেন না।[৪০] কিন্তু এই কবির কাব্যে পুতনা যশোদাকে পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করলে—

কহএ যশোদা : শুন্যাছ জে কথা : মিছামিছি কহে সভে।
এত ভাগ্য হবে : পুত্র জনমিবে : সেদিন হইবে কবে॥
ঘরে থাকি হরি : জানিলা সকলি : মাএর মিছাই বাণী।
রিপু জানাইতে : লাগিলা কান্দিতে : লজ্জিত হইল রাণী॥
শুনিঞা রোদন : পুতনা তখন : কহিতে লাগিলা তারে।

শুন শুন আর : তনয় তোমার : লুকাঞা রাখ্যাছ ঘরে ॥
যশোদা সুন্দরী : হরি কোলে করি : দিলা পুতনার কোলে। (পৃ. ৩৮)

এটি সম্পূর্ণভাবে কবিরই কল্পিত। কাহিনীটির যশোদা চরিত্র, চিত্রণের দিক দিয়ে যথেষ্ট বাস্তবসম্মত। এই কবির কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা ষোড়শ শতাব্দীর কবি জ্ঞানদাসের কথা মনে করিয়ে দেয়—

জিনিঞা বান্ধলি ফুল অধরের দুটি কুল
রহে জেন অন্তরে লাগিঞা। (পৃ. ৩২)

এর সঙ্গে জ্ঞানদাসের পদের নিম্নোদ্ধৃত অংশটির তুলনা করা যেতে পারে—

অধরের দুটি কূল জিনিঞা বান্ধুলি ফুল
হাসিখানি মুখেতে মিশায়।

ভাগবতের কাহিনীতে পুতনাবধের পূর্বেই নন্দ-বসুদেবের কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে পুতনা বধের বৃত্তান্ত বর্ণনার পরে এই মিলন-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ভাগবতে ফলহারীর কাহিনীটি অত্যন্ত সংক্ষেপে মাত্র দুটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে—

ক্রীণীহি ভোঃ ফলানীতি শ্রুত্বা সত্বরমচ্যুতঃ।
ফলার্থী ধান্যমাদায় যযৌ সর্বফলপ্রদঃ।
ফলবিক্রয়িণী তস্য চ্যুতধান্যং করদ্বয়ম্।
ফলৈরপূরয়দ্‌রত্নৈ ফলভাণ্ডমপূরি চ ॥[৪১]

"কেউ কি ফল কিনবে? ফলবিক্রয়িণীর এই কথা শুনে অচ্যুত সর্বার্থ পরিপূর্ণ হয়েও অগ্রস্থিত ধান্যমাত্র গ্রহণ করে শীঘ্র তার নিকট এলেন, কিন্তু ক্ষুদ্র হস্তের অল্পমাত্র ধান্য তা বিচার করলেন না। কৃষ্ণ ঘরের ভিতর হতে ধান নিয়ে দ্রুত পদে আসার সময় পথের মধ্যে তাঁর হাতের ধান প্রায় সবই পড়ে গেল, কেবল দুটি কি তিনটি ধান ফলহারিণীর হাতে দিলেন। ফলবিক্রয়িণী তাঁর হাতে সব ফল দিলে তার ফলভাণ্ড রত্নে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

কিন্তু এই কবির কাব্যে ফলহারিণীর কাহিনীটি বেশ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কবি এই কাহিনীর সঙ্গে তাঁর নিজস্ব কল্পনাকে যুক্ত করেছেন। ফলহারিণীকে দেখে গোকুলের ছেলেরা মায়েদের কাছ থেকে কড়ি নিয়ে ফল কিনছে দেখে শ্রীকৃষ্ণ দৌড়োলেন মায়ের কাছে, কিন্তু মা তখন গেছেন যমুনায় স্নান করতে। অগত্যা শ্রীকৃষ্ণ উঠোনে শুকানো ধান অঞ্জলি পুরে নিয়ে চললেন ফল কিনতে। তখন—

তরাসে ত লক্ষ্মী দেবী ভাবিলা অন্তরে।
কতেক দিনের মত বিলাইবে মোরে ॥
এতেক চিন্তিয়া ধান্য পড়ে হাতে হৈতে।
শূন্য হাতে ডাড়াইলা তাহার সাক্ষাতে ॥
নিরখএ চান্দ মুখ বালকের ভালে।
কল্পতরু ফল মাগে সাকোটের স্থানে ॥

জাহারে মাঙ্গএ ফল ভবাদি দেবতা।
মাঙ্গএ বনের ফল হইঞা বরদাতা ॥
ব্রহ্মা আদি দেব জারে ফল বাঞ্ছা করে।
হেনই ঠাকুর ফল মাঙ্গে জোড় করে ॥ (পৃ. ৭৯)

পরে ফলহারিণী গোপালকে 'মা' সম্বোধনের বিনিময়ে বদরি ফল দিল। পথে যেতে যেতে তার মাথার ঝাঁকা ভারী বোধ হওয়ায় দেখা গেল ঝুড়ি সোনায় ভরে উঠেছে। ফলহারিণী বুঝল স্বয়ং ভগবান তাকে ছলনা করেছেন। ভাগবতের একটি অতি-সংক্ষিপ্ত কাহিনীসূত্রকে গ্রহণ করে কবি একটি সুগঠিত কাহিনী এখানে উপহার দিয়েছেন। কৃষ্ণকে সাধারণ মানুষের প্রতি কৃপাময় ভগবানরূপে চিত্রিত করার যে ক্ষীণ চেষ্টা ভাগবতে রয়েছে, কবির এই কাহিনী তারই পূর্ণাঙ্গ পরিণতরূপ।

ভাগবতে গো এবং গোবালকদের লুকিয়ে রেখে ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করার কাহিনী, দুটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।[৪২] তার মধ্যে চতুর্দশ অধ্যায়ে ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব তত্ত্বকথাতেই পূর্ণ। কিন্তু কবি এই অংশ খুবই সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এর কারণ, তত্ত্বের প্রতি কবিদের অনীহা এবং সম্ভবতঃ এই কাহিনীর প্রতি জনচিত্তের আগ্রহের অভাব।

এই কবির কাব্যে কালিদহে শ্রীকৃষ্ণ ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ব্রজপুরে গোয়ালারা যে সব অমঙ্গলের চিহ্ন দেখলেন, তা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের গণপতিখণ্ডে ও শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বর্ণিত অমঙ্গলসূচক চিহ্নসমূহের অনুরূপ। কালিয়নাগ দমন প্রসঙ্গে এই কবি রাধার শোকও বর্ণনা করেছেন। অবশ্য পূর্ববর্তী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যেও প্রসঙ্গটি আছে।

কালিয়দমন প্রসঙ্গে কবি ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ৭ম, ৮ম ও ৯ম—এই তিন অধ্যায়ে বর্ণিত সমুদ্রমন্থনের ও অসুরদের বঞ্চিত করে দেবতাদের অমৃত ভোজনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যমুনাতীরের কদম্ববৃক্ষে বসে গরুড়ের অমৃত পানের কাহিনী এবং সেই কারণে এই বৃক্ষের অমরত্ব—এ কাহিনীতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ প্রসঙ্গটি কবির কপোলকল্পিত।

আবার অনেক সময় কবি ভাগবতের দশম স্কন্ধের কোন কোন কাহিনী বাদ দিয়েছেন। যেমন—ভাগবতের দশম স্কন্ধের ঊনবিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শরবনে গো ও গোপগণকে দাবানল হতে রক্ষার যে কাহিনী রয়েছে, কৃষ্ণদাস তা বাদ দিয়ে গেছেন।

দানখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ রাধার কাছে নিজেকে রামচন্দ্র বলে পরিচয় দিলে রাধা বলেন—

তুমি রাম হও জদি বাঁধহ মানুষ নদী
এ গাছ পাথর তাহে দিঞা।

কিন্তু কৃষ্ণ তাতে এতটুকু অপ্রস্তুত হলেন না—

পূর্ব্বলীলা মনে করি সাগর বাঁধিল হরি—
থরে থরে দিল বসইঞা ॥ (পৃ. ১৪৩)

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের শেষ খণ্ডেও সেতুবন্ধ সরোবরের উল্লেখ আছে। শ্রীরাধা শর্ত দিলেন, কৃষ্ণ যদি সত্যিই রামচন্দ্র হন, তাহলে তিনি পাথর ভাসিয়ে সরোবরে সেতু বেঁধে দিন। কৃষ্ণও তাই করলেন। এই কাহিনীর ধ্রুপদী উৎস কিছু আছে বলে জানা নেই। তবে এই শতাব্দীর বাংলা কৃষ্ণকথায় এটি একটি নবতর সংযোজন।

এর মধ্যে শ্রীরাধার বাঁশীচুরির যে কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত আকারে রয়েছে, তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ছাড়াও ইতিপূর্বে পদাবলী সাহিত্যেই আমরা পেয়েছি। তবে এই কাহিনীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীর মিল আছে বেশী। কারণ এখানেও রাধা এবং চন্দ্রাবলী অভিন্ন নায়িকা এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত এখানে বড়ায়ির নির্দেশে রাধা বাঁশী চুরি না করলেও, চুরির পর—'বড়াইর নিকটে বংশী রাখিল লুকাঞা'।

অনুযাঞা ছলে মুনিপত্নীদের ওপর শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহের কাহিনী বর্ণনার পর এবং ইন্দ্রযাগভঙ্গের আগে পর্যন্ত কৃষ্ণদাস অভাগবতীয় কৃষ্ণকথার অবতারণা করে আসর জাঁকিয়েছেন। ইন্দ্রযাগভঙ্গের কাহিনী থেকে আবার ভাগবতের অনুসরণ করেছেন।

নৌকাখণ্ডের পর এই কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভার বহনের পরিচিত অভাগবতীয় প্রসঙ্গটিও এসেছে। গোপীরা কৃষ্ণকে বললেন, তিনি নানাভাবে তাঁদের কষ্ট দিয়েছেন, সুতরাং ভার বহন করতে হবে। কৃষ্ণ তাঁদের কথায় ভার বহন করলেন—

কৃষ্ণ কান্ধে দিঞা ভার চলিলা রাধিকা ॥
বদনমণ্ডলে ঘর্ম্ম পড়ে চোয়াইঞা।
বিদরে রাধার প্রাণ বদন চাহিঞা ॥
বদন মোছাএ রাই আপনার বাসে।
বদনে বসন দিয়া গোপীগণ হাসে ॥ (পৃ. ১৫১)

রাধার এই ঘাম মুছিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গটি কিন্তু ভারখণ্ডে নতুন। এখানে লক্ষণীয় যে, অন্যান্য গোপিদের মনে কিন্তু ঘর্মাপ্লুত কৃষ্ণকে দেখে মায়া জাগে নি। সাধারণ গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণপ্রণয়িনী রাধার পার্থক্যও কবি এইভাবে সূচিত করেছেন। মমতাময়ী রাধার প্রেমস্নিগ্ধ মূর্তিটিও এখানে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে।

ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত গোবর্ধন ধারণ প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি তাতে নিজস্ব কিছু কল্পনার প্রলেপ দিয়েছেন। কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণে পুত্রের জন্য ব্যাকুলা যশোদার যে দীর্ঘ কাতরোক্তি তাঁর কৃষ্ণমঙ্গলে স্থান পেয়েছে, ভাগবতে তা অনুপস্থিত। যশোদর মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা ও অবোধ আশঙ্কা কবি যথাযথভাবেই প্রকাশ করতে পেরেছেন—

দুধের ছায়াল কৃষ্ণ একা গিরি ধরে।
ভাঙ্গিঞা পড়এ পাছে বাছার উপরে ॥ (পৃ. ১৬১-৬২)

কবির হাতে আঁকা এই জননী যশোদা একান্তভাবেই এক বাঙালী মা হয়ে উঠেছেন।

এরপর কবি ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ২৭তম অধ্যায়ের ব্যোমাসুর প্রসঙ্গে চলে এসেছেন। সমস্ত কাব্যটিতে দেখা যায়, ভাগবতের ক্রম খুব সামান্যই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এক ব্যতিক্রম। এই প্রসঙ্গে ভাগবতের শঙ্খচূড় বধের কাহিনীটিও কবি বর্ণনা করেছেন।

এই কবি ভাগবতের অনুসরণে শারদ রাস বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি মূলের ঘটনা ও বর্ণনাকে মোটামুটি অবিকৃতই রেখেছেন।

এরপর কবি বরুণ কর্তৃক নন্দকে অপহরণ ও কৃষ্ণ কর্তৃক বরুণালয় থেকে নন্দের উদ্ধার-কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এখানেও ভাগবতের ক্রম রক্ষিত হয় নি। কারণ ভাগবতে রাসলীলার পূর্বে কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এখানে বর্ণিত হয়েছে রাসলীলার ঠিক পরে। এ ছাড়াও ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৩৭তম অধ্যায়ে প্রথমে কেশীবধ ও পরে ব্যোমাসুর বধের প্রসঙ্গ রয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণদাস কাহিনী দুটিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে প্রথমে ব্যোমাসুর বধের কাহিনী ও পরে অন্যান্য নানা প্রসঙ্গ বর্ণনার পর আবার ৩৭তম অধ্যায়ের শেষে কেশী বধে ফিরে এসেছেন।

কেশী বধের পরেই কবি অক্রূরের গোকুলে আগমন বর্ণনা করেছেন। এখানে ভাগবতের ক্রম ঠিকই আছে।

পরবর্তী অংশগুলি ভাগবতানুসারী। তবে ভ্রমর গীতি রচনায় কৃষ্ণদাসের ভণিতা সর্বত্র থাকলেও একটি পদে গোবিন্দদাসের নাম দেখা যায় (পৃ. ২৩০-৩১)। 'গোপীগণের বারমাসিঞা' অংশটি কবি ব্রজবুলিতে রচনা করেছেন।

উদ্ধব ব্রজপুরী থেকে বিদায় নেওয়ার সময় গোপীদের যে অবস্থা কবি বর্ণনা করেছেন, ভাগবতে তার উল্লেখ নেই—

বিদায় হইঞা চলে উদ্ধব ঠাকুর।
বিরহে কান্দএ গোপী নাহি বান্ধে চুল ॥
পূর্ব্বে কৃষ্ণ রথে চড়ি মথুরা চলিল।
সেই দশা গোপীকার এবে উপজিল ॥
বাউলি হইঞা কান্দে জত গোপীগণে।
আউলাইল অঙ্গ সভার উদ্ধব গমনে ॥

এবং— দেখিঞা গোপীর প্রেম উদ্ধব আপনে।
গুল্মলতা হইঞা জন্ম হয় বৃন্দাবনে ॥ (পৃ. ২৩৮)

ভাগবতের দশম স্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের শেষে উদ্ধব মথুরায় ফিরে গিয়ে কৃষ্ণের কাছে নন্দ গোপদের বক্তব্য বলেছেন। কিন্তু কৃষ্ণের কোন প্রতিক্রিয়া এখানে ব্যক্ত হয় নি—

কৃষ্ণায় প্রণিপত্যাহ ভক্ত্যুদ্রেকং ব্রজৌকসাম্।
বাসুদেবায় রামায় রাজ্ঞে চোপায় নান্যদাৎ ॥[৪৩]

কিন্তু কবি কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে উদ্ধবের কাছে ব্রজের সবার কুশল জানতে চেয়েছেন এবং সেই সঙ্গে ব্রজবাসীদের জন্য তাঁর অন্তরের বেদনাকেও প্রকাশ করেছেন। শেষ পর্যন্ত—

কান্দে হরি উদ্ধবের সাতে।
রাধারে স্মরণ করি পড়িলা ভূমিতে ॥ (পৃ. ২৩৮-২৩৯)

ভাগবতের কৃষ্ণ শুধুই পরম কারুণিক ভগবান। তাই কর্তব্যবোধে তিনি উদ্ধবকে ব্রজে পাঠান ও নির্বিকারভাবে ব্রজের সংবাদ শোনেন। সপ্তদশ শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গল

কাব্যে সেই কৃষ্ণ কিন্তু পরিণত হয়েছেন প্রেমিক কৃষ্ণে, তিনি বৃন্দাবনে সংবাদ জানার জন্য সদা ব্যগ্র এবং রাধার কথা মনে পড়লে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। শ্রীরূপ গোস্বামীর উদ্ধবসন্দেশ কাব্যের ছায়া এখানে পড়েছে, তা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

ভাগবতে এই কাহিনীর পর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অক্রূরকে হস্তিনাপুরীতে প্রেরণের প্রসঙ্গ আছে।[৪৪] কিন্তু কবি সেই প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ের কালযবন বধ প্রসঙ্গে চলে এসেছেন।

বলরামের রেবতীর বিবাহ প্রসঙ্গ ভাগবতের নবম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। দশম স্কন্ধের একটি শ্লোকে[৪৫] তার উল্লেখ আছে মাত্র। কবি বলরাম ও রেবতীর বিবাহ বেশ বিস্তৃত ভাবেই বর্ণনা করেছেন (পৃ. ২ ০-২৫৩)। পরবর্তী অংশে কবি ভাগবত অনুসারে রুক্মিণী-শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। ভাগবতে আছে, রুক্মিণী কোন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু এই কাব্যে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভিক্ষা নেওয়ার জন্য এলে রুক্মিণী তাঁকেই দূত করে কৃষ্ণের কাছে পাঠিয়েছিলেন (পৃ.-২৫৭)। ১০ম স্কন্ধের সপ্ত-পঞ্চাশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জতুগৃহে পাণ্ডবদের নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে বলরামের সঙ্গে হস্তিনা চলে গেলেন। কিন্তু এই কবির কাব্যে কৃষ্ণের হস্তিনা যাওয়ার সংবাদ থাকলেও পাণ্ডবদের জতুগৃহে নিহত হওয়ার প্রসঙ্গ নেই।

এ ছাড়াও ভাগবতের দশম স্কন্ধে ঊনষষ্ঠিতম অধ্যায়ের পারিজাতহরণ প্রসঙ্গ, ষষ্ঠিতম অধ্যায়ে রুক্মিণী-কৃষ্ণের প্রণয়কলহ এবং ৬১তম অধ্যায়ের প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের পুত্রদের নামের বর্ণনা ও বলরাম কর্তৃক রুক্মিণীর নিধন প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে কবি একেবারেই ঊষা-অনিরুদ্ধের কাহিনী শুরু করেছেন। তবে ঊষা কর্তৃক কাত্যায়নীর আরাধনা ও পারিজাত লাভ কবির নিজস্ব কল্পনা (পৃ. ২৯১)। আবার নৃগ রাজার শাপমুক্তির কাহিনী বর্ণনার পর কবি বলরামের যমুনাকর্ষণ,[৪৬] পৌণ্ড্রক কাশীরাজ ও সুদক্ষিণ বধ[৪৭] ইত্যাদি মাঝখানের অনেকগুলি অধ্যায় ছেড়ে একেবারে ঊনআশিতম অধ্যায়ে কৃষ্ণ ও অর্জুন কর্তৃক ব্রাহ্মণের মৃত পুত্র আনয়ন প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। পরের অংশটি একাদশ স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের কাহিনী। এখানে ভগবান নিজের বিভিন্ন অবতারের কথা বলেছেন। এই অবতারদের মধ্যে চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গও রয়েছে। দেখা যাচ্ছে কবির এই অনুবাদের মধ্যে যাথার্থ্য ও পারম্পর্য কোনটাই রক্ষিত হয় নি।

পরের কাহিনীতে বনবাসী পাণ্ডবদের কাছে সশিষ্য দুর্বাসার আতিথ্য গ্রহণ ও শ্রীকৃষ্ণের শাকাহারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এটি ভাগবতের কাহিনী নয়, মহাভারতের বনপর্বে ১৬৩তম অধ্যায়ে এর বর্ণনা রয়েছে। এরই সঙ্গে ভাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত অম্বরীষ ও দুর্বাসা কাহিনীও যুক্ত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, দশম স্কন্ধের কেবলমাত্র কৃষ্ণজীবনী ছাড়াও কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূচক অন্যান্য উপাখ্যানও কবি কাহিনীর মধ্যে যুক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গের শেষে আছে—

কিবা শূদ্র কিবা বিপ্র নাহিক বিচার।
কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা গুরু জানিবে সভার॥

কবির এই উক্তি স্পষ্টতঃই চৈতন্যদেবের 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ'—এই মূল্যবোধেরই রূপায়ণ। সপ্তদশ শতাব্দীর ভাগবতীয় কৃষ্ণকথায় এইভাবে বাঙালী কবি চৈতন্য চেতনার নির্যাসকে পরিবেশন করেছেন।

এর পরের কাহিনী সুদামার উপাখ্যান দশম স্কন্ধেই বর্ণিত।[৪৮] তবে সুদামার দারিদ্র্যের কারণ দেখিয়ে কবি বলেছেন যে, যখন সুদাম কৃষ্ণ বলরামের সহপাঠী ছিলেন, সেই সময় একদিন তাঁরা অরণ্যে কাষ্ঠচ্ছেদন করতে যান। যাত্রাকালে গুরু-পত্নী সুদামার হাতে আহার্য দিয়ে বলেন—

অগ্রভাগ দিয়া রামকৃষ্ণ দুইজনে।
পশ্চাতে খাইহ তোমরা জত শিশুগণে॥ (পৃ. ৩২৬)

কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে সুদামা—

কৃষ্ণকে না দিঞা দ্রব্য করিল ভক্ষণ।
তেঁঞি সে দরিদ্র হৈল সুদাম ব্রাহ্মণ॥ (পৃ. ৩২৭)

সুদাম উপাখ্যানের এই অংশটি ভাগবতে নেই। ভাগবতে এই কবির কাব্যে উভয়ত্রই কাহিনীর ঠাটটি অক্ষুন্ন থাকলেও কিংবা উভয়ের লক্ষ্য ভক্তিধর্ম প্রকাশ হলেও মাত্রাগত তারতম্য আছে। তাই গুরুগৃহ বাসকালের এক কপোলকল্পিত কাহিনী কবি উপস্থিত করেছেন, যাতে সাধারণের মনোরঞ্জন করা যায়। অকারণে এক কৃষ্ণ-ভক্তের দারিদ্র্য সাধারণের বিশ্বাসকে বিচলিত করতে পারে এ বোধ কবির ছিল। সেই জন্য সুদামার এক সময়ের কিঞ্চিৎ স্খলন তিনি দেখিয়েছেন। এতে অবশ্য সুদামার ভাগবতীয় নির্লোভ চারিত্র্য মহিমা অক্ষুন্ন থাকে নি।

পরের কাহিনী পারিজাতহরণের। এই কাহিনী নির্মাণে কবি হরিবংশের অনুসরণ করেছেন। কবি নিজেই বলেছেন।

এ সকল কথা ভাই নাই ভাগবতে।
বিস্তার কহিব কিছু হরিবংশ মতে॥ (পৃ. ৩২৭)

হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে ৬৫ তম অধ্যায় থেকে ৭৫তম অধ্যায় পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে পারিজাত হরণ প্রসঙ্গ। তবে সেখানে নারদ সত্যভামার কাছে গিয়ে কৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণীকে পারিজাত প্রদানের সংবাদটি নিজে দেন নি। দাসীমুখে সত্যভামা সংবাদটি পেয়েছেন। কথাবস্তুতে এই ধরনের ছোটখাটো পরিবর্তন কবি অন্যত্রও যে ঘটিয়েছেন, তা পূর্বের আলোচনাতেও দেখা গেছে।

হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়ে আছে সত্যভামা পুণ্যক ব্রত উপলক্ষে কৃষ্ণকে নারদের হাতে সমর্পণ করলে, নারদ একটি গাভী নিষ্ক্রয়রূপে গ্রহণ করে কৃষ্ণকে মুক্তি দিয়েছেন।[৪৯] এখানে দেখা যাচ্ছে সত্যভামা নারদের হাতে কৃষ্ণকে দান করলে কৃষ্ণ নারদের সঙ্গে দ্বারকা ছেড়ে চললেন। সত্যভামা কাতর হয়ে মুনির কাছে স্বামীভিক্ষা চাইলেন।

মুনি বোলে জুখি তৌলে দিঞাছিল ধন।
মূল্য দিঞা ফিরাইঞা লহ কোন জন॥ (পৃ. ৩৪০)

কিন্তু সমস্ত ধনরত্ন তুলাদণ্ডে চাপিয়েও কৃষ্ণের সমান ওজন হল না। তখন সত্যভামা

ও অন্যান্য কৃষ্ণরমণীরা ক্রন্দন করতে থাকলেও রুক্মিণী হাসলেন। সত্যভামা রুক্মিণীর কাছে কাতরভাবে স্বামীকে উদ্ধার করার অনুরোধ জানালেন। রুক্মিণী—

আনিঞা তুলসীদাম তাথে লেখে কৃষ্ণনাম
নামে শ্যামে সমান হইল ॥ (পৃ. ৩৪১)

এরপরই কবি নারদের মুখ দিয়ে দীর্ঘ নাম মহিমা কীর্তন করিয়েছেন—

শুন ভক্তগণ ভাই নাম বিনে ধন নাই
জত দেখ নামের অধীন
দান ব্রত যজ্ঞ হোম না হয় নামের সম
ভাবিঞা দেখিনু মনে মনে। (পৃ. ৩৪২)

এইভাবে কৃষ্ণমঙ্গলের কবি কল্পিত কাহিনীর সাহায্যে একদিকে রুক্মিণীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্যদিকে কৃষ্ণনাম মহিমা বর্ণনা করেছেন।

ভক্তবৎসল কৃষ্ণের মহিমা প্রচার করার জন্য কবি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গও তাঁর কাব্যে এনেছেন। তবে এখানেও কাহিনীর মধ্যে কবির নিজস্ব কল্পনাসৃষ্ট অভিনবত্ব লক্ষ্য করার মত। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের অপরাধে দুর্যোধনের রাণীদের কাপড়ে আগুন লাগল এবং নগ্ন হয়ে রাজসভা দিয়েই পলায়ন করল (পৃ. ৩৫২)। পরের কাহিনীতে কৃষ্ণ ঐশ্বর্যমত্ত দুর্যোধনের আতিথ্য গ্রহণ না করে বিদুরের গৃহে কলার ছোবড়া খেলেন। এরপর কবি সংক্ষেপে সুভদ্রাহরণ বর্ণনা করেছেন। সুভদ্রাহরণের পর উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ ও সোনার নকুলের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এটিও ভাগবতের কাহিনী নয়। এরপর বলরাম-শ্রীকৃষ্ণের লীলাসম্বরণ, যদুবংশ ধ্বংসের কাহিনী ও সবশেষে পরীক্ষিতের মৃত্যুকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থশেষে কবি নিজের পরিচয় দিয়েছেন এবং সমগ্র গ্রন্থটির সার সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। দেখা গেল যে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড ছাড়াও ভাগবত বহির্ভূত আরও কিছু কিছু প্রসঙ্গ কবির কাব্যে এসেছে। কৃষ্ণনামের মহিমা প্রচার ও কৃষ্ণমাহাত্ম্য খ্যাপনের জন্যই কবি জনপ্রিয় কাহিনীগুলিকে বেছে নিয়েছেন।

কাশীদাসাগ্রজ কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস

'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' কাব্যটি যোড়শ শতাব্দীর শেষে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত হয়েছিল। কাশীরামের বড় ভাই কৃষ্ণদাস ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বন করে এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন বলে প্রচলিত। কাব্যটির কিছু অংশ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। পুঁথিতে কবির নামের ভণিতা দেওয়া আছে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর। তাঁর গুরু জয়গোপাল দাস তাঁকে এই নাম দিয়েছিলেন। তবে 'শ্রীকৃষ্ণবিলাসে'র কবি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ও কাশীরামের অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণদাস এক ব্যক্তি কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত কোন প্রমাণ নেই।

শ্রীকৃষ্ণবিলাসের ভণিতা অংশে কবি নিজেকে কৃষ্ণকিঙ্কর বলেই উল্লেখ করেছেন এবং এই নাম যে গুরুদত্ত তাও কবিই জানিয়েছেন। তাঁর ছোট ভাই গদাধরদাস 'জগৎ মঙ্গলে' শ্রীকৃষ্ণদাস সম্পর্কে লিখেছেন—

প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
রচিল কৃষ্ণের গুণ অতিমনোহর ॥

এর থেকেই সম্পাদক ধরে নিয়েছেন যে 'কৃষ্ণবিলাসের কবি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ও কাশীরামের বড় ভাই কৃষ্ণদাস একজনই।' 'শ্রীকৃষ্ণবিলাসের'র পুথিটি ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুসরণে লেখা হলেও হুবহু অনুবাদ নয়। মুদ্রিত পুথিটিতে কাব্যের সম্পূর্ণ অংশ নেই। এই পুথিটি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্তৃক সংগৃহীত। সম্পাদক এই একটি পুথি দেখেই গ্রন্থ সম্পাদন করেছেন।

বন্দনা অংশ দেখে মনে হয়, কবি কৃষ্ণমঙ্গল রচনা করলেও তাঁর আরাধ্য দেবতা ছিলেন হরগৌরী। কবি তাঁর কাব্যের অবলম্বিত বিষয়বস্তুর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণও কাব্যের প্রথমেই দিয়েছেন। যেমন—

অদিতি কশ্যপ ধ্রুব কশিপুনন্দন।
রুক্মাঙ্গদ ভগীরথ বৃন্দা ধরা দ্রোণ ॥
এই নয়জন ভক্তি কৈল গুরুতর।
কহিব সে সব কথা পুরাণগোচর ॥

পরিষদ্ প্রকাশিত কৃষ্ণবিলাসে কবির বর্ণিতব্য এই নয়জনের মধ্যে ধ্রুব থেকে ধরা-দ্রোণ পর্যন্ত কাহিনী পাওয়া যায় না। এই সব কাহিনী এসিয়াটিক সোসাইটির পুথিতে আছে। এগুলির সব আবার ভাগবতীয় কাহিনীও নয়। যেমন-রুক্মাঙ্গদ রাজার কাহিনী নারদ পুরাণের, ধরা-দ্রোণের কাহিনী ভাগবতে থাকলেও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে।

এই কবি তাঁর কাব্যে ঈশ্বরের দ্বাবিংশতি অবতারের কথা বলেছেন। এই দ্বাবিংশতি অবতারের কথা ভাগবতে থাকলেও[৫০] দশম স্কন্ধে নেই। এরপর কবি বামন অবতারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই কাহিনীও ভাগবতের।[৫১] তবে এখানে বলির রাণী বৃন্দাবলীর যে চরিত্রটি রয়েছে, ভাগবতে তা অনুপস্থিত। ইতিপূর্বে প্রসাদ দাসের শ্রীকৃষ্ণজন্মকথায় কংসের জন্ম প্রসঙ্গে হরিবংশের কাহিনী গৃহীত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণদাসও সেই কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। এরপর দেবকীর বিবাহ ইত্যাদি ঘটনা ভাগবত অনুসারেই বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণের জন্মের পর বসুদেব কর্তৃক তাঁকে নন্দালয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি বর্ণনায় কবি ভবিষ্যপুরাণের জন্মাষ্টমী ব্রতকথার কাহিনীকে গ্রহণ করেছেন।—

হেন বেলে শৃগাল হইয়া গেল পার ॥
বসুদেব তা দেখি সাহসে কৈল ভর।
যমুনার নীরে তবে নামিল সত্বর ॥
হেন বেলে পারাবারে যমুনা উথলে।
পরশ করিব গিয়ে চরণ কমলে ॥
হস্ত পিছলিয়া হরি পড়িলা জলেতে।
যোল কলা পূর্ণ হইল যমুনা নিভৃতে ॥ (পৃ. ১৫)

পুতনাবধ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন পুতনার রূপ দেখে—'মায়াতে পীড়িত নন্দ সকল গোয়াল' (পৃ. ১৬)। কিন্তু ভাগবতে আছে নন্দ সে সময় মথুরায় ছিলেন। পুতনার

মৃত্যুর পর তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। এই কাব্যে আছে পূতনা নিহত হওয়ার পর নন্দ মথুরায় যান ও বসুদেব দেবকীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর যথাক্রমে শকট-ভঞ্জন, তৃণাবর্তবধ, গর্গ কর্তৃক কৃষ্ণ বলরামের নামকরণ সংস্কার, যমলার্জুন ভঙ্গ প্রভৃতি ভাগবত অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। তবে কৃষ্ণের বাল্যলীলার মধ্যে কবি অত্যন্ত অদ্ভুত ভাবে রাধার প্রসঙ্গ এনেছেন। একদিন কৃষ্ণ ভাণ্ড ভেঙে ননী খেলে যশোদা তাকে তাড়া করলেন—

হাতে নড়ি করি রাণী ধায় পিছে পিছে।
ধরিতে ধরিতে উঠে কদম্বের গাছে ॥
গাছের উপরে চড়ি বলে দামোদর।
না খাইব অন্ন না যাইব তোর ঘর ॥
রাধা মামী বলেছে দিবেক অন্ন নীর।
শুইব মামীর কোলে খাওয়াইবে ক্ষীর ॥ (পৃ. ২১)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে রাধা কৃষ্ণের চেয়ে অনেক বড়। কবি এখানে সেই পুরাণেরই সূত্রানুসরণে অভিনব কাহিনী বয়ন করেছেন। অন্যান্য অসুরবধ প্রসঙ্গ এই কাব্যে ভাগবত অনুযায়ী। কবি দ্বাদশ গোপালের নাম করেছেন নন্দ, সুনন্দ, শ্রীদাম, সুদাম, বাসুদেব, স্তোককৃষ্ণ, কৃষ্ণ, বলরাম, সুবল, অর্জুন, দামু, বিশাল। ভাগবতেও কৃষ্ণের দশজন সখার নাম পাওয়া যায়।[৫২] কিন্তু তাদের নাম স্তোককৃষ্ণ, অংশু, শ্রীদাম, সুবল, অর্জুন, বিশাল, বৃষভ, ওজস্বিন, দেবপ্রস্থ এবং বরূথপ। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সখাদের যে চারটি বর্গে ভাগ করেছেন, তার মধ্যে তৃতীয় অর্থাৎ প্রিয়সখা বর্গে সুদাম, দাম, শ্রীদাম, স্তোককৃষ্ণ এই কটি নাম এবং দ্বিতীয় বর্গে অর্থাৎ দাস্যভাবযুক্ত সখাদের মধ্যে রয়েছেন বিশাল। শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণের বনগমনের সঙ্গী হিসাবে সুনন্দ, নন্দীও আনন্দীকে বর্ণনা করেছেন। এই কবির কাব্যেও 'সুনন্দ' নামটি রয়েছে এবং নন্দী নামটিই সম্ভবতঃ 'নন্দ'তে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং দ্বাদশ গোপালের নাম কবি কেবলমাত্র ভাগবত থেকেই সংগ্রহ করেন নি। এক্ষেত্রে তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন।

ভাগবতে আছে রাখাল বালকেরা কালিদহের বিষাক্ত জল খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লে কৃষ্ণ নিজের অমৃতবর্ষী দৃষ্টিতে সবাইকে বাঁচিয়ে তুললেন। কিন্তু এখানে আছে কৃষ্ণ গরুড়কে আহবান করলে গরুড় অমৃত নিয়ে এসে সবাইকে বাঁচিয়ে তুললেন (পৃ. ২৬)। কালিয়দমন বর্ণনায়ও কবি ভাগবতের কাহিনীর ঈষৎ পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। ভাগবতে কৃষ্ণ কালিয় নাগকেই প্রথম আক্রমণ করেছেন।[৫৩] আর এখানে অন্যান্য নাগেরা কৃষ্ণকে কামড়ে দিলে তাদের দাঁত ভেঙে গেল। তারা কালিয়নাগকে গিয়ে খবর দেওয়ায় সে বেরিয়ে এল।

ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিংশ ও একবিংশ অধ্যায়ের বিষয় বর্ষা ও শরৎ শ্রী বর্ণনা এবং গোপীদের কথোপকথন কবি বাদ দিয়েছেন। দ্বাবিংশ অধ্যায়ের গোপীদের কাত্যায়নী ব্রতের উল্লেখও এই কাব্যে নেই। তবে ভাগবতের মতই এখানে বস্ত্রহরণ-লীলায় রাধাপ্রসঙ্গ অনুপস্থিত। গোবর্ধন ধারণ প্রসঙ্গে কবি নিজস্ব কল্পনার সাহায্যে

কিঞ্চিৎ কৌতুক রসের সৃষ্টি করেছেন। পর্বত ধারণে কৃষ্ণের কষ্ট হচ্ছে ভেবে গোপরা স্থির করলেন, তাঁরা সবাই মিলে একসঙ্গে গোবর্ধন ধারণ করে কিছুক্ষণের জন্য কৃষ্ণকে নিষ্কৃতি দেবেন। কিন্তু কৃষ্ণ পর্বতের ভার তাঁদের ওপর ছেড়ে দিলে—

পর্ব্বত চাপানে গোপ প্রাণ নাহি ধড়ে।
অতিভরে মুখে হৈতে ধারে রক্ত পড়ে॥
ভর দেখি সর্ব্ব গোপ পাইল তরাস।
তা দেখি গোবিন্দমনে উপজিল হাস॥ (পৃ. ৩৫)

পরবর্তী অংশে কবি ইন্দ্র কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি বর্ণনা করলেও ইন্দ্র ও সুরভি কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক ও 'গোবিন্দ' নামকরণ প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছেন। বরুণালয় থেকে নন্দের উদ্ধারকাহিনী ভাগবতানুরূপ, তবে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত। রাসলীলা প্রসঙ্গে কবি বয়স সম্পর্কে বলেছেন 'শরীরে বয়স হৈল এ বার বৎসর' (পৃ.৩৬)। কিন্তু ভাগবতে বয়সের প্রসঙ্গ নেই। তবে রাসলীলার অন্যান্য প্রসঙ্গ ভাগবতানুরূপ। এমনকি অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গলকারদের দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও কবি এখানে রাধাপ্রসঙ্গ আনেন নি। অক্রুরের সঙ্গে কৃষ্ণের মথুরাগমন প্রসঙ্গে কবি একবার মাত্র রাধার নাম করেছেন (পৃ. ৪৪)। কৃষ্ণের মথুরাগমনের সময় শোকার্ত গোপীদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় চৈতন্য পরবর্তী কবি হয়েও তিনি এখানে রাধার নাম একবারমাত্র উচ্চারণ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

ভাগবতে আছে চাণূর ও মুষ্টিক এই দুই মল্লযোদ্ধা কৃষ্ণ বলরামকে যুদ্ধে আহ্বান করলে তাঁরা বললেন যে "আমরা বালক, আমাদের সমান বলশালী বালকদের সঙ্গে বাহুযুদ্ধের ক্রীড়া করতে চাই"। এর উত্তরে চাণূর বলেছে, "তুমি অথবা বলরাম উভয়ে বালক নও, কিশোরও নও, কারণ তুমি বা বলরাম হাজার হাতীর সমান বলশালী এক হাতীকে অবহেলায় বিনাশ করেছ। কাজেই তোমরা দুজনে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, এই যুদ্ধে নিশ্চয়ই কোন অধর্ম নেই।"[৫৪] কিন্তু এই কবির কাব্যে এর বিপরীত ঘটনা দেখতে পাই, এখানে চাণূর কৃষ্ণকে শিশু এবং গোপজাত বলে অবজ্ঞা করেছে। প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণও আস্ফালন করে নিজের নানা বীরত্বব্যঞ্জক কীর্তির কথা বলছেন। কৃষ্ণের ভাগবতীয় মহিমাকে খর্ব করে কবি তাঁকে এখানে অনেকখানি মানবিক করে তুলেছেন।

উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেকের পর এই কবির কাব্যে সনক প্রভৃতি মুনিগণ সূতকে প্রশ্ন করেছেন—

পূর্ব্বে নন্দ যশোমতী কোন্ জাতি ছিল।
কোন্ তপস্যাতে কৃষ্ণ তারে কৃপা কৈল॥ (পৃ. ৫১)

এর উত্তরে সূত তাঁদের ধরাদ্রোণের কাহিনী শুনিয়েছেন। কিন্তু ভাগবতের এই অংশে কাহিনীটি নেই। এ ছাড়াও কাব্যের এই অংশে শোকাতুরা কংসপত্নীদের বর্ণনা কবির নিজস্ব সংযোজন। কংসপত্নীদের শোক বর্ণনায়ও কবি যথেষ্ট কৃতিত্বেরও পরিচয় দিয়েছেন। কুব্জা ও অক্রুরের গৃহে কৃষ্ণের গমন কবি খুবই সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। অক্রুরের গৃহগমন প্রসঙ্গে সমস্ত তত্ত্বকথাই কবি বাদ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়,

কাব্যের অন্যান্য অংশেও তত্ত্বকথা প্রায় সম্পূর্ণ বর্জ্জিত হয়েছে। আবার কংস বধের পর মথুরা থেকে নন্দের ব্রজপুরে প্রত্যাবর্তন এবং যশোদা ও গোপীগণের শোকের বর্ণনাও কবির নিজস্ব সৃষ্টি। এই অংশে গোপীদের ক্রন্দনে আর একবার রাধার নাম পাওয়া যায়—

আর না শুনিব বংশী রাধা রাধা বলে ॥ (পৃ. ৫৩)

মৃত গুরু পুত্র উদ্ধার কাহিনীর পরে ভাগবতে কৃষ্ণের অক্রূর গৃহগমন বর্ণিত। কিন্তু এখানে আগে অক্রূর গৃহে গমনের কাহিনী এবং পরে গুরুগৃহ থেকে মৃত পুত্র আনয়নের প্রসঙ্গ রয়েছে। কৃষ্ণ বলরাম কর্তৃক দেবকীর মৃত পুত্র আনয়নের কাহিনী দশম স্কন্ধের একেবারে শেষের দিকে ৮৫তম অধ্যায়ে বর্ণিত। কিন্তু এটিকে কবি মৃত গুরুপুত্র আনয়নের কাহিনীর সঙ্গে সুকৌশলে যুক্ত করেছেন এবং তারপর বহুপূর্ববর্তী ৪৬তম অধ্যায়ের কাহিনী—কৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণ বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ের গোপীদের বিরহগীতে বিখ্যাত 'ভ্রমরগীত' অংশ কবি বাদ দিয়েছেন। এরপর জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ, কালযবন বধ, দ্বারকায় দুর্গনির্মাণ প্রভৃতি প্রসঙ্গের পর কবি বিস্তৃতভাবে বলরামের বিবাহ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি দশম স্কন্ধে নয়, ভাগবতের নবম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। রুক্মিণীর বিবাহ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন যে, কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বিবাহ করার জন্য বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগবতের কাহিনীতে কেবল রুক্মিণীই কৃষ্ণের কাছে দূত পাঠিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বলরাম কর্তৃক রুক্মিণীকে সান্ত্বনাদানের সময় ভাগবতকার তত্ত্বকথার প্রবেশ ঘটিয়েছেন। এখানে তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। কাহিনীও সংক্ষেপে বর্ণিত।

লক্ষ্মণার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ প্রসঙ্গ ভাগবতে একটি মাত্র শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, খগপতি গরুড় যেমন ইন্দ্রাদি অমরবৃন্দের সমক্ষেই বলপূর্বক ক্ষীরোদমথিত ক্ষীরভাণ্ড সংগ্রহ করেছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেইভাবে একাকী স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়ে মদ্রদেশাধিপতির সর্বলক্ষণসম্পন্না লক্ষ্মণা নাম্নী কন্যাকে হরণ করেছিলেন। কিন্তু এই কবি লক্ষ্মণার স্বয়ম্বরের একটি কাহিনী কল্পনা করে নিয়েছেন। লক্ষ্মণার পিতা একটি রাধাচক্র নির্মাণ করিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন—

ধনুক জুড়িয়া বাণ জে চক্র বিন্ধিব।
অঙ্গীকার কইলু আমি তারে কন্যা দিব ॥ (পৃ. ৭৮)

স্বয়ম্বর সভায় একে একে শাল্ব, শিশুপাল, দন্তবক্র, কাশীরাজ, ভগদত্ত, রুক্মী, কর্ণ, দুর্য্যোধন, এমনকি ধনঞ্জয় পর্যন্ত রাধাচক্রে তীর বিঁধতে সক্ষম হলেন না। তখন সবার শেষে কৃষ্ণ—

ধনুকে টঙ্কার দিয়া এড়িলেন বাণ।
একবাণে রাধাচক্র হৈল খান খান ॥ (পৃ. ৭৯)

অতঃপর লক্ষ্মণার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ হল। এক্ষেত্রে কবি মহাভারতে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার অনুরূপ একটি স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেছেন। এরপর কবি যথাক্রমে ভাগবতের মুর ও নরকাসুর বধ ও ঊষা-অনিরুদ্ধ কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

মুদ্রিত পুথিতে এই পর্যন্তই কাহিনী পাওয়া যাচ্ছে। তবে শেষে লেখা আছে "ইতি কৃষ্ণবিলাস সংপূর্ণ।"

এই কবির যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয় তা হল, বন্দনাংশে তিনি চৈতন্যবন্দনা করেন নি, যদিও বৈষ্ণববন্দনা করেছেন। হরগৌরী বন্দনাই প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। ভাগবতের তত্ত্বাংশকে কবি সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। একমাত্র লক্ষ্মণার বিবাহ ছাড়া বাকী যে অংশগুলির পরিবর্তন করেছেন, তা অকিঞ্চিৎকর। মুদ্রিত পুথিতে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডের প্রসঙ্গ তো নেই-ই, উপরন্তু 'রাধা' নামের উল্লেখ ছাড়া রাধা প্রসঙ্গও অনুপস্থিত। অবশ্য রাধাকৃষ্ণের মাতুলানী-ভাগিনেয় সম্পর্কের উল্লেখটুকু এই কবির কাব্যে রয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথারচয়িতা একাধিক কৃষ্ণদাসের অস্তিত্ব যে ছিল —একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। 'নারদসংবাদ' নামক কৃষ্ণকথাকাব্য রচয়িতা হিসেবে আমরা এক কৃষ্ণদাসের সন্ধান পাই। বিভিন্ন সংগ্রহশালায় কৃষ্ণদাস রচিত নারদ সংবাদের শতাধিক পুথির সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীনটির লিপিকাল ১০২৮ সাল (১৬২১-২২ খ্রীষ্টাব্দ)।[৫৫] সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে সমগ্র সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর এই সেদিন পর্যন্তও নারদ-সংবাদের পুথি লিপিকৃত হয়েছে।[৫৬] ফলে সহজেই অনুমান করা চলে, কৃষ্ণদাস বিরচিত নারদসংবাদ অশেষ জনপ্রিয়তায় ধন্য হয়েছিল।

বৈকুণ্ঠে উপবিষ্ট লক্ষ্মীনারায়ণ সমীপে উপস্থিত নারদ নানা জন্মে নারায়ণের লীলা নিজমুখে শুনতে চাইলে নারায়ণ তা বর্ণনা করেছেন—

হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ শুন তপোধন।
কহিব তোমারে সব অপূর্ব্ব কথন ॥

এই কাহিনী কোন বিশিষ্ট পুরাণের অনুবাদ বা ভাবানুবাদ নয়। নানা পুরাণের সমবায়ে গড়ে ওঠা কৃষ্ণলীলার এক আশ্চর্য মিশ্রণ। কবি তার ইঙ্গিত দিয়েছেন—

চতুর্দশ শাস্ত্র আর আঠার পুরাণ।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ইথে আছয়ে প্রমাণ ॥

এই কৃষ্ণদাসকে নিয়ে একটি ঐতিহাসিক বিভ্রাট ঘটার সম্ভাবনা সম্পর্কে এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। নারদসংবাদ নামেও কৃষ্ণদাসের একাধিক পুথি পাওয়া যায়। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, নারদপুরাণ এবং নারদ সংবাদের পুথিতে গভীর মিল আছে। সামান্য পাঠান্তর ছাড়া বিষয়বস্তু একইরকম। এইরকম একটি নারদ পুরাণের পুথিতে কৃষ্ণদাসের আত্মপরিচয় পাওয়া যায়—

অতঃপর কহি শুন নিজ সমাচার।
সুবর্ণবণিক কুলে উৎপত্তি আমার ॥
পৈত্রিক বসত পূর্ব্বে অম্বিকানগরে।
হাঁসপুকুর নাম যথা তাহার উত্তরে ॥
পিতামহ নাম ছিল মদনমোহন।
পিতা তারাচান্দ নাম ধর্ম্মপরায়ণ ॥

এসকল পুণ্যবান আছে পূর্ব্বকীর্ত্তি ;
এ অধমের সংসারে রহিল অপকীর্ত্তি ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই নাম ছিল রাম নারায়ণ।
ভেক আশ্রয় হয়্যা তীর্থ করেন ভ্রমণ ॥
রঘুনাথ মধ্যম ভাই অধিক পুণ্যবান্।
স্বর্গবাসে গেলা তিঁহ চাপিয়া বিমান ॥
আপনি কনিষ্ঠ মোর রামকৃষ্ণ নাম।
সাকিম কলিকাতা বহুবাজারেতে ধাম ॥
সন দশ শত্ত নিরেনব্বুই সালে।
মাহ জৈষ্ঠ মধ্যে এই পুস্তক রচিলে ॥[৫৭]

আগেই বলেছি নারদসংবাদ এবং নারদপুরাণকে একই কবির রচনা বলে গ্রহণ করার সঙ্গত কারণ আছে। আর এই আত্মপরিচয়কে যদি নির্ভেজাল বলে গ্রহণ করতে হয়, তবে সর্বপ্রাচীন বলে আমাদের উল্লিখিত ১০২৮ সালকে মল্লাব্দ ধরতে হয়। কারণ ১০৯৯ সালে কবি কাব্যরচনা করলে লিপিকাল কখনোই ১০২৮ সাল হতে পারে না।

ঘনশ্যাম দাস

ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে জয়গোপাল দাস সংস্কৃত ভাষায় কিছু ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেন। ঘনশ্যাম দাস ছিলেন এই জয়গোপাল দাসের শিষ্য। শিষ্য নিজের কাব্যে গুরুর রচনাবলীর উল্লেখ করে বলেছেন—

তোমার কৃপায় মাত্র পড়িল ভকতিশাস্ত্র
এসার সংগ্রহ মনোহর
ভক্তিভাব পরদীপ মনোবুদ্ধি সংবাদ
অপরূপ ভক্তিরত্নাকর।
অনুমান সমন্বয় শুনিতে অজ্ঞান ক্ষয়
এ ধর্মসন্দর্ভ রসকন্দ
অপূর্ব কৃষ্ণবিলাস কাব্যভাব পরকাশ
ঘুচিল মনের সব ধন্ধ।[৫৭]

এই রচনাবলীর সব পুথি পাওয়া যায় নি। দু একটি মাত্র পাওয়া গেছে। যেমন—ভক্তিরত্নাকর,[৫৮] রুদ্রাশুগশশধর (১৫১১) শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৮৯ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়েছিল। ভক্তিভাব প্রদীপের সংস্কৃত পুথির সংবাদ আমরা পাই নি। কিন্তু অনুবাদ করেছিলেন কৃষ্ণকিঙ্কর।[৫৯] সংস্কৃত কৃষ্ণবিলাসে'র একটি মুদ্রিত সংস্করণ আমরা দেখেছি।[৬০] এই সংস্করণ চারটি প্রাচীন পুথির ভিত্তিতে সম্পাদিত। এটির রচনাকাল "শাকে জলনিধি শশভৃদ্বান্ সুধাংশো প্রযত্নবাহুল্যাদয়ং" অর্থাৎ ১৫১৭ শক বা ১৫৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দ।

শিষ্য ঘনশ্যামেরও কাব্যের নাম ছিল কৃষ্ণবিলাস। এশিয়াটিক সোসাইটিতে

রক্ষিত এ. জি. ৫৪২১ সংখ্যক পুঁথিটিতে ঘনশ্যামের ভণিতায় বার বার গুরু জয়-গোপালের সশ্রদ্ধ উল্লেখ রয়েছে—

শ্রী জয়গোপাল দাস চরণ কৃপায়।
পরম আনন্দে ঘনশ্যাম দাস গায় ॥

কিন্তু কাব্যটি জয়গোপাল দাসের সংস্কৃত কাব্য কৃষ্ণবিলাসের হুবহু অনুবাদ নয়। জয়গোপালের কাব্যের বিষয় হল, (১) বৃন্দাবন বর্ণনা, (২) কৃষ্ণব্রজনারী ও কৃষ্ণ-লীলাসঙ্গীদের বর্ণনা, (৩) বনবিহার বর্ণনা, (৪) রাস, (৫) তালভক্ষণ, বস্ত্রহরণ, দান ও নৌকালীলা এবং (৬) অনুরাগ বর্ণনা। সব মিলিয়ে জয়গোপালের কাব্য নিবিড় মাধুর্য রসে সিক্ত।

ঘনশ্যামের নামে আমরা উপরোক্ত যে পুঁথিটির কথা বলেছি, তাতে কাহিনী সম্পূর্ণতঃ ঐশ্বর্যভাবদ্যোতক। ভক্তি যতটুকু প্রকাশিত হয়েছে, তা দাস্য ভক্তি। পুঁথির প্রাপ্ত অংশে কাহিনী কংস বিনাশের পর বসুদেব দেবকীর গৃহে আনন্দোৎসব এবং বিদ্যালাভমানসে গুরুগৃহযাত্রা থেকে পাওয়া যাচ্ছে। পূর্ববর্তী অংশ যে দীর্ঘ ছিল তা পুঁথির পত্র সংখ্যা থেকে বোঝা যায়। [প্রথম ১৪১টি পাতা নেই] [৬১] এখন গুরুদক্ষিণা, উদ্ধবদূত, [মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব ও কৌরবের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে—'ঘনশ্যাম কহে মহাভারত দেখিয়া।'] জরাসন্ধ বধের প্রসঙ্গ, রুক্মিণীহরণ, সত্যভামা সংবাদ প্রভৃতি প্রধানত ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের উত্তরার্ধের কাহিনী অবলম্বন করে বর্ণিত হয়েছে। বলরাম কর্তৃক দ্বিবিদ বানর বধের কাহিনীতে পুঁথি খণ্ডিত হয়েছে। ঘনশ্যাম দাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাসের হারিয়ে যাওয়া প্রথম অংশ যখন আধারে ছিল, তখন শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার কয়াল মহাশয় পুঁথিটি দেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জেনেছি, জয়গোপালের সংস্কৃত কাব্য কৃষ্ণবিলাসের সঙ্গে ঘনশ্যামদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাসের ব্রজলীলার কাহিনীতে গভীর মিল ছিল। বর্তমানে আদ্যন্ত খণ্ডিত সন্দিগ্ধ এই পুঁথিকে অবলম্বন করে কৃষ্ণকথাবিকাশে কবির বৈশিষ্ট্য সন্ধান তাই তাৎপর্যহীন মনে হয়।

দ্বিজ ঘনশ্যাম

ড. সুকুমার সেন 'ঘনশ্যামদাসের রচনার আর একটি পুঁথি'র পরিচয় দিতে গিয়ে দ্বিজ ঘনশ্যামকে ঘনশ্যামদাসের সঙ্গে এক করে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় 'কৃষ্ণবিলাস' রচয়িতা ঘনশ্যাম দাস[৬২] এবং হরিবংশ[৬৩] রচয়িতা দ্বিজ ঘনশ্যাম পৃথক্ ব্যক্তি। আগেই উল্লেখ করেছি ঘনশ্যামদাস যে জয়গোপালের অনুগৃহীত শিষ্য ছিলেন, সে কথা কবি ভণিতায় বার বার বলেছেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষিত ৪৭৪২ সংখ্যক পুঁথির কবি 'দ্বিজ' ছিলেন। ভণিতা 'কিঙ্কর দ্বিজ' বা কিঙ্কর' বা 'শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর' নামে পাওয়া যায়। ফলে দ্বিজ ঘনশ্যামের পুঁথিটি আমরা পৃথকভাবেই আলোচনা করতে চাই।

ঘনশ্যাম তাঁর কাব্যে 'চারিকাণ্ড' সমন্বিত কৃষ্ণকথার বর্ণনা করেছেন। এই চারটি কাণ্ড হল—

চারি কাণ্ড কৃষ্ণোৎসবে গোলোক মথুরা তবে
দ্বারকা ভারতকাণ্ড শেষে।

খণ্ড, কীর্তন, মহোৎসব প্রভৃতি বিভাগ সমন্বিত এই কাণ্ড পরিকল্পনায় কবি সুস্পষ্ট গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগে কাব্যের গঠনকে সুমিত করেছেন। মধ্যযুগের কাব্যধারায় কাব্যের গঠন নিয়ে এমন নিপুণ হিসাব নিকাশ আমরা অন্য কারো কাব্যে দেখি না।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাহিনী বর্ণনায় কবি ভাগবতানুসারী—

বন্দিতে দৈবকী গর্ভ আইলা দেবতা সব্ব
কিঙ্কর গাইল ভাগবত।

জন্মাষ্টমী ব্রত বর্ণনায় কবি ভবিষ্যপুরাণ অনুসরণ করেছেন—"ভবিষ্যপুরাণ কথা গাইল কিঙ্কর"। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অনুসরণে (৯ম অধ্যায়) দ্রোণ ও তৎপত্নী ধরার তপস্যা বর্ণনা করা হয়েছে। মথুরা কাণ্ডের বিংশতি কীর্তনের শেষে কবি উৎস নির্দেশ করেছেন—

ভাগবত অনুক্রম ব্রহ্মবৈবর্তন।
কিঙ্কর গাইল দুই পুরাণ কথন॥
নন্দোৎসব পুতনা মোক্ষণ বাল্যভাবে।
নন্দ তপ কথন নবম মহোৎসবে॥
গাইল মথুরাকাণ্ডে ব্যাসের ভারতি।
বিংশতি কীর্ত্তনে হৈল পরিপূর্ণ ইতি॥

কাহিনীতে দেখি দেবকী বসুদেবের বিবাহ, কৃষ্ণজন্ম, পুতনাদি বধ, জমলাজুর্ন মোক্ষণ, গোকুল ত্যাগ করে গোপগণের বৃন্দাবনে বসতি, গোপশিশু সঙ্গে রামকৃষ্ণের গোচারণ ও ব্যল্যলীলা, উদুখল বন্ধন, কালিয়দমন ও কংসপ্রেরিত নানা অসুরবধ, গোবর্ধন ধারণ, অসময়ে স্নান হেতু নন্দের মৃত্যু ও রাম দামোদর কর্তৃক উদ্ধার প্রভৃতি ঘটনা যথা রীতি বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও দানলীলা, নৌকালীলা, বস্ত্রহরণ, রাস প্রভৃতি লীলাও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। মথুরা ও দ্বারকালীলার কথাও বিস্তৃত। উষাহরণ কাহিনী দীর্ঘ। ব্রাহ্মণের মৃতপুত্রদের উদ্ধারে দ্বারকালীলার কাহিনী শেষ হয়েছে। ভারত-কাণ্ডের প্রারম্ভে কবি বলেছেন—

পুণ্যময় কহি কিছু ভারতের অর্থ
কৌরব নাশিতে কৃষ্ণ হইলা প্রবর্ত্ত॥

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল মহাভারত বর্ণনা কবির লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হল মহাভারতীয় কাহিনীর আধারে কৃষ্ণকথার বিস্তার ঘটানো। দুষ্টদমনে অবতীর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাকথাই কবি তাঁর 'চতুষ্কাণ্ড' পরিমিত কাব্যে বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণমঙ্গলের ধারায় এ প্রচেষ্টা আমরা অন্য কোন কবির কাব্যে দেখি নি। এদিক থেকে কাব্যটির অভিনবত্ব স্বীকার করতেই হয়। কবির কাব্যপ্রেরণা অবশ্যই ভক্তির প্রেরণা। এ সম্পর্কে তাঁর নিজেরই কথা—

বাসুদেব কথা রুচি তিন জনে করে শুচি
জিজ্ঞাসে জে কহে শুনে নর।

কবি শেখরের গোপাল বিজয়

কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহের কাল নিয়ে কিছু মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বভারতী থেকে প্রাকাশিত [সাহিত্য প্রকাশিকা-৬] কবির কাব্য সম্পাদক ড. দুর্গেশ চন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কবি শেখরকে চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। এর প্রধান কারণ হল, গোপালবিজয়ে চৈতন্যদেবের নাম উল্লিখিত হয় নি। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী বহু কাব্যে চৈতন্যদেবের নাম অনুল্লেখিত দেখা যায়। বরং বলা যেতে পারে পর্তুগীজ শব্দ ব্যবহারে গোপালবিজয় উত্তর-চৈতন্য কালের কাব্য হিসেবেই বেশী প্রতীয়মান হয়। 'বেসালি' [৬৪] শব্দটি পর্তুগীজ 'Vasilha' শব্দ থেকে আগত। মুকুন্দরামও শব্দটির ব্যবহার করেছিলেন—'চুলাতে রাখি বেসালি'। দ্বিতীয়ত, 'কৃষ্ণ যার প্রাণসার-কুল শীলজাতি' এবং 'গোপী অনুগতি' যে কবির হৃদয়ভাবনা, সে কবি চৈতন্যদেবের নামটি কেবল উল্লেখ করেন নি, এই কারণে তাঁকে চৈতন্য পূর্বকালের বলে বিবেচনা অনৈতিহাসিকতার চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হতে পারে। গোপালবিজয়ের কবিকে তাই আমরা কোন মতেই প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি বলে বিবেচনা করতে পারছি না।

অন্যদিকে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় " 'গোপালবিজয়'-এর রচনাকাল ১৫৪৮ শকাব্দ" বলে যে দৃঢ় মত পোষণ করেছেন [৬৫] তাতেও আমাদের সুনিশ্চিত অনুমোদন নেই। কারণ এই সিদ্ধান্তে আসতে গিয়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় দুটি অনিশ্চয়কে নিশ্চয় হিসেবেগ্রহণ করে নিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬০নং পুঁথির "শ্রীকবিশেখর মুখপদ্ম নির্গত শ্রীগোপালবিজয় সম্পূর্ণ শাকে গজাব্ধি শরচন্দ্রমিতে মুকুন্দ যশঃপ্রদেন শ্রীনরোত্তম নন্দী লিখিত" কথাটির ব্যাখ্যায় অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় 'আব্ধি' কথার অর্থ করেছেন ৪। কারণ হিসেবে বলেছেন পুষ্পিকা সংস্কৃতে লেখা বলে 'আব্ধি' কথার অর্থ ৭ না ধরে ৪ ধরাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু সংস্কৃতে কালবাচক শব্দ 'আব্ধি' সাত হিসেবেও বাংলায় ব্যবহৃত হয়েছে এমন প্রমাণের অভাব নেই। দ্বিতীয়তঃ 'সোজা মানে' করতে গিয়ে সমালোচক পুঁথিটিকে কবির নিজের dictation মনে করেছেন। ফলে তাঁর হিসেবে দাঁড়িয়েছে ১৫৪৮ শকাব্দ গোপালবিজয়ের রচনাকাল। আর নিজের এই হিসেবকে দাঁড় করাতে গিয়ে শিবরতন মিত্র মহাশয় প্রদত্ত আর একটি পুঁথির লিপিকাল ১৫৩৫ শকাব্দকে সন্দেহ করতে হয়েছে। এতগুলো সন্দেহ ও অনুমানের ওপর নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। আমাদের ধারণা ১৫৩৫ শকাব্দের সামান্য পূর্বেই হয়ত কবি তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন।

'গোপালবিজয়' কাব্যে কবি তাঁর আত্মবিবরণীতে বলেছেন, তিনি সিংহবংশোদ্ভব, তাঁর নাম দৈবকীনন্দন, উপাধি কবিশেখর, পিতা চতুর্ভুজ, মাতা হীরাবতী (পৃ. ৮)। এই কাব্যরচনার আগে কবি 'গোপালচরিত' মহাকাব্য, গোপালের 'কীর্তন-অমৃত' ও 'গোপীনাথ বিজয়' নাটক লিখেছিলেন।

কবির কাব্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত রাগরাগিণীর উল্লেখ রয়েছে, বন্দনা অংশে কবি নারায়ণের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন।

অপরাপর কৃষ্ণমঙ্গলকারদের মত তিনি অন্যান্য দেবদেবীর বন্দনা করেন নি, এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কাব্যের প্রথমে কবি সমৃদ্ধ মথুরাপুরীর বর্ণনা দিয়েছেন। কবির মানসলোকে আদর্শ নগরের যে ছবি ছিল, তাই-ই এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। নতুবা অত্যাচারী কংসের রাজধানী এভাবে বর্ণিত হওয়ার কথা নয়। অবশ্যই এটি কবির নিজস্ব কল্পনা। পুরাণে নারায়ণের অবতার বর্ণনায় বাসুকির কোন প্রসঙ্গ নেই। কিন্তু গোপালবিজয়ের

কবি বলেছেন, কংসের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পৃথিবী প্রথমে পাতালে বাসুকির কাছে গমন করেন। এর পরের কাহিনী ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের অনুরূপ। তবে বিষ্ণুপুরাণের মত এখানে নারায়ণের শুক্ল ও কৃষ্ণ কেশ দানের ৬৬ প্রসঙ্গ নেই।

কবি তাঁর কাব্যে দেবকীর বিবাহ প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। এই বিবাহে কবি বাংলাদেশের বাসরঘরের মনোজ্ঞ চিত্রটিকেও বাদ দেন নি—

চারি ভিতে বরকে বেঢ়িল নারীগণে।
বালচান্দ বেঢ়ি জেন শোভে তারাগণে। (পৃ. ১৭)

এই অংশে পরনারীর ওপর কংসের অত্যাচার, দেবকীর বিবাহ উপলক্ষে দেবতাদের ছদ্মবেশে মথুরায় আগমন, রাজাদের নানা যৌতুকদান প্রভৃতি প্রসঙ্গও কবির কল্পিত। এমনকি দেবকীর বিবাহে ইন্দ্র ও বরুণের পত্নীও রন্ধনকার্যে সহায়তা করেছেন এবং বাসরঘরের আনন্দ উপভোগ করার জন্য ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারাও পুরনারীর ছদ্মবেশে বাসরগৃহে এসেছেন। কাহিনী বয়নে কবির এই মৌলিকত্ব তাঁর বাঙালী প্রবণতারই পরিচায়ক।

ভাগবতে আছে, কংস যখন বসুদেব দেবকীর রথের সারথি হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আকাশে দৈববাণী হয়। কিন্তু এই পাঁচালীকার অন্যভাবে কাহিনী কল্পনা করেছেন। বসুদেব-দেবকীর বিদায়ের সময়েই দৈববাণী হয়েছে। এখানে কবি কংসের যে স্নেহকোমল চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন, এ তাবৎ কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে আমরা তার পরিচয় পাই নি। কংস দেবকীকে সুগৃহিণী হওয়ার ব্যাপারে নানা উপদেশ দেওয়ার পর বসুদেবকে ধরে বলেছেন—

দৈবকী সভার প্রাণ শিশুকাল হইতে
না পারে পরের বড় বচন সহিতে।
* * * *
ভোখ শোষ কারে বুলি হেনঞী না জানে
বচন বলিতে নাহি করে অভিমানে।
আহ্মা দেখি সহিবে সকল দোষভার
গুণ বহি দোষ কিছু না লবে ইহার। (পৃ. ১৮)

দুর্বৃত্ত দেবদ্বেষী দৈত্য কংসের ভগিনীর প্রতি এই অকৃত্রিম স্নেহময় উক্তি আসলে বাংলাদেশেরই এক স্নেহময় অগ্রজ অথবা পিতার।

আবার দৈববাণী শুনে কংস দেবকীকে বধ করতে চাইলে, দেবকী যেভাবে কাতর হয়ে পড়েছেন, তার বর্ণনাও কোন পুরাণে নেই। এটিও কবির নিজস্ব সৃষ্টি। দেবকীর গর্ভলক্ষণের কথাও পুরাণে নেই। সদ্যোজাত কৃষ্ণের নির্দেশে বসুদেব যখন তাঁকে নন্দালয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন স্বয়ং মহামায়া শৃগালীরূপ ধারণ করে তাঁকে পথ দেখিয়েছিলেন। ভবিষ্যপুরাণের এই কাহিনীটি অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গলকারদের মত এই কবিও ব্যবহার করেছেন। পুতনাবধ, তৃণাবর্তবধ ও গর্গমুনি কর্তৃক কৃষ্ণ-বলরামের নামকরণের পর কবি নিজস্ব কল্পনার সাহায্যে রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলনের

একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন। একদিন যশোদার কোলে শিশু কৃষ্ণ অত্যন্ত কাঁদতে শুরু করলেন, মা তাঁকে কোনমতেই শান্ত করতে পারলেন না। সমস্ত গোপনারীরা একে একে কৃষ্ণের কান্না থামানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। অবশেষে রাধা এসে কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলেন। রাধা কৃষ্ণকে নিয়ে নিভৃত বিশেষে চলে গেলেন এবং সেখানে উভয়ের মিলন হল।

কৃষ্ণের বাল্যলীলাও কবির নিজস্ব কল্পনায় বাস্তবরূপ লাভ করেছে—

আঙ্গিনার পাখি দেখি ধরিবারে জাএ
ধরিতে না পারি পাছে রহনি খেলাএ
আপনার প্রতিবিম্ব দেখি হাস্য-মনে
দুই হাথে চাপড় মারএ শিশুভ্রমে। (পৃ. ৫৫)

কবি ব্রজবাসীদের গোশালার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাও তাঁর নিজস্ব কল্পনা। আদর্শ গোশালা যেমন হওয়া উচিত, তারই চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে। রাধাকৃষ্ণের সম্পর্ক নিয়ে কবি কপোলকল্পিত আরও কিছু ঘটনাও তাঁর গোপালবিজয়ে যুক্ত করেছেন। যেমন বালক কৃষ্ণ খেলা করতে করতে বাড়ী যেতে ভুলে যান। যশোদা ব্যাকুলভাবে কৃষ্ণকে খুঁজতে খুঁজতে প্রত্যেককেই কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করেন। একদিন কোথাও কৃষ্ণকে খুঁজে না পেয়ে তিনি আয়ানের ঘরে গিয়ে রাধার প্রতি অনুযোগ করে বলেন, শিশুকালে থেকেই কৃষ্ণের সঙ্গে তার পীরিত। রাধাকে পেলে সে বাপ-মাকে ছেড়েও চলে আসে। তারই জন্য কৃষ্ণ আজ এইভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। এই অভিযোগে রাধা দুঃখিত হয়ে বলেন—

মুখ-মামলাএ তোর ঘর আসি যাই
কারে বা কতেক ধন দিয়াছে কাহ্নাঞি।
বোল আর না জাইব তোহ্মার দুআরে
আজি হইতে ঘরে রাখ আপন কুমারে। (পৃ. ৬০)

এই কাহিনীটিও কবির নিজস্ব সৃষ্টি। এখানে রাধা চরিত্রের বিকাশটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কৃষ্ণকথায় এইগুলিই বাঙ্গালী কবিদের নিজস্ব অবদান। এ ছাড়াও পল্লী বাংলার দুই প্রতিবেশিনীর পারস্পরিক সম্পর্কের বাস্তব চিত্রটি এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

ভাগবতে ফলহারিণীর কৃষ্ণকে ফলদানের ও বিনিময়ে রত্ন প্রাপ্তির কাহিনীটি এখানে বর্ণিত হয়েছে। তবে নন্দ ও অন্যান্য বৃন্দাবনবাসীদের বৃন্দাবন ত্যাগের সংকল্পের পুরাণ বর্ণিত কাহিনীকেও কবি একটু নতুনভাবে পরিবেশন করেছেন। নন্দ গোকুলের দক্ষ মুখ্য বৃদ্ধদের ডেকে গোকুল ত্যাগ করার সংকল্পের কথা বললে, আয়ান কোন একটি বনের কথা বললেন। কৃষ্ণ বৃন্দাবনের নাম করলেন। এক্ষেত্রে আয়ান চরিত্রটি কবির নিজস্ব সৃষ্টি।

বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গে ভাগবতে যেমন গোপীদের কাত্যায়নীব্রতের উল্লেখ আছে, এখানেও তেমনি রয়েছে। কিন্তু ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে[৬৭] কৃষ্ণ তাঁর সখাদের সঙ্গে গোপীদের বস্ত্রহরণ করেছিলেন এবং গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের কথোপকথনের সময় গোপবালকেরাও সেখানে উপস্থিত ছিল। অথচ গোপালবিজয়ে আছে, এক কৃষ্ণই গোপীদের বস্ত্রহরণ করেছেন এবং গোপীরা তাঁর কাছে এসে বস্ত্র নিয়ে গেছে। আবার গিরিযজ্ঞ

প্রসঙ্গে ভাগবতে ৬৮ বিষ্ণুপুরাণে ৬৯ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ৭০ যে তত্ত্বকথা ও গো-ব্রাহ্মণ পূজা প্রসঙ্গ রয়েছে, তা এখানে অনুপস্থিত। কবি কেবল কাহিনীসারটুকুই পরিবেশন করেছেন।

এরপর বরুণ কর্তৃক নন্দকে অপহরণের ভাগবতীয় কাহিনী পরিবেশনের পর কবি রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার লৌকিক প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। একদিন কৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে 'বাহির-বিজয়' করবার সংকল্প করলে, গোপীরা গন্ধদ্রব্য, বস্ত্র ও নানাবিধ আভরণ ইত্যাদি উপহার কৃষ্ণের কাছে পাঠিয়েছে। কৃষ্ণ নানাপ্রকার বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে বালকদের সঙ্গে 'নগর-বিজয়' উৎসবে যাত্রা করেছেন। গোপীরাও কৃষ্ণের এই নগর বিজয় করার সংকল্পের সংবাদ পেয়ে নিজেদের গৃহ নানাভাবে সাজিয়েছে। কৃষ্ণ সারা-দিন ধরে সখাদের সঙ্গে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে গোপীদের দর্শনলালসা চরিতার্থ করে-ছেন এবং দিনের শেষে কদম্ববৃক্ষের নীচে মহোৎসব করেছেন। এদিকে রাধা প্রভৃতি গোপীরাও কৃষ্ণের উৎসবের কথা শুনে বড়াইকে সঙ্গে করে মদনপূজার জন্য যাত্রা করল। এখানে কবি বড়াইর যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রায় অনুরূপ। পথে কদমগাছের তলায় কৃষ্ণকে দেখে গোপীরা নানা ছলাকলা দেখিয়ে মদনমণ্ডপে উপস্থিত হল। পূজার জন্য রাধা বড়াইকে এক ব্রাহ্মণকুমার আনার জন্য অনুরোধ করলেন। এদিকে রাধার চিন্তায় ব্যাকুল কৃষ্ণ সঙ্গীদের কাছ থেকে চলে এসে উপবনে প্রবেশ করে কদম্ববৃক্ষের নীচে রাধার এক সখীকে দেখতে পেলেন। কৃষ্ণ তাকে রাধার দেখা পাওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করলে, গোপী রাধার পরিচয় দিয়ে বলল, বড়াইর সহায়তায় রাধার দেখা পাওয়া যেতে পারে। কৃষ্ণ বড়াইর কাছে গিয়ে নিজের বলবিক্রমের কাহিনী বিবৃত করে রাধার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় বড়াই কৃষ্ণকে তিরস্কার করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের কাতর অনুরোধে বড়াই রাধাকে কৃষ্ণভজনার কথা বললে রাধা বড়াইকে অত্যন্ত তিরস্কার করলেন। এই সময় রাধার অন্যান্য সখীরা এলে রাধা গৃহে ফিরলেন, কৃষ্ণও ফিরে গেলেন। পুরাণ বহির্ভূত এই কাহিনী বর্ণনায় কবি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকেই অনুসরণ করেছেন। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কাহিনীর সামান্য পরিবর্ত্তনও ঘটেছে। যেমন—কৃষ্ণ কর্তৃক দ্বিতীয়বার গজমোতিহার বড়াইর হাতে দিয়ে রাধার নিকট তাকে প্রেরণ করার প্রসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নেই। পরবর্তী ঘটনাগুলিও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুরূপ। দানালীলায় কৃষ্ণ রাধার কাছে নিজের পুতনাবধ, গোবর্ধন ধারণ প্রভৃতি নানাবিধ বীরত্বের পরিচয় দিয়ে বললেন, রাধা এখন তাঁর কথা না শুনলে পরে তাকে কষ্ট পেতে হবে। উত্তরে রাধা বললেন—

জাহার মহিমা বেদপুরাণে ফুকরে
সে কেহ্নে চাহিব পরনারী হরিবারে। (পৃ. ১৬৯)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধার সঙ্গে এই রাধার মিল আছে। কিন্তু এরপর কৃষ্ণ নিজের মহিমা খ্যাপন করলে লোকলজ্জার ভয়ে কৃষ্ণের প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়েও রাধা ভেবেছেন—

জার পদ পরশনে মুক্ত হেনজানি।
ব্রহ্মা-আদি দেব জাহাকে বাখানি ॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর জত জার পদ সেবে।
বিধি অনুকুলে নিধি-মোরে মেনে এবে ॥ (পৃ. ১৭২)

এখানে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে গোপালবিজয়ের রাধার বিপুল পার্থক্য।

নৌকালীলার বর্ণনায়ও কবি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অনুসারী হলেও কিঞ্চিৎ ব্যাতিক্রম আছে। এখানে দেখি রাধার সঙ্গে কৃষ্ণ জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে, ভাসতে ভাসতে তাঁরা একটি নিভৃত নিকুঞ্জে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং সেখানেই রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটেছে। এই নিকুঞ্জ মিলন প্রসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নেই। আবার এই কবি কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্তা গোপীদের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা-ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মথুরার হাটে দধিদুগ্ধ বিক্রয় করতে গিয়ে তাদের বিক্রয়ের কাজ বিশৃঙ্খল হয়ে যায়—

কোহো চাছি ভাণ্ডে মাপে দুগ্ধ জোখে তুলে
কেহো ঘৃত মাপি দেই ঘোলের বদলে।
কাহ্নাঞি বলিঞা কেহো ডাকে সখাজনে
জে কথা পুছিতে কানুর রূপগুণ ভণে॥ (পৃ. ১৮৯)

রাসলীলার কাল প্রসঙ্গে এই কবি গীতগোবিন্দের দ্বারা প্রভাবিত। ভাগবতের শারদ রাসের পরিবর্তে তিনি এখানে বসন্তরাস বর্ণনা করেছেন। তবে রাসলীলা প্রসঙ্গে নবনির্মিত বৃন্দাবনের পশুপাখী, তরুলতা, ষোলশত বাসগৃহ, রাসসভা, রাসমণ্ডপের নির্মাণকৌশল, রাধাকৃষ্ণের চারপাশে ষোলশত গোপীর অবস্থান—এগুলি কবির নিজস্ব সৃষ্টি। এ ছাড়াও কবির বর্ণনায় আছেন, রাসমণ্ডপে রাধাকৃষ্ণ বসার পর তাম্বুল হাতে চন্দ্রাবলী, চামর হাতে মাধবী ও মালতী, সুবর্ণভৃঙ্গার হাতে রত্নবতী, সুবর্ণমুকুর ধারিণী ইন্দুবতী, বেশরচন নিপুণা মদালসা, নবা ও মনোরমা। এই অষ্টসখীর নামও কোন পুরাণে নেই। এঁরাও কবির নিজস্ব কল্পনা-জাত।

রাসলীলার সময় কৃষ্ণের অন্তর্ধানের কারণ এই কবির কাব্যে ভাগবতানুরূপ নয়। বিষ্ণুপুরাণে অন্তর্ধানের কোনও কারণ উল্লিখিত হয় নি। ভাগবতের বর্ণনায় দেখা যায়, কৃষ্ণের একান্ত অনুগৃহীতা গোপীদের মনে গর্বভাবের উদয় হলে কৃষ্ণ রাসস্থল থেকে অন্তর্ধান করেন।[৭১] গোপীরা তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করে বুঝতে পারেন, অপর একজন গোপীও তাঁর সঙ্গিনী হয়েছেন। কিন্তু এখানে আছে কৃষ্ণ রাসনৃত্য সমাপন করে নিজের বহুরূপ সংহরণ করেছেন। বিশ্রামের পর তিনি আবার বংশীধ্বনি করলে গোপিরা সবাই সমবেত হ'ল। এদের মধ্যে রাধাকে না দেখে কৃষ্ণ বিষণ্ণ মনে তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। কিন্তু খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে মাধবীকুঞ্জের নীচে বসে খেদ করতে লাগলেন। এই অংশটি জয়দেবের প্রভাবজাত, কিন্তু কাহিনীর পরবর্তী অংশটি কবির কপোলকল্পিত। এই অংশে আছে কোকিলের কূজন শুনে কৃষ্ণ কোকিলের সঙ্গে মিত্রতা করে রাধাকে খোঁজার জন্য তার সাহায্য প্রার্থনা করলে, কোকিল প্রতি কুঞ্জে রাধাকে খোঁজার জন্য ঘন ঘন ডাকতে লাগল। এরপর কোকিল রাধাকে খুঁজে পেয়ে কৃষ্ণকে সংবাদ দিলে তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তখন রাধা প্রতিকূলা। অবশেষে সখীর কৌশলে রাধা অভিমান ত্যাগ করলে দুজনের মিলন হল। মিলনের পর রাসমণ্ডপে যাওয়ার সময় কৃষ্ণ তাঁকে কাঁধে নিতে চাইলে রাধা রাজী হলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর 'মানমদ' খণ্ডন করার জন্য সহসা অন্তর্হিত হলেন। তখন কৃষ্ণকে না দেখে রাধা অচেতন হয়ে পড়লেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও এই প্রসঙ্গ আছে।

এই কবির কাব্যে ভাবী বিরহের বর্ণনাতেও একটু অভিনবত্ব আছে। রাধা প্রভৃতি গোপীরা সংকেতকুঞ্জে যাওয়ার সময় সর্বত্র তূর্যধ্বনি শুনে ভীত হলেন। একজন সখী কারণ জানার জন্য কৃষ্ণের কাছে যাওয়ার উদ্যোগ করলে, অন্য এক গোপী ক্রন্দন করতে করতে এসে কৃষ্ণের মথুরা যাত্রার স্থির সংকল্প জানালেন। কৃষ্ণ কুঞ্জে কুঞ্জে এসে তাদের সান্ত্বনা দিলেন। ভবন বিরহেও কবির নিজস্ব কল্পনা যুক্ত হয়েছে। কৃষ্ণ বিরহের আশঙ্কায় ব্যাকুলা গোপীরা রথের গতি রোধ করতে চাইলে কৃষ্ণ তাদের বনমালা ছিঁড়ে এক একটি ফুল দিলেন।

পুরাণের রজক বধ কাহিনীকে কবি ঈষৎ পরিবর্তিত করে নিয়েছেন। ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে যে কৃষ্ণ নিজেই রজককে হত্যা করেন। কিন্তু এখানে আছে বলরামই তাঁকে হত্যা করেছেন। চাণূর-মুষ্টিকের কাহিনীও এখানে ভাগবতের বিপরীতভাবে উপস্থাপিত। ভাগবতে কৃষ্ণ নিজেদের বালক বলে অভিহিত করলে, চাণূর তার প্রতিবাদ করে বলেছে, হাজার হাতীর মত বলশালী কুবলয়াপীড়কে যারা হত্যা ক'তে পারে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে কোন অধর্ম নেই।[৭২] অন্যদিকে এই কবির কাব্যে চাণূর কৃষ্ণকে নানাভাবে হীন ও দুর্বল বলে অবহেলা প্রকাশ করেছে এবং নিজের শক্তি সম্বন্ধেও আস্ফালন করেছে। এর আগে কাশীদাসাগ্রজ কৃষ্ণদাসের কাব্যেও আমরা এই কাহিনীর ঠিক একই রূপান্তর লক্ষ্য করেছি।

কংস বধের পর বসুদেব ও দেবকীর সঙ্গে কৃষ্ণ বলরামের মিলনের সময় কবি কৃষ্ণের মুখে যশোদা সম্পর্কে যে অভিযোগবাণী দিয়েছেন (পৃ.-৩১০-১১), তা আমাদের ঔচিত্যবোধকে আহত করে এবং কৃষ্ণ চরিত্রের ভাগবতীয় ও মানবীয় উভয় মহিমাকেই খর্ব করে। ঠিক এই উক্তি আমরা শ্রীকৃষ্ণকিংকরের কাব্যেও দেখেছি। এক্ষেত্রে কে যে কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তা যথার্থ করে বলা যায় না।

কৃষ্ণকে মথুরায় রেখে নন্দের বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তনের পর সারা বৃন্দাবনে শোকের উচ্ছ্বাস বর্ণনায় কবি পদাবলী সাহিত্যের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন। জননী যশোদার হৃদয়বেদনা বর্ণনায়ও কবি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রাধার ভূত বিরহের অবস্থায় তিনি কৃষ্ণপ্রেমের পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করে বলেন—

বুকের উপর বহি শিজ নাহি ছুই
মুখের চর্বিত বহি তাম্বুল নাহি খাই।
*　　*　　*　　*
আলিঙ্গনে বুকের ছিণ্ডিআ পেলে হারে
গাএর চন্দন মোছে বিরহের ডরে॥ (পৃ. ৩১৭)

এই বর্ণনায় পদাবলী সাহিত্যের প্রভাব খুবই স্পষ্ট; ভাগবতের উদ্ধব সন্দেশের কাহিনীকেও কবি একটু অন্য রূপ দিয়েছেন। বিরহিণী গোপীরা একজন চতুরা গোপীকে ব্রজপুরে দূতী করে পাঠিয়েছে। দূতীর মুখের কথা শুনে—'আশ্বাসিতে উদ্ধব পাঠাএ হৃষীকেশ" (পৃ. ৩২৬)। ভাগবতে কৃষ্ণ উদ্ধবকে দূত করে ব্রজে পাঠিয়েছিলেন বটে, কিন্তু বৃন্দাবনের দূতীর মুখে সংবাদ পেয়ে নয়।

উদ্ধব-সন্দেশে বিরহক্ষীণা রাধার চিত্রটি কবির হাতে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে।

উদ্ধব যখন রাধার কাছে এলেন, তখন বিরহিণী রাধিকা—

সম্ভ্রমে উঠিতে চাহে উঠিতে না পারে
হাথসানে বসিতে আসন দিল তারে ॥ (পৃ. ৩২৮)

কিন্তু বিরহক্ষীণা রাধার কৃষ্ণের প্রতি উক্তির মধ্যে তীব্র ব্যঙ্গ ও অভিযোগ ঝলসে ওঠে—

বিধাতা না কৈল খোড়া না কইল কুজে
কোন গুণে রঞ্জিব সে রসিকরাজে।
* * * *
এ আহ্মা সভার কথা সেহো বহু দূরে
মাও বাপ দেখিতে কি মন নাহি ফুরে। (পৃ. ৩২৯)

এই রাধা বৈষ্ণব পদাবলীরই রাধা। অন্যত্র গোপালবিজয়ে কবি রাধার মুখে একেবারে গোবিন্দদাসের রাধার কথাই বসিয়ে দিয়েছেন। কৃষ্ণ বিরহে রাধার প্রাণ চলে যাবে। তাই বিধাতার কাছে রাধার প্রার্থনা—

প্রভু গতাআত পথে রহে মহীভাগে
চলিতে সে চরণের তলে জেন লাগে। (পৃ. ৬৩০)

রাধার এই সমস্ত কথার উত্তরে উদ্ধব জানান, কৃষ্ণের কাছে লক্ষ্মীর চেয়েও রাধার আসন উচ্চে, এবং—

স্বপনেহো প্রভু রাধা রাধা করি উঠে
রাধানাম করিতে পরাণ জেন ফাটে। (পৃ. ৩৩১)

এরপর উদ্ধব কৃষ্ণের কাছে গিয়ে শোকাতুর বৃন্দাবনের অবস্থা বর্ণনা করলে ব্যাকুল, কৃষ্ণ উগ্রসেনের ওপর রাজ্যের ভার দিয়ে নন্দ যশোদাকে দেখার অজুহাতে বৃন্দাবনে যাত্রা করলেন। দিনের শেষে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে উপস্থিত হলে—

মৌহু মাছি সম লোক বেঢ়িল আপারে ॥
মোর বাঞ্ছা পুরনিঞাঁ জশোদা কৈল কোলে।
পুতের বাৎসল্য ভাসে লোহের হিল্লোলে ॥ (পৃ. ৩৩৪)

এরপর গোপীরা সবাই এসে কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। সবাই চলে যাওয়ার পর রাধা নিভৃতে কৃষ্ণকে বললেন—

আর না ছাড়িহ প্রভু অনাথী গোপিনী।
ইবেসি জানিল জত দুখ তোহ্মা বিনি ॥ (পৃ. ৩৩৪)

রাত্রে কৃষ্ণ নিকুঞ্জে গিয়ে বংশীধ্বনি করলে গোপীরা সেখানে এসে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন। এইভাবে বৃন্দাবনে আবার 'রসের বাদল' নামল। এইখানেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

কৃষ্ণের বৃন্দাবনে ফিরে আসার কথা ভাগবতে[৭৩] ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে[৭৪] পাওয়া যায়। গোপগোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের আবার দেখা হয়েছিল কুরুক্ষেত্রে। সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে কৃষ্ণের সঙ্গে স্বজনদের সম্মেলনের সময় নন্দ যশোদা প্রভৃতি গোপগোপীরাও সেখানে এসেছিলেন।[৭৫] বলরামের বৃন্দাবনে ফিরে যাওয়ার প্রসঙ্গ পুরাণে আছে।[৭৬] কিন্তু গোপাল বিজয়ের কবি বলেছেন কৃষ্ণ, বলরামকে উগ্রসেনের মন্ত্রী নিযুক্ত করে

বৃন্দাবন এসেছিলেন (পৃ: ৩৩৩-৩৫)। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে [৭৭] রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের পুনর্মিলনের প্রসঙ্গ থাকলেও তিনি বৃন্দাবনে ফিরে আসেন নি। কিন্তু পদাবলীকারদের কেউ কেউ কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে ফিরিয়ে এনেছেন।

গোপালবিজয়ের কবি কৃষ্ণের দ্বারকালীলা বর্ণনা করেন নি। গোপালকৃষ্ণের লীলাটুকুই শুধু তাঁর উপজীব্য। প্রধানতঃ ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের প্রভাব থাকলেও পদাবলী সাহিত্যের প্রভাব এবং কবির নিজস্ব কল্পনাযুক্ত হয়ে কাব্যটি স্বাদু হয়ে উঠেছে। চরিত্র সৃষ্টিতে কবি লক্ষণীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাঙালী জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয়ও তাঁর কাব্যে অনেক সময় ফুটে উঠেছে। সর্বোপরি রাগানুগা ভক্তিধর্মের ভাব তাঁর কাব্যের সর্বত্র ব্যাপ্ত।

বংশীদাস

কৃষ্ণকথাকোবিদ্ বংশীদাসের বিশদ পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু বংশীদাসের নামে বহু পুথি পাওয়া গেছে। যেমন—'কৃষ্ণকেলিচরিতামৃত' [৭৮] 'কৃষ্ণগুণ বর্ণনা' [৭৯] 'কৃষ্ণগুণার্ণব' [৮০] 'কৃষ্ণলীলা' [৮১] 'দানখণ্ড' [৮২] 'নিকুঞ্জরহস্যস্তব' [৮৩] প্রভৃতি। এই পুথিগুলির মধ্যে 'কৃষ্ণলীলা'র পুথিটি সর্বপ্রাচীন, সপ্তদশ শতাব্দীর (১০৮৮ সাল বা ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে)। অতএব কবিকে আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের কবি হিসেবেই গণ্য করছি।

'কৃষ্ণকেলি চরিতামৃতে'র প্রারম্ভ অংশকে কবি 'ভজন রতন' নামে অভিহিত করেছেন —"ইতি ভজনরতন সম্পূর্ণ"। এই অংশে কবি ভাগবত, পদ্মপুরাণ, গোতমীতন্ত্র প্রভৃতির উপাদান সংকলন করেছেন, প্রমাণ করতে চেয়েছেন কৃষ্ণ ভক্তির মাহাত্ম্য। এ ছাড়া, এই সমস্ত উপাদান থেকে বৈষ্ণবের কৃত্যাদিও আহরণ করেছেন। এই অংশে কবির নিজের রচনার নমুনা—

> কৃষ্ণ নাহি ভজে দ্বিজ অবৈষ্ণব হয়।
> চণ্ডাল অধিক সেই জানিহ নিশ্চয় ॥
> বড়ই অভাগ্য তার বৃথা জন্ম হৈল।
> পাইঞা অমূল্য নিধী হেলায় হারাইল ॥

কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরবর্তী যে অংশে কৃষ্ণকথা আমরা প্রত্যাশা করি, সে অংশ খণ্ডিত। বংশীদাসের কৃষ্ণকথামূলক আর একটি পুথিতে [৮৪] অবিন্যস্ত কিছু কাহিনী আমরা পেয়েছি। এতে যথাক্রমে রাস, দ্বিজপত্নী উপাখ্যান, রাধাকৃষ্ণের বিবাহ, খণ্ডিতা, বিপরীত খণ্ডিতা ও নৌকাবিলাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বংশীদাসের রচনারীতি মসৃণ। কাহিনীকে যথাযথ ভাগবত অনুসারী না বলে, বরং পদ্মপুরাণ প্রভাবিত বলাই উচিত। অবশ্য পুথির আরম্ভে পাই—'অথ শ্রী ভাগবতানুসারেণ গীতা··লিখ্যন্তে"। পুথিটি যে পাঠের জন্য রচিত নয়, তা বোঝা যায় রাগরাগিণীর উল্লেখ দেখে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭১৫ সংখ্যক পুথিতে ঝুলনের কবি বংশীদাসের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

অভিরাম দাস (দত্ত)

সপ্তদশ শতাব্দীর আর একজন কবি অভিরাম দাসের কাব্যের নাম 'গোবিন্দবিজয়'।

এই কাব্যটি আলোচনা করার সময় আমরা পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত 'গোবিন্দ-বিজয়' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত সংস্করণ, ১৯৬৯) গ্রন্থটি ব্যবহার করছি।

কবি কাব্যে নিজের ব্যক্তিগত পরিচয়ও দিয়েছেন। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল দত্ত। তবে বৈষ্ণব বিনয় প্রকাশের জন্যই তিনি 'দাস' উপাধি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু দত্ত পদবীর উল্লেখও তাঁর গ্রন্থের কিছু কিছু জায়গায় রয়েছে। বৈষ্ণব শাস্ত্রে যে কবির যথেষ্ট পরিমাণ পাণ্ডিত্য ছিল, তা তাঁর কাব্যটি পাঠ করলেই বোঝা যায়। কবির কাব্যের নাম গোবিন্দবিজয় হলেও তিনি এটিকে 'গোবিন্দমঙ্গল', 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' বলেও উল্লেখ করেছেন। এঁর কাব্য যে যথেষ্ট পরিমাণে জনপ্রিয় হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রচুর সংখ্যক পুথি দেখে এবং অন্যদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি শঙ্কর কবিচন্দ্রের কাব্যে এঁর কাব্যের উদ্ধৃতি থেকে।

কবি অভিরাম দত্ত তাঁর কাব্যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয় ও দশম স্কন্ধের অনুসরণ করেছেন। তবে তিনি ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ কিন্তু করেন নি। ইতিপূর্বেই আমরা কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যসমূহে পৌরাণিক উপাদান ছাড়াও রাধাকৃষ্ণ প্রেম-কথার লৌকিক কাহিনীগুলির ব্যবহার লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কবি সেই সমস্ত লৌকিক উপাদানকে তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেন নি। বরং তাঁর সমস্ত কাব্য জুড়েই বিশুদ্ধ ভক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এদিক দিয়ে তিনি রঘুনাথ ভাগবতা-চার্যের উত্তরসূরী।

কাব্যের প্রথমেই রয়েছে গৌরাঙ্গ বন্দনা। চৈতন্যের প্রেমধর্মের স্বরূপ একটি পংক্তিতে কবি চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন—'আপুনি কান্দিয়ে গোরা কান্দাইল জীবে' (পৃ. ৩)। এরপর কবি নারায়ণ বন্দনা, কমলা-সারদা বন্দনা, গণেশ বন্দনা, শিব বন্দনা, ব্যাসদেব বন্দনা, শুকদেব বন্দনা, মাতাপিতার বন্দনা, বৈষ্ণব ও বিপ্র বন্দনা, তীর্থবন্দনা, শ্রীকৃষ্ণবন্দনা ও গৌরবন্দনা করে কাহিনী শুরু করেছেন। বন্দনা অংশের পর ভাগবতের মত শৌনকাদি ঋষিগণকে শ্রোতারূপে দেখিয়ে কবি তাঁর কাব্যের কাহিনী শুরু করেছেন। এরপর অশ্বত্থামা কর্তৃক পাণ্ডব পুত্রদের হত্যার কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত এই কাহিনীটিকে কবি কিছুটা পরিবর্তিত করে কাহিনী বয়নে স্বাধীনতাও গ্রহণ করেছেন।

মুনিপুত্র শৃঙ্গী কর্তৃক পরীক্ষিৎকে অভিশাপ প্রদানের কাহিনীতে ভাগবতে ঐ মুনির নাম শমীক মুনি। কিন্তু এই কবির কাব্যে তাঁর নাম মানব মুনি। অঘাসুর-বধ ও ব্রহ্মার গোপবালক এবং গোধন হরণের কাহিনী বর্ণনায় কবি পুরোপুরি ভাগবতকে অনুসরণ করেন নি। কবি বলেছেন ভ্রাতা বকাসুর ও ভগ্নী পুতনার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অঘাসুর কৃষ্ণকে হত্যা করতে এসেছিল, কেবল কংসপ্রেরিত হয়ে নয়। কিন্তু ভাগবতে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ নেই। এর পরের কাহিনীগুলি ভাগবতে আছে। তবে গোবিন্দবিজয়ের বংশী নির্মাণের কাহিনী কবির নিজস্ব কল্পনা।

বরুণের অনুচর কর্তৃক নন্দকে বরুণালয়ে অপহরণের কাহিনী ভাগবতে যেভাবে

আছে, কবি তা একটু অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। ভাগবতে আছে বরুণের আদেশ ছাড়াই তাঁর এক অনুচর নন্দকে বরুণালয়ে ধরে নিয়ে গিয়েছিল এবং এজন্য বরুণ কৃষ্ণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু গোবিন্দবিজয়ে আছে বরুণ নিজেই কৃষ্ণকে দর্শন করার ইচ্ছায় নন্দকে অপহরণ করে এনেছিলেন। অর্থাৎ এখানে প্রত্যক্ষ ভাবেই বরুণকেও কৃষ্ণভক্ত করে তোলা হয়েছে। রাসলীলার পরে রাধা কর্তৃক বাঁশীচুরির যে কাহিনী গোবিন্দবিজয়ে আছে, তা কবির নিজস্ব কল্পনা প্রসূত। ভাগবতের বিদ্যাধর মোচন, শংখচূড়বধ ও অরিষ্টাসুর বধের কাহিনী এই কবির কাব্যে অনুপস্থিত। তবে কৃষ্ণলীলার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীগুলি কবি ভাগবত অনুসারে বর্ণনা করেছেন। অনেক সময় আবার কবি শ্রীমদ্ভাগবতের কাহিনীকে গ্রহণ করলেও ভাগবতের ক্রম অনুযায়ী বর্ণনা করেন নি। যেমন—ভাগবতে আছে কৃষ্ণ গোপরমণীদের সংবাদ নেওয়ার জন্য উদ্ধবকে ব্রজে পাঠালে উদ্ধব ব্রজে গিয়ে প্রথমে নন্দ যশোদাকে সান্ত্বনা দিলেন। এরপর উদ্ধব গোপীদের সান্ত্বনা দিয়ে মথুরায় ফিরে এলেন। উদ্ধব ফেরার পর কৃষ্ণ তাঁকে নিয়ে কুব্জার গৃহে গেলেন ও তারপর অক্রূরের গৃহে গিয়ে অক্রূরকে পাণ্ডবদের খবর নেওয়ার জন্য হস্তিনাপুরে পাঠালেন।[৮৫] কিন্তু গোবিন্দবিজয়ে কৃষ্ণ প্রথমে উদ্ধবকে নিয়ে কুব্জার বাড়ীতে গেছেন, তারপর অক্রূরের গৃহে গিয়ে তাকে পাণ্ডবদের খবর নেওয়ার জন্য হস্তিনাপুরীতে পাঠিয়েছেন এবং শেষে উদ্ধবকে ব্রজধামে পাঠিয়েছেন।

পরবর্তী বেশ কিছু কাহিনীই সম্পূর্ণ ভাগবত অনুসারে বর্ণিত। ভাগবতে বলরাম ও রেবতীর বিবাহপ্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র দশম স্কন্ধে আছে,[৮৬] কিন্তু গোবিন্দ-বিজয়ে কাহিনীটি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। তবে স্যমন্তক মণির কাহিনীতে কবি ভাগবতকে অনুসরণ করলেও কিছুটা নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন—গোবিন্দবিজয়ে আছে শতধন্বার কাছ থেকে মণি না পেয়ে কৃষ্ণ সেকথা প্রকাশ করলে বলরাম, রুক্মিণী ও সত্যভামা কৃষ্ণকে গঞ্জনা দিয়েছেন। কিন্তু ভাগবতে এর কোন উল্লেখ নেই। গোবিন্দবিজয় কাব্যে এই স্যমন্তক মণি উদ্ধারের ঘটনা পর্যন্ত এসে কাহিনী শেষ হয়েছে।

অভিরাম দত্তের 'গোবিন্দবিজয়' চৈতন্য পরবর্তী যুগে রচিত হলেও এর মধ্যে মধুর রস সর্বস্ব কৃষ্ণের পরিবর্তে ঐশ্বর্যময় কৃষ্ণের প্রতিই কবির সমধিক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে কবি শ্রীমদ্ভাগবতেরই ভাবধারাকে অনুসরণ করেছেন বলা যায়। তবে নামকীর্তন, নাম শ্রবণ প্রভৃতি চৈতন্য পরবর্তীকালের ভক্তিধর্মের বৈশিষ্ট্যও কাব্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্থান লাভ করেছে।

কাব্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা কাহিনীর সঙ্গে মহিমাজ্ঞাপক কাহিনীও কিছু কিছু যুক্ত হয়েছে, যেমন খট্বাঙ্গ রাজা ও অজামিলের কাহিনী। এই কাহিনীগুলিও এসেছে পরীক্ষিতেরই প্রশ্নের উত্তরে। পরীক্ষিৎ সাতদিনের পরমায়ু নিয়ে এই অল্প সময়ের কৃষ্ণভজনায় কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভব কি না এই প্রশ্ন করলে—তারই উত্তর হিসেবে কবি খট্বাঙ্গ রাজার ও অজামিলের উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন।

আগেই বলেছি কাব্যটি ভাগবতের হুবহু অনুবাদ নয়। কবি অনেক ঘটনাই

ভাগবতের তুলনায় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। এই কারণে তার সঙ্গে নিজস্ব কল্পনাও যোজনা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে অজামিলের উপাখ্যানের কথা বলা যায়। ভাগবতের এই কাহিনীতে অজামিলের অন্য নারীর প্রতি আসক্তি সংক্ষেপে বর্ণিত এবং সেখানে নারীটিকে মত্ত বারাঙ্গনারূপে দেখানো হয়েছে। কিন্তু গোবিন্দবিজয়ের কবি নিজস্ব কল্পনায় বারাঙ্গনার মধ্যেও সুস্থ মানবিকতার বিকাশ ঘটিয়েছেন। কামান্ধ অজামিল নারীর কাছে প্রেম প্রার্থনা করলে, অজামিলকে সৎপথে চালনা করার জন্য—

নারী বলে শুন বিপ্র কহি হিতকথা।
আতুর অন্ধক-গৃহে তব মাতা পিতা ॥
রমণী যৌবনা তোমার পতিব্রতা সাধ্বী।
তোমা বিনে সে নারীর অন্য নাহি বুদ্ধি ॥
* * * *
তুমি তা সভারে ছাড়ি যাবে যেই দিনে।
অন্নাভাবে তিনজন মরিব কাননে ॥ (পৃ. ৭১)

বাৎসল্যরসের বর্ণনায়ও কবি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যশোদার কোল থেকে বসুদেবের যোগমায়াকে নিয়ে যাওয়ার সময় শিশুকন্যার ক্রন্দন বর্ণনায় একাধারে কবির বাস্তববোধ ও বাৎসল্যরস সৃষ্টিতে নৈপুণ্য প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে বাৎসল্যরসের মূর্তিমতী প্রতিমা জননী যশোদার চরিত্র চিত্রণেও কবির যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণের ঐশ্বরিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়েও তিনি তাঁকে অবোধ শিশু বলেই ভাবেন। সেই কারণে বালক কৃষ্ণ কান্না শুরু করলে বিরক্ত হয়ে মা যশোদা বলেন—

নিত্য আল্য কান্দনায় প্রাণ গেল পুড়্যা।
পালাইতে মন যায় ঘর দ্বার ছাড়্যা ॥
চুপ কর মোর বাছা হাউ আসিয়াছে।
কান্দনা শুনিলে বাছা কান কাটে পাছে ॥
দূর যা ছি আয় আয় বাছা ঘুম গেল্য।
কালি আস্য কানকাটা যদি করে আল্য ॥ (পৃ. ১০০)

শুধু পদাবলী সাহিত্যেই নয়, ষোড়শ ও সপ্তদশ উভয় শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলিতেও জননী যশোদার স্নেহস্নিগ্ধ মাতৃমূর্তিটি বাঙালী কবির নমনীয় কোমল তুলির টানে মধুর হয়ে উঠেছে। গৃহকর্মের মাঝখানে দুরন্ত শিশুকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত পল্লীবাংলার বাৎসল্যাসিক্ত যে জননীর চিত্র কবিদের সামনে ছিল, তাঁরা তাকেই জননী যশোদায় রূপান্তরিত করেছেন।

কৃষ্ণ কংসকে হত্যা করার পর দেবকীর সঙ্গে কৃষ্ণের মিলনের দৃশ্যেও কবি সমানভাবে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। দেবকী কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে বলেছেন—

তোমা দেখিবার তরে ধরিয়াছি প্রাণ ॥
* * * * *
কোল মুছা তোমা বাছা দিল মোরে বিধি।
দারুণ ভেএর ভএ হারাইনু নিধি ॥ (পৃ. ৩৩৩)

আবার যশোদা যখন শুনলেন যে দৈবকীই কৃষ্ণের মাতা, তিনি তাঁকে পালন করেছেন মাত্র, তখন তাঁর অভিমানের আর সীমা থাকল না। তিনি বললেন—

অন্যের বাকল নাকি অন্য গাছে সাজে।
পোষোণিয়া পোএ কার কোথা স্নেহ আছে ॥ (পৃ. ৩৩৪)

কৃষ্ণ আর কোনদিন ব্রজপুরে ফিরে আসবেন না জেনে যশোদার ব্যাকুলতার আর অন্ত থাকল না। যশোদার স্নেহাতুর হৃদয়ের সেই বিরহবেদনার রূপাঙ্কনে অভিরামের লেখনী চূড়ান্ত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে—

সভার সম্পদ আছে সব ঘর দ্বার।
মোর বাছাধন বিনে সকলি আন্ধার ॥
ওরে বাছা ডাকে তোমা যশোমতী মায়।
শূন্য কোলে মোর রাত্রি কেমনে পোহায় ॥ (পৃ. ৩৪৭-৪৮)

শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনে বিরহকাতর গোপীদের বর্ণনায় কবি রাধার নাম উল্লেখ করেন নি, একজন প্রধানা গোপীর নাম করেছেন মাত্র। এ ছাড়া রাসলীলার সময় কৃষ্ণ অকস্মাৎ অন্তর্হিত হলে গোপীদের ও রাধার বিরহ কাতর চিত্র অঙ্কনেও কবি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কবির পারিবারিক সম্পর্ক বর্ণনার মধ্যেও আন্তরিকতার স্পর্শ অনুভব করা যায়। সহজ মানবিক সম্পর্ককেই কবি রূপ দিয়েছেন। কিন্তু তবুও সব মিলিয়ে বলা যায়, কবি কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই যে জগৎসৃষ্টির মূলীভূত কারণ—এই তত্ত্বটি সমস্ত কাব্যে রূপলাভ করেছে। সেই কারণেই পরীক্ষিৎ যখন শুকদেবকে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আত্মীয় সম্বোধন করলে শুকদেব বলেছেন যে, জগতের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপন করাটা মহাপাপ। এই প্রসঙ্গে শুকদেব পরীক্ষিতের কাছে কৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করেছেন—

এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাহিক কৃষ্ণ আর।
সেই কৃষ্ণ অখিলান্ত ভুবনের সার ॥

এই বলে তিনি পরীক্ষিৎকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, শ্রীবৎস লাঞ্ছন, কিরীট-কুণ্ডল কৌস্তুভ-শোভিত পীতাম্বরধারী নারায়ণের মূর্তি চিন্তা করতে বলেছেন। আবার রাসলীলায় কৃষ্ণ যখন রাধাকে ত্যাগ করে অন্তর্হিত হয়েছেন, তখন রাধা মনে করেছেন যে তিনি কৃষ্ণকে ব্রহ্মজ্ঞান করেন নি বলেই তাঁর এই অপমান ঘটল। রাধার এই ধরনের চিন্তা অর্থাৎ কৃষ্ণকে ব্রহ্মজ্ঞান করা ইতিপূর্বে আমরা আর কোথাও পাই নি। এখানেও কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবের প্রতিই কবির অতিরিক্ত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে একথাও ঠিক যে, কবির পুরো কাব্যটি জুড়ে তাঁর ভক্তহৃদয়ের ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা গেছে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যধারার এই কবি সংখ্যাগরিষ্ঠদের তুলনায় পৃথক। তিনি বরং রঘুনাথ ভাগবতাচার্যেরই অনুসারী।

পরশুরাম চক্রবর্তী

মধ্যযুগের অন্যান্য বহু কবির মতই 'পরশুরাম' নামক কবির সংখ্যা ও কাল নিয়ে

কোন মতৈক্য গড়ে ওঠার মত অবকাশ এখনও ঘটে নি। তবে পরশুরাম চক্রবর্তী এবং পরশুরাম রায় নামক দুই কবির কাব্যকে আমরা পৃথক্ করে পেয়েছি। তাঁদের গ্রন্থ সম্পাদিতও হয়েছে। পরশুরাম চক্রবর্তীর কৃষ্ণমঙ্গল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদনায় (১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়েছে। পরশুরাম রায়ের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে অমিতাভ চৌধুরীর সম্পাদনায় বিশ্বভারতী থেকে (১৩৭১ সনে)। এ ছাড়া পরশুরামের নামে আরও কিছু কিছু পুথি পাওয়া যায়। সেই সমস্ত পুথির সঙ্গে রায় পরশুরাম ও চক্রবর্তী পরশুরামের সম্পর্ক কি, অথবা এদের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব আছে কি না—তা এখনও নিরূপিত হয়নি। পরশুরাম চক্রবর্তীর কাল নিরূপণে ড. সুকুমার সেন মহাশয় 'শ্রীবৎস চিন্তা পালা'র একটি পুথিতে (অক্ষয়কুমার কয়াল সংগৃহীত) উল্লিখিত রচনার কাল (হাজার সত্তরি সাল) কে পরশুরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থ রচনার সমাপ্তিকাল বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এই 'শ্রীবৎস চিন্তা পালা'র রচয়িতা এবং পরশুরাম চক্রবর্তী অভিন্ন ব্যক্তি কি না সে বিষয়ে গভীর সন্দেহের অবকাশ আছে।[৮৭] একারণেই অন্য কোন অকাট্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত 'হাজার সত্তরি' সালকেই পরশুরাম চক্রবর্তীর নিশ্চিত কাল হিসেবে গ্রহণ করতে পারছি না। তবে পরশুরাম চক্রবর্তী যে এই সময়ের অল্প আগে কিংবা পরে কাব্য লিখেছিলেন সে সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ। কারণ সাহিত্য পরিষদের চিত্তরঞ্জন সংগ্রহে (পুথি সংখ্যা ২২৯) পরশুরাম চক্রবর্তীর কৃষ্ণমঙ্গলের যে পুথিখানি আছে, তার লিপিকাল ১১২৯ সাল। অতএব মূল কাব্যটির রচনা এই পুথির লিপিকাল অপেক্ষা ৫০/৬০ বছর পূর্ববর্তী হওয়া অসম্ভব নয়। এই কবি তাঁর কাব্যে ভাগবতের বিভিন্ন স্কন্ধের পালাগুলিকে নিজের ইচ্ছেমত সাজিয়ে গুছিয়ে বর্ণনা করেছেন এবং ভাগবত ছাড়াও দোললীলা, দানলীলা ও নৌকালীলার মত লৌকিক প্রসঙ্গ তাঁর কাব্যে গৃহীত হয়েছে।

বন্দনা-অংশে কবি গণপতি, ইন্দ্র ও কৃষ্ণনাম জপকারী শিবের বন্দনা করার পর চৈতন্য-বন্দনা করেছেন। এ ছাড়াও কবি চৈতন্যসহচর অদ্বৈত আচার্য, দামোদর, হরিহর, নরহরি ও শ্রীনিবাসের নাম করেছেন। পরবর্তী অংশে কবি কৃষ্ণলীলার উল্লেখ-যোগ্য স্থান ও চরিত্রগুলিকেও বন্দনা করেছেন।

বন্দনার পর কবি ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের শেষ দুই অধ্যায়ের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কাহিনীতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না ঘটালেও, একেবারে হুবহু ভাগবত অনুযায়ীও কবি কাহিনী বর্ণনা করেন নি। এরপর কবি ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের অষ্টম থেকে দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত ধ্রুব চরিত্র বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাতেও কবি তত্ত্বকথা বাদ দিয়েছেন এবং স্বল্প হলেও কিছু পরিবর্তন করেছেন। যেমন, ধ্রুবকে পিতা উত্তান পাদ কোলে না নিলে তিনি ক্রন্দন করায় বিমাতা বললেন—

মাতা তোর কভু নাহি সেবে নারায়ণে।
কোন পুণ্যে বসিতে চাহ রাজসিংহাসনে॥ (পৃ. ১৩)

কিন্তু ভাগবতে সুরুচি এ কথা বলেন নি। আবার সুনীতিও পুত্রকে বলেছেন—

কখন কৃষ্ণের সেবা না করিলাম আমি।

সিংহাসনে বসিতে কিমতে চাহো তুমি ॥
সুরুচি কৃষ্ণের সেবা কৈল চিরকাল (পৃ. ১৫)।

কিন্তু ভাগবতে সুনীতি এই ধরনের কথা বলেন নি। স্পষ্টই বোঝা যায় সপ্তদশ শতাব্দীর এই কবি কৃষ্ণ সেবার মহিমা প্রচার করার জন্যই সুনীতির মুখে এই কথাগুলি বসিয়াছেন।

পরবর্তী কাহিনী অজামিল নামক কান্যকুব্জের এক উচ্ছৃংখল ব্রাহ্মণের বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি।[৮৮] অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গলকারদের মত এই কাহিনীতেও কবি কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং তত্ত্বাংশও বাদ দিয়েছেন।

এরপর কবি ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায় থেকে প্রহ্লাদ উপাখ্যান শুরু করেছেন। প্রহ্লাদের গুরুগৃহে ষণ্ড অমর্কের কাছে পাঠগ্রহণ থেকে কাহিনী শুরু হয়েছে। আর পূর্ববর্তী প্রসঙ্গ কবি বাদ দিয়েছেন। সপ্তম অধ্যায়ে পুনরায় গুরুগৃহে গিয়ে প্রহ্লাদ দৈত্যবালকদের কাছে নিজে মাতৃগর্ভে থাকার সময় নারদের উপদেশ দানের কাহিনী বিবৃত করেছেন। কিন্তু কবি এই প্রসঙ্গেরও উল্লেখ করেন নি। অষ্টম অধ্যায়ে ২০ থেকে ৩১ সংখ্যক শ্লোকে ভাগবতকার অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ ভাষায় নৃসিংহের ভয়ালসুন্দর রূপ ও হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে তাঁর প্রলয়ংকর যুদ্ধের ও অবশেষে হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু কবি অত্যন্ত সংক্ষেপে এই প্রসঙ্গ শেষ করেছেন—

স্তম্ভো হইতে বাহিরাইলা নৃসিংহ মুরুতি ॥
ধরিয়া নৃসিংহ মূর্ত্তি প্রভু ভগবান।
নখে বিদারিয়া তারে কৈলা দুইখান ॥ (পৃ. ৪৫)

এই প্রহ্লাদ কাহিনী থেকেও বোঝা যায়, কোনমতে কাহিনী বিবৃত করাই কবির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। অষ্টম অধ্যায়ের পর নবম ও দশম অধ্যায়ের পরবর্তী কাহিনীও তিনি বাদ দিয়েছেন।

ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত গজরাজের কাহিনী কবি বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি নবম স্কন্ধের দশম ও একাদশ অধ্যায়ে বিবৃত রামায়ণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তবে রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষদের বিবরণ কবি বাদ দিয়েছেন।

দশম স্কন্ধেও কবি ভাগবতের তত্ত্ব, বর্ণনাংশ ইত্যাদি বাদ দিয়ে কেবলমাত্র কাহিনী অংশটুকুই গ্রহণ করেছেন। কখনও কখনও কাহিনীতে ঈষৎ পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। যেমন এই কাব্যে নারদ কংসের কাছে নন্দ প্রভৃতি গোপরূপে সর্বদেবগণের জন্ম এবং কংসের মৃত্যু কামনা বর্ণনার পর বলেছেন—

তুমি বোল দৈবকির নন্দন।
ইহা বহি সোত্র মোর নাহি কোন জন ॥
বুঝিলাম রাজা তুমি বড়ই পাগল।
গুনিয়া গাথীয়া দেখ সকলি অষ্টম ॥
দেবতার চক্র তুমি কি বুঝিতে পারো।
য়েকে য়েকে দৈবকীর সব পুত্র মার ॥ (পৃ. ৬৯)

নারদেরএই কথাগুলি কবির নিজস্ব কল্পনা। ভাগবতে নারদ এইভাবে কংসকে দেবকীর সব পুত্র হত্যা করার পরামর্শ দেন নি। ভাগবতে আছে, বসুদেব যখন সদ্যোজাত কৃষ্ণকে নন্দালয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন অনন্তদেব তাঁর মাথায় ফণা ধরেছিলেন এবং যমুনা তরঙ্গ ফেনিল হলেও বসুদেবকে যাওয়ার জন্য পথ করে দিয়েছিল। কিন্তু পরশুরাম এখানে ভবিষ্যপুরাণের বশিষ্ট-দিলীপ সংবাদে জন্মাষ্টমী ব্রতকথার জনপ্রিয় কাহিনীটিকেই গ্রহণ করেছেন। আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনাতেই দেখেছি যে এই কাহিনীটি শ্রীকৃষ্ণবিজয় থেকে শুরু করে অন্যান্য বহু কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণ জন্মকথার ভাগবতীয় অংশকে পরাজিত করে ভবিষ্যপুরাণের এই কাহিনীই বাংলা কৃষ্ণকথায় অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

এর পরের ঘটনা থেকে কালিয়দমনের পূর্ব পর্যন্ত কৃষ্ণের অন্যান্য লীলাগুলি কবি ভাগবতের অনুসরণেই বর্ণনা করেছেন। তবে কালিয়দমন অংশে বলরাম কৃষ্ণের স্তুতি করেছিলেন, তা তিনি বাদ দিয়েছেন এবং তার পরিবর্তে—

গরুড় আইল তথা আনন্দিত মোন।
উঠিয়া কালির মাথে নাচে নারায়ণ ॥ (পৃ. ১৯১)

এর আগে কৃষ্ণকিঙ্কর কৃষ্ণদাসের কাব্যেও গরুড়ের প্রসঙ্গ আছে। কালিয়দমন প্রসঙ্গে অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গলকারদের মত এই কবিও জননী যশোদার ব্যাকুল ক্রন্দনের বর্ণনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

পরশুরাম রাসলীলা বর্ণনা ভাগবত অনুযায়ী করলেও ভাগবতের কাহিনীকে ঈষৎ সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছেন। যেমন গোপীদের মুখে কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা[৮৯] কবি বাদ দিয়েছেন। ভাগবতে যে গোপীকে নিয়ে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হয়েছিলেন, পরশুরাম তাঁকে রাধা বলেই অভিহিত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত তাঁর কাব্যেও রাধা এবং চন্দ্রাবলী এক নায়িকা (হেন প্রভু লয়া গেলা রাধা চন্দ্রাবলি ; পৃ. ২৪৬)। ভাগবতকার সেই নামহীনা প্রাধানা গোপী সম্পর্কে বলেছেন—

সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্ব যোষিতাম্।
হিত্বা গোপীঃ কাময়ানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং মাং নয় যত্র তে মনঃ ॥[৯০]

অর্থাৎ, তিনি নিজেকে সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠা মনে করে ভাবলেন, এই প্রিয় কেবল আমাকেই ভজনা করেছেন। সগর্বে তিনি কেশবকে বললেন—আমি নিজের ইচ্ছায় আর চলতে পারি না, যেখানে ইচ্ছা তুমি আমাকে বয়ে নিয়ে যাও ॥

নলিনীবাবু কৃষ্ণমঙ্গল সম্পাদনায় যেটিকে আদর্শ পুঁথি হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাতে রাধার এই গর্বের ভাব প্রতিফলিত না হলেও খণ্ডিত পুঁথি থেকে যে অতিরিক্ত পাঠ উদ্ধার করে দিয়েছেন, তা একান্তই ভাগবতানুসারী—

রাধা লয়া কাননে ফিরএ চক্রপানি।
স্যাম সোয়াগিনি রাধা হইলা মানিনি ॥
মানিনি হইঞা রাধা ভাবে মনে মনে।

মোর সম ভাগ্যবতি নাহি কুনজনে ॥
সভারে ছাড়িয়া কৃষ্ণ মোরে আইলা লয়া।
কৃষ্ণেরে বোলেন রাধা মানিনী হইয়া ॥ (পৃ. ২৪৭)

এরপর কবি ভাগবত বহির্ভূত দোললীলা বর্ণনা করেছেন। এই দোললীলার উল্লেখ পাওয়া যায় পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে, স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে ও গরুড় পুরাণে। বাংলাদেশে চৈতন্যদেবের ধর্ম প্রচারেরও একশো বছর আগে শূলপাণি উপাধ্যায় বসন্তে দোলাযাত্রা অনুষ্ঠানের বিধিকে অবলম্বন করে দোলযাত্রাবিবেক নামে একটি স্মৃতি-নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। মনে হয়, চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে দোল-উৎসবের সূচনা হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত তা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হরিভক্তিবিলাসে দোল ও হোলিকে রাধাকৃষ্ণের সম্পন্ন সম্ভোগের প্রকার ভেদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই উৎসবে বিষ্ণুমূর্তিতে ফাগ দেওয়ার সময় যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, তাতে গোপীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত বনের মধ্যে গোপগোপী-দের সঙ্গে ক্রীড়ারত কদম্ববৃক্ষের নীচে দণ্ডায়মান জগন্নাথের উল্লেখ আছে।

পরশুরাম ছাড়া অন্য কোন কোন কবিও দোললীলাকে নিয়ে স্বতন্ত্র কিছু পালা রচনা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে শঙ্করদাসের রচনাই সব থেকে উল্লেখযোগ্য।[৯১] পরশুরামের কাব্যে কৃষ্ণ ফাল্গুন মাসে কুসুমিত বৃন্দাবনে ফাগুদোল করার ইচ্ছায় ইন্দ্রকে স্মরণ করলেন। ইন্দ্র এলে তিনি তাঁকে দোলমণ্ডপ নির্মাণ করার জন্য বিশ্বকর্মাকে সংবাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। গোবিন্দদাসের কয়েকটি দোললীলার পদ রয়েছে। কিন্তু তাতে এইভাবে কৃষ্ণের ইন্দ্রকে আদেশ করার কোন প্রসঙ্গই নেই।

ইন্দ্রের নির্দেশে বিশ্বকর্মা যমুনাতীরে সুরম্য দোল মণ্ডপ নির্মাণ করলেন। এরপর কৃষ্ণের দোললীলায় যোগ দেওয়ার জন্য দেবতারা দলে দলে উপস্থিত হলেন। দেবতাদের সঙ্গে দোললীলার পর তিনি বৃন্দাবনের অন্যান্য গোপগোপীর সঙ্গেও দোল খেললেন। সবাই দোল খেলে বিদায় নেওয়ার পর সুন্দরী রাধা সখীদের নিয়ে চললেন কৃষ্ণের সঙ্গে ফাগ্ খেলতে। রাধার এক হাতে ফুলধনু এবং অপর হাত প্রিয়ম্বদা সহচরীর হাতে। তাঁর পশ্চাতে যথাক্রমে চন্দ্রমুখি, চিত্ররেখা, কালিন্দি, তারিণী, কাদম্বিনী এবং রাশকেলি প্রভৃতি সখীরা চলেছেন। এই সখীদের নামও রাধার প্রিয়সখীদের নামের সঙ্গে মেলে না। এরপর কৃষ্ণ গোপীদের হৃদয়ে কামবাণ নিক্ষেপ করে তাঁদের সঙ্গে দোল খেলতে লাগলেন। কিন্তু কৃষ্ণ গোপী-দের মাঝখান থেকে রাধাকে তুলে নিয়ে দোলায় তাঁর পাশে বসালে অন্যান্য গোপীরা অপমানিত বোধ করে দোলমঞ্চ থেকে নেমে গলায় ঘট বেঁধে যমুনার জলে ডুবে মরতে চললেন। তখন কৃষ্ণ দোলা থেকে নেমে সবাইকে হাতে ধরে দোলায় বসালেন। কিন্তু এতেও গোপীদের অভিমান দূর হল না। কৃষ্ণ সবাইকে বুঝিয়ে বললেন যে, দোলাসন ছোট হওয়ার জন্যই তিনি এই কাজ করেছেন (পৃ. ২৮৮)। অবশেষে কৃষ্ণ সবাইকে একসঙ্গে নিয়েই দোল খেলতে লাগলেন। এই কবির কাব্যে দোললীলার কাহিনী শুধু বিস্তৃত নয়, বিচিত্রও বটে। নানা আকর থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ক্রমসমৃদ্ধ বাংলা কৃষ্ণকথার একটি বিশিষ্ট পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।

এরপর দানখণ্ডের কাহিনী। এই কবির কাব্যে রাধা নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গোপীদের সঙ্গে দানী কৃষ্ণের কাছে যেতে চেয়েছেন (পৃ. ২৯৩)। বড়াইও রাধার অনুরোধে সানন্দে তাকে সহায়তা করতে রাজী হয়েছে। এই দানখণ্ডের কাহিনীতে কবি শ্রীরূপ গোস্বামীর 'দানকেলিকৌমুদী'কে অনুসরণ করেন নি। অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গলকারদের মত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুরূপ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তবে এই কবির কৃষ্ণকথায় একটি নতুনত্ব হল, তিনি এর সঙ্গে নৌকাখণ্ডের কাহিনীকে একসূত্রে বেঁধেছেন। কবির নৌকালীলা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুরূপ হলেও কথাবস্তুতে কিছু অভিনবত্বও রয়েছে। যেমন—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে, কৃষ্ণ রাধাকেই বলেছিলেন তাঁর বসন ভূষণ পরিত্যাগ করে নৌকার ভার হালকা করতে এবং তারপর মাঝখানে নৌকা ডুবিয়ে মাঝনদীতে রাধার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু এখানে কবি সেকথা বলেন নি, বরং তার কৃষ্ণ অন্যান্য গোপীদের দেখেই কামাকুল হয়েছেন। মথুরার হাটে গিয়ে গোপীদের চতুর্দিকে কৃষ্ণকে দেখার প্রসঙ্গও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নেই। সেখানে গোপীরা আদৌ কৃষ্ণানুরাগিনী নয়। তবে অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে, যেমন— গোপালবিজয়ে অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

দশম স্কন্ধের দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ে কুব্জাকে অনুগ্রহ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কুব্জার কাছে, অনুলেপন কার—এই প্রশ্ন করলে এবং অনুলেপন চাইলে, উত্তরে কুব্জা বলেছিল—"হে সুন্দর, আমি অনুলেপন কার্যে কংসের অভিমত ত্রিবক্রা নাম্নী দাসী বলে প্রসিদ্ধা, সুতরাং আমার অনুলেপন ভোজপতি কংসের অতি প্রিয়। অতএব তোমরা ছাড়া অন্য কেউ রাজার অতি প্রিয় এই অনুলেপনের ব্যবহার-পাত্র হতে পারে না।"[৯২] কিন্তু পরশুরামের কুব্জা কংসের অত্যাচারকে উপেক্ষা করে বলেছে—

কুবজি বোলেন দুটি ভাই জে সুন্দর।
চন্দন লইয়া জাই কংস বরাবর ॥
তবে জদি ইৎসা আছে পরিতে চন্দন।
জে করে শে করুক কংস পর দুইজন ॥ (পৃ. ৩৭২)

রুক্মিণীহরণ প্রসঙ্গে পরশুরাম ভাগবতকে অনুসরণ করেও কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্যসৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তাঁর রাজা ভীষ্মক পরম কৃষ্ণভক্ত। ভাগবতে আছে রুক্মিণী দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের কাছে এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পরশুরাম বলেছেন, তিনি একজন 'পরম আপ্ত ব্রাহ্মণ' (পৃ. ৪১৯)। এটি তিনি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে পেয়েছেন।[৯৩]

স্যমন্তক মণি উপাখ্যানে পরশুরাম ভাগবতকে অনুসরণ করেও একটু সংযোজন ঘটিয়েছেন। যেমন ভাগবতে কৃষ্ণ জাম্ববানের গুহায় গিয়ে ফিরতে দেরী করলে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে শোক প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পরশুরামের কাব্যে রুক্মিণী শুভ লক্ষণ দেখে তাদের আশ্বাস দিয়েছেন (পৃ. ৪৩৬)। অবশ্য পূর্ববর্তী কবি মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়েই আমরা এই নব সংযোজনটুকুর সাক্ষ্য পেয়েছি।

পারিজাত হরণ উপাখ্যান ভাগবতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ার জন্যই বেশীর ভাগ বাঙালী কৃষ্ণমঙ্গলকারেরা বিষ্ণুপুরাণ অথবা হরিবংশ থেকে এই কাহিনী গ্রহণ করেছেন।

পরশুরাম হরিবংশকে অনুসরণ করলেও ভাগবতের সংক্ষিপ্ত কাহিনীটুকু আগেই বলে নিয়েছেন। তারপর আবার হরিবংশের মত তাঁর কাহিনী বিবৃত করেছেন। তবে হরিবংশের তুলনায় তাঁর কাব্যে কিছু স্বাতন্ত্র্যও আছে। পরশুরামের এই কাহিনীতে সমস্ত গোলযোগের মূলে একা নারদই রয়েছেন। হরিবংশে কিন্তু এইভাবে কাহিনীটি নেই। হরিবংশে আছে, নারদ যখন প্রথমে পারিজাত মালা নিয়ে কৃষ্ণের কাছে আসেন, তখন কৃষ্ণ দ্বারকার কিছু দূরে রৈবতক পর্বতে ছিলেন, বৈকুণ্ঠে ছিলেন না। হরিবংশে নারদ সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শান্তিকামী দেবর্ষি, কিন্তু এখানে তাঁকে কলহপ্রিয় ও সব অনর্থের মূল হিসেবে দেখানো হয়েছে। মধ্যযুগের সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই অবশ্য নারদের এই চিত্র। এর আগে কৃষ্ণদাসের কাব্যে আমরা পরশুরামের অনুরূপ কাহিনী পেয়েছি।

দ্বারকাপর্বে ঊষা-অনিরুদ্ধ কাহিনী একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং এতে বৈচিত্র্য সৃষ্টির অবকাশও বেশী। পরশুরাম এই কাহিনী প্রধানতঃ ভাগবত অনুসারেই বর্ণনা করেছেন। তবে অল্প কিছু পরিবর্তনও ঘটিয়েছেন। যেমন, ভাগবতে আছে ঊষা, অনিরুদ্ধকে কখনও চাক্ষুষ দেখেন নি, কখনও তাঁর নাম পর্যন্ত শোনেন নি। কিন্তু একদিন রাত্রে স্বপ্নে অনিরুদ্ধের সঙ্গে তাঁর মিলন হল। অন্যদিকে পরশুরামের কাব্যে আছে, বাণরাজের কন্যা ঊষা শিবদুর্গার পূজা করায়, একদিন পার্বতী শিবের সঙ্গে তাঁর সামনে এসে পূজার কারণ জানতে চাইলেন। ঊষা তখন দুর্গার কাছে তাঁর স্বামী কেমন হবে জানতে চাইলেন। পার্বতী তাঁকে বললেন, পালঙ্কে শুয়ে ঊষা যাকে স্বপ্নে দেখবেন, তিনিই তাঁর স্বামী হবেন। কাহিনীর পরবর্তী অংশেও এই ধরনের কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

আবার, অন্যত্র ভাগবতে আছে যে চিত্রলেখা নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে মোহিত করে ঊষার শয়নকক্ষে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু পরশুরাম বলেছেন, অনিরুদ্ধও স্বপ্নে ঊষার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। স্বপ্নে দেখা যুবতীর জন্য যখন তিনি শোক করছিলেন, সে সময় চিত্রলেখাকে দেখে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। চিত্রলেখা যোগবলে অনিরুদ্ধকে রথে তুলে, আবার আকাশ পথ দিয়ে তাঁকে ঊষার গৃহে নিয়ে গেলেন। এই কথা-অংশ কবি হরিবংশ থেকে সংগ্রহ করেছেন।[৯৪] ভাগবতে আছে, ঊষার গর্ভবতী হওয়ার সংবাদ প্রহরীরা রাজাকে দিয়েছিল। কিন্তু পরশুরাম বলেছেন, ঊষার দাসীরাই রাজা-রাণীকে এই সংবাদ দিয়েছিলেন। এর একটি যুক্তিসঙ্গত কারণও তিনি দেখিয়েছেন —"বনিতার লক্ষন ভালো বনিতা শে জানে।" এই ধরনের আরও ছোটখাটো কিছু পরিবর্তন থাকলেও প্রধানতঃ ভাগবত অনুসারেই কবি এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

নলিনীনাথ দাশগুপ্ত সম্পাদিত যে 'কৃষ্ণমঙ্গল' গ্রন্থটি অবলম্বন করে আমরা আলোচনা করছি, তার ভূমিকায় সম্পাদক বলেছেন, "দেখা যাইবে, বলদেবের যমুনা-কর্ষণের পরে পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজবধ, দ্বিবিদ বধ, বলদেব বিজয়, রাম ও কৃষ্ণ কর্তৃক দেবকীর মৃত পুত্র আনয়ন, বসুদেবের যজ্ঞানুষ্ঠান, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্রাহ্মণের মৃত পুত্র আনয়ন প্রভৃতি ভাগবতের দশম স্কন্ধের ছোটবড় কতগুলি উপাখ্যান পরশুরাম বর্ণনা করিতে বিরত হইয়াছেন।" কিন্তু শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল "দ্বিজ পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল" নামক

প্রবন্ধে[৯৫] বলেছেন—"পৌণ্ড্রক, কাশীরাজাদি বধের কাহিনী অপরাপর পুথিতে পাওয়া যায়।" পুথিটি বরাহনগর পাটবাড়ির ২২৯৫ সংখ্যক পুথি বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। নরনারায়ণ কর্তৃক দ্বারকার ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রদের উদ্ধার-কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে বলেও প্রবন্ধ লেখক জানিয়েছেন। নলিনীবাবু পুথির সমাপ্তি সম্পর্কে বলেছেন "পরশুরাম তাঁহার কাব্যে দশম স্কন্ধের ঊননব্বই অধ্যায়ের প্রথম ভাগের বিবরণ প্রদান করিয়া সমগ্র একাদশ স্কন্ধ হইতে মাত্র আটটি পংক্তি মন্থন করিয়া পুথি সাঙ্গ করিয়াছেন (পৃ. দশ আনা)।" অক্ষয়বাবু এরও প্রতিবাদ করে বলেছেন যে বরাহনগর পাটবাড়ীর পুথিশালায় পরশুরামের প্রায় সম্পূর্ণ একটি পুথি আছে (পুথিসংখ্যা-২২৯৫, পত্রসংখ্যা-২-১৮৪)। তাতে যদুবংশ বৃদ্ধিতে কৃষ্ণের দুর্ভাবনায় দশম স্কন্ধ শেষ হয়েছে এবং পুথিটি শেষ হয়েছে দ্বাদশ স্কন্ধে। সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালার চিত্তরঞ্জন সংগ্রহে একটি পুথিও দ্বিজ পরশুরামের (পুথিসংখ্যা, চি-২২১)। সেই পুথিরও শেষাংশে রয়েছে—

সমুদ্রে দ্বারকা পুরী ডুবিবে এখন।
চলিলা অর্জুন বীর লয়্যা সর্বজন ॥

অক্ষয়বাবুর নিজস্ব সংগ্রহেও পরশুরামের একটি পুথি রয়েছে। তাতেও কৃষ্ণলীলার শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়।

যশশ্চন্দ্রের গোবিন্দবিলাস

যশশ্চন্দ্রের গোবিন্দবিলাসের পুথিখানি বেশ বড়।[৯৬] কাব্যটির মধ্যে বর্ণনার পরিমাণ বেশী। আদ্যখণ্ড, রাধাখণ্ড, দানখণ্ড, অনুরাগ খণ্ড, পৌগণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন খণ্ডে গ্রন্থটি বিভক্ত। বন্দনাংশে কবি গৌরাঙ্গ, সনাতন, রূপ, গোপাল ভট্ট ও জীব গোস্বামীর পরে কৃষ্ণদাসের নাম এবং তারপর বিদ্যালঙ্কারের নাম করেছেন। বন্দনাংশে কবি রাধার বন্দনা করে বলেছেন—

বৃষভানুসুতা বন্দো রসবতি রাধা।
প্রধান প্রকৃতি নাম কৃষ্ণ তনু আধা ॥
প্রেমরসময়ি মূর্তি আনন্দ দাইনি।
অনুপাম রূপগুণ রসিক কামিনী ॥

কবি আরও বলেছেন—

চন্দ্রাবলী আদি আর আছে জত শক্তি।
সভার চরণ বন্দো করি অতিভক্তি ॥

এরপর কবি পিতামাতা ও গুরুপত্নীর বন্দনা করেছেন। তাঁর আর এক নাম ছিল শ্রীহরিদাস। মনে হয়, লেখকের প্রচলিত নাম ছিল হরিদাস দাস। জাতি বৈদ্য। তবে ভণিতায় তিনি সব সময়ই 'যশচন্দ্র' অথবা 'দীণ যশচন্দ্র' নাম ব্যবহার করেছেন।

কাব্যের কাহিনীতে গাভীরূপা ধরণীর ব্রহ্মা সমীপে গুহারী, বসুদেব দৈবকী বিবাহ, কৃষ্ণজন্ম প্রভৃতি প্রচলিত কথাবস্তু স্থান পেয়েছে। তবে বর্ণিত কাহিনীর অধিকাংশই কবি সংকলন করেছেন পদ্মপুরাণ থেকে। যেমন—

যোগমায়াসনে গর্ভবাস যেই রিতে।
তার পরিপাটি কহি শুন একচিতে॥
শ্রী পদ্ম পুরাণে ইহা সুনিল সকল।
ভাগবতে গুপ্ত আছে একথা কেবল॥

কাহিনী বর্ণনায় কবি এত বেশী পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন, যার ফলে কাব্যটি অতিরিক্ত দীর্ঘ হয়ে পড়েছে।

পরশুরাম রায়

এর আগেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একাধিক পরশুরামের অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে 'মাধব সংগীত' রচয়িতা এক পরশুরামের উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সম্পাদিত পুথিটির কথাও বলা হয়েছে। অমিতাভ চৌধুরী সম্পাদিত ও বিশ্ব-ভারতী থেকে প্রকাশিত সেই পুথিটি অবলম্বন করেই আমরা আলোচনা করছি। উভয় কবির কাব্যের মধ্যেই দুজনকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার উপাদান রয়েছে। মাধবসংগীতে কবি তাঁর গুরু মনোহর দাসের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কৃষ্ণমঙ্গলে তা নেই। কৃষ্ণমঙ্গলের কবি আত্মপরিচয় দেন নি। কিন্তু মাধবসঙ্গীতের কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন। এই আত্মপরিচয়ে কবি বলেছেন—

চম্পকনগরী গ্রাম তাহাতে নিবাস ধাম
মিরাসন্দ পুরুষ ছয় সাত॥
লোকনাথ হরি রায় তৎসুত সুবুদ্ধি রায়
তার পুত্র শ্রীমধুসূদন।
দ্বিজকুলে জনমিঞা তাঁহার নন্দন হঞা
বিরচিল কৃষ্ণের কীর্ত্তন॥
পাঞা গুরু উপদেশ কৃষ্ণসেবা সবিশেষ
অনন্ত মহিমা গুণগ্রাম।
আপনি কলম ধরি লিখন করেন হরি
পরশুরামের মাত্র নাম॥

এতে কবি তাঁর পাঁচ পুরুষেরই নাম দিয়েছেন। এরা চম্পক নগরীতে ছ' সাত পুরুষ ধরে বসবাস করেছেন, এ উল্লেখও আছে। অন্য একটি জায়গায় তিনি বলেছেন, ক্ষেত্রি বংশের কুমার শিখর শ্যামের দেশে বসে কবি কাব্য রচনা করেছেন।

সম্পাদক বিশ্বভারতীর বাংলা পুথিশালার যে দুটি পুথি অবলম্বন করে গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন, তার মধ্যে দ্বিতীয় পুথিটিতে আছে—

সংসারে ধনি ধানি ক্ষেত্রিয় শিরোমণি
শিখর শ্যাম অধিপতি।
নৃপতি আশ্রমে দ্বাদশ কন্য গ্রামে
রচিল সংগীত পুথি॥

এ থেকে বোঝা যায়, চম্পকনগরীর অধিবাসী হলেও এই কবি ক্ষেত্রি রাজা শিখর শ্যামের দ্বাদশকন্য গ্রামেই কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি কথিত তাঁর জন্মভূমি চম্পকনগরী

বর্ধমানে অবস্থিত বলে ড. সুকুমার সেন মনে করেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বর্ধমানের বারবনে গ্রামটিকেই দ্বাদশকল্যের অপভ্রংশ রূপ বলে গ্রহণ করেছেন। ভাষাতত্ত্বের বিচারে 'বার' শব্দটির ব্যুৎপত্তি দ্বাদশ শব্দ থেকে হলেও গ্রাম নামের এ হেন পরিবর্তন আমাদের কাছে সংশয়ের, বরং সম্পাদকের মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। মাধব সঙ্গীতের সম্পাদক বলেছেন যে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি থানাতে চম্পাই নগর বলে একটি গ্রাম আছে, এই গ্রামই কবির গ্রাম। কাব্যে ওড়িয়া ভাষার পদ থাকার জন্যই সম্পাদক তাঁর অনুমানকে বাস্তব যুক্তির ওপর দাঁড় করাতে পেরেছেন। কারণ মেদিনীপুরের কাঁথি থানা উড়িষ্যা সীমান্তবর্তী অঞ্চল হওয়ায় এখানকার ভাষায় অনেক ওড়িয়া শব্দ ঢুকেছে। সুতরাং পরশুরামও যদি কাঁথি থানার অধিবাসী হন, তাহলেই তাঁর পক্ষে বাংলা ভাষাভাষী হয়েও ওড়িয়া ভাষায় পদ রচনা করা সম্ভব। এ ছাড়াও মাধব সংগীতের ভাষায় শব্দ প্রয়োগের এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, যা কাঁথি অঞ্চলেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী মহাশয় নানাবিধ অনুমানের ওপর নির্ভর করে কবি পরশুরাম রায়ের গুরু হিসেবে জ্ঞানদাসের বন্ধু 'পদসমুদ্র' সংকলয়িতা বাবা আউল মনোহরদাসকে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু নিশ্চিত প্রমাণ না থাকলেও আমাদের অনুমান সম্পাদক চৌধুরী অপেক্ষা ভিন্ন। আমাদের ধারণায় পরশুরাম রায়ের গুরু মনোহর, শ্যামানন্দ শিষ্য—কেশিয়াড়ী শাখার প্রধান শিষ্য কিশোরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কবি তাঁর গুরুবংশের হিত কামনা করে যে পদরচনা করেছেন, তা উদ্ধৃত হল—

তুমি সে করুণাসিন্ধু অনাথ জনের বন্ধু
মোরা সভে চরণ কিংকরী।
খণ্ডিঞা সকল মায়া মনোহর দাসে দয়া
কর কৃষ্ণ না কর চাতুরী ॥
অনুজ কিশোর দাস তার পুর অভিলাষ
কৃপা কর বৃন্দাবন দাসে।
মাধবদাসের মনে বিলসহ অনুক্ষণে
প্রিয়া যত পরিণত বেশে ॥

অতএব এই বর্ণনা থেকে আমরা পাচ্ছি কবির গুরুরা 'চার ভাই'। শাখা বর্ণনার পুথিতে আমরা কিশোরদাসের উল্লেখ পাই। আর পাই মাধবদাসের বৈষ্ণব বন্দনা।[২৮] আমাদের এই অনুমানের একটি কারণ হল, শ্যামানন্দ এবং শ্যামানন্দ সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি বিস্তৃত ছিল বাংলা এবং উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে (প্রধানতঃ সুবর্ণরেখার দুই তীরে, গোপীবল্লভপুর থেকে সুবর্ণরেখার মোহানা ভোগরাই পর্যন্ত)। বলাই বাহুল্য, ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে এবং কবির উল্লিখিত 'চম্পক নগরী'র সঙ্গে কাঁথির 'চম্পাই নগরে'র সাদৃশ্যে কবি যে ভৌগোলিক সীমার অধিবাসী ছিলেন বলে আমাদের স্বাভাবিকভাবে মনে হয়, শ্যামানন্দ সম্প্রদায়ের সংগে সেই অঞ্চলেরই যোগাযোগ বলে কবির গুরুকে কেশিয়াড়ী শাখার অন্তর্ভুক্ত কিশোর দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলেই মনে হয়। এ ছাড়াও, অন্য যে কারণটি আমাদের মনে প্রাধান্য

লাভ করে, তা হল শ্যামানন্দ সম্প্রদায়ের মঞ্জরীভাবের সাধনার বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি। উদ্ধৃত অংশে 'মোরা সভে চরণ কিঙ্করী'র মধ্যে মঞ্জরীভাব যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, সেই একই প্রতিফলন আরও উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়েছে কবির কাব্যে রাধাকৃষ্ণের পূর্বে ললিতা বন্দনায়। অবশ্য এর পরেও বিতর্ক থেকে যায়। এ কেবল একটি অনুমানের পাশে আর একটি সঙ্গততর অনুমানের সংযোজন।

শ্যামানন্দ সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। আনুমানিক ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দে ইনি লোকান্তরিত হন। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইনি মেদিনীপুর এবং উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করেন। এঁর কাছে দীক্ষিত ব্যক্তিরা তাঁর সমকালেরই লোক। দীক্ষিতের দীক্ষিতগণকে বিশ তিরিশ বছরের কনিষ্ঠ ধরলেও পরশুরামকে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কবি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ললিতা বন্দনাটি সম্ভবতঃ কবির নিজের রচনা। শ্রীরূপ গোস্বামী ললিতাকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, এবং রাধাকৃষ্ণলীলা কার্যের সহায়িকারূপে যেভাবে ললিতাকে কল্পনা করা হয়েছে, কবি সেইভাবেই 'রাধা প্রসাধন বিধান কলা প্রসিদ্ধা' ললিতার বন্দনা করেছেন।

কাব্যের প্রথম অধ্যায়ে গৌরাঙ্গবন্দনার পর কবি বিশিষ্ট বৈষ্ণবদের বন্দনা করেছেন, এরপর ললিতা ও তারপর রাধাকৃষ্ণের বন্দনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরীক্ষিতের উপাখ্যান দিয়ে কাহিনী শুরু হয়েছে। তবে এই কাব্যটির বিষয়বস্তু অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের তুলনায় একটু পৃথক ধরনের। পরীক্ষিৎ উপাখ্যানের পরই এখানে রয়েছে বাৎসল্য ও সখ্যলীলার বর্ণনা। কৃষ্ণের প্রতি জননী যশোদার অকৃত্রিম বাৎসল্যকে কবি নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। কবি বাৎসল্যকে বলেছেন 'রসভক্তি নাম এই প্রথমা পিরিতি'। এই বাৎসল্যরসবশেই যশোদা 'অখিল লোকের কামকল্পতরু' কৃষ্ণকে নিজের অধীন সন্তান মনে করেন। বয়স্ক গোপগোপীদের পদধূলি কৃষ্ণের মাথায় দিয়ে তাঁদের অনুরোধ করেন যে, তাঁরা যেন কৃষ্ণকে আশীর্বাদ করেন, যাতে সে কুশলে থাকে। অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কপালে তরল গোময়ের তিলক পরিয়ে দেন। এই অংশে কবি তাঁর নিজস্ব কল্পনায় বাৎসল্য স্নেহে ধরা দেওয়া কৃষ্ণের মধুরলীলা বর্ণনা করেছেন। যশোদা কৃষ্ণকে দুধ খাওয়াতে চান, কিন্তু কৃষ্ণ খেতে চান না। অগত্যা যশোদা বললেন, দুধ খান না বলেই কৃষ্ণের চুল বড় হয় না, অন্যদিকে বলরামের পিঠে দীর্ঘ বেণী দোলে। মায়ের কথা শুনে চুল কতখানি বাড়ছে পরীক্ষা করার জন্য চুলে বাঁ হাত রেখে কৃষ্ণ দুধ খেতে লাগলেন। কিন্তু চুল বড় হল না দেখে কৃষ্ণ গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কান্না শুনে রোহিণী সেখানে এসে কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিজের বেণী তার মাথার ওপর তুলে দিলেন। তখন—

যশোদা বলেন এই দেখ যদুরায়।
বাড়িল তোমার বেণী ধরণী লোটায় ॥ (পৃ. ২৭)

কৃষ্ণকথার মূল অবলম্বন পঞ্চরসের একটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি এইভাবে কথাবস্তুতেও অভিনবত্ব এনেছেন। এই প্রসঙ্গে কবি ভাগবতের 'ব্রহ্মা মোহনে'র কথাও

বলেছেন। ব্রহ্মা গোপবালক ও গোবৎসদের লুকিয়ে রাখলে একা কৃষ্ণই তাদের সবার রূপ ধারণ করে লক্ষ লক্ষ গোকুল-গোপীর বাৎসল্য লাভ করেছিলেন।

এরপর কবি ভাগবতের দশম স্কন্ধ, রসামৃতসিন্ধু, রসসুধাকর, ললিতমাধব প্রভৃতি থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে সখ্যরস আলোচনা করেছেন। সখার বিভিন্ন বিভাগ এবং সেই সমস্ত বিভাগের সখাদের নাম ও আচরণ কবি বিবৃত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চদশ সখার প্রধান বিজয়ের মাতা অম্বিকা কৃষ্ণের ধাত্রীমাতা। মধুমঙ্গল ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের দুজন বিদূষক হাসাঙ্ক ও পুষ্পাঙ্কের নানাবিধ আচরণও কবি বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়েও কবি বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ভক্তিরসোদয়, ভক্তিকল্পলতিকা, ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু, ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ভক্তিতত্ত্ব ও গোপীতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে রাজা পরীক্ষিত শুকদেবের কাছ থেকে রাসোৎসব কথা শুনতে চেয়েছেন। শরতের শেষে হেমন্ত ঋতুতে কৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে নানাবিধ ক্রীড়া করার পর সন্ধ্যাবেলায় ফেরার সময় বাঁশী বাজাতে লাগলেন। সেই ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে গোপনারীরা ছুটে এলেন। কৃষ্ণ যাঁর দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করলেন, তিনিই নিজেকে ধন্য মনে করলেন। এরপর কৃষ্ণ ও তাঁর সখারা নন্দের গৃহপ্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে কবি নন্দরাজের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা মনোজ্ঞ—

হৃষ্ট পুষ্ট গোপরাজা দিব্য পরিপাটি।
গজস্কন্ধ লম্বোদর হাথে স্বর্ণলাঠি॥
তিল তন্ডুলিত কেশে বেশ মনোহর। (পৃ. ৬১)

এরপর কৃষ্ণের সেবা বর্ণনা। এগুলি ভক্তিরসামৃত সিন্ধু অনুযায়ী বর্ণিত। রক্তক কৃষ্ণের পদসেবা করল, পত্রকের হাতে সুবর্ণের ঝারিতে কৃষ্ণের জন্য জল, রসালের হাতে আর্দ্র গামছা, তিনজনে মিলে কৃষ্ণের দুটি পা ধুইয়ে দিল। মধুব্রত নামে সখা কাছে বসে কৃষ্ণের রম্যবেশ অল্প অল্প করে খুলে দিল। অম্বিকা ও কলিম্বা নামে কৃষ্ণের দুই ধাত্রী কাছে এসে পরিধেয় বসনাঞ্চলেই কৃষ্ণের সর্বাঙ্গ মুছিয়ে দিল। চন্দ্রহাস পীত বস্ত্র এনে দিল, সুবিলাস কৃষ্ণকে সাজিয়ে দিল, প্রেমকর্ণ সর্বাঙ্গে প্রসাধন লেপন করল। বকুল কনক কঙ্কণ পরিয়ে কপালে চূড়া বেঁধে দিল। রসদ ও শারদ বিচিত্র প্রসাধনে কৃষ্ণকে সাজিয়ে দিল। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপ তাঁর সন্ন্যাসপূর্ব সামন্ততান্ত্রিক জীবনের অভিজাত ঐশ্বর্যময় পরিবেশে কৃষ্ণকে স্থাপিত করেছেন। তাঁর শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকাও এই উদ্দেশ্যেই রচিত। কবির কাব্যে তারই অনুসরণ। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়, কৃষ্ণের প্রতি মাতা ও ধাত্রীমাতাদের বাৎসল্যভাব, সখা ও ভৃত্যদের সখ্য ও সেবাভাবের বর্ণনা থাকলেও কবি কৃষ্ণের বাল্যলীলার অতি পরিচিত ভাগবতীয় কাহিনীগুলিকে বাদ দিয়েছেন। পুতনাবধ, যমলার্জুন উদ্ধার, গোবর্ধন ধারণ ইত্যাদি উপাখ্যানও এখানে অনুপস্থিত। বিষয়বস্তু ও কাহিনীর উপস্থাপনায় কবি এখানে অন্যান্য কৃষ্ণ-মঙ্গলকারদের তুলনায় মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন।

এরপরই কবি রাসলীলার কাহিনী আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এই কাহিনী সম্পূর্ণ

ভাগবতানুরূপ নয়। কৃষ্ণ মায়ের হাতের পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভোজন করে শয়ন মন্দিরে পর্যঙ্কে বসে কর্পূর ও পান গ্রহণ করলেন। পূর্ণিমার নক্ষত্রবেষ্টিত চাঁদ ও কুন্দ, জাতি, যূথীর সুগন্ধে তাঁর মনে মদন জাগল। যোগমায়ার আশ্রয় নিয়ে তিনি আকাশে চাঁদকে স্তম্ভিত করলেন। এরপর কৃষ্ণ শয্যাত্যাগ করে নগরের ভেতর দিয়ে ছায়ায় অঙ্গ মিলিয়ে চলতে লাগলেন। তাঁর অঙ্গে কুঙ্কুম চন্দন বিলিপ্ত ও গলায় চম্পকমালা। রাধার বর্ণের সঙ্গে চম্পকের সাদৃশ্য আছে, তাই কৃষ্ণ রাধার কথা মনে করে অধীর হয়ে পড়েছেন। ভাগবতে কৃষ্ণ বংশীধ্বনি করে গোপীদের আহ্বান করেছিলেন এবং বাঁশীর আকর্ষণে উদ্‌ভ্রান্ত গোপীরা সব ফেলে ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু এখানে কৃষ্ণই রাধার জন্য ব্যাকুল হয়ে যমুনার কূলে ছুটে এসেছেন। এখানেও কৃষ্ণের যে মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে, তা ভাববিভোর চৈতন্যেরই মূর্তি, কৃষ্ণমঙ্গলে ও পদাবলী সাহিত্যে যার পুনঃ, পুনঃ আবির্ভাব। এখানে কবির যে পদ দুটি সন্নিবেশিত হয়েছে, তার সৌন্দর্যও অন-স্বীকার্য। কালিন্দীর কূলে কৃষ্ণের সঙ্গে মদনের ও রতির দেখা হল। তাঁদের কাছে কৃষ্ণ রাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করলেন। রাধাপ্রেমের এই শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার জন্য কবি বিল্বমঙ্গলের কাব্য ও মথুরামাহাত্ম্য থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। কৃষ্ণ রাধাকে প্রথম দেখেছেন কালিয়দমনের দিন (পৃ. ৭৫-৭৬)। কৃষ্ণ বলেন, রাধার জন্যই তাঁর বৃন্দাবনে বাস, রাধা ছাড়া তিনি ব্যর্থ। সুতরাং রতির কাছে তাঁর অনুরোধ—'অবিলম্বে হয় যেন রাধার মিলন' (পৃ. ৭৭)। রতি এবং কাম নিজেদের অক্ষমতা জানিয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে রাধা-বিরহী কৃষ্ণের অবস্থা বর্ণনা করলেন। ব্রহ্মা রতি এবং কামের সঙ্গে কৃষ্ণের কাছে এসে তাঁর বন্দনা করলেন। কৃষ্ণ ব্রহ্মার কাছে রাধা ও গোপীতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বললেন, পরবর্তীকালে এই প্রেমের প্রকাশের জন্য তিনি নবদ্বীপ নামক স্থানে অবতার হয়ে দ্বিজকুলে জন্মাবেন।

দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গলকারেরা যেখানে তত্ত্বকে বাদ দিয়ে ভাগবতের কাহিনী ছেঁকে নিয়েছেন, এই কবি সেখানে পরিচিত কাহিনী বাদ দিয়ে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য নবতর কাহিনীর সৃষ্টি করেছেন। এমনকি চৈতন্যাবির্ভাবের ঘটনাকেও কবি বৈষ্ণব তত্ত্ব প্রকাশের সঙ্গে গ্রথিত করেছেন। তাঁর কাব্যে তত্ত্ব মুখ্য এবং কথা গৌণ হলেও, কথা-অংশগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক ও ভিন্নধর্মী হওয়ার জন্য বাংলা কৃষ্ণকথার বিকাশে নতুন তাৎপর্য এনে দিয়েছে। সম্পূর্ণ তত্ত্ব আশ্রয় করে এই ধরনের বৈষ্ণব কাব্য রচনার প্রয়াস খুবই বিরল। বাংলা কৃষ্ণকথার সম্বল শুধু পূর্বপ্রচলিত কাহিনীগুলিই নয়, তত্ত্বকে জনমুখী করার প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে সৃষ্ট এই সমস্ত অভিনব কাহিনী-গুলিও বটে।

পঞ্চম অধ্যায়ে মদন-রতি, বড়ায়ি তথা পৌর্ণমাসীর কাছে গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে যাতে রাধার মিলন হয়, সেই ব্যবস্থা করে দিতে বললে আনন্দিত বড়ায়ি কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হলেন। এই বড়ায়ি একাধারে পৌর্ণমাসী ও বড়ায়ি। ইনি নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। ব্রজপুরের বালবৃদ্ধযুবা কেউই তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারে না। এই কবি বৃষভানু রাজার দুই কন্যার কথা বলেছেন, একজনের নাম রাধা এবং অন্যজন মদনমঞ্জরী। রাধার মায়াপতির নাম অভিমন্যু। রাধার মায়াপতির কথা রূপ গোস্বামীর 'ললিতমাধব' নাটকে আছে। কিন্তু রাধার ভগ্নী মদনমঞ্জরীর নাম এর

আগে আমরা কোথাও পাই নি। সম্ভবতঃ কৃষ্ণকথায় এটিও কবির নিজস্ব সংযোজন। কবি' শ্রীরাধিকা-কুলমন্ত্র' অনুযায়ী রাধার শ্বশুরগৃহের পরিজনগণের নাম করেছেন (পৃ. ১০০)। অভিমন্যুর পিতার নাম প্রিয়মন্য মাতার নাম জটিলা, কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম দুর্মর্দ এবং ভগিনীর নাম কুটিলা।

কৃষ্ণ বড়ায়িকে রাধার সঙ্গে মিলনে দূতীয়ালি করতে বললে, বড়ায়ি প্রথমে রাজি হয় নি। কারণ রাধার শ্বশুরকুল ও পিতৃকুলের পরিজনেরা সর্বদাই তাঁকে পরম যত্নে ঘিরে থাকেন। শুধু তাই নয়, রাধা আবার মিতভাষিণীও বটে। অবশেষে বড়াই কৃষ্ণকে সহায়তা করতে রাজী হয়েছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখি, রতি-কাম গোকুল নগরে প্রবেশ করে প্রতি গৃহে রসবতী যুবতীর প্রতি পুষ্পবাণ নিক্ষেপ করেছেন। তাঁরা সবাই কৃষ্ণের কথা ভেবে ব্যাকুল হয়ে বড়ায়ির শরণ নেওয়া স্থির করলেন। এদিকে বড়াই রাধার কাছে গিয়ে কৃষ্ণের নাম করা মাত্রই রাধা আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন। রাধা-কৃষ্ণ লীলায় প্রেমসহায়িকা রূপে বড়াই তথা পৌর্ণমাসী চরিত্রের সাক্ষাৎ আমরা বহু আগে থেকেই পেয়েছি। কিন্তু পৌরাণিক মদন ও রতি চরিত্রের উপস্থিতি আমরা এই প্রথম দেখলাম। এটিও কৃষ্ণকথায় অভিনব। সপ্তম অধ্যায়ে কৃষ্ণের রূপের বর্ণনা শুনে মুগ্ধ রাধা চিত্রিনীকে কৃষ্ণের ছবি আঁকতে বললেন।

অষ্টম অধ্যায়ে চিত্রপটে কৃষ্ণের রূপ দেখে আত্মবিস্মৃতা রাধার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। এরপর কবি 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু' থেকে কৃষ্ণের বাঁশীর সুরের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন (পৃ. ১৮৯)। আর রাধার প্রতিক্রিয়া কবি যেভাবে রূপকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন, তা স্পষ্টতঃই গোবিন্দদাসের প্রভাবের কথা মনে করিয়ে দেয়। লজ্জারূপ নৌকায় চেপে মান পালিয়ে গেল; শীলের যে প্রাচীর রাধাকে ঘিরে ছিল, তা প্রেমের তরঙ্গে ভেসে গেল, সঙ্গের গোপীদের অস্তিত্ব রাধার কাছে প্রেমস্রোতে ভাসমান পুঞ্জ পিপীলিকার মত মনে হল। এইভাবে—

> প্রেমের তরঙ্গে রাই মগ্ন হঞা ভাসে।
> কাল কলঙ্কের কুটি মিলাইল বাসে ॥ (পৃ. ১৮০)

নবম অধ্যায়ে কবি বড়াই-এর মুখে 'উজ্জ্বলনীলমণি' অনুসরণে রাধার মহাভাব ব্যাখ্যা করেছেন।

দশম অধ্যায়ে চন্দ্রাবলীর এক সখী পদ্মাবতী রাধার এই অবস্থার কথা চন্দ্রাবলীর কাছে গিয়ে বিবৃত করলে চন্দ্রাবলী নিজে রাধার কাছে এসে কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু চন্দ্রাবলী চলে যাওয়ার পর রাধা সখীদের ডেকে বললেন—

> সুবেশ করিঞা সভে চল বৃন্দাবন।
> ভেটিব আনন্দে আজ নন্দের নন্দন। (পৃ. ২১০)

কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে এবং রাধার আহ্বানে গোপীরা যে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়েছে। তাদের সমস্ত গৃহকর্ম বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। এখানে কবি ভাগবতকে অনুসরণ করলেও ভাগবতের অতিরিক্ত কিছু কল্পনাও সংযোজিত করেছেন। গোপীদের ভ্রান্তি যেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার কথাই মনে করিয়ে দেয় (পৃ. ২১১)।

ভাগবতে আছে একজন গোপীকে তার স্বামী কৃষ্ণের কাছে যেতে নিবারণ করায় সে কৃষ্ণের ধ্যান করে দেহত্যাগ করল। এই শ্লোকটিকে অবলম্বন করে কবি একটি কাহিনীই নির্মাণ করে ফেলেছেন। বিশারদা নাম্নী এক গোপযুবতীও কৃষ্ণের বাঁশী শুনে অভিসারে বেরিয়ে পড়ার উদ্যোগ করল। তার স্বামীর নাম নিঃশঙ্ক। সে পথ আগলে বিশারদাকে তর্জন করে যেতে নিষেধ করল। বিশারদা কৃষ্ণের বীরত্বপূর্ণ নানা কীর্তিকলাপের কথা বলেও তার মনের পরিবর্তন ঘটাতে পারল না। তখন বিশারদা বলল—

শরীর ছাড়িঞা মোর আগে গেছে প্রাণে ॥
কুলশীল লাজ ভয় গেল তার সনে ॥ (পৃ.২১৬)

তখন নিঃশঙ্ক তাকে ঘরের ভেতর রেখে দ্বারদেশে কুলুপ এঁটে দিল। বিশারদা নিজ স্থূল দেহ পরিত্যাগ করে কৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হল। বিশারদার অবস্থায় অন্যান্য যে সব গোপীদের গুরুজন জোর করে কৃষ্ণমিলন থেকে নিবৃত্ত রেখেছিল, তারাও মুক্ত হল। তারপর তারা কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখল—

দেখিল সে বিশারদা আছে কৃষ্ণসনে ॥
হাস্য লাস্য লীলারঙ্গ নয়ন নাচনি।
পরিচয় লহে যেন পরমকামিনী ॥ (পৃ.২৩৫)

দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথমে কৃষ্ণ গোপীদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের যে উপদেশ দিয়েছেন এবং প্রত্যুত্তরে গোপীরা যা বলেছেন, তা ভাগবতানুরূপ। তাদের উত্তরে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, যে হেতু তাঁরা রাধার সখী, তাই রাধার তুল্য। এদের আগমনে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। এর আভাষ অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণের মধ্যেই পেয়েছি। সেখানে কৃষ্ণ রাধাকে তুষ্ট করার জন্য গোপীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তবে মাধবসঙ্গীতের কৃষ্ণ গোপীদের প্রতি অনুযোগও করেছেন—

তোমরা সজনী সঙ্গী প্রাণসখী হঞা।
কেমনে আইলা কুঞ্জে রাধারে ছাড়িয়া ॥ (পৃ.২৪৪)

বলা বাহুল্য, এটিও কবির নিজস্ব সংযোজন। গোপীরা বললেন, রাধা তাঁদের আগে পাঠিয়ে দিয়ে পরে নিত্যসখীদের সঙ্গে আসছেন। একথায় সন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে রাধার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকলেন। এই সময়ে পদ্মাবতী, শ্যামা, ভদ্রা, গোপালিকা, তারা, চিত্রা, সুচন্দ্র, শালিকা, ইন্দ্রাবলী, তরলাক্ষী, বিলাসমঞ্জরী প্রভৃতি একাদশ যূথেশ্বরীর সঙ্গে চন্দ্রাবলী কুঞ্জে এলেন। চন্দ্রাবলীকে দেখে কৃষ্ণ দূর থেকে রাধা ভেবে সম্ভাষণ জানিয়ে কাছে গেলেন। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে চন্দ্রাবলী কৃষ্ণকে তিরস্কার করে বললেন—

সৌভমা আমার নাম খ্যাতি চন্দ্রাবলী।
সুন্দরী সমাঝে স্তুতি কর রাধা বলি ॥
নক্ষত্রের নাম রাধা নাহি শব্দবোধ। (পৃ. ২৪৬)

এই সময় ভদ্রা নাম্নী এক সখী কৃষ্ণকে গঞ্জনা দেওয়ার জন্য চন্দ্রাবলীকে তিরস্কার করলেন। এর ভাবটি কবি 'হাস্যার্ণবে'র একটি শ্লোক থেকে গ্রহণ করেছেন (পৃ. ২৪৭)।

এদিকে চন্দ্রাবলীও গোপিকাদের সমস্ত কথোপকথন, রাধা দূর থেকে তান্ত্রিকীর মন্ত্রবলে জানতে পারলেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে রাধা কুঞ্জে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। কৃষ্ণ নামে ও কৃষ্ণ প্রসাধনে প্রসাধিতা রাধার আনন্দিত প্রেমময় অভিসারযাত্রার বর্ণনা কবির লেখনীতে প্রাণময় হয়ে উঠেছে (পৃ. ২৭১)। রাধার চরণ স্পর্শলাভের জন্য ধরণী কাতর হলেন।

ধরণীর এই কাতর হওয়া কিন্তু কবি আলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহার করেন নি। তিনি এখানে ধরণী চরিত্রই সৃষ্টি করেছেন। এটিও কবির নিজস্ব কল্পনা। এইভাবে তিনি আর একটি নতুন কাহিনীও সৃষ্টি করে তাঁর কৃষ্ণকথার অন্যতম উদ্দেশ্য কৃষ্ণ ও চৈতন্যের অভিন্নত্ব বর্ণনা করেছেন। ধরণী চরিত্রের এই পরিকল্পনা কবির কাব্যে নাটকীয় ও কবিত্বময়। রাধার বিরহ সহ্য করতে না পেরে ধরণী শরীরী হয়ে সখীর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তিনি বিশাখার কাছে পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্ত, মহাপ্রলয়ের ইতিহাস, ব্রহ্মার জন্ম, বরাহরূপী বিষ্ণুর উপাখ্যান প্রভৃতি বিবৃত করেছেন। বিষ্ণু ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করতে আদেশ দিলে, ব্রহ্মা বললেন যে পৃথিবী মনের দুঃখে পাতালে প্রবেশ করেছেন। তখন বিষ্ণু পাতাল থেকে পৃথিবীকে নিজের কোলে তুলে নিলেন। পৃথিবী অসুরের অত্যাচার সহ্য করার অক্ষমতা জানালে, বিষ্ণু বললেন যে ধরণীর দুঃখিত হওয়ার কারণ নেই। ধর্মসংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। দ্বাপরে যমুনার তীরে তিনি সাঙ্গো পাঙ্গ নিয়ে বিহার করবেন এবং কলিযুগে তিনিই আবার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হবেন। ধরণী সেই থেকে দ্বাপর যুগে রাধা এলে তাঁর চরণস্পর্শের আশায় দিন গুনছেন। কিন্তু—

> ভুবি না পরশে যদি রাধার চরণ।
> এতকাল ক্লেশ পাই কিসের কারণ॥ (পৃ. ২৭৮)

প্রত্যুত্তরে বিশাখা তাঁকে বললেন, তাঁরা নন্দের নন্দন কৃষ্ণ ছাড়া আর কাউকেই চেনেন না। এরপর সখীরা রাধাকে নিয়ে কুঞ্জের দিকে চলে গেলেন। ধরণী বিমর্ষভাবে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এই সময়ে দৈববাণী হল—

> শ্রীনন্দনন্দন প্রভু নিকুঞ্জ কাননে।
> মহারস রসোচ্ছব রাধিকার সনে॥
> রভসসম্পদে গোপী সব পাসরিবে।
> চরণ চারণে চারু অঙ্গসঙ্গ পাবে॥ (পৃ. ২৭৯)

এই আশ্বাস পেয়ে ধরণী হৃদয়ে ভরসা পেলেন এবং কবিরও গোপীপ্রেম তথা রাধা-প্রেমের গরিমা প্রকাশ করা হল। চতুর্দশ অধ্যায়ে চন্দ্রাবলীও অহঙ্কার ত্যাগ করে রাধার মহিমা স্বীকার করে তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমে মিলিত হয়েছেন। এরপর কালিন্দীর কূলে কল্পতরুর নীচে কৃষ্ণকে দেখা গেল। তাঁর গলায় বনমালা, মাথায় ময়ূর পাখার চূড়া, অধরে মোহন বাঁশী এবং তাঁর অঙ্গের বসন যেন স্থির বিদ্যুৎ। চন্দ্রাবলী কৃষ্ণের রূপে মুগ্ধ হয়ে নিজের আবেগ দমন করার জন্য 'আপন দশনে রহে অধর দংশিঞা'। এরপর রাধা এবং কৃষ্ণ পরস্পরকে দেখে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণ চাতুরী করে এমন ভাবে দাঁড়ালেন, যাতে তাঁর চূড়ার ছায়া রাধার

চরণে পড়ে। রাধাও কম বুদ্ধিমতী নন। রাধা নিজের গলার মুক্তাহার ছিঁড়ে ফেললেন এবং ভূমিতে সেই মুক্তাগুলি ছড়িয়ে পড়লে রাধা 'কুড়াবার ছলে করে কানুরে প্রণাম'। এরপর প্রতি কুঞ্জে প্রতিটি গোপী পৃথক পৃথক ভাবে কৃষ্ণকে লাভ করলেন। সবশেষে রাধাকৃষ্ণের বিবাহ হল। এইখানেই কাহিনী শেষ।

মাধব সঙ্গীতের এই কাহিনীটি অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গল থেকে পৃথক। অন্যান্য কবিরা তত্ত্ব বাদ দিয়ে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী ও লৌকিক কাহিনীকে কখনও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত করে পরিবেশন করেছেন। অন্যদিকে এই কবি কাহিনী অংশকে বাদ দিয়ে তত্ত্বাংশকেই গ্রহণ করেছেন এবং এই তত্ত্বাংশকে ব্যাখ্যা করার জন্য নিজে কাহিনীর সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাব্যে প্রধান এবং অপ্রধান যে চরিত্রগুলি তিনি সৃষ্টি করেছেন, সেখানেও কবির কল্পনার অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ, বড়াই, চন্দ্রাবলী ও অপ্রধান বিশারদা চরিত্র কবির উচ্চস্তরের চরিত্রচিত্রণ দক্ষতার পরিচায়ক। কিন্তু কাব্যের মধ্যে কবির প্রভূত পাণ্ডিত্য, সসম্ভ্রম প্রগাঢ় ভক্তি, কাহিনী বয়ন নৈপুণ্য ও চরিত্রচিত্রণ দক্ষতা প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনীর মত এই তত্ত্বপ্রাধান্যের প্রবণতাও কৃষ্ণমঙ্গলের বিষয়বস্তু হিসেবে খুব বেশী আদৃত হয় নি।

ভবানন্দের হরিবংশ

ভবানন্দের 'হরিবংশ' কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দাবী করে। ব্যাপক ভাগবত অনুসরণের যুগে এই কবি ভাগবতের অনুসরণ কিংবা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভাবধারা স্বীকরণ কিছুই করেন নি। উপরন্তু বহু পূর্ববর্তী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রায় আদিরসসর্বস্ব লোকায়ত ধারাকেই অনুসরণ করেছেন।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে 'হরিবংশ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। ছয়টি পুঁথি অবলম্বন করে 'পদকল্পতরু' সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় এর পাঠ প্রস্তুত করেছেন এবং গ্রন্থখানি সম্পাদনাও করেছেন। এই গ্রন্থটি অবলম্বন করে আমরা ভবানন্দের হরিবংশ আলোচনা করব। ছয়খানি পুঁথি ধরে গ্রন্থ সম্পাদিত হলেও, কোন পুঁথি থেকেই কবির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। কেবল দু এক জায়গায় কবি নিজেকে 'শিবানন্দ সুত' বা 'দীন ভবানন্দ' বলেছেন। পুঁথিটির কথাবস্তুর বৈশিষ্ট্য এবং ভাষাভঙ্গী ইত্যাদি লক্ষ্য করে সম্পাদক কবিকে পূর্ববঙ্গের কবি এবং তাঁর কাল ষোড়শ শতাব্দী বলে স্থির করেছেন। কিন্তু যে পুঁথিগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলির মধ্যে প্রাচীনতম পুঁথির লিপিকাল ১০৯৬ বঙ্গাব্দ বা ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দ। এ থেকে ড. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় অনুমান করেছেন যে, কবি সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বর্তমান ছিলেন।[১০০] ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মত যে যুক্তিসঙ্গত ও যথার্থ, পরবর্তীকালে ড. সুখময় মুখোপাধ্যায় পরিবেশিত আর একটি তথ্যে দৃঢ়তর হয়েছে।[১০১] তথ্যটি হল ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত **Aspects of Early Assamese Literature** গ্রন্থে (**Page-248**) **U. C. Lekharu** হরিবংশের লেখক হিসেবে **"One Bhavananda Misra son of Sivananda"**-র নাম করেছেন। ভবানন্দ যে মিশ্র উপাধির লোক, তা প্রথম এইখানেই জানা গেল। ইনি ভবানন্দের

সময় সম্পর্কে বলেছেন, "In his Govinda Carita the poet refers to the patronage of Candranarayana, king of Darrang (1565-1582 Saka)"। সুতরাং ভবানন্দ ১৬৪৩ খ্রীস্টাব্দ ও ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই বর্তমান ছিলেন।

ভবানন্দ তাঁর কাব্যের প্রায় সমস্ত পদের ভণিতাতেই বলেছেন, ব্যাসের হরিবংশ অবলম্বন করে তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু সংস্কৃত খিল হরিবংশের বিষয়-বস্তুর সঙ্গে এই কাব্যের বিষয়বস্তুর কোন মিলই নেই। আর 'হরিবংশ' নামের অন্য কোন কাব্য যদি থেকে থাকে, তাহলে তার সন্ধান অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি। এই কাহিনীর পরিকল্পনা পুরাণের রীতিতে হলেও কথাবস্তু সম্পূর্ণ লৌকিক।

হরিবংশের কাহিনী শুরু হয়েছে ব্যাস জনমেজয়ের কথোপকথন দিয়ে। ব্যাসের মুখে জন্মেজয় "চারিবেদ চৌদ্দ শাস্ত্র যতেক কাহিনী" শুনে বিস্তৃতভাবে হরিবংশ শুনতে চাইলেন। রুক্মিণী, জাম্ববতী, কালিন্দী, সত্যভামা প্রভৃতি অভিজাত মহিষীদের ছেড়ে কৃষ্ণ কেন গোপীদের প্রেমের অধীন হয়েছিলেন, রাজা তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে ব্যাসদেব হরিবংশের উপাখ্যান বিবৃত করলেন। অসুর-বধের জন্য বিষ্ণু বসুদেব দেবকীর সন্তানরূপে জন্মাতে মনস্থ করে লক্ষ্মী সরস্বতীকেও তাঁর সঙ্গে অবতার হতে বললেন। কিন্তু লক্ষ্মী পূর্বে অবতার দেহে নিজের দুঃখ স্মরণ করে মর্ত্ত্যাবতরণে অনিচ্ছুক হলে, বিষ্ণু বললেন—

তুমি দুই বিনে আমার নাহিক জীবন ॥
তুমি দুই বিনে প্রিয়া কে আছে আমার।
হেন দুষ্ট বাক্য প্রিয়া না বোলিহ আর ॥
তিলেক না দেখি যদি তুমি দুই-জন।
সকল সংসার ব্যর্থ অসার জীবন ॥ (পৃ. ৩)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এবং অন্যান্য সর্বত্র লক্ষ্মীর অবতার হওয়ার কথা আছে। কিন্তু সরস্বতীর অবতার হওয়ার প্রসঙ্গ কোথাও নেই। এটি কবির নিজস্ব কল্পনা। বিষ্ণু আরও বললেন, এবার লক্ষ্মীকে বেশীদিন বিরহ সহ্য করতে হবে না। লক্ষ্মী পনেরো কলায় তিলোত্তমা অর্থাৎ রাধা হবেন এবং বাকী আর এক কলায় রুক্মিণী হবেন। এবার আর তাঁকে সীতা অবতারের মত পাতাল প্রবেশ করতে হবে না, অথবা অগ্নি পরীক্ষাও দিতে হবে না। এবার তিলোত্তমা তথা রাধারূপে তিনি বিষ্ণুর শরীরে লীন হয়ে যাবেন এবং আর এক কলা অর্থাৎ রুক্মিণীর গর্ভে কামদেব জন্মগ্রহণ করবেন। তখন লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর কাছ থেকে কামদেবের জন্মকথা শুনতে চাইলেন। বিষ্ণু তাঁর কাছে মদন ভস্মের কারণ, শিবের বিবাহ ও তারকাসুর বধের কাহিনী বিবৃত করলেন।

এরপর কৃষ্ণের জন্ম হল এবং বসুদেব তাঁকে গোকুলে রেখে এলেন। লক্ষ্মী পনেরো কলায় বৃষভানু কন্যারূপে এবং এক কলায় ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। উপযুক্ত বয়সে রাধার সঙ্গে অভিমন্যুর বিবাহ হল। কিন্তু যেদিন রাধার সঙ্গে আইমনের বিবাহ হল, সেইদিনই সে নপুংসক হয়ে গেল।

একদিন রাধা অন্যান্য গোপীদের নিয়ে জল এনে ফেরার সময় কৃষ্ণ রাধাকে দেখতে পেয়ে তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেন এবং পরিচয় জানার আগেই তাঁর প্রেম ভিক্ষা করলেন। রাধাকে নিরুত্তর দেখে কৃষ্ণ তাঁর রূপের প্রশংসা করতে লাগলেন। রাধার কাঁচুলিতে দশাবতার চিত্রিত দেখে কৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন—"কোন্ জন লিখিছে মোর নিজ দশরূপ" ? কিন্তু এতেও রাধা নিরুত্তর থাকলেন। এরপর কৃষ্ণ রাধিকার কেশ ধারণ করলে রুষ্ট রাধা অনুচিত কাজের জন্য কৃষ্ণকে তিরস্কার করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ শোনার পাত্র নন। তিনি বললেন যে কামবাণে তাঁর প্রাণ দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, এখন সম্বন্ধ রাখার অবস্থা নয়, অতএব রাধা যেন তাঁকে প্রেম দান করেন। এই কৃষ্ণ যেন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণেরই প্রতিরূপ। তেমনিই কামাতুর এবং অশালীন ভাবে বলপ্রয়োগকারী। কিন্তু এই রাধা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধার মত বামা নায়িকা নন, বরং সুদক্ষিণা। তিনি শুধু যে কৃষ্ণের রূপ দেখে কামব্যাকুল হয়ে পড়লেন, তাই নয়, কৃষ্ণকে আশ্বাস দিলেন—'সঙ্গোপে হইব কার্য্য এবে ক্ষেমা কর' এবং এই রাধাও একেবারে প্রথম থেকেই বলেন 'এরূপ যৌবনে মুই হৈল তোর দাসী' ॥ (পৃ.-১৪)। রাধার এই 'কোমল মধুর' কথা শুনে কৃষ্ণ তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

গৃহে ফিরে গিয়েও রাধার মন কৃষ্ণের কাছেই থাকে। শ্বাশুড়ী ননদী ও স্বামী রাধাকে কিছু প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন না, নীরবে থাকেন। অবশেষে রাধা তাঁর সখী যদু সেন-পত্নী শ্রীমতীর কাছে নিজের মনের কথা খুলে বলেন। এই শ্রীমতী চরিত্রটি কবির নিজস্ব সৃষ্টি। এই অংশে কবি রাধার মনের কথা কতগুলি পদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। পদগুলির মধ্য দিয়ে রাধার প্রেমের যন্ত্রণা এবং লোকগঞ্জনার ভীতি কবি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন—

কাহ্নুর বিরহে মোর তনু হৈল জরজর
কি বলিব গোকুলের লোকে ॥ (পৃ. ১৮)

রাধার অবস্থা দেখে শ্রীমতী দূতী হয়ে কৃষ্ণের কাছে গেল এবং রাধার অবস্থা ব্যক্ত করল, কিন্তু অন্যান্য গোপশিশুরা সঙ্গে থাকায় কৃষ্ণ কোন উত্তর দিলেন না। শ্রীমতী লজ্জিত হয়ে ফিরে গেলেন। শ্রীমতীর কাছ থেকে একথা শুনে রাধা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। এই সংবাদে অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে রাধার মাতামহী অর্থাৎ বড়াই-বুড়ী এলে রাধা তাঁর কাছে নিজের দুঃখের কথা বললেন। বড়াই এই অনুচিত কাজের জন্য রাধার প্রতি অনুযোগ করে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে তাকে 'নাগরালি' ত্যাগ করতে বললেন এবং রাধার ওপর বলপ্রয়োগের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে কৃষ্ণ বললেন—'আমি তো না জানি তোর নাতিন কোনজন' ॥ (পৃ. ২৪) বড়াই রাধার কথা বলল। কৃষ্ণ বড়াইর হাতে বলে পাঠালেন, রাধার জন্য তিনিও মনের আগুনে পুড়ে মরছেন। রাত্রে তিনি রাধার কাছে যাবেন। বড়াই রাধার কাছে এসে কৃষ্ণের কথা বললে রাধা বলল—মোর নিজপতি সেই মোর প্রাণধন' (পৃ. ২৫)। কৃষ্ণের খুব গর্ব, কারণ সে রাধার প্রাণসখীর কথার উত্তর দেয় নি। এতে বড়াই আবার রাধার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে বলল যে, যৌবনের গর্বে কৃষ্ণকে অবহেলা করা রাধার উচিত নয়। রাধার সখী শ্রীমতীও বড়াইকে সমর্থন করল। তখন রাধা বললেন, তাঁর স্বামী মথুরায় কর নিয়ে গেছে,

যদি আসতে হয়, তাহলে কৃষ্ণ যেন আজ রাত্রেই আসেন। বড়াই গিয়ে কৃষ্ণকে সেই সংবাদই দিল। কৃষ্ণ রাত্রে গৃহে ফিরে ক্ষুধায় আকুল হয়ে "যশোদার স্তনামৃত করিলেন পান"। তারপর কৃষ্ণ রাধার গৃহে গিয়ে রাধার শয্যায় বসে তাঁর গায়ে হাত দিলেন। রাধা প্রথমে কপটভাবে তিরস্কার করলেও শেষে উভয়ের মিলন হল। রাধা বললেন, তাঁর স্বামী জানতে পারলে হয়ত তাকে ত্যাগই করবে। কৃষ্ণ এতে বললেন যদি সত্যিই তাই হয়, তবে তিনি রাধাকে গলায় বেঁধে যোগী হবেন। এরপর কৃষ্ণ নিজের গৃহে ফিরে এসে আবার বালকরূপ ধারণ করলেন। যশোদা কিছুই জানতে পারলেন না। রাধা তাঁর সখী শ্রীমতীর কাছে রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। পরের দিন সকালে ননদিনী মহোদা ও অন্যান্য সখীদের সঙ্গে যমুনার ঘাটে জল আনতে গেল। এই মহোদা আবার যশোদার ভগ্নী অর্থাৎ কৃষ্ণের মাসী। 'মহোদা' নামটিও কবির নিজস্ব কল্পনা। জল আনতে গিয়ে দেখা গেল কৃষ্ণ কদম গাছের তলায় বসে আছেন। সখীরা কৃষ্ণের রূপে মোহিত হয়ে গেল এবং নিজেদের মধ্যে কৌতুক করতে লাগল। মহোদা ব্যাপারটি অনুমান করে নিয়ে রাধাকে তিরস্কার করল এবং তাঁর বিবাহ না হওয়া ও ভ্রাতার নপুংসকত্বের জন্য রাধাকেই দায়ী করল। মহোদার কাছ থেকে সব কিছু শুনে শাশুড়ীও রাধাকে কটূক্তি করতে লাগল। এরপর রাধার শাশুড়ী তাঁর মায়ের কাছে গিয়ে অনুযোগ করলে রাধার জননী বিমলাও তীব্র তিরস্কার করে কন্যাকে বলল—

> হেন কর্ম্ম কর রাধা কত ধন পাইয়া।
> মরিতে যুয়ায় রাধা গরল খাইয়া। (পৃ. ৪১)

এই অপমানে রাধা মাথা হেঁট করে কাঁদতে লাগল। রাধার জননীর 'বিমলা' নামটিও এই কবিরই কল্পনা। বিমলার সংস্কারভীতা জননী চরিত্রটিও এখানে বাস্তবানুগ।

এদিকে লোকমুখে এই সংবাদ পেয়ে বড়াই শ্রীমতীকে নিয়ে নন্দ গৃহে গেল। বড়াই যশোদা-রোহিণীর কাছে তার মায়ের নামে নালিশ করল। সমস্ত শুনে যশোদা তার মাকেই তিরস্কার করতে আরম্ভ করল এবং এই ভয়ও দেখাল, কৃষ্ণ একথা শুনলে নিশ্চয়ই তাকে মেরে ফেলবে। সুতরাং তিনি যেন কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাদ না করেন। রাধার শাশুড়ী সমস্ত কিছু মেনে নিল। যশোদা রাধাকে উপদেশ দিলেন, শাশুড়ীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে। এদিকে বড়াইর কাছ থেকে এই কথা শুনে কৃষ্ণ রেগে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন—

> যদি বা বুড়ীর মুখ দহিতে না পারি।
> তবে গদাধর নাম অকারণে ধরি॥ (পৃ. ৪২)

রাধার শাশুড়ী বধূকে পাহারা দেওয়ার জন্য রাধার সঙ্গে কন্যা মহোদার শয়নের ব্যবস্থা করলেন। রাত্রে কৃষ্ণ এলে রাধা পরামর্শ দিলেন, মহোদার সঙ্গেও প্রেম করতে, তাহলে সে আর রাধার ছিদ্রান্বেষণ করতে পারবে না। কৃষ্ণ রাধার কথামত তাই করলেন এবং অবশেষে যাওয়ার সময় রাধার শাশুড়ীকে জব্দ করার জন্য কৃষ্ণ—

> চুলে ধরি মুখ দিলা আনলের মাঝে।
> মুখ চুল পোড়া গেল বুড়ীয়ে পাইল লাজে॥ (পৃ. ৪৩)

কৃষ্ণের এই প্রতিহিংসা পরায়ণতার চিত্র কিন্তু আমরা অন্য কোথাও পাই না। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কৃষ্ণ-চরিত্র সম্পর্কে গ্রাম্যতা ও নিষ্ঠুরতার অভিযোগ আনা হয়ে থাকে, কিন্তু নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতায় এই কৃষ্ণ তাকেও অতিক্রম করে গেছেন। এরপর রাধার শাশুড়ী রাধাকে তিরস্কার করতে আরম্ভ করলে, মহোদা তাকে কোনমতে শান্ত করল।

একদিন রাধা তার সখী শ্রীমতীকে নিয়ে মথুরার হাটে দধিদুগ্ধ বিক্রয় করতে চললেন। যমুনায় এসে তারা দেখল, পঞ্চমীর ঘাটে একটি ছোট নৌকা নিয়ে কৃষ্ণই পারাপার করার জন্য বসে আছে। তার নৌকা এত ছোট যে তাতে একসঙ্গে একজনের বেশী পার হতে পারে না! কৃষ্ণ বললেন, একবারের বেশী পার করা সম্ভব নয়, সুতরাং দুজনের মধ্যে একজন মথুরার হাটে দধিদুগ্ধ বিক্রয় করুক এবং আর একজন কৃষ্ণের দান দেওয়ার জন্য এখানে থাকুক। কৃষ্ণের মন জেনে রাধা শ্রীমতীকে বললেন —

তোরে দেখি আকুল হইছে যদু মণি।
তুমি তান মন রক্ষা কর সুবদনি ॥ (পৃ. ৪৯)

কিন্তু শ্রীমতী বললেন, ভাই সুদাম আর দেবর অর্জুন শ্রীমতীকে এই অবস্থায় দেখলে মন্দ বলবে, সুতরাং রাধাই হাটে যাক, সে ফিরে যাবে। রাধা এই প্রস্তাবে রাজী হলেন এবং কৃষ্ণকে বললেন 'ঝাটে করি কর পার'। কৃষ্ণ যথারীতি রাধার কাছে শৃঙ্গার প্রার্থনা করলেন। উত্তরে রাধা বললেন, 'এ রূপ যৌবন মোর তোমার অধীন' (পৃ. ৫৩)। এরপর কৃষ্ণের আজ্ঞায় যমুনা তার মাঝখানে চর সৃষ্টি করল। সেখানে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন ঘটল। কৃষ্ণ রাধার অনুরোধে গঙ্গা-যমুনার উৎপত্তি, সৃষ্টির আদিকথা ও মর্ত্যে গঙ্গার অবতরণ কাহিনী শোনালেন। রাধার অনুরোধে নিজের বিশ্বরূপ ও দেখালেন।

এদিকে কন্যা মহোদার ভীতি প্রদর্শনে রাধার শাশুড়ী কৃষ্ণ কর্তৃক নিজের প্রাণনাশের ভয়ে পুত্রবধুর সঙ্গে শয়ন করতে রাজী হল না। রাত্রি দুই প্রহরে কৃষ্ণ রাধার কাছে এলে, রাধা অনুযোগ করলেন—

এ-দুই প্রহর নিশি জাগি গোঙাইলু বসি
নিহরে ভিগিল মোর শাড়ী ॥

* * * * *

দিবসে গো-ধেনু রাখ নিশি কার ঘরে থাক
এখনে বা কোথা গিয়া রৈবা।
রাধারে কলঙ্কী কৈলা এবে কার বন্ধু হৈলা
মরম ভাঙ্গিয়া সব কৈবা ॥ (পৃ. ৭৮)

এখানে রাধার কণ্ঠে পদাবলীর খণ্ডিতা নায়িকার বেদনাই বেজে উঠেছে। আবার রাধার আক্ষেপের মধ্যেও আমরা একাধারে চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের রাধার কণ্ঠস্বরই শুনতে পাই বলে মনে হয়—

নিশ্বাস ছাড়িতে অবসর নাহি ঘরে।
সুখে তোমা সম্ভাষি শাশুড়ি যদি মরে ॥

দুই কুলে গোয়ালা জাতি কেবা কি না বোলে।
তেহুঁ মোর প্রাণ পোড়ে তোমা না দেখিলে ॥
ঘর কৈলু বাহির—বাহির কৈলু ঘর।
পর কৈলু আপনা—আপনা কৈলু পর।
রাত্রি কৈলু দিবস—দিবস কৈলু রাতি
অঙ্কুরে ভাঙ্গিব জানি যোগের পিরিতি ॥ (পৃ. ৮০)

এরপর কৃষ্ণ রাধাকে নানাভাবে সন্তুষ্ট করে ফিরে গেলেন। সকাল বেলায় রাধা, মহোদা ও শ্রীমতী তিনজনে মিলে যমুনায় জল আনতে গেলেন। কদম্বের নীচে কপট নিদ্রায় নিদ্রিত কৃষ্ণের বাঁশীটি রাধা চুরি করে নিলেন। কৃষ্ণ এ নিয়ে বড়াই-র কাছে অভিযোগ করলে, বড়াই উল্টে কৃষ্ণকে কুলবধূর নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার দোষে দোষী করলেন। তখন কৃষ্ণ বড়াইকে একটি গল্প বললেন। গল্পটির মধ্যে আবার আর একটি গল্প আছে, সেটি বেতাল পঞ্চবিংশতির। এ পর্যন্ত কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে নানা পৌরাণিক উপাখ্যানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। কিন্তু কাহিনীর প্রসঙ্গ ক্রমে রূপকথাধর্মী কাহিনীর এই সংযোজন কৃষ্ণকথায় অভিনব। কাব্যটি যে অত্যন্ত সাধারণ পাঠকের জন্য লেখা, তার জোরালো প্রমাণ তত্ত্ববর্জিত রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথাকে কবি আদিরসের ভিয়ানে পাক করেছেন এবং তারই সঙ্গে এই রূপকথাধর্মী কাহিনীও সংযুক্ত করেছেন। এর কাহিনীটিও চিত্তাকর্ষক। রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র, পাত্রপুত্র ও কোতোয়ালের পুত্র—এই চারজন বন্ধুর কাহিনী। কাহিনীতে আছে একটি চুরি ও কৌশলে চোর ধরার প্রসঙ্গ।

গল্প শেষ করে কৃষ্ণ বাঁশী ফিরিয়ে দিতে বললে রাধা চুরির কথা অস্বীকার করলেন এবং অনেক কথা কাটাকাটির পর বাঁশী ফিরিয়ে দিলেন। এরপর কৃষ্ণের উদ্যোগে কালিন্দীপুলিনে মহোদার সঙ্গে রাধার ভ্রাতা শ্রীদামের বিবাহ হল। এতে রাধার শাশুড়ী ক্রুদ্ধ হয়ে রাধাকে তিরস্কার করলেন। রাধাও কুৎসিত ভাষায় শাশুড়ীকে তিরস্কার করলেন। পরে রাধা কৃষ্ণকে শ্রীমতীর সঙ্গে মিলিত হতে বললেন। শ্রীমতীর সঙ্গে মিলনের পর গৃহে ফেরার সময় কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে দেখা করলে রাধা অভিমান করলেন। কিন্তু কৃষ্ণের কথায় অভিমান ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। কৃষ্ণ দান দিয়ে কটু কথা বলার ফল হিসেবে চন্দ্রসেন রাজার উপাখ্যান বলল। এই রাজা প্রচুর দান করেছিলেন বলে তাঁর শরীর সুবর্ণের হল, কিন্তু মিষ্টকথায় দান করেন নি বলে মুখখানি হল শূকরের মত। এই কাহিনীটিতে পুরাণের আবহ থাকলেও, এটি পৌরাণিক কাহিনী বলে মনে হয় না। এরপর কৃষ্ণ গৃহে ফিরে গেলেন। সকাল বেলা রাধা জল আনতে গেলে কৃষ্ণ পথে তাকে ধরে সম্ভোগ করল। এর ফলে রাধার—

লণ্ড ভণ্ড হৈল যত অভরণ বেশ।
ছিড়িল গলার হার আকুলিত কেশ ॥ (পৃ. ৯৫)

তারপরই কৃষ্ণ কদম-গাছের ডালে লুটিয়ে পড়ায় রাধা ব্যাকুল হয়ে বললেন—

তোর লাগি বেড়াই নাথ তোর লাগি বেড়াই।
তুমি বিনে অন্য জানি—তোমার দোহাই ॥
* * * * *
তুমি বহি প্রাণনাথ নাহি কেহ আর। (পৃ. ৯৭)

রাধার কথা শুনে কৃষ্ণ রাধার কাছে এলেন। ইতিপূর্বে রাধা কৃষ্ণকে বলেছিলেন—"কালা গোরায় নাহি সাজে ভজিমু কোন কাজে" ? তাই কৃষ্ণ এখন তীব্র ব্যঙ্গ করে বলেন—

তুমি গোরা আমি কালা—সর্ব্বথা না শোভে।

* * * * *

তোমার পতির যোগ্য গোরা যার গাও।
মোর জ্যেষ্ঠ বলরাম—তান তথা যাও ॥ (পৃ. ৯৮)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণও কখনও কখনও রাধাকে ব্যঙ্গ করেছেন, কিন্তু এই ধরনের অশোভন ও অশালীন উক্তি উচ্চারণ করেন নি। এর উত্তরে রাধা বলেন—"কেবল পিতার যোগ্য দেখি বলরাম" (পৃ. ৯৮) একথায় লজ্জিত হয়ে কৃষ্ণ তরুতলে এসে দাঁড়ালে, কৃষ্ণরূপ দর্শনে মুগ্ধা রাধা বলে উঠলেন—

খানিক রহ রূপ দেখি রে কানাই
খানিক রহ রূপ দেখি।
এত রূপে গুণনিধি তোমা নিরামিল বিধি
বিরলে বসিয়া চাইয়া থাকি ॥ (পৃ. ১০০)

ভবানন্দের কাব্যের স্থূল কামসর্বস্বতার মধ্যে মাঝে মাঝে রাধার কণ্ঠের এই গভীর আবেগময় ব্যাকুলতা আমাদের বৈষ্ণব পদাবলীর পরিশীলিত রসরুচির স্বাদ পরিবেশন করে। এবং এগুলি প্রমাণ করে দেয় যে, ভবানন্দ কৃষ্ণকথার এক ক্ষমতাশালী কবি ছিলেন। রাধার এই ব্যাকুলতা দেখে মহোদাও শ্রীমতী রাধাকে নানাভাবে বোঝাতে লাগল। কিন্তু রাধা বললেন—

মিছা পরিজন আশ ছাড়িমু বসতি বাস
শ্যাম রসে হৈয়াছি বিভোল ॥ (পৃ. ১০১)

রাধার একথা শুনে মহোদা ও যশোদা নির্বাক হয়ে গেল। অতঃপর রাধা কৃষ্ণের নামে অভিযোগ করল, নিজের ছেড়া আচল দেখাল। কিন্তু যশোদা বলল যে, রাধা নিজের দোষ ঢেকে অন্যের নামে দোষারোপ করছে—

ননীর কোমল তনু দুলালিয়া বাছা।
সে তোমা এমত কৈল—ইহ কথা মিছা ॥ (পৃ. ১০২)

এদিকে আইহন মথুরায় নারদের মুখ থেকে শুনে এল, স্বয়ং নারায়ণ কংসবধের জন্য কৃষ্ণরূপে নন্দ গোপের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। গৃহে ফিরে এলে তার জননী রাধার নামে অভিযোগ করে বলল—

পুত্র হৈয়া মোরে যদি না দেও সম্মান।
তবে তোমার বধু লৈয়া যাহ অন্য স্থান ॥ (পৃ. ১০৩)

আইহনের জননীর চরিত্রটি কবি মনস্তত্ত্ব সম্মতভাবেই রূপ দিয়েছেন। তবে কাব্যে এই চরিত্রটির প্রতি কবি সম্পূর্ণ সহানুভূতিহীন। বার বার কবি তাকে 'দুষ্টবুড়ী' বলে অভিহিত করেছেন। অথচ রাধার আচরণে, যে কোন প্রকৃতিস্থ প্রাকৃত শাশুড়ীরই ক্রুদ্ধ হওয়া কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়। কিন্তু আইহন কৃষ্ণের মহিমা জেনে এসেছে। তাই

সে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে গেল না। বরং রাধাকে কৃষ্ণেরই জায়া বলে স্তুতি করল, পৃথক শয্যায় শয়ন করল এবং অবশেষে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য রাধাকে কৃষ্ণের কাছে পাঠিয়ে দিল। আইহন চরিত্রের এই ধরনের রূপান্তরও ভাবানন্দের হরিবংশ ছাড়া অন্যত্র দেখা যায় না।

এরপর কবি বস্ত্রহরণ কাহিনী বিবৃত করেছেন। ভাগবতে আছে ব্রজনারীরা কৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য কাত্যায়নী ব্রত করেছিলেন। কিন্তু এখানে ব্রজনারীদের গৌরী-পূজার প্রসঙ্গ থাকলেও কৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার প্রার্থনা নেই। ব্রজনারীরা জলে স্নান করার সময় নিজেদের পতিনিন্দা করেছে, তাদের মতে কৃষ্ণই গোকুলের একমাত্র 'পুরীষরতন' 'সর্ব্ব-বিদ্যা-বিশারদ কামিনী-রঞ্জন'। অন্তর্যামী কৃষ্ণ গোপীদের মনের ইচ্ছা জেনে বস্ত্র অলঙ্কার নিয়ে লুকিয়ে রাখলেন। গোপীরা কেউ লজ্জিত হল, অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠরা কৃষ্ণকে তিরস্কার করল এবং বলল তাদের বস্ত্র-অলঙ্কার ফিরিয়ে না দিলে কৃষ্ণ চোরের শাস্তি পাবে। ভাগবতের গোপীরা কিন্তু কৃষ্ণকে এভাবে তিরস্কার করে নি। এখানে কৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে গোপীদের নিজের শক্তি জানিয়ে দিলেন। তখন গোপীরা ভয় পেয়ে কৃষ্ণকে প্রণতি জানিয়ে কাতরভাবে বলল—

আমি সব কুলবধূ থাকি অন্তঃপুরে।
শিরের বসন কভু না করিছি দূর॥
*   *   *   *
ক্ষুধা হৈলে সন্তোষে ভোজন করি যদি।
নানা ছলে গালি পাড়ে শাশুড়ী ননদী॥
নৃত্য-গীত দেখিবার যদি লয় মনে।
কলঙ্কী করিয়া তবে বোলে গুরুজনে॥
উত্তম পুরুষ যদি দেখি চক্ষু ভরি।
শুনি মাত্র নিজ পতি তেজে কোপ করি॥
কায়-মনে পতি-সেবা করি অনুক্ষণ।
তাহার অধিক করি সেবি গুরুজন॥
সবার অধিক করি ননদী সম্ভাষি।
*
তথাপিও তারা সবে না বোলয়ে ভাল।
সহজেই কুল বধূ অভাগ্য কপাল॥
*   *   *   *
পুরুষ সকলে যদি পরদার করে।
তথাপিও তাহারে বাখানে সর্ব্ব নরে॥
নারীয়ে পুরুষ যদি নিরক্ষয়ে রঙ্গে।
জন্মাবধি লজ্জা পায় সে হি ত কলঙ্কে॥

বিধাতা নিৰ্ব্বন্ধ নারী দৈবে হীন জন।
পরের অধীন জান জীবন যৌবন॥
আমি সব কুল-বধূ পরাধীন নারী।
না দিহ অশক্য লজ্জা মুকুন্দ মুরারি॥ (পৃ. ১১৫)

ভবানন্দ শুধু শক্তিশালী কবি নন, বাস্তব-সচেতন সমাজমনস্ক কবিও বটে। তার প্রমাণ গোপীদের এই উক্তিগুলি। ভাগবতে তো নয়ই, অন্য কোন কবির কাব্যেই গোপীদের মুখে আমরা এই ধরনের কথা শুনতে পাই না। এই উক্তি আসলে মধ্যযুগীয় বাংলা-দেশের অবগুন্ঠিতা কুলবধূদের। ক্ষুধায় তারা তৃপ্তিতে অতিরিক্ত ভোজন করলেও গঞ্জনা পেতে হয়, শত সহস্রভাবে সেবা করেও কারও মন পাওয়া যায় না, সামান্য স্খলনেও পরিত্যক্ত হতে হয়, অথচ চোখের সামনে পুরুষরা সদর্পে পরদার করে। উদ্ধৃত পংক্তিগুলি তাদেরই মর্ম নিঃসৃত অশ্রু আর রক্তে মেশা বেদনার বিন্দু। এই বাস্তব সচেতনতা, এমন করে মধ্যযুগীয় নারীদের মর্মবেদনাকে তুলে ধরা আমরা কৃষ্ণ-মঙ্গল কাব্যের ধারায় সর্বপ্রথম ভবানন্দের মধ্যেই দেখলাম। এর আগে যাঁরা রাধার মুখ দিয়ে শাশুড়ী ননদীর অত্যাচারের কথা বলিয়েছেন, লোকনিন্দার কথা বলিয়েছেন, তা এত বাস্তব হয়ে ওঠে নি। মনে হয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ মোগল অধিকরে যাওয়ার ফলে নারীদের ওপর অবরোধ আর অনুশাসনের দণ্ড আরও বেশী করে নেমে এসেছিল। সপ্তদশ শতব্দীর অন্যান্য কিছু কিছু সাহিত্য শাখাব দৃষ্টান্ত থেকে তাই-ই মনে হয়। অবশ্য এই বিষয়টি বিশদ গবেষণা ও অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

গোপীদের কথা শুনে কৃষ্ণ তাদের বস্ত্র দিয়েছেন এবং এই প্রতিশ্রুতিও দিলেন "নিশি যোগে মানস পুরিমু তোমরার" (পৃ. ১১৮)। আমরা এখান থেকে কৌতুহলের সঙ্গে লক্ষ্য করবো সামাজিক অবদমন কেমন করে কাব্য কাহিনীর পটে উঠে আসে। রাত্রে কৃষ্ণের কাছে আসার জন্য রত্নবতী নামে এক 'মন্ত্রণা-চতুর' গোপী পরামর্শ করে গৃহে বলল যে, রাত্রে ভবানী পুত্রবর দেবেন, তাই তাঁর কাছে যেতে হবে।

এদিকে কৃষ্ণও ধবলীকে খোঁজার ভাণ করে একা বনে থাকতে চাইলেন। এতে—

বলভদ্রে বোলে "তুমি শিশু একেশ্বর।
কেমতে চাহিবা গাভী বনের ভিতর॥
* * * *
তবে যদি বনে রহ গাভী বিচারিতে।
আমিও রহিমু ভাই তোমার সহিতে॥ (পৃ. ১১৯)

জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরামের স্নেহ-কোমল মনটি এখানে বড় সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু বলরাম থাকলে কৃষ্ণের খুবই অসুবিধা। সুতরাং তিনি নিজের বীরত্বের নানা প্রসঙ্গ বলে বলরামকে বিদায় করলেন এবং নিজে গোপীদের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে রইলেন।

ভাগবতের রাসলীলার কাহিনী সূত্রটিকে অনুসরণ করে কবি নিজস্ব কল্পনাই সংযোজন করেছেন। রাত্রে গোপীরা পরামর্শ করেছে যে, তারা রাধাকে ছাড়াই যাবে। কারণ রাধা না গেলেই নাগর কানাই তাদের কৃপা করবেন। গোপীদের এই পরামর্শ শুনে মহোদা আর শ্রীমতী তাদের সঙ্গে না গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। এদিকে কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে রাধাকে না দেখে কুপিত হলেন। দূরে থেকে শ্রীমতী আর মহোদা তাই

দেখে খুশী হল, কিন্তু রাধার কাছে গিয়ে বিপরীত কথা বলল, কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে রসক্রীড়ায় মত্ত রয়েছেন। এরপর রাধা কৃষ্ণের কাছে গেলে, কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে মিলিত হলেন এবং একে একে সব গোপীগণকে রতিক্রীড়ায় সন্তুষ্ট করলেন। সমস্ত নারীই নিজেদের স্বামীর তুলনায় কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিল। এই প্রসঙ্গে কবি যে সমস্ত গোপীদের নাম করেছেন, তা কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে নেই, এগুলি কবির নিজস্ব কল্পনা। রাধার অন্য নাম এখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত চন্দ্রাবলী নয়, তিলোত্তমা। আবার প্রতিদ্বন্দ্বিনী নায়িকা চন্দ্রাবলীর নামও এখানে নেই। কবির বর্ণনায় গোপীরা সবাই পূর্ণযৌবনা, কেবল রাধা ও রাধার ননদী মহোদা কিশোরী। এগুলিও ভবানন্দের নিজস্ব কল্পনা। রসক্রীড়ার শেষে রাধা অভিমান করে বলেছেন—

নবীন যুবতিগণ পাইয়াছ অনেক জন
তবে যে আমারে বাস ভীন (পৃ. ১২৬)।

কিন্তু উত্তরে কৃষ্ণ সবিনয়ে বলেছেন—

তুমি বিনে প্রাণেশ্বরি অন্য নাহি জানি ॥
তোমার দাসীর যোগ্য নহে গোপীগণ। (পৃ. ১২৭)

অর্থাৎ এখানেও কবি রাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন। এর পর কৃষ্ণ গৃহে ফিরে বললেন—গাভী খোঁজার জন্য বনে বনে ভ্রমণ করে তাঁর পায়ে কুশের কাঁটা ফুটেছে। একথা শুনে নন্দ, যশোদা ও রোহিণী তিনজনেই দুঃখে কাঁদতে লাগলেন, নন্দ কৃষ্ণকে সেদিন গোষ্ঠে যেতে বারণ করে বলরামকে গোচারণে যেতে বললেন। বলা বাহুল্য, ভাগবতীয় রাসলীলায় এই সমস্ত প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এগুলিও কবির নিজস্ব কল্পনা।

পরবর্তী ঘটনা হল বিরহাতুরা রাধা বড়াইর সঙ্গে কলসী কাঁখে করে কদমতলায় গেলে কৃষ্ণ রাধার কেশে ধরে তার সঙ্গে মিলিত হলেন। রাধার কলসী ভেঙ্গে গেল। তিনি শাশুড়ীর ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু শাশুড়ী বলল—

নাতিয়ে ভাঙ্গিছে মোর মাটির কলসী।
তার লাগি দুঃখ কেনে ভাবহ রূপসী ॥ (পৃ. ১৩৯)

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, কৃষ্ণ রাধার গৃহেই রাত্রে ভোজন ও শয়ন করলেন। রাধার শাশুড়ী ও স্বামী দুজনের অতি আগ্রহে রাধাকে কৃষ্ণের কক্ষে শয়ন করার জন্য পাঠিয়ে দিল। এরপর সকাল বেলায় কৃষ্ণ রাধার বৃদ্ধা শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করলে বৃদ্ধা রাধার কাছে কৃষ্ণকে আসার জন্য অনুরোধ করে বলল, 'তোমার বিরহে মোর বধূ বিরহিত'। পুত্রবধূর সঙ্গে দৌহিত্রের অবৈধ প্রণয়কে এইভাবে সোচ্চার সমর্থন করায় কৃষ্ণ তার মুখে পদ্মহস্ত বুলিয়ে দিলেন। বৃদ্ধার পোড়া মুখ ও চুল আবার পূর্বাবস্থা ফিরে পেল। রাধাকৃষ্ণ লীলাকথায় রাধার শাশুড়ীর এই অবৈধ প্রেম সমর্থন ও পুত্রবধূর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য কৃষ্ণকে সাদর আমন্ত্রণ সম্পূর্ণ অভিনব অভাবনীয় ব্যাপার। কাহিনীর এই স্থূলতা আমাদের অত্যন্ত আহত করে।

পরবর্তী ঘটনায় দেখি, একদিন কৃষ্ণ ব্রহ্মার রূপ ধারণ করে যদুসেন গোপের কাছে গিয়ে বলল, রাধাকে কৃষ্ণের বামে বসিয়ে পুজো করতে। পুরোহিত শৃঙ্গমুনি এলেন। গোবিন্দকে স্নান করানো হল। তারপর বৃষভানু রাজার একটি প্রকোষ্ঠের মেষগুলিকে

কৃষ্ণ দাবানল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলেন। এই প্রসঙ্গ এর আগে একটু অন্য ভাবে হোলি প্রসঙ্গে পরশুরামের কাব্যে আছে। এরপর রাধাকৃষ্ণ একাসনে বসলে, স্বর্গ হতে দুজনের ওপর পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকল। ইন্দ্র এবং প্রজাপতি দুজনে এসে মন্দাকিনী জলে অভিষেক করিয়ে কৃষ্ণের নাম দিলেন 'রাধাকান্ত'। এই কাহিনীও ভবানন্দের কল্পিত। এরপর রাধার সঙ্গে কৃষ্ণ আবীর নিয়ে খেলেন। রঙ খেলা শেষ হলে কৃষ্ণ সিংহাসনে বসলেন ও ক্ষেত্রপালদের দয়া করলেন। তাঁরা মুক্ত হয়ে ইন্দ্রের সভায় চলে গেলেন। এই কাহিনী শুনে জনমেজয় ব্যাসদেবকে ক্ষেত্রপালদের এই সৌভাগ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাস বললেন, ক্ষেত্রপালদের প্রধান বারোজন অনাদি দেবের অংশ। তাদের মধ্যে প্রধান গণেশ। তখন রাজা জনমেজয় ব্যাসের কাছ থেকে গণেশ ও অন্যান্য ক্ষেত্রপালদের জন্মকথা শুনতে চাইলে মুনি গণেশের জন্মকথা বলে অন্যান্য এগারোজন সম্বন্ধে বললেন—

গণপতির মুণ্ডেত জন্মিল ক্ষেত্রগণ ॥ (পৃ. ১৫২)

এরপর আকাশবাণী হল—

সাবধান হৈয়া শুন শৃঙ্গ তপোধন।
গোপগণ লৈয়া গৃহে করহ গমন ॥
গোবিন্দ সমীপে রৈব যুবতী সকল।
তবে যদি রহ কেহ—পাইবা প্রতিফল ॥ (পৃ. ১৫২)

কবি বাৎসল্যরসের সমস্ত শুচিতাকে যেন এখানে নষ্ট করে দিয়েছেন মনে হয়।

এদিকে কংস কৃষ্ণকে মারার জন্য দূত পাঠিয়ে ব্যর্থ হলে, নারদের যুক্তিতে কংস কৃষ্ণকে নিয়ে আসার জন্য মথুরা থেকে অক্রূরকে পাঠাল। কৃষ্ণ রাধাকে এই সংবাদ জানালে রাধা প্রথমে বিশ্বাস করলেন না। কিন্তু কৃষ্ণ বার বার বলতে লাগলেন— 'হাসিয়া মেলানি দেহ যাই মধুপুর" (পৃ. ১৫৭)। কিন্তু রাধা কাতরভাবে কৃষ্ণকে বললেন—

আমার মাথাটি খাও সঙ্গে করি লৈয়া যাও
না জানি—কি আছে কপালে (পৃ. ১৫৮)।

কৃষ্ণ রাধাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—"আমিও রাখিমু তোমা নিজ কলেবরে" (পৃ. ১৬৬)। এরপর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কৃষ্ণ রাধাকে কৌস্তুভ মণি দিলেন।

কৃষ্ণের মথুরা যাত্রার সময় যশোদার করুণ বিলাপে তাঁর মাতৃহৃদয়ের বেদনা বড় আন্তরিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তবে বিরহিণী রাধার বিলাপ আমাদের মনকে তত স্পর্শ করতে পারে না। কারণ, এই কাব্যে রাধার শাশুড়ী ও ননদিনী উভয়েই তাকে সহানুভূতি দেখিয়েছে। কবির কাব্যে কংস বধের বর্ণনা নেই। এর কারণ হিসেবে কবি ব্যাসদেবের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাঁর ঘরে এসে তাঁর এবং রাধার প্রেমলীলা গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কৃষ্ণ মথুরায় চলে যাওয়ার একশো সাতদিন পর রাধা কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখেছেন। সকালে রাধা শ্রীমতীকে স্বপ্নের কথা জানালে, শ্রীমতী রাধাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—

সর্ব্বথায় মিথ্যা নহে স্বপ্নের বৃত্তান্ত।
অবিলম্বে অবশ্য আসিবা রাধাকান্ত ॥ (পৃ. ১৭৭)

শ্রীমতী কথা দিল, সে নিজে মথুরা গিয়ে কৃষ্ণকে নিয়ে আসবে। এদিকে উদ্ধবের গৃহে গিয়ে কৃষ্ণের অকস্মাৎ রাধার কথা মনে পড়ল। কৃষ্ণ রাধার সংবাদ নেওয়ার জন্য ও রাধাকে সান্ত্বনা দানের জন্য উদ্ধবকে পাঠালেন। উদ্ধব ব্রজপুরীতে গিয়ে প্রথমে নন্দ-যশোদার সংবাদ নিয়ে রাধার গৃহে গেলে, আইহন তাঁকে কৃষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসা করল ও তারপর রাধার সঙ্গে সাক্ষাৎ করারার জন্য নিয়ে গেল। উদ্ধব রাধাকে লক্ষ্মী মূর্তিতে দেখতে পেয়ে তার বন্দনা করলেন—

নমো সিন্ধু সুতা নমো কমলা সুন্দরী।
বিষ্ণুপ্রিয়া বৃন্দাবনি নমো সুরেশ্বরি ॥
সব্বর্-জীব-তত্ত্বময়ি নাহিআদি-অন্ত।
চরণ পঙ্কজে মোর প্রণতি অনন্ত ॥ (পৃ. ১৭৯)

ভবানন্দ তাঁর হরিবংশের রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথায় লৌকিক প্রসঙ্গকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কিন্তু রাধার মহিমাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতই সমুচ্চ স্তরে রেখেছেন। উদ্ধব রাধাকে সান্ত্বনা দিলে রাধা জানালেন, কৃষ্ণের বিরহে বৃন্দাবনের প্রকৃতিও শোকগ্রস্ত, নীরব। কৃষ্ণের বিরহে প্রকৃতির এই শোকস্তব্ধতা চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি পরিচিত প্রসঙ্গ। এখানে কবি সেই ঐতিহ্যের কাছে ঋণী। 'হরিবংশে'র কৃষ্ণ, মথুরা যাওয়ার চারমাস পর উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছেন। রাধার উক্তিতে তার প্রমাণ রয়েছে— "মধুপুরে গেছে হরি—হৈল চারিমাস" (পৃ. ১৮১)। এরপর উদ্ধব মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণকে বিরহিণী রাধার কথা জানিয়েছেন, কৃষ্ণও বৃন্দাবনে নিজের পূর্বলীলার কথা স্মরণ করেছেন।

এরপর কবি রাধার দীর্ঘ বিলাপোক্তি বর্ণনা করেছেন। রাধার বেদনায় সমব্যথী শ্রীমতী মথুরায় গেলে পথে তার সঙ্গে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দেখা হল। তার কাছ থেকে শ্রীমতী শুনল, জরাসন্ধ মথুরা পুড়িয়ে দিয়েছে। সেইজন্য কৃষ্ণ সমুদ্রের ভেতর দ্বারকাপুরী নির্মাণ করে আছেন এবং রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্টমহিষীকে বিবাহ করেছেন। শ্রীমতী সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গেই দ্বারকা পুরীতে গেল এবং রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীদের দেখে কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হলে, কৃষ্ণ তাকে রাধার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। তখন শ্রীমতী বিস্তৃতভাবে কৃষ্ণের কাছে রাধার বিরহ-বেদনা বিবৃত করল। শ্রীমতীর কথা শুনে কৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে রাধাকে নিয়ে আসার জন্য উদ্ধবকে শ্রীমতীর সঙ্গে পাঠালেন। উদ্ধবের এই বৃন্দাবনে পুনরাগমন কবি ভবানন্দের নিজস্ব কল্পনা। এর পরের কাহিনীর পটভূমিও দ্বারকা। কৃষ্ণ সত্যভামার কক্ষে গেলে সত্যভামা রাধার প্রতি কৃষ্ণের আকর্ষণের জন্য বিদ্রূপ করলেন। উত্তরে কৃষ্ণ বললেন—

শতভাগের ভাগনাহি হৈবা রূপে গুণে ॥
দেখিবার কায্য আছুক—আসিতে মাত্র এথা।
সহিতে নারিবা তেজ—পাইবা বড় ব্যথা ॥
উদ্ধবেরে পাঠাইছি বড় যত্ন করি।
মোর ভাগ্যে আইসে যদি সেহি প্রাণেশ্বরী। (পৃ. ১৯৯)

শুধু রাধার মহিমা প্রচারই নয়, কৃষ্ণের দ্বারকালীলার নায়িকাদের তুলনায় রাধা যে গরীয়সী, তা-ও কবি কৃষ্ণের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। এর পর শ্রীমতী বৃন্দাবনে এসে রাধার দ্বারকা যাওয়ার সংবাদ জানালে, সারা গোকুলে শোকের ছায়া নামল। রাধা সমস্ত গোকুলবাসী, শাশুড়ী, ননদী ও স্বামী আইমনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উদ্ধবের সঙ্গে দ্বারকায় চলে গেলেন। দ্বারকাপুরীতে পৌঁছে রাধা পদব্রজে কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চললেন। কৃষ্ণ দেখলেন রাধার—

রক্ত-গৌর শরীরেও মলিন বসন।
মেঘে ঢাকিয়াছে যেন চন্দ্রের কিরণ ॥
অস্থি-চর্ম-সার রক্ত মাংস-বিবর্জিত।
হাটিতে না পারে প্রিয়া বিরহে লজ্জিত ॥ (পৃ. ২০২)

রাধা কৃষ্ণকে দেখে বলে উঠলেন—"সপ্তদশ মাসে আজি হৈল দরশন।" (পৃ. ২০৩) এরপর রাধা প্রাণত্যাগ করার সঙ্কল্প নিলে দেবতারা ভীত হলেন। কারণ তাহলে শ্রীকৃষ্ণও তনুত্যাগ করবেন এবং তাতে পৃথিবী ভারমুক্ত হবে না। তখন ইন্দ্রের অনুরোধে ব্রহ্মা এসে রাধাকৃষ্ণের স্তব করে অবশেষে কৃষ্ণের পায়ে পড়ে বললেন—

সৃষ্টি নাশ না করিও প্রভু শত্রুজিত।
লক্ষ্মিরে সন্তোষ কর তান মনোহিত ॥ (পৃ. ২০৫)

রাধা বললেন, তিনি থাকতে পারেন—"গুপ্ত করি রাখে যদি শঙ্খ-চক্র-ধারী" ॥ (পৃ. ২০৫)। এরপর রাধা কৃষ্ণের শরীরে লীন হয়ে গেলেন। এই খানেই ভবানন্দের হরিবংশের শেষ এবং ব্যাসেরও হরিবংশের 'গুহ্য অতিগুহ্য বিবরণ' বলা শেষ হয়েছে।

কাব্যটির আদ্যোপান্ত লৌকিক। ঘটনা ও চরিত্রচিত্রণে অভিনবত্বের পরিচয় কাহিনী বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেই করেছি। কিন্তু শেষের ঘটনাটি অর্থাৎ দ্বারকায় গিয়ে রাধার কৃষ্ণ শরীরে লীন হওয়ার ঘটনা একান্ত অভিনব। শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ বিগ্রহে লীন হয়ে যাওয়ার কাহিনীই হয়তো এর মূলে। কাব্যটির আর একটি বৈশিষ্ট্য, আদিরসের আধিক্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের তুলনায় এখানে আদিরসের স্থূলতা বেশী। তবে রাধা-কৃষ্ণের আদিরসাত্মক মিলন বড়ু চণ্ডীদাস বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। ভবানন্দের কাব্যে ওই ধরনের বিস্তৃত বর্ণনা নেই, ভবানন্দের হরিবংশে পদও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। রাধার অপর নাম এখানে তিলোত্তমা, চন্দ্রাবলী নয়। চন্দ্রাবলী নামে যে পৃথক নায়িকার অস্তিত্ব পরবর্তী কালের পদাবলী সাহিত্যে পাওয়া যায়, তার অস্তিত্বও এখানে নেই। ড. সুকুমার সেন বলেছেন, "ভবানন্দের হরিবংশে আশ্চর্যের কথা বলরামের নাম একবারও নাই"। ড. সেনের এই মন্তব্য আমাদেরও আশ্চর্য করে দেয়, কারণ গ্রন্থের মধ্যে বলরাম তথা বলভদ্রের উল্লেখ বহুবারই রয়েছে।

সব মিলিয়ে, ভবানন্দের হরিবংশ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ধারানুসরণ করলেও বৈষ্ণবীয় ভাবের গভীর গাঢ় অনুপ্রবেশে, বিশেষতঃ রাধাতত্ত্বপ্রচারের প্রবণতায় দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন না হয়ে একটি স্বতন্ত্র স্বাদের কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য হয়ে উঠেছে।

অপরাপর কবি প্রসঙ্গ

এ পর্যন্ত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রধান প্রধান কৃষ্ণ কথা-কোবিদ্‌দের বিষয় আলোচনা করা হল। কিন্তু এঁরা ছাড়াও এই শতাব্দীর আরও বহু কবিই আছেন, যাঁদের অনেকে কালের কবলে হারিয়ে গেছেন, আবার অনেকে পুথিশালার চৌহদ্দিতে গবেষণার অপেক্ষায় আছেন। এখানে শেষোক্ত কয়েকজনের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হল।

ভবানী দাস (ঘোষ)

ভবানী দাস বোধ হয় কেবল দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডেরই কবি। দেখা যায়, কবির 'রাধাকৃষ্ণবিলাস' কাব্যটি দান ও নৌকাখণ্ডেরই কাহিনী।[১০২] এঁর নামে স্বতন্ত্র ভাবে এই খণ্ডগুলোর পুথিও পাওয়া যায়। পুথি থেকে জানা যায়, ভবানী দাস (ঘোষ)-এর রচিত কাব্যের নাম 'রাধা বিলাস' বা 'রাধাকৃষ্ণ বিলাস।' এই কাব্যের প্রাপ্ত সর্বাপেক্ষা পুরানো পুথির লিপিকাল ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দ।[১০৩] কবির পিতার নাম যাদবানন্দ, মাতার নাম যশোদা, নিবাস পাতণ্ডা, পাঠান্তরে পাশুণ্ডা, নবদ্বীপের কাছে। কবির কৃষ্ণলীলা কাব্যের পুথি উত্তর ও উত্তর-পূর্ববঙ্গেও পাওয়া গেছে।

নিজের কাব্যের উৎস সম্পর্কে কবি বলেছেন—

আগম পুরাণ বেদ বুধ মু(ে)খ গুনি।
সেই অনুসারে রচিল দাস ভবানী ॥
পাতণ্ড নিবাসী ঘোষ ভবানী অবোধ।
জনক জাদবানন্দ জননী জশোদা ॥
ভাদ্র মাস কৃষ্ণ পক্ষ উৎসব দিনে।
বিপ্ররূপে আজ্ঞা প্রভু করিল আপনে ॥
তাহার আজ্ঞাএ দানখণ্ড নৌকাখণ্ড করি।
সুধাসিন্ধু মাঝে যেন আনন্দ হঞা হরি ॥
বিপ্রবৃন্দ জত গুরুপদ করি আশ।
ভবানি দাস কহে রাধাকৃষ্ণর বিলাস ॥
দানখণ্ড নৌকাখণ্ড কবিত্ব রচিত।
শ্রীভাগবৎ কথা শুনহ নিভৃত ॥

দানলীলা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি রাধার কয়েকজন সখীর নাম করেছেন।[১০৪] মথুরার হাটে দধি-দুগ্ধ বিক্রয় করতে যাওয়ার জন্য রাধা এদের ডেকে আনলেন—

চন্দ্রাবলী চন্দ্রমুখী আর চন্দ্ররেখা।
মাধবি মালতি আর আইল কর্ণিকা ॥
বিলাসিনি রসবতি পদ্মলোচনি।
স্যাম ভদ্রা কলাবতি মধুর ভাসিনি ॥
সকল সখিকে রাধা করিল আদেশ
মথুরাকে জাবে বিখে করহ সুবেশ ॥

এখানে কবি চিরাচরিত লৌকিক কাহিনীর অনুবর্ত্তনে দানলীলা বর্ণনা করেছেন। যদি

গোস্বামী-প্রদর্শিত পথে কবি দানের কাহিনী বর্ণনা করতেন, তবে গোপিরা মথুরার হাটে না গিয়ে যেতেন বসুদেবের যজ্ঞশালায় গোবিন্দকুণ্ডের তীরে।

এ শতাব্দীর অন্য কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্যের মত এতেও রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। অবতার বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি চৈতন্য-অবতারের নাম উল্লেখ করেন নি। কল্কি অবতারের প্রসঙ্গেও চৈতন্যদেবের ছায়া পড়ে নি।

লক্ষ্য করার বিষয়, কবির ওপর প্রেমভক্তির যেমন কোন প্রভাব নেই, তেমনি চৈতন্যদেব সম্পর্কেও তিনি ভয়ঙ্করভাবে নীরব। এ থেকে অনুমান করে নেওয়া অসঙ্গত হবে না যে, এই কবি চৈতন্য প্রভাব পরিধির বাইরে কেবল লোক-সংস্কারের বশেই কাব্যরচনা করেছেন।

নরহরি দাস

নরহরি দাসের কাব্যের নাম কেশবমঙ্গল।[১০৫] বন্দনাংশে কবি সপরিজন গৌরাঙ্গ বন্দনা করেছেন। তবে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ গুণগ্রাহী—

বন্দো অবধোতচন্দ্র করি জোড় করে।
চৈতন্য হইতে প্রভু দয়ার সাগরে ॥
জগাই মাধাই জবে কানা ফেলি মাইল।
ক্রোধে মহাপ্রভু সুদর্শনে বোলাইল ॥
দয়াল নিতাই মহাপ্রভু সর্ত গিয়া।
তারে নিস্তারিলা নিজ বেয়ানা ভাবিয়া ॥

বন্দনায় কবি যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের গুণমুগ্ধ, তা প্রকাশ করেছেন। অবশ্য রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, লোকনাথ, শ্রীজীব প্রভৃতি দার্শনিকগণও আছেন। এ ছাড়া আছেন বহু চৈতন্য পার্ষদ। কবি বন্দনায় জাহ্নবী দেবীর উল্লেখও করেছেন। কবি যে অন্ততঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরবর্তী কবি, তা তাঁর এই বন্দনাংশ থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

এই পুথিটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নি, খণ্ডিত। তবে কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কবি বলেছেন—

দশম স্কন্ধের কথা ব্যাসের বর্ণিত।

দশম স্কন্ধের কৃষ্ণজন্মলীলার কথা-অংশকেই কবি বর্ণনা করেছেন। পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, ব্রহ্মাসমীপে ধরণীর গুহারী, নারায়ণের অবতার স্বীকার, বসুদেব-দেবকীর বিবাহ, ছয় পুত্রের বিনাশ, সঙ্কর্ষণ বলরামের জন্ম-কাহিনী, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, কৃষ্ণকে নন্দ গৃহে রেখে বসুদেব কর্তৃক মহামায়াকে নিয়ে আসা, কংসের কন্যারূপী মহামায়া বধের উদ্যোগ, শূন্যমার্গে কন্যার ভবিষ্যৎবাণী, শ্রীকৃষ্ণবধে কংসের পুতনাকে প্রেরণ-মন্ত্রণা, নন্দ-উৎসব, নন্দের মথুরা যাত্রা ও বাসুদেবের অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রত্যাবর্তন, কৃষ্ণহননে পুতনার বেশবাস প্রভৃতি এখানে বর্ণিত। এরপরই পুথি খণ্ডিত, অন্য কোনও পূর্ণাঙ্গ পুথির সন্ধানও আমরা পাই নি। ভণিতায় কবি বলেছেন—

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দাস দাস দাস অথ দাস।
তার সঙ্গ লৈতে নরহরি অভিলাস ॥

এই ভণিতাটি থেকেও আমাদের মনে হয়, ইনি সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদের কবি ছিলেন।

(দ্বিজ) নরসিংহ দাস

(দ্বিজ) নরসিংহ দাসের নামে 'উদ্ধব সংবাদ'-এর বহু পুঁথি পাওয়া যায়। কিন্তু নরসিংহ কেবলমাত্র 'উদ্ধব সংবাদ'-এরই কবি ছিলেন না। তিনি যে একটি পূর্ণাঙ্গ 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যও লিখেছিলেন, তা জানা যায় তাঁরই একটি ভণিতা থেকে—'কৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ নরসিংহ ভনে।'[১০৬] কবির পূর্ণাঙ্গ কৃষ্ণমঙ্গলের তুলনায় 'উদ্ধব সংবাদ' অংশটি বোধ হয় অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বিভিন্ন সংগ্রহশালায় কম করে হলেও বিশ-বাইশটি উদ্ধব সংবাদের পুঁথি আমরা পাই। কিন্তু সমগ্র কৃষ্ণমঙ্গলের কোন পুঁথির সন্ধানই আমরা এ পর্যন্ত পাই নি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির তালিকায় নরসিংহের নামে 'কৃষ্ণ কেলি চরিতামৃত'-এর যে পুঁথিটি আছে[১০৭] তা প্রকৃত পক্ষে নরসিংহের রচনাই নয়। কারণ পুঁথির কোথাও নরসিংহ ভণিতা নেই, ভণিতা আছে নিম্নরূপে—

দিন দিন বংশীদাস করে অনুমানে।
মন মর রহে গুরু বৈষ্ণব চরণে ।।

তালিকা প্রস্তুতের সময় এটি পাঠবিভ্রাটের ফল বলেই আমাদের বিবেচনা।

রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গ্রন্থাগারে শরৎকুমার রায় সংগ্রহের ৫১২ সংখ্যক পুঁথিটি 'উদ্ধব সন্দেশে'র। এর লিপিকাল ১০৭২ বঙ্গাব্দ (১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দ)। তাই আমরা কবিকে অন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি বলেই বিবেচনা করি। উদ্ধব সংবাদের নিরলংকৃত, প্রবহমান বাগ্‌ভঙ্গি ও গল্পকথন দক্ষতা বিশেষ প্রশংসনীয়—

বিন্দাবন পাসরিতে নারেন মাধবে।
বনাল্যা নিকুঞ্জবন বিন্দাবন ভাবে ।।
তাহাতে বসিলা কৃষ্ণ উদ্ধব সহিতে।
ভাবিতে লাগিলা কৃষ্ণ গোপিরস চিতে ।।
গোকুলে গোপির সঙ্গে জত কৈলে লিলা।
সে সব পাসরি কৃষ্ণ অবস হইলা ।।
সজল নয়ান দুটি বিন্দাবন ভাবে।
নিজ যুক্তি কথা কৃষ্ণ কহেন উদ্ধবে ।।
সুন সুন মর্ম্মসখা প্রাণের উদ্ধব।
আমার লাগিআ প্রান ধরে গোপি সব ।।
জখন আইলাম আমি মথুরা নগরে।
প্রবধ বচন দিয়া আইল সভারে
বিলম্ব না হবে মোর সুনহ উত্তর।
তরাএ আসিব আমি গোকুল নগর ।।
আমার বিলম্ব দেখি গোকুল নিবাসি।
সভে তেজিবে প্রাণ হেন মনে বাসি ।।
তেকারণে বলি উদ্ধব সুনহ উত্তর।
মোর পত্র নআ জাঅ গোকুল নগর।[১০৮]

"বৎসক হারায়্যা জেন ধায় ধেনুগণে"—প্রভৃতির মত কিছু কিছু প্রথাগত অলঙ্কৃতি থাকলেও নরসিংহ প্রধানতঃ সরল ভাষার কবি। উদ্ধব সংবাদের কারুণ্য প্রকাশেও এ ভাষা হৃদয়গ্রাহী।

দেখা যায় 'দ্বিজ নরসিংহ', 'নৃসিংহ দ্বিজ' কিংবা 'নরহরি দাস' নামেও কবি ভণিতা ব্যবহার করেছেন।

(দ্বিজ) গোবিন্দ

দ্বিজ গোবিন্দের কাব্যের নাম 'অক্রূর আগমন পালা'। [১০৯] পুঁথিটির লিপিকাল ১০৮২ সাল। কৃষ্ণকে আনার জন্য অক্রূরকে কংসের নির্দেশ থেকে কাহিনী আরম্ভ হয়েছে। শেষ হয়েছে—কৃষ্ণবলরামের স্বরূপদর্শনে, অক্রূরের স্তবে।

ভণিতা থেকে জানা যায় কবি শ্রীবল্লভ চক্রবর্ত্তী কাঞ্জিলালের পুত্র—

(১) কাঞ্জিলাল কুলোদ্ভব চক্রবর্ত্তী শ্রী বল্লভ
বিরচিল তাহার কুমার ॥

(২) চক্রবর্তি শ্রীবল্লভ তস্য সুত গোবিন্দ ব্রাহ্মণ ॥

কবির মায়ের নাম ছিল অপর্ণা। কারণ অপর একটি ভণিতায় কবি বলেছেন—

গাইল গোবিন্দ দ্বিজ অপর্ণানন্দন।
ভাবার্থ ভাবের ব্যাখ্যা করিয়া বর্ণন ॥

অন্যত্র কবি ভণিতায় বলেছেন—'শ্রী দ্বিজ গোবিন্দ গান শ্রীকৃষ্ণবিজয়।' এ থেকে মনে হয় কবি শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামক একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যও লিখেছিলেন।

কাব্যের মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। বর্ণনা সহজ, সরল। অক্রূরের গোকুল প্রবেশের বর্ণনা কবি এইভাবে দিয়েছেন—

প্রেমজলে অক্রূরের ছল ছল আঁখি।
উর্দ্ধবাহু কৃষ্ণ বল্যা নাচে জত সখি ॥
এরূপে নেহালে পাত্র হইঞা কৃতাঞ্জলি।
জয় দিয়া প্রবেশিলা গোকুল নগরী।
দেখিলা গোধন আগে পাছেতে কানাঞি।
পদচিহ্ন পথে পড়্যা গেছে কত ঠাঞি ॥
দুদিগে বালক গেছে জতেক বাছুর।
হেন লাগে মধ্যে গেছে ব্রহ্মার ঠাকুর ॥
পদচিহ্ন দেখি পথে আকুল অক্রূর।
গাইল গোবিন্দ দ্বিজ বাড়ি কৃষ্ণপুর ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিদায়ের সময় শোকাতুরা গোপীদের বর্ণনায়ও কবি আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন—

কৃষ্ণের বিরহে শূন্য সভাকার তনু।
বলবুদ্ধি গোপিকার সব নিল কানু ॥

জিজ্ঞাসিতে কথা কার নাঞি সরে মুখে।
কেবল প্রেমের ধারা বায়্যা পড়ে বুকে ॥

কবির এই কাব্যে মূল সুর প্রেমভক্তির।

কবি বল্লভ

'কৃষ্ণ সংহিতা' নামক কোন গ্রন্থ অবলম্বন করে কবিবল্লভ 'রসকদম্ব' গ্রন্থটি রচনা করেন।[১১০] কবির কাব্যরচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ ভাগ এবং তাঁর নিবাস ছিল আরড়া গ্রামে। এ সম্পর্কে কবি কব্যের মধ্যেই বলেছেন—

করোতোয়া তীরে মহাস্থানের সমীপে।
আরড়া গ্রামেত বাস আছিল স্বরূপে ॥
ফাল্গুনী ফাল্গুন ফাগু পৌষ মাসী দিনে।
বিংশতি অংশক গুরুবার শুভক্ষণে
বিংশতি অধিক পঞ্চদশ শত শক।
তখনে রচিল রসকদম্ব পুস্তক ॥

কব্যের মধ্যে কবি পিতামাতার নামও উল্লেখ করেছেন—

পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাতা।
জন্মাঞা গোচর কৈল সংসারের কথা ।।[১১১]

গুরু সম্পর্কে বলেছেন—

শ্রীযুত উদ্ধব দাস জ্ঞান চক্ষুদাতা।
সে পদকমলে মন রহুক সর্ব্বথা ।।

অন্যত্র—
নিজগুরু ঠাকুর উদ্ধব দাস নাম।
তাহার প্রসাদে হৈল সংসার শুভান ।।

কাব্যের গঠন সম্পর্কে কবি বলেছেন—

শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা দেখি করিল আরম্ভ।
পয়ারে লেখিল তত্ত্ব সরস কদম্ব ।।
চতুর্দ্দশ অক্ষরে লেখিল ক্ষুদ্র ছন্দ।
ছাব্বিশ বিংশতি দীর্ঘ মধ্যমে নির্ব্বন্ধ ।।

অন্যত্র বলেছেন—
রচিল সহস্র পদী পুস্তক সুন্দর।
দুই শতাধিক ছয় অযুত অক্ষর ।।

কবির কাব্যরচনার উদ্দেশ্য ভক্তিরসের বিস্তার। কাব্যের বিষয়-বস্তু হল, কৃষ্ণের ও রুক্মিণীর কথোপকথন। এতে বৈষ্ণবদের উপাসনা তত্ত্বের বহু কথা প্রকাশিত। উদ্ধব দাস বৃন্দাবনস্থ রূপ সনাতনের কাছে যে রসতত্ত্ব শ্রবণ করেন, কবি বনমালীর মারফৎ সেই তত্ত্বই কাব্যরূপ লাভ করেছিল।

গ্রন্থের আরম্ভে কবি সংস্কৃতে শ্রীকৃষ্ণবন্দনা করেছেন—

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রায় নমঃ।
চূতা পুষ্পময়ী শিখণ্ডরুচিরা বয়ংসি চ বিম্বাধরৈঃ।

কৈশোরঞ্চ বরঞ্চ নয়নকন্দর্পদৃষ্টি প্রভো ॥
রম্যং রত্নময়ং বপুশ্চ বসনং হেমপ্রভং ।
বৃন্দারণ্যে কলানিধির্বিজয়তে ক্রীড়া স রাসোৎসবঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণ পদাম্বুজং রম্যং মধুব্রতং ।
নবা রাসকদম্বাখ্যং করোতি কবিবল্লভং ॥

আবার বাংলায় কৃষ্ণবন্দনাও আছে—

জয় জয় নাগর শেখর রসগুরু ।/ অযাচক যাচক পূরক কল্পতরু ।।
প্রেমরস ভক্তি দানে শুদ্ধ মহাশয় ।/দোষলেশ নাহি ধরে গুণের আশ্রয় ।।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, পরশুরাম রায়ের মাধব সঙ্গীতে যেমন তত্ত্বকে জনোপযোগী করে তেলোর একটা চেষ্টা রয়েছে, এখানেও সেই একই প্রবণতা কাজ করেছে।

এ পর্যন্ত সপ্তদশ শতাব্দীর পদাবলী ও কৃষ্ণকথাবিষয়ক কাব্যগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল। এই শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব আর প্রায় নেই, তার পরিবর্তে এসেছে শ্রীনিবাস, নরোত্তম প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্যদের প্রভাব। কাব্যগুলির লোক-মুখিনতা আরও বেড়েছে। প্রধানতঃ সেই ভাগবতই অবলম্বন করা হলেও, লৌকিক প্রসঙ্গ ও উপস্থাপনায় লৌকিক ভঙ্গী প্রশ্রয় পেয়েছে আরও বেশি। তত্ত্বকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে, দুএকটি ক্ষেত্রে যেখানে তত্ত্ব রয়েছে, সেখানে তাকে জনমুখী করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কবিদের সে প্রচেষ্টা যে খুব একটা সফল হয় নি, তার প্রমাণ পরবর্তী কালে এর বিরল অনুসৃতি।

ভবানন্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ধারায় কাব্য রচনা করে তার মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চৈতন্য-ঐতিহ্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু এই কবির কাব্যকে বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে স্থান দেওয়া হয় নি। তার কারণ, কাব্যের মধ্যে চৈতন্য-বন্দনা করলেও তিনি শ্রীরূপের বিরুদ্ধ মতের অনেক কথা বলেছেন। যেমন—শ্রীরাধার কৃষ্ণ দেহে লীন হওয়া, রাধার ননদী ও ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের আলোচ্য কৃষ্ণকথার প্রবণতা ও পরিণতি সন্ধানে এই কাব্যটির মূল্য অপরিসীম। সমকালীন সমাজের বাস্তব ও জীবন্ত চিত্র এর মধ্যে ধরা পড়েছে। এই শতাব্দীরই অপর দু একজন কবির মধ্যে এই ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। তবে তাঁরা ভবানন্দের মত শক্তিশালী কবি নন।

এই যুগে গোস্বামিদের রচিত অলঙ্কারশাস্ত্র, কাব্য এবং নাটকের অনুসরণেও যে কাব্য রচিত হয়েছিল, তার প্রমাণও আমরা অলোচনার মধ্যে পেয়েছি। অর্থাৎ এক দিকে গোস্বামিদের অনুকরণ এবং অন্যদিকে লৌকিকতার প্রতি সমধিক আগ্রহ, সপ্তদশ শতাব্দীর কৃষ্ণকথার মধ্যে আমরা এই উভয় বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করি।

১. 'গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' থেকে পুনরুদ্ধৃত; পৃ. ১০০
২. কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়।
৩. উজ্জ্বলনীলমণি; বহরমপর সংস্করণ; পৃ. ৩৬৪
৪. গীতগোবিন্দ; নবম সর্গ; শ্লোক-২
৫. বিদ্যাপতির পদাবলী; মিত্র মজুমদার সংস্করণ; পদ-৬৫৮; ৬৫৯
৬. ভাগবত; ১০।২৯।১৭
৭. তদেব; ১০।৩৩।১৮
৮. তদেব; ১০।৩৩।১৯
৯. সদুক্তিকর্ণামৃত; ২।১৩২।১

১০. ভাগবত ; ১০।৩৯।২২
১১. তদেব ; ১০।৩৯।২৭
১২. তদেব ; ১০।৩৯।২৮
১৩. উজ্জ্বলনীলমণি-স্থায়ীভাব প্রকরণ। ১৮৯ শ্লোক
১৪. স্তবমালা ; পৃ. ১৭৪
১৫. তদেব ; পৃ. ১৭৭
১৬. পদকল্পতরু ; ৩০৭২
১৭. তদেব ; ৩০৫৯
১৮. তদেব ; ১ম খণ্ড ; পৃ. ১৫
১৯. বৈষ্ণব পদাবলী ; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত পৃ. ১১২০
২০. ভক্তিরত্নাকর ; ১০ম তরঙ্গ ; ১৩৬ পয়ার
২১. পদকল্পতরু ; পদসংখ্যা-১৫৮৪
২২. হরিবংশ ; বিষ্ণু পর্ব ২৮।৫৭-১১২
২৩. ব. সা. প, পুথিসংখ্যা-২৩৫৩ ; লিপিকাল-১১১১ সাল
২৪. ব. সা. প, পুথিসংখ্যা-২৪২১
২৫. ক. বি. পুথিসংখ্যা-১০৬০
২৬. বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ.-১০৮৭
২৭. ভাগবত ; ১০।৮।৩২ -৪০
২৮. পাঁচশত বৎসরের পদাবলী ; পদসংখ্যা-২৫৬
২৯. তদেব ; পদসংখ্যা-২৬১
৩০. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ; (৩য় সংস্করণ) ; পৃ. ১০৪ থেকে পুনরুদ্ধৃত।
৩১. বিদগ্ধমাধব ; দ্বিতীয় অংক
৩২. তদেব।
৩৩. এই আলোচনায় তারাপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত (১৩৩৩) গ্রন্থটি ব্যবহৃত হয়েছে।
৩৪. বাঙ্গালা সাহিত্য ; (দ্বিতীয় খণ্ড) শ্রীমণীন্দ্র মোহন বসু ; পৃ. ১৯৮
৩৫. মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ; ভূমিকা ; পৃ.-২৷৷০ ; খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত।
৩৬. ভাগবত ; ১০।৮।৪৮
৩৭. তদেব ; ১০।২।২৮
৩৮. তদেব ; ১০।৩।৩২ -৪৫
৩৯. তদেব ; ৩।২৪।১ -১৯
৪০. তদেব ; ১০।৬।৯
৪১. তদেব ; ১০।১১।১০ -১১
৪২. তদেব ; ১০।১৩, ১৪
৪৩. তদেব ; ১০।৪৭।৬৯
৪৪. তদেব ; ১০।৪৯
৪৫. তদেব ; ১০।৫২।১৫
৪৬. তদেব ; ১০।৬৫
৪৭. তদেব ; ১০।৬৬
৪৮. তদেব ; ১০।৮০ -৮১
৪৯. হরিবংশ ; বিষ্ণুপর্ব ; ৭৬।১২ -১৩
৫০. ভাগবত ; ২।৭
৫১. তদেব ; ৮।১৮ -২৩
৫২. তদেব ; ১০।২২।৩১ -৩২
৫৩. তদেব ; ১০।১৬
৫৪. তদেব ; ১০।৪৩
৫৫. সাহিত্য পরিষদ রক্ষিত চিত্তরঞ্জন সংগ্রহ ; পুথি সংখ্যা-২৭৭
৫৬. বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য় খণ্ড ; প্রথম সংখ্যা) শিবরতন মিত্র সম্পাদিত ; পুথিসংখ্যা-৪৫
৫৭. সা. প. প. ; ১৩০৪ ; ৪র্থ ; ৯০
৫৮. বা. সা. ই. ১ম, অপরার্ধ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৫, পৃ. ৬৮ থেকে পুনরুদ্ধৃত।
৫৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি ; ৩০৬৫ (১৬৩০ শকাব্দ) ; ভক্তি প্রদীপ নামে কৃষ্ণ-কিংকরের অনূদিত অন্য পুথি আছে এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহে, সংখ্যা ৫৩ ৭৮ (১৫৬৭ শকাব্দ)
৬০. মধুসূদন অধিকারী সম্পাদিত জয় গোপাল দাসের শ্রী কৃষ্ণবিলাস (১৩২২)
৬১. প্রসঙ্গত : একটি সন্দেহের কথা উল্লেখ করি। সোসাইটির Descriptive—Catalogue-এ পুথিটির আরম্ভ ও শেষ যেমন বর্ণিত হয়েছে কিংবা পত্রসংখ্যার যে উল্লেখ আছে, বর্তমানে পুথিটিকে সে অবস্থায় পাই নি। (Catalogue-এ উল্লিখিত পত্রসংখ্যা ১৮৩টি। বর্তমান ১৪২টি) ড. সেন তাঁর আলোচনায় পুথিটির বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রজ-লীলার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে তা নেই। ড. সেন দেখেছিলেন ব্রজলীলা অবধি গুরুর দোহাই। পরের অংশে তা ছিল না। কিন্তু বর্তমানে ব্রজলীলার পত্র-

বর্তী যে অংশটি আছে, তাতেও গুরুর দোহাই পাওয়া যায়। ওপরে একটি নমুনাও উদ্ধৃত হয়েছে। ফলে এক্সি-৫৪২১ সংখ্যক পুথির আধারে যে পুথিটি পাচ্ছি, তাকে প্রামাণিক হিসেবে গ্রহণ করতে সহজেই কুণ্ঠিত হচ্ছি।

৬২. এশিয়াটিক সোসাইটি (গভর্ণমেন্ট সংগ্রহ) ৫৪২১
৬৩. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; পুথি-৪৭৪২
৬৪. সাহিত্য প্রকাশিকা ; ষষ্ঠ খণ্ড ; পৃ. ৬২
৬৫. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম ; পৃ. ৮৭
৬৬. বিষ্ণুপুরাণ ; ৫।১।৫৯-৬০
৬৭. ভাগবত ; ১০।২২।৮-৮১ ; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ; ৪।২১।৪৮-১২৭
৬৮. ভাগবত ; ১০।২৪।১৩-৩৩
৬৯. বিষ্ণুপুরাণ ; ৫।১০।২৮-৩৬
৭০. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ; ৪।২১।৪৮-১২৭
৭১. ভাগবত ; ১০।৩০।৩৫-৩৮
৭২. ভাগবত ; ১০।৪৩।৩৯-৪০
৭৩. তদেব ; ১০।৪৫।২৬, ১০।৪৬।৩৪
৭৪ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ; ৪।৯৩।৩৮-৪০, ৪।৯৩।৮০-২
৭৫. ভাগবত ; ১০।৮২।১৩-৪৬
৭৬. তদেব ; ১০।৬৫।১ ; বিষ্ণুপুরাণ ; ৫।২৪।৮ ; হরিবংশ ; ২।৪৬।১
৭৭. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ; ৪।১২৬।১-৭
৭৮. সাহিত্য পরিষদ-১২৮৭, ক. বি.-২৮২৭
৭৯. ঢা. বি., ৪০৫০
৮০. ঢা. বি., ৪০৫০
৮১. সা. চি. ২৮০, পুথিটি একটি পালাগানের সংকলন। এতে বংশীদাসের পদও আছে।
৮২. ক বি. ৫৭১৫
৮৩. সা. প. প. ১৩০৫।১ম, ১৮
৮৪. ক. বি.-৫২৯৬
৮৫. ভাগবত ; ১০।৪৬, ৪৭, ৪৮
৮৬. তদেব ; ১০।৫২।১২
৮৭. নলিনীনাথ দাশগুপ্ত সম্পাদিত কৃষ্ণমঙ্গলে কিংবা পুথিগুলিতে শ্রীবৎসচিন্তা পালা নেই। ভণিতা দৃষ্টেও এদের ঐক্য বোঝা যায় না। কারণ 'শ্রীবৎসচিন্তা' পালার ভণিতায় কোথাও দ্বিজ বা বিপ্র বলে কবি উল্লেখ করেন নি, যা কিন্তু কৃষ্ণমঙ্গলের কবির একটা প্রবণতা হিসেবেই লক্ষ্য করা যায়। এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য। সা. প. প. ১৩৮৭, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ৪৪
৮৮. ভাগবত ; ৬।১-২
৮৯. তদেব ; ১০।২৯।৩৭-৪১
৯০. তদেব ; ১০।৩০।৩৮, ৩৯
৯১. সা. প. পুথি সংখ্যা-১২৯৪ ; ক. বি. পুথি সংখ্যা-২৭৫৮
ভাগবত ; ১০।৪২
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ; ১০৫।১৮
৯৪. হরিবংশ ; বিষ্ণু পর্ব ; ৩১-৪৮
৯৫. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৮৭ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা ; কার্ত্তিক-পৌষ, ১৩৮৭
এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত গভর্ণমেন্ট সংগ্রহ ; পুথি সংখ্যা-৫৬৭৮
৯৭. পাঠটি 'নিবাস' হবে কিনা সংশয় প্রকাশ করি।
মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদ ; পুথি সংখ্যা-১১৬
ভাগবত ; ১০।২৯।১০-১১
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ; ৩য় খণ্ড ; ৪৯২ পৃষ্ঠা ; প্রথম সংস্করণ।
১০১. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম ; প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ২৫০
১০২. সা. প. প.। ১৩৬৩। ১ম। রাধাকৃষ্ণ বিলাস। পুথি পরিচয়-১। ৭৮
১০৩. বঙ্গীয় জীবনীকোষ (১ম খণ্ড) পৃ. ৩৮৪
১০৪. সা. প. ; পুথি সংখ্যা-৫৫৭
১০৫. সা. প. ; পুথি সংখ্যা-২৩০১
১০৬. সা. প. ; পুথি সংখ্যা-৩০৬
১০৭. ক. বি. ; পুথি সংখ্যা-২৮২৭
১০৮. সা. প., পুথি সংখ্যা-৩০৬
১০৯. সা. প., পুথি-১৯৪
১১০. তারকেশ্বর ভট্টাচার্য ও আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ; ১৩৩২ সাল।
১১১. এই উদ্ধৃতি সহ পরবর্তী উদ্ধৃতিগুলি আবদুল করিম সম্পাদিত বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা) থেকে গৃহীত।

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণকথা

ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্যে প্রত্যক্ষভাবে চৈতন্য প্রভাবের ফলে যে বিপুল ভাবের প্লাবন দেখা দিয়েছিল, সপ্তদশ শতাব্দীতে তার প্রবাহ কিছুটা স্তিমিত হয়েছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে তা একেবারেই গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হল। এর ফলে পদাবলীর মধ্যে নতুন কোন ভাবের উদ্দীপনা দেখা গেল না, অষ্টাদশ শতাব্দীর পদাবলীকারেরা কেবল চর্বিত চর্বণই করলেন মাত্র। এই যুগের একটি বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন বৈষ্ণব মহাজন কর্তৃক পদাবলী সংকলন। কিন্তু এই পদাবলী-সংকলন আমাদের আলোচনার বিষয় নয়, আমরা কেবলমাত্র এই শতাব্দীর পদকর্তাদের পদগুলির বৈশিষ্ট্য নিয়েই আলোচনা করব।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

এই যুগের পদকর্তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। ভাগবতের টীকাকার রূপে বিখ্যাত হলেও ইনি বল্লভ বা হরিবল্লভ ভণিতায় বেশ কিছু পদ রচনা করেছিলেন। নদীয়া জেলার দেবগ্রামে ১৬৪৬ খ্রীস্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁর স্বগ্রামেই নানা বিষয়ে তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন। বিবাহ করলেও যৌবনে ইনি ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করেন এবং তারপর বৃন্দাবনে যান। প্রায় আশী বছর বয়সে তিনি বৃন্দাবনেই ইহলোক ত্যাগ করেন। ইনি যে কেবল পণ্ডিত ছিলেন, তা নয়। ইনি ছিলেন দার্শনিক, ভক্ত, রসবেত্তা, কবি ও পরম বৈষ্ণব। ইনি বহু গ্রন্থ—যেমন, কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতের টীকা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার টীকা, বিদগ্ধমাধবের টীকা প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা শুধু তাঁর পদগুলি নিয়েই আলোচনা করব। পদগুলিতে কবি কোন সময়েই আসল নাম ব্যবহার করেন নি। বল্লভ বা হরিবল্লভ ভণিতা ব্যবহার করেছেন। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার নানা পর্যায় নিয়ে কবি পদ রচনা করেছেন। যেমন—শ্রীরাধার পূর্বরাগ, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমোৎকণ্ঠা, কেলিবিলাস, শ্রীকৃষ্ণের অভিসার প্রভৃতি। কৃষ্ণের পূর্বরাগ নিয়ে এই কবি বেশ কয়েকটি পদ রচনা করেছেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পদে আমরা বিরহিণী রাধার যে অবস্থা দেখতে পাই, এখানে কবি বিরহী কৃষ্ণের সেই অবস্থা বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণের অবস্থা দেখে রাধার কাছে গিয়ে সখী বলে—

> আজু হাম পেখলুঁ কালিন্দীকূলে।
> তুয়া বিনু মাধব বিলুঠই ধূলে ॥ (বৈ· প· পৃ· ৮২৫)

কৃষ্ণের এই অবস্থা দেখেই সখী রাধাকে কৃষ্ণের কাছে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এই কবির পদে দেখছি, রাধা কৃষ্ণের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছেন এবং সখী তাকে এই বলে প্রবোধ দিচ্ছেন—

> মাধব নহি পরশিব তুয়া অঙ্গ ॥ (বৈ. প. পৃ. ৮২৬)

রাধার এই ভীতি এবং সখীর প্রবোধ বাক্য একেবারে সেই বিদ্যাপতির যুগ থেকেই প্রচলিত। রাধার অভিসারের বর্ণনাও এই কবির পদে গতানুগতিক। এ ছাড়া শ্রীরূপ

বর্ণিত মুগ্ধা ও প্রগল্‌ভা নায়িকার সম্ভোগও কবি বর্ণনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে অর্থাৎ অদূর প্রবাসজনিত বিরহের বর্ণনা পদাবলী সাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত নয়। এই কবি এটিকে বিষয়বস্তু করে একটি পদ রচনা করেছেন। এ ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের মানিনী রাধার প্রতি অনুনয়, অভিসার শেষে কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের মিলন ইত্যাদি পর্যায় নিয়েও এই কবি পদ রচনা করেছেন। মিলনানন্দ ও বিপরীত সম্ভোগের দুটি পদের বিষয়বস্তুও বৈষ্ণব-সাহিত্যে গতানুগতিক। রাধার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি হিসেবে এই কবি দুটি সংস্কৃত পদও রচনা করেছেন। এর একটিতেকৃষ্ণ রাধার সখীকে অনুরোধ করেছেন, রাধাকে অভিসারে আনার জন্য—

ইহ নব বঞ্জুল কুঞ্জে।
কুরুবক কুসুম সুষম নব গুঞ্জে॥
তামভিসারয় ধীরাং।
ত্রিজগদতুল গুণ গরিম গভীরাং॥ (বৈ. প. পৃ. ৮৩৬)

বিশ্বনাথের সংস্কৃত ও বাংলা, উভয় পদের মধ্যেই শিল্প সুষমার যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছে। কথা বস্তুর দিক দিয়ে তিনি শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণির বিভিন্ন রস-পর্যায়কেই বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন।

নরহরি চক্রবর্তী

নরহরি চক্রবর্তী বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্যের পুত্র ছিলেন। ইনি প্রচুর সংখ্যক পদ রচনা করেন। ছন্দোনির্মিতিতে কবি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ইনিও দুটি পদ-সংকলনের পরিকল্পনা করেন। একটি 'গৌর চরিত চিন্তামণি', অপরটি 'গীতচন্দ্রোদয়'। কবির আর একটি নাম ছিল ঘনশ্যাম। কবি নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন—

না জানি কি জানি মোর হইল দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম॥[১]

নরহরিদাস গৌর ও নিত্যানন্দ বন্দনার কিছু পদ রচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার রূপ বর্ণনায় কবি কারও জবানীতে নয়, যেন নিজেরই প্রত্যক্ষ-গোচর করার আনন্দকে ব্যক্ত করেছেন। রাধার রূপ বর্ণনায় কবির কোন কোন উপমা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথা মনে করিয়ে দেয়—

ঝলমল সিঁথে সিন্দুর কচপাশ।
মেহ নিয়ড়ে কি অরুণ পরকাশ॥ (বৈ. প. পৃ. ৮৪৩)

তুলনীয়—

কেশপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।
সজল জলদে যেন উয়িল নব সুর॥[২]

রূপবর্ণনার মধ্যে, নতুনত্ব কিছু না থাকলেও কবির বলার ভঙ্গি খুবই সুন্দর। রাধার পূর্বরাগের পদে কবি বলেন, কানড় কুসুম হাতে নিয়ে রাধা অনিমেষ সেই দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর যে কি হয়েছে, তা কবি প্রশ্ন করেও বুঝতে পারেন না। পদটি ক্ষুদ্র হলেও রাধার পূর্বরাগের ভাব বর্ণনায় সার্থক। শ্রীরূপ বর্ণিত চিত্র-

পট দর্শনে রাধার পূর্বরাগের প্রসঙ্গ নিয়েও কবি একটি পদ রচনা করেছেন। পূর্বরাগের দশ দশার মধ্যে প্রথম লালসা। এটিকে বিষয়বস্তু করেও নরহরি পদ রচনা করেছেন।[৩]

শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রৌঢ় পূর্বরাগের ষষ্ঠ দশাকে 'বৈয়গ্র' বলে অভিহিত করা হয়েছে। 'বৈয়গ্র' বলতে বোঝায় ভাব গাম্ভীর্য জনিত বিক্ষোভের অসহিষ্ণুতা। নরহরি চক্রবর্তী এইভাব নিয়েও একটি পদ রচনা করেছেন। রাধার সখী কৃষ্ণের কাছে রাধার এই অবস্থার বর্ণনা করেছেন—

ওহে নিকরুণ কহিব কত।
অবলা পরাণে সহে কি এত॥
না জানি কি কৈলে আঁখির ঠারে।
সে সব কাহিনী কহিতে নারে॥
*   *   *   *   *
নিরজনে নিজ সখীরে লইয়া।
না জানি কি কহে শপথ দিয়া॥
নিরবেদে ধনী না বাঁধে থেহা। (বৈ. প. পৃ. ৪৮৬)

'অবলা পরাণে সহে কি এত' শ্রীরাধার মনের বিক্ষোভকেই রূপ দিয়েছে। পূর্বরাগের উন্মাদ দশা নিয়েও নরহরি পদ রচনা করেছেন।

পূর্বরাগের দশম দশা 'মৃত্যু'। এই পর্যায়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে শ্রীরূপ উজ্জ্বলনীলমণিতে একটি শ্লোকরচনা করেছেন—

রাধা রোধসি রোপিতাং মুকুলিনীমালিঙ্গ্য মল্লীলতাং
হারং হীরময়ং সমর্প্য ললিতাহস্তে প্রশস্ত শ্রিয়ম্।
মূর্চ্ছমাপ্নুবতী প্রবিশ্য মধুপৈর্গীতাং কদম্বাটবীং
নাম ব্যাহরতা হরেঃ প্রিয়সখীবৃন্দেন সন্ধুক্ষিতা॥[৪]

অর্থাৎ, রাধা যমুনাতটে স্বহস্তে রোপিতা মুকুলিতা মল্লীলতাকে আলিঙ্গন করে প্রশস্ত হীরকময় হারটিও ললিতার হাতে সমর্পণ করে মধুকরগুঞ্জিত কদম্ববনে প্রবেশ করে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হলে, প্রিয়সখীরা শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করে তাঁকে সঞ্জীবিত রেখেছিলেন। নরহরি চক্রবর্তী এই শ্লোকটির অনুসরণে লিখেছেন—

মাধব। অব কি কহব তুয়া পাশ।
সো বিরহিণী ধনী হোওল নিরাশ॥
*   *   *
তুরিত কণ্ঠ সঞে হার উতারি।
সোঁপল সখীক করহি কর ধরি॥
নিজকর রোপিত মল্লী নব বেলী।
কহি কত তাহে আলিঙ্গন দেলি॥[৫]

অনুরূপভাবে নরহরি শ্রীকৃষ্ণেরও পূর্বরাগ পর্যায়ের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যেমন সখী রাধাকে বলছেন, কৃষ্ণ উন্মাদ অবস্থায় উপনীত হয়েছেন এবং—

তুয়া তনু অনুখণ করই ধিয়ান।
সো সুপুরুষবর হরল গেয়ান ॥
কহইতে উনমত তুয়া পরসঙ্গ।
কাঁপই ঘন ঘন ঘন ঘিনি অঙ্গ ॥ (বৈ. প. পৃ. ৮৪৭)

শুধু তাই নয়, রাধার প্রেমে কৃষ্ণ 'মৃত্যু' দশায়ও উপনীত হন। (ঐ)

কৃষ্ণের এই দশমী দশার কথা শুনে রাধাও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। উপায়ান্তর না দেখে দূতী পরস্পরের গলায় পরস্পরের মালা দিলেন। সেই মালার স্পর্শে তাঁরা পরস্পরের স্পর্শ পেলেন। তাঁদের জ্ঞান ফিরে এল (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ৮৪৮)। কবির মিলন পর্যায়ের পদগুলি গতানুগতিক। ইনি রাসলীলার যে পদ লিখেছেন, তাতে ঋতুর উল্লেখ নেই। তবে পূর্ণিমা রাত্রির উল্লেখে এটিকে ভাগবতানুসারী শারদরাস বলেই মনে হয়। দেখা যাচ্ছে, পদ রচনায় কবি কথাবস্তুতে কোন নতুনত্বের সঞ্চার করতে পারেন নি, সর্বতোভাবে রূপ গোস্বামীকেই অনুসরণ করে গেছেন।

রাধামোহন ঠাকুর

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সমসাময়িক কালেই রাধামোহন ঠাকুরেরও আবির্ভাব হয়। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। রাধামোহন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ইনি জয়পুর রাজ জয়সিংহের সভাপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টকে পরাজিত করে পরকীয়া মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। 'পদামৃতসমুদ্র' তাঁর বিখ্যাত পদসংকলন গ্রন্থ। মহারাজ নন্দকুমার রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। রাধামোহন ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। রাধামোহনের বেশীর ভাগ পদই উজ্জ্বলনীলমণিতে বর্ণিত বিভিন্ন ভাবের উদাহরণ দেওয়ার জন্য রচিত হয়েছে। কথিত আছে, গোবিন্দদাস যে সমস্ত ভাব নিয়ে পদ রচনা করেন নি, ইনি সেইগুলি নিয়েই পদ রচনা করেছেন এবং এইভাবে কীর্তনগানের চৌষট্টি রসকে পূর্ণতা দান করেছেন। রাধামোহন তাঁর সংকলিত পদামৃতসমুদ্রের 'মহাভাবানুসারিণী' নামে টীকাও রচনা করেছেন।

রাধামোহন ঠাকুর সংস্কৃত এবং ব্রজবুলি, উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। তবে শব্দের হিল্লোলিত বিলাস রয়েছে—

মরকত মঞ্জুল কান্তি মনোহর
মানিনি-মান-বিমোহ।
মাথহিঁ মোর মুকুট ধর সুন্দর
মোহন পিত পট শোহ ॥
মাধব মধুর মুরতি জনু কাম।
মাধবি-মল্লি-মুকুলবর-মাধুরী
মালতি মিলু ঠাম ঠাম ॥ (বৈ. প. পৃ. ৯২১)

এই শব্দবিলাস গোবিন্দদাসের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পূর্বরাগের দশ অবস্থার বিভিন্ন পর্যায় নিয়েই রাধামোহন পদরচনা করেছেন। একটি পদে রাধা পূর্বরাগের দশমী অবস্থার চরম পর্যায়ে পৌঁচেছেন। সখী কৃষ্ণের কাছে রাধার অবস্থা জানিয়েছেন। কিন্তু কৃষ্ণ রাধার কাছে আসেন নি। সখী একা ফিরে এলে রাধা বলেছেন, কৃষ্ণ যদি রাধাকে উপেক্ষা করেন, তাহলে—

তুহুঁ কাহে বিরস বদনে ঘন রোয়সি
কিয়ে পুন কয়লি অকাজ। (বৈ. প. পৃ. ৯৩৪)

এরপর মৃত্যুদশার দ্বারপ্রান্তে উপনীতা রাধা সখীকে সম্বোধন করে বলেন—

ইহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব ,
মৃত তনু রাখবি হামার।
কবহুঁ শ্যাম তনু পরিমল পায়ব
তবহুঁ মনোরথ পূর॥ (বৈ. প. ; পৃ. ৯৩৫)

সখীর কাছ থেকে রাধার এই অবস্থার কথা জেনে কৃষ্ণ রাধার অভিসারে চললেন। কৃষ্ণের অভিসার বর্ণনায় রাধামোহন ঠাকুর কৃষ্ণের যে ভাবরূপ অঙ্কন করেছেন, তা চৈতন্যদেবেরই মূর্তি—

চলইতে খলই চলই নাহি পারই
কত কত ভাব বিথারি। (বৈ. প. ; পৃ. ৯৩৫)

বাসক সজ্জিকা রাধার সঙ্গে মিলনের শেষে কৃষ্ণ রাধার বেশবাসও বিন্যস্ত করে দিয়েছেন। এ ছাড়া কবি ধীরা মধ্যা খণ্ডিতা ও অধীরা মধ্যা খণ্ডিতা রাধাকে নিয়েও পদ রচনা করেছেন। শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণি বর্ণিত নানা পর্যায়, যেমন—মানান্তে মিলন, সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ, মান-প্রকারান্তর, অকারণ মান, শ্রীরাধার স্বয়ংদৌত্য, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য প্রভৃতি পর্যায় নিয়ে কবি পদ রচনা করেছেন। রসালসের পদে উভয়ের সদ্য-বিচ্ছেদ ভারাক্রান্ত অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেন—

একহি পরাণ দেহ পুন ভিন ভিন
অতয়ে সে মানয়ে দুখ॥ (বৈ. প. ; পৃ. ৯৪১)

শ্রীরাধার হিমকালের অভিসারও এই কবির পদে রয়েছে। শ্রীরূপের বিদগ্ধ মাধব নাটকের গৌরী আরাধনা ছলে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলনপ্রসঙ্গ পদাবলী সাহিত্যের একটি পরিচিত কথাবলম্বন। রাধামোহন তা নিয়েও পদরচনা করেছেন। মিলন পর্যায়ের একটি পদে কবি কৃষ্ণের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা ভাবের আন্তরিকতায় অতুলনীয়—

নূপুর-কলরব শুনইতে মাধব
কুঞ্জক হোই বাহার।
চলই তে খলই বলই সব আভরণ
অম্বর নহত সম্ভার॥ (বৈ. প. ; পৃ. ৯৪৩)

প্রকৃতপক্ষে রাধামোহন রাধাকৃষ্ণলীলার বিভিন্ন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যায়গুলি নিয়ে সাত্ত্বিকভাবেই পদ রচনা করে গেছেন। কথাবস্তু বা ভাববস্তুর দিক দিয়ে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য তাঁর পদে লক্ষ্য করা যায় না। গ্রীষ্মকালে রাধাকৃষ্ণের সরোবর মন্দিরে মিলনের প্রসঙ্গও কবি বর্ণনা করেছেন। শ্রীরূপের 'ললিতমাধব' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে আছে, কৃষ্ণ যখন মথুরায় চলে যাচ্ছেন, তখন রাধা তাঁর রথের সামনে গিয়ে

উপস্থিত হয়েছেন। সেই সময় রাধার অবস্থা বর্ণনা করে বৃন্দা বলেছেন, শ্রীরাধা কখনও বা বিলাপ করতে করতে রথের সামনে লুটিয়ে পড়ছেন, কখনও বা সজল চোখে কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, কখনও বা দন্তে তৃণধারণ করে বলরামের সামনে আছড়ে পড়ছেন। হায়, এ দেখে কার না অত্যন্ত দুঃখ হয়।

রাধামোহন এই প্রসঙ্গ নিয়েই রাধার ভবন্ বিরহের পদ রচনা করেছেন—

খেনে খেনে কান্দি লুঠই রাই রথ আগে
খেনে খেনে হরি মুখ চাহ।
খেণে খেণে মনহি করত জানি ঐছন
কানু সঞে জীবন যাহ ॥
* * *
খেণে তৃণ মুখে ধরি রথক আগুসরি
আছাড়ি পড়ল নিজ অঙ্গে। (বৈ. প. ; পৃ. ৯৪৬)

পদের প্রথম চরণে কবি মূলকে অনুসরণ করে, পরের চরণেই বলেছেন, রাধা ক্ষণে ক্ষণে এমন মনে করেছেন যে, কৃষ্ণ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণও বুঝি চলে যাবে। অর্থাৎ কৃষ্ণের বিরহে রাধা মৃত্যুমুখে উপনীত হয়েছেন। এই অংশ পদকর্তার নিজের মৌলিক সংযোজন, এবং এটি খুব সঙ্গতভাবেই পদের মধ্যে এসেছে। রাধা ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছেন। আবার বিরহের তরঙ্গে ডুবে যাচ্ছেন। সমস্তই কবির নিজস্ব কল্পনা। পদের শেষে কৃষ্ণের মথুরা গমনের সময় শ্রীরাধার অচৈতন্য হয়ে পড়া এবং অক্রূরের রথ নিয়ে প্রস্থান রাধামোহনের নিজস্ব কল্পনা। শুধু তাই নয়, কবির কল্পনা আরও অগ্রসর হয়ে অপর একটি পদে (বৈ. প. ; পৃ.-৯৪৭)। রাধার পরবর্তী অবস্থার বর্ণনাও দিয়েছে।

শ্রীরূপের 'হংসদূত' কাব্যের প্রভাবেও রাধামোহন ঠাকুর কিছু পদ রচনা করেছে। শ্রীরূপের কাব্যে ললিতা হংসকে সহৃদয় বলে সম্বোধন করে নিজের বিরহদুঃখের বিষয় জানিয়েছেন। এই কবির পদে সেই ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে—

সজনি অদভুত প্রেমক রীত
তিরযক জঙ্গম ইহ নাহি জানত
কহতহি কত বিপরীত ॥
তুহুঁ অতি নিরমল অন্তর কোমল
পরম-হংস দয়াশীল। (বৈ.প. পৃ. ৯৪৮)

কিন্তু শুধু নিজেদের দুঃখের কথা নয়, মথুরায় গিয়ে হংসকে তো আগে কৃষ্ণকে চিনতে হবে। তাই শ্রীরূপের 'হংসদূতে' ললিতা হংসের কাছে কৃষ্ণের পরিচয়ও বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন। রাধামোহনও এই ভাবের একটি পদ রচনা করেছেন—

যো দরশনে হোয় পরম আনন্দ।
সো অবধারবি যদুকুল চন্দ ॥
শুন তভু কহি কছু নিরুপম রূপ।
জগজনলোচন-অমিয়া স্বরূপ ॥

লাবণি-লহরি-ললিত সব অঙ্গ।
ভ্রূ ধনু-নটন মদন-ধনু-ভঙ্গ ॥ (বৈ.প. পৃ. ৯৪৮)

এখানে কবি শ্রীরূপের পদের অনুসরণেই কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছেন। শ্রীরূপের 'হংসদূতে' বর্ণিত ঘটনার পরেও রাধামোহন নিজের কল্পনায় পরবর্তী ঘটনা ভেবে নিয়ে তাকে বিষয়বস্তু করে পদ রচনা করেছেন। অবশ্য এটি তাঁর মৌলিক কল্পনা নয়, এক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূরী গোবিন্দদাসের দ্বারা প্রভাবিত। রাধামোহনের পদে রয়েছে, ললিতার কথা শুনে হংস উড়ে চলে গেলে, যেখানে রাধা কিশলয় শয্যায় শয়ন করে আছেন,ললিতা সেখানেই ফিরে গেলেন। চতুর্দিকে সখিরা সবাই রাধাকে ঘিরে ধরে ক্রন্দন করছিলেন। তখন—

হেরি ললিতা সবুহুঁ পরবোধই
কহতহিঁ মৃদু মৃদু ভাব।
এ দুখ কহিতে বর দূত পাঠায়লুঁ
মধুপুর কানুক পাশ।
এত শুনি বিরহিনি চেতন পাওল
হোয়ল জিবনক আশ।

এখানে দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য সখীদের তুলনায় ললিতা অনেক বেশী পরিমাণে চিত্ত-স্থৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীরূপের বর্ণনায়, ললিতার চরিত্রের এই দিকটির উল্লেখ নেই। এটিও কবি নিজেই কল্পনা করে নিয়েছেন এবং এটি অত্যন্ত সঙ্গত কল্পনা। কারণ, সখীদের মধ্যে একমাত্র ললিতাই তাঁর দুঃখের কথা হংসের কাছে ব্যক্ত করতে পেরেছেন। ফলে তাঁর বেদনার ভারও অনেকখানি কম হয়েছে। সেই কারণেই তিনি স্থৈর্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন। রাধামোহন সখীর মুখ দিয়ে শ্রীরাধার বারো মাসের বিরহ বেদনা বর্ণনা করেছেন। চৈতন্য-পরবর্তী পদাবলীকারেরা কল্পনা করেছেন যে, বিরহিণী রাধাকে দেখার জন্য কৃষ্ণ মথুরায় ফিরে এসেছিলেন। রাধামোহন সেই ঘটনাকে গ্রহণ করে একটি পদে কৃষ্ণের মথুরা থেকে ব্রজে আগমন ও তার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন (বৈ. প. পৃ. ৯৫০)। এ ছাড়া রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা নিয়েও কবি কিছু পদ রচনা করেছেন। শ্রীরূপের বিদগ্ধ মাধবের কোন কোন শ্লোক অনুসরণেও রাধামোহন পদ রচনা করেছেন।[৬]

এই কবি দানলীলার ঘটনাকে অবলম্বন করেও পদ রচনা করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রেও তিনি অনুসরণ করেছেন শ্রীরূপের দানকেলিকৌমুদী নামক ভাণিকাটিকে। শ্রীরূপ দানকেলিকৌমুদীতে শ্রীরাধার 'কিলকিঞ্চিত' ভাবের কথা বলেছেন। এর অর্থ শ্রীকৃষ্ণকে দেখে রাধার মনে একই সঙ্গে গর্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষৎ হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ—এই সাতটি ভাব প্রকাশ পেয়েছে। রাধামোহন ঠাকুর শুধু এই ভাবের দ্বারাই নয়, 'কিলকিঞ্চিত' শব্দের দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে লিখেছেন—

গরবহি সুন্দরী চললহ আনত
নাগর পন্থ আগোর।
কহতহিঁ বাত দান দেহ মঝু হাত

আন ছলে কাঁচলি তোড় ॥
অপরূপ প্রেমতরঙ্গ
দান-কেলি-রস কলিত মহোৎসব
বর কিলকিঞ্চিত রঙ্গ ॥
অলপ পাটল ভেল অথির দৃগঞ্চল
তহিঁ জলকণ পরকাশ।
ধূনাইত ভুরু ধনু পুলকে পূরল তনু
অলখিত আনন্দ-হাস ॥ (বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ. ৯৪৬)

শ্রীরূপ তাঁর উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রবাস-বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিরহের দশ দশার কথা বলেছেন, যা পূর্বরাগের দশ দশার অনুরূপ অর্থাৎ চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তানব বা কৃশতা, মলিনতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু। রাধামোহন বিরহের বেশ কিছু পর্যায় নিয়েও পদ রচনা করেছেন। তাই বলা যায়, এই কবির কৃষ্ণকথায়ও গোস্বামীদের অনুসরণ ও শব্দবিলাস ছাড়া আর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু নেই।

দীনবন্ধু দাস

দীনবন্ধু দাসের সংকলিত গ্রন্থের নাম 'সংকীর্তনামৃতম্'। এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সংকলিত হয়। এঁর পিতার নাম বল্লবীকান্ত, পিতামহ নন্দ-কিশোর, প্রপিতামহের নাম হরি ঠাকুর। দীনবন্ধু শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। শুধু সংকলক হিসেবেই নয়, পদকর্তা রূপেও দীনবন্ধু অষ্টাদশ শতাব্দীর পদকর্তাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দাবী করতে পারেন।

ভাগবতের কাহিনী অনুসরণ করে কবি শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বর্ণনা করেছেন। জননী যশোদার মাতৃস্নেহ রূপায়ণে কবি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ব্রজনারীরা কৃষ্ণকে দেখতে এলে, তাদের কাছে মিনতি করে যশোদা বলেন—

আশীর্ব্বাদ কর সভে হইঞা সদয়।
কল্যাণ কুশলে রহু আমার তনয় ॥
* * * * *
চিরজীবি হইঞা গোকুলে করু বাস।
বড় হল্যে হবে তোমা সভাকার দাস ॥
(বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ৯৭৭)

স্নেহময়ী যশোদার এই উক্তি কবির নিজস্ব কল্পনা। কৃষ্ণের প্রতি গোপরমণীদের বাৎসল্য চিত্রণেও কবি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীরাধার জন্মলীলা নিয়েও কবি কয়েকটি পদ রচনা করেছেন। এই কবি রচিত শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির পদটি হুবহু বিদ্যাপতির অনুকরণ (পৃ. ৯৭৮)। শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুসরণে এই কবির পদে আমরা রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা সহায়িকা পৌর্ণমাসী চরিত্রের সাক্ষাৎ পাচ্ছি। কবি শ্রীরাধার বংশী ধ্বনি শ্রবণে পূর্বরাগ ও সাক্ষাৎ দর্শনে পূর্বরাগ প্রভৃতিকে অবলম্বন করেও পদ রচনা করেছেন (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ৯৮২)। কৃষ্ণের বাল্য ও গোষ্ঠলীলার কিছু পদও এই কবি রচনা করেছেন। মা যশোদা গোপালকে কোথাও খুঁজে

না পেয়ে কাতরভাবে সুবলকে জিজ্ঞাসা করলে, সুবল বলল, যশোদা কৃষ্ণকে কেঁদে বিদায় দেন বলেই, কৃষ্ণ না বলে গোষ্ঠে চলে গেছে। সুতরাং চতুর সুবল জননীকে বলে—

আগো মা গোপাল আনিঞা দিব তোরে।
বলাই দাদার সনে যদি পাঠাইবা বনে
শপথ করিঞা বল মোরে॥ (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ৯৮২)

যশোদা এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। কৃষ্ণ মায়ের কথা ভেবে গোষ্ঠ থেকে শীঘ্র ফিরে এলেন। কৃষ্ণের সর্বাঙ্গে ধুলো মাখা ও ছলোছল দুটি চোখ দেখে যশোদা ভাবলেন, পুত্রকে কেউ বুঝি অপমান করেছে। তাঁকে বাড়ীতে ধরে রাখার জন্য যশোদা ভয় দেখিয়ে বলেন—

এ ঘর আঙ্গিনা ছাড়ি না যাইও কাহার বাড়ি
ছাল্যা-ধরা আস্যাছে গোকুলে। (বৈষ্ণব পদাবলী ; পৃ. ৯৮৩)

যশোদার চরিত্রচিত্রণে কবি এখানে মৌলিকত্ব না দেখালেও বাস্তবমুখিতার পরিচয় যে দিয়েছেন—তাতে কোন সন্দেহ নেই। কৃষ্ণ বলেন, পথে গোপীরা তাঁকে ধরেছিল, তারাই তাঁর গায়ে ধুলা দিয়েছে, এরই সঙ্গে ক্ষীরসরনবনী দিয়েও 'চোর' বলে ধরে রেখেছে। কৃষ্ণ ভয় পেয়ে 'মা' বলে ডাকতে যান। কিন্তু তারা বসনে তাঁর মুখ চেপে ধরে। গোপীদের হাতে বালক কৃষ্ণের এই দুর্গতি কবির নিজস্ব কল্পনা। মা যশোদা এই কথা শুনে কৃষ্ণকে গৃহেই ক্রীড়া করতে বলেন (বৈষ্ণব পদাবলী পৃ. ৯৮২-৯৮৩)। শ্রীরাধার যশোদাগৃহে রন্ধন ও শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের প্রসঙ্গ নিয়েও এই কবি পদ রচনা করেছেন। এটি অষ্টকালীয় লীলার অন্তর্ভুক্ত। এর আগে কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দ লীলামৃতে আমরা এই প্রসঙ্গের ব্যাপক বিস্তার দেখেছি। গোবিন্দদাস কবিরাজ এবং আরও অনেক বৈষ্ণব কবি এই প্রসঙ্গ নিয়ে পদ রচনা করেছেন। উজ্জ্বলনীলমণি ও অষ্টকালীয় লীলার প্রভাব চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যের ওপর ব্যাপকভাবে পড়েছে। দীনবন্ধুদাসের পদগুলিতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তবে কবি শ্রীরূপগোস্বামীর নাটকগুলির দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। বিদগ্ধমাধবে শ্রীরাধার সূর্যপূজা একটি পরিচিত প্রসঙ্গ। 'ললিতমাধব' নাটকেও শ্রীরাধার সূর্যপূজার বিবরণ রয়েছে। দীনবন্ধু দাস সূর্যপূজা ছলে শ্রীরাধার অভিসার প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন (বৈ. প. পৃ ৯৮৫)।

শ্রীরাধার সুবল বেশে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনও 'বিদগ্ধমাধব' নাটকেরই একটি ঘটনা। বিদগ্ধমাধবের পঞ্চম অঙ্কে বয়স্য মধুমঙ্গল কৃষ্ণের কাছে ঘটনাটি বলেছেন। বৃন্দা গোপীদের মধ্যে পৌর্ণমাসী বসেছিলেন। সেই সময় তিরস্কার করতে করতে জটিলা রাধাকে নিয়ে উপস্থিত হল। বৃদ্ধা জটিলার অনেক তিরস্কারের পর রাধা অবগুণ্ঠন মোচন করলে দেখা গেল, তিনি রাধা নন, সুবল। মধুমঙ্গলের বর্ণনা শুনে কৃষ্ণ রাধাবেশধারী সুবলকে দেখতে চাইলেন, কিছুক্ষণ পর সুবল বেশধারী শ্রীরাধা বৃন্দার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলে, অনুভবে কৃষ্ণ বুঝলেন যে শ্রীরাধাই সুবলের বেশ ধরে এসেছেন। শ্রীরাধার গলায় রঙ্গনমালা দেখে শ্রীকৃষ্ণের এই ধারণা আরও দৃঢ় হল। তিনি বললেন যে, শ্রীরাধা বেশধারী সুবলকে দেখতে গিয়ে তিনি প্রেমময়ী

রাধাকেই লাভ করলেন। পদকর্তা দীনবন্ধু দাস এই পুরো ঘটনাটি নিয়ে বেশ কতগুলি পদ রচনা করেছেন। তাঁর উপস্থাপনা ও পরিবেশনার গুণে কথাবস্তুটি স্বাদু হয়ে উঠেছে।

শ্রীকৃষ্ণ বনে বনে বিহার করার সময় অকস্মাৎ তাঁর রাধার কথা মনে পড়ল (বৈষ্ণব পদাবলী; পৃ. ৯৮৯)। বিরহে কাতর হয়ে রাধাকুণ্ডে এসে কৃষ্ণ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। সুবল তাঁকে কোলে নিয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন (বৈ. প.; পৃ. ৯৮৯)। উত্তরে কৃষ্ণ বললেন—

গাথিঞা চাঁপার মালা কেনে পরাইলি।
চাঁপার বরণ গোরি মনে পড়াইলি॥
* * * * *
যদি মিলাইতে পার আনি কোন ছলে।
হইব তোমার দাস জনমের তরে॥ (বৈ. প. পৃ. ৯৮৯)

কৃষ্ণের কথা শুনে সুবল দ্রুত গতিতে রাধার স্বামিগৃহ জাবটে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি মলিন মুখে জটিলার কাছে গিয়ে বললেন, বাছুর খুঁজে তাঁর বড় তৃষ্ণা পেয়েছে। জটিলা রান্নাঘরে গিয়ে তাঁকে জলপান করতে বললেন (বৈষ্ণব পদাবলী; পৃ. ৯৯০)। সুবল রান্নাঘরে রাধার কাছে উপস্থিত হলে, কৃষ্ণ বিরহিণী রাধাও নিজের দুঃখের কথা জানালেন। তখন সুবল রাধাকে পরামর্শ দিলেন—

ধরিঞা আমার বেশ করহ পয়ান।
দরশন দিঞা শ্যামের দেহ প্রাণ দান॥ (বৈ. প. পৃ. ৯৯০)

সুবলের পরামর্শে রাধা সুবলের বেশ ধারণ করলেন, এবং সুবল রাধার বেশ ধারণ করে গৃহে থাকলেন। আর রাধা এদিকে কুঞ্জে কৃষ্ণের কাছে চললেন। তখন—

বিপিনে ভরল অতি মনোহর
রাইর অঙ্গের গন্ধ। (বৈ. প. পৃ. ৯৯০)

কৃষ্ণ ছদ্মবেশিনী রাধাকে চিনতে পারলেন না। কিন্তু স্পর্শ করেই তিনি রাধা বলে তাঁকে বুঝতে পারলেন। তখন কৃষ্ণের আনন্দের আর সীমা থাকিল না। এদিকে রাধা বেশী সুবল—

রন্ধন পরিবেশন গৃহলেপন
অবধি কয়ল সব কাজ।

তারপর যমুনার জলে স্নান করতে যাওয়ার ছল করে রাধাবেশী সুবল রাধাকুণ্ডে চলে এলেন। জটিলা রাধাবেশী সুবলের বিলম্ব দেখে তার সন্ধানে রাধাকুণ্ডে উপস্থিত হয়ে শ্যামের পাশে তাঁকে দেখতে পেল এবং রাধাবেশী সুবলকেই রাধা ভেবে তার হাত ধরল। এই সুযোগে—

সুবলের বেশে রাধিকা তরাসে
পলাইল নিজ ঘরে॥ (বৈ. প. পৃ. ৯৯২)

এরপর জটিলা রাধাবেশী সুবলের হাত ধরে যশোদা, রোহিনী প্রভৃতির কাছে নিয়ে এলে তাঁরা প্রশ্ন করলেন—

বধূর করেতে ধরি আচম্বিতে
কি লাগি আইলে হেথা ॥

জটিলা বলল— নন্দের কুমার বনের ভিতর
দেখিলাম বধূর সাথে।

আর তখনই সুবল হেসে ছদ্মবেশ মোচন করলেন এবং নিজের রূপ ধারণ করলেন। ফলে যশোদা প্রভৃতি আনন্দিত হলেন, কিন্তু জটিলা অপ্রস্তুত হল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্ত্য নিয়েও এই কবি রসোত্তীর্ণ পদ রচনা করেছেন। রাধা-কৃষ্ণের নৌকালীলা নিয়েও কবি বেশ কয়েকটি পদ রচনা করেছেন। এই নৌকালীলায় বড়াই চরিত্রকেও কবি নিয়ে এসেছেন। অন্যান্য কবিদের নৌকালীলার পদে কৃষ্ণ আগে রাধার অন্যান্য সখীদের পার করে সবার শেষে রাধাকে পার করেছেন। কিন্তু দীনবন্ধুর পদে দেখি, রাধা অন্যান্য সহচরী ও বড়াই-র সঙ্গেই কৃষ্ণের নৌকায় চেপেছেন (বৈ. প. পৃ. ৯৯৮)।

অপর একটি পদে কৃষ্ণকে বিরলে বিরহিণী রাধার অবস্থা জানানোর জন্য ; রাধার দূতী, কৃষ্ণের বয়স্য, সন্দীপনি মুনির পুত্র মধুমঙ্গলের বেশ ধারণ করেছেন। দূতীর এই মধুমঙ্গলবেশ ধারণ, দীনবন্ধুর নিজস্ব কল্পনা। (বৈ. প. ; পৃ. ১০০০)। এরপর কৃষ্ণ মধুমঙ্গলবেশ ধারিণী দূতীর সঙ্গে যমুনাজলে স্নানের ছল করে কুঞ্জে অপেক্ষারতা রাধিকার সঙ্গে মিলিত হলেন (বৈ. প. ; পৃ. ১০০০)।

সখ্যরসের পদ রচনায়ও কবি যথেষ্ট কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সারাদিন সখাদের সঙ্গে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ ক্লান্ত ও ধূলিধূসরিত। সখারা তাকে শিখিয়ে দিচ্ছেন, তিনি যেন মায়ের কাছে গিয়ে গোচারণের এই কষ্টের কথা না বলেন। কারণ, তাহলে আর মা যশোদা কৃষ্ণকে গোচারণে পাঠাবেন না এবং তাঁরাও কৃষ্ণের সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হবেন। এর উত্তরে সখাদের সঙ্গপিপাসু শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

বনে যত দুখ সেহো মোর সুখ
তোমা সভাকার সনে।
তোমার পিরীতি আদর আরতি
তেঁই সে আসি এ বনে ॥ (বৈ. প. ; পৃ. ১০০১)

কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য অক্রূরের রথ আসার ঘটনাটি কবি অভিনব ভাবে বর্ণনা করেছেন। সন্ধ্যা বেলায় গোচারণ থেকে ফিরে এসে কৃষ্ণ গোদোহন করছেন, এমন সময় একটি রথ এসে গোকুলের পথে দাঁড়ায় (বৈ. প. ; পৃ. ১০০২)। এরপর কৃষ্ণ রাধার কাছে এলে, রাধা তাঁর আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন—

শিরে হাথ দিঞা বলি দড়াইঞা
তোমা না ছাড়িব আমি ॥ (বৈ. প. ; পৃ. ১০০৩)

এরপর মাথুরের যে কয়টি পদ কবি রচনা করেছেন তা গতানুগতিক। ভাবসম্মিলনের পদও পূর্ববর্তী বিদ্যাপতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

রাধামুকুন্দ দাস বা মুকুন্দদাস

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইনিও 'মুকুন্দানন্দ' নামে একখানি গ্রন্থ সংকলন করেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের অন্যতম প্রধান শিষ্য গোবিন্দচরণ চক্রবর্তীর বংশধর। এঁর পিতার নাম পতিতপাবন। সংকলনে মোট ৬৫৯টি পদ আছে। এর মধ্যে ১৫টি পদ কবির নিজের। কবির রচনার দৃষ্টান্ত—

নীল কমল-দল শ্রীমুখমণ্ডল
ঈষত মধুর মৃদু হাস।
নব ঘন জিনি কালা গলাএ গুঞ্জার মালা
আভীর বালক চারিপাশ॥ (বৈ. প. পৃ. ১১১১)

কমলাকান্ত দাস

এই কবি ১২১৩ সালে অর্থাৎ ১৮০৬-৭ খ্রীস্টাব্দে 'পদরত্নাকর' নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। এতে পদসংখ্যা ১৩৫৩, কবির নিজের পদ রয়েছে কুড়িটি। এই কবির পিতার নাম ব্রজকিশোর, ভ্রাতার নাম রুক্মিনীকান্ত। ইনি জাতিতে শ্রীকরণ অর্থাৎ উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। গদাধর পণ্ডিত গোষ্ঠীর নটবর ছিলেন এঁর গুরু। এই কবি রাধাকৃষ্ণলীলা কথাকে বিষয়বস্তু করে কিছু পদ রচনা করেছেন। বংশী ধ্বনি শ্রবণে শ্রীরাধার পূর্বরাগের অনুভূতি চণ্ডীদাসের কথা মনে করিয়ে দেয় (বৈ. প. পৃ. ১০২৮)। তবে অভিসারিকা রাধার বর্ণনায় কবি অভিসারের উৎকণ্ঠাকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। বর্ণনা খুবই গতানুগতিক। কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলে, দশমী দশায় উপনীতা রাধার অবস্থা দেখে সখীদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় কবি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবিকা প্রভৃতি সবাই রাধার অবস্থায় বেদনার্ত (বৈ. প. পৃ. ১০৩০)। এইসব সখীদের মধ্যে সুদেবিকা ছাড়া অন্য সবার নামই পরিচিত। দেখা যাচ্ছে, এই কবি কৃষ্ণকথায় লক্ষণীয়ভাবে না হলেও, অল্প কিছু অভিনবত্ব দেখিয়েছেন।

নিমানন্দ দাস

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যান্য কবিদের মত নিমানন্দ দাসও 'সংকীর্তনানন্দ' নামে একটি পদ-সংকলন করেন। তিনি নিজেও বেশ কিছু পদ রচনা করেছেন। অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের মত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা নিয়ে এই কবি একটি মনোজ্ঞ পদ রচনা করেছেন। পদটিতে দেখা যাচ্ছে, নন্দদুলাল কৃষ্ণ নাচছেন, সঙ্গে তাল দিচ্ছেন মা যশোদা। কৃষ্ণের এই নাচ দেখার জন্য শ্রীরাধিকাও উপস্থিত হয়েছেন (বৈ. প. পৃ. ১০০৬)।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদও কবির হাতে একটু অভিনবত্ব লাভ করেছে। কৃষ্ণের অবস্থা দেখে সখারা জিজ্ঞাসা করেছে—

অধর ফুলায়ে কেন ঘন ঘন কান্দ।
খসেছে মাথার চূড়া তাহা নাহি বান্ধ॥
ভূমেতে পড়িয়া কেন মোহ নিয়া বাঁশী। (বৈ. প. পৃ. ১০০৬)

এই কবির পদে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছে কালিয়দমনের সময় (বৈ. প. পৃ. ১০০৭)। রাধার সখীদের মধ্যে কৃষ্ণ বিশাখার কাছে তাঁর মনোবেদনা ব্যক্ত করেছেন। এরপর সন্ধ্যাবেলা রাধা জটিলার নির্দেশে যমুনায় জল আনতে গেছেন। জল নিয়ে তীরে ওঠার সময় কৃষ্ণ তাঁর বসন ধরেছেন। রাধা বসন ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনেক মিনতি করেছেন। কিন্তু কোন কথা না শুনে কৃষ্ণ তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করলেন। রাধা কৃষ্ণের কাছ থেকে এসে তাড়াতাড়ি গাগরি রেখে শয়ন করলেন। ননদিনী শয়ন করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাধা বললেন—

পথ অতি সংকট কাঁখে দারুণ ঘট
বেদন লাগিল জানি বুকে ॥ (বৈ, প. ; পৃ. ১০০৮)

রাধার কথা শুনে সখীরা হাসতে লাগল। রসোদ্গার, অভিসার, মিলন প্রভৃতি পদ গতানুগতিক। এই কবির পদে অভিসারিকা রাধা, কৃষ্ণের কাছে এসে কৃষ্ণের গাত্রে প্রতিবিম্বিত নিজের মূর্তিকে অন্য নায়িকা ভেবে মান করেছেন। অবশেষে সখীদের মধ্যস্থতায় রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটেছে। কবি ভাগবতের অনুসরণে রাসলীলার কয়েকটি পদও রচনা করেছেন। পূর্ববর্তী অন্যান্য পদকারেরা এবং কৃষ্ণমঙ্গলকারেরা রাসলীলায় কৃষ্ণের সঙ্গে অন্তর্হিতা প্রধানা গোপীকে রাধা বলে অভিহিত করেছেন। কবি নিমানন্দের পদেও ইনি রাধা।

এই কবির মাথুরের পদে রাধার অবস্থার কথা সখী মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণকে জানিয়েছেন। দূতীর মুখে রাধার কথা শুনে দুঃখিত কৃষ্ণ বললেন—

মধুপুর তেজি হাম ত্বরিতহি যায়ব
ইথে তুহুঁ না বাসবি আন।

কৃষ্ণের এই প্রতিশ্রুতিও চৈতন্য পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এই কবির পদে কৃষ্ণ কথার কোন অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায় না।

নটবর দাস

এঁর সংকলিত গ্রন্থের নাম 'রসকলিকা'। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অথবা অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন। ইনি পদকর্তা হিসেবেও উল্লেখযোগ্য। এঁর রচিত আত্মনিবেদনের পদে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে সম্বোধন করে বলেন—

তোমার বদন আমার জীবন
সরবস ধন তুমি।
তোমা ধরি চিতে খুঁজিতে খুঁজিতে
আসিয়া পাইলাম আমি ॥ (বৈ. প. ; পৃ. ৯৬০)

এই একটি পদ দেখে কৃষ্ণকথার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। শুধু এইটুকুই বলা যায় যে, এর মধ্যে কবির কোন স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হয় নি।

যাদবেন্দ্র দাস

এই কবি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বীরভূম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। সংকীর্তনামৃতে এঁর পদ রয়েছে। যাদবেন্দ্র বাৎসল্য ও সখ্যরসের পদ রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

পুত্র কৃষ্ণের জন্য জননী যশোদার হৃদয়ের একান্ত ব্যাকুলতা, তাঁর পদগুলিতে অসাধারণ আন্তরিকতায় ফুটে উঠেছে। এই যশোদা যে একান্তভাবেই মানবী মাতা, তা তাঁর স্বার্থপর স্নেহ থেকেই বোঝা যায়। তিনি কেবল মাত্র নিজের পুত্রটির নিরাপত্তার কথাই ভাবেন। সেই কারণে তাঁর নির্দেশ—

বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বামভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইয় সঙ্গ ছাড়া না হইয়
মাঠে বড় রিপুভয় আছে। (বৈ. প. পৃ. ৯৭৩)

সে তুলনায় যাদবেন্দ্রের অঙ্কিত পিতা নন্দ বরং অনেকখানি সমদর্শী। তিনি গাভী দোহন করতে যাওয়ার সময় রাম এবং কৃষ্ণ উভয়কেই ডেকে নেন এবং আশাতিরিক্ত দুগ্ধদোহন করলে তা রাম ও কৃষ্ণ উভয়েরই পয়ে সম্ভব হয়েছে বলে মনে করেন। সখ্যরসের গভীর পরিচয়ও যাদবেন্দ্রের পদগুলিতে রয়েছে। সখারা কৃষ্ণকে ডেকে বলেছেন—

বটভাণ্ডিরে যাবি কানাই আয় রে আয়।
বরজ-বালক সব তোর মুখ চায়॥ (বৈ. প. পৃ. ৯৭৪)

কৃষ্ণের সখারা কৃষ্ণকে ঐশ্বর্যময় ভগবান বলে জানেন না। তাঁকে নিজেদেরই মত অল্পবয়সী বালক বলে মনে করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে সখ্যরসের যে বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করেছেন, তা সখাদের মুখ দিয়ে এখানে উচ্চারিত হয়েছে—

তো কোন বড়ুয়ার বেটা তুমি আমি সমা॥ (বৈ. প, পৃ. ৯৭৪)

শুধু সখাদের সঙ্গেই তো নয়, গোষ্ঠের গাভীদের সঙ্গেও রামকৃষ্ণের সম্পর্ক নিবিড়—

বসি রাম কানু বাজাইছে বেণু
ধবলী বলিয়া পুরে।
ধবলী শুনিয়া আইল ধাইয়া
পুচ্ছ ফেলাইয়া শিরে॥ (বৈ. প. পৃ. ৯৭৪)

কৃষ্ণ গোষ্ঠে যাওয়ার সময়, জননী যশোদার ব্যাকুলতাটুকুও লক্ষণীয়। কৃষ্ণ দূরে বিদেশে যাচ্ছেন না। তবুও তাঁর স্বল্পকালীন অদর্শনটুকুও মাতা যশোদার অসহ্য। তাই তিনি পুত্রকে ডেকে বলেন—

বাছা রয়্য রয়্য রয়্য রে।
নেহারি বয়ন ভরিঞা নয়ন
তবে তুমি ছাড়্যা যায়্য রে॥[৭]

পুত্র গোষ্ঠে যাচ্ছে, সেই কারণেই জননী যশোদার এই ব্যাকুলতা কিছুটা কষ্টকল্পনা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই কৃষ্ণ জননী যশোদার একমাত্র সন্তান। শুধু তাই নয়, বহুবার শত্রুর হাতে অনিবার্য মৃত্যু থেকেও উদ্ধার পাওয়াকে মা যশোদা পুত্রের কৃতিত্ব বলে ভাবেন না, আর পাঁচটি শংকাতুরা সাধারণ জননীর মত ঈশ্বরের কৃপা বলে মনে করেন। সেই কারণে যশোদার এই ব্যাকুলতা একান্ত স্বাভাবিক। অষ্টাদশ শতাব্দী অনুকরণের যুগ হলেও, যাদবেন্দ্রের এই পদগুলি অকৃত্রিম অনুভূতি ও মৌলিক সৃজনী ক্ষমতার পরিচায়ক।

গৌরসুন্দর দাস

পদকর্তারূপে এঁর কোনো বিশেষত্ব নেই। ইনি 'কীর্ত্তনানন্দ' সংকলন করেছিলেন এবং দু' চারটি পদও লিখেছিলেন। শ্রীরাধার পূর্বরাগের পদে কবি শ্রীরাধার দশমী দশা বর্ণনা করেছেন—

রাইক জীবন শেষ গুনি সহচরি
বহু পরবোধন তায়।
ধৈরজ ধরিপুণ কানু নীয়ড়ে চলু
না দেখিয়া আনহি উপায় ॥ (বৈ. প. ; পৃ. ৯১০) ।

বৈষ্ণব দাস

বৈষ্ণব দাসের আসল নাম গোকুলানন্দ সেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। বাস করতেন কাটোয়ার কয়েক ক্রোশ উত্তরে টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রামে। সুবিখ্যাত 'পদকল্পতরু' এঁরই সংকলন। সংকলনটির আসল নাম 'গীতকল্পতরু', । ক্রমশঃ লোকের মুখে তা 'পদকল্পতরু' নাম ধারণ করেছে। বৈষ্ণবদাস কীর্তন গায়ক হিসেবেও বিখ্যাত ছিলেন। ইনি নিজেও কিছু কিছু পদ রচনা করেন। কতগুলি পদে কবি রাধাকে সম্বোধন করে তাঁদের অভিসার, মিলনলীলা প্রভৃতির মাঝখানে রাধার কিংকরী শ্রীগুণমঞ্জরীর যূথে সেবাদাসী হতে চেয়েছেন (বৈ. প. পৃ. ১০২৪)। তবে প্রত্যক্ষভাবে রাধাকৃষ্ণলীলা নিয়ে পদ তিনি কমই রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গৌরালীলার পদই বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা নিয়ে কবি পদ রচনা করেছেন—

ঝুলনা হইতে নামিলা ত্বরিতে
রসবতী রসরাজ
রতন আসনে বসিলা যতনে
রতন মন্দির মাঝ ॥ (বৈ. প. পৃ. ১০২৪)

মোট কথা, রাধাকৃষ্ণপ্রেমকে অবলম্বন করে রচিত পদে কবির কোন বিশেষত্ব নেই।

উদ্ধব দাস

উদ্ধব দাসও মুর্শিদাবাদ জেলার টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এঁর আসল নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। ইনি রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য এবং পদকল্পতরু সংকলয়িতা বৈষ্ণব দাসের বন্ধু ছিলেন। ইনি বিশুদ্ধ বাংলা ও ব্রজবুলি—উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার বিভিন্ন দিক নিয়েই ইনি পদ রচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা নিয়ে রচিত পদ গতানুগতিক। শ্রীরাধার জন্মবিষয়ক পদে বৃষভানুপুরের আনন্দিত উৎসব বর্ণনা প্রাণময় হয়ে উঠেছে—

রত্নভানু সুভানু নাচয়ে তিন ভাই
* * * * *
গোপ গোপী নাচে গায় যায় গড়াগড়ি।
মুখরা নাচয়ে বুড়ী হাতে লৈয়া নড়ি ॥

বৃষভানু রাজা নাচে অন্তর-উল্লাসে।
আনন্দ বাধাই গীত গায় চারিপাশে ॥ (বৈ. প. পৃ. ৫১৪)

ভাগবত বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার প্রসঙ্গগুলিকে অবলম্বন করেও কবি পদ রচনা করেছেন। যেমন—শ্রীকৃষ্ণের মুখে জননী যশোদার বিশ্বরূপ দর্শন, ফলহারিণী কর্তৃক ফলবিক্রয়, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নীগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত গোপ-বালকদের অন্নদান, রাখাল রাজা খেলা ও বনভোজন ইত্যাদি। কবি বংশীধ্বনি শ্রবণে, ভাটমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণে ও সখীর মুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণে, এবং বিশাখা কর্তৃক অংকিত চিত্রপট দর্শনে শ্রীরাধার পূর্বরাগ বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্যের পদে কৃষ্ণ বাজিকর-বেশে রাধার কাছে গেলেন। ঢোলক বাজিয়ে, দড়ি দড়া নিয়ে কৃষ্ণ বৃষভানু রাজার পুরে দেখা দিলেন। সুবল সখাও তাঁর সঙ্গে গেল। এই প্রসঙ্গে কবি বাজীকরদের খেলার বেশ চমৎকার চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন—

পেটে গুয়া দিয়া বাঁশেতে চড়িয়া
ঘুরয়ে কতেক পাকে।
দড়া বান্ধি তায় হাঁটি হাঁটি যায়
সুতা উগারয়ে নাকে ॥ (বৈ. প. পৃ. ৫২০)

বাজিকরের খেলা দেখার জন্য রাধা তাঁকে নিজের মহলে ডেকে পাঠালেন—

শুনি বাজিকর চলে তার ঘর
লইয়া সকল সাজে
শিরে পদ দিয়া পড়ে উলটিয়া
রাইয়ের আঙ্গিনা মাঝে ॥ (বৈ. প. পৃ. ৫২০)

বাজিকরের খেলায় সন্তুষ্ট হয়ে রাধা তার শিরে 'বিচিত্র বসন' ফেলে দিলেন। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে বাজিকর রাধার 'হিয়ার মাঝে' অবস্থিত 'হেমঘট' প্রার্থনা করলেন। এ কথায় চমকিতা রাধা বাজিকর বেশী কৃষ্ণকে সংকেতে বললেন যে, যমুনার কূলে অবস্থিত সুরতরুমূলে কৃষ্ণের অভিলাষ পূর্ণ হবে। কখনও সন্ন্যাসী বেশে, কখনও যোগী বেশে, আবার কখনও নাপিতানী অথবা শ্যামা রমণীর বেশ ধারণ করে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলনের প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেই পাওয়া গেছে। বাজিকর বেশে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ এই পর্য্যায়েই একটি নতুন সংযোজন এবং নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক। বাজিকরদের খেলা যে সে যুগে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল, কৃষ্ণের বাজিকর বেশ ধারণই তার প্রমাণ। সমকালীন সমাজের একটি বিশিষ্ট জীবিকাকে কবি এখানে কৃষ্ণকথার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন। এইভাবে রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা যুগের নানাবিধ জীবন-অনুষঙ্গকে আত্মসাৎ করে বৈচিত্র্য লাভ করেছে।

রাধার প্রকারান্তর মানের একটি পদে দেখি, রাধার প্রিয়সখী রাধাকে জানিয়ে গেছেন, কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর সঙ্গে রাত্রি কাটিয়েছেন। এতে ক্রুদ্ধ রাধা যথারীতি মান করে বসে থাকলেন। গলায় পীতাম্বর দিয়ে জোড়হাত করেও কৃষ্ণ তাঁর ক্ষমা পেলেন না। এবার কৃষ্ণ ছলনার আশ্রয় নিয়ে বললেন, তাঁকে সর্প দংশন করেছে। আর তখন—

কি ভেল কি ভেল বলি রাই ধাই চলি
কোরে কয়ল ঘনশ্যাম ॥ (বৈ. প. পৃ ৫২০)

কৃষ্ণকথার এই বিচিত্র প্রসঙ্গটি অবশ্য ইতিপূর্বেই বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। অকারণ মানের পদে (বৈ. প. ; পৃ. ৫২১)। রাধা শুকের মুখে কৃষ্ণের অন্য নায়িকা গমনের কথা শুনে মান করেছেন। মিলনের সময় কৃষ্ণের মুখে চন্দ্রাবলীর নাম শুনেও রাধা মান করেন। এটি গোত্রস্খলিত মানের উদাহরণ। আবার কৃষ্ণের গাত্রে প্রতি-বিম্বিত নিজের শরীর দেখেও রাধার অভিমান হয় (বৈ. প. ; পৃষ্ঠা ২৫৩)। এটি নির্হেতু মানের পদ। এরপর রাধা যখন শুনলেন, এটি তাঁর নিজেরই প্রতিবিম্ব, তখন তিনি লজ্জায় অবনতমুখী হয়েছেন। তাঁর অন্তর জেনে, রসিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ক্রোড়ে করেছেন। এতেই মান শান্ত হয়েছে (বৈ. প. ; পৃ. ৫২৩)। এই পদগুলি ছাড়াও কবি ঝুলনলীলা, গোষ্ঠমিলন প্রভৃতি পর্যায় নিয়েও পদরচনা করেছেন। এই কবির নৌকালীলার পদে রাধা এবং সখীরা পৃথক্ পৃথক ভাবে নদী পার হন নি, একসঙ্গেই পারে হয়েছেন (বৈ. প. ; পৃ. ৫২৬)। রাসলীলার বর্ণনায় কবি ভাগবতকেই অনুসরণ করেছেন। হোলি এবং রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা বর্ণনা করেও কবি বেশ কয়েকটি পদ রচনা করেছেন। এ ছাড়া অদূর প্রবাস ও সুদূর প্রবাস, বিরহের এই উভয় পর্যায় নিয়েই কবি পদ রচনা করেছেন। কৃষ্ণের অদূর প্রবাসের উদাহরণ হিসেবে কবি বরুণের অনুচর কর্তৃক নন্দহরণ প্রসঙ্গটি বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণ যখন নন্দকে উদ্ধার করার জন্য গেলেন, তখন—

তাহা শুনি ধনী রাই সুবদনী
মরমে পাইয়া দুখ।
হা নাথ বলিয়া কান্দে ফুকারিয়া
না দেখিয়া চাঁদমুখ॥ (বৈ. প. ; পৃ ৫৩৭)

ভাগবতের এই কাহিনীর সঙ্গে রাধার বিরহ বেদনাকে যুক্ত করার পরিকল্পনা কবির নিজস্ব। এটি নিঃসন্দেহে রাধাকৃষ্ণ লীলা কথায় অভিনবত্বের সঞ্চার করেছে। এ ছাড়াও কবি বিরহিণী রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের স্বপ্নে মিলন নিয়েও পদ রচনা করেছেন।

চন্দ্রশেখর

অষ্টাদশ শতাব্দীর দুজন বিশিষ্ট পদকর্তা হলেন চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর। অনেকের মতে চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর হলেন দুভাই এবং আধুনিক বর্ধমান জেলার কাঁদড় গ্রামের গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের পুত্র। এরা 'নায়িকা রত্নমালা' নাম দিয়ে নায়িকার ৬৪ রকমের বৈশিষ্ট্যসহ ৬৪টি পদ সংকলন করেন। চন্দ্রশেখর বিভিন্ন রস-পর্যায় নিয়ে পদরচনা করেছেন। যেমন—অভিসারিকা রাধার অভিসার বর্ণনায় কবি শ্রীরাধার দিবাভিসার, কুজ্ঝটি-অভিসার, চন্দ্রগ্রহণ সময়ে অভিসার প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে চন্দ্রগ্রহণ সময়ে অভিসারের পদে অভিনবত্ব রয়েছে (বৈ. প. পৃ. ১০৩২)। এ ছাড়া বাসকসজ্জিকা রাধার বর্ণনায় কবি কিছুটা শ্রীরূপের অনুসারী। বাসকসজ্জিকা রাধার প্রতি সখীর উপদেশ চিত্তাকর্ষক। তিনি বলেছেন, কৃষ্ণ কাছে এলে রাধা যেন কপট নিদ্রার ভাণ করে পড়ে থাকেন। তাহলে—

হম সব বোলব রাই ঘুমায়ল
আজি অনত যাহ চলিয়া॥ (বৈ. প. পৃ. ১০৩৪)

কিন্তু তাহলেও কৃষ্ণ যাবেন না। তিনি প্রদীপ নিয়ে নিদ্রিতা রাধার মুখ দেখতে বসলে, রাধা যেন দুটি পা প্রসারিত করেন, যাতে কৃষ্ণ তাঁর পদসেবা করবেন। সখীদের এই কথা শুনে বাসকসজ্জিকা রাধা—

বিহঁসি মুখ ঝাঁপল
অন্তরে উপজল লাজ।

উৎকণ্ঠিতা রাধার বর্ণনায়ও কবি শ্রীরূপ গোস্বামীর গীতাবলীর পদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। বিপ্রলব্ধা রাধার উক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর হৃদয়ের ক্ষোভ ও অপমানবোধের জ্বালা ফুটে উঠেছে। রাধার বলার ভঙ্গীও এই কবির পদে অভিনব—

কুসুমিত শেজহিঁ ভেজহ আগুনি
অরু কিয়ে দেখহ চাই।
মালতি-মাল সুবাসিত তাম্বুল
এদুহুঁ দেহ জ্বালাই॥ (বৈ. ব. পৃ. ১০৩৬)

এর আগে কবিদের পদে বিপ্রলব্ধা রাধার ক্ষোভ নানাভাবে প্রকাশ পেলেও রাধা ফুলের বিছানায় আগুন লাগিয়ে দিতে বলেন নি। কোকিলের রবে কৃষ্ণ সংকেত করলে রাধা তাঁর গৃহের অর্গল খুলে বাইরে আসতে চাইলেন, কিন্তু বলয়ের ঝঙকারে জরতী জেগে উঠে বলল—

কো উহ নিকসই/কহু কিয়ে বাহির ভেলি। (বৈ. প. পৃ. ১০৩৬)

তখন রাধা বাধ্য হয়ে হুঁ হুঁ করে নিজের মন্দিরে আবার প্রবেশ করলেন। রাধার বাড়ীর প্রাঙ্গণের কোণে একটি বদরী তরু অবস্থিত। কবি বলেছেন রাধার পরিবর্তে—

রজনি পোহায়ল/হরি কোরে করি সোই গাছে।

এখানে কবির স্মিত কৌতুক চমৎকারভাবে রূপ লাভ করেছে। এটি কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয় ও সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত একটি পরিচিত পদের অনুবাদ। শ্লোকটির ভাব নিয়ে ইতিপূর্বে অন্যান্য বহু কবি পদ রচনা করেছেন। এই কবির পদে খণ্ডিতা রাধার কৃষ্ণের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গোক্তিও কবির শক্তিমত্তা প্রমাণ করে। রাধা বলেন—

বন্দে বরজ-রাজ-কুল-নন্দন
বিজয় করহ হরিজী॥ (বৈ. প. পৃ. ১০৩)

বন্দনা করার কারণ স্বরূপ রাধা বলেন—

কবহুঁ নীলাম্বর কবহুঁ পিতাম্বর
কবহুঁ চন্দন চাঁদ ভালে।
কবহুঁ সিন্দুর সমুহ বিরাজই
অঞ্জন-পুঞ্জ মিশালে॥ (তদেব)

অপর একটি পদে অন্য নায়িকার কাছ থেকে প্রত্যাগত কৃষ্ণকে দেখে ক্রোধে রাধার স্বাভাবিক বাক্যস্ফূর্তিও ব্যাহত হয়েছে (বৈ. প. পৃ. ১০৭৩)। খণ্ডিতা রাধার ক্রোধ প্রকাশের এই পদ্ধতি কবির নিজস্ব পরিকল্পনা। অতঃপর কলহান্তরিতা রাধাকে সান্ত্বনা দিয়ে রাধার সখী কৃষ্ণের অন্বেষণে গোবর্ধন, যমুনা কানন

প্রভৃতি খুঁজেও দেখতে পেলেন না। অবশেষে দেখলেন কৃষ্ণ নির্জন প্রান্তরের মাঝখানে পড়ে আছেন। এবং একটি স্বর্ণবর্ণ পদ্ম হাতে নিয়ে—

রাই রাই করি শিরে কর হানই
ধূলি ধূসর সব গায়॥ (বৈ. প. পৃ. ১০৪০)

মানিনী রাধা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কৃষ্ণের এই চিত্রটিও কবির মৌলিকতার নিদর্শন। এর আগে বিরহী কৃষ্ণের নানা মূর্তির সঙ্গে পরিচয় থাকলেও শূন্য প্রান্তরে রাধার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হেম পদ্ম হাতে হা-হুতাশরত কৃষ্ণকে আমরা এই প্রথম দেখলাম।

অপর একটি পদে কলহান্তরিতা রাধার সখী কৃষ্ণকে খুঁজতে বেরিয়ে দূর থেকে কৃষ্ণকে দেখেও না দেখার ভাণ করে চলে যান। কৃষ্ণ তাঁকে ডেকে করুণা করে তাঁর দিকে চাইতে বলেন (বৈ. প. পৃ ১০৪০)। কিন্তু চতুরা সখী বলে, 'মাধব তুমি কি বলবে বল, আমি অন্য কাজে যাব, তোমার সঙ্গে কথা বললে সখীরা আমার দোষ দেবে।' কৃষ্ণ বলেন, 'রাধা আমায় পরিত্যাগ করেছে, তুমিও যদি ত্যাগ কর, তবে আমি বিষ পান করব'। এর উত্তরে সখী তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করে বলেন—

আহিরিণি কুরূপিনি গুণহিনী ভাগি হিনি
তাহে লাগি কাহে বিখ পিয়বি।
চন্দ্রাবলি-মুখ চন্দ্র-সুধা-রস
পিবি পিবি যুগ যুগ জিয়বি॥ (বৈ. প. পৃ. ১০৪০)

প্রসঙ্গ পরিচিত হলেও, এখানে উপস্থাপনায় নাটকীয়ত্ব, বাক্যবিন্যাসে তির্যকতা ও তীক্ষ্ণতা সঞ্চারিত হয়ে পুরাতন কৃষ্ণকথাকে নব রূপ দান করেছে। কৃষ্ণের কাতরতা দেখে সখী ফিরে এসে রাধার কাছে কৃষ্ণের হয়ে করুণা ভিক্ষা করেছেন। ললিতা বলেছেন—

আঁচর পাতি হম তুয় পাশে মাগিয়ে
মান-রতন দেহদান॥ (বৈ. প. পৃ. ১০৪১)

মাথুরের পদগুলি গতানুগতিক। রঘুনাথের মুক্তাচরিত্রে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার অভিষেক পরবর্তীকালের বহু কবিকে পদ রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। চন্দ্রশেখরও রাইরাজার প্রসঙ্গ নিয়ে পদ রচনা করেছেন। চন্দ্রশেখরের পদাবলীর উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথায় কবি সূক্ষ্ম সামান্য কিছু বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন।

শশিশেখর

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি শশিশেখরও বেশ কিছু পদ রচনা করেছেন। এঁর গোষ্ঠবিহারের পদগুলি উল্লেখযোগ্য। এই গোষ্ঠবিহারের পদে কবি সুবল, অর্জুন, অংশুমান, দাম, বসুদাম প্রভৃতি ভাগবত বর্ণিত কৃষ্ণ সখাদের নাম করেছেন। এই পর্যায়ে মত্ত বলরামের যে চিত্র কবি অংকন করেছেন, তা উজ্জ্বল এবং জীবন্ত হলেও পূর্ববর্তী কবিদের বর্ণনা থেকেই গৃহীত।

শ্রীরাধার পূর্বরাগের পদে কবি ব্রজবুলির সঙ্গে সংস্কৃতেরও আভাস দিয়েছেন।

পদটি সাক্ষাৎ দর্শনে পূর্বরাগ সঞ্চারের পদ। রাধা নীপমূলে কৃষ্ণকে দেখে এসে সখীকে বলছেন—

নবহুঁ রুচি মেহ সখি নীপহুঁ মূলে পেখলুঁ
নয়ন মন ভুলল মঝু ভরমং।
তরুণ তমাল কিয়ে কিয়ে দামিনী অম্বরে
লখিতে নারিনু সখি গৌর কিয়ে শ্যামং॥ (বৈ. প. পৃ. ১০৪৪)

জ্যোৎস্নাভিসারিকা ও তিমিরাভিসারিকা রাধার অভিসার বর্ণনা করেও কবি পদ রচনা করেছেন। এর মধ্যে তিমিরাভিসারের পদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

আজি অদভুত তিমির-রঙ্গ
আপনি না চিনি আপন অঙ্গ
নিরখি রাইক মন-মাতঙ্গ
অংকুশ নাহি মানরি। (বৈ. প. পৃ. ১০৪৬)

সমস্ত পদটিতে চিত্র রচনা, ধ্বনিঝংকার ও ছন্দ-হিল্লোল, অভিসারিকা রাধার আসন্ন মিলনের আনন্দ ও অভিসারের আবেগকে যেন উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে। পদটির শিল্প সৌকর্য অতুলনীয়।

খণ্ডিতা রাধার কাছে অন্য নায়িকা-উপভোগকারী কৃষ্ণের মিথ্যা কৈফিয়ৎও জয়দেবের সময় থেকেই চলে আসছে। এই কবির পদে, উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে, রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার এই অংশ নাটকীয় হয়ে উঠেছে। রাধা, কৃষ্ণকে প্রশ্ন করছেন—নীল উৎপলের মত সুন্দর তাঁর মুখ ম্লান হল কি করে? কৃষ্ণ উত্তরে বলছেন, রাধার বিরহে রাত্রিজাগরণ করতে গিয়ে তাঁর মুখ ম্লান হয়ে গেছে। রাধা বলছেন, কৃষ্ণের কপালে সিঁদুরের দাগ এল কি করে? কৃষ্ণ বললেন—

গোবর্ধনে গৌরিক সেবি
সিন্দুর তঁহি লেল॥ (বৈ. প. পৃ. ১০৪৮)

এইভাবে কৃষ্ণ বক্ষে নখক্ষতের ব্যাখ্যা দিলেন, রাধাকে খুঁজতে গিয়ে কণ্টকে তাঁর বক্ষ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। রাধা প্রশ্ন করলেন—

নীলাম্বর কাহে পহিরলি
পিতাম্বর ছোড়ি। (বৈ. প. পৃ. ১০৪৮)

কৃষ্ণ বললেন বলরামের সঙ্গে বস্ত্র পরিবর্তিত হয়েছে। রাধা যখন প্রশ্ন করলেন—

অঞ্জন কাহে গণ্ড-স্থলে
খণ্ডন কাহে অধরে। (বৈ. প. পৃ. ১০৪৯)

তখন কিন্তু কৃষ্ণ কোন উত্তর দিতে পারলেন না। অপর একটি পদও—খণ্ডিতা মানিনী রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তিতে রচিত। এখানে কৃষ্ণের উক্তি সংস্কৃতে এবং রাধার উত্তর বাংলায়। কথাবস্তু ও ভাববস্তুতে নতুনত্বের সঞ্চার করতে না পেরে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিরা কেমন করে ভঙ্গিসর্বস্ব হয়ে যাচ্ছিলেন, পদটি তারই প্রবল উদাহরণ (বৈ. প. পৃ. ১০৪৯)। কৃষ্ণের বাজীকর ছদ্মবেশে কলহান্তরিতা রাধার কাছে

যাওয়ার প্রসঙ্গ নিয়েও এই কবি পদ রচনা করেছেন। এ ছাড়া অহেতুক মান, মুরলী শিক্ষা ও মাথুর বিরহকে বিষয়বস্তু করেও কবি কয়েকটি পদ রচনা করেছেন।

জগদানন্দ

জগদানন্দ অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শক্তিশালী কবি। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুরের পরিবারে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা নিত্যানন্দ ঠাকুর শ্রীখণ্ড ত্যাগ করে বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ মহকুমার আগরডিহি-দক্ষিণখণ্ডে বাস করেন। জগদানন্দও এই গ্রাম ত্যাগ করে বীরভূম জেলার দুবরাজপুর থানার অধীন যোফলাই গ্রামে, বাস করেন। কবি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন। এই উপলক্ষে এঁর গ্রাম যোফলাইতে প্রতিবছর মহোৎসব হয়। জগদানন্দ পদাবলী রচনার দিক দিয়ে গোবিন্দদাসের অনুকরণ করেছিলেন। কিন্তু গোবিন্দদাসের পদের নিতান্ত বাইরের ধ্বনি ঝংকার আর শব্দ সৌষ্ঠবকেই তিনি রূপ দিতে পেরেছেন। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনায় কবি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে আমাদের অন্বিষ্ট কথাবৈশিষ্ট্য তাঁর পদে বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর পদে অতিরিক্ত অলংকার ব্যবহার বেশীর ভাগ সময়েই মাধুর্য ও স্বতঃস্ফূর্তিকে ব্যাহত করেছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদে কৃষ্ণ বলেছেন—

আজু পেখলুঁ জলজ লোচনী
চমকি চৌদিশে চায়।
শ্রোণী লম্বিত বেণী ফণি পিঠ
বেড়ি কটি লটকায়॥ (বৈ. প.ঃ পৃ ১৮৮)

কৃত্রিম শব্দ প্রয়োগ ও অলংকারের চাপে ভাবমাধুর্য এখানে ব্যাহত হয়েছে। শ্রীরাধার পূর্বরাগের পদে সখী রাধাকে দেখে বলেছেন, রাধা বার বার নীল পদ্মে নিজের মুখ ঢাকছেন এবং পরিহিত নীল বস্ত্রে মাথা গুঁজেু আছেন (বৈ. পৃ. ৮৮৯)। এ ছাড়া বংশীধ্বনি শ্রবণে শ্রীরাধার পূর্বরাগের প্রসঙ্গ নিয়েও কবি পদ রচনা করেছেন। জগদানন্দের অভিসার বিষয়ক একটি পদে শব্দ ও ছন্দের ললিত হিন্দোলে অভিসারিকা রাধার আনন্দতন্ময় লাবণ্য বিস্তৃত হয়েছে—

কাঞ্চন রুচি রুচির অঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ
কিংকিণী কর-কংকণ মৃদু ঝংকৃত মনুহারী।
নাচত যুগ ভ্রু-ভুজঙ্গ
কালিদমন-দমন রঙ্গ
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে রঙ্গিল নীল শাড়ী॥
(বৈ. প.; পৃ. ৮১৫)

কিন্তু এই আনন্দময়ী অভিসারিকাকেই যখন কুঞ্জে এসে ব্যর্থ রজনী যাপন করতে হয়, তখন রাত্রিশেষে কৃষ্ণ ফিরে এলে, তাকে ক্ষুব্ধ সখী বলেন, অরুণ কিরণ যাঁর অঙ্গ স্পর্শ করে না, সেই কুলবতী রাধা কুঞ্জে সারারাত ধরে কৃষ্ণের জন্য জেগে থাকলেন। এ যেন কৃষ্ণ নিজেই কাঁটা দিয়ে পীরিতির পথ রোধ করলেন (বৈ. প., পৃ. ৮৯৩)। এখানে কবির এই উপমা খুবই সুপ্রযুক্ত হয়েছে এবং সখীর হৃদয় বেদনাকে যথার্থ

ভাবেই প্রকাশ করেছে। আবার কলহান্তরিতা রাধার প্রতি সখীর তিরস্কারও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়—

যৌবন-রূপ গরবে ধরণীতলে
না পড়ই চরণ তুহারি। (বৈ. প.; পৃ. ৮৯৪)

এ ছাড়া মানান্তে মিলনের পদও কবি রচনা করেছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের একটি বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করে কবি পদ রচনা করেছেন। এটি চৈতন্য পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় প্রসঙ্গ। বিষয়টি হল, শুকসারীর দ্বন্দ্ব। বিদগ্ধমাধবের পঞ্চম অঙ্কে ললিতার সঙ্গে মধুমঙ্গলের তর্ক বেধেছে রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে। নেপথ্য থেকে শুক কৃষ্ণের প্রশংসা করায়, মধুমঙ্গল তাকে সাধুবাদ দিয়েছেন। কিন্তু ললিতা তিরস্কার করেছেন। এই সময় সারী নেপথ্য থেকে কৃষ্ণের নিন্দা করে, রাধার প্রেমের প্রশংসা করেছে। সারীর কথা শুনে ললিতা আনন্দভরে বলেছেন, 'সখি-সারিকে, তুমি সৌভাগ্যবতী হও, প্রত্যুত্তর দিয়ে তুমি দুর্মুখ শুককে জয় করলে'। শ্রীরূপের নাটকের এই ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, তিনি শুক ও সারীকে যথাক্রমে কৃষ্ণ ও রাধার ভক্তরূপে কল্পনা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, এটিও বলতে চেয়েছেন যে, শুক-সারীর মধ্যে মাঝে মাঝেই রাধাকৃষ্ণের রূপ-গুণের উৎকর্ষ নিয়ে বিবাদ বাধে। জগদানন্দ এই মধুর বিবাদকে অবলম্বন করে পদ-রচনা করেছেন—

মোদের কিশোরী রাজার কুমারী
সব সখীগণ পূজে।
তোমার নাগর রাখাল-খেয়াতি
সদা থাকে গোঠ মাঝে ॥ (বৈ. প.; পৃ. ৮৯৮)

জগদানন্দ শ্রীরাধার আক্ষেপানুরাগ নিয়ে উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর ব্যবহৃত অলংকার কৃত্রিম না হয়ে বরং রাধার নিরুপায় প্রেমের যন্ত্রণাকে যথার্থভাবে প্রকাশ করেছে। পদটি নিঃসন্দেহে কবির শক্তিমত্তার পরিচায়ক। কৃষ্ণ যেন ব্যাধ, আর তাঁর ভুবন-ভুলানো রূপ যেন ফাঁদ; হাসি হচ্ছে চার, আর অঙ্গলাবণ্য ফাঁদের আঠা। রাধার আঁখি-চিত্তশালায় যে ধৈর্যরূপ হাতী বাঁধা ছিল, সে-ও কৃষ্ণের কটাক্ষ রূপ অংকুশে আহত হয়ে দম্ভের শিকল কেটে পালিয়ে গেল। রাধার কুলবধূ সুলভ লজ্জা ও সুশীলতা যেন সোনার মন্দিরের মত বিরাজ করছিল, গুরুগৌরব ছিল তাঁর সিংহদ্বার স্বরূপ এবং ধর্ম ছিল তার কপাট। কিন্তু বংশীধ্বনিরূপ বজ্রাঘাতে তা অকস্মাৎ পড়ে গিয়ে সমভূমিতে পরিণত হল (বৈ. প. পৃ.; ৮৯৮)। জগদানন্দের স্বাভাবিক অলংকার প্রয়োগ প্রবণতা এখানেও কাজ করেছে। তবে পূর্ববর্তী কবি চণ্ডীদাসের প্রভাবও এখানে লক্ষ্য করা যায়। গোটা পদটি রূপক অলংকারের দৃষ্টান্ত। কিন্তু এখানে অলংকার প্রয়োগ রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথাকে অভিনব ঔজ্জ্বল্য দান করেছে।

অষ্টাদশ শতকের এই কবি, রাধার স্বপ্নে গৌরাঙ্গকে অবতীর্ণ করিয়ে, রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথায় অভিনবত্বের সঞ্চার করেছেন। রাধাকৃষ্ণ কথার সুদূরত্ব ও তত্ত্ব এইভাবে ভক্তকবির অনুভবের আলোকে বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক অদ্ভুত আস্বাদ্যমানতা

লাভ করেছে। রাধাকৃষ্ণ মিলনের পর রসালসে নিদ্রিত আছেন, রাত্রিশেষে রাধা স্বপ্ন দেখে নিদ্রাভঙ্গে কৃষ্ণকে বলছেন—

কি দেখিলাম অকস্মাৎ
এক যুব গৌরবরণ।
কিবা তার রূপঠাম জিনি কত কোটি কাম
রসরাজ রসের সদন ॥
অশ্রু কম্প পুলকাদি ভাবভূষা নিরবধি
নাচে গায় মহামত্ত হৈয়া।
অনুপম রূপ দেখি জুড়াইল মোর আঁখি
মন ধায় তাহারে দেখিয়া ॥
নব জলধর রূপ রসময় রসকূপ
ইহা বই না দেখি নয়নে
তবে কেন বিপরীত হেন হৈল আচম্বিত
কহ নাথ ইহার কারণে ॥
চতুর্ভুজ আদি কত বনের দেবতা যত
দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।
তাহে তিরপিত মন না হইল কদাচন
গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে ॥ (বৈ. প. ; পৃ. ৯০০)

কবি এখানে সুকৌশলে রাধার স্বপ্নদর্শনের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের গৌরাঙ্গ রূপে জন্মানোর আভাস দিলেন। পদটির চমৎকৃতি এইখানে যে, রাধা এই অজ্ঞাত গৌরাঙ্গপুরুষের প্রতি নিজের আকর্ষণে বিপন্নবোধ করেছেন এবং কৃষ্ণকেই এর কারণ জিজ্ঞসা করেছেন। জগদানন্দের অপরাপর পদগুলিতে কথা বৈশিষ্ট্য কিছুই লক্ষ্য করা যায় না।

এ ছাড়া এ যুগের আর একজন কবি হলেন বিপ্রদাস ঘোষ। এঁরও পদ সংখ্যা কম। কিন্তু স্বল্প কয়েকটি পদেই বাৎসল্য রসচিত্রণে কবি যাদবেন্দ্রের মতই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কৃষ্ণের 'গোষ্ঠযাত্রার আনন্দ, আর তারই পাশাপাশি পুত্রের বিচ্ছেদ আশংকায় জননী হৃদয়ের করুণ-কোমল মূর্তি অঙ্কনে (বৈ. প. ; পৃ. ১০৮৪) কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

প্রেমদাস এবং লালদাসও বেশ কিছু পদরচনা করেছেন। তবে পদগুলির কথাবস্তুতে নতুনত্ব কিছু নেই।

অজ্ঞাত পরিচয় কবি নসির মামুদও বাৎসল্য ও সখ্যরসের পদে (বৈ. প. ; পৃ. ১৫১৫)। কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

নসির মামুদের পদটি শিল্পসুন্দর। কিন্তু কথাবস্তুতে কোন নতুনত্ব নেই। তবে নসির মামুদের পদ রচনা এই সত্যই প্রমাণ করে যে একসময়, লোকজীবনে প্রকীর্ণ কৃষ্ণকথা, বিশিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদে পরিণত হলেও, উত্তরকালে তা আবার গোষ্ঠী-ধর্ম নির্বিশেষে বিপুল ব্যাপ্তি লাভ করেছে।

কবিচন্দ্র শংকর চক্রবর্তী

মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ইতিহাসে 'কবিচন্দ্র' নামটি একাধিক কবি ব্যবহার করায়, উত্তরকালের গবেষকদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছেন, তাতে কোন সন্দেহমাত্র নেই। আমরা কিন্তু এখানে একাধিক কবিচন্দ্র সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। কেবলমাত্র কৃষ্ণকথার কবি হিসেবে যাঁরা কবিচন্দ্র উপাধি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের পৃথকভাবে সনাক্ত করার চেষ্টা করছি।

মল্লরাজসভার কবি হিসেবে খ্যাত শংকর, অন্যতম 'কবিচন্দ্র' উপাধিক কবি ছিলেন। এঁর রচনাবলীর মধ্যে 'ভাগবতামৃত গোবিন্দমঙ্গল' অন্যতম। ইনি রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ যেমন করেছিলেন, তেমনি শিবমঙ্গল, শীতলামঙ্গল এবং লক্ষ্মীমঙ্গলও রচনা করেছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদে ভক্তশাখা বর্ণনা প্রসঙ্গে একজন 'কীর্তনীয়া' কবিচন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভক্তি তত্ত্বসার গ্রন্থে 'সর্বসুখময় বন্দ দ্বিজকবিচন্দ্র' এবং গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশে 'কবিচন্দ্র ঠাকুর সেহ হয়ে বিদ্যাধাম' প্রভৃতি পরিচিতিতে যে কবিচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তিনি শংকর চক্রবর্তী হওয়াই সম্ভব বিবেচনা করি। কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে পুথির সংখ্যা বিচার করলে, কবিচন্দ্র শংকর চক্রবর্তীকেই সর্বাধিক জনপ্রিয় বিবেচনা করতে হয়। দুই বাংলার যে কোন পুথিশালাতেই কবিচন্দ্রের কৃষ্ণকথা বিষয়ক পুথির সংখ্যা অন্য যে কোন কবিকেই অতিক্রম করে যায়। এঁর কৃষ্ণকথামূলক কাব্যের সাধারণ নাম ভাগবতামৃত ও গোবিন্দমঙ্গল। অবশ্য মহাভারতের অনুবাদক হিসেবেও ইনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। কৃষ্ণকথার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, এমন পালায়ও ভাগবতামৃতের বা গোবিন্দ মঙ্গলের ভণিতা দেওয়া হয়েছে দেখা যায়। যেমন—দাতা-কর্ণের পুথিতে কবি গোবিন্দমঙ্গলের ভণিতা দিয়েছেন।[৮] কখনো কখনো 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' নামেও কবি ভণিতা দিয়েছেন।[৯] আবার কখনো 'রাধিকামঙ্গল' 'কলঙ্ক ভঞ্জন' নামেও কবিকে ভণিতা দিতে দেখা গেছে। সম্প্রতি কবিচন্দ্রের 'রাধিকামঙ্গল'কে পৃথক একটি রচনা হিসেবে দেখার চেষ্টা হয়েছে।[১০] কারণ হল, মূল কাব্যের-'গোবিন্দমঙ্গল' নামটি—উল্লেখ করে পালা হিসেবে স্বতন্ত্র নামটি উল্লেখ করা কবির অভ্যাস। অথচ রাধিকামঙ্গলের ভণিতায় কেবল 'রাধিকা মঙ্গল' নামটি দেখা যায়। প্রবন্ধকর্তা যে পুথিটি দেখেছেন, তাতে হয় কেবল 'রাধিকামঙ্গল' নামটি থাকতে পারে; কিন্তু এমন পুথি পাওয়া যায়, যাতে গোবিন্দমঙ্গলের সঙ্গেই রাধিকামঙ্গলের ভণিতা দেওয়া হয়েছে।[১১] তা ছাড়া প্রবন্ধকর্তা যে উদ্ধৃতি সংকলন করেছেন, তাতে স্পষ্টই বলা হয়েছে 'রাধিকামঙ্গল' একটি পালা। এই পালাটি সোনার গেঁড়ু চুরি, নন্দের ইষ্ট-পুজায় শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ, একই সঙ্গে যশোদার মন্দিরে ও গোপিনীদের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি, মূষিক-মার্জারলীলা, ও কলঙ্কভঞ্জনের কাহিনী নিয়ে গঠিত।[১২] সুতরাং রাধিকামঙ্গল কবির গোবিন্দমঙ্গলেরই একটি পালা। কলঙ্কভঞ্জন রাধিকামঙ্গল পালারই অংশবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ও গোবিন্দমঙ্গলেরই অংশ।

কিন্তু এসমস্তই যুক্তিবদ্ধ অনুমান মাত্র। কারণ কবির অখণ্ড গোবিন্দমঙ্গল আমাদের হস্তগত হয় নি। কবির নামে বহু সংখ্যক বিচ্ছিন্ন পালার পুথি পাওয়া

যায়। এই পালাগুলিকে সম্পাদক মাখনলাল মুখোপাধ্যায় একসময় সংকলন করে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এই সংকলন নির্ভেজাল হয় নি। কারণ সংকলনের গুরুদক্ষিণা পালাটি শংকর চক্রবর্তীর রচনা নয়। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

শংকর কবিচন্দ্র সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিকালের কবি। তবে 'ভাগবতামৃত' সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই রচিত। ভাগবতামৃতের সর্ব দেব দেবী বন্দনায় কবি বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের নবরত্ন মন্দিরের বর্ণনা দিয়েছেন।[১৩]

এই মদনমোহন মন্দির নির্মাণ করেছিলেন দুর্জনসিংহ। মন্দির নির্মাণের কাল 'মল্লাব্দ ফণিরাজ-শীর্ষ গণিতে' (১০০০ মল্লাদ) অর্থাৎ ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দ। অতএব এ ব্যাপারে আমরা নিঃসংশয় যে মন্দির নির্মাণের পর কবি তাঁর কাব্যরচনা করেছিলেন। সুতরাং তাঁর কাব্যরচনার কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক, একথা বলা যায়।

কবিচন্দ্রের কৃষ্ণকথা প্রধানতঃ ভাগবতের দশম স্কন্ধ থেকে সংকলিত কাহিনী। তবে অন্যান্য স্কন্ধের জনপ্রিয় কিছু কিছু উপাখ্যানও তিনি পালা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এরপর ভাগবতের দশম স্কন্ধের কাহিনীকে কবি যথাযথ ভাবেই অনুসরণ করে কাব্যরচনা করেন।

তবে কবি যে আক্ষরিক অনুবাদ করতে চান নি, তা তিনি নিজেই বলেছেন—

কেবা ব্যাসদেবের বুঝয়ে অভিপ্রায়।
ভাবর্থ ভাবের ব্যাখ্যা কবিচন্দ্র গায়।।

কবির এই ভাবার্থ ব্যাখ্যায় অনেক সময়ই ব্যাসদেব ঢাকা পড়ে গেছেন এবং কালের হাওয়ায় বৈষ্ণবভাবুকতার যে পরিমল প্রবাহিত হচ্ছিল, তাই-ই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এর উদাহরণ দেওয়া যায়। উদুখলের বন্ধনে বাঁধা পড়ে কৃষ্ণ যমলার্জুন উদ্ধার করলেন। এই হল ভাগবতীয় কাহিনী। পরে পরম বিস্ময়ে নন্দ এসে কৃষ্ণকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু কবিচন্দ্রের বর্ণনায় দেখি শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি সখার অনুরোধে বলরাম এসে ওজর ধরলেন, কৃষ্ণকে মুক্ত করে দেওয়া চাই। এতে ভাগবতের ভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বৃন্দাবনলীলার বাৎসল্য ও সখ্য ভাবাতিরেক-যুক্ত হয়েছে। মল্লরাজসভার বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে বাস করে এবং রাজসভার উপযোগী কাব্য রচনা করতে গিয়ে কবিচন্দ্র খুব স্বাভাবিক ভাবেই ভাগবত-কাহিনীর মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ ভাগবতের সামান্য ইংগিতকে আশ্রয় করেই কবি অনেক নতুন কাহিনী গড়ে তুলেছেন। যেমন, কবি বর্ণিত গেড়ু খেলার পল্লবিত কাহিনীটি 'ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ ক্বচিৎ'[১৪] অথবা 'ক্বচিৎ বিল্বৈঃ ক্বচিৎ কুম্ভৈঃ কু চামলকমুষ্টিভিঃ'[১৬]-র মত শ্লোকাংশের সামান্য ইঙ্গিতকে কেন্দ্র করেই হয়েছে। এইভাবে সোনার গেঁড়ু অন্তর্হিত করার কাহিনী 'নিলায়নৈঃ'[১৭] শব্দের ইঙ্গিতে, লুকা লুকী খেলার কল্পনাসূত্র 'অস্পৃশ্য নেত্র বন্ধাদৈঃ'[১৮] তে, হাডু-ডু খেলার সূত্র 'দদুর প্লবৈঃ'[১৯] রাখালরাজা

খেলার সূত্র 'কর্হিচিন্নপচেষ্টয়া' ২০-র মধ্যে নিহিত আছে বলে মনে করি। ফল ভোজন, কিরাতিনী উদ্ধার ও কিরাতসহ কিরাতিনীর অন্তে স্বর্গপ্রাপ্তি প্রভৃতি উপাখ্যানের উৎসও ভাগবতের মাত্র দুটি শ্লোকের[২১] সামান্য ইঙ্গিতকে আশ্রয় করে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণের ফল ভক্ষণের কাহিনী কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির একটি পরিচিত প্রিয় প্রসঙ্গ। পূর্ববর্তী শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গলকারদের কাব্যেও আমরা ভাগবতের এই দুটি শ্লোককে অবলম্বন করে কাহিনী বয়নের চেষ্টা দেখেছি। কিন্তু কবিচন্দ্র বেশ একটি পূর্ণাঙ্গ উপাখ্যান নির্মাণ করেছেন। এই নির্মিতিতে কবির যথেষ্ট কৃতিত্বও প্রকাশিত হয়েছে।

ফল ভক্ষণ কাহিনীতে বৃদ্ধ ফলবিক্রেত্রীর যুবতীতে রূপান্তরিত হওয়া, গৃহে প্রত্যাবর্তন ও তার স্বামীর তাকে অপরিচিতা রমণী ভেবে নেওয়া ইত্যাদি ঘটনা পূর্ববর্তী কোন কৃষ্ণমঙ্গলে নেই। এগুলি কবির নিজস্ব কল্পনা। আর কিরাতের কৃষ্ণপ্রেমের আবেশ (পৃ. ১২৮) মদনমোহন মন্দিরে কীর্তন-নৃত্যরত আবিষ্ট বৈষ্ণব ভক্তের ছবিই যেন তুলে ধরে। কবি তাঁর পারিপার্শ্বিকলব্ধ প্রত্যক্ষ জীবনের ছবিই এখানে আমাদের সামনে পরিবেশন করেছেন বলে মনে হয়।

এই সমস্ত প্রসঙ্গ ছাড়াও ভাগবত পুরাণ বহির্ভূত কিছু কিছু কাহিনীও কৃষ্ণ-কথার বর্ণনায় কবি গ্রহণ করেছেন। যেমন, কণ্বমুনির পারণ, কোকিল সংবাদ ও দিবা রাসের কাহিনী ভবিষ্যপুরাণ থেকে গৃহীত বলে কবি উল্লেখ করেছেন, যদিও বর্তমান প্রচলিত মুদ্রিত ভবিষ্যপুরাণে এসব কাহিনী নেই। অধিকাংশ কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের মত এই কবিও পারিজাতহরণ হরিবংশ অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী, নারদ পুরাণের[২২] কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কপোত-কপোতী সংবাদও ভাগবতের কাহিনী নয়। এর কোনও পৌরাণিক উৎসও জানা যায় না। কাহিনীটিতে শত্রু ব্যাধ ক্ষুধাতুর হলে, তার ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য কপোত-কপোতী নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অতিথিপরায়ণতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রেখেছে।

কলঙ্কভঞ্জনের নষ্টচন্দ্রদর্শন প্রসঙ্গটি সম্ভবতঃ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ[২৩] থেকেই গৃহীত। তবে পদ্মপুরাণেও[২৪] এই কাহিনীটি রয়েছে।

চতুর্থতঃ, এই কবির কাব্যের কিছু কাহিনী প্রত্যক্ষভাবেই গোস্বামীদের কৃষ্ণকথার উত্তরাধিকার। যেমন-মুক্তা চাষের কাহিনী। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'মুক্তাচরিত্রের' প্রভাব এর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু কবি মুক্তা চরিত্রের প্রাথমিক ঘটনাটুকু মাত্র এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, পুরো কাহিনীটি বর্ণনা করেন নি। কৃষ্ণকালী সংবাদ, রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধবের কাহিনী—কৃষ্ণের গৌরী মূর্তি ধারণের প্রসঙ্গজাত বলেই মনে হয়। তবে সপ্তদশ শতাব্দীতেও আমরা এই ধরনের কাহিনী পেয়েছি।

আবার, এমন কিছু কিছু কাহিনী কবিচন্দ্র বর্ণনা করেছেন, যা হয় তাঁর কপোল-কল্পিত, নয় কোন লৌকিক উৎস সঞ্জাত। যেমন—কাঠুরিয়া-ভক্তি কাহিনী, মূষিক-মার্জার লীলা প্রভৃতি। দাতা-কর্ণের কাহিনীও মহাভারত কিংবা জৈমিনীয় সংহিতায় নেই, প্রসঙ্গটির জন্ম বাংলাদেশেই।

আগেই উল্লেখ করেছি, ভাগবতামৃত 'গোবিন্দমঙ্গল'-সম্পাদক যে গুরুদক্ষিণা পালাটি সংকলন করেছেন, তা কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর রচনা নয়। কারণ কবিচন্দ্র লেগোর দক্ষিণে অবস্থিত পানুয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবি নিজেই বলেছেন—

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ভাবি রমাপতি।
লেগোর দক্ষিণে ঘর পানুয়ায় বসতি ॥ (ভূমিকাং ; পৃ. ছয় আনা)

কিন্তু যে শঙ্কর কবিচন্দ্র গুরুদক্ষিণা পালাটি রচনা করেছেন, তাঁর বাস বর্ধমান জেলার কুলচন্ড গ্রামে, 'শঙ্কর রচিল যার কুলচণ্ড বাস' (পৃ. ২৫৫)। এই পালাটি ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৪৫তম অধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। গুরুদক্ষিণার কাহিনী অবশ্য অগ্নিপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতিতেও দেখা যায়। কিন্তু ভাগবত পুরাণের কাহিনীতে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যে, অন্য পুরাণের কাহিনী থেকে একে সহজেই পৃথক করা চলে। যেমন—শঙ্করের বর্ণনায় শঙ্খাসুর হরিবংশ অনুযায়ী তিমি মাছ নয় শঙ্খ। ভাগবতের কাহিনীতে যমরাজ ভক্তিতেই কৃষ্ণের গুরু-পুত্রকে প্রত্যর্পণ করেছিলেন, কিন্তু হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে তিনি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রত্যর্পণ করেন। শংকর এখানে ভাগবতকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু কাহিনী বয়নে ভাগবতকে অনুসরণ করলেও কিছু কিছু প্রসঙ্গে কবি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। যেমন—শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি হেতু যমলোকে বন্দী সমস্ত পাপীর উদ্ধার প্রসঙ্গটি অভিনব। মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সংকলিত এই পালাটির আরও একাধিক পুথি পাওয়া যায়। যেমন—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১৩০৬। প্রথম সংখ্যা) প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রসঙ্গে ২৪৬ সংখ্যক পুথিটি শংকরের গুরুদক্ষিণা পালার।

মহারাজা গোপাল সিংহ

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বংশ বৈষ্ণব ছিল। মদনমোহনের মন্দির প্রাঙ্গণ কৃষ্ণকথাকীর্তনে মুখর থাকত। মল্ল রাজসভার সভাকবি শংকর চক্রবর্তীর কৃষ্ণকথা কাব্য নিয়ে ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। তিনি তাঁর কাব্যে লিখেছেন—

কীর্তন করিতে রাজা ভুলি দিল মেলা।
দিনরাত মহোৎসব বৈষ্ণবের খেলা ॥ (পৃ. ৩)

এখন স্বয়ং মহারাজ গোপালসিংহের (রাজত্বকাল-১৭১২-৪৮ খ্রীস্টাব্দ) ভণিতায় রচিত 'রাধাকৃষ্ণমঙ্গল'[২৫] নামে কাব্যটির বিষয়বস্তুই আমরা বিশ্লেষণ করে দেখবো।

গোপাল সিংহের সভাকবি কবিচন্দ্র শংকর চক্রবর্তী তাঁর গোবিন্দমঙ্গলের কাহিনী প্রধানতঃ ভাগবত থেকেই সংকলন করেছিলেন। কিন্তু গোপাল সিংহের ভণিতায় পাওয়া পালাগুলির কাহিনী নির্মাণে ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও ব্রহ্মসংহিতা থেকে কৃষ্ণকথার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। কাব্যটি ছোট ছোট পালায় গাঁথা। আমরা প্রায় ১১টি পালা পেয়েছি।

প্রথম পালার নাম 'কৃষ্ণার্জুন সংবাদ'। বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন শ্রোতা, বিষয় গোপীপ্রেম। এই কথোপকথনে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে বলেছেন—

সর্বশাস্ত্র অগোচর নাহি গোপীকার পর
প্রাণের অধিক করি বাসি।

কিন্তু গোপীদের মধ্যে আবার রাধাই শ্রেষ্ঠ—'রাধা আমি এক তনু নাম ভিন্ন মাত্র'। রাধার মাহাত্ম্য ঘোষণায় কবি মুখর। তাঁর মতে যে—

কৃষ্ণের নামের পর রাধা নাম লয়
ব্রহ্মহত্যা পাপের পাতকি সেই হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত প্রেমধর্মে রাধার যে অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়েছিল, মহারাজ গোপালসিংহ সেই ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকার বহন করে নিজের কাব্যভাবনার বিস্তার ঘটিয়েছেন। সমস্ত কাব্যেই দেখি, কবি বার বার চৈতন্য পদাশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

দ্বিতীয় পালার বন্দনায়ও চৈতন্য-নিত্যানন্দ সহ লক্ষ্মীপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া, জাহ্নবা দেবী, অদ্বৈত, সীতা ঠাকুরাণী, হরিদাস ঠাকুর, গদাধর পণ্ডিত, গদাধর দাস, বীরচন্দ্র, অদ্বৈত তনয় অচ্যুতানন্দ, পুরন্দর মিশ্র, শচীদেবী, শ্রীবাস, মুরারি গুপ্ত, ছয় গোস্বামী, দ্বাদশ গোপাল, চৌষট্টি মহান্ত, নিত্যানন্দের পিতামাতা হরাই পণ্ডিত[২৬] ও পদ্মাবতী প্রমুখের বন্দনা করা হয়েছে।

কবি যে অভাববোধ থেকে কাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছেন, তা হল—'সংক্ষেপে বর্ণিলা ব্যাস নাহি লিলারস'। এই লীলার রসকে পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করার অভিলাষী হয়েই কবি বোধ হয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কবি বলেছেন—'এইসব পদ্যক্রমে কহিব রসের কারণ'। প্রারম্ভিক এই সংকল্পের সঙ্গে দেখা যায়, কবি দ্বিতীয় পালায় ভবিষ্যপুরাণের কাহিনীও গ্রহণ করেছেন।

লক্ষ্য করার বিষয়, মল্লরাজসভায় ভবিষ্যপুরাণের কিছু কথা শংকর কবিচন্দ্র তাঁর গানে শুনিয়েছেন। দ্বিতীয় পালায় কাহিনীর বক্তা বশিষ্ঠ, জিজ্ঞাসু শ্রোতা দিলীপ। কাহিনীর প্রারম্ভে ধরিত্রী মহেশ্বরকে নিজের দুঃখের বিবরণ জানাচ্ছেন। এই পালার নন্দোৎসব ও নামকরণ পর্যন্ত প্রচলিত কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় পালার বর্ণনীয় বিষয় রাধার জন্মকাহিনী। চতুর্থ পালার কাহিনী পুতনাবধ, বেদবিধিমত কৃষ্ণের অভিষেক, তৃণাবর্ত বধ, গোপীদের ঘরে ঘরে কৃষ্ণের উপদ্রব এবং সখাদের সঙ্গে খেলা। এখানে কবি রূপ গোস্বামীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সখাদের সখা, প্রিয়সখা, প্রিয়নর্মসখা প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

পঞ্চম পালার কাহিনী, উপানন্দের উপদেশে গোকুলবাসীদের বৃন্দাবনে বসতি স্থাপন, রাখালদের বনভোজন ও ব্রহ্মার বৎসাদি হরণ।

ষষ্ঠ পালার আরম্ভ হয়েছে কৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তব দিয়ে। এই স্তবটি দীর্ঘ। স্তবের পরে এই পালায় আবার সংক্ষিপ্তাকারে গোচারণলীলা ও জননীর ব্যাকুলতা বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তম পালার কাহিনী আরম্ভ হয়েছে বিষণ্ণ রাধাকে সখিগণের বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসায়। পরে রাখালগণের যজ্ঞীয় অন্ন যাচঞা ও বিপ্রপত্নিগণের শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্শন বর্ণিত হয়েছে। এই অংশের উৎস সম্পর্কে কবি বলেছেন—

কর অবধান ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ
ব্যাসের লিখন কথা ॥

এই পালার শেষাংশে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণিত হয়েছে। কবি যে যথেষ্ট বর্ণন-ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তা শ্রীকৃষ্ণের এই পূর্বরাগ বর্ণনায় প্রমাণিত হতে পারে—।

চাহে চারি পানে কিছুই না জানে ভাবে হয়্যা অচেতন।
সেই কলেবর প্রবেশে অন্তর রাধা সরবস ধন ॥
উঠি ধিরে ধিরে আইলা বাহিরে ক্ষণেক বসিয়া থাকি।
রাধার বদন করেন মনন মুদিয়া যুগল আঁখি ॥
কিছু নাই আন রাধাগত প্রাণ ভাবনা নাহিক আর।
রাধা হল্য তপ যজ্ঞ যাগজপ রাধিকা কয়িলা সার ॥
রাধিকা স্মরণ হল্য অনুক্ষণ বদনে রাধার নাম।
রাধারে ভাবিয়া স্থির নহে হিয়া রাধা সে সুখের ধাম ॥

বর্ণনাটি আমাদের চণ্ডীদাস বর্ণিত শ্রীরাধার পূর্বরাগের কথাই মনে করিয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের এই উন্মাদপ্রায় সংকট উত্তরণে প্রিয় নর্ম্মসখা সুবলের দৌত্য এবং অপর পক্ষে ললিতার দৌত্য শুরু হলে পালা সাঙ্গ হল।

অষ্টম পালার কাহিনী সখাসখিগণের দ্বারা রাধাকৃষ্ণের গান্ধর্ব বিবাহের উদ্‌যোগ। রাধাকৃষ্ণের এই বিবাহ প্রসঙ্গ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের কাহিনীতে আছে। কিন্তু সেখানে স্বয়ং ব্রহ্মা দেবগণের উপস্থিতিতে, এই বিবাহ দিয়েছেন।

নবম পালার কাহিনীতে গান্ধর্ব বিবাহ সম্পন্ন হল। দশম পালার কাহিনী মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীতে শ্রীরাধার কৃষ্ণপূজায় গমন, ফাল্গুনী পূর্ণিমার মিলন এবং দোলবর্ণন। অবশ্য বাংলাদেশে দোল-উৎসব খুব প্রাচীন উৎসব নয়।

একাদশ পালার কাহিনীতে প্রচলিত বস্ত্রহরণলীলা বর্ণনার সঙ্গে কিছুটা রাসের মত এক অভিনব মিলনরজনীর বর্ণনাও রয়েছে। আর একটি কাহিনী হল, রাধাকে রাজা করে, রাজার অনুমতি নিয়ে গোবিন্দ আরাধনার নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। একাদশ পালার অন্তে পুথিটি খণ্ডিত হয়েছে।

দীন বলরাম দাস

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বলরামদাস' অন্য বহু সমস্যার মতই এখনো পর্যন্ত সমাধানহীন একটি সমস্যা। গৌরপদতরঙ্গিনীর সম্পাদক জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় সর্বাধিক সংখ্যক-১৯ জন বলরামের দাবী উত্থাপন করেছিলেন। ড. সুকুমার সেন মহাশয় তাকে কিছুটা কমিয়ে (৫ জনে) আনার গবেষণা করেছেন।[২৭] 'কৃষ্ণলীলামৃত'[২৮] রচয়িতাকে তিনি অন্যদের থেকে পৃথক ব্যক্তি বলেই চিহ্নিত করেছেন। ইনি ভণিতায় নিজেকে 'দীন' বলে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য সব সময় যে করেছেন, এমন নয়—

"কৃষ্ণলিলামৃত কহে বলরাম দাসে"-ও ভণিতা হিসেবে দেখা যায়। এই 'দীন' চিহ্নিত বলরাম দাস যে অন্যদের থেকে পৃথক্, তা স্বীকার করা যেতে পারে। দীন বলরামের নামে যে দু' একটি পদ পাওয়া যায়, তা-ও হয়ত এঁরই রচনা হতে পারে।

বলরাম দাসের 'কৃষ্ণলীলামৃত' একটি কৃষ্ণলীলামূলক কাব্য। হেঁয়ালীতে কবি কাব্য রচনার কাল নির্দেশ করেছেন নিম্নরূপ—

অজমুখ ভুজ অঙ্গ আশ্বিনী সকায়।
এই পরমানে সকাদিত্য সক জায়॥

(অজমুখ-৪, ভুজ-২, অঙ্গ-৬, অশ্বিনী-১) অর্থাৎ ১৬২৪ শকাব্দ বা ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ কবির কাব্যরচনার কাল।

বন্দনাদির পর বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের সঙ্গে কবি কাব্য আরম্ভ করেছেন। দেখা যায় কাব্যের মধ্যে কবি গদাধর দাসের চরণ বন্দনা করেছেন—

শ্রীযুত গদাধর চরণ ভরসে।
কৃষ্ণলিলামৃত কহে বলরাম দাসে॥

সম্ভবতঃ গদাধর কবির গুরু ছিলেন।

কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের ধারায় বলরাম দাসের কাব্য নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ কাব্যটির গঠনই অন্য সমস্ত কাব্যগুলোর থেকে কবিকে স্বতন্ত্র করে তোলে। সাধারণতঃ শুক, নারদ, জন্মেজয়ের মুখ দিয়ে প্রশ্নোত্তর ছলে পৌরাণিক রীতির অনুবর্তন করেই কৃষ্ণমঙ্গল কাহিনীসমূহ বয়ন করা হয়েছে। কিন্তু বলরাম গ্রন্থারম্ভে একটি অভিনব কাহিনী উপস্থাপন করেছেন—

মগদ্য দেশেতে এক রাজার কুমার।
শুদ্রেতে কুলিন ছিল মহা অধিকার॥
ভুঞ্জিয়া বিসয় বাস তিক্ত হৈঞা মনে।
সকল ছাড়িয়া তিঁহো গেলা বৃন্দাবনে॥
ব্রজেতে করিল বাস বরিস দশেক।
সর্বশাস্ত্র পড়ি গ্রন্থ দেখিল অনেক॥
ইষ্টদেব স্থানে তিঁহো বিদায় লইয়া।
প্রতি দেশে দেশে তিঁহো বেড়ান ভ্রমিয়া॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা মৎস্য রাজার দেশে।
পাঞ্চাল নগরে রাজা করিলা প্রবেশে॥
জমুনার হেন তথা দুকুলে নগর।
তটের উপরে দিব্ব স্থান মনোহর॥

* * * *

নদির তীরেতে এক বটবৃক্ষ আছে।
পথশ্রম পাঞা তেহো গেলা তার কাছে॥
পরম সিতল ছায়া স্থান মনহর।
দেখিয়া হরিস বড় হইলা অন্তর॥

বসিলা বিবেকী গ্রন্থ রাখিয়া ভূমিতে।
বেলা অবসান দেখি লাগিলা ভাবিতে॥
*   *   *   *
এই মতে বসিয়া করেন আলোচন।
দিবর্ব এক নিতম্বিনী তথা আগোমন॥

ইনি আত্মপরিচয় দিলেন—

গোকুলেতে জন্ম মোর নাম সত্যবতী।
শিশুকাল হৈতে করি গোবিন্দ ভকতি॥
*   *   *   *
আমার বাসাতে চল বৈষ্ণব গোসাই।
করিবে তোমার সেবা মোর জেষ্ঠ ভাই॥
আর এক আছে মোর কণিষ্ঠা ভগিনী।
অলপ বএসে রাড়ি সেই অভাগিনী॥

যাই হোক, বিবেকী শেষ পর্যন্ত সত্যবতীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করলেন। এই পর্যন্ত প্রথম অধ্যায়। সন্ধ্যাকালে সত্যবতীর অনুরোধে বিবেকী কৃষ্ণকথা আরম্ভ করলেন। বর্ণনায় খণ্ডিতা, বাসকসজ্জিকা, কলহান্তরিতা প্রভৃতি রূপ-নির্দেশিত রস পর্যায় যে বিবেকীর ভালভাবেই রপ্ত, তা বোঝা যায়। একটি দৃষ্টান্ত উৎকলিত হতে পারে—

যেহেতু কলহ জম্মে কহিএ তোমারে।
মান না জন্মিলে রস পুষ্টি নাহি ধরে।
নাইকা ছাড়িয়া অন্য নাইকার ঘরে।
রসের লালসে জদি নিরসক্তি করে॥
সে কথা বেক্ত যদি হয় তার আগে।
মাণিনীর ভক্ত জদি হয় অনুরাগে॥

এছাড়া কাব্যে রাধা ও চন্দ্রাবলীকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হিসেবে চিত্রণও রূপ গোস্বামী প্রভাবিত। সমস্ত কাব্যটির বুনুনী এই বিবেকী-সত্যবতীর প্রশ্নোত্তরে গ্রথিত। গঠনের দিক থেকে কাব্যটি যে অভিনব, তা স্বীকার করতেই হবে। এ ছাড়া কাব্য-কাহিনী সম্পূর্ণ প্রেমভক্তির ডোরে গাঁথা ব্রজলীলার উপাখ্যান। ঐশ্বর্য বর্ণনা পরিপূর্ণভাবে কবি পরিহার করেছেন। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণের মথুরাগমনে গোপীদের খেদে কাব্য শেষ হয়েছে। কাহিনীর উৎস নির্দ্দেশ করে বলা হয়েছে—

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে জে কহিল ভাগবতে
তাহা আমি করি বিরেচন।

বর্ণনার ক্ষেত্রে কবির ক্ষমতা নিতান্ত মন্দ নয়। নায়িকার মানে কৃষ্ণের বিরহ-অবস্থার একাংশ প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ করা যায়—

বিরহে ব্যাকুল কৃষ্ণ   হইঞা হৃদএ তৃষ্ণ
ঘন ঘন ছাড়েন নীশাস।

মাধবী তলাতে বসি ফেলাঞা হাতের বাঁশি
নি (ি) রক্ষণ করে দিগ পাষ ॥
পথে রাধা না দেখিয়া পড়ে মূর্ছাগত হৈঞা
পুন উঠে পথ পানে চায় ।
মুণ্ডে (?) পানি হানি কহে আজি প্রাণ নাহি রহে
কি হইল করে হায় হায় ।।

দ্বিজ রমানাথ

এই কবির কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।[২৯] কাব্যটিতে পৌরাণিক কাঠামোর অনুসরণে শুক, নারদ, অথবা পরীক্ষিৎ জনমেজয়-এর কথোপকথনে কাহিনী বিবৃত হয় নি। কাহিনীর বক্তা কবি নিজেই। অবশ্য এর আগেও আমরা কখনও কখনও স্বয়ং কবিকে বিবৃতিকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখেছি। কাব্য প্রারম্ভে দেবকী ও যশোদার সাধনা বর্ণিত হয়েছে—

দৈবকী জশোদা দুহে বাঞ্ছা কৈল মনে ।
করিবে কঠোর তপ কৃষ্ণ আরাধনে ॥
কোন্ তপ কৈলে দুহা কৃষ্ণধন মিলে ।
এতভাবি গেল দুহে ক্ষিরোদের কুলে ॥
গ্রীষ্মকালে আনল জ্বালিঞা চারি পাশে ॥
উর্দ্ধমুখে উর্দ্ধপদে রহে অনায়াশে ॥
শীতকালে শিশিরেতে দুহে রহে বসি ।
দিবাভাগে ক্ষিরদের জলে থাকে বসি ॥
বরিষাতে ভিজে দুহে বরিসন নিরে ।
নিবিষ্ট করিয়া মনে ডাকে দামদরে ॥
বিদারিএ রিদয় পদ্ম অঞ্জলি অঞ্জলি ।
আনলে আহুতি দেই কাটিয়া আঙ্গুলি ॥
এই মত কতকাল করএ পুজন ।
ক্ষিণ হইল অঙ্গ দুহার ওষ্ঠ জে জীবন ॥

* * * *

ধরিল শিশুর বেশ দেব নারায়ণ ।
দৈবকী নিকটে আসি দিলা দরসন ॥
দৈবকী আছেন চক্ষু মুদিত হইআ ।
ছল করি কৃষ্ণ তোথা দাণ্ডাইল গিয়া ।
নিজরূপ ধরি প্রভু দৈবকীরে কন ।
কি হেতু করহ তপ থাকিআ নির্জ্জন ॥

তখন-দৈবকী বর চাইলেন—'তুমা হেন পুত্র জেন এই জন্মে পাই।' যশোদাও সেই প্রার্থনা করলেন।

ধরা দ্রোণ, সুতপা পৃশ্নির তপস্যা প্রসঙ্গ ভাগবতেও বর্ণিত হয়েছে। এঁরাই পরে যথাক্রমে যশোদা-নন্দ ও বসুদেব-দেবকী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কবি সেই প্রসঙ্গ পরিবর্তিত করে তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। এরপর কাহিনী যথারীতি ব্রহ্মার নিকট পৃথিবীর দুঃখ জ্ঞাপনে আরম্ভ হয়েছে। দেবকীর বিবাহ, কংসের প্রতি দৈববাণী ইত্যাদি ভাগবত নির্দিষ্ট ক্রম-অনুসারে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের ভণিতাংশে কবির নাম বেশ কয়েকবার পাওয়া যায়। যেমন—

(১) দ্বিজ রমানাথ বলে গোবিন্দ কৃপায় ॥

(২) দ্বিজ রমানাথ বলে কৃষ্ণের কৃপায় ॥

(৩) অঘাসুর বধ কথা শুনে জেই জনে।
তার সব্ব নাস জায় রমানাথ ভনে ॥

পুঁথিতে ভাগবতের কাহিনী, পুতনাবধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্তবধ, মুখব্যাদানকারী কৃষ্ণের মুখগহ্বরে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন, গর্গের নামকরণ, উদুখলে বন্ধন, বৎসাসুর বধ, বকাসুর ও অঘাসুর বধ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

অন্যান প্রসঙ্গের তুলনায় কালিয়দমন প্রসঙ্গ দীর্ঘ। এ ছাড়াও কৃষ্ণকে স্বামীরূপে পেতে চেয়ে গোপীগণের কাত্যায়নী পূজার কাহিনীও এখানে আছে—"নন্দের নন্দনে দুর্গা স্বামী করি দিব"। কবি বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গও বর্ণনা করেছেন। যজ্ঞস্থানে রাখালদের অন্ন প্রার্থনা, ঋষিপত্নীদের কৃষ্ণকে ভোজন করানো, গোবর্ধন ধারণ, কুক্ষণে স্নানের সময় বরুণের অনুচর কর্তৃক নন্দকে হরণ ও কৃষ্ণের নন্দ উদ্ধার প্রভৃতি ভাগবতীয় কাহিনী বর্ণিত। এ ছাড়াও অরিষ্টাসুর বধ, ব্যোমাসুর বধ ও অক্রুরের ব্রজে আগমন, কৃষ্ণ বলরামের মথুরা যাত্রা, গোপীগণের বিলাপ; পথে যমুনায় স্নানকালে অক্রুরের জলের মধ্যে রামকৃষ্ণের স্বরূপ দর্শন, রামকৃষ্ণের মথুরায় আগমন, রজক হত্যা ও শিশুগণকে বস্ত্র বিতরণ পর্যন্ত কাহিনীর পর পুঁথি খণ্ডিত হয়েছে।

এই সমস্ত পৌরাণিক প্রসঙ্গ ছাড়াও এই কাব্যে দানলীলা, নৌকালীলা ও জলক্রীড়ার কাহিনী রয়েছে। দানলীলার বর্ণনায় কবি বলেছেন—

আর রূপে গেলা কৃষ্ণ জমুনার ঘাটে ॥
দান ছলে রহিলেন কদম্বের তলে।
হোথা সে শ্রীমতি গিয়া সখি ডাকে বলে ॥
বিধাতা করিল যদি গো গোয়ালার জাতি।
দধিদুগ্ধ বিকিকিনি এই মোদের বিত্তি ॥

রাধা সঙ্গে বড়াইকেও নিলেন। এর পর রাধা কৃষ্ণের কাছে উপনীত হলে, কৃষ্ণ রাধাকে বলেন—

নিতি নিতি জাহ বিকে দান দেহ কোন লোকে
ভুলাইয়া গেছ বহু দানি ॥

গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দানলীলায় বড়াইর ভূমিকাটি খুবই সক্রিয়। দানী দান চাইলে সমস্যায় পড়েছেন গোপীরা। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এলো বড়াই এবং সমস্যার সমাধানও করলো।

নৌকালীলার বর্ণনাও রয়েছে। নৌকালীলার পর রাস, কাত্যায়নী ব্রত ও শঙ্খাসুর বধের পৌরাণিক প্রসঙ্গের পর কৃষ্ণ ও গোপীদের জলক্রীড়া বর্ণিত হয়েছে। জলক্রীড়া প্রসঙ্গে চন্দ্রাবলী চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। চন্দ্রাবলী এখানে রাধার সঙ্গে এক নয়, পৃথক চরিত্র। জলক্রীড়ার সময় চন্দ্রাবলীর নূপুর হারিয়ে যাওয়ায়, কে চুরি করেছে জানার জন্য সবার বস্ত্র আভরণ ঝেড়ে দেখা হল। জলক্রীড়ার প্রসঙ্গ পরিচিত হলেও চন্দ্রাবলীর নূপুর হারিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটি কবির কপোলকল্পিত।

এই কাব্যে দু-একটি রাগ-রাগিণীসহ কিছু পদও পাওয়া যায়। যেমন—কালীয়দমন বর্ণনাকালে একটি করুণারাগের পদাংশ—

কোথাকারে গেলিরে প্রাণের কানাই রে
তোমা বিনে সখা কেহো নাঞি রে।

অপর একটি পদের রাগ মালসি, গোবর্ধন ধারণ লীলায় যুক্ত হয়েছে। মল্লার রাগে আর একটি পদ আছে। এ ছাড়াও ধনশ্রী, কামদ, বিভাস প্রভৃতি রাগের উল্লেখ আছে। এই পুথিটি ঠিক বিশুদ্ধ আকারে পাওয়া যাচ্ছে না। একটি ভণিতায় আছে—

হেন বেলে কোকিলের কলরব শুনি
গুণরাজ খান বলে কৃষ্ণরস বাণি।

এরপর রাসের বর্ণনা রয়েছে। অথচ চৈতন্যোত্তর কালের পরিচিত বৃন্দাদূতীর চরিত্রটি এখানে উপস্থিত—

এত জদি বলিলেন রাই বিনোদিনী।
কান্দে কান্দে বলে বৃন্দা আধ-আধ বাণী।

পুথিটি যদি নির্ভেজাল হত, তাহলে রমানাথের পরিচয় স্পষ্ট হত।

নন্দদুলাল দাস

এই কবির নামে একটিই মাত্র পুথি পাওয়া যায়।[৩°] পুথিটি আবার খণ্ডিত। মাত্র ১১ পত্রের। সাল তারিখও নেই। আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমের পুথি। অক্রুরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনোদ্যোগ পর্যন্ত কাহিনী বর্ণনার পর পুথিটি খণ্ডিত। অতএব কবি কতটা কাহিনী তাঁর কাব্যে গ্রহণ করেছিলেন, তা বোঝার উপায় নেই। ব্রহ্মার কাছে লক্ষ্মী দেবী পৃথিবীতে তাঁর ওপর যে অপমান হচ্ছে, তা নিয়ে দুঃখ জ্ঞাপন করলে, ব্রহ্মা দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে নারায়ণের কাছে উপস্থিত হলেন এবং স্তবাদি করে জানালেন—

তোমা বিনে দর্পচুর করিতে কেহ নাঞি।
কংসের দর্পচুর্ণ কর সুনহ গোসাঞী॥

ফলে নরায়ণ রাজি হলেন—'কৃষ্ণ অবতার লীলা করিবেন প্রচার'। তার সঙ্গে—

সপ্ত গর্ব্বে বলরাম রূপ গর্ব্ব ধরি।
রোহিনি ওদরে জাবেন জোগবল করি॥

এই কাহিনী ভাগবতের অনুরূপ হলেও কবি কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধনও করেছেন। ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে লক্ষ্মী নয়, পৃথিবী এসে ব্রহ্মার কাছে দুঃখ নিবেদন করেছেন।

কবি তাঁর কাব্যে সর্বাগ্রে ব্যাসের প্রতি প্রণতি জ্ঞাপন করেছেন। এ ছাড়াও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের প্রতিও কবি শ্রদ্ধাশীল—

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব পদরেণু করি সিরে।
নন্দদুলাল দাস বলে সুন তার পরে ॥

দ্বিজ রামেশ্বর

দ্বিজ রামেশ্বরের ভণিতায় বৃহৎ গোবিন্দবিজয়ের পুঁথি উত্তরবঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল।[৩১] এই রামেশ্বরকে শিব সংকীর্তন রচয়িতা মনে করার কোন কারণ নেই। তাঁর কাব্যের শেষ কটি ছত্র এই—

এ হেন মঙ্গল যেবা ভক্তি করি শুনে
তবে তারে ইষ্টদেব রাখিবে চরণে।
সপ্তম দিবসে গীত গায় গুণিজনা
বিভার স্বরূপ দিব ইহার দক্ষিণা।
সবাকারে দয়াকর ভকত বৎসল
সম্পূর্ণ হইল পুঁথি গোবিন্দ মঙ্গল।
জন্মে জন্মে নারায়ণ না হইবে বাম
কহে দ্বিজ রামেশ্বর করিয়া প্রণাম ॥

রামেশ্বর দাস

এঁর পুঁথির নাম শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা।[৩২] পুঁথি আরম্ভ হয়েছে এইভাবে—
শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণজী II.X. জন্মলীলা পুস্তক লিক্ষ্যতে—

শ্রীগুরুচরণ বন্দো হয়্যা সাবধান।
জাহার কৃপায় খণ্ডে তীমির অজ্ঞান ॥
শ্রী সচিনন্দন বন্দো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
অবতার প্রীথিবী করিলা ধন্য ধন্য ॥

এরপর কাহিনী শুরু হয়েছে। পরীক্ষিৎ রাজসভায় বসে আছেন। এমন সময় নারদ এলেন। রাজা মুনিকে বলেন—

প্রসন্ন হইয়া কহ কৃষ্ণকথা শুনি।

ফলে মুনি বর্ণনা আরম্ভ করলেন—

ভবিষ্যপুরাণ মত অমৃতের সার।
এক নামে বহে জার শত শত ধার ॥

এখানে দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণ জন্মের কারণ হচ্ছে—

অসুরের দাপে ক্ষিতি অতি দুঃখ মনে।
গোহারি করিতে গেলা শিব সন্নিধানে ॥
সাক্ষাতে জাইয়া স্তব করে বসুমতী।
মোর নিবেদন অবধান পশুপতি ॥
তুমি প্রভু দেব দেব তিন গুণ ধারি।
তোমার মহিমা জতো কি কহিতে পারি ॥
ভবিষ্যপুরাণ মত অমৃতের সার

জন্মলিলা শ্রবণে জনম নাহি আর ॥
একভাবে পুজিয়া শ্রী ব্যাসের চরণ।
রামেশ্বর দাস কহে পয়ার বচন ॥

শিব সকল দেবতাকে নিয়ে ক্ষীরোদ সাগরের তীরে এসে নারায়ণকে ডাকলেন। সকলের ডাকে নারায়ণ সাড়া দিলেন—

না ভাব অন্তরে ক্লেশ শুন এক উপদেশ
কহি তোমা সভার লাগিয়া ॥
প্রকাশ করিব ভুমি জনম লভিব আমি
শুভক্ষণে দৈবোকি উদরে।

নন্দোৎসবের বর্ণনায় কবি আনন্দে উল্লাসে উদ্বেল গোপপুরীর পরিবেশকে একেবারে জীবন্ত করে তুলেছেন—

তৈল হরিদ্রা দধি ভারে ভারে চলে তথী
ভিড়ে মহাকর্দম হইলো ॥
খোল করতাল বাজে উর্ধ্বাহু করি নাচে
কেহো ভুমিতলে পড়ি জায়।
করিয়া যুগল পানি কেহো দধি কাদা আনি
কেহো কার অঙ্গেতে লেপায় ॥
নন্দেরে আনিল ধরি ফেলিল কর্দ্দর্ম পরি
দধিকাদা ঢালিল মস্তকে।
ভুমে গড়াগড়ি জায়্যা পুলকে পুর্ণিত হৈয়া
কোলাকুলি পরম কৌতুকে

আনন্দের আতিশয্যে নন্দকে ধরে এনে কাদার ওপর ফেলা এবং তার মাথায় দইকাদা ঢালার প্রসঙ্গটি কবির নিজস্ব সৃষ্টি। এর আগে অন্য কোথাও পাওয়া যায় নি।

এই কাব্যের মূল সুর দাস্যভক্তির। কবি বলেছেন নন্দোৎসবের মত জন্মাষ্টমী পালন করলেও লোকে—

তেজী ঘোর ভবদায় মোহানন্দ সুখ পায়
জন্মে জন্মে হয় তার দাস ॥

গর্গের নামকরণ, পুতনাবধ, সকটাসুর, অঘাসুর, বকাসুর ইত্যাদি কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনার পর—

এই তো কহিল জতো আশ্চর্য্য লক্ষণ
মাধুর্য্য মহিমা কিছু শুনহ রাজন ॥
* * * *
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ করেন বিলাস
সর্ব্ব গোপীগণ লয়্যা কৈলা পুণ্য রাশ।

এখানে কবি ভবিষ্যপুরাণের কাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কংসের নিধনে এই

কাব্যের কাহিনী শেষ হয়েছে। কাব্যটি নিতান্তই ব্রতকথা-জাতীয়। এই কবিকে 'রামেশ্বর দ্বিজে'র সঙ্গে এক করে গণনা না করলেই হয়ত ঠিক হবে।

বনমালি দাস

বনমালি দাসের কাব্যের নাম গোবিন্দমঙ্গল।[৩৩] বন্দনাংশে কবি যথাক্রমে চৈতন্য, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কৃষ্ণ ও রাধিকার বন্দনা করেছেন। এখানেই পুঁথি খণ্ডিত বলে পরের অংশ জানা সম্ভব নয়। ভণিতায় কবি নিজেকে 'গৌরীর নন্দন' বলে অভিহিত করেছেন। কাব্যের নাম দেখে কাব্যের কাহিনী যে কৃষ্ণলীলামূলক ছিল, তা বোঝা গেলেও অন্য পূর্ণতর পুঁথি না পাওয়া পর্যন্ত, কেবল চৈতন্যবন্দনাটুকুই কবি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারে—

বড় অবতার কৈল কির্ত্তন রসাল
চারিবেদ প্রকাসী (ল) শুধন্য কলিকাল।
রামকানু অবতার চৈতন্য নিতাই।

উদ্ধারিল দৈত্যকুল জগাই মাধাই।
কপটে ভ্রমেন গোরা অনেক সহর।
কালিন্দি যমুনা যেথা গোকুল নগর।

নিম্নরেখ পংক্তিটি থেকে কি অনুমান করা সম্ভব, গোস্বামিগণের দর্শন প্রচারিত হওয়ার আগেই কবি তাঁর কাব্য লিখেছিলেন? মনে হয় যেন অনেকটা চৈতন্যভাগবতের মতই কবি চৈতন্যদেবের অবতারত্ব লক্ষ্য করেছেন।

ভক্তরাম দাস

ভক্তরাম দাসের কাব্যের নাম গোকুলমঙ্গল।[৩৪] কাব্যের প্রথমে কবি বলেছেন—

শ্রী রাধাকৃষ্ণায় জয়তাং
জদাংঘ্রকমলদ্বন্দ্বং দ্বন্দ্বতা পন্ন বারণং।
তারণং ভবসিন্ধুচ্চ শ্রীগুরু প্রণমাম্যহং॥
শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদ করিয়া প্রণতি।
কৃপা কর অধমের যুক্ত হৌক মতি।
* * * *
ইষ্টদেব রাধা কানু না হইয় বাম।
যুগল পদ ভাবি লেখে দাস ভক্তরাম॥

দেখা যাচ্ছে কবি এখানে কৃষ্ণের চেয়ে রাধাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এই গ্রন্থে কৃষ্ণের বাল্যলীলা বিষয়ক একটি পদে কবি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—

নাচে নন্দলাল নাচে নন্দলাল
গোপী বোলে নন্দলাল ভাল নাচে রে।
ঘন ভুরু ঠারে অলি চুরাএ উরে,

চরণে নপুর বাজে রে ॥
গোপি সঘন মঙগল গাহে রে।
জেন চাতকিনি হেরে মেঘ পানি,
কানু পানে গোপি চাহে রে ॥
রঙগ করে ব্রজনারি রে।

চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরীর কর্মচারী শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র বিশ্বাস এই পুথির মালিক।

নন্দরাম ঘোষ

নন্দরাম ঘোষের পালার নাম তালভক্ষণ।[৩৫] পালার পুথিটি তিন পাতার। প্রথম ও শেষ ভণিতা যথাক্রমে—

(১) নন্দরাম ঘোষ বলে গোবিন্দবিজয়
শুনিলে বাঞ্ছিত হয় পাপ বিনাশয়।
(২) নন্দরাম ঘোষ বলে গোবিন্দ চরণে।
শ্রীকৃষ্ণবিজয় তাল ভক্ষণ শুন এক মনে ॥

কিন্তু মাঝ খানেরটি একটু আলাদা—

জগন্নাথ ঘোষ বলে রাঙগা পদতলে।
বারেক করুণা কর নন্দের গোপাল ।।

এই জগন্নাথ ঘোষ বোধ হয় কবির পিতা। কবির এই তিন পাতার পালাটি দেখে মনে হয় না, কবি কৃষ্ণকথার এই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কণাটুকু নিয়েই প্রচেষ্টা শেষ করেছিলেন। রচনার হাত যথেষ্টই মসৃণ। বোধ হয় গোবিন্দবিজয় কিংবা শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামক কোন পূর্ণতর কাব্যের অংশ বিশেষ এই তালভক্ষণ পালাটি।

দ্বিজ বৃন্দাবন

দ্বিজ বৃন্দাবনের কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা'।[৩৬] এর কাহিনী এই রকম—উগ্রসেনের পুত্র কংস সহস্র বৎসর তপস্যা করলে ব্রহ্মা বর দিলেন 'তুমি অমর হবে'। কেবল তোমার ভাগিনাই তোমাকে বধ করতে পারবে। তপস্যা শেষে কংস ফিরে এলে উগ্রসেন বল্লেন, 'বহুদিন কঠোর তপস্যা করেছ, আর তপস্যায় কাজ নেই। সুখে রাজত্ব কর।' অতঃপর কংস রাজা হলেন। একদিন পাত্রমিত্র নিয়ে কংস রাজসভায় বসেছেন এমন সময় নিজের মৃত্যু চিন্তা করে তিনি পাত্র-মিত্রদের বল্লেন, দেবকীকে কেশে ধরে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে। সকলে মুখ নীচু করলেন। শেষে সৈন্য পাঠিয়ে দেবকীকে ধরে আনা হলে কংস তাকে হত্যা করার জন্য খড়্গ উত্তোলন করলেন। উগ্রসেন এই কার্যে বাধা দিলেন। কংস দেবকীকে ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু দিনে দিনে তিনি হয়ে উঠলেন পৃথিবীর মধ্যে অত্যাচারী এক অসুররাজ। ধরণী সহ্য করতে না পেরে ব্রহ্মার কাছে গুহারী জানাতে গেলেন। এর পরের কাহিনীতে যথারীতি ব্রহ্মা দেবতাদের নিয়ে নারায়ণের স্তব করলেন এবং নারায়ণও পৃথিবীতে অবতার হতে স্বীকার করলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন।

এই কাহিনীর শ্রোতা যুধিষ্ঠির ও বক্তা নারদ। মাত্র পাঁচ পাতার পুথি। শ্রোতার

দিক থেকে অভিনবত্ব ছাড়া এই পুথিতে লক্ষণীয় অন্য কিছু বিষয় নেই। কবির কাব্যে সর্বত্রই ভণিতা রয়েছে দ্বিজ বৃন্দাবন।

শ্রীকৃষ্ণদেব সার্বভৌমের শিষ্য গোবিন্দলীলামৃতের 'সদানন্দ বিধায়িনী' নামক টীকা রচয়িতা বৃন্দাবন চক্রবর্তী ও দ্বিজ বৃন্দাবন এক ব্যক্তি হলেও হতে পারেন।

এঁর নামে দধিখণ্ড[৩৭] গোপিকামোহন[৩৮], গোকুলবিলাস[৩৯] প্রভৃতি পালার পুথিও পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এগুলি কবির কৃষ্ণকথামূলক অখণ্ড কাব্য 'গোবিন্দ-লীলামৃতে'রই অংশ। গোবিন্দলীলামৃতের একটি খণ্ডিত পুথির সন্ধান দিয়েছেন যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়।[৪০]

পরাণ দাস

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে রচিত পরাণ দাসের 'রসমাধুরী' (ক. বি. ৩২৮৯) একটি বিশাল ব্রজলীলামূলক কাব্য। কবি কাব্য রচনার কাল নির্দেশ করেছেন নিম্নলিখিত ভাবে—

শকাব্দা সতের শতে আশ্বিন মাহাতে।
শুক্লপক্ষ দ্বাদসি তিথি দিবস তিনেতে॥
শুক্রবার ষোল দণ্ড বেলায়র সময়।
সমাপ্ত লিখন হইল প্রাণদাস কয়॥

ড. সুকুমার সেন মহাশয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে[৪১] 'শতে'র পাঠ 'সাত' হতে পারে কিনা বিভ্রমে পড়লেও এটি যে 'শতে' হবে এ বিষয়ে আমাদের সংশয় নেই। কারণ 'শ' ও 'স' এর ব্যবধান লিপিতে স্পষ্ট। ফলে শকাব্দ'র 'শ' এবং 'শতে'র শ সদৃশ বলে আমরা পাঠটি 'শতে' বলেই নিঃসংশয়ে গ্রহণ করে রচনাকাল ১৭০০ শকাব্দ গণনা করছি।

কবি বীর হাম্বিরের সভাপণ্ডিত ব্যাস আচার্যের শিষ্যও হতে পারেন। কারণ কবি বলেছেন—

শ্রীব্যাস আচার্য ঠাকুর পাদপদ্মধ্যান
রসের মাধুরী কহে এ দাস পরাণ॥

কবির কাব্য রচনার অনুপ্রেরণা ছিলেন গুরুপত্নী ও গুরুমাতা। তাঁর এই বিশাল গ্রন্থে (৩৫০ পাতা) চৈতন্যচরিতামৃত, গোবিন্দ রতিমঞ্জরীর সঙ্গে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বৃন্দাবনদাস, বলরাম দাস, গোবিন্দদাস এবং ঘনশ্যাম দাসেরও পদ উদ্ধৃত আছে। দীর্ঘ বৈষ্ণব বন্দনাও এই কবির কাব্যের অন্যতম বিষয়।

বন্দনা প্রভৃতি দীর্ঘ উপক্রমণিকার অন্তে কাব্যের কাহিনী আরম্ভ হয়েছে সখিগণের উদ্যোগে কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমজাগরণে। তবে কাব্যটিকে আমরা কোন স্বাধীন রচনা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। কারণ কবির নিজের কথাতেই শোনা যেতে পারে—

শ্রীগোবিন্দলীলামৃত বিদগ্ধ মাধব।
তার ছায়া দেখি লিখি করি অনুভব॥
মহাজনের গীত পদ্য দেখিয়া দেখিয়া।
লিখিয়ে গোবিন্দলীলা আপনা বুঝায়া॥

কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত' কিংবা রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' ছাড়াও, বহুজনের রচনা সংকলন করে কবি তাঁর সুবৃহৎ কাব্যকে (পৃষ্ঠা হিসেবে ৭০০, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থেও পৃষ্ঠাগুলি বিরাট) ব্রজলীলার এক কোষ গ্রন্থে পরিণত করেছেন। কারণ অন্যান্য নানা স্থান থেকে এতে উদ্ধৃতি সংকলিত হয়েছে। 'প্রেমমাধুরী' থেকে দীর্ঘ বৈষ্ণব বন্দনা কবি সংকলন করেছেন। কৃষ্ণ-সেবার অধিকারী হতে কবির আকাঙ্ক্ষা বারবার প্রকাশিত হয়েছে—

এ দাস পরাণ কয় মম ভাগ্য হেন হয়
দাসি হঞা থাকিব তাহার ॥

কৃষ্ণরাম দত্ত

এঁর কাব্যের নাম 'রাধিকামঙ্গল'।[৪২] কাব্যের উৎস সম্পর্কে কবি বলেছেন—

ব্যাসের সঙ্গিতা ভাগবত অনুসারে।
কহিল পাঞ্চালি কিছু ভক্তি লভিবারে ॥

বন্দনাংশে চৈতন্যবন্দনা কিংবা বৈষ্ণববন্দনা নেই, আছে বেদাদির সঙ্গে গণেশ সরস্বতী প্রভৃতির বন্দনা। কবি ভণিতায় বলেছেন—

কৃষ্ণরাম দত্তে কহে রাধিকামঙ্গল।
শুনিতে পাতক হরে সরির নির্ম্মল ॥

ভণিতায় কবি সর্বত্রই 'দত্ত' উপাধি ব্যবহার করেছেন, কোথাও 'দাস' ভণিতা নেই।

কাব্যের কাহিনী এইরূপ। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে উদ্ধব গোকুলে চলেছেন শ্রীমতী রাধা সহ অন্যান্য গোপী, সখাসখী, গবাদি পশু ও নন্দ যশোদাকে সান্তনা দিতে এবং এই সমাচার জানাতে—"বিলম্ব নাইক কিছু আসিব মাধব" ॥ লক্ষ্য করার বিষয় হ'ল, এই কবির কাব্যে রাধার আর এক নাম তিলোত্তমা—

কৃষ্ণের পরম প্রিয়া দেবি ত্রিলোত্তমা
ত্রিভুবনে নাই জার রূপের মহিমা ॥

রাধার এই নামটি আমরা ইতিপূর্বে ভাবানন্দের হরিবংশ ছাড়া অন্য কোথাও পাই নি। সুতরাং কবি এক্ষেত্রে হরিবংশের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

গোকুলে এসে উদ্ধব প্রথমে গেলেন নন্দালয়ে। সেখানে উদ্ধবের সঙ্গে যশোমতীর কথোপকথনকালে কবি কৌশলে কৃষ্ণের বাল্যলীলার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। পরের প্রভাতে উদ্ধব সাক্ষাৎ করেছেন রাধা ও অন্যান্য গোপীদের সঙ্গে এবং পরে অন্যান্যদের সঙ্গে। এই সুযোগেও কবি ব্রজলীলার বিচিত্র প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া বস্ত্রহরণ, রাস, এবং দানলীলা প্রভৃতির কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল, এই কাব্যটিতে রাধার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়েছে—

তাহাতে অধিক ভক্ত রাধা বিলাসিনি।
কদাচিত না ছাড়িব শুন সত্যবানি ॥

রাধার এই অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্যাপকভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

পরের কাহিনী হল উদ্ধবের আশ্বাস সত্ত্বেও রাধা দীর্ঘ বিরহে কালযাপন করতে লাগলেন। বিরহ যখন চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করল, তখন রাধার সখী শ্রীমতী গেল মথুরায় দূতী হয়ে। এই ঘটনাটিও কবি ভবানন্দের হরিবংশ থেকে সংগ্রহ করেছেন। ভবানন্দের হরিবংশে শ্রীমতী রাধার ভ্রাতৃবধূ এবং অন্তরঙ্গ সখী। কৃষ্ণ মথুরা চলে যাওয়ার পর তিনি মথুরায় নয়, দ্বারকায় কৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন। এর পরের কাহিনী দূতী সংবাদের, কাহিনীর শেষ অংশে দেখা যায় রাধা কৃষ্ণকে নিয়ে পৃথিবী ত্যাগ করতে চাইছেন। কিন্তু তখনও মর্ত্যের ভারহরণের কাজ অসমাপ্ত। তাই ব্রহ্মা এসে রাধাকে স্তবে সন্তুষ্ট করলে, রাধা কৃষ্ণের দেহে লীন হয়ে রইলেন—

লিন হৈয়া রৈলা রাধা গোবিন্দচরণ।

এই সমাপ্তি কাহিনীও সম্পূর্ণভাবে ভবানন্দের হরিবংশের অনুরূপ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কবি ভবানন্দের দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে কাব্যটি রচনা করেছেন। এঁর পুথির লিপিকাল-১৭৪৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ।

(দ্বিজ) চণ্ডী

এঁর কাব্যের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল[৪৩] (শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল খুইল পাঁচালির নাম)। ইনি মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা অঞ্চলের রাজা ছত্রসিংহের সময়ে কাব্য রচনা করেন। কবি বলেছেন—

রচেন শ্রীচণ্ডি দ্বিজ কৃষ্ণগুণগান।
নৃপতি ছত্রসিংহের করিবে কল্যাণ ॥

কবির ভণিতাযুক্ত দুটি খণ্ডিত পুথি বিশ্বভারতীর পুথিশালায় সংগৃহীত হয়েছে। বিচ্ছিন্ন পালাও হয়ত সমকালে আদৃত হয়েছিল। 'কংসবধ' পালার একটি পুথি (পুথি সংখ্যা-১০৭) বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহে আছে।

রসিক শেখর

এঁর লেখা 'পারিজাতহরণ' কাব্যের একটি ১০ পৃষ্ঠার খণ্ডিত পুথি পাওয়া গেছে।[৪৪] পারিজাতহরণের কাহিনী কৃষ্ণের দ্বারকালীলার একটি জনপ্রিয় প্রসঙ্গ। পূর্ববর্তী বহু কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যেও এই কাহিনী স্থান লাভ করেছে। ভাগবতে এই কাহিনী নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যহীন। অথচ বিষ্ণুপুরাণে ও বিশেষতঃ হরিবংশে এর বিস্তৃত কাহিনী রয়েছে। বেশীর ভাগ কবিই হরিবংশের কাহিনী অনুসরণ করেছেন। এই কবিও হরিবংশকে অনুসরণ করেই কাব্য রচনা করেছেন। তবে ভাগবত অনুযায়ী শুকমুনিই এর বক্তা। হরিবংশের মতই এখানেও নারদ ইন্দ্রের কাছে কৃষ্ণের পারিজাত বৃক্ষ যাচ্ঞার প্রস্তাব নিয়ে গেছেন।

মুনি বলে পাদ্য অর্ঘ্য নাহি প্রয়োজন।
দূত হঞা আইলাম আমি শুনহ বচন ॥
এক পারিজাত ফুল দিঞাছিলা শিবে।
সে ফুল আমারে দিলা গীত অনুরাগে ॥
আমি তবে দিলাম ফুল দেব জগন্নাথে।

গোবিন্দ দিলেন ফুল রুক্মিনীর হাতে ॥
গোবিন্দ তোমার ছোট আমি বড় ভাই।
এক তরুবর দিলে বাঁচেন সবাই ॥

রসিক কবি ভণিতায় 'তাড়কাবধ' পুথিটি [৪৫] এই কবির রচিত হলেও হতে পারে।

উদ্ধবানন্দ

উদ্ধবদাস নামে একজন কবি সম্ভবতঃ শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। কারণ তাঁর কাব্যে 'ব্রজমঙ্গলে'র [৪৬] বন্দনাংশে তিনি শ্রীখণ্ডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। এঁর কাব্যের বিষয়বস্তু কৃষ্ণকথামূলক নয়, শাখা বর্ণনামূলক।

আর একজন কবি উদ্ধবানন্দ 'রাধিকামঙ্গল'[৪৭] রচনা করেছিলেন। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের আগে কাব্যরচনা করেন নি বলেই মনে করি। কারণ তাঁর কাব্যের মাধ্যে বহু অর্বাচীন শব্দের প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করি, যেমন—'সোনার চুড়ি'। কবিকে অন্ততঃ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের সন্ধিলগ্নের কবি হিসেবে গ্রহণ করে, কথাবস্তুর বৈচিত্র্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

রাধিকামঙ্গলকে একটি কাব্য না বলে দীর্ঘ পদ্য বললেই ঠিক হয়। এখানে রাধার জন্মকথা বর্ণিত হয়েছে। বার বছর ধরে সূর্যের তপস্যা করে রাজা বৃষভানু সূর্যের কাছ থেকে বর পেলেন 'পরম সুন্দরী' এক কন্যা হবে তোর' এবং সূর্যদেব আরও বলে দিলেন 'সেই কন্যা হব রাজা জগতে পূজিত'। এরপর ভাদ্র মাসের শুক্ল অষ্টমী তিথিতে রাজা বৃষভানু ভগবতী পূজা করার জন্য ফুল তুলতে গেলেন। তখন রাণী কৃত্তিকা (কীর্তিদা ?) গোশালায় আলপনা দিচ্ছিলেন। এমন সময় রাজা তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরে কৃত্তিকাকে ডাকলেন, সেই সময় রাধা জন্মগ্রহণ করলেন। রাধার চরণস্পর্শ লাভ করে ধন্য বসুমতী ভাবলেন—

যে চরণ সদাই বৈষ্ণব আশা করে।
হেন চরণ আরোপিলা আমার উপরে ॥
রাধা লাগি গোলক ছাড়ি আসিব শ্রীহরি।
কৃষ্ণ পদস্পর্শ পাব মোর ভাগ্য ছাড়ি ॥

এরপর পৃথিবী বৃকেভানু রাজা ও কৃত্তিকা রাণীরও সৌভাগ্যের কথা বলেছেন। শিশুর রূপ দেখে সবাই আনন্দিত হলেন। কিন্তু শিশুকে দুগ্ধপান করতে ও চোখ খুলে তাকাতে না দেখে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল। এদিকে রাধা মনে মনে ভাবছেন—

প্রাণনাথ বিনে কার অঙ্গে দিঠে দিব।
গোবিন্দ আসিয়া যবে দিব দরশন।
শ্যাম অঙ্গ নিরখি দেখিব অন্যজন ॥

এদিকে রাজাও কন্যার এই অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সেই সময় নারদ এসে উপস্থিত হলেন। রাজাকে বিষণ্ন দেখে নারদ কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাজা বললেন—

বৃদ্ধকালে এক কন্যা যদি হইল মোর।
সেই অন্ধা হল অভাগ্যের নাহি ওর ॥

তখন নারদ বললেন যে, তিনি নিজে একবার শিশুকে দেখবেন। তারপর নারদ সদ্যোজাতা রাধাকে দেখে বুঝলেন 'এই শিশু কৃষ্ণপ্রিয়া হব'। সুতরাং নারদ স্থির করলেন কৃষ্ণকে তিনি এই সংবাদ দেবেন, তারপর বাইরে এসে রাজাকে বললেন যে, বৈদ্য ওঝা লাগলেই এর প্রতিকার হবে। তারপর নারদ গোলোকে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে রাধার জন্ম সংবাদ দিলেন।

নারদের কথা শুনে কৃষ্ণ বৈদ্যরাজের বেশ ধরে গোলোক ছেড়ে রাধার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং বললেন যে, তিনি জন্ম অন্ধকে চক্ষুদান করতে পারেন। তখন রাজা কাতরভাবে বৈদ্যবেশী কৃষ্ণকে বললেন—

মোর কন্যায় কৃপা করি দেহ চক্ষু দান ॥

কৃষ্ণ কন্যাকে ভাল করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে—

রাজা বলে কন্যা যদি পায় চক্ষুদান।
সেই কন্যা তোমারে করিব সম্প্রদান ॥

এরপর কৃষ্ণ রাধার কাছে গিয়ে তাঁকে কোলে নিলেন, তারপর রাধার কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং বাইরে এসে রাজাকে বললেন 'তোমার কন্যায় আমি দিনু চক্ষুদান'। রাজা যেহেতু পূর্বে কন্যাদানের অঙ্গীকার করেছিলেন, তাই প্রশ্ন করলেন যে বৈদ্যরাজের অর্থাৎ কৃষ্ণের যদি আসতে দেরী হয়, তবে বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাকে তিনি কেমন করে রাখবেন। উত্তরে বৈদ্যরূপী কৃষ্ণ বললেন—

যদি মোর বিলম্ব হইব।
অন্য পাত্র আনি তুমি কন্যা দান দিব ॥

এরপর মনে মনে কৃষ্ণ বললেন যে, রাধার বিবাহ হলেও তার স্বামী নপুংসক হবে। এই কথা বলে কৃষ্ণ চলে গেলেন। বৃষভানু অন্তঃপুরে গিয়ে কৃত্তিকাকে কন্যা আনতে বললেন। কৃত্তিকা রাজার কোলে কন্যা এনে দিলে—

বৃষভানু কোলে কন্যা মুখপানে চায়।
দক্ষিণ বাহু তুলি নাচিয়া বেড়ায় ॥

কৃত্তিকা খুবই আনন্দিত হয়ে বৃষভানুকে বলল, কন্যার জন্য আভরণ প্রস্তুত করতে। এরপর রাজা আভরণ এনে দিলে কীর্তিদা কন্যার চুলে সোনার ঝাঁপা পরিয়ে দিলেন। তাতে সুন্দর চিত্র আঁকা। হাতে কনকের চুড়ি আর পায়ে নূপুর পরিয়ে রাণী কন্যাকে নাচাতে লাগলেন। বৃষভানুপুরের লোকেরা ভাবল বুঝি বা আকাশের চাঁদ মাটিতে নেমে এসেছে। এরপর কবি এইভাবে কাব্য শেষ করেছেন—

অগাধ সমুদ্রলীলা কহনে না যায়।
এতদূরে রাধিকামঙ্গল হইল সায় ॥

পালাটি নিতান্ত ক্ষুদ্র পরিসরের হলেও, এর ভেতর কাহিনীর অভিনবত্ব যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণকে না দেখলে সদ্যোজাতা রাধার চোখ না খোলার প্রসঙ্গ এর আগেও আমরা পেয়েছি। কিন্তু সূর্যের কাছে বারো বছর তপস্যা করে রাধাকে কন্যারূপে লাভ এবং সদ্যোজাতা রাধার কাছে নারদমুনির আগমন ও গোলোকে গিয়ে কৃষ্ণকে সংবাদ প্রদান, কৃষ্ণের রাধার নিকট বৈদ্যরাজ বেশে আগমন ইত্যাদি ঘটনা অভিনব। সুতরাং এদিক দিয়ে পালাটির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

এই কাব্যের পুঁথিটি বাঁকুড়া জেলায় পাওয়া গিয়েছিল। পুঁথিটির লিপিকাল-১২৩৪ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ। আমাদের মনে হয় কাব্যটিকে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে গণনা করা ঠিক নয়।

হরিদাস (দীন)

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হরিদাস(দীন) কৃষ্ণলীলা নিয়ে 'মুকুন্দ মঙ্গল' রচনা করেন।[৪৮] পুঁথিটি বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সংগ্রহ করে সাহিত্য পরিষদকে দান করেছিলেন। অনুমিত হয়, শেষের দুএকটি পাতাই হয়ত নেই। পত্রসংখ্যা—১-২৯৫। এঁর কাব্যের আরো কিছু পুঁথিও পাওয়া গেছে।[৪৯] প্রাপ্ত কাব্যটি যে সম্পূর্ণ কবির নিজের লেখা নয়, তা পুঁথিটি থেকে প্রাপ্ত এক বর্ণনায় জানা যায়,—

কলিযুগে কৃষ্ণ হৈল গৌর অবতার।
নিত্যানন্দ জ্যেষ্ঠ তার প্রেমের ভাণ্ডার ॥
তার প্রিয়া শ্রীমতী জাহ্নবী গোসাঞী।
তার অতি প্রিয়পাত্র ঠাকুর রামাই ॥
তার প্রিয়পাত্র এই মোর প্রাণেশ্বর।
দশম বর্ণিতে তার হৈল অন্তর ॥
সার্দ্ধ সপ্ততি অধ্যায় বর্ণন করিল।
বর্ণিতে বর্ণিতে কিবা তাঁর ইচ্ছা হৈল ॥
অপ্রকট লীলা তিঁহ প্রকাশ করিলা।
তার গোত্র প্রভু মোর অধমে আজ্ঞা দিলা ॥
প্রেমদাস তুমি কর বাকির বর্ণন।
আজ্ঞা শুনি মুঞি হৈনু সচিন্তিত (মন) ॥

এরপর পুঁথিটি খণ্ডিত। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে জাহ্নবা দেবী বহু শিষ্যের দ্বারা মান্য হয়েছিলেন। এঁর শিষ্য রামাই ঠাকুর, গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার অন্যতম অনুবাদক সম্ভবতঃ ইনিই, (সা. প. প-৪, পৃ. ২৯৯-৩০০) এবং পবনদাস বাবাজীর 'রামাই চরিতামৃত' হয়ত এঁরই জীবনী। রামাই ঠাকুরের শিষ্য হরিদাস। অতএব হরিদাসকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশের লোক বলে ধরে নেওয়া যায়।

কাব্যটির প্রথমে নারায়ণাদি বন্দনার পর কবি নিজের দীক্ষিত স্বভাবটি উদ্ঘাটিত করেছেন আর একটি বন্দনা অংশ যোগ করে—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বন্দো অকিঞ্চন রূপে।
ডুবাইল আচণ্ডাল প্রেম রস কূপে ॥
শ্রীগুরুর পাদপদ্ম বন্দিয়া সানন্দে।
আঁখ্যে সিদ্ধাঞ্জন দিঞা উদ্ধারিলা অন্ধে ॥
মূর্খ জড় অধির বধির গুণহীন।
উদ্ধারিলা প্রভু মোর অতিশয় দিন ॥
হেন প্রভু চরণে সে দৃঢ় রহু মন।

শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু আর অদ্বৈতচরণ ॥
বৈষ্ণব ঠাকুর তবে করিব বন্দন।
যাহার কৃপায় ভব তরে জীবজন ॥
করিয়াছি বড় আশা হঞা অল্পমতি।
জ্ঞানের নাহিক লেশ কিসের শকতি ॥

অতএব প্রেমদাস নামক দ্বিতীয় যে কবি হরিদাসের মৃত্যুর পর তাঁর আরব্ধ কর্ম পূর্ণ করেছিলেন (সার্দ্ধ সপ্তম অধ্যায়ের পরবর্তী অংশ) এবং হরিদাসের একটি পরিচয় দিয়েছেন, তা বিশ্বাস করতে হরিদাসের রচনার মধ্যেই উপাদান থেকে গেছে স্বীকার করতে হয়।

ভণিতায় লক্ষ্য করা যায়, কবি কোথাও 'দিন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, আবার কোথাও করেন নি। গ্রন্থারম্ভ হয়েছে ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বন করে। কবি ক্রমান্বয়ে ভাগবতের অধ্যায় বিভাগকে যথার্থ নিষ্ঠার সঙ্গে মান্য করে নিজের কাব্য 'মুকুন্দমঙ্গলে'রও অধ্যায় বিভাগ করেছেন।

এইভাবে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি অধ্যায়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তত্ত্বমূলক অংশ যতদূর সম্ভব পরিহার করে (ক্ষেত্র বিশেষে অবশ্য গৃহীতও হয়েছে) কবি কাহিনীর কাঠামোকে নিজের সহজ ও সরস ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল, চৈতন্য-উত্তর কালের অনুবাদক হয়েও কবিকে প্রেম ভক্তির অপেক্ষা দাস্যভক্তির অধিক অনুসারী বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, এ যুগের কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যধারায় ভাগবতীয় কাহিনীর সঙ্গে লৌকিক কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গের অবতারণা হয় অনিবার্য প্রসঙ্গ। কিন্তু কবির কাব্যে তার স্পর্শমাত্র নেই, কেবল রাধা নামটুকু ছাড়া। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা নামের বিচ্ছিন্নতা এ যুগে আর সম্ভব ছিল না বলেই বোধ হয় এটিকে কবি এড়াতে পারেন নি। গঠনের দিক থেকে দেখলে দেখা যায়, কাব্যটি বর্ণনাত্মক হলেও রাগ-রাগিণীর উল্লেখ সহ দু একটি পদও আছে। জানা যায় কবি ১৭০০-১৭০১ খ্রীস্টাব্দে 'মুকুন্দমঙ্গল' কাব্যটি রচনা করেন। ইনি মল্লভূমের অধিবাসী ছিলেন। এঁর পুথি এই অঞ্চলেই পাওয়া যায়।

রামপ্রসাদ রায়

রামপ্রসাদ রায়ের কাব্যের নাম 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু'। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু'র একটি পুথি সংগ্রহ করেছেন এবং এটিকে নবাবিষ্কৃত কাব্য বলে অভিহিত করেছেন[৫০] এবং একথাও বলেছেন যে এই কাব্যের আর একখানি মাত্র পুথি ড. ক্ষুদিরাম দাসের সংগ্রহে আছে এবং তাতে আদিলীলা ও অন্ত্যলীলা দুটি খণ্ড আছে কিন্তু এর আগেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথি-শালায় এই কাব্যের একটি পুথি সংগৃহীত হয়েছে।[৫১] তবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৮৭ পৃষ্ঠার পুথিটিকে সম্পূর্ণ বলা হলেও, পুথিটি যে সম্পূর্ণ নয়, তা অবশ্য বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত পুথিটি থেকে বোঝা যায়। তাঁর সমগ্র পুথিটি ৩৫৩ পৃষ্ঠার এবং এতে আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা বর্ণিত হয়েছে। মধ্যলীলার ১৪৮ থেকে ১৬২, এই ১৫ খানি পাতা নেই। কাব্যে অধ্যায় বিভাগ নেই। কিছু কিছু

পরিচ্ছেদসূচক সংখ্যা আছে। এই কাব্যে আদিলীলা ১ থেকে ৬১ পৃষ্ঠা, মধ্যলীলা ৬২ থেকে ২৬৫ পর্যন্ত এবং অন্ত্যলীলা ২৬৬ থেকে ৩৫৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত রয়েছে। আদিলীলায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা থেকে নন্দ প্রভৃতি সকলের বৃন্দাবনগমন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। মধ্যবৃন্দাবনলীলায় দানখণ্ড, মানখণ্ড প্রভৃতি লৌকিক লীলা সংযুক্ত হয়েছে শ্রীরূপ কথিত উজ্জ্বল রসের উদাহরণ হিসেবে। এর সংগে ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের বীরত্বসূচক ও মধুর রসাত্মক ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। অন্ত্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণের মথুরা ভ্রমণ থেকে ঘটনা শুরু হয়েছে, শেষ হয়েছে কৃষ্ণের গোলোকনগরী প্রত্যাবর্তনে।

কবি বৈষ্ণব রসতত্ত্ব বিশ্লেষণের ইচ্ছা নিয়ে কাব্যটি রচনার পরিকল্পনা করেন—

সেই কালে হত্যে মোর মনে ছিল আসা।
রাধাকৃষ্ণ রসতত্ত্ব বর্ণিবারে ভাসা ॥

কাব্যে নরনারায়ণ বন্দনার পরেই গুরুবন্দনা করা হয়েছে। বিশেষ কোন গুরুর নাম নেই। কবির বক্তব্য—

দিক্ষাদাতা শিক্ষাদাতা সেই গুরু হন।
গুরুতে সাধুতে ভিন্ন দেহ কভু নন ॥

পরে গণেশবন্দনা, পার্বতীবন্দনা, সরস্বতীবন্দনা, ভাগীরথী বন্দনা ও তারপর কৃষ্ণবন্দনা—

জয় জয় কৃষ্ণ চন্দ্র ব্রজেন্দ্রনন্দন।
জোড় করে করি মুই চরণবন্দন ॥

বন্দনায় কৃষ্ণের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা দেখে মনে হয় কবির ভক্তি প্রেমমার্গের পথিক—

চন্দনের বিন্দু ভালে জিনি পূর্ণচান্দ
সে চান্দ ব্রজাঙ্গনার মন মৃগফান্দ ॥
*　　*　　*　　*
বাঁকা ঠামে বামে চূড়া তাঅ বনফুল।
জাহে হেরী ব্রজনারী মজাইল কুল ॥
তিভঙ্গ ভঙ্গিমা অঙ্গ কদম্ব হিলনে
কালিন্দির কুলে স্থিতি নিকুঞ্জ কাননে।

এই রূপ বর্ণনায় জ্ঞানদাসের প্রভাব লক্ষণীয়। কবি যে শক্তিশালী, তা তাঁর এই কৃষ্ণবন্দনা থেকেই বোঝা যায়। কবি রাধার বন্দনাও করেছেন—

জয় কৃষ্ণ প্রাণাধিকা　　বন্দো দেবি শ্রীরাধিকা
কৃষ্ণ কেলি রাধিকাসুন্দরী।
রামপ্রসাদেতে গাঅ　　শ্রীমতী রাধিকা পাঅ
নিজ কাঅ করি সমর্পণ।
এ সংসার সাগরেতে　　অনাআসে পার হইতে
ধন্য কৃষ্ণকান্তার চরণ ॥

এই কবির কাব্যে ভণিতা হল—

কৃষ্ণলিলামৃতসিন্ধু বর্ণন করিতে।
মূর্খ মূঢ় হইআ লালসা হঅ চিত্তে ॥
*　　　*　　　*
জগদ্রাম সুত রামপ্রসাদ পামরে।
কেবল ভরসা গুরু শ্রীচরণ বরে ॥

কবি যে পিতৃগৌরবে বিশেষভাবে গৌরবান্বিত তা তাঁর ভণিতা থেকেই জানা যায়। তিনি তাঁর পিতা জগদ্রামের অদ্ভুত রামায়ণ ও দুর্গা পঞ্চরাত্রি রচনায় সহযোগিতা করেছিলেন।

সাম্প্রদায়িক বিভেদের পরিবর্তে মিলনের একটি সুর কবিকে বহুজন থেকে স্বাতন্ত্র্য দিতে পারে—

রামকৃষ্ণ এক আত্মা অভেদ আকার।
নিজজ্ঞানে গান করি রাম নাম যার ॥
পরম পুরুষ এক প্রধান প্রকৃতি।
একে দুই হইয় আছে নিজে কর স্তুতি ॥
উপাসনা ভেকে কেহ বলে শ্রীতারাম।
কেহ দুহাকারে কঅ রাধাকৃষ্ণ নাম ॥

কবি তাঁর কাব্যে কাহিনীর উৎস সম্পর্কে জানিয়েছেন—

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মধ্যে জন্মখণ্ড মত।
রচনা করি এ গ্রন্থ কৃষ্ণলিলামৃত ॥

বন্দনাংশের পর গ্রহারম্ভ থেকে লক্ষ্য করা যায়, কবি নিম্নলিখিতভাবে ভণিতা দিচ্ছেন—

জন্মখণ্ডমত কৃষ্ণলিলামৃতসিন্ধু ॥
জগদ্রামসুত রচে তার একবিন্দু ॥
সিতারাম রাধাশ্যাম অভেদ শরীরে
খেল রাম প্রসাদের রিদঅ মন্দিরে ॥

কবির এই বারবার সীতারাম ও রাধাকৃষ্ণের অভিনবত্বের ঘোষণা সম্ভবতঃ পিতার অদ্ভুত রামায়ণ রচনার দ্বারা প্রভাবিত।

কাব্যের কাহিনী নারায়ণ ও নারদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগবতের অথবা হরিবংশের তুলনায় এই রীতিটি ভিন্ন। রাধার প্রতি শ্রীদামের অভিশাপ কাহিনী এখানে বর্ণিত। এই কাহিনীটি কবি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ থেকে পেয়েছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতি খণ্ডের ত্রয়োদশ থেকে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে তুলসী-চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া পদ্মপুরাণেও তুলসীর কাহিনী রয়েছে। শ্রীদামের কাছ থেকে অভিশাপ পেয়ে রাধার প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় কবি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কৃষ্ণের জন্মের কারণ এই কাব্যে পুরাণানুগ, আর রাধাকে এখানে বলা হয়েছে অযোনিসম্ভবা।

এই কবির কাব্যে প্রধানতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এবং এ ছাড়াও ভাগবত ও শ্রীরূপ রচিত উজ্জ্বলনীলমণির ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রভাব আছে। শ্রীরূপের ঋণ স্বীকার করে কবি নিজেই বলেছেন—

উজ্জ্বল কিরণ কনা রসামৃতসিন্দু।
এ দুই গ্রন্থের সূত্র লয়্যা বিন্দু বিন্দু॥
কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু প্রসাদেতে গায়।
সীতারাম রাধাশ্যাম রাখ রাঙা পায়॥

দীননাথ

দীননাথের পালার নাম 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা'।[৫২] পাঁচ পাতার এই ছোট পুথিতে কৃষ্ণের জন্ম থেকে কংসবধ পর্যন্ত কাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে। পুথিটি অখণ্ড, কাব্যের শেষে একটি মাত্র ভণিতায় কবি নিজের নামটি প্রকাশ করেছেন—

বদন ভরিয়া হরি বোল সর্ব জনে।
শ্রীগুরু চরণ ভাবি দিননাথ ভনে॥

এ ছাড়া কবির কাল কিংবা পরিচয়ের অন্য কোন সূত্র পুথিতে পাওয়া যায় না। পুথিটির লিপিকাল ১২২৬ সাল (১৮১৯ খ্রীস্টাব্দ)। কবিকে তাই অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের কবি হিসেবেই গ্রহণ করা যায়। কাহিনীর মধ্যে অভিনবত্ব কিছুই লক্ষণীয় নয়।

জয়ানন্দ দাস

এই কবির কাব্যের নাম 'কৃষ্ণের জন্ম'[৫৩]। বসুমতীর অভিযোগ শুনে নারায়ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে প্রতিশ্রুত হলেন। পরে সে বিষয়ে অংশগণকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, 'যাও মর্ত্যধামে কে কিরূপে জন্মাবে তা জানাও'। এই কবিও রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে কৃষ্ণকথাকে অভিন্ন করতে চেয়েছেন। এদিক দিয়ে রামপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে এই কবির সাদৃশ্য আছে—

জে কৌসল্যা জে জসদা সুমিত্রা রোহিনী।
কেকই দৈবকী হবে আমার জননী॥

এইভাবে পিতা দশরথ হবেন বসুদেব, সীতা হবেন রাধা। ব্রজের সখাসখিগণও রাম অবতারের অনুসঙ্গে কল্পিত হয়ে বর্ণিত হয়েছেন। রামকথার সঙ্গে কৃষ্ণকথার সঙ্গতি সাধক কবিকল্পনা মাঝে মধ্যে আমাদের চমকও দেয়—

যজ্ঞ নারি দ্বিজকন্যা হইব অহল্যা।
অন্ন যোগাইব মোরে গোচারণ বেলা॥

নন্দোৎসবের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি কৃষ্ণের বিভিন্ন নামকরণের কথা বলেছেন—

নন্দ রাখিল নাম শ্রীনন্দের নন্দন।
ব্রজগোপী রাখিল নাম মদন মোহন॥
নিলমুনি নাম দিল জসদা রোহিনী।
কালা কানু নাম দিল বৃন্ধ গোয়ালিনী॥
ঠাকুর রাখাল নাম দিল বলরাম।
অনন্ত অশ্রুত ব্রহ্মা দিলা তার নাম॥

কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের পূর্বাভাস অথবা প্রভাব এখানে পড়েছে বলেই মনে হয়। মৃত্তিকা ভক্ষণ ও কৃষ্ণের উদরে যশোদার বিশ্বরূপ দর্শনে এই কাব্যটি সমাপ্ত হয়েছে। কাব্যটির মূল সুর বাৎসল্য।

(দ্বিজ) জয়নারায়ণ

দ্বিজ জয়নারায়ণ কৃষ্ণকথামূলক 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' কাব্য রচনা করেছিলেন।[৫৪] ইনি ভণিতা দিয়েছেন—'জয়নারায়ণ ভণে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস'। এ ছাড়া একাধিক ভণিতায় কবির 'রায়' উপাধিটিও ব্যক্ত হয়েছে। যেমন—'গুরুপদে সঁপি কায় কবি রায় রচিল'। এর সঙ্গে নিজের দ্বিজত্বও তিনি ঘোষণা করেছেন, 'দ্বিজ জয় বিরচিল শ্রীকৃষ্ণবিলাস'। 'কবি রায়' কথাটির অর্থ যদি কবিরাজ না হয়ে, 'রায়' উপাধিক কবি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে কবির নাম (দ্বিজ) জয়নারায়ণ রায়। কবি নিজের কাব্যকে 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' নামে চিহ্নিত করলেও মাঝে মাঝে নামান্তর ব্যবহার করেছেন। যেমন—'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন', 'রাধাকৃষ্ণলীলা'। এঁর নামে আরও পুঁথি পাওয়া যায় 'দ্বারকাবিলাস'[৫৫] ও রাধাকৃষ্ণবিলাস।[৫৬]

জয়নারায়ণ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, কৃষ্ণকথা শ্রবণের ভূমিকা হিসেবে নারদের উপস্থিতিসহ ভারাক্রান্ত বসুন্ধরার ব্রহ্মা সমীপে গমন থেকে আরম্ভ করে শ্রীকৃষ্ণের ও যুধিষ্ঠিরের স্বর্গগমন পর্যন্ত, কাহিনী বর্ণনা করেছেন। জন্ম থেকে আরম্ভ করে ব্রজলীলার শেষ পর্যন্ত কাহিনী 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন', 'রাধাকৃষ্ণলীলা' বা 'রাধাকৃষ্ণবিলাস' নাম কবি অভিহিত করেছেন। দ্বারকালীলার কাহিনী গ্রথিত হয়েছে 'দ্বারকাবিলাসে'।

জয়নারায়ণ তাঁর কাব্য-কাহিনীর উপাদান সংগ্রহে কেবল ভাগবতের ওপর নির্ভর না করে বরং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ওপরই বেশী নির্ভর করেছেন। যেমন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বিষ্ণুর প্রতি মহাবিষ্ণুর নির্দেশ, শ্রীরাধার জন্মবৃত্তান্ত, রাধা-কৃষ্ণের প্রথম দর্শনের বিবরণ, শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের জন্ম, শ্রীরাধার সখিগণের জন্ম প্রভৃতি কাহিনী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেরই উপাদান। এ ছাড়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মধ্যে আমরা রাধাকৃষ্ণের বিবাহের যে প্রসঙ্গ পাই, তা-ও বর্ণিত হয়েছে। এই বিবাহে—

> ইন্দ্রাদি অমরগণ বরযাত্র হন।
> পুরোহিত হৈলা দেব মরাল বাহন।
> মহাদেব মহাদেবী অধ্যক্ষ হইল।
> বৃন্দাবনে মহামহোৎসব আরম্ভিল।

অবশ্য রাধার সঙ্গে আয়ান ঘোষের বিবাহও হল প্রকাশ্যে। এই বিবাহকে সমর্থন করতে আয়ান ঘোষের পূর্বজন্মের তপস্যার বিবরণ সহ বিষ্ণুর কাছ থেকে লক্ষ্মীকে ভার্যা রূপে বরলাভ করার বৃত্তান্তও বর্ণিত হল। এ ছাড়া কিছু লৌকিক কথাবস্তুও কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন—দান ও নৌকালীলা তো আছেই, এই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে রাজা করে নিজে কোটাল হয়েছেন। আর এক কাহিনীতে রাধা পুষ্পচয়ন ছলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে সখিসমভিব্যাহারে মালঞ্চবনে গেছেন। পরিষদের

পুথিটি এখানেই খণ্ডিত। তবে আগেই বলেছি কবি দ্বারকালীলার শেষ অবধি বর্ণনা করেছেন বলে জানা গেছে—

শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গযাত্রা করিয়া শ্রবণ।
স্বর্গ যান যুধিষ্ঠির তেজি সিংহাসন ॥[৫৭]

বাণীকণ্ঠ দ্বিজ

এই কবির কাব্যের নাম 'কৃষ্ণমঙ্গল' বা 'কৃষ্ণচরিত'। এশিয়াটিক সোসাইটিতে এই কাব্যের একটি পুথির ছ'টি পাতা পাওয়া গেছে।[৫৮] যে ছ'টি পাতা পাওয়া যায়, তাতে বড়াই চরিত্রের সক্রিয় ভূমিকা আমাদের খুবই দৃষ্টি আকর্ষণ করে—

শুন শুন শুন কহি পুন পুন
অবোধ মাধব তুমি।
তুমার মানস পুরিতে নারিলে
তনু তিয়াগিব আমি ॥[১]
* * * *
বড়াই বলিয়া মিছা নাম ধরি
মিছাই গোকুলে বসি।
সে রাধা রমণি তুয়া পায় আনি
যদি না করাঙ দাসি ॥[৪]

পুথির ৩২ পৃষ্ঠায় কবি কাব্যের আদি কাণ্ডের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন—'এসব রহস্যকথা আদিকাণ্ড সায় ॥' এবং মধ্য খণ্ডের শুরু করেছেন—'পুনর্ব্বার শুন মধ্য খণ্ডের পত্তন'। অতএব সহজেই বোঝা যাচ্ছে, কবি কাব্যের পরিচ্ছেদগুলিকে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মতই খণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। প্রথম খণ্ডের যেটুকু বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সমস্ত ভঙ্গিটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মতই গাঢ় আদিরসে পাক করা। কিন্তু কাব্যের গঠনটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত নয়। এখানে রাধাকৃষ্ণ ও বড়াইর উক্তি প্রত্যুক্তির সামান্য বর্ণনা যেমন আছে, তেমনি পৌরাণিক রীতিটিও অনুসৃত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভে যথারীতি শুকদেবকে পরীক্ষিৎ পরবর্তী কাহিনী সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। এই রীতিটি ভাগবতীয়।

এই কাব্যের কথা অংশের কিছু অভিনবত্বও চোখে পড়ে। স্নানের ঘাটে বসে রাধা যমুনায় প্রতিবিম্বিত কৃষ্ণকে দেখে দুবাহু প্রসারিত করে আলিঙ্গন করতে চাইছেন। এই কথাবস্তু কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে না থাকলেও, ইতিপূর্বে আমরা পদাবলী সাহিত্যে এর সন্ধান পেয়েছি। দ্বিজ বাণীকণ্ঠের আরও দুটি খণ্ডিত পুথির একটি আছে এশিয়াটিক সোসাইটিতে (পুথিসংখ্যা ৪৯২৩) এবং আরও একটি আছে বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদে (পুথি সংখ্যা ৮০৭)।

দামোদর দাস

দামোদর দাসের কাব্যের নাম 'কৃষ্ণমঙ্গল'।[৫৯] কাহিনী শুরু হয়েছে ব্রহ্মার কাছে ধরণীর গোহারী থেকে। পৃথিবী এখানে গাভীরূপ ধারণ করেছেন। এটি ভাগবতের কাহিনী। কৃষ্ণজন্ম, কৃষ্ণকে নন্দালয়ে স্থাপন, বধোদ্যত কংসের প্রতি মহামায়ার ভবিষ্যৎ

কথন, পূতনাবধ শকটবধ, তৃণাবর্তবধ, যশোদার কৃষ্ণমুখগহ্বরে বিশ্বরূপ দর্শন, ফল-বিক্রেত্রীকে কৃপা ও গোপিগণের গৃহে ননীচুরির কাহিনী পর্যন্ত এসে পুঁথি খণ্ডিত হয়েছে। কবি সম্ভবতঃ একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষ্ণলীলা কাব্য লিখেছিলেন। কারণ তাঁর কাব্যের নাম কৃষ্ণলীলার কোন খণ্ডাংশ নয়, সম্পূর্ণ কৃষ্ণমঙ্গল। কাব্য আরম্ভও হয়েছে কৃষ্ণলীলার সূচনা থেকে। সহজ ও কিছুটা সংক্ষিপ্ত ভঙ্গীতে কবি কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সম্পূর্ণ কাব্যটি পাওয়া না গেলেও যেটুকু পাওয়া গেছে, তার থেকেই এই মন্তব্য করা চলে।

কবির নাম দামোদর দাস ছিল কি না সন্দেহ হয়। কারণ ভণিতার সর্বত্রই রয়েছে 'দামোদরের দাস'।

রামকৃষ্ণ দ্বিজ

রামকৃষ্ণ দ্বিজের কাব্যের নাম 'গোবিন্দমঙ্গল'। এশিয়াটিক সোসাইটির ৫৬৬২ সংখ্যক পুঁথিটি এই গোবিন্দমঙ্গলেরই অংশ বিশেষ, মণিহরণের কাহিনী। পুঁথিটির লিপিকাল ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। খুব সম্ভব ইনি অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিকালের কবি। মণিহরণ পালার বর্ণনায় 'গোবিন্দমঙ্গল দ্বিজ রামকৃষ্ণ ভণে'—এই ভণিতা কবি ব্যবহার করেছেন।

দ্বিজ কবিরত্ন

দ্বিজ কবিরত্নের কাব্যের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।[৬০] প্রাপ্ত পুঁথিটি খণ্ডিত, পত্র সংখ্যা ৩৪ থেকে ৪৬। পুঁথির প্রথমের ৩৩টি পাতা না থাকায় কবি কাব্যের কাহিনী কিভাবে আরম্ভ করেছিলেন বোঝা যাচ্ছে না। ৩৪ সংখ্যক পাতায় আমরা দেখেছি, কালীয়-দমনের কাহিনী। কালিয়দমন প্রসঙ্গে কবি কদ্রু-বিনতার দ্বন্দ্ব, অরুণ-গরুরের জন্ম, গজকচ্ছপের কাহিনী, গরুরের অমৃত হরণ প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া প্রলম্ব বধ ও বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গ রয়েছে। বস্ত্রহরণলীলার পর পুঁথি খণ্ডিত। অতএব দেখা যাচ্ছে কবিরত্ন ভাগবতেরই কাহিনীর ক্রম অনুসরণ করেছেন। কবি ভণিতা দিয়েছেন—

(১) দ্বিজ কবিরত্ন গান রচিয়া রসাল ॥
(২) দ্বিজ কবিরত্ন গান শ্রীকৃষ্ণচরণে।
(৩) দ্বিজ কবিরত্ন গান হরিপদ তলে।

হরিবোল দাস

হরিবোল দাসের 'নৌকাখণ্ডে'র পুঁথির[৬১] বন্দনা অংশে শ্রীচৈতন্যদেবের দীর্ঘ প্রশস্তি করা হয়েছে, পরে 'কৃষ্ণ' নামের প্রশস্তি। এই সূত্রে রত্নাকরের কবিত্বলাভ কাহিনী এবং কৃষ্ণলীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও রয়েছে। ভক্তাধীন ভগবানের চরিত্র বর্ণনা ছলে অম্বরীষ ও দুর্বাসার কাহিনী, বলি ও বামনের কাহিনী, বৈষ্ণব মাহাত্ম্য ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। তত্ত্বগতভাবে কবি পরকীয়া প্রেমের পক্ষপাতী ছিলেন—

রাধা কানু এক তনু সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
পরকীয়া ভাব বিনু লিলা পূর্ণ নয়॥

পতিপত্নী হইলে একঘরে বাস।
রসপুষ্টি না হয় লীলার প্রকাশ ॥

কাব্যের নাম নৌকাখণ্ড হলেও, প্রথম ২৭ পৃষ্ঠার পুথিতে ওপরের কাহিনগুলি বর্ণিত হয়েছে। দান ও নৌকালীলার ঐতিহ্য পৌরাণিক না হলেও দীর্ঘদিন ধরে বাংলা কৃষ্ণকথার অঙ্গনে মর্যাদার আসন পেয়ে এসেছে। বিশেষতঃ মহাপ্রভুর আস্বাদন ধন্য হয়ে দান ও নৌকালীলার কাহিনী ভক্ত সমাজেও আদৃত হয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে এসে এই দানলীলা নতুন আধ্যাত্মিক মহিমায় উন্নীত হয়েছিল। প্রেমের মূল্যেই ভবপারের কাণ্ডারী শ্রীকৃষ্ণ ভবনদী পার করবেন, এই কবির কাব্যে এই নতুন আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়—

সুখেতে সকল গোপী পার হয়্যা জায়।
কড়ির নাহিক দায় নামে পার হয় ॥

কাব্যটির গঠন দেখে মনে হয়, এটি কোন পূর্ণাঙ্গ কাব্যের পালা বিশেষ নয়, এটিই পূর্ণাঙ্গ কাব্য।

চন্দ্রশেখর

এই কবির কাব্যের নাম 'অক্রূরাগমন'। এর যে পুথিটি পাওয়া গেছে [৬২] তা খণ্ডিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব পদকর্তা চন্দ্রশেখর ও ইনি অভিন্ন বলেই মনে হয়। এঁর কাব্যের পুথিটিতে মাঝে মধ্যে দু একটি পাতা না থাকলেও কাহিনী মোটামুটি অনুসরণ করা যায়, অভিনবত্বহীন গতানুগতিক অক্রুর সংবাদের কাহিনী। কবি আরও দু-একটি পালাও লিখে থাকবেন। এই পুথির শেষে কবি লিখেছেন—

ইহার পর নন্দবিদায় শুনিতে মধুর।
যাহার স্মরণে লোক পায় প্রেমাঙ্কুর ॥

অতএব পরবর্তী পালাও কবি লিখেছিলেন বলেই মনে হয়। কবির কাব্যে ভণিতা দেওয়া আছে—

অক্রুরগমন সায় হৈল এই ঠাঁই।
শ্রীচন্দ্র শেখর (পাঠ-সিখর) কহে শুন বন্ধুগণ ॥

কবি যে প্রাচীন নন, তা তাঁর কাব্যের 'শুন বন্ধুগণ' ভণিতা থেকেই বোঝা যায়। এই ধরনের ভণিতা প্রাচীন কোন কাব্যে পাওয়া যায় না।

হরিকৃষ্ণ দাস

হরিকৃষ্ণ দাসের কাব্যের নামও অক্রুরগমন।[৬৩] বন্দনা-অংশে কবি গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত, শচী ঠাকুরাণী প্রভৃতির বন্দনা করেছেন। এর কাহিনী গতানুগতিক হলেও স্বল্প কিছু পরিকল্পনার নূতনত্ব রয়েছে।

কবি স্বকীয়াপন্থী বা পরকীয়াপন্থী, তা বোঝা যায় না। কৃষ্ণের চলে যাওয়ার সংবাদ শুনে—

তবে বৃকভানুসুতা ধিরে কন কথা।
কি হইবেক কি করিব হাম।

আরাধিঞা হৈমবতি পাইয়াছি কৃষ্ণপতি
গুণের বন্ধু ছাড়ি জায় ॥

বর্ণনার আর একটি অংশও অভিনব মনে হয়, বোধ হয় শাক্ত পদাবলীর বিজয়া অংশের প্রভাবজাত। কৃষ্ণ যে প্রভাতে মথুরায় যাবেন, তার আগের রজনীতে মা যশোদা জননী মেনকার মতোই সূর্যের কাছে প্রার্থনা করেছেন—

প্রভাত না হবে রাত্রী না দেবে উদয়।
শ্রবণে শুনহ দেব অভাগীনি কয় ॥
এইমত রাত্রিকাল থাকুক সদাই।
মধুপুরে জেন আর না জায় কানাই ॥

রাধাকৃষ্ণের গোকুল ত্যাগে শ্রীমতী রাধার বিলাপ অংশে পুথি খণ্ডিত হয়েছে। তাই লিপিকাল কিংবা অন্যত্র কবির কাল সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যায় না। অনুমান, কবির কাল অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের আগে নয়।

দ্বিজ সন্তোষ

এঁর কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'।[৬৪] পুথির মোট ১৬টি পাতা পাওয়া গেলেও পুথির পাতাগুলির সংখ্যা ক্রমিকভাবে পাওয়া যায় না। আবার পাতাগুলির ডানদিকের অংশ নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে নিরবচ্ছিন্নভাবে পড়া যায় না। তবু কাহিনীর ধারা অনুসরণে অসুবিধা হয় না। দ্বিতীয় পত্র থেকে কাহিনী অনুসরণ করলে দেখা যায়, কৃষ্ণের জন্ম, কৃষ্ণকে নিয়ে বসুদেবের নন্দালয়ে গমন, পথে যমুনা উত্তরণ, কন্যারূপী মহামায়াকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন, কন্যা হননে কংসের উদ্যোগ, কংসের প্রতি মহামায়ার ভবিষ্যৎ বাণী, নন্দের মথুরায় কর দিতে আগমন, পুতনাবধ প্রসঙ্গ, শকটভঞ্জন, নামকরণ, মৃত্তিকাভক্ষণ, উদূখলে বন্ধন প্রভৃতি কাহিনী কবি বর্ণনা করেছেন। সম্পূর্ণ পুথি না পাওয়ায় কাহিনী কতদূর ছিল জানা যায় না। নামকরণের কাহিনীতে অল্প কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। পুত্রের চিন্তায় উদ্বিগ্ন দেবকী একসময় বসুদেবকে বললেন, গর্গকে নন্দালয়ে পুত্রের নামকরণের জন্য পাঠাতে। বসুদেবও দেবকীর কথামত গর্গের কাছে গিয়ে নিবেদন করেন, নন্দালয়ে গুপ্তবেশে আমার দুই পুত্র অবস্থান করছে, পুরোহিত হিসেবে এদের নামকরণ যেন গর্গ করে আসেন। শুনে গর্গ নন্দালয়ে গিয়ে জানালেন—

তোমার ভবনে আছেন দেবকি তনয়।
আমা পাঠাইল আজি তোমার ভবন।
থুইব তাহার নাম [করি] নিবেদন ॥

ভণিতায় কবি বলেছেন—

(১) সন্তোষ কহেন কৃষ্ণ পাবে কতদিনে ॥
(২) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ সন্তোষ রচিত ॥

বিশ্বনাথ ভট্টরায়

কবির কাব্যের নাম শ্রীকৃষ্ণলীলা।[৬৫] পুথির লিপিকাল ১২৭২ সন। কাব্যের প্রথমে কবি গণেশ বন্দনা করেছেন—

বন্দো দেব গণপতি গিরিস তনয়।
নিজগুণে কৃপা মোরে কর দয়াময় ।।

কবি ব্যাসদেবের বন্দনাও করেছেন। গ্রন্থারম্ভে দেখা যায়, চিরাচরিত কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের মতোই—

ধেনু রূপ ধরি খিতি গেলা যথা প্রজাপতি
নিবেদন জানায় ব্রহ্মারে
অধার্ম্মিক পাপীভার সহিতে না পারে আর
অসুর রাক্ষস জন্ম নিল।

এর পরের কাহিনীও একেবারেই ভাগবতের অনুরূপ। বসুদেবের বিবাহ, বরকন্যাকে পেঁৗছে দিতে যাওয়ার পথে কংসের দৈববাণী শ্রবণ, বসুদেবের অনুনয়ে দেবকীর মুক্তি, বসুদেবের প্রথম সন্তানকে কংসের হাতে সমর্পণ। কংসের উক্তি—"কংস বলে এই পুত্র মম বৈরী"। পরে কংসের কাছে নারদ এলেন এবং ঘটনা শ্রবণে বিস্ময় প্রকাশ করে মনে মনে চিন্তা করলেন—

নৃপতির বাক্য শুনি নারদ বিস্ময়।
অধর্ম সঞ্চার বিনে দুষ্ট নহে ক্ষয় ।।
অহিংসক শিশু বধি মহাপাপ হব।
সেই পাপে দুষ্ট কংস নিপাত হইব ।। (৩খ.)

নারদের চিন্তা অবশ্য ভাগবতানুগ নয়, এটি কবির নিজস্ব সৃষ্টি। এরপর কবি বলেছেন—

অষ্টম গননে আদি অষ্টম রাজন।
প্রথমে অষ্টম গুনি কহে মুনিগণ।
এত বলি দেবঋষি করিল গমন।
শুনিয়া কুপিল কংস অনল সমান ।। (৩খ.)

কৃষ্ণের জন্ম বর্ণনায় কবি ভাগবতকেই বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন—

কৃষ্ণপক্ষ ভাদ্রমাসি উপনিত হৈল আসি।
অষ্টমি জে তিথি তাহে হয় ।।
নক্ষত্র রোহিনী জুক্তা রজনি ঘোর সবিতা
মেঘে হয় মন্দ মন্দ বিষ্টি ।।
জামিনি সেসে অতি ঘোর বলাহক ডাকে ঘোর
অন্ধকারে নাহি চলে দৃষ্টি
শুভক্ষণ জোগ দেখে প্রসাধনে সসিমুখি
ভুমিষ্ট হইল ভগবান।
মলয় পবন বায় গন্ধর্ব্বে তে নাচে গায়
পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ ।।

এরপর বসুদেবের শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যমুনা পার হওয়ার প্রসঙ্গটি কবি জনপ্রিয় ভবিষ্য-পুরাণ অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

এর পরের কাহিনী বসুদেব কর্তৃক যশোদার কন্যাকে আনয়ন, কংসের সেই শিশু কন্যাকে হত্যার জন্য নিক্ষেপ ও শিশুর অষ্টভুজা মূর্তি ধারণ করে অন্তর্ধান ও কংসের প্রতি সাবধান বাণী। পরের কাহিনী নন্দোৎসব, নন্দের মথুরা যাত্রা, নন্দ-বসুদেব সংলাপ এবং পুতনাবধ। পুতনাবধ প্রসঙ্গের পর কবির ভণিতা রয়েছে—

নন্দ বলে নিসাচরি নৃপতির চর।
ভাগ্যে মোর পুত্র রক্ষা করিল ঈশ্বর ॥
সাবধান হয়া থাক পুত্রের কল্যাণে।
ভাগবতামৃত ভট্ট বিশ্বনাথ ভণে ॥

এর পরের কাহিনী শকটভঞ্জন। শকটভঞ্জনের পর তৃণাবর্তবধ, গর্গের নামকরণ, গোপীদের গৃহে গৃহে নিত্য খেলা, গোপনারীদের যশোদা সমীপে গোহারী, উদূখলে বন্ধন, জমালর্জুন ভঙ্গ, রিষ্টি দূরীকরণের জন্য গর্গের শান্তি-যজ্ঞ, মৃত্তিকা-ভক্ষণ, কৃষ্ণের মুখ-গহ্বরে যশোদার ব্রহ্মাণ্ড দর্শন প্রভৃতি ভাগবতের কাহিনী। এরপর কবি গেড়ুং-খেলার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। গেড়ুং-খেলার সময় রাধার বস্ত্রের মধ্য থেকে কৃষ্ণ মায়া করে গেড়ুং বার করে রাধাকে যশোদার সামনে অপদস্থ করেছেন।

এই কাহিনী ভাগবত বহির্ভূত সম্পূর্ণ লৌকিক কাহিনী। তবে কবির কাব্যে ভাগবত অংশের বর্ণনার ঝোঁক বেশি। এটি অবশ্য বেশীর ভাগ ভাগবত-অনুবাদকেরই বৈশিষ্ট্য। তবে গেড়ুংখেলার কাহিনী সম্পূর্ণ লৌকিক। এইসব কৃষ্ণমঙ্গলের কাহিনী প্রমাণ করে, চৈতন্যোত্তর কালেও অদীক্ষিত গৌড়ীয় দার্শনিকতার বহির্ভূত এক বিশাল জনগোষ্ঠী ছিল। এঁরা আবার শক্তিমান, ঐশ্বর্যশালী দেবতার প্রতিই সহজে আসক্ত হতেন। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রীমতী না শোনার অপরাধেই তাঁকে অপমানিত হতে হল। কৃষ্ণ বললেন—

তার প্রতিফল তুমি পাইলে হাতে হাতে।
অধোমুখ হয়া আর কিবা ভাব চিত্তে ॥

এর পরের কাহিনী কণ্বমুনির পালা। একই কালে যশোদাগৃহে এবং গোপী গৃহে লীলা। কৃষ্ণের ভাগবত-বহির্ভূত একটি কাহিনী এখানে দেখা যাচ্ছে। কাহিনীটি হল, একদিন কৃষ্ণ রাধার শয়ন কক্ষে উপস্থিত হলেন। প্রথমে রাধার ঈষৎ আপত্তি থাকলেও পরে দুজনের মিলন হল। এই অবস্থায় জটিলা দুজনকে দেখল। আয়ানের মা খুব বকাবকি করে বাইর থেকে দরজা বন্ধ করে আনলেন। এরপর সে নন্দরাণীর কাছে দৌড়ালো হাতে নাতে চোর ধরিয়ে দিতে। কিন্তু সহজে কথাটা বলা যায় না। তাই জটিলা ছল ফেঁদে বলল—

আশ্চর্য দেখিলাম এক আমার গৃহেতে।
মার্জারের কোলে শুয়্যা মুসা আছে সুখি।

রাণীও জটিলার কথায় এই আশ্চর্য ঘটনাটি দেখতে চল্লেন। এদিকে অন্তর্যামী কৃষ্ণ সমস্ত ঘটনাটি মনে মনে জেনে স্থির করলেন—

জান্বসি ভাবনা জার অবস লভিব।
মুসা হব রাই আমি মাঞ্জার হইব ॥

স্বার খুলে দেখা গেল, কৃষ্ণের ইচ্ছামতই ঘটনা ঘটেছে। ফলে জটিলা 'বিস্ময় মানে হাসে নন্দ জায়া'। গোবিন্দের মায়া বোঝানোর এই লৌকিক চেষ্টাও কিন্তু জনরুচিকে পরিতৃপ্ত করার প্রবণতা থেকেই জন্মেছে। কলঙ্কভঞ্জন কাহিনীও সম্পূর্ণ লৌকিক কাহিনী। তবে এর পরবর্তী কাহিনীগুলি, যেমন—ফলবিক্রেত্রীর কাহিনী, বাৎসাসুর বধ; প্রলম্ব বধ, ধেনুকাসুর বধ, গোপিগণের কাত্যায়নী পূজা, বস্ত্রহরণ, ব্রাহ্মণের যজ্ঞে রাখালদের অন্নপ্রার্থনা, মুনি পত্নীদের অন্নদান ও কৃষ্ণদর্শন, বকাসুর বধ প্রভৃতি কাহিনী ভাগবতের।

এর মধ্যে পুঁথির ৫৫ পৃষ্ঠা নেই। ৫৬ পৃষ্ঠা থেকেই আবার দানলীলার কাহিনী শুরু হয়েছে। নৌকালীলার কাহিনী খুব জাঁকালো করে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর অঘাসুর বধ, ব্রহ্মার গোবৎস হরণ ও পরে কৃষ্ণের স্তব। ভণিতায় কখনো কখনো কড়া রংএর ভক্তির সুরও শোনা যায়। এরপর দীর্ঘ রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার বর্ণনা ও দীর্ঘ রাসের প্রসঙ্গ বর্ণনান্তে অক্রূরাগমন, কৃষ্ণের মথুরায় যাত্রা ও কংসবধের ফলে কংস পত্নীদের শোক প্রকাশে কাব্যে শেষ হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমগ্র কৃষ্ণলীলা অবলম্বন করে যেমন কাব্য রচিত হয়েছে, তেমনি কৃষ্ণলীলার নানা অংশকে অবলম্বন করে অজস্র পালাও রচিত হয়েছে। এই পালাগুলির কিছু কিছু পরিচয় আগেই দিয়েছি। সম্ভবতঃ পালা রচনাই এই শতাব্দীর অন্যতম প্রবণতা। বিভিন্ন পুঁথিশালায় রক্ষিত পুঁথির তালিকা দৃষ্টে আমাদের এ ধারণা দৃঢ় হয়।

এই শতাব্দীতে রচিত পালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কৃষ্ণ জন্ম বা জন্মাষ্টমী পালা। এই পালার বহু কবি। যেমন, গোপীনাথ দত্ত, (শ্রী. সা. ৩৪১), জয়ানন্দ দাস (সা. চি, ৪০১), দীননাথ (সা., ৯১৮), প্রসাদ দাস (বি. ১০১০, ১০১১), দ্বিজ বৃন্দাবন (সা. ২৪১১), রাধা দাস (বি. ১০৬০, সা. ২৪২১), রাধাগোবিন্দ (শি. ন. ২০০), রামেশ্বর দাস (সা. ১২৯১, ১২৯২), দেবনাথ দ্বিজ (কোচ. ৫), দামোদর দাস (বিশ্ব. ২৫১৮), পরাণ দাস (বি. ৩৪৭৫), প্রভুরাম পণ্ডিত (বি. ৬১০৪), মধুসূদন (বি. ৩৫৫০), মাধবানন্দ কবিরত্ন (ব. সা. ৫৭৮), রঘুনাথ (বিশ্ব, ২৩৫৫), রামকান্ত (সা. ২৬৮৯), রামজয় ভট্টাচার্য (বি. ২৬৮৭), শম্ভুরাম (বি, ৬১০৪), শিবরাম (বিশ্ব. ৪৫৪১)।

শুক-পরীক্ষিৎ সংবাদের পুঁথি পাওয়া গেছে হরিচরণের নামে (সা. প. প. ১৩০৪। ৪র্থ)। নারদ সংবাদের পুঁথি পাওয়া যায় অঘোর দেবশর্মার নামে। এ ছাড়া এ পালার কবি হলেন গোবিন্দ দাস (বি. ৪০৬৪), বাণীকণ্ঠ (বি. ২৪০১), বৃন্দাবন দাস (বি. ৩৩৯৩, মিত্র. ১৬৭)। নন্দোৎসব পালার কবি গিরিধর দাস সপ্তদশ শতাব্দীর কবি হলেও হতে পারেন। কারণ পুঁথিতে ১০৪৩ সালের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া বহু অজ্ঞাতনামা কবির এই পালাটি পাওয়া গেছে (যেমন—পাঠ. ২৮২৫। ৪৩, বিশ্ব. ৫৪৫৮)।

কানাই বন্ধন খালাস পালারও একাধিক অজ্ঞাতনামা কবির পুঁথি পাওয়া যায় (প্রা-পু. ১৮৩, বরেন্দ্র. আ—৩২১ ; সা. প. প. ১৩০৮। ১ম, ৫ম)। দধিখণ্ড বা দধি-

মন্থন পালার কবি বৃন্দাবন দাস (বি. ২৬৩৪, সা. প. প. ১৩০৫ । ১ম । ৯)। তালভক্ষণ পালার কবি নন্দরাম ঘোষ (বি, ১০২৭)। গোষ্ঠলীলা পালার কবি বলরাম (বি. ৩৫৫১) ও যদুনাথ দাস (বিশ্ব ৩৭৫৭)। গোপীগোষ্ঠের কবি রসিকনন্দন (রং, সা. প. ১৩১৪। ১ম, ২২)। গোপীকামোহন পালার কবি বৃন্দাবন দাস (সা. ২৫৩১)। সুবল সংবাদের কবি গোবিন্দ দাস (মে. সা. ১৭০, ১১০, ৫৩), জয়কৃষ্ণ দাস (ঢা. বি. ২১৫১ ঘ) ও যদুনাথ দাস (বিশ্ব. ৩৮০৮)। গৌর কুণ্ডু (বি. ৬২৪২), জগমোহন-(বিশ্ব. ৪৩২৩), তনুরাম ভট্ট (প্রা. পু. ২২৯), প্রাণ দাস (মিত্র. ৮৩) ও রুদ্র দাস (ঢা. বি. ১৭৯৮) প্রমুখ কবিগণ বস্ত্রহরণ পালার রচয়িতা। রাসলীলার কবি সংখ্যায় বহু। এঁদের মধ্যে বৃন্দাবন দাস (বি. ২৬৫৮), কমলাকান্ত দাস (বিশ্ব. ৪০৪৭), কৃষ্ণচন্দ্র দাস (মে. সা. ১৪৩), গদাধর দাস (এ. ৪৮৬৭), জগন্নাথ দাস (সা. ২৭৩২), দর্পনারায়ণ দেবশর্মা (বিষ্ণু. ৮৩৩), শচীন নন্দন (বি. ১০১২), হরেকৃষ্ণ দাস (বিশ্ব. ২৯৭), লোচন দাস (বিশ্ব. ৮৬২) প্রভৃতি কবির নাম পাওয়া যায়।

মানভঞ্জনও জনপ্রিয় পালা ছিল। এ পালার বহু পুথির উল্লেখ পাওয়া যায়। কবিরা হলেন কালীকৃষ্ণ দাস (সা. ২৭২৭), গোবিন্দ দাস (ঢা. কৃ. ৪১৪), চম্পতি পতি (সা. ১২৬৪), জয়দেব (রং ১০৫জ), পঞ্চানন দ্বিজ (সা. ১২৭৫), প্রেম-নারায়ণ রায় (দৌ. হি. ১৪), হরিচরণ দাস ঘোষ (বিষ্ণু ৭৯৭), মাধব দ্বিজ (ব. সা. ২৭৩) প্রভৃতি।

এর আগে কবিচন্দ্রের ভাগবতামৃত আলোচনা প্রসঙ্গে রাধিকামঙ্গল বা কলঙ্ক উদ্ধারের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। কাশীশ্বর দেবশর্মা (মোক্ষদা. ৪২৬), কৃষ্ণদাস (বিশ্ব. ৩৫৩, ১৩, ৩৭৬), বৃন্দাবন দাস (বি. ৩৬০০), মাধবানন্দ (বি. ৬১৬০), রামকৃষ্ণ (মোক্ষদা, ৪২৮), কাশীরাম দাস (বিষ্ণু ৪৫৮), কৃত্তিবাস (?) (বি. ৫৭৩৮) গোবিন্দ দাস (র. কু. ১৩০৫), গোলক চাঁদ (সা. প. প. ১৩০৮। ১ম, ৩), চণ্ডী-দাস (প্রা. পু. ৭৬), জগন্নাথ দাস (শ্রী. সা. ১৬৮), জয়লোচন দে (ময় প্রদ. ১৩৩), দুর্গা প্রসাদ (বিশ্ব. ৫৬৯৪), নরোত্তম (বরেন্দ্র. আ. ১০৭), বৃন্দাবন দাস (শ্রী, সা. ১৪), মদন চাঁদ (সা. প. প. ১৩০৮। ১ম, ৩), মাধব দ্বিজ (বরেন্দ্র, আ. ১০৭), মুকুন্দ দাস (কোচ, ৩৯), যদুনন্দন দাস, (বি. ১০৩৯), যদুবন্ধু দাস (ক. পু. ৩৫), যাদবিন্দু দাস (ময়. প্রদ. ১৩৩), যাদবেন্দ্র দাস (সি. ন. ১১২), রামচন্দ্র (বরেন্দ্র. আ. ৩১৬), লোচন দাস (রা. কু. ৭৭৪) প্রভৃতি অসংখ্য কবি এই পালা রচনায় উৎসাহ দেখিয়েছেন। কবির ও পুঁথির সংখ্যা দেখে মনে হয় কলঙ্ক উদ্ধারের কাহিনী কৃষ্ণলীলার অন্যান্য কাহিনীর তুলনায় এই শতাব্দীতে জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থানীয় ছিল।

তুলসী মাহাত্ম্য নিয়েও লেখা বহু পুথি পাওয়া যায়। তবে দ্বিজ ভগীরথই এ পালার সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি ছিলেন বলে মনে হয়। কারণ ভগীরথের পুথিই সংখ্যায় অধিক। অন্যান্য কবি হলেন, শেখর দাস (বি. ৬৮২৬), বৃন্দাবন দাস (বিশ্ব. ২৫৩০), বলরাম দাস (বি. ৬৮২৬), দুর্গাদাস দত্ত (বি. ৩৪৬৫), গোবিন্দ দ্বিজ (সা. প. প. ১৩০৮। ১ম, ৩) প্রভৃতি।

গোবিন্দ দ্বিজ (সা. চি· ১৯৪), চন্দ্র শেখর (বি. ২১৪২), পঞ্চানন দাস (বি· ৪৩৪১) মাধব দ্বিজ (বি. ৯৮১), রাধাদাস (সা. ২৪২০), হরেকৃষ্ণ (বি· ৫৫৯১) প্রভৃতি কবিগণ রচনা করেছিলেন অক্রুর সংবাদ। রাধার বারমাসী লিখেছিলেন মাধব কবি (প্র· পু. ৩২২), রামশরণ সেন (প্রা. পু. ৬২), শ্রীধর বণিক (ঢা. সা. ৬০) রামতনু (প্রা. পু. ১৫৬)। একজন মুসলমান কবির নামেও রাধার বারমাসী পাওয়া যায়। কবির নাম হাসিম (প্রা· পু. ৩১৮)। রাধার চৌতিশা লিখেছিলেন দেবীদাস (প্রা. পু. ৪৪৫, সা. প. প. ১৩০৭ । ৩য়, ১২) বলরাম দাস (বরেন্দ্র. আ. ৩৭), মুক্তারাম দাস (প্রা. পু. ১৯), মদন দাস (প্রা. পু. ৪৭০), রামশরণ (প্রা. পু. ১৮৯) প্রভৃতি। এ ছাড়া রাধিকার জন্মলীলা নিয়ে লিখেছিলেন কয়েকজন কবি। কবিরা হলেন উদ্ধবানন্দ (বি. ২৫৪৮, ৪৭০০), জনার্দন দ্বিজ (সা. ৮৬৫), বৈষ্ণব নন্দন দাস (বি. ৩৯২৪)। 'রাধিকাজন্মরহস্য' লিখেছিলেন কৃষ্ণ মল্লিক (বিষ্ণু ১১৩), রাধিকার দশদশা নিয়েও কয়েকটা পুথি পাওয়া গেছে (বিষ্ণু ৭৯২, ৭৩৯, বি· ১৬৭৩, ঢা· কৃ. ৫১৪৬)।

শ্রীকৃষ্ণ চৌতিশার দুজন কবি হলেন গোপীবল্লভ দাস (বি. ৫৩৭২) ও ভবানন্দ (সা. প. প. ১৩০৭ । ৩য়, ১৮)।

উদ্ধবসংবাদের কবিরা হলেন চন্দ্রমণি দ্বিজ (বিশ্ব. ৩৬৬০, ৪৬০৬), তনুরাম দাস (রা· কু. ১১০৮), নরসিংহ দাস (সা. ৩০৬), পঞ্চানন (বি. ৪৬৫৫), বৃন্দাবন দাস (সা. ২৩৯১), মাধব দাস (বিশ্ব. ৫৬৬৬), মুক্তারাম দাস (প্রা· পু· ৫৮১), শিবরাম (সা. ৯৫৫), কিশোর দাস (এ· ৪৯৪৮) ও বলরাম দাস (বিশ্ব· ১৪৬৩, ২৩৫০) প্রভৃতি।

ভবানন্দ সেন রচনা করেছিলেন ঘুঘুচরিত্র (বি. ১০২১, সা· প· প. ১৩০৬ । ১ম । ২৫২)।

দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের পালাও অন্যতম জনপ্রিয় পালা ছিল। দান ও নৌকাণ্ডের কবি হলেন ভবানী দাস (ঢা. কৃ. ২০৮, ৪৬১ ক), দানকেলিকৌমুদীর অনুবাদক (ক. স. ১১, খণ্ড, ৪৯), জীবন চক্রবর্তী (সা. চি. ৩৮৭), মাধব দ্বিজ (সা· প· প· ১৩০৬।৩য়, ২৫) নন্দরাম দাস (বি. ২৮৮৫), যদুনাথ (বি.২৮৮৫), জগন্নাথ দাস (বিশ্ব ২০৩, ৪৩৯০), জীবন (বি. ১০৩৩), বৃন্দেশ (সা. ১২৫৯), ভবানী দাস (ক. পু. ৩২৩), রামপ্রসাদ দ্বিজ (পল্লী, ৩৩), হরিধন দাস (সা. চি· ৩৯৭), হরিবোল দাস (বি. ১০১৩), নরসিংহ দাস (মোক্ষদা. ২৯৯) প্রভৃতি।

রুক্মিণীহরণ কাহিনী নিয়ে পালা লিখেছিলেন রামেশ্বর (মে· সা. ২৯) ও রূপরাম দাস (রা. কৃ. ৫১৬) প্রভৃতি কবি।

পারিজাত হরণ কৃষ্ণের দ্বারকালীলার একটি· জনপ্রিয় কাহিনী। এটিকে নিয়েও কিছু পালা রচিত হয়েছে। রচয়িতাদের মধ্যে আছেন কবি সারণ (বি.২২১৬), পঞ্চুরাম (শ্রী· সা. ৪৪৭), পুরুষোত্তম দাস (শ্রী. সা. ৪১৫), ভবানী নাথ (ঢা. কৃ· ৮৭৪), রসিক শেখর (মিত্র· ৭০), রূপ নারায়ণ (ঢা. কৃ. ৫১৩ছ) প্রভৃতি।

মণিহরণ পালার কবি হলেন কমলাকান্ত (সা· প. প· ১৩১৩।৩য়, ১), ঘনশ্যাম

দাস (সা. ১২৬৬). জগন্নাথ (বি. ৬১২৬), শিব শিরোমণি (এ, ৪৯৭৫) প্রভৃতি।

সুদামার দারিদ্র্যভঞ্জন নিয়ে পালা রচনা করেছেন অকিঞ্চন দাস (প্রা. পু. ৩০০), কিশোর দাস (রং ৯ ঘ), কিষণ দাস (বিশ্ব. ২৯৯৩), গদাধর দাস (সা. ৯১৬), পুরুষোত্তম দ্বিজ (বি. ৭৬২) ভগীরথ (বিশ্ব ৩৭৫৮), মহাদেব বিপ্র (রং ৩১ফ), রাধাকৃষ্ণ দাস (বরেন্দ্র. সা ১০৫৫), রাম দ্বিজ (সা. ১২৮৫), রামশরণ (বি, ৩৮২৪), রামেশ্বর দেব (বরেন্দ্র. শ. ১০৫৪) প্রভৃতি কবিগণ।

এ ছাড়া শিবায়নের কবি রামেশ্বর তাঁর কাব্যের মধ্যেই রুক্মিণীহরণ পালা রচনা করেছেন (মে. সা. ২৯, ১৯৩)। রূপরাম দাসও রুক্মিণীহরণ পালা রচনা করেছেন। (রা. কু. ৫১৬, ৬২৮)।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণলীলার টুকরো টুকরো অংশকে অবলম্বন করে রচিত বিপুল সংখ্যক এই পালাগুলিই প্রমাণ করে দেয়, শুধু বিশেষভাবে দীক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে নয়, কৃষ্ণকথা সর্বব্যাপ্ত হয়েছিল ও চিত্তবিনোদনের উপায় হিসেবে গৃহীত হয়েছিল আপমর জনসাধারণের মধ্যেই।

উল্লেখ পঞ্জী

১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ; বৈষ্ণব পদাবলী হতে পুনরুদ্ধৃত, পৃ. ৮৪৯
২. শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ; জন্মখণ্ড
৩. গীতচন্দ্রোদয় ; পৃ. ১১৫-১১৬ ; হরিদাস দাস সংস্করণ
৪. উজ্জ্বলনীলমণি ; শৃঙ্গারভেদ প্রকরণম্ ; শ্লোক সংখ্যা-৪৬
৫. গীতচন্দ্রোদয় ; পৃ. ১২২-১২৩ ; হরিদাস দাস সংস্করণ
৬. বিদগ্ধমাধব ; ২য় অংক ; শ্লোক-৫৯
৭. পাঁচশত বৎসরের পদাবলী ; বিমান বিহারী পদসংখ্যা-২৭৭
৮. মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সংকলিত' ভাগবতামৃত 'গোবিন্দমঙ্গলের' দাতা কর্ণ পালাতেও এই ভণিতা পাওয়া যায়—
অনুমতি পেয়ে কর্ণ হাসে খল খল
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় গোবিন্দমঙ্গল।
৯. সা. প. প., ১৩০৪।৪র্থ।২০
১০. সা. প. প., ১৩৮৬।১।পৃ. ১১-১৮
১১. সাহিত্য পরিষদ ; পুথি সংখ্যা-২৪৭
ভণিতা-ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র গাঅ।
এতদূরে রাধার মঙ্গল হৈল সাঅ॥
১২. সাহিত্য পরিষদ ; পুথি সংখ্যা-২৪৭
১৩. ভাগবতামৃত ; শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল ; পৃ.-৩ ; শ্রী মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত ও প্রকাশিত ; ১ম সংস্করণ ; ১৩৪১ সাল। এই আলোচনায় ভাগবতামৃতের সমস্ত উদ্ধৃতি এই গ্রন্থটি থেকেই গৃহীত হয়েছে।
১৪. ভাগবত ; ১০।৫।১৭
১৫. তদেব ; ১০।১১।৩৯
১৬. তদেব ; ১০।১৮।১৪
১৭. তদেব ; ১০।১৪।৬১
১৮, তদেব ; ১০।১৮।১৪
১৯. তদেব ১০।১৮।১৫
২০. তদেব ; ১০।১৮।১৫
২১. তদেব ; ১০।১১।১০-১১
২২. নারদপুরাণ ; উত্তরার্ধ ; ৩২৪
২৩. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ; ৪।১২।৩-২২
২৪. পদ্মপুরাণ ; উত্তর খণ্ড ৯৪ অধ্যায়
২৫. সা. প., পুথি-১২৬৯
২৬. 'হাতাই পণ্ডিত' নামটিও পাওয়া যায়।
২৭. বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ ; ১৯৭০ ; পৃ. ১১৯-১২৬৯
২৮. সাহিত্য পরিষদ ; পুথি-৩৫৯
২৯. সা. প. ; পুথি সংখ্যা-১২৯৩
৩০. পুথি পরিচয় ; পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত- ১।১৯৫ ; শ্রীকৃষ্ণলীলা

ব. সা. প. প. ।২, পৃ. ১৮৪-৮৫।১৩৪ পাতার পুথি
৩২. সা. প. ; পুথি সংখ্যা-১২৯১
৩৩. পুথি পরিচয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত-১।১৯৬ ; গোবিন্দ মঙ্গল।
৩৪. আবদুল করিম সম্পাদিত পুথি পরিচিতি, ২য় খণ্ড ; ৫৯১
৩৫. ক. বি., পুথি সংখ্যা-১০২৭
৩৬. সা. প., পুথি সংখ্যা-২৪১১
৩৭. সা. প. প., ১৩০৫, ১ম সংখ্যা
৩৮. বি. ৬২।১৮
৩৯. সা. ২৫।৩১
৪০ মোক্ষদা, ১৪২২
৪১. বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড অপরার্ধ, ১৯৭৫, পৃ. ৩৭৭
৪২. ক. বি. ; পুথি সংখ্যা-৬০৮২
৪৩. পুথি পরিচয় ; পঞ্চানন মণ্ডল ; (১ম খণ্ড ১১৯, পৃ. ২২২)
বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ; শিবরতন মিত্র সংকলিত ; ২য় খণ্ড ; ১ম-সংখ্যা ; পুথি সংখ্যা-৭০
৪৫. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ; সুকুমার সেন ১ম খণ্ড ; অপরার্দ্ধ ; পৃ. ৪২৯
৪৬. ক. বি., ১০২২
৪৭. সা. প. প. ১৩০৩
৪৮. সা. প., পুথি সংখ্যা-২৫৮৭
৪৯. ক. বি., ১০০৫, বিশ্বভারতী, ৩৫০৮, ৪৫৮১, ৪৬৯৬, ৫২১৬
৫০. সা. প. প. ১৩৮৭, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৪০
৫১. ব. সা. প., পুথি সংখ্যা-১৮৭
৫২. সা. প., পুথি সংখ্যা-৯১৮
৫৩. সা. প., পুথি সংখ্যা-চি-৪০১
৫৪. সা. প., পুথি-১২৭০
৫৫. সা. প. প., ১৩০৪; ৪র্থ সংখ্যা
৫৬. সা. প. প. ; ১৩০৪ ; ৪র্থ সংখ্যা ; ৮৩
৫৭. প্রা. পু., ১৫৩
৫৮. পুথি সংখ্যা-৮০৪১
৫৯. এশিয়াটিক সোসাইটি। জি. ৫৬৬৪
৬০. ক. বি., পুথি সংখ্যা-১০০৪
৬১. ক. বি. পুথি সংখ্যা-১০১৩
৬২. ক. বি. পু.-২৯৪২
৬৩. ক. বি. ; পুথি সংখ্যা-৫৫৯১
৬৪. ক. বি. ; ৬২৬০
৬৫. বরাহনগর পাঠবাড়ী-পু-২৩০২।১০
৬৬. এই প্রসঙ্গে যে সমস্ত পুথির উল্লেখ করা হল, তা অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়' (Vol. 1.) থেকে আহৃত। পুথিশালা নির্দেশক সংকেতগুলি তাঁরই বিশিষ্ট পদ্ধতির অনুসারী।

পরিশিষ্ট—ক

॥ তন্ত্র-প্রভাবিত কৃষ্ণকথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ॥

শক্তিসাধনা তথা তন্ত্রসাধনা ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য। খ্রীস্টীয় অষ্টম-নবম শতক থেকেই যে এটি প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ বিভিন্ন সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে পাওয়া যায়। মধ্যযুগ ও তার পরবর্তীকালে তান্ত্রিক শক্তি-উপাসনা পূর্ব-ভারতের উড়িষ্যা, বাংলা, মিথিলা ও কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল। আসামেও তান্ত্রিক উপাসনা বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। কামাখ্যার যোনিপীঠ ও সেখানকার কামাখ্যা দেবীর মন্দির সেই সত্যই প্রমাণ করে। 'কামাখ্যাতন্ত্র' নামের একটি তন্ত্র গ্রন্থও কামরূপে ব্যাপক শক্তি-উপাসনার প্রমাণ দেয়।

আর বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যেও শক্তি-ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল প্রাচীন কাল থেকেই। উড়িষ্যার জগন্নাথ মন্দিরের ভিতরে বিমলা ও অন্নপূর্ণা মন্দিরের উপস্থিতি সেই সত্যের ইংগিত দেয়। এ ছাড়া জগন্নাথের পূজার মধ্যেও কিছু কিছু তান্ত্রিক বিধির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মধ্যযুগে, শুধু মধ্যযুগেইবা বলি কেন, তার পরবর্তী সময়েও বাংলাদেশে ব্যাপক তান্ত্রিক শক্তি উপাসনার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেও বিষ্ণু এবং শিবের উপাসনাতে শাক্ত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিরূপে রাধার কল্পনা শাক্ত প্রভাবেরই নিদর্শন। আবার কিছু কিছু তন্ত্র গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব প্রতিপাদন করার চেষ্টা হয়েছে। যেমন—কুলার্ণবের অন্তর্ভুক্ত ঈশান-সংহিতায় চৈতন্যদেবকে দেবতা বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বিশ্বসার বা বিশ্ব সারোদ্ধার তন্ত্রের গূঢ়াবতার নামক খণ্ডে ৪৫৮৬ অব্দে চৈতন্যরূপে বিষ্ণুর অবতরণের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ঊর্ধাম্নায় সংহিতায় বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে বুদ্ধের জায়গায় চৈতন্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বসারতন্ত্রে নিত্যানন্দের জন্মবৃত্তান্ত পাচ্ছি।[১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলা দেশে এই তন্ত্রসাধনা সর্বাতিশয়ী প্রভাব বিস্তার করেছে। একদিকে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যেমন তন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তেমনি অন্যদিকে বৈষ্ণবধর্মের মধ্যেও তন্ত্রসাধনার তথা তান্ত্রিক উপাসনা পদ্ধতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই কারণে নানা দেব দেবীকে পূজা করার জন্যই শুধু তন্ত্র রচিত হয় নি, নানাবিধ বৈষ্ণবতন্ত্রও রচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্য যুগের একমাত্র নিদর্শন এবং রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও আমরা তন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করি। কাব্যের শেষ অংশ 'রাধা বিরহে' কৃষ্ণপ্রেম পাগলিনী রাধা কৃষ্ণের রতি প্রার্থনা করলে, কৃষ্ণ বলেছেন—

> আহোনিশি যোগ ধেআই।
> মন পবন গগনে রহাই ॥
> মূল কমলে কয়িলে মধুপান।
> এবেঁ পাইএ্যা আক্ষে ব্রহ্ম গেআন ॥[২]

অন্যত্রও কৃষ্ণ বলেছেন—'আহোনিশি করো মো যোগ ধেআন।'[৩] বৈষ্ণবদের উপাস্য কৃষ্ণের তন্ত্রমতে যোগ সাধনার এই চিত্রটি বাশুলি উপাসক বড়ু চণ্ডীদাসের কেবল

ব্যক্তিগত কল্পনা মনে করলে ভুল হবে। যুগের স্বাভাবিক প্রবণতাই এখানে কাজ করেছে। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যেও আমরা শাক্ত প্রভাব লক্ষ্য করি। অবশ্য এর মূলে কাজ করেছে ভাগবতের শাক্ত প্রভাব। ভাগবতে কৃষ্ণ স্যমন্তক মণি উদ্ধার করতে গিয়ে ফিরতে বিলম্ব করায় রুক্মিণী দেবকীকে চণ্ডীপূজা করতে বলেছেন। তবে ভাগবতের এই প্রসঙ্গটুকু ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে যোগ আর তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।[৪]

পরবর্তী কালের অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গলকাব্য সমূহেও তন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ, পরশুরাম রায়ের 'মাধবসঙ্গীতে' আমরা দেখি, কৃষ্ণ রাধাপ্রেম লাভ করার জন্য রাধার উপাসনা কিভাবে করতে হবে, ব্রহ্মার কাছে সেই উপদেশ প্রার্থনা করার সময় বলেছেন—

যোগ বলে কর তুমি সংসারের সৃষ্টি।
মন্ত্র উদ্ধার করু ভক্তিযোগে নিঞা দৃষ্টি॥
* * * *
আগমোক্ত তন্ত্রে যন্ত্রে করিয়া যোজনা।
ষট্‌চক্র সুধিম্না করাবে উপাসনা॥[৫]

অন্যদিকে ব্রহ্মাও রাধাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করার সময় বলেছেন—

প্রকৃতি পুরুষ যেই আধেয় আধার।
প্রণয় বিকার ভেদ এ দুই আকার॥
প্রেমার কারণে দোঁহে দুই দেহ ধরে।[৬]

এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যেও আমরা তন্ত্রের ও সহজ সাধনার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করি।

রাধার প্রেমলাভ করার জন্য কৃষ্ণের এই সাধনার আরও বিস্তৃত রূপ আমরা দেখতে পাই 'রাধাতন্ত্র' নামক গ্রন্থে। শাক্তরা বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, লোপামুদ্রা, রামলক্ষ্মণ এমনকি বুদ্ধদেবকেও পর্যন্ত শক্তির উপাসক বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এঁদের শক্তি প্রতিপন্ন করার জন্য কোন গ্রন্থ রচিত হয় নি। প্রাসঙ্গিক ভাবে তাঁরা যে শাক্ত, সেই উল্লেখ অথবা তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে মাত্র। কিন্তু রাধাতন্ত্রে শক্তির উপাসক রূপে কৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে দেখা যায়। এই গ্রন্থে রাধা আর কৃষ্ণের একত্র উপাসনার কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাধার সঙ্গে মিলনেই যে কৃষ্ণের জীবনে সিদ্ধি লাভ, সে কথাও এই গ্রন্থে বলা হয়েছে। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ প্রেম-কথা এই কাব্যে সম্পূর্ণভাবে তন্ত্রের আধারে স্থাপিত হয়েছে।

'রাধাতন্ত্রের রচনাকাল খুব একটা প্রাচীন নয়। এর ভাব আর ভাষাও আধুনিক। গ্রন্থটি বাংলাদেশেই রচিত ও প্রচলিত বলে মনে হয়। কারণ এর যে ক'টি সংস্করণ পাওয়া গেছে, সেগুলি সবই বাংলাদেশ থেকে পাওয়া। এই সংস্করণ গুলি হল *রসিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত সংস্করণ, সুলভতন্ত্র প্রকাশ নামক তন্ত্র সংগ্রহে* প্রকাশিত সংস্করণ (কলিকাতা, ১২৯৪ সন), কামিক্ষ্যানাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত সংস্করণ (প্রথম মুদ্রণ, কলিকাতা, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ কলিকাতা, ১৩৪১), কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন প্রকাশিত সংস্করণ (কলিকাতা, ১৩১৩), সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

প্রকাশিত সংস্করণ (কলিকাতা, ১৩২৪)। এ ছাড়া এই গ্রন্থের হাতে লেখা পুঁথির বেশীর ভাগই বাংলা অক্ষরে লেখা এবং বাংলা দেশেই পাওয়া গেছে।[৮] উত্তর-পশ্চিম ভারতেও এই পুঁথির কয়েকটি পাওয়া গেছে বলে শোনা যায়, কিন্তু সেগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় নি।[৯]

এই গ্রন্থটি কবে রচিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত ভাবে কিছু জানার উপায় নেই। তবে নানাবিধ প্রমাণ থেকে কিছুটা অনুমান করা চলে। রাজকিশোরের রচিত শক্তি রত্নাকর নামক গ্রন্থে রাধাতন্ত্র থেকে বেশ কয়েকবার প্রমাণ উদ্ধৃত করা হয়েছে। তবে এই গ্রন্থটিরও তারিখ জানা যায় নি। ১৬৯৯ শকাব্দ বা ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রচিত শ্যামা সপর্যাবিধি গ্রন্থের উপক্রমে গ্রন্থ রচনার জন্য আলোচিত গ্রন্থগুলির যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে রাধাতন্ত্রের নাম পাওয়া যায়।[১০] এর থেকে এইটুকুই স্থির করা যায় যে, রাধাতন্ত্র ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্ববর্তী। তা ছাড়া এই দুটি গ্রন্থের উল্লেখ থেকে এটিও বোঝা যায় যে, রাধাতন্ত্র গ্রন্থটি তান্ত্রিক সমাজে মোটামুটি প্রচলিত ছিল। বৃহদ্‌রাধাতন্ত্র নামক গ্রন্থটিও[১১] প্রমাণ করে যে রাধাতন্ত্র মোটামুটি প্রসিদ্ধই ছিল।

এবার সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত এই গ্রন্থটির কথা অংশ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা এখানে কামিক্ষ্যানাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'রাধাতন্ত্রম্'-এর দ্বিতীয় সংস্করণটিকে (১৩৪১ সাল) আলোচনার জন্য গ্রহণ করছি।

দেবী পার্বতী মহাদেবের কাছে বাসুদেব রহস্য রাধাতন্ত্র শ্রবণ করতে চাইলে, তিনি দেবী পার্বতীর কাছে তা বর্ণনা করেন। একদা বাসুদেব মহাদেবের কাছে এসে বললেন—

মৃত্যুঞ্জয় মহাবাহো কিং করোমি জপং প্রভো
তন্মেবদ মহাভাগ বৃষধ্বজ নমোঽস্তু তে ॥[১২]

মহাদেব বাসুদেবকে ত্রিপুরসুন্দরী ভজনা করার উপদেশ দিলে, বাসুদেব কাশীপুরে গিয়ে তাঁর আরাধনা করতে লাগলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল সাধনা করেও তিনি সিদ্ধি-লাভ করতে পারলেন না। অবশেষে দেবী তাঁর কাছে আবির্ভূতা হয়ে বললেন— 'কুলাচারং বিনা পুত্র ন হি সিদ্ধিরপ্রজায়তে।'[১৩] কুলাচার ছাড়া মন্ত্র সিদ্ধি হয় না। তিনি আরও বললেন যে, তাঁর অংশ সম্ভূতা লক্ষ্মীদেবীকে ত্যাগ করে বাসুদেবের পূজা, তপস্যা এবং জপ সবই বৃথা। এই বলে দেবী তাঁকে সর্বসিদ্ধিদায়িনী কলাবতী মালা ধারণ করার জন্য দিলেন এবং বললেন 'মথুরায় আমার অংশভূতা পদ্মিনী রাধারূপে জন্মগ্রহণ করবেন। তুমি তার সঙ্গ কর।' তখন পদ্মিনীও আবির্ভূত হয়ে বাসুদেবকে শীঘ্র ব্রজে যেতে বললেন এবং তাঁর সঙ্গে কুলাচার অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি এও বললেল যে, কৃষ্ণের আগেই তিনি বৃকভানুর গৃহে জন্মাবেন। দেখা যাচ্ছে রাধাতন্ত্রে রাধা কৃষ্ণের বয়োজ্যেষ্ঠা। চৈত্র মাসের পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে যমুনা নদীর জলে পদ্মের মধ্যে উজ্জ্বল ডিম্বের আকারে পদ্মিনী আবির্ভূতা হলেন। মহাকালীর উপাসক বৃষভানু কাত্যায়নী দেবীর নিকট কাত্যায়নীর মত কন্যা প্রার্থনা করলে কাত্যায়নী তাঁকে সেই মনোহর ডিম্বটি প্রদান করলেন; বৃষ-

ভানু সেই ডিম্বটি তাঁর পত্নী কীর্ত্তিদার হাতে দিলে তা দ্বিখণ্ড হল এবং কীর্ত্তিদা তার মধ্যে পদ্মিনীকে দেখতে পেলেন। কীর্ত্তিদার অনুরোধে পদ্মিনী তাঁর অলোকসামান্য রূপ সম্বরণ করে সামান্য রূপ ধারণ করলেন এবং কীর্ত্তিদাকে সম্বোধন করে বললেন—'স্তনং দেহি স্তনং দেহি তব কন্যা ভবাম্যহম্' ।[১৪] কীর্ত্তিদা তাঁকে স্তন্য পান করালেন এবং কন্যা রক্তবিদ্যুতের প্রভা ধারণ করেন বলে বৃকভানু তাঁর নাম রাখলেন রাধা। এর পরের ভাদ্র মাসেই জন্মগ্রহণ করলেন কৃষ্ণ।

শিশুকাল থেকেই রাধা শক্তির উপাসনা আরম্ভ করলেন। রাধা তাঁর শরীর থেকে তাঁরই তুল্য আকৃতির আর একজন রাধা সৃষ্টি করেছিলেন। এই দ্বিতীয় রাধিকাই অভিমন্যু বা অভিমন্যুর স্ত্রী। এরপর কবি দীর্ঘ কয়েকটি পটলে বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শিব, বৃন্দাবনের মহিমা বর্ণনা করলে দেবী পার্বতী প্রশ্ন করলেন-

যদি বৃন্দাবনং দেব জরামরণ বর্জ্জিতং।
অদুঃখ শোকবিচ্ছেদমক্রোধং যদি শূলভৃৎ ॥[১৫]

তাহলে কেন পূতনা, বৃষাসুর, কেশী, শঙ্খাসুর প্রভৃতি দৈত্যেরা এখানে নিহত হল? এর উত্তরে শিব, বললেন 'হে প্রিয়ে! বৃন্দাবনে কামক্রোধাদির বিষয় যা পূর্বে জিজ্ঞাসা করেছ, তা কেবল মায়াময়ী প্রকৃতির কাজ। এ ছাড়াও মহাদেব বললেন যে, বৃন্দাবনের নদী কালিন্দী আসলে স্বয়ং কালিকা দেবী। কৃষ্ণের অনুগ্রহের জন্যই তিনি কুণ্ডলাকারে ব্রজধাম ব্যাপ্ত করে আছেন। এ ছাড়াও শিব বললেন—'কৃষ্ণস্য শ্যামদেহস্তু স্বয়ং কালী মহেশ্বরী' ।[১৬] অর্থাৎ কৃষ্ণের শরীরে প্রকৃতি রূপিণী মহেশ্বরী কালী বিরাজ করছেন বলেই তিনি শ্যামবর্ণ। রাধার সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী কাত্যায়নী তাঁকে বর দিয়ে বললেন যে, হেমন্তকালে পূর্ণিমা তিথিতে বাসুদেবের সঙ্গে রাধার মিলন হবে। রাধার সঙ্গ ছাড়া কৃষ্ণ কোন কাজই করতে পারবেন না। আর রাধার সঙ্গ লাভের ফলেই তাঁর কৈবল্য লাভ হবে।

এরপর তন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে কুলাচারের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। মথুরা ও বৃন্দাবন বা ব্রজমণ্ডলই তাঁর সাধনার উপযুক্ত স্থান। কারণ, বৃন্দাবন সতীর কেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং মথুরাও সহস্র পত্র কমলের আকার বিশিষ্ট শক্তিচক্রের ওপরে অবস্থিত। ব্রজভূমিতেও দেবী অনুক্ষণ অবস্থান করছেন, এখানকার তমাল বৃক্ষ স্বয়ং কালী এবং কদম্ব বৃক্ষ দেবী ত্রিপুরা। এরপর কৃষ্ণের আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন যে, কলিকালে ভারতবর্ষে কীর্তি প্রচারিত হবে এবং কৃষ্ণের গুণকীর্তনও প্রচলিত হবে।

এরপর দেবী পদ্মিনীকে অর্থাৎ রাধাকে বললেন, যদি কেউ মহাবিদ্যা ছাড়া রাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করে, তাহলে সেই সেই ব্যক্তিরা পদে পদে ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হয়। এখানে বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীদের ওপর শাক্ত নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এছাড়া এই গ্রন্থের মতে কৃষ্ণের কালীয়দমন, যমলার্জুন ভঞ্জন, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত বধ, বক ও কেশি দৈত্যবিনাশ, দাবানল পান প্রভৃতি সবই 'কালিকায়াং প্রসাদতঃ'[১৭]।

এরপর পার্বতী শিবের কাছে কৃষ্ণের দুই শক্তি রাধা ও চন্দ্রাবলীর কথা বিশেষভাবে

জানতে চেয়েছেন। দেখা যাচ্ছে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার প্রতি-নায়িকা চন্দ্রাবলীও এখানে কৃষ্ণের শক্তিতে পরিবর্তিত হয়েছেন। এর উত্তরে মহাদেব বললেন, ত্রিপুরার শরীর থেকেই রাধা ও চন্দ্রাবলী উভয়ের উদ্ভব। এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকজন সখীর নাম করা হয়েছে, যেমন—চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রাবতী, চন্দ্রকান্তি, চন্দ্রা, চন্দ্রকলা, চন্দ্রলেখা, চন্দ্রাঙ্কিতা, রোহিনী, ধনিষ্ঠা, বিশাখা, মাধবী, মালতী, গোপালী, রত্নরেখা, পারাখ্যা, সুভদ্রা, ভদ্ররেখা, সুমুখা, সুরতি, কলহংসীও কলাপী। এদের মধ্যে একমাত্র বিশাখা ছাড়া অন্য নামগুলি আমাদের অপরিচিত।

রাধাকৃষ্ণলীলার জনপ্রিয় নৌকাখণ্ডের ঘটনাও এখানে অভিনব ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং এর মধ্যেও শক্তিদেবতার পরিপূর্ণ মহিমা প্রকাশিত হয়েছে। নৌকালীলা ত্রয়োবিংশ পটল থেকে শুরু করে মোট ছয়টি পটলে বর্ণিত হয়েছে। এক রাত্রিতে কৃষ্ণ ও পদ্মিনী রাধা স্বপ্ন দেখলেন যে, কালিকা তাদের সামনে আবির্ভূতা হয়ে বলছেন—'বৎস, আমি তিন রাত্রি নৌকারূপে যমুনার মধ্যে অবস্থান করব। তুমি সেই নৌকায় রাধার সঙ্গে ক্রীড়া ও জপ করলে পরম সুখ লাভ করবে।' লক্ষণীয় বিষয়, আমাদের দেশে সব সময়েই নৌকাকে দেবীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণও এই স্বপ্নাদেশ পেয়ে যমুনা নদীতে গিয়ে, সেখানে অবস্থিত নৌকারূপিণী দেবীকে নমস্কার করলেন। পরে, তাতে আরোহণ করে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলেন। মন্ত্র জপ করে তিনি রাত্রি শেষে কালীরূপিণী বংশী বাজাতে লাগলেন। এই সময়ে দধিদুগ্ধ প্রভৃতি বিক্রয়ের ছলে রাধা সখীদের সঙ্গে যমুনাতীরে এসে উপস্থিত হল। নদী পার করে দেবার জন্য রাধা কৃষ্ণকে অনুরোধ করলে, কৃষ্ণ গোপীগণের কাছে রতি প্রার্থনা করলেন। এই নিয়ে রাধা ও কৃষ্ণ-উভয়ের মধ্যে বহু কথাকাটাকাটি হল। তারপর রাধা নিজের মহিমা প্রকাশ করার জন্য নিজের দেহে বিশ্বরূপ দর্শন করালেন। রাধা কর্তৃক এই বিশ্বরূপ দর্শন করানোর প্রসঙ্গটিও এর আগে কোথাও পাওয়া যায় নি। শুধু রাধার শ্রেষ্ঠত্ব নয়, শক্তি-উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানোর জন্যই এইভাবে রাধার বিশ্বরূপ দর্শন করানো হয়েছে। রাধা কৃষ্ণকে স্পষ্টই বলেছেন, কৃষ্ণকে তাঁর সাধারণ মানুষ বলে মনে হয়। কোন মানুষের সঙ্গে রাধার মিলন সম্ভবপর নয়। সুতরাং কৃষ্ণ যদি নিজেকে দেবতা বলে প্রতিপন্ন করতে পারেন, তাহলেই রাধার সঙ্গে তাঁর মিলন সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ তখন কালীকে স্মরণ করে নিজের রূপ ধারণ করলেন ও বললেন—

যঃ কৃষ্ণো বাসুদেবোহহং মহাবিষ্ণুরহংপ্রিয়ে
সঙ্গোপনার্থং চাব্বঙ্গি দ্বিভুজোহহং ন চান্যথা।
ত্বদর্থং হি মহেশানি তপস্তপং সুদারুণং ॥[১৮]

আমি মহাবিষ্ণু বাসুদেব, কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছি। হে সুন্দরি, লোকসঙ্গোপনার্থ দ্বিভুজ মূর্তি হয়ে তোমার সঙ্গ লাভের জন্যই এই দারুণ তপ করছি।

কৃষ্ণের এই রূপ দেখে রাধা খুবই সন্তুষ্ট হলেন। কার্তিকী পূর্ণিমার রাত্রে যমুনা নদীতে নৌকার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মিলন হল। কৃষ্ণ তন্ত্রের নিয়মানুসারে কুলাচারের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। রাত্রি শেষে পদ্মিনী অন্তর্হিত হলে কালী আবির্ভূত

হয়ে কৃষ্ণকে বললেন—'তুমি বহু চেষ্টায় আজ সিদ্ধিলাভ করলে। এখন তুমি অন্যান্য গোপীদের সঙ্গে যথেচ্ছ বিলাস কর।'

এরপর কৃষ্ণ যৌবন বয়সের উপযুক্ত বিলাস সহকারে ব্রজমণ্ডলে বিহার করতে লাগলেন। যমুনার তীরে রাধার জন্য বিলাপ করে তিনি বাঁশী বাজাতে লাগলেন। নব পল্লব ভূষিত যমুনার উপবনে, নিকুঞ্জে ও অশোকবনে কৃষ্ণ এইভাবে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তারপর কৃষ্ণ ব্রজলীলা সমাপন করে মথুরাতে কংস প্রভৃতি দৈত্যকে নিহত করে শক্তি স্বরূপিণী দ্বারাবতী পুরীতে গমন করলেন। কিছুদিন পর তিনি রুক্মিণী প্রভৃতি আটজনকে বিবাহ করলেন। ষোড়শ সহস্র অন্য রূপবতী নারী বিবাহ করলেও এঁরা হলেন তাঁর প্রধানা মহিষী, কুলসাধনার অষ্টপ্রকৃতি বা অষ্টনায়িকা। প্রত্যহ, দিনে ও রাত্রিতে রত্নমন্দিরে এই অষ্টপ্রকৃতির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ দেবীর আরাধনা করতে লাগলেন। পরমান্ন, পায়স প্রভৃতি বিবিধ ভোগ ও অষ্ট তণ্ডুল, দূর্বা প্রভৃতির সাহায্যে দেবীর পূজা করে তিনি দশাক্ষর মন্ত্র জপ করতেন। এইভাবে কৃষ্ণ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিতে সিদ্ধিলাভ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই তত্ত্ব না জেনে যদি কেউ তাঁর পূজা করে, তবে সে পূজা নিষ্ফল হয়। যে তন্ত্রে এই তত্ত্ব কীর্তিত হয়েছে, তাই-ই আসল শ্রীমদ্ভাগবত।

দেখা যাচ্ছে, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বলে অনুমিত এই গ্রন্থে কৃষ্ণকে যে শুধু কালিকার উপাসকরূপে দেখানো হয়েছে তা নয়, রাধা দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর অংশজাতা পদ্মিনী, শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি এবং সাধনসঙ্গিনী, তাও বলা হয়েছে। কথা অংশে কিছু লক্ষণীয় বৈচিত্র্যও পাওয়া যায়। যেমন—এখানে রাধা কীর্তিদার গর্ভজাতা কন্যা নন, তিনি ডিম্ব থেকে জন্ম গ্রহণ করেছেন। অবশ্য তপস্যা করে রাধাকে কন্যারূপে পাওয়ার প্রসঙ্গ রূপ গোস্বামীর 'ললিত মাধব' নাটকে রয়েছে। তবে সেখানে রাধাকে বলা হয়েছে বিন্ধ্যপর্বতের কন্যা। এ ছাড়া নৌকাখণ্ডের কাহিনীতেও দেবীর স্বয়ং নৌকারূপ ধারণ করার পরিকল্পনারও নতুনত্ব রয়েছে। প্রায় বিলীয়মান চৈতন্য প্রভাবের পটভূমিই রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথায় তন্ত্রের এই প্রবল উপস্থিতিকে অনিবার্য করে তুলেছিল, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

ঠিক এই কালপরিধিতেই অর্থাৎ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের বৈষ্ণবদের মধ্যে একটি বিশেষ সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, যার মধ্যে আমরা সাংখ্য দর্শন আশ্রিত, তান্ত্রিক ধর্ম ধারণা-নির্ভর পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। বৌদ্ধ সহজিয়াদের মত এঁরাও সহজ পন্থী ছিলেন, অর্থাৎ এঁদেরও চরম উদ্দেশ্য ছিল মহাভাবরূপ সহজ বস্তুকে লাভ করা। নিজেদের সহজিয়া মত প্রচার করার জন্য এঁরা বাংলায় অনেক গান এবং গদ্যে ও পদ্যে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তারও আগে গীত গোবিন্দে কবি জয়দেবও সহজিয়া সাধক ছিলেন বলে অনেকের অভিমত। পদ্মাবতী জয়দেবের সহজ সাধনার সঙ্গিনী প্রকৃতি ছিলেন। আবার কারও কারও মতে বাংলাদেশে কবি চণ্ডীদাসই বৈষ্ণব সহজিয়া মতের প্রথম সাধক ও প্রচারক। রামী নামের রজকিনী তাঁর সাধন সঙ্গিনী ছিলেন। কিন্তু এই চণ্ডীদাসকে চৈতন্য পূর্ববর্তী বলা হলেও এঁর

পদগুলি চৈতন্য পরবর্তীকালেরই শুধু নয়, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখা বলে মনে হয়। আসলে চৈতন্যদেবের সমুন্নত অধ্যাত্মিক চিন্তায় ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির স্বরূপ আবেগ নির্ভর হয়ে ওঠার জন্যই বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তি, রাগানুগা ভক্তিতে পরিণত হয়েছিল। আর সেই রাগানুগা ভক্তির পথ বেয়েই তান্ত্রিক আচার প্রবেশ করেছিল চৈতন্যদেবের ভক্তি ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এবং তার ফলশ্রুতিতেই চৈতন্যপরবর্তী সহজিয়ারা চণ্ডীদাসের নামকে যেমন গ্রহণ করেছে, তেমনি তাদের অনেক তত্ত্বগ্রন্থ ও গান বিদ্যাপতি, রূপ-গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরোত্তম, লোচন, চৈতন্য দাস প্রভৃতির নামে চালানোর চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশের এই বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ও বৌদ্ধ সহজিয়াদের মত বলেছে যে, প্রত্যেক নরনারীর দৈহিক রূপের মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাদের স্বরূপ বা সহজ রূপ। অর্থাৎ একজন মানুষ দৈহিক রূপে মানুষ হলেও তার স্বরূপ আসলে কৃষ্ণ, আর একটি নারী দৈহিকরূপে নারী হলেও তার স্বরূপ আসলে রাধা। সহজিয়াদের সাধনা নরনারীর এই রূপ ছেড়ে স্বরূপে অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ ভাবে ভাবিত হওয়ার সাধনা। এইভাবে রূপের মিলনে যখন স্বরূপের মিলন সংঘটিত হবে, তখনই আসবে অনাবিল সামরস্যের অনুভূতি। বৈষ্ণব সহজিয়ারা কামকেই প্রেমে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন, এই জন্য তাঁদের সাধনাকে বলা হয় আরোপ সাধনা ; রূপে স্বরূপের আরোপ অর্থাৎ নর-নারীতে রাধাকৃষ্ণের আরোপ। এই আরোপ সাধনার দ্বারা যখন স্বরূপে ধ্রুবা স্থিতি লাভ হয়, তখন মানবীর আকর্ষণে আর কাম থাকে না, তা প্রেমে পরিণত হয়।

এ পর্যন্ত কৃষ্ণ কথার যে ক্রম-বিকাশ আমরা লক্ষ্য করেছি, তার চরম বিকাশ বোধ হয় এখানেই। এতদিন যে কৃষ্ণকথা ছিল নিতান্তই দৈবী লীলা তা এবার একান্তভাবে মানুষেরই লীলায় পরিণত হল। এর আগে রাধাকৃষ্ণ লীলাকথার নানা বৈচিত্র্য ও তরঙ্গভঙ্গের চিত্রণে বৈষ্ণব কবিরা যে প্রাকৃত নর-নারীর বাস্তব প্রেমলীলার চিত্র থেকেও ধার করেছেন, তা আলোচনা প্রসঙ্গেই দেখিয়েছি। কিন্তু কোন বৈষ্ণব কবি অথবা সাধক এর আগে নরদেহধারী নিজের স্বরূপকে কৃষ্ণ এবং প্রেমিকাকে রাধা বলে অভিহিত করতে পারে নি। সুতরাং সহজিয়াদের সাধনাতেই 'রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা একান্ত ভাবে মর্ত্য-মৃত্তিকালগ্ন হয়ে উঠল।

এই সহজিয়া সাধনতত্ত্ব নিয়ে কিছু গ্রন্থও রচিত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি হল 'দুর্লভসার'। এটি লোচনদাসের রচনা। লোচনদাস ১৪৪৫ শকে বা ১৫২৩ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান জেলার কোগ্রামে, বৈদ্য পরিবারে জন্মান। এঁর পিতা মাতার নাম যথাক্রমে কামনা কর ও সদানন্দী। লোচনদাস সহজিয়া সাধক ছিলেন। তাই নিজের স্ত্রীকেও কেবলমাত্র সাধন সঙ্গিনীরূপে দেখতেন। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। লোচনদাস চৈতন্য দেবের জীবনী গ্রন্থ চৈতন্য মঙ্গল রচনা করেছিলেন। 'দুর্লভসার' ছাড়াও এঁর অন্যান্য বৈষ্ণবতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ হল 'চৈতন্য বিলাস', 'বস্তুতত্ত্বসার', 'আনন্দলতিকা' ইত্যাদি।

লোচন দাসের 'দুর্লভসার' গ্রন্থটি সহজিয়া সাধন গ্রন্থ। তবে সহজিয়া সাধনায়

প্রেমভক্তির স্বরূপকে ব্যাখ্যা করার জন্য কৃষ্ণলীলার নানা প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন কৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে মথুরা গিয়েছিলেন। সেখানে বসুদেব তাঁকে বললেন, কৃষ্ণ বলরাম কিছু-দিন মথুরায় থাকুক। একথা শুনে নন্দ অচেতন হয়ে পড়লেন, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে সমাধিস্থ নন্দের মনে হল—

প্রেমায় বিহ্বল কৃষ্ণ যেন আছে বুকে।
কৃষ্ণ কোলে করি যেন চুম্বু দিছে মুখে॥
ঐছন বাসয়ে নন্দ শোক নাহি আর।
আচম্বিতে পরিতোষ পাইল গোয়াল॥[১৯]

আবার অনুরূপভাবে নন্দ ফিরে এলে, কৃষ্ণকে ফিরতে না দেখে বৃন্দাবনে জননী যশোদা, অন্যান্য গোপ-গোপী এবং কৃষ্ণ প্রেমিকা গোপীরা সবাই শোকগ্রস্ত হলে, তারাও একই উপায়ে কৃষ্ণবিরহের যন্ত্রণা থকে উদ্ধার পেল—

সকল ইন্দ্রিয় ভেল কৃষ্ণ গুণে ভোর॥
*   *   *   *
সভার অন্তর ভেল কাছে আছে কৃষ্ণ।[২০]

প্রতিটি জীব স্বরূপে কৃষ্ণ। সহজিয়া সাধনার এই তত্ত্বটিই এখানে কাজ করেছে। এ ছাড়াও এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলারও সহজিয়া ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কুলিয়ায় ছ'কড়ি চট্ট এবং তাঁর পুত্র বংশীবদন চট্ট বৈষ্ণব-উপাসনায় তান্ত্রিক পূজার উপাদান ব্যবহার করেছিলেন। বংশীবদনেব পুত্র রামচন্দ্র গোস্বামী, যিনি রামাই নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি বাঘনাপাড়ার শ্রীপাটের প্রতিষ্ঠাতা। এঁর রচিত অনঙ্গমঞ্জরী-সম্পুটিকা দেখে মনে হয়, এঁরা পরম্পরাক্রমে তন্ত্রবিহিত পথে বৈষ্ণব উপাসনার ধারাকে বজায় রেখেছিলেন। বৃন্দাবনচন্দ্র দাসের ভজনচন্দ্রিকা থেকে ইনি নিজের গ্রন্থে বহু অংশ উদ্ধৃত করেছেন। এই ধারারই শিষ্য কবি অকিঞ্চন দাসও লিখেছেন বিবর্তবিলাস। তবে এই সম্প্রদায়কে কতটা সহজিয়া বা কতটা তান্ত্রিক বলা যায়, সে নিয়ে বিশদ গবেষণার অবকাশ আছে।

এই প্রসঙ্গে চৈতন্য পরবর্তী আরও কিছু সহজিয়া গ্রন্থের পরিচয়ও আমরা দিতে পারি। চৈতন্যদেব অপ্রকট হওয়ার পর শাক্ত প্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্ম এবং বৈষ্ণব ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্রয় নেওয়া সহজিয়া ধর্ম এক সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সৃষ্টি হল বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম। সিদ্ধ মুকুন্দদেব নামক একজন তন্ত্র সিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য এই সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দান করেছিলেন। তিনিই এই নতুন সহজিয়া ধর্মের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে সংস্কৃতে ছটি মুক্তাবলী রচনা করেন, এগুলির নাম মুকুন্দ মুক্তাবলী। এই ছটি মুক্তাবলীর নাম হল অমৃত রত্নাবলী, রাগ-রত্নাবলী, অমৃত রসাবলী, প্রেম রত্নাবলী, ভৃঙ্গ রত্নাবলী এবং লবঙ্গ চরিত্র মুক্তাবলী। এই সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুথিগুলির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। তবে বাংলা ভাষায় অমৃতরত্নাবলী ও অমৃতরসাবলী নামে দুটি পুথি পাওয়া যায়। এ দুটি ছাড়াও চৈতন্যোত্তর আর দুটি সহজিয়া পুথি হল আগমসার ও আনন্দ ভৈরব। এই পুথিগুলির মধ্যে তিনটিই মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত 'সহজিয়া সাহিত্যে' রয়েছে।

আমরা পরবর্তীকালে পরিতোষ দাস সম্পাদিত 'চৈতন্যোত্তর প্রথম চারিটি সহজিয়া পুথি গ্রন্থে সংকলিত পুথিগুলিকেই আদর্শ গ্রন্থ হিসেবে ধরে নিয়ে আলোচনা করছি।

'আগমসার' গ্রন্থটির লেখকের নাম 'যুগলের দাস'। এই পুথির রচনা কাল ১০৭৫ বঙ্গাব্দ। প্রথম মঙ্গলাচরণের পর বইটি আরম্ভ হয়েছে। একদিন পার্বতী কৈলাসে শিবকে বললেন—

রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব আজি কহিবে আমারে।
যদি দাসী হেন কৃপা থাকে মোর তরে।[২১]

উত্তরে শিব জানালেন যে, রাধাকৃষ্ণ উভয়ে আপাততভাবে পৃথক হলেও এক শরীর এবং এক আত্মা। স্বাভাবিকভাবেই এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, চৈতন্যচরিতামৃতের কথা—

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নিজ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥[২২]

অতএব দুজনকে পৃথক করে দেখলে রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্ব জানা যায় না। কৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম। তিনি নিত্যস্বরূপ, চিরকিশোররূপে ব্রজপুরে বিহার করেন। জ্যোতির্ময় নিরঞ্জন ব্রহ্ম তাঁর অংশের ছটা মাত্র। পার্বতী কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, নিরঞ্জন যদি পূর্ণ ব্রহ্ম না হন, তাহলে তাঁকে ব্রহ্ম বলা হয় কেন? এর উত্তরে শিব সৃষ্টি-প্রকরণ বর্ণনা করলেন। রাধাকৃষ্ণ দুজনে একদিন সৃষ্টির কারণে প্রেমরঙ্গে বসলে সেই সময়েই কৃষ্ণের তেজ থেকে নিরঞ্জন বা জ্যোতির্ময় আদিব্রহ্মের উদ্ভব হল। এরপর মহাবিষ্ণু, পঞ্চভূত ও সপ্তস্বর্গ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়েছে। প্রলয়কালে সব কৃষ্ণ তেজেই মিশে যায়। এবার পার্বতী শিবকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কৃষ্ণ যদি পূর্ণ ব্রহ্মই হন, তাহলে লোকে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে কেন? উত্তরে শিব বললেন—

মোর প্রভু ছাড়ি জেবা তোমা আমা পূজে।
কল্পকোটি সেই জন নরকেতে মজে॥[২৩]

এখানে মহাদেবের মুখ দিয়ে কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপূজার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে। এবার পার্বতী, পূর্ণব্রহ্ম কি ভাবে বিহার করেন, তা জানতে চাইলেন। উত্তরে শিব বললেন, অখণ্ড গোলোকে নিত্য বৃন্দাবন অবস্থিত। সেখানে দিবা-নিশার ভেদ নেই। ছয় রিপুর অবস্থানও নেই, সেখানে ছয় ঋতু একত্রে অবস্থান করে। ফলে চক্রবাক সুশোভিত মানস সরোবর সেখানে রয়েছে। শোক মোহ জরা মৃত্যু বিরহিত সেই স্থানে পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ কিশোর বয়সী সঙ্গিনীদের নিয়ে নানা কেলি করেন, এবং "তাঁর আহ্লাদিনী হয় রাধা ঠাকুরানী"।[২২] রাধাই আদ্যাশক্তি।

. এবার পার্বতী, অবতার হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে শিব গীতার উক্তির প্রতিধ্বনি করলেন,—সাধুর নিস্তার ও দুষ্টের বিনাশের জন্য বিষ্ণু অবতার হন। শিব এই প্রসঙ্গে নৃসিংহ, রাম এবং কৃষ্ণ অবতারের কথা বললেন। এরপর পার্বতী শিবকে মোক্ষম প্রশ্নটি করলেন—

আপনি কহিলা রাধা আদ্যা শকতি।
তবে কেনে রাধিকার হইল অন্যপতি ॥[২৫]

উত্তরে শিব বললেন, গোলোকে শত কোটি শক্তির সঙ্গে কৃষ্ণ বিহার করেন। তার মধ্যে প্রধান দুই শক্তি রাধিকা ও বিরজা। কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গেই সর্বদা বিহার করতেন, মাঝে মাঝে বিরজার-মন্দিরে যেতেন। একদিন কৃষ্ণকে রাধার সঙ্গে বিহাররত অবস্থায় দেখে বিরজার এক সখী সে কথা বিরজার কাছে বললে, তিনি অভিমানে দ্রবীভূত হয়ে নদীতে পরিণত হলে কৃষ্ণ তাঁকে উদ্ধার করলেন। এই কাহিনীটি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও আছে। এরপর কৃষ্ণ পরস্পরের এই হিংসার জন্য রাধা ও বিরজা—উভয়কেই অভিশাপ দিলেন যে, এরপর তাঁরা বৃন্দাবনে জন্ম নিয়ে সেখানে পরকীয়া হয়ে থাকবেন। এই পরকীয়া ভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই সহজিয়াদের বাহ্য ও মর্মসাধনার বিশিষ্ট অঙ্গ। এরপর কবি শিবের মুখ দিয়ে কৃষ্ণলীলা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। কাহিনীর শেষে দেখি, কৃষ্ণের আদেশে উদ্ধব রথে করে রাধাকে ব্রজপুরে নিয়ে এসেছেন, এবং সেখানে রাধারূপিণী লক্ষ্মী কৃষ্ণরূপী নারায়ণের শরীরে লীন হয়ে গেছেন। এই কাহিনী আমরা ভবানন্দের হরিবংশেও পেয়েছি।

পরে শিব চৈতন্য-অবতারের কারণ ও স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। কলির আরম্ভে দেবতাদের স্তুতি শুনে কৃষ্ণ রাধাকে বললেন—'চল যাই দুজনে করি অবতার'। কিন্তু রাধা রাজী হলেন না। কারণ তিনি কৃষ্ণের বিরহ সহ্য করতে পারবেন না তখন কৃষ্ণ বললেন—

তোমায় আমায় এক শরীর সে হইয়া।
অবতার হইব তোমার ভাব লইয়া ॥
বাহ্যে রাখিব তোমায় সদাই দেখিতে।
অন্তরে থাকিব আমি হইয়া গুপ্তেতে ॥
সদাই করিব তোমার বিরহ আস্বাদন।
তোমার বিরহ যত করিল গ্রহণ ॥[২৬]

এইভাবে কৃষ্ণলীলার সঙ্গে চৈতন্য-অবতার প্রসঙ্গ একেবারে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছে। কাহিনী শেষে বলে দিয়েছেন—'কৃষ্ণকথারসে সদা বিনাশে বিপদ'।[২৭]

আনন্দভৈরবের রচনাকাল ১২৩৯ বঙ্গাব্দ (১৮৩২ খ্রীস্টাব্দ), এটি রচনা করেছেন প্রেমদাস। এই গ্রন্থটি থেকেই জানা যায়, 'আগমসার' এর আগেই রচিত হয়েছিল—

পদ্মাবতী কহে প্রভু করি নিবেদন।
আগমসার গ্রন্থ কহ শুনিতে হয় মন ॥[২৮]

এতেও মঙ্গলাচরণ আছে। মঙ্গলাচণের পর পদ্মাবতী নামে এক মহিলা ও শ্রীকান্ত নামে এক ব্যক্তির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে। পদ্মাবতী শ্রীকান্তকে অনুরোধ করলেন, মঙ্গলাচরণের শ্লোকটি ব্যাখ্যা করতে। সেই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই যেন কাব্যটি শুরু হল। তিনি বললেন—'বাহ্যে নাহি কহা যায় মনের করণ'।[২৯] কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে তিনি তাঁর যুক্তির সারবত্তা প্রমাণ করেন। তিনি বলেন, ব্রহ্মার ঘাম থেকে

শক্তির উৎপত্তি। ব্রহ্ম ও শক্তির সংযোগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উদ্ভব। একদিন এক নদীর তীরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তপস্যায় নিযুক্ত হলে, ব্রহ্ম তাঁদের পরীক্ষা করার জন্য তাদের সামনে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকেন। ধ্যানভঙ্গের পর ব্রহ্মা এটি দেখে বিরক্ত হয়ে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, বিষ্ণু তিন অঞ্জলি জল দান করেন, কিন্তু শিব ধ্যানে সমস্ত কিছু জানতে পেরে ঐ শবটিকে আলিঙ্গন করেন। এতে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে শিবকে প্রকৃতিরূপিণী শক্তি দান করেন। মাতৃতুল্য শক্তিকে গ্রহণ করতে শিব ইতস্তত করলে ব্রহ্মা শিবকে বললেন, নিজের শক্তির এবং ব্রহ্মের যথার্থরূপ জানা নেই বলেই শিব এই ভাবে ইতস্তত করেছেন। ব্রহ্মের এই উক্তিতে শিব শক্তিকে গ্রহণ করলেন।

এবার শক্তি শিবকে রহস্যময় উপাসনার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে শিব বললেন, তিনি কাম বীজের আশ্রয় নিয়েছেন। এই কামবীজ হল কামরূপী কৃষ্ণ স্বয়ং। এরপর মহামায়া শিবকে জানুতে বসিয়ে শক্তিতত্ত্ব বর্ণনা করলেন। শিবের কুচনী-সম্ভোগ আসলে তাঁর সহজ বস্তু আস্বাদন, আর এই শক্তিরসতত্ত্ব শিব এবং শক্তি এই দুজনেই জানেন। তখন পদ্মাবতী প্রশ্ন করলেন, এই সহজতত্ত্ব আর কে জানে? উত্তরে শ্রীকান্ত বললেন, এই পৃথিবীতে চন্দ্রকোণা গ্রাম আছে। সেই গ্রামের চন্দ্রকেতু নামে এক রাজার কুমারের গুণে মুগ্ধ হয়ে পার্বতী তাঁকে অষ্টনায়িকা ভজনের উপায় বলে দেন। এ ছাড়া সহজপুর গ্রামের রাজা হরিনারায়ণের পুত্র ভৈরবকেও দেবী কালিকা এই সহজ উপাসনার উপায় বলে দেন। একটি রূপকের মাধ্যমে এই কাহিনী বিবৃত হয়েছে। দেবী কালিকা তাঁকে চন্দ্রকোণা গ্রামের অষ্টসখীর কাছে পাঠিয়ে দেন। সুলোচনা নাম্নী সখী ভৈরবের কাছে সেই তত্ত্ব বললে ভৈরব, দেশে ফিরে সেই প্রণালী অনুযায়ী ধর্মাচরণ করতে লাগলেন। মোটামুটি ভাবে আনন্দ-ভৈরবের কাহিনী-অংশ খুবই সামান্য। সম্পূর্ণই তন্ত্র নির্ভর সহজ সাধনার তত্ত্ব। তবে প্রথম অংশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের তপস্যার কাহিনী বৃহৎধর্ম পুরাণের মধ্যখণ্ডের সৃষ্টি প্রকরণ কাহিনীর সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত।

'অমৃতরত্নাবলী' গ্রন্থটি মুকুন্দ দাসের অনুবাদ। সিদ্ধ মুকুন্দ দেব গোস্বামী সংস্কৃত শ্লোকে যে ছয়টি মুক্তাবলী রচনা করেন, তাদের মধ্যে প্রথমটির নামই 'অমৃতরত্নাবলী'। এর মধ্যেও কথা অংশ কিছু নেই, তবে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় এই পুথিটির মূল্য অনস্বীকার্য। এই গ্রন্থটির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হল রস। এই রস সাধনার জন্য রূপের প্রয়োজন। কারণ রস থেকেই রূপের জন্ম—

রতনে ঘটিত রস রূপের আকার।
তাহাতে রূপের জন্ম শুনহ বিচার॥

এই রস থেকেই বস্তু-তত্ত্বকে পাওয়া যায়। এই বস্তু হ'ল সহজবস্তু। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রূপের সঙ্গে সহজ বস্তুরসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। সুতরাং প্রথমে করতে হবে প্রাকৃত রসকে অপ্রাকৃত রসে পরিণত করার সাধনা। সাধনায় প্রাকৃত রস যখন অপ্রাকৃত রসে পরিণত হয়, তখন সাধক তাঁর সম্মুখে শুভ্র স্নিগ্ধ দ্যুতি উদ্ভাসিত হতে দেখেন। এই দ্যুতিই হল আত্মারূপ বা ব্রহ্মরূপ। সহজিয়ারা একেই বলেন, সহজ বস্তুর প্রাথমিক প্রকাশ। এই প্রকাশের ফলেই সাধকের প্রকৃতিতে প্রকৃত রাগের

উৎপত্তি হয়। আত্মরূপকে দর্শন করলে তবেই আত্মপ্রকৃতিতে রাগের উদয় হয়। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, রাগ রূপকে আশ্রয় করেই স্ফুরিত হয়, এবং এইভাবেই শুরু হয় রাগভক্তির সাধনা—

দেবদেহে দেহান্তর হইবে যতনে।
তবে শিক্ষা সাধ্যবস্তু পাইবে যতনে ॥
আবির্ভূত দেহে হবে সাধন প্রকৃতি।
স্বভাব প্রকৃতি হইলে তবে রাগরতি ॥[৩১]

এই রাগরতি জাগ্রত না হলে 'ব্রজে নাহি প্রাপ্তি'। এই ব্রজের অধিকারী শ্রীরূপমঞ্জরী। তিনি রাগেরও অধিকারি এবং রূপবতী রাধিকাই এই রাগবস্তু। আর রসিক নাগর কৃষ্ণ মন্মথের ধাম। মন্মথ ধামের পূর্বদিকে রয়েছে সহজপুর। সহজ মানুষ সেখানে সদাই বাস করেন। তার দক্ষিণ দিকে রয়েছে সদানন্দপুর। সদানন্দপুরের কিছু-দূরের দেশের নাম চন্দ্রকান্তি, এ ছাড়াও রয়েছে কলিঙ্গকান্তি দেশ। এই সহজিয়া তত্ত্ব-কাররা অবশেষে বলেন—

সকলের সার হয় আপন শরীর।
নিজ দেহ জানিতে আপনি হবে স্থির ॥[৩২]

এবং— দেহকে জানিতে যদি পার ভাল মনে।
দেহেতে সকল আছে এ চৌদ্দভুবন ॥[৩৩]

এরপর কবি দেহের অভ্যন্তরস্থ চৌদ্দভুবনের বর্ণনা দিয়েছেন। শরীরের ভিতরের কামকে কবি কালসর্পের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই কাল সর্পের অবিরত দংশনে শ্রীকৃষ্ণভজনে বাধার সৃষ্টি হয়। এই জীবরতির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য 'সাধিবে প্রকৃতি সহিত সাধকাঙ্গ হঞা'[৩৪] সাধনার প্রক্রিয়া বর্ণনার পর কবি বলেছেন, 'প্রেম নিত্য সাধ্য-বস্তু সাধনের সার'। সুতরাং এই প্রেমেরই সাধনা যে আপন শরীরে করতে পারে সে শুদ্ধসত্ত্ব মানুষ। যে মানুষ এই প্রেম সাধনা করতে পারে, সে সহজপুর গ্রাম বা সদানন্দ দেশে বাস করতে পারে। এইজন্যই—

শ্রীনন্দ নন্দ কৃষ্ণ নরবপু তার।
সাধিলেন প্রেমরতি মানুষ আচার ॥[৩৫]

সহজিয়া কৃষ্ণকথার যে মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এর আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, এখানে তারই প্রকাশ। এতদিন পর্যন্ত কৃষ্ণকথার শরীরে দিব্যলোকের নির্মোক লগ্ন ছিল; সহজিয়া প্রেম সাধনায় তা খুলে পড়েছে। মানুষের সঙ্গে দেবতার আর কোন প্রভেদ থাকে নি। এইভাবে 'অমৃত রত্নাবলী' গ্রন্থে সহজ সাধনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃত হয়েছে। তাই গ্রন্থ সম্পর্কে উপসংহারে কবি বলেছেন—

অমৃত রত্নাবলী গ্রন্থ রসের ভাণ্ডার ॥
রসিক সহজে হয় রসের ভাণ্ডার।
অমৃত রত্নাবলী তার গলে কণ্ঠহার ॥[৩৬]

'অমৃতরসাবলী' গ্রন্থটিও 'অমৃতরত্নাবলী'র মত বাংলা পয়ারে লেখা একটি গ্রন্থ। অবশ্য এই গ্রন্থটিতে কোথাও অনুবাদকের নাম পাওয়া যায় না। গ্রন্থটির মঙ্গলা-

চরণে লেখক প্রথমে অন্যান্য গোস্বামীদের বন্দনা করে পরে মুকুন্দদেব গোস্বামীর কিছু বিস্তৃত বন্দনা করেছেন।

'অমৃতরসাবলী' মনের করণের গ্রন্থ। মন ও দশেন্দ্রিয়ের শিক্ষাই এই বইটিতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটির দুটি ভাগ রয়েছে। প্রথম ভাগে সহজ ধর্মের দার্শনিক তত্ত্বের বিবৃতি দেওয়া আছে ; দ্বিতীয় ভাগে আখ্যায়িকার সাহায্যে মন ও ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা ও সাধনার কথাই বলা হয়েছে।

সহজিয়া তত্ত্ব অবগত হওয়ার উপায়স্বরূপ দৈহিক সাধনার কথাই বলা হয়েছে। দেহতত্ত্ব যদি ঠিকভাবে জানা যায়, তাহলে অন্তর সহজ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়, কারণ—'ভজনের মূল এই নরবপু দেহ'[৩৭] এবং নিজেকে অর্থাৎ দেহকে যথার্থভাবে জানলে তবে সহজ বস্তুকে জানা যায়। কিন্তু দৈহিক সাধনা শুরু করতে হলে বাইরের অন্ধকার এবং মনের অন্ধকার দুটিকেই দূর করতে হয়। এই বাইরের অন্ধকার বলতে বোঝায় ইন্দ্রিয়ের প্রতিক্রিয়ায় জাত বিকার এবং মনের অন্ধকার অজ্ঞানতা বা অবিদ্যা-জনিত মায়ামোহবিভ্রম। অতএব, সহজ ধর্মের মর্মে প্রবেশ করতে হলে জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী হতে হবে এবং অবিদ্যা ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু এই সহজ ধর্মের সাধনা করা রীতিমত কঠিন, কারণ নির্বিকার না হলে কেউ সহজ সাধনায় প্রবেশ করতে পারে না। বিকারগ্রস্ত লোক প্রবেশ করা মাত্রই ধ্বংস হয়। গীতার তৃতীয় অধ্যায়েও আমরা অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে এর প্রতিধ্বনি শুনি, 'ইন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধি ; এরা কামের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। এদের সাহায্যেই দেহাভিমানী মানুষদের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে কাম আত্মাকে মোহগ্রস্ত করে রাখে। অতএব হে ভারত ! তুমি আগে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করে সব পাপের মূল ও জ্ঞানবিজ্ঞান বিনাশকারী এই মহাপাপ কামকে জয় কর'।

জিতেন্দ্রিয় এবং নির্বিকার-চিত্ত হওয়ার পর দেহতত্ত্ব কিভাবে আয়ত্ত করা যাবে, তার কৌশল 'অমৃতরসাবলী'তে সন্ধ্যা ভাষায় বর্ণিত আছে। তাতে বলা হয়েছে যে, দেহের তিনটি দ্বার। চতুর হলে দুটি দ্বার ছেড়ে একটি দ্বারের কাছে থাক। অর্থাৎ দেহের মধ্যস্থিত তিনটি দ্বার। তন্ত্রমতে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করে সুষুম্না দ্বারে পরিচালিত করলে অভীষ্ট লাভ হয়। সেইজন্যই বলা হয়েছে চতুর ব্যক্তি দুটি দ্বারকে পরিত্যাগ করে একটি দ্বারের কাছে থাকবে। এরপর নানাভাবে সহজিয়া ধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হওয়ার পর গ্রন্থের আখ্যায়িকা শুরু হয়েছে।

রচনাটি প্রতীকধর্মী। এতে বর্ণিত 'পৃথিবী' মানবদেহ, সরোবর অক্ষয় সরোবর, কমল হল সহস্রদল পদ্ম। আর সহস্রদল কমল থেকে প্রবাহিত আট ক্রোশ দূরের নদী, রসের নদী। এই রসের নদীতে স্নান করতে পারলে স্বর্গীয় রূপ-লাবণ্যের অধিকারী হওয়া যায়। অক্ষয় সরোবরের অধিকারী সর্বদেবা বা পরমাত্মা। তিনি রসের ভোক্তা। তাঁর পঞ্চ রক্ষক হ'ল, কন্দর্পের পাঁচ বাণ। সবা বা জীবাত্মা সর্বদেবা বা পরমাত্মার অংশ। তার নয়জন অনুচর হ'ল পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং চারটি কর্মেন্দ্রিয়। রস চুরি করতে যাওয়ার অর্থ, সাধনা ব্যতীত রস আস্বাদনের কামনা করা।

এরপর যে কন্যার কাহিনী রয়েছে, সেই কন্যাটি হ'ল শ্রীরাধার অংশ-জাত শ্রীরূপ-

মঞ্জরী। সহজিয়া সাধন পন্থায় সাধকের মধ্যে যখন আত্মচৈতন্যের উদয় হয়, তখন আত্মার সঙ্গে নিত্যযুক্ত আত্মা স্বভাব বা আত্মপ্রকৃতিরও বিকাশ হয়। আত্মজ্ঞানী সাধকের মধ্যে বিকশিত স্বভাব-প্রকৃতিই হল এই কন্যা। নয়জন তপস্বীর মধ্যে একজন কন্যাকে অনুসরণ করেছে, এই একজন হল মন। আর 'ভরত' শব্দের অর্থ হল সহজ বস্তুতে নিষ্ঠা-সম্পন্ন মন। কাহিনীর নায়ক 'সবা' নদীর তীরে আসায় সর্বদেবা সংবাদ পেয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে, সবাকে তার সঙ্গে যাওয়ার কথা বললে সবা তার সঙ্গে যেতে রাজী হ'ল না। এর অর্থ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত যুক্ত জীবাত্মা আর সর্ব-দেবার অর্থাৎ পরমাত্মার পঞ্চভূতাত্মক জীবসৃষ্টির কাজে সহায়তা করতে রাজী হল না। যে পাঁচজন তার সঙ্গে থেকে গেল, তারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়।

এরপর সবা পাঁচজনের সঙ্গে সেই কন্যার গৃহে গেলে, সে তাদের বাহির দ্বারে স্থান দিল। এই বাহির দ্বার 'স্থিতি দেহের'। সাধনার প্রাথমিক স্তরে এই দেহকে অগ্রাহ্য করা চলে না। এই কন্যার ছয়জন সখী ছয়টি ভাবের সাধিকা মঞ্জরীগণ।

এটি মনের বারণের গ্রন্থ। সমস্ত কাহিনীটির মূলে তাৎপর্য হল জগৎ-মোহন কৃষ্ণ মানব-শরীরের অভ্যন্তরে স্বরূপে বর্তমান আছেন। তাঁর আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে যখন তিনি জীবাত্মারূপী প্রকৃতিকে নিত্যানন্দ দান করেন, তখনই সহজ সিদ্ধিলাভ হয়।

এই গ্রন্থগুলি ছাড়াও সহজিয়া কৃষ্ণকথাকে অবলম্বন করে যে গান বা পদ রচিত হয়েছে, সে কথা আগেই বলেছি। এবার সেই পদগুলি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

সহজিয়ারা নানা জনের ভণিতা দিয়ে পদ রচনা করেছেন। সহজিয়া চণ্ডীদাসের নামে আমরা বেশ কিছু পদ পাই। তবে ইনি কোন একজন চণ্ডীদাস নন, বহু সহজিয়া কবিই চণ্ডীদাস নামে পদ রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, চণ্ডীদাস নামে যে অনেক সময় সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরু পরম্পরা প্রচলিত ছিল, তার দৃষ্টান্তও ডক্টর বিমান বিহারী মজুমদার দিয়েছেন।[৩৯] তবে এই সহজিয়া চণ্ডীদাস এক বা একাধিক,—সংখ্যায় যাই হোন না কেন, চৈতন্য পরবর্তী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ কিছু কিছু পদে শ্রীরূপ গোস্বামীর উল্লেখ আছে। একজন বিখ্যাত সহজিয়া চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গিনীর নাম রামী রজকিনী এবং ইনিও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার বড়ু চণ্ডীদাসের মত বাসুলী-উপাসক। এঁর একটি পদে রয়েছে—

বাসুলি কৃপায়ে সকলি জানিয়ে
স্বরূপ আরোপ করি।
কৃপা করি মোরে আশ পুরায়ল
স্বরূপ রজক নারি ॥[৪১]

সহজিয়া সাধনায় মানুষ যে সবার উপরে, সে সম্পর্কে কবি বলেছেন—

মানুষ ধরম মানুষ করম
মানুষ সভার বড়।[৪২]

সহজিয়া সাধনায় স্বরূপে যারা কৃষ্ণ এবং রাধা, সেই পুরুষ প্রকৃতিকে কিশোর কিশোরী বলা হয়েছে। চণ্ডীদাসের পদে রয়েছে—

কিশোর কিশোরী দুইটি জন ।
শৃঙ্গার রসের মুরতি মন ।।
* * * *
কিশোর কিশোরী যাহাকে ভজে ।।
গুরু বস্তু সে সদাই মজে ।।[৪২]

সহজিয়াদের এই সাধনা কামকে প্রেমে পরিণত করার সাধনা, তাও কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মানবীর মধ্যে দিব্য প্রেমকে উপলব্ধি করার অবিস্মরণীয় একটি পদ রচনা করেছেন, এই সহজিয়া চণ্ডীদাস। তাঁর সাধনসঙ্গিনী রামীকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন রামীর চরণেই তিনি শরণ নেবেন, রামীই তাঁর কাছে বেদবাদিনী হরগৃহিণী, তাঁর নয়নের তারা। রামীই স্বরূপে কিশোরী অর্থাৎ রাধা। সহজিয়া সাধনা যে সম্পূর্ণভাবেই তন্ত্র-আশ্রিত, তার প্রমাণও চণ্ডীদাসের একটি পদে রয়েছে।[৪৩]

দেখা যাচ্ছে পদগুলি সবই তত্ত্ব-নির্ভর। কিন্তু এই তত্ত্বের আলোকেই কৃষ্ণকথা এখানে নতুনভাবে দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

এই চণ্ডীদাসের সহজিয়া প্রেম নিয়েও চিত্তাকর্ষক কাব্য রচিত হয়েছে। কাব্যটির নাম 'সহজ উপাসনা তত্ত্ব'; পদকর্তা তরুণীরমণ। এর কাহিনী-অংশ এই রূপ—চণ্ডীদাস রজকিনীর সঙ্গে প্রেম করেছেন শুনে রাজা চণ্ডীদাসের ভ্রাতা নকুল ঠাকুরকে তাঁর কাছে পাঠালেন।[৪৪]

তাকে দেখে রামী রজকিনী ঘরের ভেতর চলে গেল। নকুল চণ্ডীদাসকে প্রণাম করে বললেন—'ধোবিনী ছাড়হ ভাই জাতে উঠ তুমি'। কিন্তু চণ্ডীদাস বললেন—

ছাড়িতে নারিব ধোবিনীর প্রেম ফাঁস ।।[৪৫]

এরপর চণ্ডীদাসের স্পর্শে নকুলের ভাবান্তর ঘটল। রামী এবং চণ্ডীদাস নকুলকে সহজ সাধন তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। এইখানেই কাহিনীর শেষ।

চণ্ডীদাস ছাড়াও অন্যান্য কবিদের নামে কিছু সহজিয়া পদ আরোপিত হয়েছে। বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত এই ধরনের একটি পদে সহজ সাধনার পদ্ধতি প্রায় সন্ধ্যা-ভাষায় রচিত হয়েছে।

এ ছাড়াও নরোত্তম, দীনকৃষ্ণদাস প্রভৃতির ভণিতায়ও সহজিয়া পদ পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলির কথা-বৈশিষ্ট্য বলতে কিছু নেই। তাই এ প্রসঙ্গে আলোচিতব্য নয়। তবে দীন কৃষ্ণদাসের ভণিতায় 'শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা' নামে যে কাব্যটি পাওয়া যায়, তার মধ্যে কৃষ্ণকথার অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। কবি গোস্বামীদের পরিকল্পিত কৃষ্ণকথাকেই অবলম্বন করে নতুন কাহিনী কল্পনা করেছেন। কাহিনীগুলির বৈশিষ্ট্য হল, এর সবগুলিতেই কৃষ্ণ নানা ছদ্মবেশ ধারণ করে সুকৌশলে রাধার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

প্রথম কুতূহলে জননী যশোদা একটি পেটিকার ভিতরে রাধার জন্য প্রসাধন ও আভরণ ঢুকিয়ে রাধার স্বামী অভিমন্যুর হাতে পাঠাতে চেয়েছেন। কিন্তু যশোদার কাছ থেকে এই খবর আগেই শুনে নিয়ে কৃষ্ণ নিজেই জননীর আগোচরে অলঙ্কার প্রসাধনসমূহ বার করে দিয়ে পেটিকার ভিতরে বসে থাকলেন এবং অভিমন্যু তা বহন

করে রাধার কাছে নিয়ে গেলেন এবং শেষে পেটিকার ভিতর থেকে কৃষ্ণ বহির্গত হলে—

রাধাকৃষ্ণ মিলন হইল।
দোঁহে দোঁহা দরশনে আনন্দ বাঢ়িল ॥[৪৬]

দ্বিতীয় কুতূহলে সকাল বেলা রাধা যমুনায় স্নান করতে বেরিয়েছেন; সেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে তার মিলন হল। কুটিলা সন্দেহ করে সেখানে উপস্থিত হলে, কৃষ্ণ অভিমন্যুর বেশে তার সামনে উপস্থিত হলেন। রাধাকৃষ্ণের মিলনের প্রমাণ আনতে বলায় কুটিলা কুঞ্জগৃহের শয্যা থেকে রাধাকৃষ্ণের ছিন্ন হার নিয়ে এলে, অভিমন্যুবেশী কৃষ্ণ বললেন, তিনি মথুরায় যাবেন কংসের কাছে খবর দিতে, যাতে তারা কৃষ্ণকে ধরে নিয়ে যায়। আরও বললেন, কংসের পার্শ্বচর গোবর্ধন তাঁর প্রিয় সখা। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে বলবেন যে, হারটি গোবর্ধন-পত্নী-চন্দ্রাবলীরই। এতে গোবর্ধন কৃষ্ণের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হবেন। কৃষ্ণ কুটিলাকে আরও বললেন যে, যদি গৃহে অভিমন্যুর বেশ ধরে কৃষ্ণ আসে, তবে তাকে যেন তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে প্রকৃত অভিমন্যু বাড়ীতে এলে কুটিলা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। আর অভিমন্যু ভাবল—

জানিলাম মহাপ্রেতে পাইল ইহারে।
অবশ্য যাইব আমি রোজা আনিবারে ॥[৪৭]

এই বলে অভিমন্যু চলে গেলে, ঠিক তার পরেই অভিমন্যু-বেশী কৃষ্ণ এলে জটিলা-কুটিলা তাঁকেই প্রকৃত অভিমন্যু বলে মনে করল। তিনি পরমানন্দে অন্তঃপুরে গিয়ে রাধার সঙ্গে মিলিত হলেন। এই কাহিনীর উপসংহারে কবি বলেছেন—

যেই ফল ধরে কৃষ্ণ ইচ্ছা করে যেই।
পরবধূ ক্রীড়া বিনা তাঁহার ইচ্ছা নাই ॥[৪৮]

এর মধ্যে স্পষ্টতঃ সহজিয়া মতের প্রতি ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

তৃতীয় কুতূহলের কাহিনীতে দেখি, জটিলা কৃষ্ণের হাত থেকে বধূকে রক্ষা করার জন্য যশোদার গৃহে রাধার যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। (যশোদা প্রত্যহ রাধাকে রন্ধনের জন্য ডেকে পাঠাতেন। কারণ রাধার ওপর দুর্বাসার বর ছিল যে কেউ তাঁর রন্ধন ভোজন করলে দীর্ঘজীবি হবেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃতে এ প্রসঙ্গ আছে।) কিন্তু এতে রাধাকৃষ্ণ বিরহ যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত সখীরা কৌশল করে জটিলাকে গিয়ে বললেন, রাধাকে সর্পদংশন করেছে। জটিলা ওঝা আনতে চাইলে রাধা বললে, তিনি পরপুরুষকে অঙ্গ স্পর্শ করতে দেবেন না।[৪৯]

তখন রাধার সখীরা কৃষ্ণকে বিদ্যাবলী নাম্নী এক সর্পমন্ত্র বিশেষজ্ঞার বেশে সাজিয়ে দিলেন।[৫০] এরপর বিদ্যাবলীবেশী কৃষ্ণ রাধার দেহে হস্তচালনা করে বিষ দূর করতে চাইলেন এবং শেষ পর্যন্ত বললেন যে, এভাবে বিষ যাবে না। সবাইকে বাইরে যেতে হবে। মন্ত্রবলে সর্পকে এনে দংশনের কারণ জানতে হবে এবং বিষ দূর করতে হবে। সবাই নিষ্ক্রান্ত হলে কৃষ্ণ নিজেই বিদ্যাবলী এবং সর্প উভয় কণ্ঠে কথা বলতে লাগলেন। তাতে জানা গেল, রাধাকে কৃষ্ণের জন্য রন্ধন করতে দেওয়া হয় না বলেই সর্প আগে রাধাকে দংশন করেছে, পরে অভিমন্যুকেও দংশন করবে। একথা শুনে ভীতা জটিলা পুত্রবধূকে আবার যশোদা-গৃহে রন্ধন করতে যাওয়ার অনুমতি

দিলেন এবং শুধু তাই নয়, আবার সর্প বধূকে দংশন করতে পারে এই আশঙ্কায় বিদ্যাবলীকে সেই রাত্রিতে বধূর সঙ্গে একত্র শয়নের আদেশ দিলেন। এইভাবে রাধা-কৃষ্ণের মিলন ঘটল।

চতুর্থ কুতূহলের কাহিনীও একই রকমের। রাধা কৃষ্ণের প্রতি মানবতী হলে, কুন্দলতার সঙ্গে পরামর্শ করে কৃষ্ণ অপূর্ব সুকণ্ঠী নারীবেশ ধারণ করলেন। কুন্দলতা রাধার কাছে তাঁকে নিয়ে গিয়ে বললেন, এঁর নাম কলাবতী। ইনি 'গানেতে জিনেন সরস্বতী আদি যত'। সুতরাং 'গান গাওয়াইয়া কিছু লহ পরিচয়।' রাধার অনুরোধে কলাবতী-বেশী কৃষ্ণ গান শোনালেন। সেই গান শুনে মুগ্ধ রাধা গলার হার খুলে তাঁকে দিলে, ললিতা রাধার কানে কানে কিছু বললেন। রাধা বললেন যে, তিনি কলাবতীকে বসনে ভূষণে সাজিয়ে দেবেন, জীর্ণ কঞ্চুলিকা খসিয়ে নতুন কঞ্চুলিকা পরাবেন। কুন্দলতা এতে বাধা দিলেও সখীরা জোর করে কলাবতীবেশী কৃষ্ণের বসনভূষণ খুলতে লাগলেন। কৃষ্ণের বক্ষ থেকে দুটি বৃহৎ কদম্ব মাটিতে পড়ে গেল। কৃষ্ণ ধরা পড়লেন। এরপর তাঁরা কৃষ্ণ ও কুন্দলতাকে চলে যেতে বললে, কৃষ্ণ আবার নারী বেশ ধারণ করে জটিলার কাছে গিয়ে কেঁদে কেঁদে বললেন, 'আমি কীর্তিদা রাণীর ভগ্নি-কন্যা, বাল্যকাল থেকেই রাধিকার সঙ্গে আমার অতিশয় প্রীতি। কিন্তু রাধা—

মোরে দেখি একবার ফিরি না চাহিলা।
কিছু না কহিল আলিঙ্গন নাহি দিলা ॥[৫০]

তখন জটিলা রাধার কাছে উপস্থিত হয়ে কলাবতী বেশী কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতে বললেন। কুন্দলতার সঙ্গে এর বিবাদ আছে, কুন্দলতাকে যদি আলিঙ্গন করে, তবে তিনিও আলিঙ্গন করবেন। কুন্দলতা কৃষ্ণের ভ্রাতৃজায়া, তবু শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ তাকে আলিঙ্গন করলেন। এবার জটিলা নিজে এগিয়ে এসে নারী বেশী কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার আলিঙ্গন করিয়ে দিল এবং বিশাখাকে আদেশ দিল—

ঘরে লৈয়া দুঁহাকারে করাহ ভোজন।
কলাবতী সহ রাধা এক পালঙ্কেতে।
শয়ন করেন যেন সুদৃঢ় পীরিতে ॥[৫১]

এইভাবে আবার রাধাকৃষ্ণের মিলন হল। এই কাহিনীগুলির প্রত্যেকটিই কবি বিশেষের নিজস্ব কল্পনা। রাধাকৃষ্ণ প্রেম কথাকে নিয়ে আপন আপন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট দার্শনিক তত্ত্ব আরোপ করে এইসব কাহিনী নির্মিত হয়েছে।

মধ্যযুগের অপরাপর কাব্য ধারায় যেখানে প্রত্যক্ষভাবে শক্তি-দেবীর মাহাত্ম্য খ্যাপন করা হয়েছে অথবা ধর্মমঙ্গল, ধর্মপুরাণ প্রভৃতিতে যেখানে যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট, সে সব কাব্যের পরিধিতেও কৃষ্ণকথা কোন না কোনভাবে বিস্তার লাভ করেছে। বংশীদাসের মনসামঙ্গলে দেখি লখীন্দরের বাসর ঘরের দেওয়ালে চিত্রিত কৃষ্ণলীলার নানা প্রসঙ্গ কবি বর্ণনা করেছেন।[৫২] এ ছাড়াও বংশীদাস কৃষ্ণকথার আর একটি সুন্দর প্রয়োগ করেছেন তাঁর কাব্যে। বাসর রাত্রে লখীন্দর বেহুলাকে যে গল্পটি শুনিয়েছে, তা হ'ল ভাগবতের কৃষ্ণার্জুন কর্তৃক ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র আনয়ন কাহিনী। মনসামঙ্গলের পরবর্তী ঘটনা, বেহুলার মৃত স্বামীকে নিয়ে স্বর্গপুরে যাত্রা। এই কাহিনীর পটভূমিতে উল্লিখিত প্রসঙ্গ তাই অনেক বেশী ব্যঞ্জনাবহ হয়েছে।[৫৩]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও তাঁর মনসামঙ্গলে পঞ্চদেবতা বন্দনা প্রসঙ্গে 'বনমালা গলে' কৃষ্ণকে প্রণিপাত জানিয়েছেন।[৫৪] এ ছাড়াও কেতকাদাস নানাভাবে কৃষ্ণকথার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কৃষ্ণকথা-কাব্যের ব্রজবুলি প্রয়োগ রীতিকেই কেবল তিনি অনুকরণ করেন নি, রাখালবালকদের গোচারণ প্রসঙ্গটিতেও গোষ্ঠলীলার আবহ রচনা করে সমকালীন কৃষ্ণকথামুখী জনমানসের প্রবণতাকে নিজের কাব্যে ধরার চেষ্টা করেছেন।

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে দেখি, বেহুলার মৃত স্বামী নিয়ে স্বর্গযাত্রা উপলক্ষে যে মঞ্জুষ নির্মিত হল, তাতে নানা চিত্র অঙ্কিত হল। এই চিত্রের একটি—

কালিন্দী যমুনাতীর লেখিলেন যদুবীর
হেল্লেন কদম্বের গাছে ॥
যতেক গোপিগণ হইয়া বিবসন
বসিয়া কালিন্দী জলে।[৫৫]

এ ছাড়াও সম্পাদিত কাব্যটি থেকে প্রতিভাত হয়, জগজ্জীবনের কাব্যগানে যে সকল ধুয়া ব্যবহৃত হয়েছে, তা কাহিনীর প্রাসঙ্গিক কৃষ্ণকথা। যেমন—বরযাত্রী বেশে লখীন্দরের যাত্রাকালের বর্ণনা প্রসঙ্গে যে ধুয়া ব্যবহৃত হয়েছে, তা হ'ল—

ও শ্যামের বাঁশী বয়ানে বয়ান।
অবলা রাধার তুমি হরিলে পরাণ ॥

আবার লখিন্দরের মৃত্যুর পর ধুয়া রয়েছে—

আমি নারী অভাগী নিদ্রার কাতর।
কাল ঘুমে হারাইল শ্যামসুন্দর।

স্বামীহারা বেহুলার বেদনার সমধর্মী ঘটনা হিসেবে এখানে মাথুর পর্যায়ের রাধার কথাই ভাবা হয়েছে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর বৈষ্ণব ভাবুকতা সর্বজন পরিচিত প্রসঙ্গ। অতএব এ প্রসঙ্গের বিস্তার না ঘটিয়ে কেবল উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, শ্রীমন্তের বাল্য-ক্রীড়ার বর্ণনায় মুকুন্দরাম বৎসহরণ, ব্রহ্মার বিভ্রম প্রভৃতি কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গকেই অনুকরণ করেছেন। চণ্ডীমঙ্গল ধারার অপর কবি দ্বিজ রামদেবও তাঁর অভয়ামঙ্গলে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গকে বারবার উপস্থিত করেছেন। কৃষ্ণকথা নিয়ে রচিত কবির পদসমূহ তাঁর অভয়া-মঙ্গলেই সঙ্কলিত হয়েছে। এই পদসমূহ অনবদ্য—

ভাইরে মধুবনে আর ভয় নাই।
আনন্দে বিহরে তথা রামকানাই ॥
আজু আপনি মাঠেতে আইলে নন্দের দুলাল
না ধাইও ধাইও বোলে রঙ্গিয়া রাখোআল ॥
দেখ না কদম্বতলে ও দীনদয়াল।
আনন্দে বিহরে রঙ্গে নন্দের দুলাল ॥
রামদেবে বোলে আছ ধন্য ধন্য ক্ষিতি।
গোধন রাখিতে আইল গোলোকের পতি ॥

এ ছাড়াও রূপানুরাগ ও মানিনী রাধার প্রসঙ্গ নিয়েও দ্বিজ রামদেব তাঁর অভয়ামঙ্গলে পদ রচনা করেছেন।[৫৬]

ধর্মমঙ্গল কাব্যধারাতেও কৃষ্ণকথা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে দেখি, ধর্মের আনুকূল্যেই কৃষ্ণ তাঁর আরব্ধ লীলাসমূহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন—

হয়ে বাসুদেব-বংশ কংসে কৃষ্ণ কৈল ধ্বংশ
তায় তুমি তাঁরে অনুকূল।
গোলক বিহারী হরি স্বামী পাইল গোপনারী
পূজি তব চরণ রাতুল।[৫৭]

ধর্মদাস বৈদ্যের ধর্মমঙ্গলে (অনাদ্যমঙ্গল) লাউসেন রাজা, রাজসভায় বসে কালিয় দমনের কাহিনী শুনেছেন—'ধর্মকথা শুনে রাজা কালিয় দমন'।[৫৮]

বিশ্বনাথ দাসের ধর্মপুরাণের নানা প্রসঙ্গেও কৃষ্ণকথা ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, মাসির কথায় লাউসেন কাটামুণ্ড জোড়া লাগে বিশ্বাস করতে না পেরে বলেছে—

প্রকার প্রবন্ধে কংস বধিতে ভাগিনা
কৃষ্ণকে বধিতে জেমন পাঠাইল পুতনা।
তেমনি এসেচ বুঝি মামার অংশ হঞা
তোমার চরিত্র মাসি লইলাম বুঝিঞা।[৫৯]

আর এক অজ্ঞাত কবি রচিত অনাদি পুরাণের তত্ত্ব-কথা কৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।[৬০] ত্রিলোচন দাসের 'শরীর নির্ণয়' শ্রী মদন গোপালের আজ্ঞায় লিখিত কায়া সাধনার তত্ত্বগ্রন্থ। 'কাএ ম [ধ্যে] ভজ রাধাকৃষ্ণের চরণ'-ই হল এর মূলকথা।[৬১] মাণিকরাম গাঙ্গুলীর শীতলামঙ্গলেও কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হয়েছে—

হস্তিনা নগরে ঘর রাজা দুর্জোধন
অহঙ্কার কর্যা কৃষ্ণে কৈল কুবচন।
গোধন চরায়্যা তোর গেল সর্বকাল
গুয়ালার ভাত খায়্যা এত ঠাকুরাল।[৬২]

হৃদয়রাম সৌউ-এর ধর্মপুরাণে বিচিত্র রূপে অবতীর্ণ ধর্মের বন্দনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণেরই নানা লীলার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে—

হইয়া নন্দের কানু মুরলীতে দিলে সানু
শুনে গোপী না রহিল ঘরে
ত্বরা ধায় গোপীগণ প্রবিশিয়া বৃন্দাবন
পরশ করিল গদাধরে।
তোমার অনেক লীলা পাতিয়া দানের ছলা
দান ছলে নৌকার কাণ্ডারী
মথুরার বিকে গিয়া শ্রীরাধারে সঙ্গে লইয়া
কৌতুকে হইলা রাধার ভারী[৬২]

এই কবির কাব্যে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শঙ্খাসুর প্রভৃতির ভাগবতীয় কাহিনীও বর্ণিত

হয়েছে। কৃষ্ণরাম দাস কালিকামঙ্গলে 'রাধার সহিত কৃষ্ণ'কে প্রথমে বন্দনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত কৃষ্ণকথার একটি অংশ—

বন্দিলাম যশোদা নন্দ পরম সাদরে।
পুত্রভাবে আপনি আছিলা যার ঘরে ॥
বাসুদেব দৈবকী বন্দিলাম জোর হাথ
পাইল পরমানন্দ অখিলের নাথ ॥[২৪]

অবশ্য এই ধরনের যথেচ্ছ উদাহরণ সংকলন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। স্বল্পায়াসে সংকলিত এই উদাহরণ মালা সামনে রেখে আমরা যে সিদ্ধান্তটি উপস্থিত করতে চাই, তা হ'ল—কৃষ্ণকথাকে প্রধান অবলম্বন করে সাহিত্যের যে ধারাকে আমরা পূর্বে অনুসরণ করেছি, পর্বে পর্বে তার বিকাশকে যেমন পর্যবেক্ষণ করেছি, তাতেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সমস্ত পরিধিটি বিধৃত ছিল না। মধ্যযুগের সমস্ত কাব্য-ধারাতেই কৃষ্ণকথার অবিসম্বাদী অনুপ্রবেশ অবারিত হয়েছিল—সংকলিত উদাহরণমালা এই সত্যেই আমাদের পৌঁছে দেয়।

উল্লেখ পঞ্জী

১. তন্ত্রকথা ; চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ; বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ ; ১৩৬২ ; পৃ. ৬
২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ; বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত ; পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১৪২
৩. তদেব ; পৃ. ১৪৬
৪. বর্তমান গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়,
৫. পরশুরাম রায়ের মাধব সঙ্গীত ; অমিতাভ চৌধুরী সম্পাদিত ; বিশ্বভারতী, ১৩৭১, পৃ. ৮৩
৬. তদেব ; পৃ. ৮৮
৭. তদেব ; পৃ. ৯০
৮. Descriptive Catalogue of Sans. Mss, Royal Asiatic Soc. Bengal, ৮।৬০০২-৩, Cat. Printed Books and Mss. Asiatic Soc. Bengal. পৃ. ২৬১ ; Descriptive Cat. Sans. Coll. Mss ৫।৭৬, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংকলিত Notices Sans. Mss.-১।৩৮৩, এদের মধ্যে শেষোক্ত পুঁথি দুটিতে যথাক্রমে প্রথম পাঁচটি অধ্যায় ও মাত্র ত্রয়োবিংশ অধ্যায়টি আছে।
৯. তন্ত্রে কৃষ্ণচরিত্র ; চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৪৬, পৃ. ২৯৬
১০. তদেব ;
১১. Catalogus Catalogorium ১।৫০৪
১২. রাধাতন্ত্রম্ ; কামিক্ষ্যানাথ মুখোপাধ্যায় সংকলিত ; দ্বিতীয় সংস্করণ ; (১৩৪১), ১ম পটল ; শ্লোক সংখ্যা-৪
১৩. তদেব ; ২য় পটল। শ্লোক সংখ্যা-২২
১৪. তদেব ; অষ্টম পটল। শ্লোক সংখ্যা-২৩
১৫. তদেব ; ত্রয়োদশ পটল ; শ্লোক সংখ্যা-১
১৬. তদেব ; ষোড়শ পটল ; শ্লোক সংখ্যা-১৫ ; 'মহেশ্বরী'র পাঠান্তর জগন্ময়ীও পাওয়া যায়।
১৭. তদেব ; ২২শ পটল ; শ্লোক সংখ্যা-১৫
১৮. তদেব ; ২৮শ পটল ; শ্লোক সংখ্যা-৯
১৯. দুর্লভসার ; পৃ. ২১৫ ; বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী ; বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত।
২০. তদেব ; পৃ. ২১৭
২১. আগমসার ; চৈতন্যোত্তর প্রথম চারিটি সহজিয়া পুঁথি ; শ্রী পরিতোষ দাস, এম. এ. সম্পাদিত ; প্রথম প্রকাশ, ১৯৭২ ; পৃ. ১৮
২২. চৈতন্যচরিতামৃত ; ১।৪
২৩. আগমসার ; পৃ. ২৫
২৪. তদেব ; পৃ. ২৭

২৫. তদেব ; পৃ. ৩১
২৬. তদেব ; প. ৪১
২৭. তদেব ; পৃ. ৪৪
২৮. আনন্দভৈরব ; ভূমিকা ; পৃ. ৪৫ চৈতন্যোত্তর প্রথম চারিটি সহজিয়া পুঁথি, শ্রী পরিতোষ দাস, এম. এ. সম্পাদিত ; প্রথম প্রকাশ, ১৯৭২ ; পৃ. ১৮
২৯. তদেব ; পৃ. ৮০
৩০. তদেব ; পৃ. ৮৫
৩১. তদেব ; অমৃতরত্নাবলী ; পৃ. ১৩৩
৩২. তদেব ; পৃ. ১৩৪
৩৩. তদেব পৃ. ১৩৫
৩৪. তদেব ; ১৩৮
৩৫. তদেব ; পৃ. ১৪৭
৩৬. তদেব ; ১৫৭
৩৭. তদেব ; পৃ. ১৮৬
৩৮. তদেব ; পৃ. ২১১
৩৯. চণ্ডীদাসের পদাবলী ; বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত ভূমিকা ; পৃ. ৩৫
৪০. তদেব ; পৃ. ২০
৪১. তদেব ; পদ সংখ্যা ৮৪
৪২. তদেব ; পদ সংখ্যা ৮৯
৪৩. বৈষ্ণব-মহাজন-পদাবলী ; প্রথম খণ্ড ; পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ ; বসুমতী সাহিত্য মন্দির ; পৃ. ১৬২
৪৪. তরুণী রমণের সহজ উপাসনা তত্ত্ব ; সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ; ১৩৩৫, ৪র্থ সংখ্যা পৃ. ১৭৩
৪৫. তদেব।
৪৬. বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী ; বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত ; পৃ. ৩০৮
৪৭ তদেব ; পৃ. ৩১৩
৪৮ তদেব ; পৃ. ৩১৩
৪৯ তদেব ; পৃ. ৩১৯
৫০. তদেব ; পৃ. ৩৩০
৫১. তদেব ; পৃ. ৩৩৩
৫২. রামনাথ চক্রবর্তী ও দ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত বংশীদাসের পদ্মপুরাণ ; ১৩১৮।
৫৩. দ্বিজবংশীকৃত পদ্মপুরাণ ; ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ; পৃ. ১৭২-৭৩
৫৪. অক্ষয় কুমার কয়াল ও চিত্রাদেব সম্পাদিত কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসা মঙ্গল ; পৃ. ৩
৫৫. কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসা মঙ্গল ; শ্রী সুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, কাব্যতীর্থ ও অধ্যাপক ড. আশুতোষ দাস কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০ ; পৃ. ২৫৬
৫৬. দ্বিজ রামদেব বিরচিত অভয়ামঙ্গল, ড. আশুতোষ দাস সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ; পৃ. ৩-৩।।
৫৭. শ্রী ধর্মমঙ্গল, বঙ্গবাসী তৃতীয় সংস্করণ, ১৩১৮, পৃ. ৩
৫৮. দ্বাদশ মঙ্গল, শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, সাহিত্য প্রকাশিকা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫
৫৯. তদেব ; পৃ. ৯১
৬০. তদেব ; পৃ. ১১৪
৬১. তদেব ; ১৬৩-১৭৩
৬২. তদেব ; পৃ. ২৮৮
৬৩. তদেব ; পৃ. ৩০২
৬৪. কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, শ্রী সত্য নারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ; পৃ. ৫

পরিশিষ্ট-খ

কৃষ্ণকথার আধুনিক যুগ

আমাদের আরব্ধ, মধ্যযুগের সময়-সীমায় কৃষ্ণ কথার বিকাশ পর্বটি আমরা অতিক্রম করে এসেছি। প্রসঙ্গসূত্রে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ঊষা লগ্ন থেকে যে কথাপ্রবাহকে অনুসরণ করতে করতে আমরা পৌঁচেছি, শেষ করার আগে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে পরবর্তীকালে সে কোন্ পরিণতিতে পৌঁছোলো। যুগান্তর সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাধারণীকরণ হ'ল—

> প্রতি যুগ আনে না আপন অবসান,
> সম্পূর্ণ করে না তার গান,
> অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে।

আধুনিক যুগ মানবতাবাদের স্বচ্ছ আলোয় উদ্ভাসিত হতে চায়। সাধারণভাবে তাই কৃষ্ণকথার আধ্যাত্মিকতা, কিংবা তার পরকীয়া প্রেমকথায় একালের মানুষের মন ভরে না। যুগসন্ধির সন্ধ্যালোকে বাংলার কাব্যাকাশে কবি অপেক্ষা কবিওয়ালার যে ভীড় জমেছিল—তাদের গানে, খেউড়ে, টপ্পায়, কৃষ্ণকথার যে বিকৃতি ঘটছিল, তা আধুনিকতার অগ্রদূত রামমোহনের মোটেই রুচিকর হয় নি। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জাতীয় অবনতির কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম মনে করতেন। তাঁর **Defence of Hindu Theism**-এর প্রথম ভাগে তিনি লিখেছিলেন যে, কৃষ্ণের ভক্তেরা কৃষ্ণ এবং গোপী সেজে অশ্লীলভাবে নাচ গান করে এবং কৃষ্ণের প্রেম ও লাম্পট্যের অভিনয় করে। স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আদর্শে রামমোহন বিশ্বাস করতেন না। 'গোস্বামীর সহিত বিচার' গ্রন্থেও তাঁর এই একই মনোভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করি। কৃষ্ণ যাদের উপাস্য এবং চৈতন্যচরিতামৃত যাদের উপনিষদ, তাঁদের তিনি আক্রমণ করেছেন।

কিন্তু কৃষ্ণকথা আমাদের সংস্কৃতির এমনই এক গূঢ় রহস্য যে, রামমোহনের বা মিশনারী সম্প্রদায়ের আক্রমণে সংস্কৃতির পট থেকে তার বর্ণোজ্জ্বলতা বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নি। ভাগবতের একাধিক মুদ্রিত সংস্করণ একালেই প্রকাশিত হল (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সংস্করণ, মুদ্রণ সমাপ্তিকাল-১২ই মে, ১৮৩০ ; গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ-সানুবাদ সংস্করণ ; ১৮৫২)। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব কিছুটা হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণচরিত্র নিয়েই আধুনিক কালের যুক্তিঋদ্ধ মনীষা নতুন পথে যাত্রা শুরু করলেন। একই নদী কেবল পুরাতন ধারা-পথ ত্যাগ করে বয়ে চলল নতুন পথে। এই নবপ্রবাহের ভগীরথ হলেন—মধুসূদন, কেশব চন্দ্র সেন, গৌরগোবিন্দ রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, শিশির কুমার ঘোষ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ।

মধুসূদন ব্রাহ্মবন্ধু রাজনারায়ণের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্রজলীলারই অংশবিশেষ নিয়ে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' লিখেছিলেন। ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনা করার আগে সংস্কৃত উদ্ভট কাব্য কবিতা, জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং আরও কিছু বৈষ্ণব গ্রন্থও পাঠ করেন। কিন্তু কোন ধর্মীয় গোঁড়ামির দ্বারা চালিত না হয়েই তিনি কাব্যটি রচনা করেন। রাজ-

নারায়ণকে তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন "I think you are rather cold towards the poor lady of Braja. Poor man ! when you sit down to read poetry leave aside all" religious bias. Besides Mrs. Radha is not such a bad woman after all. রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলায় চিরকালের মানুষের ভালবাসার আকৃতিকেই নিখিল সাহিত্য-নাগরিক মধুসূদন লক্ষ্য করেছেন। তাঁকে নাড়া দিয়েছে বিরহিণী রাধার বেদনা। রাধা তাঁর কাছে হ্লাদিনী শক্তির সারভূতা মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীমতী নন, তিনি 'Mrs. Radha', 'Poor lady of Braja' এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর নব-নায়িকা। প্রেমের জন্য যে নারী নিজের তথাকথিত সতীত্ব সংস্কার, সমাজের রক্তচক্ষু ও পারিবারিক সম্পর্কের নিরাপত্তাকে বিসর্জন দিতে পেরেছে, অথচ বিনিময়ে প্রেমিকেব কাছ থেকে পেয়েছে বিশ্বাসঘাতকতা, সেই হতভাগিনী নারীর বেদনা, আক্ষেপ ও আশা ধ্বনিত হয়েছে ব্রজাঙ্গনা কাব্যে।

কাব্যের আরম্ভে কবি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকাব্য 'পদাঙ্কদূত' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সরল সরস মিত্রাক্ষর রীতির ছন্দে লেখা এই কাব্যে কবি বিরহিণী রাধার বেদনাকে আন্তরিকভাবেই তুলে ধরেছেন। আকাশে মেঘ দেখে রাধার মনে কৃষ্ণের স্মৃতি জাগ্রত হয়, আবার কখনও কখনও প্রতিধ্বনির কাছেও তিনি নিজের বিরহবেদনা ব্যক্ত করেন। রাধার সখীরা, যাঁরা বৈষ্ণব কবিতায় তাঁর প্রেম সহায়িকা, এখানে তারা ছায়ামাত্র। বিশ্ব প্রকৃতিই তাঁর বিরহবেদনার শ্রোতা। তাই বলা যায়, মধুসূদনের এই কাব্যে ভাষা ও ভাবের দিক থেকে, বৈষ্ণব পদাবলীর কোন পূর্বসংস্কার কাজ করে নি। বরং তিনি কিছুটা ভারতচন্দ্র ও নিধুবাবুর দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন। মোটকথা, তাঁর ব্রজাঙ্গনা কাব্যে কৃষ্ণকথার নায়িকা রাধা, আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের গণ্ডী পার হয়ে মানবীয় আবেগের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছেন।

চতুর্দশপদী কবিতাবলীতেও কৃষ্ণকথাকে অবলম্বন করে দুটি পদ রচিত হয়েছে— 'জয়দেব' ও 'ব্রজবৃত্তান্ত'। 'জয়দেব' কবিতায় কবি জয়দেবকে সঙ্গী করে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার ক্ষেত্র গোকুলে যেতে চেয়েছেন, যেখানে—

শিখিপুচ্ছ চূড়া শিরে, পীতধড়া গলে
নাচে শ্যাম, বামে রাধা—সৌদামিনী ঘনে।

'ব্রজবৃত্তান্তে'ও কবি কালিন্দীকে সম্বোধন করে রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার পূর্বস্মৃতি স্মরণ করেছেন। বহুকাল আগে হলেও শরণের একটি পদে আমরা বৃন্দাবনের লীলাস্মরণে কবির দীর্ঘশ্বাস মর্মরিত হতে দেখেছি। যুগান্তরের ব্যবধান সত্ত্বেও কাব্যানুভূতির একটি বিশেষ মুহূর্তে কবিদ্বয়ের এই সাযুজ্য আমাদের বিস্মিত করে। মধুসূদনের অন্য কাব্য-নাটকেও কৃষ্ণকথার নানা প্রসঙ্গ নানাভাবেই স্থান পেয়েছে।

হেমচন্দ্রের কাব্যবৃত্তেও কৃষ্ণকথা এসে পড়েছে নানা প্রসঙ্গে। তাঁর 'চিত্ত-বিকাশে'র 'স্মৃতিসুখে'র ভেতরে দেখতে পাই, ময়ূরই হয়ে উঠেছে শ্রীমতীর বিরহে কৃষ্ণ-স্মরণের অবলম্বন। ময়ূরকে দেখে রাধার মনে পড়ে—

তোর নাচে তিনি তুড়ি দিয়া দিয়া,
নাচাতেন আরো ঠারি আমায়,

কভু তোর নাচে উল্লাসে মাতিয়া,
নাচিতেন হেম নূপুর পায়।

অবশ্য কবিতা হিসাবে এটি নিতান্তই নগণ্য। বরং 'ব্রজবালক' কবিতাটির "মোহন মূরতি চিকণ কালা, রূপের ছটায় জগৎ আলা।" প্রভৃতি পংক্তিগুলি অনেক সরস। মোট কথা, হেমচন্দ্রের কাব্যে কৃষ্ণকথার যেটুকু প্রসঙ্গ এসেছে, তা কোনভাবেই তাৎপর্যবহ নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে কেশব চন্দ্রের ভূমিকা, সাহিত্য স্রষ্টার ভূমিকা ছিল না। তিনি ছিলেন প্রধানতঃ সমাজ ও ধর্মসংস্কারক। ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চিন্তায়, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার চিন্তায় তিনি তাড়িত হয়েছিলেন। শ্রেণী-বর্ণ-ধর্মভেদেব বিরুদ্ধে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন ; যদিও তাঁর জন্ম হয়েছিল কলুটোলার এক নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারে। পররতীকালে ব্রাহ্ম সমাজে বৈষ্ণবোচিত ভক্তিমূলক সাধন প্রণালীর প্রবর্তনে কেশবচন্দ্র যে উৎসুক হয়েছিলেন, তার মূল তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের মধ্যেই ছিল। অন্য দিকে ব্রাহ্মধর্মের সংস্কার সাধন করে তিনি যে 'নব-বিধান' প্রবর্তন করেন, তার লক্ষ্য ছিল ধর্মের মধ্যে 'কোন প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার অথবা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কোন মতকে প্রশ্রয় না দেওয়া'। লক্ষ্য করার বিষর, কেশব চন্দ্রের এই যুক্তিবাদী মনটি অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেরও ঐক্যসাধনে প্রয়াসী হয়েছিল। তাঁর অন্যতম অনুরাগী ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালকে দিয়ে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম আলোচনার আয়োজনও করেছিলেন। আর নিজেও কৃষ্ণকে জাতীয় বীর হিসেবে চিত্রিত করেছিলেন। **Sunday Mirror (10th and 24th Dec., 1876 ; 14th August, 1886)** এবং **New Dispensation (9th June, 22nd July, 1881 and 23rd Sep., 1883)**-এর একাধিক প্রবন্ধে তিনি কৃষ্ণচরিত অঙ্কন করেছেন। এ ছাড়া তাঁর 'জীবনবেদে'র নানা স্থলেও কৃষ্ণের প্রসঙ্গ এসেছে।

কেশবচন্দ্রের শিষ্য গৌরগোপাল উপাধ্যায় গুরুর নির্দেশে কৃষ্ণচরিত্রকে কিছুটা ঐতিহাসিক মর্মে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছিলেন, ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায়। পরে এটি গ্রন্থাকারে ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিতও হয়েছিল। 'অন্যদিকে এই সময়েই ম্যাক্সমূলার প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা ভারত-তত্ত্বে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিশেষতঃ ভাগবত এই সময়ে পাশ্চাত্ত্য ভাষায় অনূদিত হলে, অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা কৃষ্ণলীলাত্মক পুরাণগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে দেশে এবং বিদেশে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে কৃষ্ণচরিত্রকে বিচারের অনুকূল আবহ রচিত হয়। রামমোহনের বিরূপ মনোভাবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র, কৃষ্ণকথার পক্ষে যতটা অনুর্বর হয়ে উঠেছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে এসে তার বহুগুণ উর্বরতা বৃদ্ধি পেল।

এই উর্বর সামাজিক পরিবেশে অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রেহে' (১৮৭৪-৭৭) বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদসংকলন প্রকাশ করেন। বাঙ্গালীর যা কিছু সম্পদ বলে তিনি জ্ঞান করতেন, তাকে সকলের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা ছিল তাঁর দেশাত্মবোধ ও স্বদেশপ্রীতির বিশিষ্ট প্রকাশ। এতে এক শ্রেণীর মানুষ তাঁকে গোঁড়া বলে চিহ্নিত করেছে, তাঁর সংকলিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্যকে অপবিত্র

অরুচিকর ও অশ্লীল বলে আক্রমণ করেছে। এই আক্রমণের মুখে সেদিনের বঙ্গদর্শনের নায়ক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শন সঙ্গে নিয়েই প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছেন। বঙ্গদর্শন কেন্দ্রিক যে নতুন সংস্কৃতি সেদিন গড়ে উঠছিল, তাতে কৃষ্ণকথা সসম্ভ্রম স্বীকৃতি পেয়েছে। ১২৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার বঙ্গদর্শনে অক্ষয় সরকার সম্পাদিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্যের নিন্দুকদের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

কৃষ্ণকথাকে "যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসারগ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণগীত কখনও এতকাল স্থায়ী হইত না। কারণ অপবিত্র কাব্য কখন স্থায়ী হয় না। এ বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ জন্য আমরা এই নিগূঢ় তত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।"

এই অনুসন্ধানের ফলই বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত'। এটি রচনার উদ্দেশ্য হিসেবে তিনি প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞপ্তিতে বলেছিলেন—"অনুশীলনের ধর্মে যাহা তত্ত্বমাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট।" অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম যা **theory** হিসেবে আলোচনা করেছেন, 'কৃষ্ণচরিত্রে' কৃষ্ণের মধ্য দিয়ে তিনি তারই প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন (বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮১)। এই প্রবন্ধে তিনি কৃষ্ণকে বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষের ঐক্য স্থাপনে সক্রিয়, মানব জাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতীক হিসেবে কল্পনা করেছেন। এরপর ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে 'প্রচার' পত্রিকায় কুড়ি মাস ধরে এর কয়েকটি অধ্যায় ছাপা হওয়ার পর, ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে। কৃষ্ণচরিত্র নিয়ে তাঁর প্রথম ভাবনার কাল থেকে এই সময় প্রায় ১৮ বছর। এই কাল পরিধিতে তাঁর কৃষ্ণ-চিন্তা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নি। দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছিলেন—"আমি বলতে বাধ্য যে প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়াছি।.........এরূপ মত পরিবর্তন স্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না।.........বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলো অন্ধকারে যতদূর প্রভেদ, এতদুভয়ে ততদূর প্রভেদ। মত পরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল।" বঙ্কিমের এই মত পরিবর্তন কোন পথগামী? আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমশঃ গভীর ও ব্যাপক গবেষণার মধ্য দিয়ে তাঁর এ মত পরিবর্তনকে আবাহন করেছেন। ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত এবং হরিবংশের কৃষ্ণলীলাকে ভিত্তি করে তাঁর কৃষ্ণচরিত্র সম্পর্কিত প্রত্নগবেষণা বিস্তারলাভ করেছে। পুরাণেতিহাসের তুলনামূলক বিচার পদ্ধতি তাঁর হাতে নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছে। তিনিই প্রথম আমাদের পৌরাণিক ঐতিহ্যকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে বিচার করেছেন। তাঁর কৃষ্ণচরিত্রের আদর্শ বৈষ্ণব কবিতার কৃষ্ণচরিত্র হতে সম্পূর্ণ পৃথক। বৈষ্ণব কবিতায় ও বিবিধ পুরাণে গোপীগণের সঙ্গে অবৈধ প্রেম সম্বন্ধের ফলে কৃষ্ণচরিত্রের যে কালিমা আধুনিক রুচির কাছে জুগুপ্সা-ব্যঞ্জক ছিল, তা হ'তে কৃষ্ণচরিত্রকে মুক্তি দিয়ে কৃষ্ণকে অনুশীলন ধর্মের আদর্শে মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শ করে চিত্রিত করাই ছিল বঙ্কিমের উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে

পৌঁছতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ যুক্তির নিয়ন্ত্রণে কৃষ্ণচরিত্র থেকে অনৈসর্গিক ও অলৌকিকতাকে বর্জন করেছেন।

কিন্তু বঙ্কিম যখন কৃষ্ণকে অবলম্বন করে কবিতা লিখেছেন—

কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান ?
ব্রজ কি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই
ব্রজ-জন টুটায়ল পরাণ ॥

এতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণচরিত্র থেকে যে কলঙ্কের কালিমা বঙ্কিম 'কৃষ্ণচরিত্রে' অপনোদন করতে চেয়েছেন, তাঁর রচিত কবিতায় তা হয় নি। উপন্যাসের মধ্যে নায়ক নায়িকার প্রণয় সম্পাদনে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু কিছু কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গানের ব্যবহার করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব গীতগুলি অসাধারণ রসোত্তীর্ণতা লাভ করেছে।

কিছু কনিষ্ঠ হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালে নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'ত্রয়ী' (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস)-তে কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা করেছেন। উভয়েই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ হলেও, কৃষ্ণচরিত্র চিত্রণে অলৌকিকতাকে সমানভাবে বর্জন করতে পারেন নি। সন্দেহ নেই, বঙ্কিমের মত নবীনচন্দ্র যুক্তিবাদী ছিলেন। নবীনচন্দ্র বিশ্বাস করতে পারেন নি, কুন্তী সূর্যকে মর্ত্যে নামিয়ে এনেছিলেন, এবং তাঁর ঔরসে গর্ভবতী হয়েছিলেন। বরং মনে করেছেন দুর্বাসার কাছ থেকে মন্ত্র পাওয়ার পরিবর্তে, তাঁরই সঙ্গে কুন্তীর অবৈধ সম্পর্ক থেকেই কর্ণের জন্ম হয়েছিল।

ছাত্র জীবনে নবীনচন্দ্র কেশব সেনের সংস্পর্শে এসে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে একটি মানস প্রবণতা লাভ করে থাকতে পারেন। এ ছাড়াও কেশব চন্দ্রের কৃষ্ণ চরিত্র, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়ের আলোচনা এবং সমকালের সমস্ত পরিবেশ থেকে নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ সম্পর্কে যে ধারণা গঠিত হয়েছিল, ত্রয়ীতে তার প্রভাব পড়েছে। প্রাসঙ্গিক ভাবে নবীনচন্দ্রের মানসবিকাশে আর একজনের উল্লেখ করতে হয়। তিনি হলেন প্রথম জীবনে কেশব সেনের অনুগামী, উত্তর জীবনে বৈষ্ণব, অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ। নবীনচন্দ্র কর্ম জীবনে যখন যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর নিযুক্ত হয়ে যান, (১৮৬৮) তখন শিশির কুমারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। শিশির কুমারের প্রভাব সম্পর্কে নবীন চন্দ্র 'আমার জীবনে' লিখেছেন—"যশোহরে লিখিত আমার খণ্ড কবিতায় ও পলাশীর যুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রুবিসর্জন আছে, তাহা কথঞ্চিৎ শিশিরকুমারের সংসর্গ ও শিক্ষার ফল।" এখানে শিশিরকুমারের স্বদেশভক্তির প্রভাব যেমন নবীনচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন, তেমনি শিশিরকুমার এই সময় থেকেই, ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে শিশিরকুমার 'নরপূজা'র কারণে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। স্বাভাবিক ভাবে মনে হয়, এর আগে থেকেই শিশিরকুমার তাঁর উত্তর জীবনের অবলম্বন, বৈষ্ণব ধর্মে আসক্ত হয়ে পড়ছিলেন। পরবর্তীকালে 'অমিয়-নিমাই-চরিতে' তিনি চৈতন্যলীলাকে কৃষ্ণলীলার মারফতে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে কৃষ্ণ ও চৈতন্য, দুজনেরই উদ্দেশ্য ছিল মানব সেবা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ঊনবিংশ

শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষিত হিন্দু সমাজে কৃষ্ণলীলার নানা যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছিল। এই সময় অনেক ভক্ত বৈষ্ণব কৃষ্ণলীলাকে অবলম্বন করে বহু তত্ত্ব গ্রন্থও লিখছিলেন। যেমন রসিক মোহন বিদ্যাভূষণের নাম প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের মতে কৃষ্ণলীলা কোন ঐতিহাসিক, বাস্তব বা ভৌমলীলা নয়, এ একটি অচিন্ত্য অলৌকিক লীলা, যার কোনকালেই বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না। সেকালে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে, অনেক বৈষ্ণব ভক্ত-পণ্ডিত কৃষ্ণলীলা কাহিনীকে অনেক সময়ই রূপক বলে মনে করেছেন।

সামাজিক এবং মানসিক এই প্রেক্ষাপটে নবীনচন্দ্র একান্তভাবেই যুক্তির পথগামী হয়েছেন সত্য। বৃন্দাবনলীলার অনেক কাহিনীকে তিনি অবাস্তব বলে প্রত্যাখ্যানও করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় কাব্যের শেষে প্রার্থনা করেছেন, মৃত্যু কালে যেন কৃষ্ণনাম শুনতে পান। তৃতীয় কাব্যে তিনি পুরোপুরি বাংলার বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছেন এবং যীশু বা চৈতন্য হিসেবে কৃষ্ণের পুনর্জন্মে বিশ্বাসী হয়েছেন। কুরুক্ষেত্র কাব্যে নবীনচন্দ্র কৃষ্ণকে ব্যাসের শিষ্য হিসেবে চিত্রিত করেছেন। শতধা বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণকে পীড়িত করেছে। বহু রাজ্য, আর জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিদ্বেষের বিভেদে ভারতবর্ষ জর্জরিত, তাই কৃষ্ণ সমস্ত ভারতবর্ষকে এক সূত্রে বাঁধার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছেন। আর সুভদ্রা চিত্রিত হয়েছেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের আদর্শে। তাঁরই মত সুভদ্রা শিবির থেকে শিবিরে আর্ত ও আহতের সেবা করে বেড়িয়েছেন। কৃষ্ণ এবং সুভদ্রা, উভয়েই নবীনের হাতে চিত্রিত হয়েছেন শাশ্বত প্রেম ও শান্তির দূত হিসেবে।

ত্রয়ীর অন্ত্যখণ্ড 'প্রভাসে' যদুবংশ ধ্বংসের বিবরণ আছে। যাদবরা কৃষ্ণের প্রেমধর্মকে গ্রহণ না করে ভোগ আর পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছে। অন্যদিকে অনার্যগণ কৃষ্ণের প্রেমধর্মে অভিষিক্ত হয়েছিল। এই কাব্যের পটভূমিতে আর্য অনার্যের দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে দেখা যাবে, দুর্বাসার প্ররোচনায় বাসুকি শত চেষ্টা করেও নাগগণকে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণদ্রোহী করে তুলতে পারে নি, বরং বাসুকিই শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু জরৎকারু অপরিবর্তনীয় থেকে গেছে। যদুবংশ ধ্বংসের পরে কৃষ্ণ অনার্য সৈন্য নিয়ে পশ্চিমে প্রেমধর্ম প্রচারের অভিযান করতে মনস্থ করেছেন। ব্যাসের ভবিষ্যদ্বাণীতে শোনা গেছে, লোহিত সাগরের উত্তর-পূর্বে নতুন অবতার আবির্ভূত হবেন (লক্ষ্য যীশুখ্রীষ্ট)। বোধ হয় নবীনচন্দ্রের এই ভিত্তিহীন কল্পনার দুঃসাহসকে কেউ কোনদিনই ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। এই পরিকল্পনার রূপায়ণে বঙ্কিমচন্দ্রের নিষেধ কিংবা হেমচন্দ্রের কটাক্ষ উপেক্ষা করেও নবীন চন্দ্র মহৎ পরিকল্পনার ট্র্যাজিক রূপকার হিসেবে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন।

এই যুগের আর একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ব্রহ্মবান্ধবের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনিও কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে তাঁর নব বিধান ধর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা গ্রহণ করেন। (১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী) পরবর্তীকালে তিনি ধর্মান্তরিত হলেও স্বদেশপ্রীতি ছিল ব্রহ্মবান্ধবের আবাল্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর জন্য তাঁর একটি সংগ্রামশীল মনও ছিল। ১৯০৪

খ্রীস্টাব্দে জে. এন ফারকোহার নামে একজন খ্রীস্টধর্ম প্রচারক 'গীতা অ্যান্ড গস্পেল' নামক পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে অযথা কালিমা লেপন করেন। এতে ব্রহ্মবান্ধব আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে জুলাই মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ এন. এন. ঘোষের সভাপতিত্বে 'Personality of Sri Krishna' শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন। এই সভায় তিনি ফারকোহারের অযথা উক্তিগুলির এমন উত্তর দেন যে, ফারকোহারের পক্ষের লোক সভায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রতিবাদে সাহস করে নি। বাংলা ভাষাতেও তিনি 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শোভা বাজারে রাজা বিনয় কৃষ্ণ দেবের ভবনে সাহিত্য সভার একটি অধিবেশনে (১৯০৪, ২রা অক্টোবর) এটি পঠিত হয় এবং সাহিত্য সংহিতা-য় (আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১১ সংখ্যা) প্রকাশিতও হয়।

এ ছাড়াও ব্রহ্মবান্ধবের 'পাল-পার্বণ' গ্রন্থে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক দুএকটি প্রবন্ধও সংকলিত দেখা যায়। যেমন—'শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব' ও 'দোললীলা'। কৃষ্ণকে ব্রহ্মবান্ধবও আত্মচেতনার আলোতেই দেখতে চেয়েছিলেন, দেখতে চেয়েছিলেন জাতীয় জীবনের হীনতা হতে মুক্তির উপায় হিসেবে। তাঁর ভাষায়—"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহংবিন্দুগুলিকে কৃষ্ণচরণ বিনির্গত জাতীয় জীবন জাহ্নবীতে নিমজ্জিত করিতে হইবে। হিন্দুর ঐতিহাসিক পারম্পর্য শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল হইতে প্রসূত। আইস এই জন্মাষ্টমীর দিনে সেই পারম্পর্য স্বীকার করিয়া সকলে কৃষ্ণপদ কল্পতরু মূলে অভেদসূত্রে এক হই।" দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মবান্ধবও কৃষ্ণকথাকে যুগোপযোগী জাতীয় জীবন রসে সিক্ত করেই বিচার করেছেন। বিপিন চন্দ্র পাল বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীরই প্রভাবে এসে কৃষ্ণকথার অন্যতম শক্তিশালী ব্যাখ্যাতা হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম ছিলেন, বেশী বয়সে তিনি বৈষ্ণব হন। বিপিনচন্দ্রের কৃষ্ণ বিষয়ক গ্রন্থ হ'ল—Sri-Krisna। এতে অবশ্য কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হয় নি। কৃষ্ণের শিক্ষা সমূহের তাৎপর্য এবং বৈষ্ণব দর্শনই এতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে তিনি কৃষ্ণকে ভারতাত্মা হিসেবে উপস্থিত করেছেন। তাঁর ভাষায় "Sri Krisna represents the ideal of the Indian type of Humanity. Historically, he has been the supreme teacher of our people. He has given us the highest philosophy of both our individual and our composite social life. In his life and teachings India had found the master key to the secrets of her nation building, and a rational synthesis of all the outer differences and conflicts of her diverse races and communities and the confusions of her numerous cults, cultures, religions and philosophies", এ যেন নবীনচন্দ্রেরই কৃষ্ণ চরিত্র পরিকল্পনার প্রতিধ্বনি। নবীন চন্দ্রের প্রভাব আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, যখন বিপিনচন্দ্র বলেন—"Finally Sri-krisna as we find him in the Mahabharata and the Haribansa stands out as the first and greatest nation builder in India. He sought to reconstruct the ancient aryan society of India upon a broad federal basis, making room within it, for the

various non-aryan races and communities of the land, thus laying the foundations of Indian unity and nationality upon a stupendous social synthesis, reconcilling the independence and individuality of the different races and communities with the unity of the new composite social national whole" (Sri-krana ; Bipin Chandra Pal ; p. p.-7-8) রামায়ণ-মহাভারতে কিংবা পুরাণ সমূহে, বলাই বাহুল্য, এই মতের সমর্থনে কোন তথ্য নেই। নব্য ভারতের কিছু কবি এবং দার্শনিকই কৃষ্ণকে নিয়ে এই অভিনব ব্যাখ্যার স্রষ্টা। বিপিন চন্দ্র পাল প্রধানতঃ দার্শনিক। ইতিহাসের মুখ তিনি সর্বত্র রক্ষা করতে পারেন নি। কারণ তিনি কৃষ্ণকে ঘোর আঙ্গিরসের পুত্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর আলোচনায় প্রধানতঃ তিনি ভাগবত ও জীব গোস্বামী লিখিত সন্দর্ভ সমূহের ওপরেই নির্ভর করেছেন।

অন্যদিকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হলেও, তাঁর বংশ ছিল বৈষ্ণব। তাঁর পিতামহীও গভীরভাবে বৈষ্ণবভক্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শ খানিকটা তাঁর জীবনে পেয়েছিলেন। জোড়াসাঁকোয় তাঁদের গৃহপ্রাঙ্গণে নীলকণ্ঠ ও মতি রায়ের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রাগান রবীন্দ্রনাথ বাল্য-কৈশোরে অনেক দেখেছিলেন। কিশোরী চাটুজ্জের কাছে তিনি যে সমস্ত পাঁচালী গান শুনতেন, তাতেও কৃষ্ণলীলার বেশ প্রভাব ছিল। নিতান্ত অল্পবয়সে যখন সংস্কৃত কাব্য বোঝার বোধ তাঁর জন্মায় নি, তখনই তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্য ছাপা গীতগোবিন্দ সুর করে পড়ে পড়ে আনন্দ পেতেন। রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলনের সেই ছন্দিত রূপ কবির প্রাণে কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছিল, সদ্য-তরুণ কবির রচিত ভানু সিংহের পদাবলীতেও তার প্রমাণ রয়েছে। 'ভানুসিংহে'র—

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে—
বালা বিরহ বিষণ্ন।

এগুলি জয়দেবের 'রতিসুখসারে' পদটির কথাই মনে করিয়ে দেয়। এ ছাড়া অক্ষয় কুমার সরকারের সম্পাদিত বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদাবলীও রবীন্দ্রনাথকে 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনায় উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা এবং তারই সঙ্গে ব্রজবুলির শব্দমোহে সৃষ্টি হয় 'ভানুসিংহের পদাবলী'। কিন্তু এখানেও কবির ওপর বৈষ্ণব প্রভাব বাইরের দিক থেকেই পড়েছিল। তিনি ভাষা এবং ছন্দোমাধুর্যেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন বেশী পরিমাণে। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবির কাব্যের ছন্দোমাধুর্য রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু এটিই সব নয়। পদাবলী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার মধ্য দিয়ে তাঁর নিজেরই ভাবকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এদিক থেকে সুক্ষ্মভাবে বিচার করলে কৃষ্ণকথার যে আবেদন মধুসূদনের কবি মনে সঞ্চারিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথেও তাই হয়েছে। তাই ভানুসিংহের রাধা বলেন—

মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান।
মেঘ বরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,
রক্ত কমলকর, রক্ত অধর পুট,
তাপ বিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান।

ভানুসিংহেরও প্রধান অবলম্বন রাধার বিরহ। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাবিরহের পদগুলিতে বিরহের তীব্রতায় হৃদয় বেদনার যে গভীর প্রকাশ, তার পরিবর্তে এখানে রাধার বিরহে তরুণ কবির ফেনায়িত ভাবোচ্ছ্বাসই রূপ লাভ করেছে। কিন্তু আবার কখনও এই কাব্যেই রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা কবির নিজস্ব প্রকাশের ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে সার্থক—

মৃদু মৃদু গমনে আওল মাধা
বয়ান পান তছু চাহল রাধা
চাহয়ি রহল স চাহয়ি রহল
দণ্ড দণ্ড সখি চাহয়ি রহল,
মন্দ মন্দ সখি নয়নে বহল
বিন্দু বিন্দু জলধার।

মোট কথা, কৃষ্ণকথা কাব্যজীবনের আদি পর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছে। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব কবিতার ভাব সৌন্দর্যকে কবি আত্মস্থ করেছেন গভীরভাবে। তাঁর বিপুল বিস্তৃত সাহিত্য জীবনের সর্বত্র সেই প্রভাবের চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে। তবে কৃষ্ণলীলার বৃন্দাবন পর্বই কবির মনে প্রভাব বিস্তার করেছে বেশী। এমনকি পরবর্তীকালে এক সময় কবি একথাও বলেছেন—

যদি পরজন্মে পাইরে হতে
ব্রজের রাখাল বালক—
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে
সুসভ্যতার আলোক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আরও বহু শিল্পী মনীষীর রচনায়ও কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গ রয়েছে। রামনারায়ণ তর্করত্ন 'রুক্মিণীহরণ' (১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭১ এবং 'কংসবধ' (৬ই ডিসেম্বর, ১৮৭৫) নাটক রচনা করেন। গৌরী তর্কবাগীশ ভাগবতের সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে। বিদ্যাসাগরও 'বাসুদেব চরিত' রচনা করেছিলেন, যদিও তা মুদ্রিত হয় নি। যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুও 'পবিত্র বৈষ্ণব ধর্মচন্দ্রের কলঙ্ক কালিমা মোচনার্থ' লেখেন। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর রাজকৃষ্ণ রায়ও প্রহ্লাদ চরিত্র, দ্বাদশ গোপাল, জন্মাষ্টমী, শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা প্রভৃতি রচনার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। নাট্যকার মনোমাহন বসুও 'রাসলীলা' অবলম্বনে নাটক লিখেছিলেন। অমৃতলাল বসুও 'ব্রজলীলা' নাটক লিখেছিলেন। বিহারী লাল চট্টোপধ্যায় 'নন্দবিদায়' নাটক লিখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পরম সুহৃদ্ রামদাস সেনও বঙ্কিমেরই অনুরোধে ভাগবত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনুসারী

কবিদের অন্যতম দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাব্যে, বিষয়বস্তুর মধ্যেও কৃষ্ণ প্রসঙ্গ এসেছে। সে যুগের বিখ্যাত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদও 'বৃন্দাবন-বিলাস' নাম দিয়ে একটি গীতিনাট্য রচনা করেন, তাঁর আর একটি নাটকের নাম 'রাধাকৃষ্ণ'। এ ছাড়াও তাঁর 'নর-নারায়ণ' নাটকটিতে কৃষ্ণ চরিত্রকে নাট্যকার সম্পূর্ণ মৌলিকভাবে উপস্থিত করেছেন। অতুলকৃষ্ণ মিত্রও নাট্যাকারে নন্দবিদায়, গোপীগোষ্ঠ প্রভৃতির কাহিনী রচনা করেছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'জয় রাধেকৃষ্ণ' নামে প্রবন্ধ লিখে-ছিলেন 'প্রবাহিণী'তে (১০ই ফাল্গুন, ১৩২১)। অধরলাল সেনের 'ললিতা সুন্দরী ও কবিতাবলী'তে কৃষ্ণকথার অন্যতমা পাত্রী ললিতাকে শাশ্বত সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে উপস্থিত করেছেন। এই কৃষ্ণকথা চর্চার ধারা বর্তমান শতাব্দীর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও অব্যাহত ছিল। দীনেশ চন্দ্র সেন কৃষ্ণ কথা অবলম্বনে একাধিক উপাখ্যান রচনা করেছেন। যেমন-ধরাদ্রোণ, সুবল-সখার কাণ্ড, কানুপরিবাদ ও শ্যামলী খোঁজা ইত্যাদি। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 'চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থে সচিত্র ভাগবতীয় ব্রজলীলা প্রকাশ করেছিলেন। প্রাচীন সাহিত্য গবেষক হিসেবে অমূল্যচরণ একটি স্মরণীয় নাম। 'প্রাচীন সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ' নামক একটি গবেষণা-ধর্মী প্রবন্ধের তিনি যেমন রচয়িতা, তেমনি 'শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত', 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস', 'শ্রীশ্রী সংকীর্ত্তনামৃতে'র মত, কৃষ্ণকথাশ্রয়ী প্রাচীন গ্রন্থগুলির সম্পাদকও তিনি। আবার গিরীন্দ্র শেখর বসুর মত মনোবিজ্ঞানীও কৃষ্ণকথার অবতারণা করেছেন 'পৌরাণিকী'তে, আর তাঁর হাতে গীতা ব্যাখ্যাত হয়েছে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টি কোণ থেকে। এ ছাড়াও ঔপন্যাসিক শরৎ-চন্দ্রের চেতনায় নানা প্রসঙ্গে নানাভাবে এসেছে কৃষ্ণকথা ও বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গে অন্ততঃ তাঁর শ্রীকান্ত উপন্যাসের চতুর্থ পর্বের কথা উল্লেখ করা যায়। বৈষ্ণববংশের সন্তান, কবি কালিদাস রায়ের কবিতায় বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাবনা কৃষ্ণকথার আধারে প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'ভারতবর্ষ'-এ (শ্রাবণসংখ্যা ; ১৩২০) মুদ্রিত তাঁর 'অন্ধকার বৃন্দাবন' কবিতাটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের 'নারায়ণ' নামক মাসিক পত্র সম্পাদনায় এবং তাঁর রচিত বিভিন্ন কবিতায়ও কৃষ্ণকথার ভক্তিনম্র উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে বিকশিত কৃষ্ণলীলা কথার এই বিচিত্র গতিভঙ্গকে আমরা মূলতঃ তিনটি ধারায় বিভক্ত করতে পারি। একটি প্রাচীন পৌরাণিক আদর্শের ধারা, আর একটি ধারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শে নিয়ন্ত্রিত। এ দুটো ধারাকে রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যাবে, আধুনিক যুগে অবশিষ্ট-মধ্যযুগের অতৃপ্তির 'দীর্ঘশ্বাস'। তৃতীয় ধারাটি কিন্তু সম্পূর্ণ আধুনিক রীতির ; ইউরোপীয় শিক্ষা দীক্ষায়, যুক্তি-বোধে, চলতি কালের সমাজ-দর্শনের আবহাওয়ায় লালিত হয়ে এবং নতুন মানবতাবাদে প্রভাবিত হয়ে, কৃষ্ণকথার যুগোপযোগী মানবীয় জীবনরস সম্পৃক্ত উপস্থাপন। অতিসাম্প্রতিক কালেও কৃষ্ণকথার আবেদন সাহিত্য স্রষ্টা-দের কাছে ফুরিয়ে যায় নি। তাই আধুনিক কবির কবিতায় কখনও ব্যক্তিমানুষের হাহাকার বেজে উঠেছে রাধারই রূপকে—মহানাগ যেন সে আমিই / মৃতপ্রায় নিজেরই দংশনে/ বিধাতার ইচ্ছেমতো প্রাণ দেবো কানুর মন্তরে, চরণেও / অথচ সে শুধু খেলা

করে ছিনিমিনি,/আমার যে বেঁচে থাকা দায়,/মরণও যে দায়,/বড়ায়ি লো, বলু তারে যেন আর না বাজায় বাঁশী (এখনো রাধিকা ; জিয়া হায়দার)। রচিত হয়েছে 'রাধাকৃষ্ণ' (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) ও 'শাম্ব'-র (সমরেশ বসু) মতো উপন্যাস। আজকের যুগজীবনের বক্তব্যই এরা ধারণ করেছে। তবে কৃষ্ণকথার এই modernisation শিক্ষিত নাগরিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলেও, লোকজীবনে কৃষ্ণের অলৌকিক লীলাই অনন্ত প্রবাহে প্রবাহিত। যাত্রা-পাঁচালীতে, লোককাব্যে আমাদের এ সিদ্ধান্তের অজস্র প্রমাণ আছে।

নির্দেশিকা